পরিচয়

বর্ষ ৩৯ । সংখ্যা ৬-৭

পৌষ-মাঘ ১৩৭৬

সূচিপত্র

অপ্রকাশিত চিঠি :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ৬২৯

প্রবন্ধ :

ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গ : স্মৃতিতর্পণ । অরুণা হালদার ৬৩২ ॥ ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গ : শেষ আলাপ । গোপাল হালদার ৬৪০ ॥ বোদল্যারের বিচার । অবন্তীকুমার সান্যাল ৬৫৩ ॥ মুক্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামের চলচ্চিত্র । পরিমল মুখোপাধ্যায় ৬৬৭ ॥ বুদ্ধিজীবিকা ও বিষের কারবারী । এ. সিম্‌শিংস্‌ (অনুবাদক : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়) ৬৭৩

কবিতা :

গোলাম কুদ্দুস ৬৬০ । কৃষ্ণ ধর ৬৬২ । শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় ৬৬৩ । রেখা দত্ত ৬৬৩ । কেদার ভাদুড়ী ৬৬৪ । দীপক রায়চৌধুরী ৬৬৫ । তরুণ সান্যাল ৬৬৬

গল্প :

ইতিহাস সংবাদ । চণ্ডী মণ্ডল ৭০৬

নাটক :

ঠাকুর যাবে বিসর্জন । লোকনাথ ভট্টাচার্য ৬৭৭

পুস্তক-পরিচয় :

আশুতোষ ভট্টাচার্য ৭১৩ । সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১৪ । অমিতাভ দাশগুপ্ত ৭১৬

বিবিধ প্রসঙ্গ :

কল্যাণ চৌধুরী ৭২৩ । তরুণ সান্যাল ৭২৭

বিয়োগপঞ্জী :

রাসেল আর নেই । জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ৭৩৬

পাঠকগোষ্ঠী :

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় ৭৩৮ । তরুণ সেন ৭৩৯ । সুকুমার মিত্র ৭৪২ । অশোকনাথ মুখোপাধ্যায় ৭৪৩

প্রচ্ছদপট : বিশ্বরঞ্জন দে

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত ।

পরিচয়
বর্ষ ৩৯ । সংখ্যা ৬
পৌষ । ১৩৭৬

HOTEL IMPERIAL
WIEN

Dear Dr Lesny

I am confined to my bed, ill and tired. My doctor thinks that I shall have my release in the beginning of the next week when I shall try to visit Budapest where the people are so eagerly waiting for me. The memory of my welcome in Prague will always remain in my heart and my love for your people I shall carry with me to India.

I have just finished reading the

Letters from England by your great author Capek, they are brilliantly suggestive and full of originality.

Kindly send me a list of the books that you have undertaken to send to our library in Santiniketan. For I have to send a notice beforehand to Prabhat Kumar Mukerji, our librarian informing him about the number and names of them.

With kindest regards to yourself and your wife

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

HOTEL IMPERIAL
WIEN

Oct, 23. 1926

Dear Dr Lesny,

I am confined to my bed, ill and tired. My doctor thinks that I shall have my release in the beginning of the next week when I shall try to visit Budapest where the people are so eagerly waiting for me. The memory of my welcome in Prague will always remain in my heart and my love for your people I shall carry with me to India,

I have just finished reading the Letters from England by your great author Capek, they are brilliantly suggestive and full of originality,

Kindly send me a list of the books that you have undertaken to send to our library in Santiniketan. For I have to send a notice beforehand to Prabhat Kumar Mukerji, our librarian informing him about the number and names of them.

With kindest regards to yourself and your wife.

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অধ্যাপক লেজ্‌নির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। তাঁকে লেখা কবির বেশ কিছু চিঠি নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমরা জানি বন্ধুবর দুশান্‌ জবাভিতেলের উদ্যোগেই সেটা সম্ভব হয়েছে। তবে ওপরের চিঠিটি কি করে যে দুশানের গবেষকশোভন শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে এতাবৎ অপ্রকাশিত রয়ে গেছে তা সত্যিই একটি আশ্চর্য ব্যাপার। চিঠিটা পাওয়া গেল প্রাগের 'ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউট'-এর গবেষক ডঃ মিলোস্লাভ ক্রাসা ও ডঃ জাঁ মারেকের কাছ থেকে। তাঁর ও আমাদেরও ইচ্ছা ছিল দুশান্‌কে দিয়েই চিঠিটির সঙ্গের এই 'নোট'টি লেখানো। কিন্তু দুশান্‌ বেশ কয়েক মাস এখানে থাকার পর কিছুদিন হলো কলকাতা ছেড়ে দেশে ফিরে যাওয়ায় সে ইচ্ছা পূরণ করা গেল না। তবে আশা করব 'পরিচয়'-এর পুরনো সুহৃদ হিসেবে তিনি পরে হয়তো এই চিঠিটি সম্পর্কে বা রবীন্দ্রনাথ-লেজ্‌নি প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য পাঠিয়ে আমাদের নতুন তথ্যের সন্ধান দেবেন।

ডঃ ক্রাসা, ডঃ মারেক্‌ ও চেকোস্লোভাক 'ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউট'-এর কাছে 'পরিচয়' এই চিঠির জন্য বিশেষভাবেই কৃতজ্ঞ। —চিন্মোহন সেহানবীশ]

শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ সম্প্রতি প্রাগে (চেকোস্লোভাকিয়া) 'ওয়ার্ল্ড মার্কসিস্ট রিভিয়ু' পত্রিকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'লেনিন ও সমকাল' শীর্ষক একটি আলোচনা সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন। প্রাগে তিনি রবীন্দ্রনাথের অমূল্য চিঠিখানির সন্ধান পান এবং 'পরিচয়' পত্রিকার জন্য সংগ্রহ করে আনেন। আমরা প্রাগের 'ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউট', ডঃ ক্রাসা, ডঃ মারেক্‌ ও শ্রীসেহানবীশকে এই বিশেষ সহায়তার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

—সম্পাদক।

ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গ ঃ স্মৃতিতর্পণ

অরুণা হালদার

জীবনের রৌদ্রদাহ, অপরাহ্ন অন্তরে, অম্বরে—
গাঢ় যন্ত্রণার শেষ ; দিগ্‌দিগন্তে বিদ্যুৎ ডম্বরে
আশঙ্কা ঘনায়, রাত্রি তবু অবসান, ভোর হয়—
মানুষ আশায় বাঁচে, কাঁদে হাসে আর কথা কয়।
অর্থহীন দ্বি-অর্থক—কতবার ফুটো নৌকো সেঁচে
অন্তহীন জল পার হয়—প্রলয়ের পরে বেঁচে
উঠেও বা ঘাসের অঙ্কুর। ঘুঁই ঝরায়েছে পাতা
এবারের মতো—মাটির মলিন-মসী—ছেঁড়া কাঁথা,
রোগের জর্জর খেদ, পাবে কি পাবেনা পরিণতি
উর্বরা পলির প্রাণে - কে জানে! এ-বুকজোড়া ক্ষতি
ঘর ভাঙা ক্ষতি মিলে দিনরাত্রি হাত ধরাধরি
পথে দাঁড়ায়েছে এসে—তবু বাঁচি যদি নাই মরি।

শরতের নীলাকাশে শুভ্র বিচ্ছুরিত সূর্যালোক—
আছো তো তুমিও প্রেম? বলি, তবে তাই সত্য হোক।

কাগজে কিছুকাল পূর্বে দেখেছিলাম ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গের মৃত্যুর সংবাদ (আগস্ট ৩০, ১৯৬৭)। মনে পড়ল তাঁকে দেখার ও পরিচয় পাবার সুযোগ ঘটেছিল। দেখার পূর্বে পড়েছিলাম তাঁর 'ঝড়' (Storm); আর বিশেষ কালের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা তাঁর উপন্যাস 'বরফ গলার দিনগুলি' (Thaw)। সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে ভাবতে চেষ্টা করেছি, সাহিত্যিকের শক্তি শুধু মনীষায় বা সৃজনী-সাহিত্যেই অভিব্যক্ত হয় না—সময়ে সময়ে তা হয়ে ওঠে যুগোপযোগী ঘোষণা। উদ্দেশ্যমূলক রচনা না-হলেও সে-রচনা একটি না-একটি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়—পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌, আর—ধর্ম সংস্থাপনার্থায় তো নিশ্চয়ই। এই ঘোষণা বারবার ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গের রচনায় তত্তৎকাল পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গিয়েছে। এই বিশেষ কারণেই সর্বকালের সার্বজনীন মানবতার উদ্‌গাতারূপে

ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গকে দেখতে পাই। তাঁর ভূমিকা একাধিকবার রাশিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবকালে, তথা বিপ্লবোত্তর কালে, পরিলক্ষিত হয়েছে।

আমার এইরূপ মানসিক পটভূমিকায় তাঁকে দেখবার ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছিল বিগত ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে। জানুয়ারি ১৯৬২—১৯৬৪ জানুয়ারি পর্যন্ত আমার কাটে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগে অধ্যাপনার কাজে। সময়টার বেশির ভাগই লেনিনগ্রাদ শহরে কাটাতে হলেও যাওয়া-আসার পথে এবং বারদুই শান্তিপরিষদের দুটি আন্তর্জাতিক অধিবেশনে মস্কো যাই। শান্তি পরিষদের সাধারণ সভায় প্রেসিডিয়মে এহ্‌রেনবুর্গও সমাসীন ছিলেন, তাঁকে পৃথক করে দেখার ততখানি সুযোগ হয়নি। সুযোগ হল ফ্রেণ্ডশিপ হাউসে, সাহিত্যকারদের শাখার বিশেষ অধিবেশনের সময়। এহ্‌রেনবুর্গ ১৬ই জুলাই (১৯৬২) সেই শাখা অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন। তাঁর ভাষণও শোনার সৌভাগ্য হল। মূল রচনা থেকে তা যথা-নিয়মে তৎক্ষণাৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে কানে আসছিল। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয়টি ছিল সাহিত্যিকের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে সচেতন দায়িত্ব ও সেই মনোভাব-প্রণোদিত কার্যধারা। বেশি দীর্ঘকায় নন এহ্‌রেনবুর্গ। য়িহুদী বংশীয় খড়্গনাসা, বদ্ধ ওষ্ঠাধর এবং মুখের ছাঁদ পিয়ার ফলের মতো। মাথায় উস্কোখুস্কো (shaggy) চুল। মোটামুটি বুদ্ধিজীবী সম্বন্ধে যে ভাব আমরা পোষণ করি—তেমনই মুখভাব। তাঁর ওই চুল—যা দিয়ে নাকি তাঁর সুহৃদসমাজেও তাঁর নাম—আর তাঁর কণ্ঠস্বরের ধ্বনিতে আমরা শ্রোতারা পাচ্ছিলাম অভিজ্ঞতালব্ধ প্রত্যয়।

যথাকালে আমার অধ্যাপনার নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করে গৃহে ফেরার পথে আবার মস্কো এলাম। এখান থেকে গেলাম ইয়োরোপের কতকগুলি দেশ ঘুরে ফিরে দেখে আসার জন্য। জার্মানিতে হুমবোল্ড ইয়ুনিভার্সিটিতে এবং চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাহা ইয়ুনিভার্সিটিতে আমার স্বামী (শ্রীগোপাল হালদার) ও আমার বক্তৃতা দেবারও নিমন্ত্রণ ছিল। সুতরাং ১৬ই জানুয়ারি আমরা মস্কো ছেড়ে গেলাম। রেল ভ্রমণে ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম, দেশ দেখার সুযোগ অপেক্ষাকৃত বেশি। ইণ্টারন্যাশন্যাল ট্রেনে তাই লণ্ডনের উদ্দেশে রওনা হলাম। ওখান থেকে (মোটরেই বেশিটা) প্যারিস হয়ে লণ্ডনে ফিরে কিছুদিন থেকে আবার রেলেই ফিরলাম মস্কোতেই। এবার থেকে অর্থাৎ মস্কো ফেরার পর ব্যবস্থাটা গেল পাল্টে। যাবার সময় পর্যন্ত আমি ছিলাম ওই

দেশের সাময়িক কর্মী, আমার স্বামী ছিলেন আমার 'অতিথি'। আর ইয়োরোপ ঘুরে আসার পর আমার স্বামী হলেন সোভিয়েত লেখক সংঘের অতিথি। আর, সস্ত্রীক অতিথি। ১৬ই ফেব্রুয়ারি আমরা অপরাহ্ন বেলায় মস্কোতে পৌঁছলাম। সেদিন স্টেশনে প্রতীক্ষমান ছিলেন কয়েকজনা বন্ধু-বান্ধবী। শ্রীভিক্তর রামেসিস এবং শ্রীমতী মরিয়ম সাল্‌গানিক ছিলেন লেখক সংঘের পক্ষ থেকে। তাঁদের সঙ্গেই আমরা এলাম ভারশাভা হোটেলের একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট স্যুইটে। এখানে চার-পাঁচ দিন থেকে ভারতবর্ষের টিকেট ইত্যাদি কেনা ও অন্যান্য ব্যবস্থা হলে আমরা দেশে ফিরব ঠিক হল। টিকিট পাওয়া গেল ২২শে ফেব্রুয়ারি সকালবেলায়। তার আগে পর্যন্ত সোভিয়েত লেখক সংঘের ব্যবস্থামতো আমরা মস্কোর দর্শনীয় স্থান কিছুকিছু দেখার সুযোগ পেলাম। আমার তো মস্কো প্রায় অদেখাই ছিল এতাবৎ। মানবতার তীর্থ-স্বরূপ লেনিনের সমাধিস্থল, ক্রেমলিন প্রাসাদের ম্যুজিয়ম, সেখানকার লেনিন-বাসকক্ষ ও কয়েকটি সুন্দর সুরক্ষিত চার্চ যা আগে দেখিনি—এবার দেখার সুযোগ ঘটল। আর সে সুযোগ ঘটল সোভিয়েত লেখক সংঘের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনায়। প্রায় বেশির ভাগ সঙ্গে থাকতেন শ্রীমতী মরিয়ম (মীরা)—তিনি লেখক সংঘের সদস্যা, তথা কর্মীও।

১৮ই ফেব্রুয়ারি বিকাল বেলায় আমরা বসে আছি—লেখক সংঘের সংলগ্ন 'লবি' বা প্রবেশ হল। কয়জনা পূর্বপরিচিতের দেখা পাওয়া গেল। কয়েক কাপ কফি খাবার পর উঠব উঠব করছি। এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘরে তুমুল করতালির শব্দ শুনে উৎকর্ণ হলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেদিক থেকে দ্বার খুলে একটি মাঝারি আকারের ভদ্রলোক স্মিত মুখে বুদ্ধির উজ্জ্বলতা পরিস্ফুট করে এই কক্ষে প্রবেশ করলেন। হাতে তাঁর তখনও কিছু কাগজপত্র। সম্ভবত পাশের ঘরে কোনও অধিবেশন শেষ করে তিনি ফিরে চলেছেন। আমাদের সোফার পাশ দিয়েই তিনি চলে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে একটু যেন থমকে দাঁড়ালেন। আমি জানতাম আমার শাড়ি ওদেশে তখনও খুব সুলভ-দর্শন নয়—অন্তত তা দৃষ্টিআকর্ষণীয়। লোক-সাধারণ যেভাবে আমার শাড়ি পর্যবেক্ষণ করতেন তা কৌতুকাবহ। আর, এহ্‌রেনবুর্গের মতো লোকের চক্ষে আমার ভারতীয় পরিচয় নিশ্চয় শাড়ি থেকে সূচিত হয়ে থাকবে। তিনি হাসিমুখে ঈষৎ নুয়ে অভিবাদন করতেই আমরাও প্রত্যভিবাদনের জন্য উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে হাসিমুখে সম্ভাষণ জানালাম। তিনি একটু এগিয়ে আবার ফিরলেন। ইঙ্গিত করে

মরিয়মকে ডাকলেন। মরিয়ম তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে আমাদের কাছে জানতে চাইলেন আমাদের হাতে কিছু সময় আছে কিনা, এহ্‌রেনবুর্গ আমাদের সঙ্গে পরিচয় করতে চান। আমরা সানন্দে সম্মতি জানালে মরিয়ম জানাতে চাইলেন ২০ তারিখের সকালবেলা এহ্‌রেনবুর্গ তাঁর গৃহে আমাদের প্রাতরাশের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। আমাদের সম্মতির জন্য তিনি অপেক্ষমান দেখে আমরা কৃতজ্ঞতা সহ সম্মতি জানালাম। তিনিও মরিয়মের কাছে কিছু নির্দেশ দিয়ে 'শুভ সায়াহ্ন' (দোব্রে ভেচের) জানিয়ে চলে গেলেন। ফেরার পথে মরিয়মের সঙ্গে আমাদের এই বর্ষীয়ান সুদর্শন সাহিত্যিক সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু আলোচনা হল। যা জানতাম তার ওপরে নতুন কিছু জানা হল। মরিয়মও বললেন—তিনি শুধু ফরাসী ভাষাভিজ্ঞ নন, ফরাসী শিষ্টতা ও আলাপন-রীতিতেই তিনি অভ্যস্ত। তাঁর সমগ্র আকৃতির মধ্যে আমরা মার্জিতরুচি শ্রী এবং পশ্চিম ইয়োরোপের একটি বিশিষ্ট বৈদগ্ধ্য বরাবরই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। জানতাম তিনি চারুকলার একজন বিদগ্ধ বিশেষজ্ঞ। মরিয়ম একবার ইন্দোনেশিয়া থেকে ফেরার সময় একটি যবদ্বীপীয় মূর্তি প্রায় কোলে করে সযত্নে ধরে আনেন এহ্‌রেনবুর্গকে দেবার জন্য। আমরা প্রশ্ন করলাম সেটা পেয়ে এহ্‌রেনবুর্গ খুশী হয়েছিলেন কিনা। পরিহাস-বিদগ্ধা মরিয়ম হেসে জানালেন "আমি কোথায় সমস্ত রাস্তাটা কোলের ছেলের মতো ধরে আনলাম মূর্তিটিকে—তা, তিনি বল্লেন মূর্তিটা নাকি অত্যন্ত কুৎসিত।"

এসব কথা শুনে আমাদের ভাবনা—কাল তবে সাক্ষাৎ করতে যাবার সময় কি নিয়ে যাব এহ্‌রেনবুর্গের জন্য? আমরা তখন দেশাভিমুখী। অর্থসাধ্য প্রায় সংকুচিত। ভারতীয় জিনিসপত্র, উপহার, ব্যবহারের বস্তু ভালোমন্দ মিলিয়ে যা কিছু ছিল তা বিদেশের ও স্বদেশের বন্ধুদের দিয়ে-থুয়ে নিঃশেষ করেছি। অথচ বিদেশের একটি প্রথা আমাদের বড় ভালো লাগত। যখন কারুর বাড়ি কেউ প্রথম যান তখনই হাতে করে কিছু নিয়ে যান উপহার। এই সম্মানিত রুচিমান মনীষীর কাছে রিক্ত হাতে আতিথ্য নিতে যেতে মনও চাইল না। ভেবেচিন্তে অবশেষে মনে হল হয়তো এহ্‌রেনবুর্গ পারীর কিছু জিনিস পেলে খুশী হতে পারেন। দীর্ঘকাল তো তাঁর সেখানেই কেটেছে। আমরা লণ্ডন-পারীর বিমান পথে (skyways) বিমানেই বেশ কিছু সিগারেট কিনেছিলাম। এই পথটিতে ফরাসী সুগন্ধ, ধূমপানের দ্রব্য ও পানীয়ের উপর শুল্ক লাগে না। সুতরাং লোকে যাওয়া-আসার পথে যে পরিমাণ ঐ তিনটি,

ফলের গঠনের মুখ আর বুদ্ধিব্যঞ্জক প্রতিভাদীপ্ত ললাট। সিগারেট পেয়ে ভারী খুশী হয়ে তিনি তা আমাদের সামনেই ধরালেন।

আমার সঙ্গেও সামান্য কথাবার্তা হল। তার বেশির ভাগই রুশিয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে। আমার কেমন লাগল সে-দেশের ছাত্রছাত্রীদের, এ-সম্বন্ধেও কথা হল। তাঁর কাছেই শুনলাম তিনি যখন প্রথমবার ভারতে আসেন, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবার আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পর পর দুইবার শান্তি পরিষদের সম্মেলনে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়—একথাও তাঁর স্মরণে ছিল (১৯৫৮, ১৯৬২)। দেখতে দেখতে দেড়ঘণ্টার মতো একটি জমাট আড্ডা ঘনীভূত হয়ে উঠল আর শিল্পিজনোচিত ভাবেই তার সমাপ্তি ঘটল।

তখন এহ্‌রেনবুর্গ জানালেন এবার (বেলা সাড়ে এগারোটা) তাঁরা তাঁদের দাচা বা বাগানবাড়িতে যাবেন। পরিচারিকা এসে জানাল সব প্রস্তুত। আমরা উঠে দাঁড়িয়ে এহ্‌রেনবুর্গ দম্পতির কাছে বিদায় গ্রহণ করে এগিয়ে এলাম। তাঁরাও লিফট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। দরজা খোলাই রইল। আমরা নামতে নামতেই দেখলাম, এহ্‌রেনবুর্গ-পত্নী সযত্ন ও সতর্ক হাতে স্বামীকে তাঁর ভারী শীতের কোটটি পরতে সাহায্য করছেন। পরিশীলিত আলাপনের সুস্থ সুখস্মৃতি নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরলাম। শ্রীমতী মরিয়মকে কৃতজ্ঞতা সহ বিদায়-সম্ভাষণ জানালাম। অমন বুদ্ধিমতী ও অনুবাদ-কুশলা মুখপাত্রী না হলে সেদিনের সভা জমত না।

এক-একটি ব্যক্তিত্ব সহজে ভোলা যায় না। এহ্‌রেনবুর্গও সহজে বিস্মৃত হবার মতো নন। সামান্য পরিচয়ও যে অসামান্য হয়ে স্মৃতিতে জেগে থাকতে পারে, তা সত্য। এহ্‌রেনবুর্গ শুধু রুশ সাহিত্যের সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক বলেই নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জর্মননীতির তথা য়িহুদী-বিদ্বেষবিরোধী যোদ্ধা বলেও নয়; এহ্‌রেনবুর্গের মর্যাদাময় ব্যক্তিত্ব দৃঢ়তায় ও মানব মহিমায় বারবার আমাদের স্মরণে উদিত হয়। যখনই তাঁকে মনে পড়েছে, মনে হয়েছে যে বিশ্বের কল্যাণ-কামী বুদ্ধিজীবীরা যেন একগোত্রীয়—যেন তাঁরা দেশকালাতীত বন্ধনে বাঁধা। আরো একটি কথা মনে হয়েছে। বর্ষীয়ান এহ্‌রেনবুর্গ খুব সচেতন (alert) এবং বাস্তবানুগ (Realist)। শেষোক্ত গুণগুলি লেখক সম্প্রদায়ে সব সময়ে পাওয়া যায় না।

দেশে ফেরার পর তাঁকে কিন্তু ভারতীয় জিনিস পাঠাতে মন চাইত। মনটা

খুঁৎ খুঁৎ করত তাঁকে কিছু ভারতীয় জিনিস আসার সময় দিতে পারিনি বলে। ১৯৬৫ সালে এ সুযোগ ঘটল। আমাদের শ্রদ্ধেয় আচার্য অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রুশিয়া তথা উক্রাইনায় আমন্ত্রিত হয়ে ১৯৬৫ সালে সেখানে গেলেন। উক্রাইনীয় কবি শেভচেংকো মহাশয়ের সার্ধ শত বার্ষিকী স্মৃতি উদযাপনায় তিনি ভারতের পক্ষ থেকে যোগ দিতে যান। তখন তাঁর হাতে ওখানকার বন্ধুবান্ধবদের জন্য ছোটখাটো কিছু উপহার পাঠানোর সুযোগ ঘটেছিল। আমাদের পাঠানো একটি ছোট চন্দন কাঠের বাক্স এহ্‌রেনবুর্গের হাতে পৌঁছেছিল; তিনি তা পেয়ে খুশী হয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন সে চিঠিও আমরা পেয়েছিলাম। সুন্দর হস্তাক্ষরে পরিচ্ছন্ন সুবিন্যস্ত চিন্তায় মার্জিত ফরাসী ভাষায় লেখা পত্র। ইংরাজী ১৯৬৬ সালেও তাঁকে যথারীতি অভিনন্দন পাঠাই। ১৯৬৭ সালে আর সে সুযোগ আসেনি। তৎপূর্বেই এই মনীষীর মৃত্যু ঘটেছে।

রুশ সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রে এহ্‌রেনবুর্গের তিরোভাব নিশ্চয়ই দুষ্পূরণীয় ক্ষতি। আমি ভারতের একটি সামান্য নারীমাত্র। আমার চোখেও সেই মানুষটির পরিচয় ধরা পড়েছিল একটি পরিণত মেধা, রুচিবিদগ্ধ মনীষীর বৈশিষ্ট্যে। আমার দেশের লোকের পক্ষে তাঁকে স্মরণে রাখা কর্তব্য, একথা স্মরণ করেই এ-লেখা লিখতে বসেছি। এইই আমার স্মৃতিতর্পণ।

এই সঙ্গে আরও একটি কথা মনে আসছে। সেদিনকার সেই রৌদ্রোজ্জ্বল শীতের সকালে এহ্‌রেনবুর্গের গৃহে সুমিত সুস্মিত আতিথ্যে পরিতুষ্টিসাধন করেছিলেন দুই বিদেশীকে এক স্নিগ্ধশ্রী মর্যাদাময়ী নারী। নারী প্রকৃতিও প্রায় সর্বত্রই এক। সেদিনের সেই সকালবেলা শ্রীমতী এহ্‌রেনবুর্গের সঙ্গে কথাবার্তা হতে পারে খুব কম। দাচায় যাবার জন্য তাঁরা তৈরি হচ্ছিলেন। শান্ত অভ্যস্ত হাতে স্বামীর হাতের কাছে জিনিসগুলি তিনি এগিয়ে দিচ্ছিলেন। কথাগুলি স্থিরভাবে শুনছিলেন। মুখের ভাবে মনে হচ্ছিল যে সেসব কথা ও জগতের সঙ্গে তিনিও সুপরিচিত। মূলকথা, খুব সহজ গৃহজীবনের একটি অলক্ষ্য প্রভাব সেই পরিবেশকে সুষমামণ্ডিত করেছিল। সেই পরিপূর্ণতায় তাঁরা দুজনাই বিধৃত ছিলেন। সেই বিদেশিনী নারীর কথাই আজ বারবার মনে আসছে। তাঁর গৃহের সেই পরিপূর্ণ রসের মধ্যে যে ক্ষয় এলো—তার শূন্যতা কি তাঁর জীবনে কখনও শেষ হবে?

২৩।৯।৬৮

ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গ ঃ শেষ আলাপ

গোপাল হালদার

১

লিফট থেকে পা বাড়াতেই স্বাগত করলেন কর্মব্যস্ত গৃহকর্ত্রী, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাঁরা 'দাচা'য় রওনা হচ্ছেন, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র তার মুখর সাক্ষী। আমাদের নমস্কার ও সম্ভাষণ তাই সকৃতজ্ঞ হলেও সসংকোচ। বেশ বিলম্ব হয়েছে ও অপেক্ষিত সময়ও বিগতপ্রায়, যদিও সে অপরাধ আমাদের নয়। আমাদের মুখপাত্রী মীরা সাল্‌গানিক অবশ্য বুদ্ধি ও বিনয় সহযোগে তাও জানিয়ে দিচ্ছিলেন, বুঝলাম। তার আগেই ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গও স্বয়ং এসে গিয়েছেন। অভ্যর্থনা জানালেন—বিলম্বের অভিযোগও চোখে, মুখে যদিও স্মিত হাসি ও সহজাত পরিহাস। বার্ধক্য ইলিয়ার দেহকে অবনত করছে—কিন্তু বিদগ্ধ মনকে স্পর্শ করেনি, চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকেও নয়, কথার শাণিত ধারকেও নয়। অতিথিদের বিলম্বিত আগমনে মনও খুশি হবার কথা নয়। তবু দৃষ্টি যে তির্যক হয়নি, আর সম্ভাষণ হয়নি বঙ্কিম, তাতেই আশ্বস্ত বোধ করলাম। অবশ্য নিমন্ত্রণ নিজেই তিনি করেছিলেন, গতকাল (১৮।২।৬৪) লেখক সঙ্ঘের ভবনে। ভারতীয় লেখকদের সঙ্গে আলাপে তাঁর আগ্রহ যথেষ্ট জানতাম। আমাদের দোভাষিণী মীরা তাঁর স্নেহের পাত্রী—মীরার বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা, নানা ভাষার অধিকার প্রভৃতি গুণ ভারতীয়রাও অনেকেই জানেন। উর্দু ও হিন্দীতে তিনি পারদর্শিনী; আর ভারত এতবার দেখেছেন এবং এত ভারতীয়কে জেনেছেন যে, সম্ভবত আমরা অনেক ভারতীয়ও তাঁর কাছে হার মানবো। আমার স্ত্রী অরুণার তো তিনি সুহৃদ-স্থানীয়া। দেখলাম ইলিয়ারও মীরা আত্মীয়া-স্থানীয়া। কিন্তু মীরা সাল্‌গানিক-এর কথা এখন নয়; যদিও এখনি বলতে হবে, মীরার মতো বুদ্ধিমতী ও ইলিয়ার স্নেহের পাত্রী আমাদের মুখপাত্রী না হলে ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গ এর মুখে সম্বর্ধনা সম্ভবত তখন অম্ল-মধুর হতো—তিনি যে তখন দাচায় যাবার মুখে।

বসবার ঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে এহ্‌রেনবুর্গ বললেন ফরাসীতে—"চারদিকের প্রাচীরেই বহু চিত্র—ত্যাখো, সব কিন্তু এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট।" তারপর সরল আত্মীয়তায় বললেন—"একখানা যামিনী রায়ও আছে।"

বছরখানেক আগে খ্রুশ্চভ ও সোভিয়েত রাজনৈতিক নেতারা 'এ্যাবস্ট্রাকট আর্ট'-এর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন, পার্টির ফরমান জারি হয়েছে। স্তালিনের মৃত্যুর পরে সোভিয়েত দেশে হাওয়া বদলেছিল—গোঁড়ামি ছাড়তে হবে। এহ্‌রেনবুর্গ নিজেও উৎসাহ বোধ করেন—বরফ গলছে, বসন্ত আসবে। নতুন কবিদের সাহস বাড়ে, শিল্পী ও চিত্রকররাও ভাবলেন—'আমরা চলি সমুখ পানে।' কিন্তু আপত্তি হলো, তর্ক উঠল। নতুন চিত্রকরদের একটা চিত্র প্রদর্শনীতে খ্রুশ্চভ গিয়ে তুড়ে তাঁদের গাল দিলেন। যথা নিয়মে হলো লেখক-মণ্ডলীতে ও শিল্পিমণ্ডলীতে বিচারসভা। তাঁদের সিদ্ধান্ত হলো—এসব নতুন কবিরা ও বিমূর্ত শিল্পীরা সমাজতন্ত্রী শিল্পের আদর্শচ্যুত। সেসব তর্কে-আলোচনায় এহ্‌রেনবুর্গ ছিলেন নতুন শিল্প স্রষ্টাদের দলে ; তাঁদের মুরুব্বি। সভায় আলোচনায় তিনি নিজের মত ঘোষণা করেছেন। এবং শেষ অবধিও তা ছাড়েননি। শেষ আলোচনা-সভায় যখন ইভ্‌তেশেংকো প্রভৃতি যুবক কবিদের ও এ্যাবস্ট্রাকট আর্টের শিল্পীদের বিরুদ্ধে মণ্ডলীর রায় ঘোষিত হয় তখন সেখান থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন—কর্তাদের সঙ্গে তিনি একমত নন। উপস্থিত উৎসুক শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তরে মন্তব্য করেন, "এ্যাবস্ট্রাকট আর্ট এখানেও গ্রাহ্য হবে—তবে আমি তখন বেঁচে থাকব না।" এসব জানা পুরনো খবর। প্রথম দু-চার মাস তখন রুশ দেশে ফরমান মানার উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, দেখেছি। তারপরে তাও একটু থিতিয়ে এসেছে এখন। ফরমান অবশ্য জাহিরই আছে। ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গ সেই কর্তাদেরই শিল্প-নীতির কথা স্মরণ করিয়ে করলেন এই ব্যাজোক্তি—"সব এ্যাবস্ট্রাকট আর্ট"—আর আমাদের উদ্দেশে জানালেন—"একখানা যামিনী রায়ও আছে এর মধ্যে।"

ঘরের দেয়াল জুড়ে ছবি। অনেক ছবি। শুনেছি, এহ্‌রেনবুর্গের অনেক চিত্রই থাকে 'দাচা'য়, পল্লীবাসে। পৃথিবীর নানা দেশের শিল্পোপকরণে তাঁর আগ্রহ, আর নানা দেশের ফুল, লতা-পাতায়ও। মস্কোর আস্তানায় অত স্থান কোথায় ? তবু তাঁর ফ্লাট ছোট নয়—শয়নকক্ষাদি ছাড়াও সম্ভবত ঘর আছে—টাইপ-রাইটারের শব্দ শুনছিলাম বরাবর—অন্তত আছে এই বৈঠকখানা, মস্কোতে যা প্রায় কারো থাকে না। বাড়িটি পুরনো হলেও, বৈঠকখানা বড় ; প্রশস্ত যতটা তার চেয়ে দীর্ঘ বেশি। আর যতটা বড় তার থেকেও বেশি তাতে নানা সযত্ন-সংগৃহীত জিনিসপত্র, সোফা-সেটি প্রভৃতি, যাতে আড্ডা জমতে পারে, শীতের দেশে ; জিনিসপত্রের ঘেঁষাঘেঁষি তাতে মনে লাগে না। শিল্পোপকরণই বেশি—ছোট-

খাটো কিছু ভাস্কর্য, আর প্রাচীর জুড়ে ছবির পরে ছবি। প্রথম যুদ্ধের পূর্বে ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গ ছিলেন প্যারিসে, জার-সাম্রাজ্য থেকে নির্বাসিত পলাতক। সাংবাদিকতায় দিন গুজরানো ছিল দুর্ভার, প্রায় অসম্ভব, প্যারিসের শিল্পী-এলেকার কাফে রেস্তোঁরায় অভুক্ত, অভাব পীড়িত, কফিজীবী অপরিচিত বিদেশী বুদ্ধিজীবীদের একজন, শিল্পিগোষ্ঠীর বন্ধু।—পিকাসো, মেন্দেলস্টার্ন প্রভৃতি সেসব বন্ধুরাই পরে ইউরোপের শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন—এ্যাবস্ট্রাকট আর্ট কেন, আধুনিক কালের সকল শিল্পকলার কেউ বা তাঁরা মৃত অগ্রদূত, কেউ এখনো (পিকাসোর মতো) জীবিত শিল্পগুরু। এসব সকলেই পড়েছেন এহ্‌রেনবুর্গের পরম উপাদেয় স্মৃতিকথায়। আমিও পড়েছি। কিন্তু সাধ্য কি তখন তা মনে করি, তাঁদের শিল্পকর্ম খুঁটিয়ে দেখি। দেয়ালজোড়া ছবি আর ছবি—অনেকই যা 'বিমূর্ত'। কিন্তু সব তা নয়—অন্তত সবই রূপময়, আর আমার চোখে অপরূপ। রূপের পশরা সামনে—কিন্তু সামনে ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গও—এ্যাবস্ট্রাকট আর্ট নয়, একটা জীবন্ত মানুষ। রূপবান না হোন, রূপ-রসিক, আর বাক্য রসিক—ফরাসী বৈদগ্ধ্যে ও ফরাসী ব্যঙ্গোক্তিতে প্রায় 'রুশিয়ার ফরাসী সন্তান'। তাঁর সঙ্গে কথা বলতেই তো আসা; তাঁকে না দেখে তাঁর ঘরের ছবি দেখা সুবুদ্ধির কাজও নয়।

২.

"কী পানীয় তোমার অভিপ্রেত?"—প্রাঞ্জল ইংরাজিতে ফরাসী প্রশ্নটি অনুবাদ করে দিলেন মীরা—দু-ভাষাতেই তাঁর অধিকার স্বচ্ছন্দ। পানীয়ের প্রশ্নে বরাবরই বিব্রত বোধ করি। আমার স্ত্রীর মদের নামেই যেমন ঘৃণা তেমন ভয়। "দু-চোখে দেখতে পারি না।"—অত কুসংস্কার আমার নেই। কিন্তু মদ্যে আমার আকর্ষণ নেই। রুশ ভোদকা আমার বিবেচনায় তরলানল মাত্র। আর সুপ্রচলিত কনিয়াকও আমার কাছে বিস্বাদ। ফরাসী শ্যাম্পেন খানিকটা উপাদেয়। খুব উঁচু মানের জর্জীয় বা উক্রেনীয় বা আর্মানী সুরাও তদ্রূপ। কিন্তু শ্যাম্পেন জাতীয় ওয়াইন পরম সুস্বাদু, বেশ উপাদেয়, পেলে আমি তা আস্বাদন করি। এক্ষেত্রে তার অভাব হতো না—এহ্‌রেনবুর্গ ফরাসী বৈদগ্ধ্যে ও আতিথেয়তাতেই বেশি অভ্যস্ত। তবু অন্যত্র যেমন তেমনি এ-ক্ষেত্রেও মার্জনা চাইলাম—"আপনি তো আমাদের ভারতীয়দের জানেন, বিশেষ করে বাঙালিদের। আমরা কড়া

পানীয়ের পক্ষপাতী নই। চা, কফি, আর গ্রীষ্মে সরবৎ—এই আমাদের নিয়ম।" কফিরই ব্যবস্থা হলো—আমার স্ত্রীর কথায়—উম্যান ডিসপোসেজ। সঙ্গে কেক প্রভৃতি। চমৎকার পেয়ালা-প্লেট। পুরনো দিনের পর্সিলেন, মনে হলো গায়ে প্রাচ্য ধরনের কাজ। কিন্তু ততক্ষণে কথা এগিয়ে চলেছে। এহ্‌রেনবুর্গই সূত্রপাত করলেন—"রুশরা পান করে না—সুরাপান তাদের মধ্যে নেই।" চমকাবার মতো কথা—রুশরা মদ খায় না! এহ্‌রেনবুর্গ বলে চললেন—"পানীয় উপভোগের মতো কালচার আমাদের নেই। মদ গিলে আমরা মত্ত হতে চাই—আপনাকে ভুলতে চাই। আমাদের শিক্ষিত, কালচর্‌ড্‌দেরও এই দশা।"

অরুণা যোগ করলেন, "হাঁ, উনি বলছিলেন—রুশ দেশের লেখকরা অনেকেই নাকি অত্যন্ত মদ্যাসক্ত ছিলেন, নিজেদের শক্তিও তাতে কেউ কেউ বিনষ্ট করেছেন, আর নিজেদেরও নিঃশেষ করেছেন।"

ভাবলাম, লেরমনতভ থেকে ব্লক—নাম করতে হবে। কিন্তু প্রয়োজন হলো না। এহ্‌রেনবুর্গই বলে চললেন—"তার কারণ বুঝে দেখেছেন? রুশ সমাজটা কেমন ছিল? স্পর্শকাতর মানুষ কেন, একটু বিবেকবান ও ভাবুক মানুষেরই পক্ষে সে সমাজ অসহ্য ছিল। অবস্থাটা পরিবর্তন করতে পারছি না, অবস্থাটা তাই যে করে হোক ভুলতে হবে। আর অবস্থা ভুলতে হলে, যে কোনো উপায়ে হোক নিজেকে ভুলতে হবে। যত কড়া হয় মদ ততই ভালো। রুশ সমাজে মদ্যপানের অর্থ—মন-প্রাণের জ্বালা তাতে ডুবিয়ে দেওয়া যায়। সভ্য সমাজের সুরাপান এরূপ নয়। তারা পানীয় উপভোগ করতে চায়। ভালো সুরাতে চিত্ত মন সজীব সরল হয়, আলাপ-আলোচনা-গোষ্ঠীসুখ জমে ওঠে। মন, রুচি, রসবোধ, চেতনায় উজ্জ্বলতা আনে। রুশিয়ার সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থায় এই সুস্থ আনন্দ ও সামাজিকতা দুর্লভ ছিল। হাঁ, দুর্লভ এখনো—এখনো আমাদের লেখকরা, এমনকি উৎকৃষ্ট বুদ্ধিজীবীরাও, সত্যই সুরাপানে সজীব সরল হতে চান না—মদ গিলে আপনাদের ভুলতে চান।"

আমার ধারণা পুরাতনের জের। জারের আমল তো নেই, এখন সমাজতন্ত্র। সংবেদনশীল মানুষের আজ তাই মন-বুদ্ধি মুক্ত। আপনাকে ভুলে থাকবার তাড়না নেই। হাঁ, পুরাতনের ও-রকম জের টিকে থাকে। তবু বিশেষ করে মত বদলানো সহজ, কিন্তু আহারে পানে মানুষের অভ্যাস বদলাতে দেরি ঘটেই। সমাজতন্ত্র হলেই তো আর সঙ্গে সঙ্গে সে সকল অভ্যাস বদলে যায় না।

এহ্‌রেনবুর্গ কিন্তু সেদিক দিয়ে গেলেন না—"অভ্যাস টিঁকে আছে, শাসন বদলালেও এ-বিষয়ে অবস্থা তত বদলায়নি। একচ্ছত্র ক্ষমতা মন-বুদ্ধির চারদিকে গণ্ডী টেনে রাখতে চায়। যতই বুদ্ধি চিন্তা জাগ্রত হচ্ছে ততই মানুষ অনুভব করছে এই গণ্ডীর দৌরাত্ম্য, খর্বতা, পীড়ন; আর চেনা অভ্যস্ত পথেই চাইছে আবার গণ্ডীর বেড়া থেকে নিষ্কৃতি—মদের স্রোতে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে।

"—আলেকসন্দর ফাদেয়েভ ছিল আমার বন্ধু। ভালো উপন্যাস লিখেছিল গোড়ায়—'পরাজয়', '১৯ জন'। তারপর আর তেমন লিখতে পারেনি। খুব নাম ছিল, লেখারও বহুৎ ইনাম। যুদ্ধশেষে প্যারিসের শান্তি কংগ্রেসে আমরা এক সঙ্গে যাই। প্যারিসের বন্ধুরা জানাচ্ছে বন্ধুভাবে সোভিয়েতের সম্বন্ধে তাদের নালিশ—লেখকদের ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাব, লেখকদের মামুলিপনা ইত্যাদি। ফাদেয়েভ চটে লাল। দাঁড়িয়ে তাদের আচ্ছা আক্রমণ করল—সমাজতন্ত্রের মহান আদর্শের ও সংস্কৃতির তা জয়গান—ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সংস্কৃতি তার বুঝবে কি? আমরা প্যারিস ছাড়লাম। হোটেল থেকে বোতল নিয়ে বসেছিল ফাদেয়েভ, প্লেনেও সারাক্ষণ তাই চলল। মস্কোতে যখন নামলাম তখন ফাদেয়েভকে নামাতে হলো স্ট্রেচারে করে বেহুঁশ, দাঁড়াবার মতো অবস্থা নেই।

"—দু-জনায় বরাবরের বন্ধুত্ব আমাদের। বহু আলাপ-আলোচনা দু-জনাতে রেস্তোঁরায়; আর তারপরে বাইরে পথে এসেও রুশ কবিতার কথাই চলছে—ফাদেয়েভ আধ ঘণ্টা ধরে একটার পর একটা আবৃত্তি করচে, পাস্তেরনাকের কবিতা-আবৃত্তিতে মশগুল। দু-দিন পরেই যেই বসল লেখক সঙ্ঘের সভা—ফাদেয়েভ তখন সঙ্ঘের কর্তা—মামুলি কটূক্তি ও কড়া ভাষায় ভৎ'সনা করে চললে পাস্তেরনাক ও নতুন কবিদের—"তাদের কবিতায় মাথামুণ্ডু নেই।" সম্ভবত সভার পরেই আবার ভোদকায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে ফাদেয়েভ।

"—হ্যাঁ, হাওয়া বদলেছে—কিন্তু একেবারে বদলায়নি। আর, সোভিয়েত কর্ণধাররাও কান পাকড়ে থাকতে অভ্যস্ত। কর্তাভজামি আর মামুলিপনাতেই অভ্যস্ত। রুশ সাহিত্যিকরা, শিল্পীরা তাই পিপায় পিপায় মদ না গিললে স্বস্তি পাবে কিসে?"

আলেকসন্দর ফাদেয়েভ মারা গিয়েছেন, সম্ভবত ১৯৫৬তে। পড়েছিলাম তিনি আত্মহত্যা করেছেন, হয়তো শারীরিক অসুস্থ ছিলেন বলে। কিন্তু

সুস্থই বা থাকবেন কি করে? রুশদের কাছেই শুনেছিলাম—মৃত্যুর কারণ অত্যধিক মদ্যপান। বাইরে থেকে যতটা বুঝি, এ-রোগ রুশ লেখকদের ও রুশ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এখনো কম নয়। তবে ওদেশে সুরাপান তো একটা সমাজসম্মত সাধারণ নিয়ম, আতিথেয়তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রাব্‌নিক বা উৎসব তো অধিকাংশের পক্ষে সুরাসাগরে সাঁতার কাটা। ক্রুশ্চেভের আমলেই বরং দেখেছি মাতলামির ও মদ্যাসক্তির বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে। মিলিশিয়া বা পুলিশের ভয়ও তার সঙ্গে আছে। পথে-ঘাটে মাতালের সংখ্যা আগের থেকে তাই কমেছে। সুরাপান অবৈধ বা নিষিদ্ধ নয়—পাশ্চাত্য দেশে তা অভাবনীয়। সম্ভব তাতে মাত্রা টানার চেষ্টা। অবশ্য তাতে রুশ দেশে মাতালদের কোনো অসুবিধা হয় না। রুশ জনসমাজেও মাতলামিতে তত ঘৃণাবোধ নেই। দেখা যায় একটু লজ্জা ও কৌতুক বোধ। মাতলামিতে ঘৃণাবোধ দেখা দিচ্ছে বরং এহ্‌রেনবুর্গের মতো রুচিবান লোকেদের মধ্যে—ওঁরা সুরার রসিক, জীবনের রসিক। সামাজিক সরস বৈদগ্ধ্যের সমজদার। কিন্তু সুরাপান নীতিবিরুদ্ধ বা গর্হিত, এমন কথা শুনলে ওঁরাও বোধহয় বিরক্ত হবেন বেশি। আর ব্যঙ্গবিদ্রূপে দক্ষ ইলিয়ার হাতে সেই মদ্যপান নিবারণী সভার সদস্যদের নিশ্চয়ই লাঞ্ছনার একশেষ হবে।

কথা হচ্ছিল রুশ সমাজ, সোভিয়েত সমাজ ও শিল্প-সাহিত্য নিয়ে। ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গ সোভিয়েত আদর্শের ও সমাজতন্ত্রের ভক্ত, সোভিয়েত সংস্কৃতিরও সমর্থক, শিল্পোদ্যোগে সোভিয়েত সাফল্যে গর্বিত। যন্ত্রশিল্প সোভিয়েত সংস্কৃতির বনিয়াদ। কিন্তু গৃহ তো শুধু বনিয়াদ নয়। সংস্কৃতির বনিয়াদের উপরে গড়া চাই তেমনি মন বুদ্ধিরও প্রশস্ত আয়তন—উন্নত মানসিক চর্চা, ন্যায়নীতির ব্যবস্থা, বিচার, বিবেক, চৈতন্যের মুক্তি, সাহিত্য ললিতকলায় মুক্তবুদ্ধির ও সৃষ্টিকল্পনার পরীক্ষা নিরীক্ষা নবায়মানতা। সোভিয়েত নেতাদের এসব বিষয়ে যে-দৃষ্টিভঙ্গি, তা তিনি কোনো সময়েই পুরাপুরি গ্রাহ্য করেননি। পূর্বে চুপ করেই তবু থাকতেন। ক্রুশ্চেভের আমল থেকে এই কথাটা মুখেও বলেন—বাঁধা বুলিতে ও মামুলিপনায় চলতে তিনি এখন নারাজ। তাই মুক্তমনের তরুণদের তিনি সমর্থক, উৎসাহদাতা। বলা বাহুল্য তাঁর আজকের আলোচনার মূল লক্ষ্যটাও তাই। সোভিয়েত কর্তাদের কড়াকড়ি তিনি আলগা করতে চান। চান শিল্পীর স্বাধীনতা—অবশ্য শিল্পীর দায়িত্ব বাদ দিয়ে নয়।

রুশ সাহিত্য সম্বন্ধেই সরাসরি কথা শুরু হলো। মীরার মুখে তিনি পূর্ব-দিনই শুনেছিলেন—আমি বাঙলায় রুশ সাহিত্যের একটা রূপরেখা লিখেছি। এবার সেই কথাতেই তিনি এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় আরম্ভ করেছ, আর কোথায় এসে থেমেছ?"

তখন পর্যন্ত আমার যা পরিকল্পনা ছিল, তা জানালাম। আমার উদ্দেশ্য—বাঙলা ভাষার পাঠকদের রুশ সাহিত্যের সম্বন্ধে একটু আকৃষ্ট করা, তাই একটি সহজবোধ্য বিবরণে রুশ সাহিত্যের পরিচয়-দান। সেই প্রয়োজন মনে রেখে আমি প্রাচীন (৮০০—১২০০) ও মধ্যযুগের (১২০০—১৭৫০) রুশ সাহিত্যের কথা প্রায় লিখিনি—লোমোনোসভ (১৭১১—১৭৬৭) থেকে আরম্ভ করেছি, আর থেমেছি ১৯১৭তে অক্টোবর বিপ্লবে এসে। বলে নিই—এ-পরিকল্পনা পরে আমি একটু শুধরেছি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের রুশ সাহিত্যের কথা পরিমিত আকারে যোগ করেছি—পাঠক সেই ভার যতটা বহন করতে পারে, সেই পরিমাণে। আর ১৯১৭র পরেকার রুশ সাহিত্যের কথাও যোগ করেছি—যত স্বল্পে সম্ভব—ক্রুশ্চেভের বিদায়কাল অবধি। এহ্‌রেনবুর্গের এদিনকার আলোচনাও এদিকে আমাকে কতকটা প্ররোচিত করেছে, তা স্বীকার্য।

এহ্‌রেনবুর্গ বললেন, "তোমার যুগ-বিভাগটা কিরূপ বলো তো—১৯১৭তে থামলে কী হিসেবে?"

প্রশ্নের সুরেই বুঝলাম এবার সমালোচনা আসছে। তার অর্থ তীক্ষ্ণ মন্তব্য ও বুদ্ধির শাণিত আঘাতও। প্রস্তুত হলাম সহ্য করবার জন্য, আর যথাসম্ভব সহজভাবেই জানালাম আমার পর্ব-বিভাগ—এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এহ্‌রেনবুর্গ তবু ধরলেন, "১৯১৭তে থামলে কী যুক্তিতে?"

সহজ কথাতেই বললাম, বিপ্লবের যুক্তিতে। রুশ জীবন ১৯১৭র পরে নতুন হয়ে উঠেছে। আরো বড় যুক্তি। সোভিয়েত যুগের রুশ সাহিত্য এত বিশাল যে, আমার বই দ্বিগুণ আকারের হয়ে যেত, অথচ তবু তা বলা হয়ে উঠত না।

এহ্‌রেনবুর্গ বললেন, "কিন্তু ১৯১৭তে আসছ কেন? অক্টোবর বিপ্লবে তো রুশ সাহিত্যের পর্বশেষ বা পর্বারম্ভ হয়নি। যে-ধারাটা পূর্ব থেকে

চলছিল, সিম্বলিস্টদের পরে—তা দুঃসাহসিক পরীক্ষার ধারা। ১৯১৭র পরে তা আরো প্রবল হয়ে ওঠে। বলতে পারো, ১৯২৭।২৮ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। বিপ্লবের সঙ্গে সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বরং বাড়ে। সব পরীক্ষা সমান সার্থক নয়, কিন্তু তখন পরীক্ষার দুর্জয় সাহস ছিল, সৃষ্টির চেষ্টাও তাতে অনেকটা সার্থক হয়েছে। ভেবে দেখলে, তা রুশ সাহিত্যের একটা উল্লেখযোগ্য যুগ।

"সেই সময়ে দেখি নানা সাহিত্যতত্ত্ব ও আন্দোলন—ইমেজিজম, ফিউচারিজম, লেফ-এর দল, প্রোলেটকাল্ট দল, ফর্মালিস্ত, সেরাপিওন ভ্রাতৃমণ্ডলী, কন্‌স্ত্রাকতিভিস্ত গোষ্ঠী ইত্যাদি। লেখকও কত বেরিয়ে এল: এসেনিন, মায়কোভ্‌স্কির মতো কবি; পিল্‌নিয়াক, ওলেসা, ৎসেভায়েভা, তিখনভ্‌, পাস্তেরনাক প্রভৃতিও তখনই উঠেছেন। বাবেল, লিওনভ্‌, ফেদিন, কাতায়েভ্‌—এসব ঔপন্যাসিকরাও এসে গিয়েছেন।"

এহ্‌রেনবুর্গ অনেকের নাম করছিলেন। তাঁর নিজেরও লেখা আছে তখনকার—নিজের নাম করলেন না। আমার মতে 'জুলিও জুরেনিতোর দুঃসাহসিক কর্ম'-এ তাঁর বৈশিষ্ট্য ভালো বোঝা যায়। তিনি ভলতেয়রের ভক্ত। তাঁর 'স্মৃতিকথা'ও যুদ্ধকালীন নিবন্ধের মতোই বিশেষ আকর্ষণীয়। আমার বিবেচনায় পরেকার উপন্যাসই বরং ততটা রসোত্তীর্ণ নয়—তা যেন সাংবাদিকের উপন্যাস।

এহ্‌রেনবুর্গ বলছিলেন, এ-যুগটা 'নেপ্‌ যুগ' (১৯২৪-১৯২৭) ছাড়িয়ে ১৯৩২ অবধি চলেছিল। তখন প্ল্যানিং-এর প্রথম যুগ (১৯২৮ থেকে)—শিল্পে উৎসাহ দেখা দিয়েছে, সাহিত্যও তাতে উৎসাহী। কিন্তু উৎসাহ সাহিত্যে তখনো উপদ্রব হয়ে ওঠেনি, লেখা ভালোই চলছে। ঝোঁকটা বোঝা হতে লাগল ১৯৩৪-এ। ১৯৩৩-এ লেখক-সঙ্ঘের সম্মেলন—গোর্কি যাঁর সভাপতি—অবশ্য স্তালিন মন্ত্রণাগুরু। নতুন সাহিত্য-নীতি তাতে প্রণীত হলো—সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বা 'সোস্তালিস্ট রিয়ালিজম'। ১৯৩৪-এ শুরু হলো সেই নিয়মবাঁধা সাহিত্যের দিন—নীতি 'সোস্তালিস্ট রিয়ালিজম', পরিচালক লেখক-সঙ্ঘ। আরেক যুগ—স্তালিনীয় জবরদস্তি ও মামুলিপনা ক্রমেই চেপে বসতে লাগল। ওদিকে তো নানা জটিলতা, যুদ্ধের ছায়া আসছে ঘনিয়ে। যুদ্ধ পর্যন্ত তো ও-অবস্থাতেই যায়। যুদ্ধের পর্ব তোমরা জানো—সে তো আত্মরক্ষার পর্ব। আর, যুদ্ধের পরে ঝ্‌দানভ্‌-এর কুখ্যাত কড়া শাসন। শিল্প-সাহিত্যই প্রায় নাকচ করবার চেষ্টা।"

এহ্‌রেনবুর্গের যুগ-বিভাগে আমার সন্দেহ প্রকাশ করা তখন অসম্ভব ছিল, এখনো অসম্ভবই রয়েছে। কারণ, রুশ সাহিত্যের মূল বই পড়া-শোনা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য, অন্য কোনো ভিত্তিতে তার পর্ব-বিভাগ স্থির করা আরো দুঃসাধ্য। অনুবাদ ও যৎসামান্য পড়া-শোনা বুদ্ধি-বিবেচনার জোরে ও-বিষয় নিয়ে তর্ক করা চলে না—বিশেষত এহ্‌রেনবুর্গের মতো সাহিত্যবিদ্‌ লেখকের সঙ্গে। তবে সম্প্রতিকার রুশ বিশ্বকোষও দেখেছি—সোভিয়েত যুগের পর্ব-বিভাগ এখনো তাঁরা কালানুপাতেই করে থাকেন—যথা, বিশের পর্ব, ত্রিশের পর্ব, যুদ্ধের পর্ব, পঞ্চাশের পর্ব, এবং সমসাময়িককাল। ভাবধারা অনুপাতে বোধহয় এখনো সর্বস্বীকৃত পর্ব-বিভাগ গ্রাহ্য হয়নি। সেদিন আমি সবিনয়ে জানালাম আমার কথা—পাঠকের আগ্রহ, বই-এর উদ্দেশ্য, আকার-সীমা, ইত্যাদি। এহ্‌রেনবুর্গ তা বুঝলেন, কিন্তু যেভাবে আলাপ চলল, তাতে মনে হয় তিনি ১৯৩৩।৩৪-এর সময়ে একটা ছেদ টানতে চান। 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম'কে সঙ্ঘের সরকারী সাহিত্য-' নীতি হিসাবে স্বীকার করা ও প্রয়োগ করাকে একটা পর্বচ্ছেদ ও পর্বারম্ভ বলে চিহ্নিত করা তিনি বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করেন। স্পষ্ট করে কথা হলো না, কিন্তু বুঝতে পারলাম 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম' কথাটার উপর তাঁর তেমন ভক্তি নেই। অন্তত যেভাবে শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে, তাতে তাঁর সম্মতি নেই। সোভিয়েত দেশে কমিউনিস্ট-রাজনৈতিক নেতৃত্বে যে-ঝোঁক যখন প্রবল হয়েছে, লেখক-সঙ্ঘের মারফৎ সাহিত্যে তখন তারই দাপটও বিস্তৃত হতে চেয়েছে। যদিও লেখক-সঙ্ঘ সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ববান, তবু কার্যত রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলাই সঙ্ঘের অভ্যাস। নেতৃত্বের মেজাজ ও মর্জি বুঝেই 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম'-এর তাই ব্যাখ্যা হয়। তাতে আজ আখ-মাতোভা বাতিল হলেন, আবার কাল না হোক পরশু তাঁর অভিনন্দনও হয়। আমরাও এরকম লেখা ও লেখকের ভাগ্যনির্ণয়ের কথা প্রায়ই শুনি।

সাধারণভাবে রুশ সাহিত্যের প্রধান ঐতিহ্য হচ্ছে বাস্তবতার ঐতিহ্য—যথা, 'ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজম','সাইকোলজিক্যাল রিয়ালিজম', আর তারপরে 'রিভোল্যু-শনারি রিয়ালিজম' এবং এখন 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম'। অন্যসব 'রিয়ালিজমই' এখন গৌণ। আর 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম'-এর ছকে না পড়লে সে-লেখা সে-বই নিয়ে বড়ই দুশ্চিন্তা। কিন্তু সৃষ্টিধর্মী শিল্প বা সাহিত্য ছক মেনে চলতে চায় না।

তাই তেমন শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে মতবিরোধও বাড়ে। সে-বই পড়ে কেউ বলে তা 'সোস্থালিস্ট রিয়ালিজম'-এর নতুন দিগন্ত উন্মোচন; অন্য কেউ তাতেই দেখে দিগ্‌ভ্রান্তি। এমন মতবিরোধ প্রতিদিনই ঘটছে। তার ওপরে আছে রাজনৈতিক হাওয়া বদল—লেনিনের পরে স্তালিন, স্তালিনের ক্রমবর্ধিত মতান্ধতা ও সার্বভৌম দমননীতি, তারপরে ক্রুশ্চেভ্ (এখন ব্রেজনেভ্)। দেখা যায় সোভিয়েত লেখক-সঙ্ঘ একদিকে যেমন 'সোস্থালিস্ট রিয়ালিজম'-এর নামে সাধারণভাবে রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামিতে অভ্যস্ত, অন্যদিকে ঠিক রাজনৈতিক কারণেই ওই নীতির নামে লেখক সঙ্ঘ ডিগবাজি খেতে পটু। কাজেই বুদ্ধিমান ও বিবেকবান লেখকদের এ-সবে স্বস্তিবোধ করবার কথা নয়। তবে আগে তাঁদের ভয়ে ভয়ে চুপ করে থাকতে হতো; এখন কেউ কেউ বলেন, "লেখক-সঙ্ঘের ওসব মত আমি বিশ্বাস করি না।" আবার, কেউ কেউ এহ্‌রেনবুর্গের মতো আরো স্পষ্ট করেই জানান—এই গোটা পরিণতিতেই অনাস্থা। পরিস্থিতির উদ্ভব—সাহিত্য-ক্ষেত্রের হিসাবে—সেই ১৯৩৩।৩৪-এর লেখক সম্মেলন ও 'সোস্থালিস্ট রিয়ালিজম'-এর মন্ত্র নির্ধারণ থেকেই। আরম্ভ হয় শিল্পে সাহিত্যে স্তালিনিজম-এর যুগ—যা শেষ হয়েও শেষ হচ্ছে না।

স্তালিনিজম-এর মূল কোথায়—এটি আমার জিজ্ঞাস্য ছিল। এখনো আছে। সন্তুষ্ট হবার মতো উত্তর কোনো রুশ বুদ্ধিজীবীর থেকে পাইনি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যা তাঁরা বলেন তা জানি—কতকগুলি ঘটনা ও ঘটনার তাৎপর্য তাঁরা বুঝিয়ে বলেন—তাড়াতাড়ি এক দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের জবরদস্ত ব্যবস্থা থেকে ট্রটস্কি প্রভৃতিদের নানা বিচ্যুতি, বাইরে হিটলার ও সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত, ইত্যাদি। ও-সব কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু তা আমাদের সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করেনি। এহ্‌রেনবুর্গের সঙ্গে এখন যা কথা হতে লাগল, তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারিনি। তবে কিছু নতুন তথ্য ও নতুন ধরনের ব্যাখ্যা পেলাম যাতে পরিস্থিতির দু-একটি দিক একটু স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গ যা বললেন তার সারসংক্ষেপ এই: "দুর্ভাগ্যক্রমে লেনিন বড় শীঘ্র মারা গেলেন—ডিক্টেটরশিপ অব্ প্রোলেটারিয়েট কীভাবে গড়ে তুলতে হবে তার নীতি-পদ্ধতি তিনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত, প্রণীত ও বেশি বিকশিত

করে যেতে পারেননি। বেঁচে থাকলে হয়তো তা সত্যই তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বিকশিত করতে পারতেন। সাহস করে যে-লোক 'নেপ্' নীতি গ্রহণ করেছিলেন—কেতাবী কমিউনিস্টদের বাধাকে মানেননি—তিনিই সত্যকার ডিক্টেটরশিপ অব্ দি প্রোলেটারিয়েট-এর বা 'শ্রমিক আধিপত্য'র নীতি ও কার্যক্রম উদ্ভাবনা করতে পারতেন। পার্টি পরিচালনার ব্যাপারে ডিমোক্র্যাটিক সেণ্ট্রালিজম বা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিক শাসনের রীতি-পদ্ধতি প্রণয়ন করে (ভবিষ্যতের জন্য) সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিকেও তিনি দৃঢ়ভিত্তিক করে যেতে পারতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে লেনিন মারা গেলেন—এসব অসম্পূর্ণ রেখে। আরো দুর্ভাগ্যক্রমে বিপ্লবের প্রধান প্রধান নেতারা আরো অনেকেই বড় তাড়াতাড়ি মারা গেলেন—ফ্রুঞ্জে, ওর্জানিকিদজে, ঝারঝানস্কি ইত্যাদি। সহজেই পার্টিটা এসে পড়ল স্তালিনের হাতে। শ্রমিক-এক-নেতৃত্বের নামে পার্টিও পথ না-বুঝে হয়ে পড়ল জবরদস্ত পার্টি-নেতার মুখাপেক্ষী। পার্টির ভিতরকার নেতৃত্বের বিরোধ পার্টি সভ্যদের গণতান্ত্রিক চেতনা না-বাড়িয়ে বরং উল্টোদিকে এক-নায়কত্বের পরিপুষ্টির দিকেই সভ্যদের ঠেলে দিল। সোভিয়েত একদেশকেন্দ্রিতায় সোভিয়েত অহমিকাও দেখা দিল। স্তালিনের নীতি-পদ্ধতিই তাই চেপে বসতে পারল, স্তালিনও হয়ে উঠতে লাগলেন—পার্টির নেতা, ত্রাতা, সর্বদর্শী 'অভ্রান্ত গুরু'। ওদিকে এল হিটলারী বিভীষিকা। অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম পার্টি-নীতি হারাতে লাগল, তারপর কর্মপদ্ধতিও খোয়াল। ১৯৩৮।৩৯-এর পরে পার্টি ছিল কি ছিল না, তা গবেষণার বিষয়। পার্টিসদস্য অবশ্যই ছিল লাখে লাখে—কিন্তু তার কেন্দ্রীয় কমিটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হলো—সে কমিটির সভা বসত না, তার পলিটব্যুরোরও সেই দশা। স্তালিন তাঁর দু-একজন সাকরেদকে নিয়ে পার্টির নামে হয়ে রইলেন 'শ্রমিক একনায়কত্ব'।"

৬.

লেনিনের তৈয়ারি কমিউনিস্ট পার্টি তাঁর মৃত্যুর ১৫ বছরের মধ্যেই প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছল কি করে?—আমার এই প্রশ্নের একটা আংশিক উত্তর পেলাম—লেনিনের মৃত্যু, অন্যান্য প্রধান নেতার মৃত্যু, এ-সবের ফলে সমগ্রভাবে পার্টির যথার্থ কমিউনিস্ট চেতনা ও কমিউনিস্ট কর্মকাণ্ড মোটেই পাকা হতে পারেনি। পার্টি শৃঙ্খলার নামে ব্যক্তিপূজাই পাকা হয়ে ওঠে। 'সোভিয়েত দেশপ্রীতি' যা

পেট্রিয়টিজম-এর আড়ালে এক ধরনের জাতীয় অহমিকাও বাড়ে। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য আরো একটু গভীরতর—রুশ জনগণের মধ্যে যদি পূর্ব থেকে গণতান্ত্রিক চেতনা থাকত, এমন কি, রুশিয়ায় গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া নীতি-পদ্ধতিরও কোনো স্থির ঐতিহ্য থাকত, তা হলে কি অমন একনায়কত্ব ও ব্যক্তিপূজা প্রশ্রয় পেতে পারত? না, পার্টিটা 'ডিমোক্রাটিক সেন্ট্রালিজম'-এর প্রথম শর্তটি (ডিমোক্রাটিক) বিস্মৃত হয়ে শুধু সেন্ট্রালিজম এর পদতলেই নিজের অস্তিত্ব প্রায় বিসর্জন দিতে পারত?

ইদানীং অবশ্য এ-প্রশ্নটা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। রুশ ও চীন—যে দুই প্রধান দেশে সমাজতন্ত্রী বিপ্লব সম্ভব হয়েছে, তার একটিতেও গণতান্ত্রিক উদারতার (বুর্জোয়া ডিমোক্রাসির) ঐতিহ্য ছিল না; আর তার ফলেই এক রকম (জারতন্ত্রী ও চিয়াংকাইশেকী) একনায়কত্ব থেকে অন্য রকম (তথাকথিত শ্রমিকশ্রেণীর) একনায়কত্ব (বা ব্যক্তিপূজা) মেনে নিতে রুশিয়ার ও চীনের জনসাধারণের বাধা হয়নি। বর্তমান কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের একটা প্রধান কারণ কি এই নয়? এ-প্রশ্নটা মনে জাগলেও তখন (১৯৬৪) আমি তা উত্থাপন করিনি। এহ্‌রেনবুর্গ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "স্তালিন সম্বন্ধে তোমাদের দেশে ধারণা কি?"

আমি বললাম, "আমার মনে হয়, কমিউনিস্টরা কেউ কেউ মনে করে স্তালিনের বিরুদ্ধে যা বলা হচ্ছে তা অসত্য, অন্তত অনেকাংশে অর্ধসত্য। অনেক কমিউনিস্ট অবশ্য তা মনে করে না। সাধারণ মানুষ মনে করে—স্তালিন অন্যায় অনেক করেছেন, তবে রুশিয়ার উন্নতিও তো তখন কম ঘটেনি। কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মনে একটা সংস্কার আছে—মৃতদের তারা নিন্দা করতে চায় না। বিশেষ করে স্তালিনের মৃতদেহকে কবর থেকে তুলে দিয়ে অন্যত্র কবর দেওয়া, এ-ব্যাপারটা তারা খুবই বিসদৃশ কাজ মনে করে। এর প্রয়োজনই বা কী ছিল?"

এহ্‌রেনবুর্গের চিন্তা অন্যদিকে বয়ে গেল, "কিন্তু মৃতদেহকে অমন মসলা-মেখে রক্ষা করা কেন? এতো আমাদের রুশ প্রথা নয়, 'মমি' রক্ষা মিশরীয় রীতি। লেনিনকেও ওভাবে রাখা সেদিক থেকে রুশ-নিয়মের ব্যতিক্রম।"

কথাটা নতুন ধরনের। আমি কিন্তু তর্ক তুললাম, "কীয়েভ্-এ কাতাকুম্‌স্ দেখেছি—মৃত্তিকাতলের খুপরিতে তোমাদের সাধুসন্তদের দেহ রক্ষিত আছে, অনেককাল ধরেই তো তা চলছে।"

এহ্‌রেনবুর্গ বললেন, "হাঁ, প্রাচীন মিশরীয় প্রথাটা সেখানকার খ্রীস্টানরা মিশরে গ্রহণ করে, পরে এই বাইজেনটাইন খ্রীষ্ট-মণ্ডলেও তা ব্যাপ্ত করে দেয়। রুশরা কিন্তু মৃতকে সমাধিই দিত।"

আমার মনে হয়, কথাটা ঠিক। 'মমি' রক্ষার বিদ্যা মিশরের উদ্ভাবনা, তাদেরই তা প্রথম অভ্যাস। কিন্তু খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রথম যুগ থেকেই যখন পূর্ব ভূমধ্য-অঞ্চলের খ্রীষ্টজগতে এ-রীতি এমন পাকাভাবে চেপে বসেছে, তখন তা রুশ ঐতিহ্য হয়ে যায়নি কি? একটা প্রথা কতদিন চললে 'ঐতিহ্য' বলে গণ্য হয়?"

তখনকার মতো অবশ্য এ-তর্ক চলল না, সময়ও ছিল না। এহ্‌রেনবুর্গের গাড়ি নিচে তৈরি, তাগিদ আসছিল—বেরুতে হবে। আমাদেরও উঠতে হলো। আমি বললাম, "এসব তো হলো, কিন্তু দেশে আমার বন্ধুরা যদি জিজ্ঞাসা করে রুশ শিল্প-সাহিত্যে এখন পরিস্থিতি কী, কী বলব তাদের?"

এহ্‌রেনবুর্গ বললেন, "বলো, নিরাশ হবার কারণ নেই।—সব থেকে বড়ো আশার কথা, আমাদের পাঠকরা এখন নিজেরাই বিচার করছে, নির্দেশ শুনে মত স্থির করে না।"

নিশ্চয়ই আশার কথা।

এহ্‌রেনবুর্গ আমাদের লিফটের কাছে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, "তোমাদের দেশের পাঠকদের সম্বন্ধে কি বলবে?"

আমি বললাম, "যাই হোক তোমাদের এখানকার মতামত, আমাদের পাঠকরা তোমার লেখা পড়ে—পড়তে চায়। বিশেষ করে পড়ে তোমার 'স্মৃতিকথা'র খণ্ডগুলি। এমনকি ভালো করে ভাষা না-বুঝলেও সেই বই ও মূলও কেউ কেউ কেনে, পড়তে উৎসাহী; আর তাই অনেক বিষয়েই তা থেকে জানে যা চাপা থাকে না। তোমাকে জানাতে পারি তাদের প্রীতিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা।"

বিদায় নিয়ে এলাম। এ-বিদায় চিরবিদায়ও। পরদিন আমরা মস্কো ছাড়ি। আর দু-বৎসর পরেই ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। সে-বিদায়ের পূর্বলেখা সেবার সাক্ষাৎকালে তাঁর মুখে দেখেছিলাম। লিফটের মুখে শেষ দেখেছিলাম—একটু রঙ্গস্নিগ্ধ হাসি। একান্ত রঙ্গের নয়, একটু ব্যঙ্গেরও রেশ ছিল তাতে। জীবনপ্রান্তে পৌঁছে ওই ব্যঙ্গমিশ্রিত রঙ্গের হাসিতেই যেন তিনি পৃথিবীটাকে দেখছিলেন, ভলতেয়রের মতোই বুদ্ধি আর কৌতুকনিয়ে।

বোদল্যারের বিচার

অবন্তীকুমার সান্যাল

বোদল্যারের ফ্লর দ্যু মাল প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ সালের এপ্রিল মাসে, কিন্তু প্রকাশক মালাসির গড়িমসিতে জুন মাসের শেষ দিকের আগে বাজারে বেরোয়নি। বইটির নাম ফ্লর দ্যু মাল হলেও, ফ্লর দ্যু মাল মাত্র এক গুচ্ছ কবিতা এবং ওই নামেই সেগুলি ছাপা হয়েছিল ১৮৫৫ সালে রেভ্যু দে দ্যু মঁদ পত্রিকায়। বোদল্যার তাঁর বাছাই কবিতার একটি সঙ্কলন প্রকাশ করতে গিয়ে এগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। বইয়ের নাম প্রথমে দিয়েছিলেন ল্যাঁব, তারপর লেস্‌বিয়েন, সর্বশেষে ফ্লর দ্যু মাল।

দু'বছর আগে যখন ফ্লর দ্যু মাল কবিতা-গুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছিল তখনই তীব্র আক্রমণ করেছিলেন ল্য ফিগায়ো-র কাব্য সমালোচক গুস্তাভ ব্যুরদ্যাঁ। এবারে যখন বই-আকারে আত্মপ্রকাশ করল, তিনি সঙ্গেসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে আক্রমণ করলেন তা অভাবিতপূর্ব।

এই আক্রমণের পেছনে প্রেরণা ছিলেন স্বয়ং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। সেই বছরই তাঁর হাতের মুঠো থেকে ফসকে গেছেন ফ্লবের, মাদাম বোভারি অশ্লীলতার অভিযোগ থেকে রেহাই পেয়ে গেছে। তারই পাল্টা নিতে তিনি চাইলেন বোদল্যারকে কাঠগড়ায় তুলতে। ব্যুরদ্যাঁর প্রবন্ধ প্রকাশের সঙ্গেসঙ্গে বোদল্যার আদালতে অভিযুক্ত হলেন।

আদালতে যাবার আগে বোদল্যার ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের চেষ্টা করলেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী ম. ফ্লুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, প্রথম চিঠি লিখলেন তাঁকে। তিনি লিখলেন :

> "আমার ইচ্ছা হয়েছিল গোপনে বিচার-বিভাগের মন্ত্রীর কাছে আবেদন করি, কিন্তু ভেবে দেখলাম, সে ধরনের চেষ্টা অভিযোগের প্রায় স্বীকৃতির পর্যায়ে পড়বে, এবং আমি নিজেকে মোটেই দোষী বলে মনে করি না। বরং আমি এমন একখানা বই লেখার জন্য গর্বিত যাতে অশিবের ত্রাস ও আতঙ্ক সুস্পষ্ট।"

মন্ত্রীমহোদয় তাঁর চিঠির উত্তরও দিলেন না। বোদল্যার ঠিক করলেন

আরও উঁচু পর্যায়ে যাবেন। মাদাম বোভারির মামলায় ফ্লবেরের রেহাই পাওয়ার ব্যাপারে সম্রাজ্ঞীর হাত ছিল। তাঁর কাছে পৌঁছবার জন্ত বোঁদল্যার ধরলেন মাদাম সাবাভিয়েকে। কিন্তু কিছুতে কিছু হলো না। মামলার দিন ঠিক হল ১৮৫৭ সালের ২০শে আগস্ট।

মামলা সুরু হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে বোদল্যার চেষ্টা করলেন ভাবী বিচারকদের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু তিনি তাঁদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা নিয়ে ফিরলেন, লিখলেন :

> "তাঁরা যে সুন্দর নন একথা বলবো না, বলবো যে তাঁরা জঘন্য কুৎসিৎ ; তাঁদের আত্মা নিশ্চয়ই তাঁদের মুখেরই প্রতিরূপ।"

বোদল্যার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তৈরি হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির অন্যতম ছিল—ধর্মের মর্যাদাহানি। তিনি ঠিক করলেন, ক্যাথলিক জগতের সম্মানিত বার্বে দোর্ভিলিকে দিয়ে এ সম্পর্কে নির্দোষিতার ছাড়পত্র লিখিয়ে নেবেন এবং তা হয়ত কাজে দেবে। বার্বে দোর্ভিলিও সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিলেন। অতি অলঙ্কৃত রূপকের ভাষায় তিনি লিখলেন :

> "ম. বোদল্যার বলেননি যে অশিবের ফুলগুলি সুন্দর, এদের মধ্যে শিবের সুগন্ধ আছে, বলেননি যে এগুলি তাঁর মাথার মুকুট, এগুলি দুহাতে তিনি অঞ্জলি করে তুলবেন। এবং এখানেই তাঁর প্রাজ্ঞতা। বরং নামকরণের মধ্য দিয়েই তিনি এদের কলঙ্কিত করেছেন। ·· ···ভয়ঙ্কর ও ভীত কবি চেয়েছেন যে ফুলের ডালি থেকে—যে ফুল নৈবেদ্যের ডালি তিনি গ্রীক পূজারিণীর মতো আতঙ্কে চুল খাড়া-হয়ে-ওঠা মাথায় করে বয়ে নিয়ে চলেছেন—আমরা যেন জুগুপ্সার ঘ্রাণ নিই। এ সত্যিই এক মহান দৃশ্য।"

কিন্তু লেখাটি বেরুল না, ল্য পেই পত্রিকা ছাপতে অস্বীকার করল। বোদল্যার লেখাটি বিচারকদের কাছে পাঠালেন। তাতে ফল হলো এইটুকু যে, তিনি ধর্মীয় নীতিবোধে আঘাত দেবার অভিযোগ থেকে রেহাই পেলেন।

এবারে বোদল্যার সাহায্য চাইলেন বন্ধুদের কাছে, তাঁরা যদি বিচারকদের প্রভাবিত করতে পারেন। স্যাঁৎব্যভ তখন আকাদেমির সদস্য, তিনি কবির পক্ষ সমর্থনে লিখলেন :

> "লামারতিন আকাশকে আশ্রয় করেছিলেন, ভিক্তর উগো আশ্রয় করেছিলেন মাটিকে এবং মাটিরও বেশি কিছুকে। লাপার্দ আশ্রয়

করেছিলেন অরণ্যকে, ম্যুসে আশ্রয় করেছিলেন স্বর্ণোজ্জ্বল উৎসব-সমারোহের আসক্তিকে। অন্যরা আশ্রয় করেছিলেন গৃহকোণ, গ্রামীণ জীবনকে। তেয়োফিল গতিয়ে আশ্রয় করেছিলেন স্পেন এবং তার চড়া রঙকে। বাকী ছিল কী? তাকেই আশ্রয় করেছেন বোদল্যার। তিনি তা করতে বাধ্য হয়েছেন।"

স্যাঁৎ-ব্যভ যুক্তি দেখালেন আলফ্রে দ্য ম্যুসে অনেক অশালীন কবিতা লিখেছেন, তবু তিনি ফরাসী আকাদেমিতে উন্নীত। তিনি লিখলেন:

"বই খুলে আমি ম্যুসের সেইসব কবিতা পড়ছি যা বেশ কয়েক পুরুষ মুখস্থ করে এসেছে; এবং দেখছি তা আমি আপনাদের সামনে আবৃত্তি করতে পারবো না। তবু তাঁর কবিতা চলে এসেছে; যুবক-যুবতীদের মধ্যে তাদের পথ করে নিতে দেওয়া হয়েছে, তাদের লেখককে ক্ষমা করা হয়েছে; এরা অন্য কবিতাগুলির সঙ্গে তাঁকে ফরাসী আকাদেমিতে নিয়ে গেছে। আমাদের দুরকম বাটখারা দুরকম মাপ থাকা উচিত নয়।"

গুস্তাভ ফ্লবেরও স্যাঁৎ-ব্যভের মতো যুক্তি দেখালেন। ম্যুসে ছাড়াও তিনি প্রসঙ্গ তুললেন বের‍াঁজের। তিনি লিখলেন:

"আমরা সদ্য সদ্য জাতীয় সম্মান দিয়েছি বের‍াঁজেকে—অশালীন এই বুর্জোয়াকে, এই মহান বহুরূপীকে, যিনি গান গেয়েছেন সুলভ প্রেমের, চিত্রবিচিত্র বেশের।"

এইভাবে বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে বোদল্যার যে সাহায্য পেলেন তা মোটেই কাজের হলো না। তিনি এবার উকিলের দ্বারস্থ হলেন। কিন্তু কাব্যে অশালীনতার অভিযোগ প্রসঙ্গে বের‍াঁজের নজির তিনি কিছুতেই ভুলতে পারলেন না। এক চিঠিতে তিনি প্রশ্ন করলেন: "কাকে আপনারা বেশি পছন্দ করেন—বিষণ্ণ কবিকে, না উচ্ছল লজ্জাহীন কবিকে? অশিবের আতঙ্ককে, না, অতি উচ্ছলতাকে? অনুশোচনাকে, না, ধৃষ্টতাকে?" তিনি লিখলেন যে তাঁর বইয়ের ভয়াবহ নৈতিকতাকে বুঝতে হলে অশিবের ফুলগুলিকে একসঙ্গে দেখতে হবে, এদের আলাদা করে দেখলে বিশেষত্বের বড় অংশই নষ্ট হয়ে যাবে।

বোদল্যার বুঝতে পারলেন যে তিনি যত যুক্তিই দেখান, শিল্পবোধের কাছে যত আবেদনই করুন, বিচারকদের কঠিন মন তাতে গলবে না। তিনি শেষবারের

মতো চেষ্টা করলেন কাঠগড়ায় দাঁড়াবার আগে। রাজপ্রতিভূ এর্নে পিনারের মত যদি পালটায়, তাহলে তিনি বাঁচতে পারেন। কারণ, পিনারই ফ্লবেয়রকে অভিযুক্ত করেছিলেন এবং এবারও তিনিই বোদল্যারকে অভিযুক্ত করেছেন। বোদল্যার আবার বার্বে দোরভিলির সাহায্য চাইলেন। কিন্তু রাজপ্রতিভূ অটল রইলেন। কবি হিসাবে বোদল্যার-এর প্রতি সহানুভূতি জানালেও তাঁর কয়েকটি কবিতায় কয়েকটি শব্দ এবং চিত্রকল্প সম্পর্কে নির্মম হয়ে রইলেন। তবে তিনি সরকারী ভাবে যে অভিযোগ আনলেন, তা ফ্লবেয়রের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের চেয়ে অনেক লঘু। তিনি অভিযোগের পরিসমাপ্তি করলেন এই বলে '…ম. বোদল্যারের মাথা চাই না, চাই সতর্কীকরণ।"

মামলা সুরু হলো।

আসামী পক্ষের উকিল শে দেস্তাঁজ স্যাঁৎ-ব্যভের জোরালো যুক্তিকে এড়িয়ে কেবল ম্যুসে ও বের‍াঁজের সঙ্গে তুলনাটাই বড় করে দেখাতে চাইলেন। তিনি ম্যুসের লা বালাদ্ আ লা লুন কবিতার এই স্তবকটি উদ্ধৃত করে শোনালেন:

"একেবারে তপ্ত হয়ে শ্রীমান কিন্তু অভব্যতা সুরু করলেন শ্রীমতীর সঙ্গে, শ্রীমতী সুরু করলেন কান্না। শ্রীমান বললেন, উঃ আমি খেটে মরছি গো, তুমি কাজের কিছুই করছ না; তুমি ঠিকমতো থাকতে পারছ না।"

তারপর বিচারকদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন: "আমি জিজ্ঞাসা করি, "তুমি ঠিক মতো থাকতে পারছ না"—এই বাক্যটির মধ্যে যে চিত্রকল্প আছে, বোদল্যারের সমস্ত বইয়ের মধ্যে এমন কোনো কিছুই কি তার কাছে যেতে পারে?"

তারপর তিনি উদ্ধৃত করলেন বের‍াঁজের লা-গ্রঁমের কবিতা থেকে। উৎসবের সন্ধ্যায় নেশায় রঙীন হয়ে ঠাকুমা নাতনিদের কাছে বলছে:

"কি যে দুঃখ হয় আমার গোলগাল হাত, সুডোল পা আর হারানো সেই দিনগুলোর জন্যে…কী বললে, ঠাকুমা! তুমি লক্ষ্মী মেয়ে ছিলে না?…না, সত্যিই ছিলাম না; আর শুধু পনের বছরেই ছলাকলা কাজে লাগাতে শিখেছিলাম, কারণ, রাতে আমি ঘুমুতাম না…"

কিন্তু শে দেস্তাঁজের সওয়াল হলো খুবই দুর্বল। তিনি যে পথ ধরেছিলেন তা ছিল ভুল। আদালতে দর্শকদের মধ্যে হাজির ছিলেন বার্বে দোর্ভিলি, উকিলের সওয়াল সম্পর্কে তিনি কঠোর মন্তব্য করে গেছেন।

আদালত রায় দিল। বোদল্যার সুনীতি ও সুরুচিকে আঘাত করায়

অপরাধে অপরাধী। সোজাকথায় তিনি অশ্লীলতার অপরাধে অপরাধী। তাঁর জরিমানা হল ৩০০ ফ্রাঁ এবং লেস্‌বস্‌ ফাম দাঁনে, লে মেতামরফস্‌ দ্যু ভাঁপির, ল্য লেতে, আ সেল্‌ কি এত্র গেই, লে বিজু—এই ছয়টি কবিতার প্রকাশ ও প্রচার নিষিদ্ধ করা হলো। আক্ষেপ করে বোদল্যার লিখলেন: "যদি আমি নিজে আমি আমার পক্ষ সমর্থন করতাম তাহলে নিশ্চয়ই মুক্তি পেতাম।"

নিষিদ্ধ কবিতা ছয়টির শব্দ ও অর্থ নিয়ে আদালতে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে প্রচুর বাকবিতণ্ডা হয়েছিল। ক্রুদ্ধ প্রতিপক্ষ অশ্লীলতার নিদর্শন হিসাবে উদ্ধৃত করেছিলেন ল্য লেতে কবিতার এই স্তবকটি যার অনুবাদ বুদ্ধদেব বসু করেছেন লিথি নামে:

"এ-কঠিন তিক্ততারে ডোবাতে, করবো শোষণ
ধুতুরার নেশায় ভরা গরলের তীব্র ফোঁটায়
ঐ তোর মোহন স্তনের আগুয়ান দৃপ্ত বোঁটায়—"

অনুবাদ মূল থেকে অতিবিচ্যুত। 'ল্য নেপাঁতে' এবং 'বন সিগ্যু'-র একসঙ্গে অনুবাদ করা হয়েছে, ধুতুরার নেশায় ভরা গরলের তীব্র ফোঁটা। বুদ্ধদেব 'শারমাঁৎ গর্জ এগ্যু'-র অনুবাদ করেছেন 'মোহন স্তনের আগুয়ান দৃপ্ত বোঁটা'। 'গর্জ' স্তন নয়, বক্ষোচূড়। ফরাসে 'গর্জ'-এ প্রতিশব্দ 'স্যাঁ' নেই। স্তন শব্দটি ব্যবহারের জন্যই 'বু' অর্থে 'বোঁটা'-র আগমন এবং মিলের খাতিরে 'ফোঁটা'-র প্রয়োগ। ফোঁটায় ফোঁটায় কি শোষণ হয়?

তর্ক উঠেছিল 'নেপাঁতে' শব্দটির অস্পষ্টার্থ নিয়ে। অভিধান দেখে তবে বিচারকরা আশ্বস্ত হয়েছিলেন যে শব্দটি গ্রীক, অর্থ একরকম ফুল, বিষাদের ঘোর কাটাতে ব্যবহৃত এক প্রকার মন্ত্রপূত পানীয় এবং হোমরে এর উল্লেখ আছে।

সবচেয়ে তীব্র আক্রমণ হয়েছিল আ সেল্‌ কি এ ত্র গেই কবিতার তিনটি স্তবকের বিরুদ্ধে, বুদ্ধদেব বসু 'অতিশয় লাস্যময়ী'কে নাম দিয়ে যার অনুবাদ করেছেন। আক্রমণ ছিল মুখ্যত এই লাইন কটির বিরুদ্ধে:

"হ'তে চাই তোর ফুল তনুর হন্তা
ক্ষমাশীল স্তনযুগলে আঘাত ক'রে—
এবং উরুর বিস্মিত অন্তরে
দীর্ঘ, কঠিন, ক্ষমাহীন এক ক্ষত।"

"ঐ অভিনব, উজ্জলতর ঠোঁটে
সনির্বন্ধ প্রতিহিংসায় ছোটে
আমার তীব্র গরল—..."

অনুবাদে বুদ্ধদেব বসু 'ওঁ ফ্লঁ। এতোনে'-র বাঙলা করেছেন, 'উরুর বিস্মিত অন্তরে'। এক্ষেত্রে অর্থ আগেরটির চেয়েও স্থূল হয়ে পড়েছে। বোদল্যার "গর্জ" ও 'ফ্লঁ।' শব্দ দুটি ব্যবহারে স্থূলতা পরিহার করতে চেয়েছিলেন নিশ্চয়ই লোকরুচি বা আইনের মুখ চেয়ে নয়, সম্পূর্ণ কবিতার প্রয়োজনে। যাই হোক, কবিতার শেষ স্তবকের 'ভেনঁ্যা' বা 'তীব্র গরল' শব্দটির মধ্যে প্রতিপক্ষ বোদল্যারের সিফিলিস রোগের ইঙ্গিত খুঁজেও পেয়েছিলেন। আসলে তিনি 'তীব্র গরল' অর্থে তাঁর বিষণ্ণতা, তাঁর দৌর্মনস্যই বুঝিয়েছেন।

লে মেতামরফস্ দ্যু ভঁাপির কবিতাটিকে অশ্লীল আখ্যা দিয়ে প্রতিপক্ষ বিচারকদের মন বিরূপ করে তোলার চেষ্টায় ছিলেন প্রথম থেকেই। বিশেষ করে এই লাইনটি ছিল আক্রমণের লক্ষ্য, বুদ্ধদেব বসু 'পিশাচীর রূপান্তর' নামে অনুবাদ করেছেন:

"বক্ষের বিজয়তটে সব কান্না করি প্রতিহত,
বুড়োদের হাসাই, কলমুখর বালকের মতো।"

লেসবস্ এবং ফাম্ দাঁনে কবিতা দুটির প্রসঙ্গে সরকারী অভিযোক্তা সবচেয়ে বেশি অশালীনতার অভিযোগ এনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন:

"আপনারা নিজেরা এদুটি বাড়িতে পড়ে নেবেন, পড়ে দেখবেন, এতে আছে 'ত্রিবাদ'-দের চালচলন।"

'ত্রিবাদ্'শব্দ প্রয়োগে বোদল্যারের ক্রুদ্ধ উকিল প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন যে 'ত্রিবাদ' নয় 'ফাম দাঁনে' অর্থাৎ 'অভিশপ্ত নারীরা'—কবি যে অভিধা ব্যবহার করেছেন সেটাই ঠিক। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কবিতাটি প্রসঙ্গে তিনি সাফোর বেদনাকরুণ কবিতার উল্লেখমাত্রও করেননি।

১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ছয়টি কবিতা বাদ দিয়ে বোদল্যার ফ্লর দ্যু মাল-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং তাতে তিনি আরও পঁয়ত্রিশটি নতুন কবিতা যোগ করে দেন। এই সংস্করণের জন্য তিনি ভূমিকার তিন তিনটি খসড়া করেছিলেন, কিন্তু কোনটাই ছাপা হয়নি। তিনটি ভূমিকাই অবশ্য টিকে

আছে এগুলি থেকে বোদল্যারের সেই সময়কার মানসিক চাঞ্চল্য, ক্ষোভ ও অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পটপরিবর্তন হলো অবশেষে এক শতাব্দী পরে ১৯৪৯ সালে। ফ্লর দ্যু মাল-এর দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহারের আবেদন ফরাসী সরকার গ্রহণ করলেন। এডভোকেট জেনারেল দ্যুপ্যুই (সেদিন ছিলেন পিনার) তাঁর সরকারী বক্তব্য শেষ করলেন এই বলে :

"লক্ষ্য হিসাবে বোদল্যার এঁকেছেন মানব-অস্তিত্বের যন্ত্রণার চিত্র, সে চিত্র সমস্ত প্রথাগত স্টাইল থেকে মুক্ত। তাল-লয়-সমন্বিত ধ্বনিময় ভাষায়—যাতে তিনি রাজা, যাতে কৃত্রিমতা নেই, আড়াল নেই, সেইসঙ্গে যাতে আছে তাঁর সমস্ত কলঙ্ক তাঁর ভয়ঙ্করত্ব তাঁর পদস্খলন, তাঁর দোষ, তাঁর সৌন্দর্যও—এই ভাষায় তিনি প্রত্যেককে তাঁর বাণী পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। "যদি বোদল্যারের কোনো কোনো কবিতায় যৌনতার লক্ষণ থেকেও থাকে, কবি কিন্তু অশ্লীল অথবা স্থূল শব্দ পরিহার করেছেন। আমাদের প্র-পিতামহদের স্নায়ুর চেয়ে আমাদের স্নায়ু কম অসহনশীল। আমরা লেডি চ্যাটার্লির প্রেমিক মালির শৌর্যও হজম করেছি।

"সেইদিন থেকে আমাদের উচিত, ফ্রান্সকে যে-লেখকরা সবচেয়ে বেশি সেবা করেছেন তাঁদের এমন একজনের স্মৃতিকে যে-দণ্ড ম্লান করেই চলবে, সেই রাষ্ট্রীয় দণ্ডকে মুছে দেওয়া।"

সরকারী রায়ে এই অভিমতই স্বীকৃত হলো। আরও স্বীকৃত হলো যে বোদল্যারের কবিতা বিশুদ্ধ প্রেরণার ফল, তাঁর কোনো কবিতায় কোনো অশ্লীল অথবা স্থূল শব্দ প্রয়োগ করা হয়নি, ফ্লর দ্যু মাল প্রথম প্রকাশের সময় কাউকে সন্ত্রস্ত করে থাকলেও তা জনমতের অনুমোদন লাভ করেনি এবং তার বিচার ট্রাইবুনালও করেনি।

ধ্রুপদ

গোলাম কুদ্দুস

বর্ষণঋতুর শেষে আবার সোনালী রোদ।
সব ভুলে চেয়ে আছি
শরতের লঘু সাদা মেঘেদের দিকে।
ভুলে'ছি কি তবু সব কিছু ?
শুধু জানি জগতের বাধাবিঘ্ন যত
জীবনের যত ভার গ্লানি
সব কিছু লঘু হ'য়ে ভেসে যাবে উড়ে যাবে
ঠিক এই শরতের মেঘেদের মতো।

মারকাট, মন্ত্রী, মোসায়েব, হোমরাচোমরা, ধামাধরা,
রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রের নিশানা—
লোকসভা, রাজ্যসভা, পার্লামেণ্ট, সিনেট, কংগ্রেস,
ডিক্টেটর, গণতন্ত্রী,
সজারুর যত কাঁটা আত্মরক্ষাপ্রয়াসসঞ্জাত,
দল, উপদল, নেতা, উপনেতা, মহানেতা, মহা সেনাপতি
হাল্কা হ'য়ে লঘু হ'য়ে ভেসে যাবে, উড়ে যাবে, মিশে যাবে
ঠিক এই শরতের মেঘেদের মতো।

যত জাতি, যত দেশ, দেশের সীমানা,
শেয়ালের যত গর্তে যত মত, যত পথ,
সেয়ানা শয়তান, আর
যত ধর্ম, যত ভগবান,
খোলস, মুখোস, আর বুজরুকি, চোরাগোপ্তা যত
ভেসে যাবে উড়ে যাবে মিশে যাবে
ঠিক এই শরতের মেঘেদের মতো।

তার আগে হবে কিছু ঝড়,
ভারি ভারি কালো মেঘে গর্জন, ঘর্ষণ,
বিদ্যুৎ-বিক্ষোভ, বজ্রপাত,
প্রলয়ের জটাজালে সর্পিল সংঘাত।
আমি তার সঙ্গী নিরুদ্বেগ
যদি জানি সেই সংঘাতেরই বেগ
ছিঁড়ে ফেলে মেঘ,
আর তারই ফাঁকে ফাঁকে ঝরে নানা দেশে
নির্মল হাস্যের মতো রৌদ্রের কৌতুক।
উদ্বেগের ঘনঘটা বুকে নিয়ে আমি নিরুদ্বেগ
যদি জানি নদীকূলে অপেক্ষিছে শুভ্র স্বপ্নাতুর
কাশগুচ্ছ কামনা-কোমল,
শিউলির ডালে ডালে ফুল ফোটানোর আগে চলেছে মধুর
মধুর অধররাঙা লজ্জিত প্রণয়,
আর আকাশের কোণে লুকিয়ে রয়েছে সঙ্গোপনে
এই সব শরতের লঘু সাদা মেঘ।

যে পারে ভারের বোঝা লঘু ক'রে দিতে
শরতের মেঘেদের মতো,
সেই শুধু মন কেড়ে নেয়।
তার স্পর্শে থেমে যায় অতীতের স্মৃতি-রোমন্থন,
বর্তমান মেলে তার যাদুর পাখনা,
পলকে আলোক তার, সে যে ভবিষ্যৎ,
দৃশ্য থেকে উড়ে যায় অদৃষ্টের কোন স্বপ্নলোকে
ঠিক এই শরতের লঘু সাদা মেঘেদের মতো।

হয়তো আমিই লিখব

কৃষ্ণ ধর

হয়তো আমিই লিখব একালের কথা, কাহিনীর জটে জটে
বাঁধা থাকবে কোনো এক স্তব্ধ স্রোত, কল্লোলও শুনতে পাব
একদিন হয়তো আমরাই।

হয়তো আমিই লিখব অনশন বন্দীদের ঘুমভাঙা গান
ভাঙবে শিকল
ঝনঝন শব্দ তার শুনতে পাব একদিন হয়তো আমরাই।

এ শুধু শব্দ নিয়ে খেলা নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু খোঁজা
আমাদের সকলেরই মুখ দেখে মনের ভিতর দেখা মতো
রক্তের ভিতরে আনাগোনা মন্ত্রগুপ্তি মানা
এ সবই আমি লিখব মরচে-পড়া লেখনীকে
আবার শাণিত ক'রে হিংস্রতার মুখোমুখি হয়ে।

হয়তো হবেনা কিছুই, শুধু স্মৃতি নিয়ত দগ্ধাবে
নিজেরই অক্ষমতা ব্যঙ্গ করে দেখাবে নিজেকে
হয়তো নিজেই পুরনো বইয়ের পাতা খুঁটে খুঁটে
খুঁজব অতীত দিন, ম্লান সন্ধ্যা ঘিরবে দুচোখ

বাগানের বাসিফুল চেখে চেখে বিরক্তির স্তিমিত নখরে
দাগ কেটে যাব শুধু দালানের ইঁট বালি চুনে।

তবুও ঘৃণার টানে যাবনা জোয়ারে
যেহেতু এ বন্যা শুধু আপতিক ক্রোধাবিষ্ট নয়
রক্তের অমলকথা বহে নিয়ে আনে তারা
বসতবাড়িতে কিংবা ভাঙা ভিতে ঘোরানো সিঁড়িতে
তারপর উঠে যায় পাক খেতে খেতে
শহীদ মিনারে।

তাদেরই কথা লিখব, আজ যদি ফিরে যায়
কাল তারা ফের আসবে কলমের মুখে

হয়তো আমিই হব তার কবি, গল্পকার
শিল্পীর তুলিতে ছবি এঁকে দাঁড়াব সম্মুখে
হয়তো আমিই।

কোকিলের সন্ধানে

শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়

কোকিল ডাকে না আজকাল, কাক ডাকে।
পোষা খরগোশদের জন্যে কচি ঘাস কিনেছে মল্লিকা
চড়া দামে। রথের মেলায় অল্প দাম দিলে সব পাওয়া যায়
কেবল কোকিল ছাড়া। ঐ দূরে গাছে
কে বেঁধেছে ঘোড়াগুলি, যাবে ওরা তল্পিতল্পা নিয়ে
অরণ্যনিবাসী কিছু কাজল রমণী,
তারা চোখ তুলে মেঘ চিনতে চাইছে আর দেখছে আকাশ
কাক ডাকছে ওদিকে ছপ্পরে
যেখানে সমস্ত দিনরাত্রি ধরে জল ঝরঝর ঝরে যায়
ভাঙা কলে, যেখানে কোকিল যদি নাও ডাকে, কাক ডাক দেয়
কোকিলেরই সন্ধানে আমরা এসেছিলাম রথের মেলায়
কেননা অনেক কাল কাকডাকা ভোর থেকে
সকাল রওনা দিয়ে ক্লান্ত হল বিকেল অবধি।

বিপ্লব

রেখা দত্ত

নিশীথ-প্রদীপ জেলে তোমাকেই খুঁজে ফিরি প্রাণের ভিতরে।
অন্তরের অন্তস্থল থেকে
তোমাকে নিয়ত ডেকে ডেকে
আমি দিশেহারা। এই পৃথিবীর অন্ধকার ঘরে
বারে বারে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে আপন পরিচয়
দিয়েছ। অথচ পরাধীন
আমি আজো। তুমি বরাভয়
ধর্মসংস্থাপন-কল্পে আমার শিয়রে কবে হবে সমাসীন?

সোনমাই গ্রাম

কেদার ভাদুড়ী

সূর্য অস্ত গেলো—
সূর্য উঠল—
এরই ফাঁকে
ভূতে পাওয়া রাত্রির জমাট অন্ধকার
তৈমুর নাদিরের মিলিত পাহারায়
শক-হূণ-দল পাঠান মোগলের
চুনমুখে থুতু ছিটিয়ে
কি-এক অব্যক্ত ইশারায়
হৈ হৈ ক'রে নাচল
তারপর বুক পকেটে হোয়াইট হাউসের
পৈশাচিক দলিল বুলেটে মুখ গুঁকিয়ে
ছাগল ভেড়া মোরগ মুর্গিদের সঙ্গে
বুড়ো বুড়ী ছেলে মেয়ে এমন কি
শিশুদের প্রত্যেকটি কপাল তাক ক'রে
এক হ'য়ে গেলো—
সাম্য শান্তি স্বাধীনতার অপর নাম
ষোলই মার্চ উনিশ শো আটষট্টির
সোনমাই গ্রাম।

ভূগোলের টুকরো খবর—ভিয়েতনাম।
পাঁচ শো ষাট—এমন কিছু নয়,
একটি সংখ্যা মাত্র।
মৃত্যুকেও ভাগ করা যায় না,
মৃত্যু অদ্বৈত।
তবু তাদের তাজা নীল রক্ত
মানুষের স্বাধিকারের প্রশ্নে
এক স্বর্গীয় উত্তর—
সোনমাই গ্রাম।

পরিচিত বৃত্তে প্রেম

দীপক রায়চৌধুরী

এখন প্রেমকে চিনি, পরিচিত বৃত্তের খকাল,
দ্বিধা-দ্বন্দ্বে অহরহ স্নায়ুর শরীর,
অনুভবে সূচীমুখ সময়ের তীক্ষ্ণ স্পর্শসুখ ;
স্বভাবের অন্তর্গত সব প্রথা দেখ
কৌতুকে নিষ্ঠুর।

প্রত্যেকে ভুগছে, নানা প্রবৃত্তির কল্পিত অসুখ,
পাখির ডানার শব্দ বুকে করে
মুছে যায় নিস্পৃহ বিকেল,
পৃথিবীর মাঠে-ঘাসে অরাজক নৈঃশব্দ্য এখন ;
তারই মাঝে সাবধানে লক্ষ বুকে কেড়ে রাখা
শুধুই উত্তাপ।

সেই সব সেরে-ওঠা কবিতায়, গথিকে-গীর্জায়
বহুকাল ভুলে গেছি,
এখন কেমন সব ভিন্ন ভিন্ন ফলকে উৎকীর্ণ,
সারি সারি স্মৃতির কঙ্কাল ;
কিছু তার ধূপ-দীপে, বাসি ফুলে রজনীগন্ধায়
ছিটেফোঁটা হয়তো বা প্রোথিত সত্তায়।

সবরমতী

তরুণ সান্যাল

নদীর বালিতে জ্যোৎস্না শান্ত শাদা, নদীর চিকন জলে ছলছল সময়
এমন বিপুল শূন্য স্নিগ্ধতায়, সবরমতী, আছ শুয়ে কোন স্মৃতি বেদনা বিনত?
আমারও অনেক সুখ মুখ থুবড়ে অমনি বালিতে শুয়ে, ধবল নুড়ির বাঁকে
নরকরোটির পুঞ্জে, কঙ্কালে বলয়ে
আমারও অনেক সাধ অমনি চিকনজলে চূর্ণ ফেন-তরঙ্গের ছুরিতে নিহত।

মধ্যরাতে জলে ওঠে দাউদাউ আকাশ, আর্ত নারীর জঙ্ঘায় তীক্ষ্ণ ধাতব আয়ুধ,
দিনগুলি শকুনের ডানায় শম শম হাওয়া, আরব সমুদ্রে হা হা লোনাক্ষুর
স্ফীতি
আমি শুধু গুনে দিই অন্তরাত্মা, ত্রিশটি রূপার চাকতি এবং শোণিত ধূমে সুদ
নদী, আ রে দূরপ্লাবী মানুষের বেদনার স্রোত, নদী বালি ও প্লাবনে খাঁ খাঁ
হাঁ-মুখে হোঁচট খেয়ে পাতাল-পতনে দ্রুত নিয়ে যাও প্রীতিস্মৃতি,কখন বিস্মৃতি!

তিনি যেন এখানে ছিলেন, তাঁর শীর্ণ দেহে জলে উঠত ভারতবর্ষের অভিমান,
দুঃখ বজ্র হতো—
শূন্য গ্রাম, দগ্ধভাল মাঠে
দিনগুলি দৌড়ে যেত প্রলয় পয়োধি জলে, ইতিহাস দ্রুত নৌকা,নদী ছলাৎছলে,
তিনি যেন নদীর পাড়ের ভাঙা মসজিদে আজান, উষাউন্মীলনে লোকচলাচলে
শান্ত পথ
এখন চশমায় তাঁর ধুলো, কেউ মুছে দেয় না, ট্যাকের ঘড়িটি থেমে আছে
মৃত আমেদাবাদের হৃদপিণ্ডে, ঐ তিনি
গোলাপবিথার থেকে, তর্পণে নামেন রাজঘাটে

এবং তাঁরই নদী, সবরমতী, আ রে অশ্রুমতী, লজ্জাহীনা নগ্ন ধর্ষণের বিকৃত
স্বরাটে
মানুষের অপমান বহে যাও—যা কেবল অশ্রু স্বেদ রক্তের লবণে তপ্ত জল
সুতাকলে বিষাদপ্রতিমা গাঁথে নক্সিকাঁথা দুঃখের সুতায়
নিহত পুরুষ-নারী আগামী ভারত যেন মৃত শিশু দুজনের মধ্য নিয়ে
নদীর ছলছলে শুয়ে, স্বপ্নের বিভ্রমে নড়ে, কথা কয়
সে-কি তুলে ধরে ঢেউ, আরব সমুদ্রবাহী
মেঘ, মেঘে বিদ্যুতে হিম্মত?

মুক্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামের চলচ্চিত্র

পরিমল মুখোপাধ্যায়

রোজকার মতো সেদিন সন্ধ্যায় আড্ডার আসর বসেছিল। তবে অন্যদিনের মতো সেদিন সবাই বক্তা নয়। বলছিলেন একজন, আর বাদবাকিরা চুপচাপ শুনছিলেন। বক্তা বন্ধুমহলে চলচ্চিত্রের একজন কঁনসিয়ার রূপে পরিচিত। সিনেমার কথা উঠলেই তাঁর কাছ থেকে তৎক্ষণাৎ আভাঁগার্দে, বুনুয়েল, নিউ রিয়ালিজম, নুভেলভাগ, আণ্ডারগ্রাউণ্ড মুভী ইত্যাদি পরিচিত-অপরিচিত বিষয়ে ছোটখাট লেকচার শুনতে পাওয়া যায়।

যাই হোক, অবান্তর কথা লিখে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটানো ঠিক নয়। আদৎ কথায় ফিরে আসি। বন্ধুটি নয়াদিল্লীর আসন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবে কোন দেশ থেকে কি ছবি আসছে তার ফিরিস্তি দিচ্ছিলেন। যেহেতু তখন কলকাতার কোনো সংবাদপত্রে সে-তালিকা প্রকাশিত হয়নি, তাই অদম্য কৌতূহল নিয়ে সকলে তা শুনছিলেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামের নাম উঠতেই একজন অতি-উৎসাহী বন্ধু বলে উঠলেন, "শুনছি দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারের একটি প্রতিনিধিদল ভারতে আসছেন। ওঁরাই কি ছবি আনছেন?" বক্তা একটু হেসে বললেন, "ধুৎ! ওই জঙ্গলে কি আবার ফিল্ম হয় নাকি! নয়াদিল্লীতে সায়গন সরকার ছবি পাঠাচ্ছে।"

কথাগুলো তীরের মতো কানে এসে বিঁধল। এতই বিস্মিত বোধ করলাম যে মুখে কথা জোগাল না, একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারলাম না। একটু বাদে যখন উত্তেজনার রেশটা মিলিয়ে গেল, তখন 'চলচ্চিত্র পণ্ডিত'-এর এই অজ্ঞতার জন্য দুঃখ বোধ করলাম। ওঁর না জানাই স্বাভাবিক, কারণ লণ্ডন-পারী-নিউইয়র্কের যে-চলচ্চিত্র পত্রিকাগুলিকে ফিল্মের বাইবেল জ্ঞানে ওঁরা আবশ্যিকভাবে পাঠ করেন, সে-পত্রিকায় ভিয়েতনামের জঙ্গলে ছবি তৈরির খবর ছাপা হয় না।

অন্যদিকে আমাদের দেশে একদল 'অতি-বামপন্থী' ভিয়েতনামের যে-চিত্রটি জনসমক্ষে তুলে ধরতে চান, তাতে আছে শুধু যুদ্ধ আর রক্ত। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে, সংগ্রামের মাঝে, অন্য জীবন আছে—সে-জীবন আনন্দের, শিল্পের, সৃষ্টির। আমাদের দুর্ভাগ্য—সে-জীবনের সংবাদ আমরা খুব অল্পই পাই। আর, এখানকার

পত্র-পত্রিকায় তা এত সামান্ত ছাপা হয় যে সাধারণ পাঠকের প্রায় চোখেই পড়ে না। তাই ভিয়েতনামের জঙ্গলে ফিল্ম হয় কিনা, সে খবর না জানা হয়তো দুঃখের—কিন্তু দোষণীয় নয়।

১৯৬১ সাল। ভিয়েতনামের ইতিহাস নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সৈন্যদের হাত থেকে মাতৃভূমিকে ছিনিয়ে নেবার জন্য দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের সশস্ত্র অভিযান ক্রমেই অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে। গঠিত হয়েছে 'মুক্ত অঞ্চল'। এই বছরেই মুক্ত অঞ্চলে চলচ্চিত্র শিল্পের সূচনা হয়। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যেই গভীর জঙ্গলে গড়ে ওঠে 'গিয়াফঙ' বা লিবারেশন স্টুডিও। তারপর যুদ্ধের পরিধি বাড়তে থাকে। যুদ্ধ যত প্রবল আকার ধরে, মার্কিনী আর তাঁবেদার বাহিনীর দল ততই পিছু হটতে থাকে। আর সেই সঙ্গে বিস্তৃতি ঘটে মুক্ত এলাকার। এবং স্বাভাবিক-ভাবে সমৃদ্ধতর হতে থাকে মুক্ত অঞ্চলের চলচ্চিত্র শিল্প। চলচ্চিত্র শিল্পের এই বিকাশকে অব্যাহত রাখার জন্য পরবর্তী সময়ে আরো দুটি স্টুডিও স্থাপন করা হয়। এগুলি হচ্ছে 'সিনেমা অফ দি লিবারেশন আর্মি' ও 'সিনেমা অফ লিবারেশন'।

অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাশিয়ার চলচ্চিত্র শিল্পকে জাতীয়করণ করা হয়। অক্টোবর বিপ্লবের মহান নেতা লেনিন চলচ্চিত্রের ভূমিকা সম্পর্কে সেই সময় বলেছিলেন যে তথ্যচিত্র নির্মাণ দিয়ে কাজ শুরু করা উচিত এবং জনগণকে শিক্ষিত করার কাজে চলচ্চিত্রকে প্রয়োগ করা দরকার। মুক্ত অঞ্চলের চলচ্চিত্র নির্মাতারা লেনিনের নির্দেশ বাস্তবায়িত করেছেন। এখানে নির্মিত হচ্ছে তথ্যচিত্র—যা শুধু ভিয়েতনামের জনগণকেই নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীকে ভিয়েতনামের সংগ্রাম সম্পর্কে অবহিত করছে।

মুক্ত অঞ্চলের চলচ্চিত্রকারেরা এই নতুন শিল্পমাধ্যমে ধরে রাখছেন ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণকে। এই চিত্রগুলিকে শুধু আজকেরই নয়, আগামী দিনের মানুষও অনুধাবন করবে। এই তথ্যচিত্র ভাবীকালের এক অমূল্য দলিল।

১৯৬৩ সালে মস্কোয় তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববাসী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল উৎসবে অংশগ্রহণকারী দেশের তালিকায় একটি নতুন নাম। এটি হচ্ছে 'মুক্ত' দক্ষিণ ভিয়েতনাম। উৎসবে প্রদর্শিত হলো দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্ত এলাকায় তৈরি কয়েকটি তথ্যচিত্র। এরই একটির নাম 'বীরত্বপূর্ণ দক্ষিণ ভিয়েতনাম'। কলাকৌশলের দিক থেকে এই চিত্রটি

এত উন্নতমানের ছিল যে পাশ্চাত্যের প্রায় সব সমালোচকই উৎসবের আলোচনা প্রসঙ্গে এটির উল্লেখ করেন।

তারপর ১৯৬৪ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত এশিয়া-আফ্রিকা চলচ্চিত্র উৎসবে আবার মুক্ত অঞ্চলের চলচ্চিত্রকে দেখা গেল। এই চিত্রটি হচ্ছে 'আমাদের বন্দুক ধরে থাকতে হবে'।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে-নতুন জীবন শুরু হয়েছে, এই চিত্রে তারই পরিচয় পাওয়া গেল।

সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন ফৌজ আর তাঁবেদার সৈন্যদের হটিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্বার বাহিনী একের পর এক জনপদ অধিকার করছে। এই মুক্ত এলাকায় জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের নেতৃত্বে শুরু হয়েছে এক নতুন জীবন। সে-জীবনে শোষণকারীদের স্থান নেই। চাষী পেয়েছে জমি। শ্রমিকের হাতে উৎপাদন-ব্যবস্থা। সকলের জন্য আছে চিকিৎসা আর শিক্ষার সুযোগ। এই নতুন জীবন আনন্দের। কিন্তু পররাজ্যলোভী সাম্রাজ্যবাদীর দল চায় এই সুখ-সমৃদ্ধিকে ধ্বংস করতে। তাই জল, স্থল ও শূন্য থেকে তারা মারণাস্ত্র ছাড়ছে। শত্রুকে এক পাও বাড়তে দিতে ভিয়েতনামবাসীরা রাজী নয়। গ্রামের বৃদ্ধ মোড়ল, চাষী রমণী, স্কুলের ছাত্র—সকলেই স্বাধীনতা, শান্তি ও সমৃদ্ধির অতন্দ্র প্রহরী। তাই তাদের বন্দুক ধরে থাকতেই হবে।

পরবর্তী বছরে (১৯৬৫) আবার মস্কোয় চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। সেখানে মুক্ত অঞ্চলের দুটি তথ্যচিত্র 'দক্ষিণ ভিয়েতনাম লড়ছে' ও 'মুক্তিফৌজের সৈন্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ' প্রদর্শিত হয়। এবারে আর শুধু প্রদর্শন নয়, "জঙ্গলের ছবি" পুরস্কার অর্জন করল।

আন্তর্জাতিক বিচারক মণ্ডলীর এই স্বীকৃতি দ্বারা মুক্ত অঞ্চলের চলচ্চিত্রের উন্নতমান স্বীকৃত হলো, দুনিয়ার মানুষ উপলব্ধি করতে পারল মুক্তিসৈনিকেরা শুধু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধই করে না, তারা শিল্পসৃষ্টিও করতে জানে।

চলচ্চিত্রের সঙ্গে মুক্ত অঞ্চল থেকে একটি প্রতিনিধিদলও এই উৎসবে যোগ দেন। প্রতিনিধিদলের নেতা লু ফোঙ থান সেখানে মুক্ত অঞ্চলের চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করেন।

এই বিবরণ থেকে জানা যায় যে মুক্ত অঞ্চলে বছরে গড়ে চল্লিশটি করে তথ্যচিত্র নির্মিত হয়ে থাকে। তথ্যচিত্র নির্মাণের জন্য রয়েছে একটি সুসংবদ্ধ সাংগঠনিক ব্যবস্থা। প্রদেশ ও জেলাভিত্তিকভাবে ক্যামেরাম্যানদের দল গঠন

করা হয়েছে। এই দল দু-ভাবে কাজ করেন। প্রথমত এঁরা কেন্দ্রীয় প্রযোজক সংস্থার নির্দেশমতো চিত্র গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয়ত নিজস্ব চিন্তা অনুযায়ী কয়েকটি বিষয়ের চিত্রগ্রহণ করেন। এই সমস্ত চিত্রকে স্টুডিওয় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে সম্পাদনা ও অন্যান্য টেকনিক্যাল কাজ সারা যায়।

তারপর এই সমস্ত চিত্রের প্রিণ্ট প্রদর্শনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। চিত্র প্রদর্শন যাতে ব্যাপক হয়, তার জন্যও ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে প্রজেকশানিস্ট বা চিত্র প্রদর্শকদের দল। তাঁরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এই সমস্ত চিত্র প্রদর্শন করে থাকেন। এঁরা যে শুধু মুক্ত অঞ্চলে নির্মিত তথ্যচিত্রই দেখান তা নয়। উত্তর ভিয়েতনামের ছবি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অবিস্মরণীয় ক্রুপদী চিত্রগুলি সহ বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের ছবিও তাঁরা দেখে থাকেন।

আর-একটি সংবাদ বোধহয় অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হবে। চলচ্চি:ত্রর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্য মুক্তাঞ্চলে একটি ইনস্টিটিউট রয়েছে। ১৯৬৪ সালে এখান থেকে প্রথম শিক্ষার্থীদল পাশ করে বেরোন।

কলকাতায় মুক্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামের কিছু চিত্র দেখবার দুর্লভ সুযোগ বর্তমান লেখকের হয়েছিল। এগুলি হলো 'কুচি' 'নিউজ ফ্রম সায়গন' 'উইথ বার্চেট ইন লিবারেটেড এরিয়া'।

'কুচি' একটি গ্রামের নাম। সায়গন থেকে দূরত্ব মাত্র তেরো কিলোমিটার। দক্ষিণ ভিয়েতনামের আর দশটি গ্রামের মতোই সাধারণ এই গ্রামটির একমাত্র বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি 'মুক্ত' গ্রাম। অর্থাৎ তাঁবেদার সায়গন সরকারের বাহিনী হটিয়ে এখানে স্থাপিত হয়েছে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের শাসন।

সায়গনের নাকের ডগায় এই মুক্ত এলাকা মার্কিন প্রভুদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। তারা মানচিত্রের বুক থেকে 'কুচি' গ্রামের নাম মুছে ফেলার সংকল্প নিল। আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিশাল মার্কিনবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল। অসংখ্য ট্যাঙ্ক গ্রামটিকে ঘিরে ফেলল। আর আকাশ থেকে অতিকায় বোমারু বিমান বিরতিহীন বোমাবর্ষণ করে চলল।

কিন্তু 'কুচি' শঙ্কাহীন মৃত্যুহীন। সেখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা স্বাধীনতার সৈনিক। মাটির গভীরে বাসস্থান বানিয়ে, ফাঁদ পেতে, সাবেকী অস্ত্র নিয়ে 'কুচি'-বাসীরা মার্কিন আক্রমণকে প্রতিহত করল। শুধু তাই নয়, পরাজিত মার্কিনবাহিনীর অস্ত্র পর্যন্ত তারা দখল করে নিল। একবার নয়, বার বার

তিনবার তারা এই আক্রমণকে প্রতিহত করে। সায়গনের অল্প দূরে এই 'কুচি' আজও অপরাজিত।

এই হলো সংক্ষেপে 'কুচি' চিত্রের বিষয়বস্তু। এটি তোলা হয়েছে 'সিনেমা ভেরিতি' রীতিতে। এ-চিত্রের ক্যামেরাম্যানরা রণক্ষেত্রের মধ্য থেকেই যুদ্ধকে চিত্রায়িত করেছেন। অনেক দৃশ্যই দর্শককে স্তম্ভিত করে, ভাবতে হয় সেলুলয়েডের বুকে এ-সব কিভাবে তুলে রাখা গেল! সম্পাদনাও সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। নেপথ্যভাষণ রয়েছে, কিন্তু চিত্রের সাবলীলগতি ও চিত্রকল্প ভাষার অভাবকে মিটিয়ে দেয়।

ডকুমেণ্টারি চিত্রের জন্মদাতারূপে আখ্যাত জন গ্রিয়ারসন ডকুমেণ্টারি চিত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন "ক্রিয়েটিভ প্রেসেনটেসান অব দি রিয়ালিটি"। 'কুচি' চিত্রে এই সংজ্ঞার প্রতিটি অক্ষর যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আনন্দের কথা, এই তথ্যচিত্রটি যথাযোগ্য স্বীকৃতি পেয়েছে। পঞ্চম মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এটি স্বর্ণপদক লাভ করে।

'নিউজ ফ্রম সায়গন' পনেরো মিনিটের সংবাদচিত্র। মার্কিনদের তাঁবেদার শাসকচক্রের বিরুদ্ধে সায়গনে ছাত্র ও বৌদ্ধদের যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ হয়েছিল, এই চিত্রে সেটাই তুলে ধরা হয়েছে। চিত্রে বিক্ষোভকারীদের উপর মার্কিন সৈন্যের নির্লজ্জ আক্রমণ, দিয়েম-কাই চক্রের অত্যাচার, বৌদ্ধদের আত্মাহুতি প্রভৃতি ঘটনা উপস্থিত করা হয়েছে। শত্রু এলাকায় গিয়ে মুক্তিফ্রণ্টের চিত্র-নির্মাতারা যেভাবে চিত্র তুলেছেন—তা বিস্ময়কর।

মুক্ত অঞ্চলের জীবনের সকল দিকের প্রকাশ ঘটেছে 'উইথ বার্চেট ইন লিবারেটেড এরিয়া' চিত্রে। পশ্চিমের সাংবাদিক বার্চেট গিয়েছিলেন মুক্ত অঞ্চলে সেখানকার জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করতে। তাঁর সঙ্গ নিয়েছিলেন মুক্ত অঞ্চলের একদল ক্যামেরাম্যান।

গভীর জঙ্গল। সূচীভেদ্য অন্ধকার। অল্প দূর থেকেও মনে হয় সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে এখানে মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। গোপন পথ দিয়ে বার্চেট হাঁটছেন। কি দেখলেন তিনি? হিংস্র জন্তু? না। তিনি দেখলেন গভীর অরণ্যে গুপ্ত মানুষের ভিড়। একদিকে সংবাদপত্রের অফিস। কিছুটা দূরে ওষুধের কারখানা! বিস্ময়ের আরো বাকি ছিল। সেখানে দেখা গেল অস্ত্রের কারখানা। পরাজিত মার্কিন সৈন্যদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র আর ভূপাতিত মার্কিন বিমানের টুকরো দিয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন ধরনের অস্ত্র। মার্কিন

বৈমানিকের প্যারাসুট, মার্কিন সৈন্যদের পোষাক দিয়ে তৈরি হচ্ছে মুক্তি-সেনাদের পোষাক। মুক্ত অঞ্চলে 'মেড ইন ইউ এস এ' চিহ্নিত জিনিসের প্রাচুর্য দেখে পরবর্তীকালে বার্চেট আর বিস্মিত হননি।

এই রকম অসংখ্য ঘটনায় চিত্রটি পরিপূর্ণ। বার্চেট দেখেছেন উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়, শুনেছেন প্রাচ্য ও পশ্চিমের সঙ্গীত, দেখেছেন মুক্তিফৌজ অভিনীত 'হ্যামলেট'; আর প্রত্যক্ষ করেছেন জন্মভূমি থেকে মার্কিন সৈন্যদের বিতাড়ন করতে মুক্তিফৌজের মরণপণ সংগ্রাম। বার্চেট যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, এ-ছবির দর্শকদেরও সেই অভিজ্ঞতা হবে।

পুনশ্চঃ

নয়াদিল্লীর চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দেবার সুযোগ বর্তমান লেখকের হয়েছিল। এই উৎসবে সায়গন সরকার একটি ছবি পাঠিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে উত্তর ভিয়েতনাম বা দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারকে উৎসবে চিত্র পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছিল কিনা উৎসব কর্তৃপক্ষ তা জানাননি।

যাইহোক, সায়গনের ছবি প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এই ছবিটির নাম 'রেমিনিসেন্স'। একদা-হারিয়ে-যাওয়া প্রেমিককে ফিরে-পাওয়া নিয়ে ছবির কাহিনী। এই ছবির কয়েকটি সংলাপের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। "আমি মার্কিন সৈন্যকে বিয়ে করতে চাই" (নায়িকার বন্ধুর উক্তি)। "মার্কিন সেনা-অফিসে চাকরির মতো সম্মান নেই" (নায়িকার বর্তমান প্রেমিকের উক্তি)। "আজ সন্ধ্যায় আমেরিকান ক্লাবে নাচতে যাব" (নায়িকার উক্তি)। এ-ছবি দেখার পর যেকোনো দর্শকই বুঝতে পারবেন কেন এদেরকে মার্কিন-তাঁবেদার বলা হয়। এরা যে শয়নে জাগরণে সর্বদাই মার্কিনদের ধ্যান করছে—ছবিটি তার চমৎকার নিদর্শন। এ-ছবির কাহিনীবিন্যাস, দৃশ্যরচনা, অভিনয় ও আলোকচিত্র অত্যন্ত নিম্নস্তরের। চলচ্চিত্র উৎসবে এই রকম নিম্নমানের ছবিকে অন্তর্ভুক্ত করে কর্তৃপক্ষ উৎসবের মানকে এত নিচে কেন নামালেন—তা অবশ্যই দুর্বোধ্য রয়ে গেল।

বুদ্ধিজীবিকা ও বিশ্বের কারবারী

এ. দিম্‌শিৎস

আমাদের বিপক্ষীয়দের সম্পর্কে ক্রমশ বেশি বেশি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান অর্জন আমাদের যুগের তীক্ষ্ণ তত্ত্বগত সংগ্রামের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, এদের তথাকথিত গণসাহিত্যের ভূমিকা-বিষয়ে ভালো করে একটু নজর দেওয়া। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অগণ্য সংখ্যায় প্রকাশিত ও অসংখ্য সিনেমা ও টেলিভিশনের চিত্ররূপের সাহায্যে পরিবর্ধিত এই "গণসাহিত্য" নির্জলা মিথ্যা, অপপ্রচার ও জনসাধারণকে বিমূঢ় করে তোলার বিশাল যন্ত্রের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এদের "তত্ত্ব" অনুযায়ী শিল্প দুই শ্রেণীর হতে পারে। এক, "বাছা বাছা লোকেদের জন্যে শিল্প", অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর সেরা অংশ, বুর্জোয়া সমাজের "অন্তঃসার"-দের "পরিমার্জিত" ক্ষয়িষ্ণু শিল্প; এবং, দ্বিতীয়ত, "জনতার জন্যে শিল্প", অর্থাৎ সাহিত্যের বকলমে দুর্নীতিগ্রস্ত হাতুড়েদের লেখা স্থূল বাজে রচনা বা প্রচারধর্মী "পণ্যদ্রব্য"। কিন্তু এ-"তত্ত্ব" নিছক লোকনিন্দা ছাড়া কিছু নয়।

জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনস্থ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়ান্সেস-এর জনৈক জার্মান বিজ্ঞানী ক্লাউস জিয়েরমান রচিত 'নভেলস অন দি কনভেয়র' (পরিবহন-চক্রস্থিত উপন্যাস সমূহ) নামের বইটি একটি মৌল গ্রন্থ। এটি এ-বছরই জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিক থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পুঁজিবাদী দেশসমূহের "গণসাহিত্য"-র অনুধাবন যে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের তত্ত্বগত সংগ্রামে তা যে কত প্রয়োজনীয়—এই বইয়ে তা সুস্পষ্টরূপে বিবৃত। "গণসাহিত্য"-র যে ঘোলাটে বেনো জল জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের বইয়ের বাজার এবং সিনেমা ও টেলিভিশনের পর্দাকে প্লাবিত করছে, তা পশ্চিম জার্মানির প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কর্মনীতির এক অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ মাত্র।

জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকেই এই 'নোঙরা সাহিত্য', ভাড়াটে লেখা, আধা-অশ্লীল রচনা, রোমহর্ষক ও নর্দমার উপন্যাস সম্পর্কে প্রচুর লিখিত আলোচনা হয়েছে, কেননা ওদেশে সত্যিকার 'বেলে লেত্‌র' নামের যোগ্য সাহিত্যের তুলনায় পূর্বোক্ত ধাঁচের রচনার সংখ্যা ও প্রভাব ব্যাপকতর

কখনো কখনো সেখানে এই "গণসাহিত্য"-র বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরও আমরা শুনতে পাই। যেমন, জাকব মাদের 'কুয়েরবিস্‌কার্ন' পত্রিকায় তিক্তভাবে লিখেছেন যে "গণসাহিত্য"-র এই ঢেউ নব্য ফাশিস্ত মতিগতি বৃদ্ধির একটা লক্ষণ মাত্র। তবে ক্লাউস জিয়েরমান তাঁর বইয়ে নর্দমার এই নোংরা, এই "বিকল্প" সাহিত্য সম্পর্কে সামাজিক দিক থেকে যে রকম পূর্ণাঙ্গ, কঠোর এবং বিধ্বংসী সমালোচনা উপস্থাপিত করেছেন—অপর কোনো সমালোচক তা করতে সমর্থ হননি। "গণসাহিত্য"-র পৃষ্ঠপোষকদের স্বরূপ তিনি এতে উদ্‌ঘাটন করে দেখিয়েছেন। এই পৃষ্ঠপোষকরা হলো এক-চেটিয়া পুঁজির মালিক, গির্জার অধিকর্তা ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। আবার ফৌজী দপ্তরের কর্তাব্যক্তিরা এবং পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধানরাও এর পৃষ্ঠপোষক। এই সাহিত্যের চলচ্চিত্র-রূপায়ণের অধিকার, প্রকাশন ও পুনর্মুদ্রণ থেকে এরা মুনাফা অর্জন করে। বর্তমানের প্রতিক্রিয়াশীল প্রচার-যন্ত্রের অন্যতম চালক শক্তিই হলো "গণসাহিত্য"। ক্লাউস জিয়েরমানের দৃষ্টিতে এ-সাহিত্য মিথ্যা, শঠতা ও অপপ্রচারের বিশাল, চতুর, সংগঠিত যন্ত্রের অংশবিশেষ। 'মাঝরাতের কিস্‌সা', গোয়েন্দা-কাহিনী, পকেট-বুক, কমিক্‌স এবং কুৎসিৎভাবে লেখা সুপরিচিত গ্রন্থাবলীর অবলম্বিত ভাষ্য, এ-সবই এই সাহিত্যের অঙ্গীভূত।

এ-সব বইয়ের প্রকাশ-সংখ্যা খুবই বেশি। এটুকু বলাই যথেষ্ট যে ১৯৬৫ সালে সারা জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকে মোট ৫৭টি প্রকাশক সংস্থা শুধুমাত্র পকেট সংস্করণের বই-ই প্রকাশ করেছে। এইসব বইয়ের মধ্যে আছে প্রধানত মহিলা পাঠিকাদের মনে "ওষুধ" ধরানোর উদ্দেশ্যে লেখা "অভিজাত উপন্যাস", দীন-দরিদ্র নায়ক-নায়িকার সমাজের উচ্চ মঞ্চে আরোহণের যতরকম আষাঢ়ে গপ্পো, ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হিটলারপন্থী সৈন্যদের বীরত্বকাহিনী এবং সরকারের আশীর্বাদপূত গুপ্তচর, গোয়েন্দা, দালাল ও নাশকতার কাজে লিপ্ত নানা ধরনের খুনেদের নিয়ে লেখা গোয়েন্দা-উপন্যাস।

জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের প্রতিক্রিয়াশীল প্রকাশক-সংস্থার ও পত্র-পত্রিকাগুলির "ব্যাপক ফসল" এর চরিত্র নির্ণয় করতে গিয়ে ক্লাউস জিয়েরমান লক্ষ্য করেছেন যে কার্যত এই ফসলের সবটাই কমিউনিজম-বিরোধিতা ও সোভিয়েত-বিরোধিতায় আচ্ছন্ন। অবশ্য "অভিজাত উপন্যাস", হিটলারের পরাজিত সেনাধ্যক্ষ ও অফিসারদের এবং প্রতিশোধ আশঙ্কায় উন্মত্ত প্রাক্তন

নাৎসী রণাঙ্গনের সংবাদদাতাদের বানানো যুদ্ধবিবরণী, কুখ্যাত জেমস বনড-এর মতো অতি-মানবদের বিষয়ে লেখা বই এবং '০০৭ নং গুপ্তচর' সম্পর্কিত আইয়ান ফ্লেমিং-এর ১৫ খানা উপন্যাসের সব কথানাই ঝুড়ি ঝুড়ি ছাপা হয়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে। তাছাড়া, জেরি কটন ও 'কমিসার এক্স' বিষয়ে ধারাবাহিক উপন্যাসও প্রচুর ছাপা হচ্ছে। তদুপরি এই সব সাহিত্যের চিত্ররূপও হরদম তৈরি হয়ে চলেছে। এই প্রসঙ্গে জিয়েবুমান পশ্চিম জার্মানির জনেক বিদ্বজ্জন হেরিবার্ত শ্লিকার-এর কৌতূহলোদ্দীপক প্রামাণ্য রচনা উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে ১৯৬৫ সালের পূর্ববর্তী দশ বছরে ওদেশে যুদ্ধবাদী "মতাদর্শ" এবং মনোভাবকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে যেখানে ৫৮৫টি চলচ্চিত্র দেখানো হয়েছে, সে-ক্ষেত্রে মাত্র ৯টি যুদ্ধবিরোধী চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকে বিশেষ করে কমিউনিস্ট-বিরোধী "এটা কার কর্ম" জাতীয় এবং মেকি তথ্য-সংবলিত হিংস্র চরিত্রের সাহিত্যসৃষ্টিতে উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে। পশ্চিম জার্মানির গ্রন্থকার ক্লাউস লুড্উইগ লাউ-এর মতে, এ-সব রচনায় প্রধান চরিত্রটি হচ্ছে এমন একজন যে "মানুষ-শিকারী, খুনে, দুর্দান্ত অপরাধী, শয়তানের বাচ্চা আর জাহান্নমে যাওয়া" এক ব্যক্তি। আর ওদেশের "যুদ্ধ-বিষয়ক গল্প-রচনা" হিটলারি প্রচাররীতির সব কটি ধরন-ধারণ রপ্ত করা নিছক বানানো লেখা ছাড়া কিছু নয়। এটুকু বলাই যথেষ্ট যে সাহিত্যের এই বিশেষ ক্ষেত্রে রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ ও প্রিয় লেখকের ভূমিকায় রয়েছে এমন এক ব্যক্তি যে এক কালের কুখ্যাত এক নাৎসী "লেখক" এবং হিটলারের কলমপেষা শকুনদের অন্যতম। এর নাম ই. ই. ডিউইন্গার।

পশ্চিম জার্মানির গ্রন্থকারদের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একথা নির্ভয়ে বলা চলে, "গণসাহিত্যের" ক্ষেত্রে যতসব ঝানু রাজনীতিক দুর্বৃত্তদের প্রবেশাধিকার ঘটেছে। সোভিয়েত-বিরোধী তথাকথিত যুদ্ধ ও "রহস্য ফাঁস" করা উপন্যাসের সবচেয়ে পরিচিত লেখকদের অন্যতম হচ্ছে জনেক হাইন্‌ৎস গুন্থার কন্সালিক। মাত্র এক বছরের মধ্যে ওই লেখকের নামে, সোভিয়েত জনগণের প্রতি পাশবিক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ কমপক্ষে তিন বা চারখানা স্থূলকায় "রহস্য-রোমাঞ্চ" মার্কা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। কন্সালিক আসলে একটা ছদ্মনাম। জিয়েবুমানের মতে, অন্তত তিন ব্যক্তি, বলা যেতে পারে একটা

পুরো গোষ্ঠী, ওই নামে অনবরত এই নোংরা জঞ্জাল স্তূপীকৃত করে তুলছে। এই ভাগ্যান্বেষী মানববিদ্বেষীরা সংবাদপত্র, প্রকাশন সংস্থা, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের জন্যে হরবখত মালমশলা যুগিয়ে চলেছে।

এই "গণসাহিত্যের ফসল"-এর অনেক লেখকের স্বীকারোক্তি নিম্নরূপ: বয়স ৩৫ বছর, একদা-সাংবাদিক, বর্তমানে "লেখক"-এর পেশায় উন্নতি করতে বদ্ধপরিকর। অল্প সময়ের মধ্যেই লোকটি ছ-টি বিভিন্ন ছদ্মনামে আদিরসাত্মক, গোয়েন্দা, অবাস্তব কল্পনায় পূর্ণ এবং যুদ্ধ-বিষয়ক ৮৪ খানা উপন্যাস বানিয়ে ফেলেছে। কলমধারী এই বেশ্যাটি সগর্বে ঘোষণা করেছে, "উপন্যাস পিছু ৫৫০ থেকে ৮৫০ মার্ক আমার রোজগার।" অন্যান্য তথাকথিত "লেখক"-দের স্বীকারোক্তিও একই রকম। অর্থাৎ, এক কথায়, হুজুর পয়সা দিচ্ছে আর নফর লিখছে। লিখছে আর লিখছে…

জিয়েরুমান তাঁর বইয়ে জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের এই "গণসাহিত্য"-র দুটি পরিষ্কার মূল ধারা লক্ষ্য করেছেন। প্রথমটি হলো, এর আমেরিকী-করণের পদ্ধতি, এবং দ্বিতীয় ধারা হলো, নব্য নাৎসী ভাবধারাগুলিকে সক্রিয় করে তোলা। "গণসাহিত্যের ফসল" ক্ষেত্রে নব্য নাৎসী ধারাটা হিংস্র-চরিত্রে এবং "গুপ্তচর"-মার্কা গল্পের ব্যাপারে বিশেষ করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গত যুদ্ধের "ফ্রন্টলাইন সৈন্যদের" বীরপুঙ্গব সাজিয়ে চালানো, "ক্রেমলিনের ষড়যন্ত্র" ফাঁস-করে দেওয়া গোয়েন্দাকে অতি-মানবের মহিমায় দ্যুতিমান করে দেখানো এবং নোংরা কুৎসা-রটনা—এ-সবই ডিউইন্‌গার-এর মতো ঘাগী হিটলারপন্থী ও আমেরিকী নব্য নাৎসী সকলেরই মস্তিষ্কপ্রসূত রচনার সমান বৈশিষ্ট্য। জিয়েরুমান লিখেছেন, কিছু কিছু প্রকাশক সংস্থার প্রায় পুরো প্রকাশন পরিকল্পনাটাই এ-ধরনের "রচনাবলী" প্রকাশের ব্যবস্থামাত্র। এর একটা উদাহরণ, 'পাবেল প্রকাশন সংস্থা'। ১৯৬৬-৬৭ সালে এরা যে ২২ খানা বই প্রকাশ করে, তার মধ্যে ২০ খানাই একেবারে প্রকাশ্য যুদ্ধবাদী উপন্যাস, একটা তো আবার ভিয়েতনামে আমেরিকার যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াসমাত্র। বন্‌-এর ফৌজী দপ্তরে এ-ধরনের বই প্রভূত কাজে লাগে।

প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া "গণসংস্কৃতি"-র স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা মার্কসবাদী সমালোচকদের অবশ্য কর্তব্য। আমাদের তাত্ত্বিক প্রতিপক্ষীয়রা পুঁজিবাদী জগতের জনসাধারণকে ভুল বোঝানোর এবং ভাঁওতা দেওয়ার জন্য ও অন্য যে যে দেশে সম্ভব সেই ভাঁওতাবাজি চালান দেওয়ার সর্বপ্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। তাদের সেই কর্মনীতি ও কৌশলের আসল উদ্দেশ্য ধারাবাহিকভাবে ও গভীরভাবে প্রকাশ করে দেওয়া আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

অনুবাদক: মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর যাবে বিসর্জন

লোকনাথ ভট্টাচার্য

[পাত্র-পাত্রী : নোঙরা প্যাণ্ট ও ছেঁড়া বুশ-শার্ট-পরা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের অস্থিচর্মসার বটুকলাল বটব্যাল ওরফে বোঁচা ও তার অন্য তিন অংশ—যারা যথাক্রমে মিহি গলার খোঁচা, একটু ভারী গলার প্যাঁচা এবং বেশ ভারী গলার পেঁচো—এবং দর্শকদের মধ্য থেকে এক সুরূপা সুসজ্জিতা যুবতী। সময় : মঞ্চের উপরে, রবিবারের সকাল ; মঞ্চের বাইরে, দিন বা সন্ধ্যার যে-কোনো সময়। স্থান : মঞ্চের উপরে, কলকাতার কোনো সাধারণ রাস্তা—এক কোণে সাইন বোর্ড দেখা যাচ্ছে, 'নদীয়া মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান', দোকান বন্ধ। বড় একটা থলে পড়ে আছে রাস্তার উপরে, ভিতরে কিছু আছে বলেই থলেটা ফুলে-ফেঁপে ঢোল হয়ে আছে—পাশেই বাসি গাঁদা ফুলের মালা, অদূরে দাঁড়িয়ে বোঁচা।]

বোঁচা। (দর্শকদের দিকে হাতজোড় করে) হুজুর, আমার মা-বাপ, আকাশ-বাতাস সাক্ষী—উঃ, কী ঘাম বলুন তো—যাকগে, যা বলছিলাম। হুজুর, আপনারা সজ্জন, আমি অকৃতার্থ, অধমের অধম—কাব্য কাকে বলে জানি না, নাটক কাকে বলে জানি না, নিজগুণে মার্জনা করবেন। আমি কিন্তু কথা বলতে জানি—জানেন, ভয়ংকর জানি—আর সেইটেই আমার পেশা। অবশ্য পেশা, হ্যাঁ, পেশাই বলতে পারেন। যদিও রোজগার? হা-হা-হা (হাসি), সেটা একটা প্রশ্ন বটে। রোজগার স্যার দুই নয়া, তিন নয়া, কখনো পাঁচ নয়া, কখনো দশ নয়া, বেশির ভাগই অষ্টরম্ভা (বুড়ো আঙুল দেখানো), হা-হা-হা (হাসি)—যার পকেটে যা থাকে, অর্থাৎ যে-দুয়েকজন দেয় বা দিতে চায় বা দিতে পারে। আর আমি

সেলাম ঠুকি, এই যেমন আপনাদের ঠুকছি। না স্যার, পেশাটা পেশাই, রোজগারের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই—আমার এই পেটটা দেখছেন তো (পেটে হাত দেওয়া), কী আছে বলুন তো ? বায়ু, নির্জলা বায়ু—তবু বেশি নয়, বেশি থাকলে খাসা একটি হৃষ্টপুষ্ট ফুটবল হত। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, ওঃ-হোঃ-হো (হাসিতে ফেটে পড়ে), মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল (ধেই ধেই নৃত্য করে)। আর হ্যাঁ, পেটটায় বিনা পয়সার কিছু জলও আছে, কর্পোরেশনের জল, ক-লি-কা-তা-ক-র্পো-রে-শন, মাঝে মাঝে পেচ্ছাব করে বাঁচি। (জিভ কেটে) হুজুর, আমার মা-বাপ, নিজগুণে মার্জনা করেন। শালা বাঞ্চোৎ জীবন, হ্যাক থুঃ (থুথু ফেলা, থলেটার পাশেই)। (সহসা নিচু হয়ে, থলেটাকে উদ্দেশ করে গাঢ় স্বরে) আ-হা-হা, শেষটায় তোর ওপর থুথু ফেললাম—কোথায় পড়েছে রে, কোথায় (খুঁজতে থাকে), জিভ দিয়ে চেটে নেব, ও-থুথু তোর গায়ে লাগতে দেব না। ও, তুই তো কিছুই বলবি না, তোর তো সব বলা শেষ হয়ে গেছে—না-না-না, কিছু মনে করিসনি, সোনা আমার, মানিক আমার, প্রেম আমার, ভাই আমার, বোন আমার। আমার বিয়ে-না-করা সেই বউটা তুই, আমার না-ভাই-থাকা সেই ভাইটি তুই, আমার না-বোন-থাকা সেই বোনটি তুই। বাবা-মা ? (ভাবতে বসে) হ্যাঁ, বাবা-মা-টা এককালে ছিল—নইলে এলাম কী করে, এ্যাঁ ? (কৌতুকের হাসি) তাই থাক, বাবা-মা বলে তোকে না হয় আর নাই ডাকলাম। তবে তারা মরে গেছে, সেই কতকাল আগে, মনেও পড়ে না, এখন হয়তো ভূত-পেত্নী-বেহ্মদত্যি-শাঁকচুন্নী হয়ে কোনো গাছের ডালে ঠ্যাঙ ঝুলিয়ে বসে থাকে—কিন্তু এই দ্যাখ, কী কাণ্ড করে বসে আছিস, কারণ তুইও তো মরে গেছিস। হ্যাঁ রে, তবে কি তুইও একদিন শাঁকচুন্নী হবি, পেত্নী হবি, ভূত হবি, বেহ্মদত্যি হবি, একরত্তি হবি, দুরত্তি হবি, তিনরত্তি হবি·· ঐ ছাখ, কথার মারপ্যাচে আবার আমায় পেয়ে বসল। কথার তোড়ে ভেসে যাই, তোকে একবার আদর করতে আরম্ভ করেছি কি রক্ষে নেই। (চিন্তার ভান

করে), কিন্তু হ্যাঁ রে, তোকে ভূতও বলছি, আবার পেত্নীও বলছি, একই সঙ্গে সেটা কী করে সম্ভব ? হয় তুই ভূত, নয় তুই পেত্নী, অর্থাৎ ভূত যদি হতে চাসই একদিন বা হয়ে যাসই একদিন, কিম্বা পেত্নী যদি হতে চাসই একদিন বা হয়ে যাসই একদিন— কিন্তু ভূতও হবি, আবার পেত্নীও হবি, সেটা তো হয় না, হয় কি রে, তুইই বল ? তবে তো তোকে গোড়াতেই হিজড়ে হয়ে জন্মাতে হয়েছিল—হ্যা হ্যা (কৌতুকের হাসি)—না কি সত্যিই হিজড়ে হয়েই জন্মেছিলি ? কই, সেটা তো দেখা হয়নি ? অবশ্য দেখব কী করে, তোকে চিনলামই বা কবে—আজই তো প্রথম দেখা, এখানেই, এই রাস্তার উপরেই, কিন্তু তার আগেই তুই শেষ, কত আদরের রাস্তাটা যেন, হাজার টাকার পালঙ্ক, দুর্দান্ত ঘুমে মুখ গুঁজে পড়েছিলি, মাছি ভন ভন করছে চোখে –বেশ করেছিস, কেল্লা ফতে (সানন্দে চীৎকার), ভবলীলা সাঙ্গ, বৈতরণী পার, শালা বাঞ্চোৎ জীবন, শালা বাঞ্চোৎ জীবন, সেই শালা বাঞ্চোৎ জীবনকে কলা দেখানো। মানে মানে কেটে পড়লি ব্যাটা, যাঃ! তোকে নিয়ে আক্ষেপ নেই, আক্ষেপ এই আমাদের নিয়েই (যেন কাঁদতে বসে)। (হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে) কিন্তু ভূত হবি না পেত্নী হবি, পুরুষ ছিলি না মেয়ে ছিলি, সে-মীমাংসাটা করে ফেলি তবে ; এঁ্যা—কি রে, হাতে পাঁজি, মঙ্গলবার ? (থলেটা আগ্রহে খুলতে যায়, পরে কী ভেবে) থাক, কী হবে দেখে, কারণ তোকে ভূতও হতে আমি দিচ্ছি না, পেত্নীও হতে দিচ্ছি না, আমি ব্যাটা তোকে মোক্ষ পাইয়ে ছাড়ব, আমাকে কি কম পেয়েছিস ? আমি শালা জগতের সেরা পুরুত ডেকে তোর সংকার করব, মন্ত্র পড়ব, গঙ্গাজল ছেটাব— আর বছর খানেক বাদে গয়ায় গিয়ে তোর পিণ্ডি পর্যন্ত দেব। হ্যাঁঃ, (ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে) ভূত হবি, পেত্নী হবি—হওয়াচ্ছি তোমায় ! ছাখো শালা এবার কত ধানে কত চাল। (আবার ভাবতে বসে) কিন্তু পুরুত পাচ্ছি কোথায় ? আর তোকে শ্মশানে বহন করে নিয়ে যাবেই বা কে ? কারণ কম-সে-কম চারটে তো বাহন চাই, রীতি-নীতি তো সব পালন করা চাই, বলো-হরি-

হরিবোল বলে পাড়া মাত করে চেঁচানো চাই—এসব করে কে, সে-বাহিনী এখন যোগাড় করি কোথায় ? (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে) এই যাঃ, ফ্যাসাদে ফেলল দেখছি। শালা বাঃঞোৎ এই কলকাতায় সব কিছুর অভাব, (হেসে) শুধু লোকের অভাব নেই, তবু সৎকাজে কোনো শালা এগিয়ে আসবে ? (বুড়ো আঙুল দেখিয়ে) একটিও নয়। (দর্শকদের দিকে ইঙ্গিত করে) এই তো এত লোক বসে আছে এখানে, সব এত চুপচাপ কেন, এঁ্যা ? কই, কেউ এগিয়ে আসুন, দেখি, একটি লোকও উঠে দাঁড়ান, দাঁড়ান না ! বেশি নয়, এতগুলো মাথার শুধু একটি মাথা, এতগুলো হাতপায়ের শুধু দুটো হাত চারটে পা····(জিভ কেটে, দর্শকদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ও হাতজোড় করে) দোহাই হুজুর, আমার মা-বাপ, আকাশ-বাতাস সাক্ষী, নিজগুণে মার্জনা করবেন। বালাই ষাট, চারটে পা হতে যাবে কেন, শুধু দুটো পা, এক আর একে দুই, আপনারা যে মানুষ, সেই মহামান্য জীব—আমি অকৃতার্থ, অধমের অধম। (থলেটার দিকে দেখিয়ে) আসলে জানেন, এ-ব্যাটা আমার সব গোলমাল করে দিচ্ছে, এ-ব্যাটার চারটে পা, আমি তাই সকলেরই চারটে পা দেখছি—এমন কি এই আমারও যেন চারটে পা, বুঝলেন, হ্যা-হ্যা-হ্যা (বোকার মতো হাসি)। (গম্ভীর হয়ে) কিন্তু হুজুর, আমার মা-বাপ, হাসি-ঠাট্টাতে সময় চলে যাচ্ছে, আপনাদের মহামূল্য সময়, এদিকে সমস্যাটার তো কোনো সমাধান দেখছি না। কারণ হে ভদ্রমহোদয়গণ, হে ভদ্রমহিলাগণ, আপনারা জানেন, আমি গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতে পারি, বলতে পারি, (চেঁচিয়ে) পুরুত চাই, একজন পুরুত চাই, টিকিওয়ালার দরকার নেই, পৈতে না থাকলেও ক্ষতি নেই, বামুনও যদি না হয় তো না হোকগে—কী দরকার, আমিই না হয় তার নতুন নামকরণ করে দেব, এই ধরুন বলব, আজ এই কাজটির জন্যে, এই কয়েক মুহূর্তের জন্যে, তুমি হয়ে গেছ ভোলানাথ ভট্টাচার্য বা চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী বা গজানন গঙ্গোপাধ্যায় বা প্রমথনাথ পঞ্চতীর্থ বা শশিভূষণ তর্কভূষণ, বন্দ্যোপাধ্যায়-মুখোপাধ্যায়-চট্টোপাধ্যায়, দ্বিবেদী-ত্রিবেদী-চতুর্বেদী, আরো কী-কী আছে জানি

না—এক কথায়, হে ভদ্রোমহোদয়গণ, হে ভদ্রমহিলাগণ, একটা মানুষ, যার এখনো কিছু উত্তাপ অবশিষ্ট আছে, যে এখনো নিজেকে মানুষ বলে মনে করে, যার মধ্যে শ্রদ্ধা-প্রেম-স্নেহের শেষ কিছু বহ্নি এখনো ধুক ধুক করে জ্বলছে....(ভাব পরিবর্তন করে) এঁ্যা, ভূতের মুখে রাম-নাম? হাসি পাচ্ছে তো আপনাদের? জানেন, আমারও হাসি পাচ্ছে (অল্প অল্প হাসতে শুরু করে, শেষে হাসিতে ফেটে পড়ে)—শ্রদ্ধা প্রেম স্নেহ, (জিভ কেটে) ছি-ছি-ছি-ছি, এসব কথা কি আমার মুখে শোভা পায়? বলুন, আপনারাই বলুন। দেখছেন তো আমার এই পেটটা, আমার এই শরীরটা, আমার এই জামা-কাপড়; আর সেই আমার এত বড় আস্পর্ধা হবে, আমি উচ্চারণ করব মানুষ, আমি উচ্চারণ করব ঈশ্বর, বলব প্রেম, সত্য, শ্রদ্ধা, স্নেহ? হা-হা-হা (সজোরে হাসি)—না-না স্যার, আমার মুখে ঐ একটি কথাই শোভা পায়, ঐ একটি কথাতেই আমার জন্মগত জীবনগত মৃত্যুগত অধিকার, আর সেই কথাটাই হল আমার একমাত্র সত্য, আমার একমাত্র ঈশ্বর, আমার একমাত্র প্রেম (দর্শকদের দিকে চেয়ে, কৌতুকের ভঙ্গীতে)—কোন কথাটা? আবার বলব? বেশ, তবে শুনুন—শালা বাঞ্চোৎ জীবন, শালা বাঞ্চোৎ জীবন, শালা বাঞ্চোৎ জীবন। (আবার গম্ভীর হয়ে) তবু স্যার, ঠাট্টা নয়, শ্রদ্ধার কিছু ভাব নিয়ে কারুর সত্যিই এগিয়ে আসার দরকার, কারুর-না-কারুর, হোক না একটি মানুষই, মাত্র একজন, কারণ সেই একটি লোকও যদি থাকে তো জানবেন এখনো সময় আছে, এখনো আশা আছে, এখনো মানুষকে বাঁচানো যায়। কারণ হে ভদ্রমহোদয়গণ, হে ভদ্রমহিলাগণ, (থলেটার দিকে দেখিয়ে) এই যে-মৃত্যুটা দেখছেন, এটা কিছু কাব্য নয়, এটা কিছু নাটক নয়; বরং জানবেন সব কাব্যের কী ভীষণ মৃত্যু এটা, সব নাটকের কী শোচনীয় মৃত্যু এটা—তবু এই মৃত্যুটির সঙ্গে জানবেন আমি জড়িত, আপনি জড়িত, আপনারা প্রত্যেকেই জড়িত, (দর্শকদের দিকে আঙুল দেখিয়ে) ঐ দূরে বসে-থাকা ভদ্রমহিলাটির সোনার ফ্রেমের চশমাটা জড়িত। সব শালা জড়িত, সব বাঞ্চোৎ জড়িত—(জিভ কেটে, হাতজোড় করে) মাপ করবেন—সব ভদ্রমহোদয়গণ সব ভদ্র-

মহিলা জড়িত। না-না, মৃতকে বাঁচানো যায় না, তেমন অসম্ভব প্রস্তাবও আমি করছি না—শুধু বলছি, এমন তাচ্ছিল্যের ভাবে অবজ্ঞাটা না হয় নাই করলেন, চোখটা না হয় নাই ফিরিয়ে রইলেন, না হয় একবার আহা-উহু-ই বললেন, যেচে একটু এগিয়ে এলেন, হাতটি বাড়ালেন—(থলের দিকে দেখিয়ে) এই মৃতের সৎকারে। কারণ এই ধূসর শ্বাসরোধকারী সভ্যতার জগতে ভদ্রমহোদয়গণ, হে ভদ্রমহিলাগণ, আজকের এই ভীষণ করাল সুন্দর রক্তরাঙা আকাশের, আগুনের হলকার এই যুগসন্ধিক্ষণে, আসুন, আমরা সকলে মিলে এগোই, একটু আগ্রহ দেখাই, হোক না এতটুকু আগ্রহই, একেবারে আধ ইঞ্চির পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ পুঁচকে আগ্রহ একটা—অন্তত আসুন, (থলেটার দিকে দেখিয়ে) এমন একটা মৃত্যুতে একটু ব্যথিত হই, সত্যিকারেরর ব্যথায়। এবং আমার মতো অপদার্থ কী আপনাদের বলতে পারে বলুন ভদ্রমহোদয়গণ, হে ভদ্রমহিলাগণ, জানেনই তো, সত্যিকারের ব্যথাটা বাদ দিয়ে কাব্য হয় না, নাটক হয় না—আর কাব্য বা নাটক তো শালা-বাঞ্চোৎ, চুলোয় যাক, জীবনটাই আসল—সেই ব্যথাটা বাদ দিলে জীবনটাও হয় না। শুধু হয় না-ই বা কেন, নইলে মনুষ্যত্বের সমূহ বিনাশ। (ভাব পরিবর্তন করে) যাকগে, পুরুত চাই, পুরুত চাই, পুরুত চাই, চেঁচাতে পারি, কিন্তু জানি, কোনো শালা আসবে না। না-না, আপনাদের বলছি না, আপনারা কেন আসবেন, আপনারা তো নাটক দেখতে এসেছেন—কিন্তু অন্য কেউ তো আসতে পারত। (হতাশার ভঙ্গীতে) আসবে না স্যার, আসবে না. পুরুত হবে না, মন্ত্র পড়বে না, গঙ্গাজল ছিটোবে না—আর তা করবে না বলেই যুগসন্ধিক্ষণের এমন একটি অসাধারণ অপরিহার্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান হতে পারবে না। তাই পৃথিবী রসাতলে যাবে—ঐ চলেছে, দেখছেন, ঐ পড়ল বলে অতল গর্তে। (চীৎকার করে) কেল্লা ফতে, কেল্লা ফতে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল (ধেই ধেই নৃত্য)। (হঠাৎ গম্ভীর হয়ে) কিন্তু এত সহজে পিছপাও হওয়ার মক্কেল তো আমি নই—আমাকে আপনারা চেনেন না স্যার, আমার নাম বটুকলাল বটব্যাল, ওরফে বোঁচা—খেতে পাই না তো পাই না, রোজগার দুই

নয়া তো দুই নয়া, পাঁচ নয়া তো পাঁচ নয়া, তবু আমি একাই কিছু কম একশো নই। আমার ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, আমি নিধিরাম সর্দার। শালা পুরুত হবে না, আসবে না, নাই এলি—ব্যাটা, যেখানে আছিস, থাক বসে, বসে আঙুল চোষ—আমি তোর থোড়াই তোয়াক্কা করি। পুরুত? আমি হব, এই বোঁচা হবে—নিজেই নিজের নাম দেব—পঞ্চানন পঞ্চতীর্থ কিম্বা বৃন্দাবন বিদ্যাদিগ্‌গজ, তখন? আর পুরুতের সময় তো এখনো ঢের রয়েছে রে বাবা, সেই শ্মশানে দরকার, তার আগে তো নয়। এ-মুহূর্তে যেটা দরকার, সেটা এক নয়, দুই নয়, চার-চারটে বাহকের, কারণ (থলেটাকে দেখিয়ে) এ-ব্যাটাকে তো আগে শ্মশান পর্যন্ত বহন করতে হবে—প্রথামতো, হ্যাঁ বাবা, এসব ব্যাপারে আমি প্রথার বড্ড ভক্ত, মৃতকে সম্মান দিতে হবে—নইলে ভারী আর এমন কী, আমি তো একলাই নিয়ে যেতে পারি। অনায়াসেই। অবশ্য শক্তিতে কুলোবে তো? কারণ ক-ঘণ্টা আগে পেটে শেষ কিছু পড়েছে জানি না—নাই জানলাম। না-না-না, তবু মৃতকে সম্মান দিতে হবে, চারটে বাহকই চাই—(দর্শকের দিকে হাতজোড় করে) হুজুর, আমার মা-বাপ, আকাশ-বাতাস সাক্ষী, আমি অকৃতার্থ, অধমের অধম, এবং আমি একটা লোক, তবু সেই চারটে বাহকই হব একসঙ্গে। কী করে? এই দেখুন না। কিন্তু চারটে নাম তো ঝটপট চাই—না-না, আপনারা কিছু বলবেন না, আমিই নাম ঠিক করে দিচ্ছি, অভিনয় তো আমাকেই করতে হবে, কী বলুন? ধরুন, চারজনের একজন তো আমি নিজেই··· অর্থাৎ বোঁচা। দ্বিতীয়জনের নাম ধরুন····(ভেবে) খোঁচা। তৃতীয়জন ধরুন···· (ভেবে) প্যাঁচা। আর চতুর্থজন ধরুন····(ভেবে) পেঁচো। (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে) যাক, একটা সমস্যার সমাধান অন্তত হল, চারজনের নাম তাহলে যথাক্রমে বোঁচা, খোঁচা, প্যাঁচা এবং পেঁচো। কেল্লা ফতে (সানন্দে চীৎকার) কেল্লা ফতে (গম্ভীর হয়ে) কিন্তু পার্থক্যটা করছেন কেমন করে আপনারা? খুব সহজ—গলার স্বরে। এই দেখুন, এই-যে আমার স্বাভাবিক গলাটা শুনছেন না, এই গলায় বললে বুঝবেন আমি বলছি, অর্থাৎ বোঁচা বলছে। আর যদি এই গলায় বলি, (মিহি স্বরে) "আমার নাম খোঁচা, হ্যালো-হ্যালো-ওয়ান-টু-

থ্রি-ফোর”—তখন বুঝবেন খোঁচা বলছে। আবার যখন শুনবেন, (একটু ভারী গলায়) “আমার নাম প্যাঁচা, হ্যালো-হ্যালো-ওয়ান-টু-থ্রি-ফোর”—বলা বাহুল্য, সেটা প্যাঁচা, নির্ঘাৎ প্যাঁচা। এবং সবশেষে যখন শুনবেন, (বেশ ভারী গলায়) “আমার নাম পেঁচো, হ্যালো-হ্যালো-ওয়ান-টু-থ্রি-ফোর”, বুঝবেন পেঁচো বলছে, বুঝবেন তো? হুজুর, আমার মা-বাপ, আকাশ-বাতাস সাক্ষী, এবার আরম্ভ হচ্ছে একদিকে যেমন আপনাদের কল্পনাশক্তির পরীক্ষা, অন্যদিকে তেমনি পরীক্ষা আমার কপালের আর অভিনয়ের হাতযশের। ভুল যদি হয়—হয়তো হবেই, কারণ আমি অকৃতার্থ, অধমের অধম—তো নিজ-গুণে মার্জনা করবেন। তবু ভুলচুক যাতে কম হয়, আরেকবার রিহার্সালটা হয়ে যাক—কী বলেন? এই দেখুন, এটা আমার স্বাভাবিক গলা, এ-গলায় বললে বুঝবেন বোঁচা বলছে, মানে আমি বলছি। আর খোঁচার গলা? (মিহি স্বরে) “আমার নাম খোঁচা, ইত্যাদি-ইত্যাদি-ইত্যাদি”। এবার শুনুন প্যাঁচা বলছে, (একটু ভারী গলায়) “আমার নাম প্যাঁচা, ইত্যাদি-ইত্যাদি-ইত্যাদি”। সবশেষে পেঁচোর কণ্ঠস্বর, (বেশ ভারী গলায়) “আমার নাম পেঁচো, ইত্যাদি-ইত্যাদি-ইত্যাদি”। এবার শুরু, এঁ্যা? রেডি-স্টেডি-গো। (হঠাৎ থেমে, কী ভেবে) ওঃ, দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনাদের ধৈর্যকে এতখানি ট্যাক্সো করা কি উচিত হবে? তার চেয়ে বরং একটা সহজ পন্থা বাতলাই, এঁ্যা? দেখুন, আমিই নিজেকে চারটে লোক করে ফেলছি, সশরীরে। সব ম্যাজিক পারি হুজুর, শুধু একবার দেখাতে দিন (সেলাম ঠোকে)। অতএব আমি তো বোঁচা, আমি তো রয়েছিই, দেখুন আমার থেকেই কী করে বেরিয়ে আসে খোঁচা-প্যাঁচা-পেঁচো। (চেঁচিয়ে) এই শালা খোঁচা-প্যাঁচা-পেঁচো, বেরিয়ে আয়, আয় বলছি। (মন্ত্রের মতো) আয়-আয়-আয়-আয়-আয়-আয়-আয়....

[মঞ্চে আলো ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে, ছায়া মূর্তির মতো বোঁচা নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ একেবারে যেন তার মধ্য থেকেই একে একে খোঁচা-প্যাঁচা-পেঁচো বেরিয়ে আসে লাফ মেরে। সেই অতি অল্প আলোয় মনে হয়, সকলেই যেন হুবহু বোঁচারই মতো

দেখতে—পোষাকও একই। যতক্ষণ এদের সকলকে মঞ্চের উপর দেখা যাবে, আলো খুব ক্ষীণই থাকবে। বোঁচা সহসা সিদ্ধান্ত নেয়, প্রথম কথা বলে।]

বোঁচা। হ্যাঁ রে খোঁচা!

খোঁচা। কী রে বোঁচা!

বোঁচা। হ্যাঁ রে প্যাঁচা!

প্যাঁচা। কী রে বোঁচা!

বোঁচা। হ্যাঁ রে পেঁচো!

পেঁচো। কী রে কেঁচো—এই থুড়ি, কী রে বোঁচা!

বোঁচা। এই শালা, আমায় কেঁচো বললি কেন?

পেঁচো। মাপ করে ফেল ভাই, নামে কী আসে যায়?

বোঁচা। মাপ করলাম। হ্যাঁ রে খোঁচা-প্যাঁচা-পেঁচো, এবার হিসেবনিকেশটা করে ফেলা যাক?

খোঁচা। করে ফেলা যাক।

বোঁচা। আমি দলপতি—মেনে নেওয়া যাক?

প্যাঁচা। মেনে নেওয়া যাক।

বোঁচা। উত্তম, সর্বপ্রথমে তা হলে পজিশনটা ঠিক করে নেওয়া যাক?

পেঁচো। ঠিক করে নেওয়া যাক।

খোঁচা। কিসের পজিশন?

বোঁচা। বা রে, কে কোথায় দাঁড়াবে, সেই পজিশন—মৃতকে বহন করতে হবে না? কারা থাকবে মাথার দিকে, কারা থাকবে পায়ের দিকে?

খোঁচা। কিন্তু আগে একটা খাটিয়া-ফাটিয়া কিছু আসুক, আনো।

বোঁচা। ফচকেমি করবি নে খোঁচা—হ্যাঁ, বলে দিলাম, আমি দলপতি। খালি কথায় কথা বাড়ায়। খাটিয়া এসে যাচ্ছে, কিন্তু তার আগে পজিশনটা ঠিক করে নিতে হবে না? যাকগে শোনো—খোঁচা, তুমি খাটিয়ার ডান পায়া ঘাড়ে করছ, মাথার দিকে।

খোঁচা। আমার আবার বাঁ ঘাড়টা হঠাৎ একটু টনটন করছে ভাই—ডান পায়াটা দিস নে, লক্ষ্মী ভাই, দিস নে।

বোঁচা। চোপরাও শালা, আবার কথার উপর কথা বলছে, একটি থাপ্পড়ে তোমার ঘাড়ের টনটনানি শেষ করে দেব। যা বলছি তাই করবি,

আমি দলপতি না? অর্ডার ইজ অর্ডার। (সহসা ভাব পরিবর্তন করে ও দর্শকদের দিকে হাতজোড় করে) ক্লাস সেভেন পর্যন্ত বিদ্যে হুজুর, তবু ইংরাজীটাও একটু-আধটু বলতে পারি—ভুল যদি হয়, নিজগুণে মার্জনা করবেন। (আবার আগের ভাবে ফিরে গিয়ে) অতএব খোঁচা, তোমার ঘাড়ে ডান পায়া, মাথার দিকে।

খোঁচা। বেশ।

বোঁচা। আমি নিচ্ছি বাঁ পায়া, মাথার দিকেই। আর তুই প্যাঁচা, তুই নিচ্ছিস পেছনের পায়া, বাঁ দিকের।

প্যাঁচা। আমারো ঘাড়টা একটু....

বোঁচা। (চেঁচিয়ে) আবার? অর্ডার ইজ অর্ডার। এবং পেঁচো?

পেঁচো। বল ভাই।

বোঁচা। তোর ঘাড়ে ডান পায়া, পেছনের।

পেঁচো। বেশ।

বোঁচা। ব্যস, পজিশনটা হয়ে গেল, এবার বলো-হরি হরিবোল-এর একটা রিহার্সাল হয়ে যাক। চেঁচিয়ে বল, এই আমার মতো করে, (চেঁচিয়ে) বলো-হরি-হরিবোল।

খোঁচা। বলো-হরি-হরিবোল।

প্যাঁচা। বলো-হরি-হরিবোল।

পেঁচো। বলো-হরি-হরিবোল।

বোঁচা। বাঃ, পার্ফেক্ট। এখন আমাদের কর্মসূচীর দ্বিতীয় আইটেমটা ঝটপট সেরে নেওয়া যাক। হ্যাঁ রে খোঁচা, (থলেটার দিকে দেখিয়ে) এ-ব্যাটার কী নাম দেওয়া যায় বলতো? সনাক্ত করতে হবে তো—পুরুত আসবে, মন্ত্র পড়বে।

খোঁচা। খোঁচাই দিয়ে দে।

বোঁচা। দুর ব্যাটা, সেটা তো তোর নাম হয়ে গেল।

খোঁচা। তাতে আর কী—কারণ দশা তো সমানই, ও না হয়ে আমিও তো হতে পারতাম।

বোঁচা। না-না, তা চলবে না, অন্য নাম চাই। তুই কী বলিস প্যাঁচা?

প্যাঁচা। প্যাঁচাটাই বেশ তো।

বোঁচা। দুর গাধা, সেটাও তো তোর নাম হয়ে যাচ্ছে।

প্যাঁচা। তাতে আর কী, ওর আর আমার একই দশা, ও না হয়ে আমিও হতে পারতাম।

বোঁচা। তোরা তো মহা ঝামেলায় ফেললি দেখছি—না-না-না, অন্য নাম চাই। এই পেঁচো, এবার তুই একটা নাম বল।

পেঁচো। আমি বলি কি, পেঁচো নামটাই সবচেয়ে ভালো।

বোঁচা। (হতাশের ভঙ্গীতে) ওঃ, তুমিও তোমার নামটাই দেবে ?

পেঁচো। তাতে আর কী, ওর দশায় আমি প্রায় পৌঁছে গেলাম বলে, ও না হয়ে আমিও তো হতে পারতাম।

বোঁচা। এ তো একটা অসহ্য অবস্থার সৃষ্টি করলে দেখছি। আচ্ছা বেশ, আমিই নাম ঠিক করে দিচ্ছি। (একটু ভেবে) হ্যাঁ, খোঁচা-প্যাঁচা-পেঁচো, এ-বিষয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে একমত, সম্পূর্ণ একমত যে ওর অবস্থাটার সঙ্গে আমাদের অবস্থাটার বিশেষ একটা তারতম্য নেই, অর্থাৎ ওর যা হয়েছে, আমাদেরও সেটা হতে পারত, খুবই হতে পারত—এমন-কি, আজো যে হয়নি, সেইটেই আশ্চর্য। অতএব এমন একটা নাম রাখা যাক, যে-নামটার সঙ্গে আমাদের সকলের নামের মিল আছে—এই ধর····ওঁচা, কেমন লাগে ?

খোঁচা। ওঁচা ? না-না-না-না-না।

প্যাঁচা। না-না-না-না-না।

পেঁচো। না-না-না-না-না।

বোঁচা। (ভেঙিয়ে) কেন না-না-না-না-না ?

খোঁচা। সারাটা জীবন তো ওর ওঁচা ভাবেই কাটল।

প্যাঁচা। এখন মরণের পরেও বেচারাকে ওঁচা বলে অসম্মান করা ? আর সেটা আমরাই করব, আমাদের দশা যখন ওরই মতন ?

পেঁচো। বেচারা মরে গেছে, এখন কিছু সহানুভূতি তো ওর প্রাপ্য, অন্তত আমাদের কাছ থেকে।

বোঁচা। (চিন্তিতের ভাবে) হ্যাঁ, কথাটা ঠিক বটে। বেশ, (ভেবে) তবে মোচা নাম দেওয়া যাক—পছন্দ ?

খোঁচা। পছন্দ।

প্যাঁচা। পছন্দ।

পেঁচো। পছন্দ।

খেঁাচা। উত্তম, এখন নামটা দুয়েকবার আউড়ে নেওয়া যাক, যাতে শ্মশানে গিয়ে ভুলে না যাই বা পুরুত ঠাকুরকে অন্য কোনো নাম না দিয়ে বসি। বল খেঁাচা, এই আমার মতো করে, (থলেটার দিকে দেখিয়ে) বেঁাচা তোর নাম দিল মোচা।

খেঁাচা। (থলেটার দিকে দেখিয়ে) খেঁাচা তোর নাম দিল মোচা।

প্যাঁচা। (থলেটার দিকে দেখিয়ে) প্যাঁচা তোর নাম দিল মোচা।

পেঁচো। (থলেটার দিকে দেখিয়ে) পেঁচো তোর নাম দিল মোচা।

বেঁাচা। উত্তম, অতি উত্তম। আমাদের কর্মসূচী চমৎকার এগোচ্ছে, ঠিক টাইম মতো। এখন খেঁাচা-প্যাঁচা-পেঁচো, (থলেটার দিকে দেখিয়ে) এই থলেটায় কী আছে বলে দাও, কী নিয়ে এত কাণ্ড জানিয়ে দাও, (দর্শকদের দেখিয়ে) সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর ধৈর্যের পরীক্ষা শেষ হোক। বল খেঁাচা, কী আছে থলেটায় ?

খেঁাচা। একটা কুকুরের মৃতদেহ।

বেঁাচা। ঠিক ঠিক উত্তর দে। খেঁাচাটাকে নিয়ে আর পারি না—আচ্ছা তুই বল প্যাঁচা, মৃতদেহটি কুকুরের না কুকুরছানার ?

প্যাঁচা। ঠিক ছানা নয়, তবে অল্প বয়সী এক কুকুরের।

বোঁচা। কী রঙের ?

প্যাঁচা। (ভেবে) হলদেটে হবে।

বোঁচা। পোষা না রাস্তার ? তুই বল খেঁাচা।

খেঁাচা। রাস্তার। (হেসে ফেলে) হে-হে, ঠিক এই আমাদের মতো।

বোঁচা। চুপ কর! মরল কেন ?

প্যাঁচা। না খেতে পেয়েই হবে।

পেঁচো। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় না খেতে পেয়ে।

খেঁাচা। ও-মৃত্যু বাবা ও-ছাড়া হয় না, দেখেই চেনা যায়। (হেসে ফেলে) হে-হে, প্রায় আমাদেরই দশা।

বোঁচা। আবার ? (হেসে) আচ্ছা, আমরা কি শালাকে আগে কখনো দেখেছি ?

খেঁাচা। দেখিনি।

বোঁচা। তবে এত সব বলছিস কী করে ?

খেঁাচা। (হেসে ফেলে) হে-হে, সহজেই অনুমান করা চলে।

প্যাঁচা। সহজেই করা চলে।

বোঁচা। তো বেশ তো, কিন্তু ওর সৎকার আমরা করতে যাব কেন ?

খোঁচা। কেন করব না ?

বোঁচা। কেন করব ?

পেঁচো। আমরাই তো করব।

বোঁচা। কিন্তু কেন, কেন করব ?

প্যাঁচা। বা রে, আমরা যে ওর জ্ঞাতি-ভাই, ওর সৎকার আমরা না করলে কে করবে ?

খোঁচা। কারণ আমরাও তো খেতে পাই না।

পেঁচো। কারণ, আমরাও তো ঐরকম দুর্বল জীর্ণ হয়ে এ্যানিমিয়ায় ভুগতে ভুগতে, ধুঁকতে ধুঁকতে, মুখ থুবড়ে একদিন থপ করে পড়ে যাব—ঐরকমই রাস্তার ওপর চিৎপটাং, চোখ কপালে, মুখে মাছি ভন ভন, প্রাণ-পাখি খাঁচা ভেঙে উধাও।

বোঁচা। ওঃ-হো-হো (হাসিতে ফেটে পড়ে), কেল্লা ফতে, কেল্লা ফতে।

খোঁচা। আর তখন আমাদেরও সৎকার করবে এই রকমই কোনো জ্ঞাতি-ভাই এসে, যে আমাদেরই মতো খেতে পায় না—ভাই যদি ভাইকে না দেখে....

প্যাঁচা। তো কী করে চলে ?

পেঁচো। কী করে চলে ?

বোঁচা। আচ্ছা বেশ, বুঝলাম, কিন্তু কুকুরটা পড়ে ছিল কোথায় ?

খোঁচা। ঐ তো, রাস্তায়, মোড়ের ঐ আবর্জনার গাদার ওপর।

প্যাঁচা। ঐ ডাবের খোলা, কলাপাতা, মিত্তিরদের গিন্নীর বদহজমের বমি আর কাগজে সযত্নে মোড়া নোংরা রক্ত-মাখা ন্যাকড়া....

পেঁচো। ওঃ-হো-হো....

বোঁচা। (আনন্দে চেঁচিয়ে) ওঃ-হো-হো, কেল্লা ফতে ..

খোঁচা। আর তারই পাশে খানিকটা দুর্গন্ধ ভিজে-স্যাঁৎসেতে খড়ের গাদি, সেটার ওপর শুয়ে শেষ নিদ্রা দেয় ব্যাটা।

প্যাঁচা। তবু একদিন শরতের আকাশকে অভিনন্দন করেছে....

পেঁচো। যেমন আমরাও একদিন করেছি...

খোঁচা। কিঁউ কিঁউ করে ডেকেছে...

প্যাচা। যেমন আমরাও একদিন করেছি ··

পেঁচো। লেজ নেড়েছে····

খোঁচা। যেভাবে আমরা এখন হাত নাড়ছি (হাত নাড়ে)····

প্যাচা। তবু কিছুতেই কিছু হল না, আর পারল না বেচারা····

পেঁচো। যেমন আমরাও একদিন আর পারব না।

বোঁচা। অথচ এত বড় শহরে খাওয়ার মতো কিছু মিলল না? এত বড় বড় বাড়ি, গগনচুম্বী অট্টালিকা, লেকের ধারে কত ঘাস, কী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রান্তর, এত ফুটপাথ, গাড়ি-ঘোড়া-ট্রাম-মোটর-বাস, নুড়ি-কয়লা-গাছ-পাথর-ইঁট, এগুলোকে কি খাওয়া চলে না, দাঁত দিয়ে চিবনো চলে না?

খোঁচা। চলে না, চলে না, চলে না।

বোঁচা। টাটা নাকি আবার একটা প্রকাণ্ড বাড়ি তুলছে····

খোঁচা। টাটা না বিড়লা····

প্যাচা। বিড়লা না ঢনঢনিয়া····

পেঁচো। ঢনঢনিয়া না খনখনিয়া····

বোঁচা। খনখনিয়া না তনমনিয়া····

খোঁচা। তনমনিয়া না তনুমনু ··

প্যাচা। তনুমনু না অনু নামক সুন্দরী রমণীর তনু····

পেঁচো। বুকে দুটি····ওঃ-হো····

বোঁচা। পেলে একবার····ওঃ-হো····

খোঁচা। নরম-নরম গরম-গরম····

প্যাচা। ধবধবে ফর্সা দুটি থাম ··

পেঁচো। অন্ধকারে জাপটে ধরে হাম ··

বোঁচা। (সানন্দে চেঁচিয়ে) কেল্লা ফতে, কেল্লা ফতে। (হঠাৎ দর্শকদের প্রতি, হাতজোড় করে) হুজুর, আমার মা-বাপ, আকাশ-বাতাস সাক্ষী—দেখুন কী কথার থেকে কী কথা এসে পড়ল, মনের ভেতর থেকে কী সব সাপ ব্যাঙ বেরোতে শুরু করেছে হুজুর! হুজুর, আমরা বড় অভাজন, খেতে পাই না, মেয়ে নিয়ে শুতেও পাই না—আমাদের তাই দুটো প্রধান চিন্তা, একটা পেটের, আরেকটা····(জিভ কেটে) ছি-ছি-ছি-ছি-ছি, আপনাদের সামনে এমন কথা কি

উচ্চারণ করা যায়? আমার মা-বাপ, নিজগুণে মার্জনা করবেন। (আগের ভাবে ফিরে গিয়ে) এই শালা খোঁচা-প্যাঁচা-পেঁচো, খবরদার, আর খিস্তি নয়। এবার আমাদের কর্মসূচীর তৃতীয় আইটেমটা, ঝটপট। (চেঁচিয়ে) তৃতীয় আইটেম!

খোঁচা। তৃতীয় আইটেম!

প্যাঁচা। তৃতীয় আইটেম!

পেঁচো। তৃতীয় আইটেম!

বোঁচা। (থলেটার দিকে দেখিয়ে) এবার শালাকে নিয়ে চল শ্মশানে, আর সময় নষ্ট নয়। (হঠাৎ ভেবে) ওঃ, ফুলের মালাটা? দে-দে-দে, ভালো করে জড়িয়ে দে থলেটার ওপর। দাঁড়িয়ে দেখছিস কী বাঁদরগুলো? এই খোঁচা!

[খোঁচা বাসি গাঁদাফুলের মালাটা তুলে নেয়, সযত্নে রাখে থলেটার ওপর।]

প্যাঁচা। কিন্তু খাটিয়া? খাটিয়া তো এল না।

বোঁচা। আসবে। (ধমকের স্বরে) আবার কথা? আমি দলপতি না? আর হ্যাঁ, ব্যাটার মুখেও তো কিছু দিতে হয়।

পেঁচো। কী দিতে হয়?

বোঁচা। এই কিছু খাবার-টাবার?

খোঁচা। কিন্তু শালা মরে গেছে তো, খাবে কী?

বোঁচা। আ-হা-হা, সারা জীবন খেতে পায়নি, এখন এই শেষ যাত্রায় কিছু খাবার অন্তত সঙ্গে যাক, অন্তত মুখে লেগে থাকুক।

খোঁচা। তা বেশ।

প্যাঁচা। উত্তম প্রস্তাব।

পেঁচো। অতি উত্তম।

বোঁচা। (চারদিকে তাকিয়ে) কিন্তু খাবার পাচ্ছি কোথায়?

খোঁচা। পেলে তো নিজেরাই খেতাম।

প্যাঁচা। মনেই নেই, কখন যে শেষ কিছু পেটে পড়েছে।

পেঁচো। (লাফিয়ে উঠে, আনন্দে) হ্যাঁ, মনে পড়েছে. কাল খেয়েছি পুঁইশাকের চচ্চড়ি।

বোঁচা। (হঠাৎ দোকানের সাইনবোর্ডটা দেখে) এই তো একটা দোকান

দেখছি, মিষ্টির দোকান।

খোঁচা। কিন্তু শালা বন্ধ যে।

প্যাঁচা। শালা রোববার যে।

পেঁচো। শালার গভর্নমেণ্ট রোববারে সব বন্ধ করে দেয় যে।

বোঁচা। পেছনে দরজা নিশ্চয়ই আছে, লুকিয়ে-চুরিয়ে বিক্রি তো করেই—সব শালা যুধিষ্ঠিরকে জানা আছে।

খোঁচা। কিন্তু আমাদের বিক্রি করবে কেন?

প্যাঁচা। আমাদের তো পয়সা নেই।

পেঁচো। আমাদের যে কিস্সু নেই।

বোঁচা। ছাখ না কী করি, আমায় ফলো কর। আঃ, একটা লাল-কাল রোমালও যদি থাকত!

প্যাঁচা। রোমাল?

খোঁচা। (জোরে হেসে) হেঃ-হেঃ-হে, আবার রোমাল চায়!

পেঁচো। পরনের কাপড় জোটে না, আবার রোমাল!

বোঁচা। আ-হা-হা, মূর্খ কোথাকার, একটা ঝাণ্ডা-ফাণ্ডার মতো কিছু....অন্তত সেরকম দেখতে....যাকগে, মাথায় বুদ্ধি এসে গেছে। হাঁ-হাঁ-ব্বাবা, আমি বটুকলাল বটব্যাল ওরফে বোঁচা, অত সহজে পিছপা হওয়ার মক্কেল নই। এই শালা খোঁচা-প্যাঁচা-পেঁচো, আমায় ফলো কর।

[বোঁচা দোকানের দিকে এগিয়ে যায়, অন্য-তিনজন তাকে অনুসরণ করে। বোঁচা ও তার দেখাদেখি অন্য তিনজন দোকানের বন্ধ দরজায় দমাদম ধাক্কা মারতে থাকে—দরজার একটু অংশ অল্প খোলে, দোকানের কাউকে দেখা যায় না।]

বোঁচা। (চেঁচিয়ে, হাত উঁচিয়ে) লাল সেলাম!

খোঁচা। (একই ভঙ্গীতে) লাল সেলাম!

প্যাঁচা। (একই ভঙ্গীতে) লাল সেলাম!

পেঁচো। (একই ভঙ্গীতে) লাল সেলাম!

বোঁচা। পার্টির ফাণ্ডে কিছু দিন। না-না, পয়সা নয়—আচ্ছা পয়সাও দিন। আর কিছু মিষ্টি দিন।

[খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে একটা হাত বেরোতে দেখা যায়, হাতে একটা মুদ্রা ও কিছু মিষ্টি। মুদ্রাটা বোঁচা পকেটস্থ করে, মিষ্টিটা হাতে নেয়, পরে মঞ্চের মধ্যভাগে আবার ফিরে আসে—অন্য তিনজন তাকে অনুসরণ করে। দোকানের দরজা বন্ধ হয়।]

বোঁচা। একটা রসমুণ্ডি। (হাসি) হোঃ-হোঃ-হো, (চেঁচিয়ে) কেল্লা ফতে।

খোঁচা। কেল্লা ফতে, কেল্লা ফতে।

প্যাঁচা। কেল্লা ফতে।

পেঁচো। কিন্তু রসমুণ্ডি? কুকুরকে?

বোঁচা। চোপরাও শালা, কলকাতার কুকুরে সব খায়।

খোঁচা। আমরা সব খাই।

প্যাঁচা। আর, সারা জীবন খেতে পায়নি যে—তার আবার অত বাছবিচার কেন?

পেঁচো। আমাদের কোনো বাছবিচার নেই।

বোঁচা। (থলের কাছে গিয়ে, থলের ভিতর হাত ঢুকিয়ে) সোনা আমার, মানিক আমার, এই এক কণা মিষ্টি তোর ঠোঁটে লাগিয়ে দিই—এ্যাঁ? না-না, সবটা দেব না, আমরাও তো একটু একটু খাব।

খোঁচা। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমরাও তো খাব।

প্যাঁচা। (চোখ মুছতে মুছতে) আমার কিন্তু ভাসানের দুগগাঠাকুর মনে পড়ে

পেঁচো। তোর বাপ বুঝি পুজো করত?

বোঁচা। তোদের বাড়িতে বুঝি নাটমন্দির ছিল?

খোঁচা। চোদ্দপুরুষে ছিল?

প্যাঁচা। না, কলকাতায় কত পুজোতেই তো দেখেছি। পাড়ার মেয়েরা কেঁদে কী গড়াগড়িই না যায়, ঠাকুরের ঠোঁটে নারকেল নাড়ু ছুঁইয়ে দেয়, কেঁদে কেঁদে বলে, আবার আসিস মা!

বোঁচা। (কাঁদো-কাঁদো স্বরে, থলের প্রতি হাত জোড় করে) আবার আসিস মা!

খোঁচা। (একই ভঙ্গীতে) আবার আসিস মা!

প্যাঁচা। (একই ভঙ্গীতে) আবার আসিস মা!

পেঁচো। (একই ভঙ্গীতে) আবার আসিস মা!

[নেপথ্যে দুর্গাপূজার ঢাকীর বাজনা শোনা যায়, কাঠির বোল বলছে, "ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন"। মঞ্চের উপরে চারজন নৃত্য সুরু করে।]

বোঁচা। (নাচতে নাচতে) ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন।

খোঁচা। (নাচতে নাচতে) ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন।

প্যাঁচা। (নাচতে নাচতে) ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন।

পেঁচো। (নাচতে নাচতে) ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন।

বোঁচা। (হঠাৎ নাচ থামিয়ে) এই শালা, এভাবে সময় নষ্ট করলে চলবে? (চেঁচিয়ে) নেক্সট্ আইটেম!

খোঁচা। নেক্সট্ আইটেম!

প্যাঁচা। নেক্সট্ আইটেম!

পেঁচো। নেক্সট্ আইটেম!

বোঁচা। (মুখ কাঁচুমাচু করে) কিন্তু বুঝলি শালা, ইতিমধ্যে বড্ড পেচ্ছাব পেয়ে গেল যে।

খোঁচা। (কাঁদো-কাঁদো স্বরে) আমারও পেয়েছে।

প্যাঁচা। (একই ভাবে) আমারও।

পেঁচো। (একই ভাবে) আমারও।

বোঁচা। তবে করে ফেলি? এইখানেই?

খোঁচা। আবার কি?

প্যাঁচা। শালা কলকাতা কর্পোরেশনের জল কলকাতা কর্পোরেশনকে ফিরিয়ে দিই।

পেঁচো। ঋণ শোধ।

[চারজনে মঞ্চের বিভিন্ন কোণে গিয়ে দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ায়, প্যাণ্টের বোতাম খোলার ভঙ্গী করে। হঠাৎ দর্শকদের প্রথম সারি থেকে কোনো যুবতীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়।]

যুবতী। (খুব চেঁচিয়ে নয়) রাবিশ!

[বোঁচা ও অন্য তিনজন সঙ্গে সঙ্গে সচকিত হয়ে মুখ ঘোরায়।]

বোঁচা। (দর্শকদের দিকে চেয়ে) কেউ কিছু বলছেন?

যুবতী। (আসনে বসেই, চেঁচিয়ে) বলছি, রাবিশ!

বোঁচা। (একটু থতমত খেয়ে, পরে এগিয়ে এসে ও উল্লাসে চেঁচিয়ে) ওঃ-হো-

হো, কেল্লা ফতে, কেল্লা ফতে। (গম্ভীর হয়ে, যুবতীকে) তো এতই যদি দয়া করলেন, একবার মঞ্চের উপর উঠে আসবেন? আসুন, আসুন না, আপনার বক্তব্যটা বলুন—ভারী চমৎকার জমেছে আজ। এই খোঁচা-প্যাঁচা-পেঁচো, এবার কেটে পড়ো ঝটপট, উধাও হও—হু··· স, হুস করে উধাও হও।

[ছায়ামূর্তির মতো একে-একে খোঁচা-প্যাঁচা-পেঁচো সেই অল্প আলোয় উধাও হয়। মঞ্চে আবার আলো ফুটে ওঠে।]

বোঁচা। (যুবতীকে, হাতজোড় করে) কই, আসছেন না তো? আসুন!

[যুবতী দ্বিধান্বিত পদক্ষেপে ওঠে, সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চের উপর এসে হাজির হয়। দেখেই বোঝা যায়, ক্রুদ্ধা নাগিনীর মতো সে ভিতরে ভিতরে ফোঁস ফোঁস করছে—অথচ লোকের সামনে বিড়ম্বনার ভাবও স্পষ্ট, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।]

বোঁচা। বাঃ, এই তো চমৎকার হয়েছে। (উপরে মাথা তুলে, মঞ্চের কোণের দিকে তাকিয়ে ও চেঁচিয়ে) আলো, আলো, আরেকটু আলো। কী মশাই, আপনাদের মঞ্চে একবার দাঁড়াতে দিয়েছেন বলে কি মাথা কিনে নিয়েছেন? [প্রখর আলো ফুটে ওঠে মঞ্চে, বিশেষত যুবতীর মুখের উপর পড়ে।] বাঃ, ঠিক এই চেয়েছিলাম, আপনারা পার্ফেক্ট দাদা! (যুবতীর দিকে চেয়ে, বিস্ময়ে) আঃ, মরি মরি, কী সুন্দর দেখতে গো আপনাকে, কী চমৎকার সেজেছেন!

যুবতী। (ঘৃণার সঙ্গে) শাট আপ!

বোঁচা। এত রাগ কেন বলুন তো? কী করেছি?

যুবতী। (রাগে কথা আটকে যায়) আপনার····আপনার লজ্জা করে না?

বোঁচা। (হেসে ফেলে) এই দেখুন, কথাটা বলেই লজ্জা দিলেন। কারণ জানেন, লজ্জাটা একটা প্রকাণ্ড বিলাস, সেটা একমাত্র আপনাদের মতো সুখী ভদ্র ঘরেরই নিজস্ব সম্পত্তি। না-না, লজ্জা করতে যাব আমরা? এত বড় আস্পর্ধা?

যুবতী। অবশ্য আপনার সঙ্গে কথা বলে তো কোনো লাভ নেই, ইউ আর জাস্ট এ নো-বডি, একজন অভিনেতা, এই মাত্র। কথা বলা উচিত নাট্যকারের সঙ্গে, যে-ভদ্রলোক এমন একটা জঘন্য নাটক লিখতে পেরেছেন। আর কথা বলা উচিত প্রযোজকের সঙ্গে, যিনি এমন একটা নাটক মঞ্চে

নামিয়েছেন।

বোঁচা। কেন অযথা সময় নষ্ট করবেন, আপনার মহামূল্য সময়। একটু ধৈর্য ধরে আমার কথাটা শুনবেন? এ-নাটক কেউ লেখেনি, কেউ প্রযোজনাও করেনি। আর আমি কোনো অভিনেতাও নই, অন্তত অভিনেতা বলতে আপনারা যা বুঝে থাকেন। আর জানেন, মঞ্চেও এর আগে কখনো নামিনি—এই প্রথম। বলেইছি তো, আমি বটুকলাল বটব্যাল, ওরফে বোঁচা, আমার চাল নেই, চুলো নেই, রাস্তায় রাস্তায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াই, হাত-পা ছুঁড়ি—লোক জমে যায়, লোক জমানো কিছু শক্ত নয় এই শহরে, আর তা করে যা দু-এক পয়সা পাই, পেট চলে যায়। অবশ্য তাতেও সব সময় চলে না, আসলে অনেক সময়ই চলে না। (যুবতীকে অধীর হতে দেখে) দাঁড়ান দাঁড়ান, শেষ করতে দিন। আজ কী হল জানেন? বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে গেল। এই-যে থিয়েটারটা দেখছেন না, এরই কোনো কর্তাব্যক্তি সেদিন আমায় রাস্তায় পেয়ে বলে বসলেন, "এই, অমুক দিন অমুক সময় আমাদের মঞ্চে কিছু করবে? যা তোমার খুশি? সব ব্যবস্থা করে দেব।" বুঝতেই পারছেন, কী লোভনীয় প্রস্তাব—কারণ আর কিছু না হোক, পয়সা তো বেশ····

যুবতী। (যেতে চেয়ে) তবে যাই, আমি থিয়েটারের সেই কর্তার সঙ্গেই দেখা করব।

বোঁচা। (বাধা দিয়ে) আ-হা-হা, অত তাড়া কেন, দাঁড়ান না, কথা আছে।

যুবতী। না, আপনার সঙ্গে আমার কোনো কথা নেই, থাকতেই পারে না।

[যুবতী চলে যেতে চায়, মঞ্চের চারপাশে ঘোরে, পালাবার পথ খোঁজে—বোঁচাও কেবলি তার সামনে এসে দাঁড়ায়, বাধা দেয়। শেষে যুবতী যখন সত্যই পালাতে উদ্যত, বোঁচা তার হাতটা ধরে ফেলে, টেনে কাছে আনতে চায়]

বোঁচা। (সানন্দে চেঁচিয়ে) ওঃ-হো-হো, কেল্লা ফতে।

যুবতী। (চেঁচিয়ে) শাট আপ! লীভ মি, ইউ স্কাউণ্ড্রেল! (সজোরে হাত ছাড়িয়ে নেয়, পরে বিহ্বল দৃষ্টিতে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে) আর আপনারাই বা কী, চুপ করে বসে উপভোগ করছেন? না কি লজ্জা সরমের মাথা আপনারাও খেয়েছেন? (বোঁচাকে দেখিয়ে) তার

মানে কি এ-লোকটাকে বিশ্বাস করতে আপনারা এখনো প্রস্তুত? দেখছেন না, স্টেজের ওপর একটার পর একটা কী জঘন্য কাণ্ড করে চলেছে, কী জঘন্য সব কথাবার্তা বলছে, শুনে কানে আঙুল দিতে হয়, তবু আপনারা মুখ বুঁজে সব সহ্য করবেন! সত্যিই দেখালেন, বলিহারি আপনাদের! শেষে নারী হয়ে আমাকে উঠতে হল, কারণ আর বসে থাকতে পারছিলাম না, ধৈর্যের একটা সীমা আছে। তবু আমাকে উঠতে দেখেও আপনারা টুঁ শব্দটি করলেন না।

বোঁচা। (সানন্দে চেঁচিয়ে) কেল্লা ফতে, কেল্লা ফতে।

যুবতী। (বোঁচাকে, চেঁচিয়ে) ইউ শাট আপ! (দর্শকদের প্রতি) আর এখন যখন লোকটা আমায় অপমান করতে উদ্যত, একেবারে শারীরিক ভাবে পর্যন্ত, তখনো কি আপনাদের মধ্যে এমন একজন ভদ্রলোকও নেই যিনি····

বোঁচা। (সানন্দে চেঁচিয়ে) কেল্লা ফতে, কেল্লা ফতে।

যুবতী। (বোঁচাকে দেখিয়ে, দর্শকদের প্রতি) দেখছেন তো, কী রকম লাফাচ্ছে —একটা পশু, মানুষ এ নয়। মানুষ হলে কি এসব কথা উচ্চারণ করতে পারত, এসব কাণ্ড করতে পারত—সব দেখছিলেন শুনছিলেন তো এতক্ষণ বসে বসে।

বোঁচা। (হাতজোড় করে, দর্শকদের প্রতি) হুজুর, আমার মা-বাপ, আকাশ-বাতাস সাক্ষী, এখনো যদি বিশ্বাস না হারিয়ে থাকেন আমার ওপর তো আরেকবার বিশ্বাস করুন—কাউকে অপমান আমি করতে চাই না, (যুবতীকে দেখিয়ে) এঁকে তো নয়ই। তবে ইনি তম্বি করে মঞ্চের ওপর উঠে এসেছেন—অবশ্য আমিই আমন্ত্রণ জানাই—এবং কিছু বলতে চান। তো বলুন না কেন কী কথাটা তাঁর—আমি কান দুটো খাড়া করেই রয়েছি, আপনারাও শুনুন।

[আহ্বানের ভঙ্গীতে বোঁচা যুবতীর দিকে তাকায়—যুবতী রাগে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে, দর্শকরা নিস্পন্দ।]

বোঁচা। (যুবতীকে) কী, বলুন। আপনার সব কথা কর্পূরের মতো উবে গেল দেখছি।

যুবতী। কিছু উবে যায়নি। নাটকের নামে আপনি যা করলেন, তা ব্যভিচার, অত্যাচার।

বোঁচা দেখুন, প্রথমত আমার নাটক শেষ হয়নি, শেষ করতে আপনি দিলেন না, এবং যে-জিনিসটা শেষ হয়নি, তার সম্বন্ধে মতামত দেওয়া চলে কি না আমি জানি না। (যুবতীকে অধীর হতে দেখে) দাঁড়ান, দয়া করে আমার কথাটা শেষ করতে দিন। আচ্ছা, না হয় তর্কের খাতিরে ধরেই নিচ্ছি, আপনার তবু মনে হয়েছে ব্যভিচার, অত্যাচার। কিন্তু এখানে আমার প্রশ্ন, কেন ব্যভিচার, কেন অত্যাচার ? যুক্তি দিন।

যুবতী যুক্তি দিতে আমার ভারী বয়েই গেছে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত ঘৃণা হয়।

বোঁচা বাঃ, এ তো ভারী আশ্চর্য, এ তো এক-তরফা যুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে—আমারো তো কিছু বলার থাকতে পারে। না কি আপনিই শুধু যা খুশি বলে যাবেন ?

যা খুশি আমি বলছি, না আপনি ? (দর্শকদের দেখিয়ে) এই এঁরা সকলে বসে আছেন, সে-বিচার এঁরা করবেন। একটার পর একটা যত অকথ্য অশ্রাব্য গালাগাল আপনি দিয়ে গেলেন, নাটকের নাম করে, স্টেজের ওপর, সেটা হজম করলাম। শুধু তাই নয়, অসভ্য বর্বরের মতো কাণ্ডকারখানা করে চলেছেন, যা ভাবতে পর্যন্ত ঘৃণায় গা রি-রি করে ওঠে, চোখ দিয়ে দেখা তো দূরের কথা। যান, সেসব না হয় ছেড়েই দিলাম—যদিও ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু সেগুলো নিয়ে বলব কী, মুখে তো আনা যায় না সেসব কথা।

বোঁচা। অর্থাৎ সেইটাই আপনার অভিযোগ, মানে মুখ্য অভিযোগ ?

যুবতী। অভিযোগ সব কিছু নিয়েই। এই ধরুন আপনার বক্তব্য বিষয়টাই, যেটা নিয়ে কথা বলা যায়, অন্তত মুখে বাধে না, অন্তত সেটা আপনার অন্যান্য কথাবার্তার মতো অশ্লীল নয়—এই ধরুন, না-খেতে পেয়ে মরার ব্যাপারটাই।

বোঁচা। তবু ভালো, কথাটা আপনার শ্রীমুখে উঠতে পারল, অন্তত এ-কথাটাকে যথেষ্ট অশ্লীল বলে আপনি ভাবেন না। কী ভয়ংকর ভাগ্যি আমাদের।

যুবতী। (অপ্রস্তুতের ভাবে) ঠাট্টা করতে চান করুন, তবু বলবই, না-খেতে পেয়ে কেউ মরে না, জানেন, এ-শহরেও না, ওসব সেন্টিমেন্টালিজম ছাড়ুন। বিশেষত তা নিয়ে নাটক তো হয়ই না, মেরে-কেটে হয়তো পলিটিকাল স্পীচ দেওয়া চলে—তার বেশি নয়।

বোঁচা। (হাতজোড় করে, দর্শকদের প্রতি) হুজুর, আমার মা-বাপ, আকাশ-বাতাস সাক্ষী—নাটক কাকে বলে, তার বিচার আপনারা করবেন। আমি অকৃতার্থ, অধমের অধম। তবে যদি অনুমতি দেন তো এ-মহিলাটিকে বলি, না-খেতে পেয়ে কেউ মরে কি না-মরে, সেটা তর্কাতীত ব্যাপার এবং তা নিয়ে তর্ক করতে আমি প্রস্তুত নই, কারুর সঙ্গেই নই, এমন কি এমন একজন লোভনীয় দেহের সুন্দরী তরুণীর সঙ্গেও নই।

যুবতী। শাট আপ।

বোঁচা। (যুবতীকে, শ্লেষের ভঙ্গীতে) বড্ড শ্লীল আপনি, না? সত্যি, আপনাকে দেখে ঈর্ষা হয়—এ-শহরে বাস করেও এত শ্লীল আপনি রয়ে গেলেন কী করে? যেন অনাঘ্রাত পুষ্প একটি, পবিত্রতার যুঁই ফুল! কিন্তু রাস্তায় বেরোন না? চোখ দিয়ে কিছু দেখেন না, কান দিয়ে কিছু শোনেন না? হাহাকার আর নোংরামি আর মৃত্যু আর অবিচারের শত-সহস্র উন্মুখ উলঙ্গ ঔদ্ধত্য আপনার ঐ কুসুমকোমল লজ্জাবতী লতার শ্লীলতাবোধে সর্বক্ষণ পেচ্ছাব করে দেয় না? আর সেই পেচ্ছাবের শ্বাসরোধকারী গন্ধে আপনার ঐ অত সুন্দর নাক-মুখ, সব প্রেমিকের স্বপ্নের মতো আপনার ঐ গাল-চোয়াল-চিবুক....

যুবতী। (কানে হাত দিয়ে) উঃ, কী ভয়ংকর নির্যাতন, কী অমানুষিক অপমান! (দর্শকদের দিয়ে চেঁচিয়ে) তবু আপনারা একটা কথাও বলবেন না, একজনও এগিয়ে আসবেন না, আর....আর এই অসভ্য বর্বর লোকটা আমায় অপমান করে চলবে?

বোঁচা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, হতাশের ভঙ্গীতে) অল রাইট, শুনতে যদি এতই খারাপ লাগে আপনার তো সত্যি কথাটা না হয় নাই বললাম। মুস্কিল জানেন ঐ সত্যি কথাটা নিয়েই—কেউ শুনতে চায় না। না, এ-শহরে আগাগোড়া জীবনটাই অশ্লীল, শুধু এই আমাদের জীবনটাই নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি অশ্লীল আপনাদের জীবন। যাকগে, এসব বললাম, কারণ আপনি তেড়ে-মেড়ে এসেছেন আমাকে গুঁতোতে, আমার নাটককে অশ্লীল বলতে।

যুবতী। (ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে) অশ্লীল? অশ্লীল বললে কিছুই বলা হয় না, আপনার নাটক নাটক নয়....(একটু থেমে, সহসা জোরের সঙ্গে)

আপনার নাটক নাটকের গর্ভস্রাব।

বোঁচা। (সহসা সচকিত, স্তব্ধ, পরে উল্লাসে) গর্ভস্রাব? হে-হে-হে (হাসিতে ফেটে পড়ে), গর্ভস্রাব। (দর্শকদের প্রতি) শুনলেন তো কথাটা আপনারা? দেখছেন, (যুবতীকে দেখিয়ে) এই ইনিও কিছু কম যান না। (যুবতীকে) বলতে পারলেন তো কথাটা? আপনিও তো অশ্লীল হলেন? পথে আসুন, ও-পথ ছাড়া আর পথ নেই। (চেঁচিয়ে) কেল্লা ফতে, কেল্লা ফতে।

যুবতী। শাট আপ, ইউ রাস্ক্যাল!

বোঁচা। (সহসা যুবতীর দিকে এগিয়ে, আগ্রহের সঙ্গে) জানেন, এতদিন এমনি একটি মেয়ের খোঁজ করে ফিরেছি আমি, যার আপনার মতো এমনই উত্তপ্ত মন, এমনই উত্তপ্ত দেহ, এই রকম উদ্ধত মুখ, দুটি উদ্ধত বুক....(যুবতী কিছু বলতে যায়, তাকে থামিয়ে) কথাটা শুনুন, একটা নাটক করবেন, একটা অন্য নাটক, প্রেমের নাটক? প্রেম দেখুন পেলে কে না চায়....(যুবতী আবার কিছু বলতে চায়, তাকে আবার থামিয়ে, আদেশের সুরে) স্থির হয়ে দাঁড়ান, শুনুন। সব্বাই প্রেম চায়, সব শালা প্রেম চায়, সব বাঞ্চোৎ (যুবতী কানে হাত দেয়) প্রেম চায়—আমিও শালা প্রেম চাই, আমি বাঞ্চোৎ প্রেম চাই, এবং আমি আপনাকে নিয়ে প্রেম করতে চাই, একটু করবেন? অত ভয় পাবেন না, সত্যিকারের প্রেম নয়, শুধু নাটক একটা, একটা অভিনয়—এই দেখুন, (দর্শকদের দেখিয়ে) এতগুলো লোককে ডেকে এনেছি, একটা গল্প ফেঁদেছিলাম, সেটা আপনি শেষ করতে দিলেন না, সেটা আধ-খ্যাঁচড়া হয়ে রইল। সেটা থাকগে, সেটা মরুকগে, (থলেটাকে দেখিয়ে) যেমন করে এই কুকুরটা মরে গেছে। না-না-না, আগের ঐ গল্পটা বলতে আমারও ভালো লাগছিল না, কারণ বিশ্বাস করুন, আমিও ভালো-ভালো কথা বলতে চাই, শরতের সোনার রোদ্দুর, সুস্থ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-অভিনিবেশ, প্রেম, এই সবই চাই—কিন্তু সেটা আমাকে চাইতে দিচ্ছে কে, কোন শালা দিচ্ছে? নইলে বলুন তো, ইচ্ছে করে কোন শালা-বাঞ্চোৎ (যুবতী আবার কানে হাত দেয়) খিস্তি করতে চায়? কিন্তু আমার হাত থেকে জয়নগরের মোয়াটা

কারা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, আমার অন্য অস্ত্র নেই। (আগ্রহের সঙ্গে) তাই বলছি, অবকাশ যখন দিলেনই, আসুন একটা প্রেমের নাটক ফাঁদি—গপ্প আমার মনে ঝটপট এসে যায়, ভাববেন না—বলুন, ফাঁদা যাক তবে? আজকের পালাটা ভালো করে সাঙ্গ হোক, (দর্শকদের দেখিয়ে) রসিকজনেরা তৃপ্ত হয়ে ফিরে যান। (খপ করে যুবতীর হাত ধরে, যুবতী চেঁচাতে যায়, তাকে থামিয়ে) চেঁচাবেন না, কোনো দুরভিসন্ধি আমার নেই—আর হাতটা ধরলেই আপনি কিছু অপবিত্র হয়ে যাবেন না, (আদেশের সুরে) বিশ্বাস করুন, আমি আপনার চেয়ে কিছু বেশি অপবিত্র নই। (যুবতীর হাত ধরে থেকে ও উপরে মাথা তুলে মঞ্চের কোণার দিকে তাকিয়ে ও চেঁচিয়ে) আলোটা একটু কমিয়ে দাদা, একটু নীল আমেজ দিন দয়া করে। আর পেছনের সেই পর্দাটা, সেই নিসর্গটা, যেটা আমায় আগে দেখান কিন্তু আমি নিইনি, এবার সেটা আস্তে আস্তে ফেলে দিন—এই 'নদীয়া মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান' মুছে যাক। [আলো যথারীতি কমে আসে, গাছপালা-নদী অংকিত মনোরম এক পশ্চাৎপট ধীরে ধীরে পড়ে।] (যুবতীর হাত ছেড়ে দিয়ে) বাঃ, বেশ হয়েছে, (আবার মঞ্চের কোণার দিকে তাকিয়ে) এবার সেতারের কিছু মৃদু-মৃদু ঝংকার উঠুক না, আবহাওয়াটা ঘনিয়ে তুলুন। [নেপথ্যে সেতার বেজে ওঠে।] (যুবতীকে) আর জানেন, চান বা না-চান, শুনে ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করুন বা না-করুন, আপনার সঙ্গে আমার মিলনের একটা অনিবার্য লালকালি-মাখা তারিখ এগিয়ে আসছে, হু-হুঃ শব্দে এগিয়ে আসছে, এই মুহূর্তেই ঐ আরো একটু এগোল, ঐ এগোল আবার—পাচ্ছেন তো সেই পদধ্বনি, বলুন, পাচ্ছেন তো? না কি সুন্দরী, এখনো কান তৈরি হল না আপনার? (উল্লাসে) ওঃ হো-হো, কেল্লা ফতে, কেল্লা ফতে। (যুবতী রাগে কাঁপতে থাকে, কিছু বলতে যায়, তাকে থামিয়ে) শাট আপ, এখন আমি কর্তা, তম্বি করবেন না। (আগ্রহের সঙ্গে) সাদার্ন এভেনিউ-র সেই বাড়িটা দেখেছেন তো? একটা প্রকাণ্ড বাড়ি, একটা অট্টালিকা, আর বাড়িটার চারধারে কী ভীষণ বড় বিস্তৃত বাগান, এককালে সেখানে নিশ্চয়ই কত সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ ছিল, কত লিলি-ডালিয়া-

ইতিহাস সংবাদ

চণ্ডী মণ্ডল

তারাগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী স্কুলের ইতিহাসের মাস্টার নিকুঞ্জবিহারী অধিকারী সুদীর্ঘ তিরিশ বছর ছাত্রদের ইতিহাস পড়ানোর পর অবশেষে একদিন ইতিহাসের আসল ইতিহাস আবিষ্কার করলেন—পৃথিবীর অসাধারণ মানুষদের নিয়েই ইতিহাস লেখা হয়, ইতিহাসে এমন একটিও লোকের নাম নেই যে কোনো না কোনো ভাবে সাধারণের অতীত ছিল না; নিতান্ত সাধারণ যে লোক, সে-ও কোনো না কোনো আকস্মিক কারণে বিশেষ বিখ্যাত হয়ে তবেই ইতিহাসে স্থান পায়। নিকুঞ্জবাবু স্থির বিশ্বাসে সিদ্ধান্ত করলেন ইতিহাসে যাদের স্থান হয় না তাদের আসলে কোনো ইতিহাসই থাকে না, তাদের কথা কেউ জানে না; এমনি কত অসংখ্য জীবন অতীতে মিথ্যা হয়ে গেছে, ভবিষ্যতেও কত অসংখ্য জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে, তার সঠিক হিসাবও ইতিহাসে কোনো দিন লেখা থাকবে না।

তারাগঞ্জ শহর থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরের একটি সাধারণ মফঃস্বল এলাকা। শহরের সঙ্গে সম্পর্ক হাজার তুচ্ছ হলেও দুপুরের আগেই দৈনিক সংবাদপত্র স্কুলে নিয়মিত পৌঁছে যায়। নিকুঞ্জবাবু বিশেষ এক শ্রেণীর খবরে ডুবে যান—ট্রেন দুর্ঘটনায় একশ জনের মৃত্যু হয়েছে, যাত্রীবাহী বিমান বিধ্বস্ত হওয়ায় পঞ্চাশ জনের জীবনহানি হয়েছে, প্রতিবেশী রাজ্যের আকস্মিক আক্রমণে দু-শ গ্রামবাসীর মৃত্যুবরণ, খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে কুড়ি জনের অকাল মৃত্যু, ইত্যাদি। এমন আরো কত, অসংখ্য, দেশ বিদেশের কত লোকের মৃত্যু হচ্ছে। প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় প্রতি মিনিটে সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক কত বিচিত্রভাবে পৃথিবীতে কত মৃত্যু ঘটছে তার সমস্ত খবর নিকুঞ্জবাবু জানেন না, কেউই জানে না, তবে নিকুঞ্জবাবু সমস্ত ভাবতে পারেন, ভাবেন, ভাবেন আর ভাবেন, ভাবতে ভাবতে এক সময় খুব চঞ্চল হয়ে পড়েন—দৈনিক এত লোক মরে যাচ্ছে, এদের প্রায় কারো কথাই ইতিহাসে লেখা হয় না, এত সমস্ত মানুষের জীবন

চিরদিনের মতো পৃথিবী থেকে লোপ পাচ্ছে, ভবিষ্যতে আরো কত—নিকুঞ্জবাবু ভাবতে পারেন না। তাঁর রক্তশূন্য শরীরেও রক্তের উচ্চচাপ হঠাৎ ভীষণ বেড়ে যায়, মাথা ঘুরে যায়, শিরদাঁড়া যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে যেতে থাকে, তিনি মারাত্মক বিপন্ন হয়ে পড়েন। সেই মৃত্যুতুল্য কষ্ট-যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি নিজের স্বরূপের মুখোমুখি হতে বাধ্য হন—পৃথিবীতে আমি এতদিন বেঁচে রইলাম, আর আমার মৃত্যুর পর আমি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাব ; সম্পূর্ণ মিথ্যে হয়ে যাব !

সেই গভীর উদ্বেগ-যন্ত্রণা একটু সহনীয় হলে নিকুঞ্জবাবু আবার ভাবেন তাঁর মৃত্যুর পর যদি কিছু লোক তাঁকে মনে রাখে অর্থাৎ যদি তিনি কোনোক্রমে ইতিহাসে স্থান পেয়ে যান তবেই কিনা প্রমাণিত হবে তিনি শ্রীনিকুঞ্জবিহারী অধিকারী পৃথিবীতে জন্মেছিলেন, তিনি এইরকম ছিলেন ; আর তাতেই তাঁর জন্মের জীবনের সার্থকতা।

নিকুঞ্জবাবু নিজের মনেই এ-বিষয়ে অনেক আলোচনা করলেন—প্রশ্ন উঠতেই পারে আমার মৃত্যুর পর আমি পৃথিবীতে মানুষের মনে চিরদিন বা বেশ কিছুদিন বা কিছুদিন বেঁচে থাকলাম কি থাকলাম না—এতে আমার কী তখন এসে যাবে। কিন্তু জীবিতকালে যদি আমি জানি আমি তেমন একজন অতিবিখ্যাত অসাধারণ কোনো লোক হতে পেরেছি, তাহলে আমি বেঁচে থেকেও আমার মৃত্যু-পরবর্তীকালীন অবস্থা নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারব। আমি মহাকালের অন্ধকার অসীম শূন্যে হারিয়ে যাব না। জন্মের জীবনের সেই দুর্লভ সার্থকতার অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনায় তখন আমি সীমাহীন আনন্দে ভরে উঠব। গভীর আত্মতৃপ্তিতে আমি নিজেকে ধন্য ভাবব।

স্কুলের অদূরে গ্রামের এক প্রান্তে নিকুঞ্জবাবুর নোনাধরা দেড়কামরা মাটির ঘর। জীর্ণ টালির চালে ইতস্তত ফাটল ধরেছে। বারো মাস নানা অসুখে ভুগে ভুগে নিকুঞ্জবাবুর ভগ্নস্বাস্থ্য স্ত্রী অর্ধেক রাত পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে সংসারের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনাকালে, তাঁদের বিশেষ করে তাঁর মৃত্যুর পর সংসারের কী গতি হবে প্রশ্ন করলে আতঙ্কে নিকুঞ্জবাবু কপট ঘুমে আত্মগোপন করার চেষ্টা করেন। তখন তাঁর স্ত্রী চীৎকার করে তাঁর মৃত্যু কামনা করেন। নিকুঞ্জবাবুও তাই কামনা করেন, তিনি কিছুই করতে পারলেন না, এবার তাঁর মৃত্যু হোক। নিকুঞ্জবাবুর তিরিশ বছর উত্তীর্ণ বড় ছেলে পড়াশুনা শেষ করে দীর্ঘদিন ধরে চাকরির বৃথা চেষ্টা করার পর এখন লৌকিক-অলৌকিক-শারীরিক-

মানসিক নানা অসুখের শিকারে পরিণত। মেজ ছেলে শৈশব থেকেই পড়াশুনো ভালো লাগে না বলে কিছুই করেনি, এখন যৌবনের খর মধ্যাহ্নে সে গ্রাম্যবীর রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ছোটছেলে স্কুলের পড়া শেষ করার আগেই গঞ্জের কোনো একটা দোকানে যে কোনো একটা কাজের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছে। নিকুঞ্জবাবুর ছোট মেয়েটি এখন বিবাহযোগ্য বয়েসে পৌঁছে গেছে। বড় মেয়েটি গ্রামের রীতি অনুযায়ী বিয়ের যে বয়েস তাকে ছাড়িয়ে পাঁচ-ছ বছর এগিয়ে গিয়ে যথার্থই অলক্ষ্মীর মতো হয়ে উঠেছে। পাত্রপক্ষের সোনাদানার লোভ দিন দিন স্বচ্ছন্দে ধাপে ধাপে আরো উঁচুতে উঠছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় নিকুঞ্জবাবু ক্লান্তিতে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, বিষম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন—তাহলে মেয়েটার জীবনটা কি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থই হয়ে যাবে।

ঠিক এই সময় নিকুঞ্জবাবু হঠাৎ পৃথিবীর অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ইতিহাস চিন্তা করে মানুষের জীবনের পরিণতির কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন—তাঁর জীবনও কি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে। সাধারণের চেয়েও সাধারণ তিনি, জীবিতকালেই তাঁকে অল্প কজন মাত্র চেনে, তাও চেনে কি চেনে না! সুতরাং মৃত্যুর পর ইতিহাসের কৃপা পাবার বিন্দুমাত্র আশা নেই। নিকুঞ্জবাবু অতএব নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে সংসারের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেলেন।

স্কুল ছুটির পর যখন সকলে যে যার ঘরে ফিরে যায়, তখন তিনিই শুধু আর ঘরে ফেরেন না, অন্যমনস্কের মতো হাঁটতে হাঁটতে গঞ্জের দিকে এগোতে থাকেন। গঞ্জের পাশ দিয়ে যে নদী সমুদ্রের দিকে বয়ে গেছে, সেই নদীর পাড়ে গৈরিক বালির ওপর এসে বসেন। অদূরে এক একটা ঢেউ আশ্চর্য উচ্ছল ভঙ্গিতে ভাসতে ভাসতে কূলে এসে হঠাৎ ভেঙে যাচ্ছে—বারবার, অবিরাম। চারপাশের বাতাসে ঢেউগুলোর কণ্ঠস্বর মিশে একসময় অদ্ভুত বিষণ্ণ শোকবিলাপের মতো শোনায়। ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের পালতোলা নৌকোগুলো দূরে দূরে সজীব প্রাণীদের মতো বয়ে চলেছে, যেন নিরুদ্দেশে চলেছে সকলে। ক্রমশ আকাশে শেষ বিকেলের রঙ ঘনিয়ে আসে। সূর্যও ডুবে যায়। বেগুনে সন্ধ্যার আভাস ছড়িয়ে পড়ে চরাচরে। হঠাৎ ধূ ধূ পরপার থেকে ধোঁয়াটে অন্ধকার হু হু বেগে ছুটে আসতে থাকে, মুহূর্তে আকাশ পৃথিবী সমস্ত অন্ধকারের কবলে চলে যায়। নিকুঞ্জবাবু ভাবনার শেষে পৌঁছতে পারেন না, ক্রমশ আরো ভাবনার আবর্তে জড়িয়ে পড়েন, কিছুতেই আর মুক্তি পান না। যে কোনো সময় তাঁর মৃত্যু হতে পারে, আগে থেকে তিনি তার কিছুই জানতে পারবেন না।

অনেক আগে থেকেই মানুষকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। কিন্তু তিনি এখনও অপরিচিত অতি-সাধারণ থেকে গেলেন। তাঁর অন্তরাত্মা হাহাকার করে ওঠে। অন্ধকারে নিজের চোখে অদৃশ্য আবছায়া দিশাহারা হয়ে তিনি বসে থাকেন। গভীর রহস্যের মতো অস্পষ্ট ছায়াছায়া কোনো এক সম্পূর্ণ অপরিচিত পৃথিবী যেন ধীরে ধীরে অন্ধকারের গর্ভ থেকে ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করে, অসংখ্য তারার মিট মিট আলোতে আবছা আকাশ একটা হেঁয়ালির মতো মনে হয়। অন্ধকার নদী এতক্ষণে ধূ ধূ কুয়াশাময় প্রান্তরের মতো ঈষৎ দৃশ্য হয়ে ওঠে। নিকুঞ্জবাবুকে ঘিরে অসংখ্য জোনাকি কাঁপতে কাঁপতে এলোমেলো বাতাসে ভাসতে থাকে। এখনও কি সময় আছে? যদি আবার নতুন করে জীবন শুরু করি? তা আর সম্ভব নয়? মৃত্যুর পর সত্যিই কি পৃথিবীতে আমি থাকব না? তাহলে এখন আমি কী করব? কোনো উত্তরই মেলে না। শুধু রাত্রি গভীরতর, অন্ধকার নিবিড়তর, পৃথিবীর প্রকৃতি জটিলতর হতে থাকে। নিকুঞ্জবাবু সমস্ত মিথ্যা আশা বিসর্জন দিয়ে শুধু অভিজ্ঞতা নিয়ে ঘরে ফিরে যান।

গভীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিকুঞ্জবাবু আরো কিছুদিন জীবন-যাপনের যন্ত্রণাকর দায় বয়ে চললেন। আর প্রতি মুহূর্তে সেই বিশ্বাসকে আরো প্রশ্রয় দিতে লাগলেন, তাঁর আসলে কোনোদিনই কোনো যোগ্যতা ছিল না, আজও নেই, তাই হাজার ইচ্ছা করলেও তিনি আর কোনোমতেই বিখ্যাত কেউ হয়ে সকলের পরিচিত হয়ে উঠতে পারেন না। অথচ সেই ইচ্ছাটা কিছুতেই মরতে চায় না, সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন করে, হতাশ করে! জীবনযাত্রা ততই বিরক্তিকর আর বিস্বাদ লাগে। আরো বেঁচে থাকা অহেতুক অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। তখন নিজের ওপর ভীষণ বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন।

মনে সবচেয়ে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটে স্কুলে, যখন কোনো একটি ক্লাসে পড়াতে যান। ইতিহাস বইখানা হাতে তুলে নিয়েছেন কি তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর উদ্বেগ হিংস্র সাপের মতো আক্রমণ করে। তিনি প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন, কিন্তু মনের শক্তি সব নষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর কথা কেউ কোনোদিন জানবে না, সকলের অজান্তে চিরদিনের মতো তিনি হারিয়ে যাবেন। নিকুঞ্জবাবু ভীষণ চঞ্চল হয়ে পড়েন। অদ্ভুত এক যন্ত্রণার পীড়ায় তাঁর অনুভূতি শিথিল এলোমেলো হয়ে যেতে থাকে, তিনি শূন্যতায় ডুবে যেতে থাকেন। কথা বলার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন, অস্বাভাবিক ভাবে ঠোঁট দুটো শুধুই

কাঁপতে থাকে। ক্লান্তিতে গোটা শরীরটা ভেঙে পড়তে উদ্যত হয়। শেষপর্যন্ত কোনোমতে টলতে টলতে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন মাত্র।

স্পষ্ট করে কিছু না-বুঝলেও তাঁর সম্পর্কে একটা কিছু অনেকেই অনুমান করল। স্কুল কমিটি যথারীতি বিদায় অভিনন্দন সহযোগে তাঁকে শেষ বিদায় দিলেন। আর সেই সঙ্গে তাঁর শূন্য জায়গায় তাঁরই বড় ছেলেকে আমন্ত্রণ করা হলো।

এরপর যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হলো। তিনি ভাবলেন তাঁর আর কোনো কাজ নেই, সংসারেও তিনি একটা বোঝা মাত্র। ভাবলেন, আমার জীবনের পরিণতি যখন আমি জেনেই গেছি তখন কেন আর এই মিথ্যা জীবনকে শুধু শুধু বয়ে নিয়ে চলি!

আরো কয়েকদিন তিনি অপেক্ষা করলেন। দেখলেন, স্কুল থেকে শেষ বিদায়ের পর যে-টাকা তিনি পেয়েছিলেন, সেই টাকায় শেষ পর্যন্ত তাঁর বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল; তাঁর ছোট ছেলে গঞ্জের এক দোকানে একটা কাজ পেয়ে গেল। দেখলেন, তাঁর কথা সকলে কেমন স্বচ্ছন্দে ভুলে গেছে। তিনি যে বেঁচে আছেন, এ-কথা যেন আর কারো মনে নেই। তিনি কি খান, কখন খান, আদৌ কিছু খান কি খান না, ঘুমতে পারেন কিনা, শরীর কেমন, কেন শরীর খারাপ—তাঁর কী হয়েছে—কোনো কথাই তাঁর সম্পর্কে কেউ ভাবে না। যেন সত্যিই তিনি মারা গেছেন আর কি!

তখন রীতিমতো বর্ষাকাল। দ্বীপের মতো নির্জন অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে দাওয়ায় ভিজে সপসপে কাঁথায় শুয়ে শুয়ে চালভাঙা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে শীতে কুঁকড়ে যেতে যেতে অদ্ভুত এক জরো মানসিকতায় নিকুঞ্জবাবু অনুভব করলেন তিনি যেন এক অজানা দেশের একজন অপরিচিত লোক। এক আশ্চর্য অলৌকিক আত্মদর্শন হলো তাঁর। টালির চালের ওপর টিপ টিপ অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দে এক অজানা লোকের কোন এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর তিনি সারারাত ধরে শুনলেন, আর এক গভীর প্রেরণায় তাঁর মন একটু একটু করে ভরে উঠতে লাগল। যখন সকাল হলো, বৃষ্টিমুখর ঘনায়মান সন্ধ্যার মতো সকাল, নিকুঞ্জবাবু সকলের অলক্ষ্যে পথে নেমে পড়লেন। পথের জল-কাদা ভেঙে ভিজতে ভিজতে কাঁপতে কাঁপতে তিনি গঞ্জের খেয়াঘাটে এসে পৌঁছুলেন। নদী তখন ঘন কুয়াশায় এমন অদৃশ্য যেন পরপার বলে কিছু নেই। এই দুর্যোগে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় যাত্রী কেউ নেই। খেয়ারীকে

অনেক সাধ্যসাধনা করে শেষে একা অনেক পারীর ভাড়া দিয়ে নিকুঞ্জবাবু পর-পারের উদ্দেশ্যে নৌকায় উঠলেন।

অন্য পারে যখন পৌঁছলেন তখন আর বৃষ্টি নেই। আকাশ মলিন মেঘমুক্ত। শান্ত রোদে উজ্জ্বল সেই নতুন জনপদ এক নতুন জগতের মতো মনে হলো। কিন্তু এখানে তিনি কাউকে চেনেন না, তাঁকেও কেউ চেনে না। ভাবলেন, তাহলে কাউকে পরিচয় দেওয়া বৃথা।

এখানে তিনি কোথায় এসেছেন তা জানেন না। কোথাও না কোথাও যেতে চেয়েছিলেন, যেতে হতই, তাই এখানে এসেছেন মাত্র।

পথে পথে মাঠে মাঠে আলোতে-অন্ধকারে দিন-রাত্রি নিজের সঙ্গে সারাক্ষণ কথা বলতে বলতে তিনি ইতস্তত ঘুরে ঘুরে বেড়ান। খিদে যখন কিছুতেই আর সহ্য হয় না, কোনো দোকান থেকে যাহোক কিছু খেয়ে নেন। কোনো দোকানের দেখা না-মিললে কিছুই আর খাওয়া হয় না। এক সময় আর খিদেও থাকে না। যখন ক্লান্তিতে খুব অবশ হয়ে পড়েন, কোনো গাছের নিচে বিশ্রাম করেন, ঘুমিয়ে পড়েন। রাত্রি-দিনের বিচার করেন না। তাঁকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে না, তিনিও কারো সঙ্গে কথা বলেন না। এক সময় এমন হলো আর কিছুই খেতে ইচ্ছা করে না, খিদে পায় না, ঘুম আসে না, বিশ্রাম করার তাগিদ অনুভব করেন না।

নিজেকে তিনি সম্পূর্ণ ভুলেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন তাঁর বাড়ির কথা মনে পড়ল। নিজেকে তিনি আবার গভীরভাবে ভাবলেন, ভাবলেন আমি যে এইভাবে ঘর থেকে পালিয়ে কোথায় না কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছি এতদিন ধরে, কেন? আমার কী হয়েছিল? কোনো কথাই তাঁর স্পষ্ট মনে পড়ল না। ভাবলেন, এই বুড়ো বয়েসে আমার কী দুর্মতি হয়েছিল, কী হাস্যকর ব্যাপার! এখন যদি ভালোয় ভালোয় আবার ঘরে ফিরে যাই তো এ-যাত্রায় সবদিক রক্ষা হয়। কিন্তু এতদিন আমি কোথায় ছিলাম, কেন এইভাবে আমি উধাও হয়ে গেলাম—বাড়ি পৌঁছে এইসব প্রশ্নের বিশ্বাসযোগ্য উত্তর দিতেই হবে। নইলে সকলে যে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে, ভাববে—বুড়ো পাগল হয়ে গেছে, সে আবার বিদায় করে।

আবার নদী পেরিয়ে নিকুঞ্জবাবু গঞ্জের সেই পুরনো খেয়াঘাটে এসে পৌঁছলেন। তখন সকাল। রোদ গঞ্জের দৃশ্য আকাশ পথঘাট ঘরবাড়ি লোকজন সবই আগের মতো, তবু তাঁর মনে হতে লাগল যেন জীবনে এই

প্রথম তিনি এখানে এসে পৌছলেন। নিজেকে তাঁর বার বার অন্য একজন অপরিচিত লোক মনে হতে লাগল।

তিনি ভীষণ রোগা হয়ে গেছেন। মেরুদণ্ডটা যেন ভেঙে যেতে বসেছে, অসম্ভব কুঁজো হয়ে হাঁটছেন। সাদা রুক্ষ লম্বা চুলগুলো বটগাছের ঝুরির মতো মুখের চারপাশে ঝুলে পড়েছে। দুপাশের দুটো গাল অস্বাভাবিক রকম ভেঙে গিয়ে দুটো গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে। শুকনো কপালটা অসংখ্য ভাঁজে ভাঁজে যেন ফেটে ফেটে গেছে। কোটরস্থিত চোখদুটো পেকে গেছে। জামাকাপড় ইতস্তত ছিঁড়ে গেছে, আর নোঙরা যত বেশি হওয়া সম্ভব। নিজের গলার স্বর শুনে নিজেকে যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। কিন্তু বাড়ির পথ চিনে চলতে তাঁর একটুও ভুল হচ্ছে না।

বাড়ির দরজায় পৌঁছে তিনি সকলকে নাম ধরে ধরে ডাকতে লাগলেন। প্রত্যেকে নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল, এক সময় সকলেই বেরিয়ে এল। কিন্তু যে-লোকটি এতক্ষণ ধরে তাদের সকলকে নাম ধরে এত ডাকাডাকি করছিল, তাকে তারা কেউই চিনতে পারল না। নিকুঞ্জবাবু খুব অবাক হলেন, বিরক্তও হলেন যথেষ্ট। শেষপর্যন্ত তাঁকে নিজের নাম-পরিচয় ইত্যাদি বলতে হলো। তখন দু-একজন তাঁকে কিছুটা চিনতে পারল, আবার ঠিক চিনতে পারলও না। তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। কোনো প্রতিবাদও করতে পারলেন না। অদ্ভুত দুঃখ যন্ত্রণা আর অভিমানে তাঁর অন্তর কানায় কানায় ভরে গেল। হতাশভাবে আরো কিছুক্ষণ সকলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর একসময় যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, তেমনি ফিরে গেলেন। তাঁকে এইভাবে চলে যেতে দেখে সকলে ভাবল: এই লোকটি কখনোই তাদের নিরুদ্দেশ আত্মীয় হতে পারে না, হলে এমন করে নিশ্চয়ই ফিরে চলে যেত না।

পুস্তক-পরিচয়

বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবপদাবলীর ক্রমবিকাশ। ডঃ সতী ঘোষ। সারস্বত লাইব্রেরী। পাঁচ টাকা

বাঙলা বৈষ্ণব পদাবলী নিয়ে এ-পর্যন্ত যে খুব বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আলোচনার এই বিস্তারের মধ্যে তার মূল প্রবাহটি অনেক ক্ষেত্রেই হারিয়ে গিয়েছে। অথচ মূল প্রবাহটি অনুসরণ করতে না পারলে কেবলমাত্র তার আলোচনার বিস্তারের মধ্য থেকে তার রস এবং তাৎপর্য কিছুতেই উপলব্ধি করা যেতে পারে না। তারপর বিস্তৃত আলোচনা .পণ্ডিতের উপভোগ্য; সাধারণ পাঠক এবং ছাত্রসমাজের কাছে তা যেমন অপ্রয়োজনীয় তেমনই অনেক সময় ভীতিপ্রদ। সুতরাং বাঙলা বৈষ্ণব পদাবলীর মূল প্রবাহটির যাতে সন্ধান পাওয়া যায়, যাতে তার মর্ম যথাযথ ব্যাখ্যাও হয়, যাতে এর সূক্ষ্মতম তাৎপর্যটুকু প্রকাশ পায়—এমন একটি গ্রন্থ বহুদিন ধরেই প্রত্যাশিত ছিল। বাঙলা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাচীনতম একটি ধারা নিয়ে যিনি গবেষণা করে যশস্বিণী হয়েছেন, তাঁরই হাত দিয়ে আজ সেই প্রত্যাশাটি পূর্ণ হয়েছে দেখে আমি যারপর নাই আনন্দিত হয়েছি। ডক্টর শ্রীমতী সতী ঘোষ ইতিপূর্বে 'চৈতন্যসমসাময়িক কালের বৈষ্ণব পদাবলী' নামক গ্রন্থ রচনা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট লাভ করেছিলেন। তার মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর মূল ভিত্তি নিয়েই তিনি আলোচনা করেছেন; এই বিষয়ে তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ বৈষ্ণব পদাবলীর সামগ্রিক ভাব এবং রস-প্রবাহটি অনুসরণ করে রচিত হয়েছে। সুতরাং যে-বিষয়ে তিনি যথার্থ অধিকারিণী, সেই বিষয়েই তিনি এখানে তাঁর গ্রন্থটি রচনা করেছেন, সুতরাং তার প্রামাণিকতা সম্পর্কে পাঠকদিগকে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ রাখবার সুযোগ দিয়েছেন।

বৈষ্ণব দর্শনে যাঁরা সুগভীর পণ্ডিত, তাঁরা সাধারণ পাঠক এবং ছাত্র সমাজের কথা ভেবে তাঁদের বই রচনা করেননি, তাঁরা পণ্ডিত এবং ভক্ত সমাজের কথাই ভেবেছেন। কিন্তু ডক্টর শ্রীমতী ঘোষ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেও সাধারণ পাঠক এবং ছাত্র সমাজের কথা

স্মরণ করেই তাঁর 'বাংলাসাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর ক্রমবিকাশ' নামক গ্রন্থটি রচনা করেছেন। সেজন্য তাঁর গ্রন্থখানি অভিনন্দনযোগ্য।

বৈষ্ণব পদাবলীর দুটো দিক আছে: একটি রসের দিক, আর-একটি তত্ত্বের দিক। পণ্ডিতগণ তত্ত্বের দিকটা যত দেখেছেন, রসের দিকটা তত দেখেননি। কিন্তু ডক্টর শ্রীযুক্তা ঘোষের আলোচনায় তত্ত্ব এবং রসের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়েছে; কারণ তিনি সাহিত্যের অধ্যাপিকা বলে রসবিচারের অন্তর্দৃষ্টি তাঁর আছে। সেইজন্য তাঁর এই আলোচনা যথার্থ সার্থকতা লাভ করেছে।

বৈষ্ণব পদাবলী আলোচনার ভাষা রসসিক্ত না হলে তা কদাচ উপভোগ্য হতে পারে না। শ্রীমতী ঘোষের রচনা সাহিত্যরসসিক্ত বলেই তার মধ্যে যতখানি তত্ত্বকথা আছে, তাও পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। সুতরাং সাধারণ পাঠকও এই আলোচনার মধ্যে সহজেই প্রবেশ করতে পারবেন।

কিছুকাল যাবৎ বাঙলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে বাঙালি রসিক পাঠকসমাজে আগ্রহের অভাব দেখা যাচ্ছে। যে-বিষয় কয়েকশত বৎসর ধরে বাঙালির ধ্যান ও জ্ঞানের রাজ্য পরিপূর্ণ ভাবে অধিকার করে ছিল, আজ তার প্রতি অবহেলার ভাব দেখলে স্বভাবতই দুঃখ হতে পারে। আমার মনে হয়, সময়োপযোগী গ্রন্থের অভাবই তার কারণ। একদিন এই বিষয় নিয়ে যে-বই লেখা হয়েছিল, আজকের পাঠকদের কাছে তার মূল্য নানা কারণেই অনেক কমে এসেছে। সুতরাং আজকের পাঠকের প্রয়োজনে যুগোপযোগী করে এই বিষয়ে বই না লিখলে এযুগে তা প্রচার লাভ করতে পারে না। শ্রীমতী ঘোষ তাঁর এই গ্রন্থখানি রচনা করে সেই অভাব অনেকখানি পূরণ করেছেন। সে জন্য তিনি আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

ব্যোমকেশ মুস্তফী। দেবজ্যোতি দাশ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই কার্যত বাঙলা সাহিত্যে গবেষণার সূচনা। দীনেশচন্দ্র সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,

যোগেশচন্দ্র রায়, সতীশচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টাতে বাঙলা সাহিত্যের গবেষণায় প্রভূত সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে। সাম্প্রতিককালে যথাযথ তথ্যনির্ভর গবেষণাকর্মে শৈথিল্য তথা অনীহা অসংখ্য লেখককে লালন করায় (যার ব্যতিক্রম যোগেশচন্দ্র বাগল, বিনয় ঘোষ প্রমুখেরা) সৎপাঠক পীড়িত ও শঙ্কিত হন, সন্দেহ নেই; তৎসত্ত্বেও কতিপয় নিষ্ঠাবান গবেষকের প্রয়াসে আমাদের উৎফুল্ল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ।

শ্রীদেবজ্যোতি দাশের 'ব্যোমকেশ মুস্তফী' সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ১০৩ সংখ্যক গ্রন্থ। নির্ভরযোগ্য জীবনীকোষ হিসেবে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পেশ করা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। প্রসঙ্গত বলা চলে—তথ্যভিত্তিক জীবনীরচনা যে অতীব আয়াসসাধ্য, সে-সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীদের মতো আলোচ্য মালাকারও সবিশেষ সচেতন। উৎসুক পাঠক শুনে আরও খুশী হবেন যে দেবজ্যোতিবাবুর অশেষ আগ্রহেই দীর্ঘকাল পরে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার প্রকাশন পুনরায় সক্রিয় হবে। অতএব নিঃসন্দেহে তিনি ধন্যবাদার্হ। তাঁর 'ব্যোমকেশ মুস্তফী' পাঠে তাঁকে ব্রজেন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসূরী বলতেও আমার আদৌ আপত্তি নেই। এবং কোনও উচ্চকপালবাদী এমতো তারিফকে অনুরাগীর অশোভন উচ্ছ্বাস ঠাওরালেও একজন ভুক্তভোগী সমদর্শী হিসেবে আমি আমার সিদ্ধান্তে স্থিরনিশ্চয়। সর্বোপরি বলা যায়, 'ব্যোমকেশ মুস্তফীর'-র প্রতিটি পৃষ্ঠাই আমার এবংবিধ প্রত্যয়ের পরিস্ফুট প্রতীক।

বাঙলা নাট্যজগতের স্বনামখ্যাত ব্যক্তিত্ব অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর সুযোগ্য সন্তান ব্যোমকেশ আমৃত্যু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবায় আপন অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছিলেন। এই একনিষ্ঠ ত্যাগের মহিমা যথার্থই দুর্লভ। পরিষদের নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কর্মে সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও কতিপয় গবেষণামূলক রচনাতেও ব্যোমকেশ নিজেকে নিয়োজিত করেন। যদিচ প্রথাগত বিদ্যাচর্চায় পারদর্শী হওয়া তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভবপর হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টের সাধারণ চাকুরিজীবী হিসেবে উর্ধ্বতন কর্মচারীর বিরাগ-ভাজন হওয়া ছিল তাঁর জীবনে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কারণ, বলা বাহুল্য পরিষদই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংগ্রহে রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখিত ব্যোমকেশের যে তিনখানি চিঠি বর্তমান, প্রথম পত্রটির শেষাংশের আলোকচিত্রসমেত সেই চিঠিগুলির অনুলিপি (দেবজ্যোতিবাবুর

পাদটীকাসহ) অনুধাবনে পাঠক পরিষদের সঙ্গে পত্রলেখকের যোগাযোগের যথার্থ স্বরূপটি হৃদয়ঙ্গম করবেন।

উপসংহারে দেবজ্যোতিবাবু লিখেছেন: "ব্যোমকেশ মুস্তফীকে প্রথম শ্রেণীর সৃজনধর্মী লেখক বলিয়া প্রচার করিবার যৌক্তিকতা নাই। সাহিত্যে লেখক হিসাবে তাঁহার অবদান প্রধানতঃ সৃজনধর্মী নয়, ব্যাখ্যান ও বিচারধর্মী। কিন্তু লেখক হিসাবে তাঁহার যে গুরুত্ব, সাহিত্য-আন্দোলনের উদ্যোগী কর্মী হিসাবে গুরুত্ব সে তুলনায় বহুগুণে অধিক। এই শেষোক্ত ভূমিকাই তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যের জগতে দীর্ঘস্মরণীয় করিয়া রাখার পক্ষে যথেষ্ট। নাট্যজগতে অর্ধেন্দুশেখরের অবদানের তুলনায় স্বীকৃতি নিতান্ত সীমাবদ্ধ; ব্যোমকেশের নিঃস্বার্থ ও নিরলস শ্রম বিবেচনা করিলে মনে হয়, সাহিত্যজগৎ বুঝি তাঁহারও মূল্যায়নে কৃপণতা করিয়াছে, তাঁহারও প্রাণদানের ঋণ অনায়াস নিষ্কারুণ্যে বিস্মৃত হইয়াছে, আসরবাহিরে তাঁহার স্মৃতিকে নির্বাসিত করিয়া অযাচিত সেবার অধমর্ণতার দায়মুক্ত হইয়াছে।"

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভিয়েতনাম। মণীন্দ্র রায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। দু-টাকা

ভিয়েতনাম-প্রসঙ্গ বাঙলা দেশের শিল্পী সাহিত্যিকদের যে অল্পবিস্তর নাড়া দিয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধকে উপলক্ষ করে একাধিক কবিতা-সঙ্কলন, কবি-সম্মেলন, এমন কি সংস্কৃতি-সেবীদের বিক্ষোভ মিছিল পর্যন্ত হয়ে গেছে। এই ধারাবাহিক উদ্যমে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন মণীন্দ্র রায় প্রণীত একটি দীর্ঘ কবিতা, 'ভিয়েতনাম'।

৬০১ পংক্তি বিস্তৃত এই কবিতাটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ে একদিকে যেমন এক এক বক্তব্যের কাব্যরূপ দেয়া হয়েছে, তেমনি, অপর দিকে অধ্যায়গুলি ক্রমানুসারে একটি অপরটির সম্পূরক। একটু মোটা ভাবে বিচার করলে দেখা যায় অধ্যায় ১—ভিয়েতনামের জাগরণ, ২—খণ্ডিত বাঙলা ও ভিয়েতনামের তুলনা, ৩—মুক্তিসেনাদের যুদ্ধ, ৪—ইতিহাসের শিক্ষা, ও ৫— ভিয়েতনামের মুক্তি; এভাবেই কবিতাটির বিবর্তনের বাঁকগুলো জেগে ওঠে।

প্রথম অধ্যায়ে ভিয়েতনামকে উপলক্ষ করে পৃথিবীর সর্বত্র ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শেকল ছিঁড়ে ফেলার জন্য রক্ত ও চোখের জলের পথে পীড়িত মানুষের বৈপ্লবিক লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছে। পড়তে পড়তে মনে হয়, চোখের সামনে যেন একটা মানচিত্র খোলা রয়েছে। এক জায়গায় দাঁড়াতে পারে না, চোখ অবিরাম বা অবিশ্রান্ত ভাবে ছুটে যায় ভারতের প্রায় প্রতিটি প্রদেশ শেষ করে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ-মহাদেশের "শত জাতি অধ্যুষিত ভূগোলের পলিতে বা মনে।" এবং স্বভাবতই শেষাংশে কবিকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, "একটা পথ কেবলি সম্মুখে,/যেন গোটা পৃথিবীরই গতির শপথ—/রাত্রিফাটা আকাশের উষার শিখরে/স্বাগত, স্বাধীন,/ভিয়েতনাম, জাগে ভিয়েতনাম।" বেশ একটা সমর্থ পুরুষালি মেজাজ আছে অধ্যায়টিতে, ভূগোল বা বিবৃতি অতিক্রম করে যা কবিতা হয়ে ওঠে।

যথেষ্ট ভালো কাব্যাংশ থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু প্রশ্ন থেকে যায় দ্বিতীয় অধ্যায়টিকে ঘিরে। প্রথমেই উদ্ধার করা যাক এ-জাতীয় কিছু সুঠাম পঙক্তি—

(১) "মনে পড়ে, চম্পা তুমি
সমুদ্রের দূর উপকূলে!
মনে পড়ে, সেদিনের সুবর্ণভূমির
দ্বীপময় ভারতের, শ্যাম-কম্বোজের
বাণিজ্যবায়ুর আনাগোনা।"

(২) "আর তাই নাপামের তরল আগুন
পোড়ায় পুরুষ-হাত, নারীর হৃদয়, আর
কচি-কাঁচা বাছাদের আদরের গাল।
আর তাই ধানক্ষেতে হাঁটুজলে মেয়ে—
পিছনে দাউদাউ গ্রাম, উলঙ্গ বালিকা,
দুচোখে বিশ্বের ঘৃণা, কাঁদে অসহায়।"

এই অংশে কবি খণ্ডিত বাঙলার সঙ্গে ভিয়েতনামের তুলনা ক'রে বেদনার্ত হয়ে বলছেন, "আমি জানি, যন্ত্রণা কি তার!" বিভাজন ছাড়া একটি দেশের সঙ্গে আরেকটি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, এমন-কি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চরিত্রগত কোনো মিল আছে কি? জার্মানির ক্ষেত্রেও কি চাইবেন তিনি এক-দেশতত্ত্বকে সমর্থন করতে? এ-অংশটি ভিয়েতনামের বহু অঞ্চলের ও বীর নায়কদের ব্যাপক নামোল্লেখে অযথা ভারাক্রান্ত।

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়টিতে ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম সার্থক কাব্যভাষা লাভ করেছে। পর পর উন্মুক্ত উজ্জ্বল পঙক্তিগুলি কবির অভীষ্ট লক্ষ্য ভেদ করেছে। বিশ্ববিধানে অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের যে বিবর্তনশীল রূপ দেশে কালে দেখা যায়, ভিয়েতনামের পটভূমিতে তাকে কবি সার্থকভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এ-অধ্যায়ে এক মুহূর্তের জন্য কবি অসতর্ক হননি ও তাঁর মুঠো কবিতার বল্গা থেকে শ্লথ হয়ে যায়নি। এক সর্বব্যাপী মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্নটিকে তিনি যখন তুলে ধরেন—

"তোমার সমুদ্রতীরে, ধানক্ষেতে, পাহাড়ে টিলায়
কোন মূল্যে বেঁচে আছ তুমি ?
তোমার প্রতিটি ঘরে ঘুমন্ত শিশুরা
উড়ন্ত বুলেট ঝাঁঝরা লুটেছে মাটিতে ;
পথে পথে কেঁদেছে জননী।
প্রতিটি সকাল সন্ধ্যা রক্ত ঢেলে তবু
তুমি জয়ধ্বনি।" অথবা আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের ভগ্ন-পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে কবি যখন বলেন—

"যতো সে পীড়নে হিংস্র
ততো তাকে টানে চোরাবালি—
যতো ডোবে ততো তার আথালি-পাথালি।
চতুর্দিকে টানে কাঁটাতার,
চতুর্দিকে উঁচানো সঙিন,
শুধু হেলিকপ্টারের—
রকেটের—প্লেনের গর্জন,
গ্যালন গ্যালন মদ,
মদিরাক্ষী বারবণিতার
ফ্লোর শো'র উল্লোল হুল্লোড়।
তবু ঠিক ঘাড়ের পিছনে
কে যেন দাঁড়িয়ে—শান্তি নেই ;" তখন সঠিকভাবেই কবির চেতনা ঘটনার নিয়ন্ত্রণ-শক্তির সঙ্গে সাজুয্য খুঁজে পায়। এবং তাই এ হেন বক্তব্য অনায়াসে সত্য হয়ে ওঠে, "ইতিহাস মোড় নেয়,/বোঝে কি তা কালের জহ্লাদ ?"

এই সত্যতার পথ ধরে কবি নির্ভুল ভাবে কবিতাটির অন্তিম অধ্যায়ে এগিয়ে গেছেন। প্রায় স্লোগানের মতো জীবন্ত হয়ে উঠেছে, "কথাটা এগিয়ে চলা ; / বুকে হাঁটা পাহাড়ে খাড়াই। / কথাটা আগুনে নামা ; / সাড়া তোলা মানুষের ঘরে।" ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাঁড়ে, সাঁওতাল পরগণায় বিরশা-সিধু, বাঁশের কেল্লার নায়ক তিতুমীর, চট্টলের প্রীতিলতা, তেলেঙ্গানা, কাকদ্বীপ তাই অলঙ্ঘনীয়ভাবে যাত্রী হয় বাস্তিলের অগ্নিভ দিনগুলির, পেত্রোগ্রাদ সাইবেরিয়ার শহীদদের, সাকো-ভেনসিত্তি, রোজেনবার্গ দম্পতি, ফুচিক, লুমুম্বা. গুয়েভারার। তাই, "অযুত শহীদ আসে, / পায়ে পায়ে লাখো লাখো বীর ; / সব দেশ মহাদেশ সময়ের শতাব্দী ডিঙিয়ে, / পৃথিবীর গূঢ়তম নাটকের শেষ অঙ্কে আজ / ওরা করে ভিড়।" দুনিয়ার মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে ভিয়েতনামের লড়াইকে সাফল্যমণ্ডিতভাবে মেল-বন্ধনে বেঁধে দিতে পারা 'ভিয়েতনাম'-এর কবি মণীন্দ্র রায়ের পক্ষে কম কৃতিত্বের নয়।

মানুষের মুখ। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কবিতা গ্রন্থাগার। তিনটাকা

যে সময়কে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির ঝুঁকি নিয়েও চল্লিশের দশক বলা হয়, সেই সময়ে যাঁরা কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে গোনা দু-তিন জনের কলম এখনো সমান ধারায় অকৃপণ। নিঃসন্দেহে তাঁদের একজন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তাঁর প্রণীত সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ 'মানুষের মুখ'। গ্রন্থের সমস্ত কবিতাই বিগত তিন বছর অর্থাৎ ১৯৬৭-৬৯ সনের মধ্যে লিখিত। তিন বছরের কবিতাগুলিকে তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে সাজানো হয়েছে। কাব্যের চতুর্থ অংশটিতে হো-চি-মিনের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ করা হয়েছে।

বছর পাঁচ/ছয়েকের মধ্যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, কখনো একক ভাবে (সভা ভেঙে গেলে, মুখে যদি রক্ত ওঠে, ভিসা অফিসের সামনে, মহাদেবের দুয়ার ও ওরা যতই চক্ষু রাঙায়), কখনো বা অপর কোনো কবির সঙ্গে (তৃণতরঙ্গ রৌদ্র। রাত্রি শিবরাত্রি—স-অতীন্দ্র মজুমদার এবং হাওয়া দেয়—স-অরুণ ভট্টাচার্য)। এই কাব্যগ্রন্থগুলিতে প্রাক্তন-রীতি কাটিয়ে মুখ্যত আনুষ্ঠানিক কবিতা রচনাতে মনোনিবেশ করেছিলেন কবি। কবি অপেক্ষা প্রগতিশীল সাংবাদিকের ভূমিকাই এসব জায়গায় বেশি

ভাবে পালন করা হয়েছে ; বলা বাহুল্য, তার ফলে কবির ক্রোধ ও ঘৃণা এত প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল যে, সেই অনুভব কতখানি কবিতা হয়ে উঠেছিল, তা নিয়ে অনেকের মতো আমারও কিছু স-সঙ্কোচ প্রশ্ন ছিল। তা ছাড়া এত দ্রুত পর পর বই প্রকাশ করে যাওয়া পাঠককুলকে বেশ একটু বিব্রত করে—কারণ তাঁরা তো সেই রন্ধন-শিল্প, সেই ধীর অথচ ঋজু কাব্যিক বিবর্তনের বাঁকটি খুঁজে বের করার জন্য অপেক্ষা করেন, বিশ্রাম চান। এমন সময়, আমাদের একই রকমের আশঙ্কায় আতুর করে বেরিয়েছে কবির সদ্য প্রণীত 'মানুষের মুখ'।

কিন্তু সুখের বিষয়, বস্তু ও ঘটনার ভিড় ছিঁড়ে বহুদিন বাদে গভীর আন্তরিকতায়, সংবেদন ও সচেতনার সাজুয্যে পরিস্ফুট হয়েছে প্রকৃত কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখ। আমাদের অনর্গল কাব্যপাঠের ঔদাসীন্যের উপর প্রায় জায়মান বিস্ময়ের মতো এসে পড়েছে কাব্যগ্রন্থটি।

'৬৭-র কাব্যাংশের উন্মেষ অবশ্য খুব পরিচ্ছন্ন নয়, তবে এখান থেকেই অবিরত কোলাহল ও একজাতীয় একঘেয়ে গুটিকতক শব্দ প্রয়োগের পালা অতিক্রম করে কবির বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা চোখে পড়ে। এই অংশে বীরেনবাবুর প্রিয় ঈশ্বর আছেন ; ধর্ম, ব্রাহ্মণ, আশীর্বাদ, রাজা ইত্যাদিও পুরনো রীতি-মাফিক আছে ; অবশ্য তাঁর কবিতায় উপরোক্ত বস্তুগুলির সংজ্ঞা সামন্ত-তান্ত্রিক নয়, খানিকটা নিত্য বা সত্যের চেহারা নিয়ে তারা আসে। জানি না, নিম্নোক্ত প্রয়োগগুলোও একালের পাঠকের কাছে ক্লিশে হয়ে এসেছে কি না—

(১) "প্রতিটি রুটির টুকরো, প্রতিটি ধানের শিষ জ্বলে যেন
ফিনকি দেয়া খুনের নিশান।" (গোর্কির জন্য)

(২) "রোদ না উঠতে, ফ্যান দাও!
রোদ চলে গেলে, ফ্যান দাও!" (কয়েকজন ভিক্ষুক)

(৩) "লাল টুকটুক নিশান ছিল
হঠাৎ দেখি শ্বেত কবুতর,
উড়ছে উর্ধ্বে, আরও উর্ধ্বে
ভুখমিছিলের মাথার উপর।" (লাল টুকটুক নিশান ছিল)

কিন্তু এই অধ্যায়েই কবিতা পরতে পরতে খুলতে আরম্ভ করেছে 'সত্যকাম', 'রাজত্ব' ও বিশেষভাবে 'জেলখানার কবিতা' ১, ২, ৩, ৪-এ। গভীর অর্থবহ

হয়ে কানে বাজে, কবি যখন লেখেন—"সারা দুপুর পাখিগুলি/রোদ পোহায় ; সমস্ত রাত পাখিগুলি/শীত তাড়ায়।" শীতার্ত রাতে দুপুরের সঞ্চিত উষ্ণতা বহন করে নিয়ে আসা জীবনের উত্তাপ যেন আমাদের বোধের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। জেলখানার কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল প্রফুল্ল ঘোষ সরকারের বিরুদ্ধে বাঙলার গণতান্ত্রিক মানুষের ব্যাপক আইন-অমান্য আন্দোলনের গৌরবদীপ্ত পটভূমিকায়, স্বয়ং কবি-ও যে-লড়াইয়ের সৈনিক ছিলেন। কবিতাগুলি পড়তে পড়তে আমার খুব মনে পড়ে যায়, অনেকদিন পর, নাজিম হিকমেত-কে। কাটা কাটা, ছোট, সংহত বক্তব্য—বিপুল আলোড়ন আত্মস্থ তন্ময়তায় থিতিয়ে এলে যেভাবে লেখা হতে পারে সার্থক কবিতা। জেলখানার বন্দীদের ঘিরে কবি যে রৌদ্রের উৎসব দেখেছেন, তাকেই এই কবিতাগুলিতে তিনি বর্ণাঢ্য ভাষায় ধরে রেখেছেন। যে-মানসিকতায় সার্থক, ঋজু ভঙ্গীতে লেখা হয়েছে—

> "গেট খুলে গেলে আমরা একটু আধটু রোদ পাব
> যদিও গেটের বাইরে গেট, পথ হাঁটলে
> আবার লোহার দরজা! ডাইনে বাঁয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধী,
> মিশতে বারণ।....
> তবু গেট খুলে যাওয়া ভাল ; বাইরে একটু পায়চারি করা যাবে।"
> (তিন)

তারই উত্তরণ হয় উন্নততর কাব্যভাষায়—

> "কারার আড়ালে জন্মদিন
> বাজায় ভোরের শঙ্খ ?
> তোমার, আমার, পৃথিবীর
> সব মানুষের
> মুখের ওপর এই ভোর
> কাঁপে না কি ?
>
> আমরা তো স্বপ্ন দেখি
> স্বদেশের প্রতি ঘরে একটি জন্মদিন।"　　　　(চার)

'৬৮র কাব্যাংশে কবিতার বিভা ক্রমশ প্রখর হয়ে উঠেছে। এই অংশের শ্রেষ্ঠ কবিতা 'প্যারীর আগুনে দীপ্ত ভুবন রাঙায়' পুরোপুরি উদ্ধার করে দেবার লোভ বহুকষ্টে দমন করতে হচ্ছে। এমনই কয়েকটি অনন্য কবিতা 'ক্রুশবিদ্ধ মানুষের ছবি', 'গানের মানুষ,' তিন পংক্তির 'সে', 'বৃষ্টিতে মিলায়,'

'জন্মভূমি' ও 'রাত্রি ক্ষমাহীন'। কেমন অনায়াস অনিবার্য বলে মনে হয় —

(১) "তিমির বিনাশী তুই, জন্মভূমি!
মেলাস বুকের পদ্ম, দিঘির কান্নাকে
শিশুর মুখের রৌদ্রে, শান্ত
ঊষার আগুনে।" (জন্মভূমি)

(২) "মেলায় এসো শোকহরণ গানের মানুষ, আনো
হীরার মতো রৌদ্র ক্রীতদাসের মুখে।" (গানের মানুষ)

(৩) "আমার ঘরভরতি শুধু ক্রুশের চিহ্ন, করুণাহীন ;
কোথায় আমার রক্তমাখা আলোর ফুল, ক্ষমা ?"
(ক্রুশবিদ্ধ মানুষের ছবি)

'৬৯-এর কবিতার অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে 'রক্তাক্ত দক্ষিণা' নামে একটি অনবদ্য, সম্ভবত এই সঙ্কলনের শ্রেষ্ঠ, কবিতা দিয়ে—

"কঠিন সবিতাব্রত, তাই রাত জেগে
কবিতা লিখি না।
অথচ সূর্যের স্তব ছাড়া কবিতার
আজ কোন অর্থ আছে কি না।

ভোরের বৃক্ষের কাছে, সন্ধ্যার নদীকে
প্রশ্ন করি····নিরুত্তর····একমাত্র দ্বিপ্রহর দাবি করে রক্তাক্ত দক্ষিণা।"

বাইরের উত্তাপকে এভাবেই ভিতরে নিয়ে এসে বোধির উজ্জ্বল আনন্দে লেখা হয় কবিতা—যা সত্যিকারের অর্থে কবিতার প্রগতি বা মুক্তিকে বয়ে আনে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রশংসিত কবিতা 'লেনিন' এই অংশভুক্ত। এ-অধ্যায়ে একটি অত্যন্ত দুর্বল কবিতা আছে, যা ক্ষিপ্ত চীৎকার ছাড়া আর কিছু নয় ; নাম 'দেয়ালের লেখা'। আশা করি, ভারসাম্য সম্পর্কে কবি আরেকটু সচেতন হবেন। গান্ধীজীর প্রতি কবিতাটি বিতর্কমূলক। পাঁচ পঙক্তির কবিতায় গান্ধীজীর সামগ্রিক দর্শনকে বিদ্রূপ করা আমার কাছে দায়িত্বহীন হঠকারিতা বলে মনে হয়েছে।

হো চি মিনের কবিতার অনুবাদগুলি যথাযথ, এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। ছাপা খারাপ, যথেষ্ট মুদ্রণ প্রমাদ রয়েছে। গ্রন্থের অঙ্গসজ্জা রীতিমতো দীন। বিশেষ করে আজকাল কতো সুন্দর সেজে গুজে কবিতার বই বেরোয়!

অমিতাভ দাশগুপ্ত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় সংহতি সপ্তাহ

২৪শে জানুয়ারি থেকে ৩০শে জানুয়ারি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে, জাতীয় সংহতি সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হলো। ৩০শে জানুয়ারি গান্ধীজীর মৃত্যুদিনে 'শহীদ দিবস'-এ সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী একটি উল্লেখযোগ্য ও বর্ণাঢ্য শোভা-যাত্রা বেরোয়। বাঙলাদেশের বহু বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতি-সেবী ঐ শোভাযাত্রায় অংশ নেন। তা ছাড়া ছাত্রছাত্রীরা ঐ সংহতি সপ্তাহ উদ্‌যাপন ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানগুলির উদ্যোগ নিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সংহতি সংস্থা।

জাতীয় সংহতি সপ্তাহের উদ্‌যাপনে শহীদচিত্রমালা প্রদর্শনী ও আলোচনাচক্র বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ধর্ম, সম্প্রদায়, শ্রেণী নির্বিশেষে আত্মদানকারী মহান শহীদদের শহীদ চিত্রমালা প্রদর্শনী বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান-শিখ প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের মানুষ কেউ কারো থেকে পিছিয়ে থাকেননি। সকল রাজ্যের সকল ভাষা সম্প্রদায় ও ধর্মের মানুষই যে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আত্মদান করেছিলেন—প্রদর্শনীটি দেখতে দেখতে এ-সব কথা মনে পড়ে যায়। সাম্প্রদায়িকতাবাদী, ভাষান্ধ ও সঙ্কীর্ণতাপন্থীদের সমস্ত প্রকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত জাতীয় সংহতি-বিরোধী গোপন ও প্রকাশ্য প্রচারের বিরুদ্ধে এ-প্রদর্শনী একটি জ্বলন্ত প্রতিবাদের মতো। শহীদ চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আবেগস্পন্দিত কণ্ঠে শোনালেন: মেদিনীপুরের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন আন্দোলন পর্যায়ে হিন্দু-মুসলিম কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে হিন্দুদের পাশে মুসলিমদের ছিল ঐকান্তিক সহযোগিতা, সমর্থন ও অংশ গ্রহণ। ২৪শে জানুয়ারি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসে, উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন আলোচনা চক্র উদ্বোধন করলেন। নতুন দৃষ্টিতে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনার এই প্রচেষ্টাকে তিনি স্বাগত জানালেন।

আলোচনা চক্রের অন্যতম বিষয় ছিল 'ভারতের নব জাগরণ'। তরুণ বুদ্ধিবাদী অধ্যাপক ডঃ প্রদীপ সিংহ উনিশ শতকে কলকাতার সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের এক তথ্যপূর্ণ বিবরণ দিয়ে বললেন, নবজাগরণের

অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল 'বাজার অর্থনীতি'। বাবু-কালচার তারই একটি দিক। ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নবজাগরণের মধ্যে সনাতন ধর্মকে পুনর্জীবিত করার যে প্রয়াস ছিল—তার সদর্থক ও নঞর্থক দিকগুলি চমৎকারভাবে আলোচনা করেন। 'নন্দন' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রী সৈয়দ সাহেদুল্লাহ্‌ নবজাগরণের সামাজিক পটভূমি, বঙ্কিমের ভূমিকা, নবজাগরণের নেতাদের শ্রেণীচরিত্র ও তাঁদের প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ ইত্যাদি বিষয়ে এক চমৎকার বিশ্লেষণমূলক ভাষণ দেন।

সভাপতি ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর বক্তব্যে নবজাগরণের বিভিন্ন দিকগুলি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমের প্রগতিশীল দিকগুলি তুলে ধরেন।

আলোচনার দ্বিতীয় দিনে 'স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলন' বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক শান্তিময় রায় স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমি, তার বৈশিষ্ট্য, তার ফলশ্রুতির কথা উল্লেখ করেন। এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অসহযোগ আন্দোলনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমির এক তথ্যপূর্ণ ও মনোজ্ঞ বিবরণ দেন। তিনি গান্ধীনেতৃত্বের প্রগতিশীল ভূমিকা ও তার স্ববিরোধিতাগুলি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন। আলোচনার মূল সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য। তিনিও তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন।

তৃতীয় আলোচনার বিষয় ছিল 'অগ্নিযুগ'। এই আলোচনার সভাপতি ছিলেন প্রবীণ বিপ্লবীনেতা শ্রীসতীশ পাকড়াশী। তিনি অগ্নিযুগের আদি থেকে শেষ পর্যন্ত প্রধান প্রধান দলের ভূমিকা, তাঁদের মুক্তিপ্রয়াস, ব্যর্থতার কারণ ও আত্মত্যাগের কথা সবিস্তারে বলেন।

বিপ্লবী শ্রীযুক্তা বীণা দাস 'অগ্নিযুগ'-এর পটভূমি ও এই দুই যুগের মধ্যে সংযোগের সমস্যাবলী এবং বিপ্লবী মহিলাদের ভূমিকার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। এই আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীভূপেন রক্ষিতরায়, শহীদ ভগৎ সিং-এর সহকর্মী শ্রীসুরযপ্রকাশ আনন্দ ও শ্রীশান্তিময় রায়। অধ্যাপক গোপাল হালদার বাঙলার সাহিত্যে, সঙ্গীতে, সমাজচিন্তায় অগ্নিযুগের ভূমিকার এক মনোজ্ঞ বিবরণ দেন।

প্রাচীন বিপ্লবী শ্রীনগেন্দ্রশেখর চক্রবর্তী তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে বলেন যে "আমরা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বাধীনতার কথা কখনো মনে স্থান দিই নাই। মুসলিমরাও ১৯১০-এর পর থেকে বিভিন্ন প্রদেশে এই

বিপ্লবী প্রয়াসে সমান ভাবে যুক্ত থেকে সমান ত্যাগ স্বীকার করেছেন।" অধ্যাপক শান্তিময় রায় 'অগ্নিযুগ' যে "হিন্দু পুনর্জীবনের যুগ" এই ধরনের ভুল ধারণার নিরসনে কয়েকটি তথ্যপূর্ণ যুক্তি দিয়ে বলেন "এই যুগের" মধ্যেও রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তন ঘটতে বাধা এবং তা ঘটেছেও। বঙ্কিম, বিবেকানন্দ ও শাওয়ালীউল্লা থেকে যার আরম্ভ—ম্যাটজিনি, গ্যারিবল্ডী, মাইকেল, কলিন্স, ক্রপটকিন হয়ে মার্কস ও লেনিনের চিন্তার মধ্যে সে-যুগের শেষ। ভগৎ সিং, বরকতুল্লার চিন্তার মধ্যেই এ-রূপরেখা পরিষ্কার বোঝা যায়।

চতুর্থ আলোচনা হয় জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে ছাত্র, যুবক ও মহিলাদের ভূমিকা প্রসঙ্গে। এই আলোচনার উদ্বোধন করেন অধ্যাপক শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায়। তিনি ইয়ং বেঙ্গল থেকে শুরু করে আনন্দমোহন, সুশীল সেন, কানাইলাল হয়ে ৪৬ সালের ছাত্র আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। শ্রীযুক্তা বিস্থা মুন্সী এই আলোচনায় মহিলা শাখার অংশগ্রহণকারী হিসেবে স্বর্ণকুমারী থেকে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী পর্যন্ত বীরাঙ্গনাদের কথা উল্লেখ করেন।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর অন্যতম নায়ক ও সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী শ্রীদেবনাথ দাস আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তিযুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম-শিখ এবং খৃষ্টানদের বিপ্লবী ঐক্য ও আত্মত্যাগের বহু দৃষ্টান্ত দেন। এই আলোচনার শেষ বক্তা শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় করাচির নৌবিদ্রোহের অন্যতম অংশগ্রহণকারী ছিলেন। যখন তিনি ১৮ বছরের ছাত্র আনোয়ার হুসেনের অভূতপূর্ব বীরত্বের চিত্র তুলে ধরেন, তখন সভার প্রত্যেকটি শ্রোতার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। শ্রীব্যানার্জি বলেন "ভারতের মুক্তি আন্দোলন যদি আজাদ হিন্দ বাহিনী, নৌবিদ্রোহ ও ২৯ এ জুলাই-এর পথে অগ্রসর হতে পারত, তবে দেশবিভাগ হতো না—বিপ্লবের সিংহদ্বার এক বিরাট সম্ভাবনাময় পথের দিকে খুলে যেত। কিন্তু তা হয়নি। কেন হয়নি, কারা তা হতে দেয় নি?" যখন নৌবিদ্রোহে হিন্দু-মুসলিম-শিখ ও খৃষ্টান নওজোয়ানদের অসামান্য ভ্রাতৃত্ববোধ, সংগ্রামী দৃঢ়তা ও মহান আত্মত্যাগের একটির পর একটি কাহিনীর তিনি বর্ণনা দেন, তখন আলোচনাচক্রের সবার কাছ থেকে তিনি আন্তরিক অভিনন্দন লাভ করেন। সবাই তাঁকে এই মহিমময় কাহিনী প্রত্যেক কলেজে কলেজে ছাত্রদের কাছে পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেন।

পঞ্চম দিনে আলোচনা হয় শ্রমিক, কৃষক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার ভূমিকা প্রসঙ্গে। সভাপতি ডঃ সুনীলকুমার সেন এই আলোচনার উদ্বোধন

করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে উপস্থিত করার মহৎ এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজচিন্তা ও সমাজসংস্থাগুলির সংস্কারের ক্ষেত্রে কৃষক বিক্ষোভ ও বিদ্রোহগুলির অসামান্য অবদানের কথা উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পাবনার কৃষকবিদ্রোহের ও বিভাগপূর্ব ভারতে উত্তরবঙ্গে তেভাগা আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন। অন্যতম বক্তা শ্রীধরণী গোস্বামী শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত প্রয়াসের এক বিশেষ ধারাকে চিহ্নিত করেন। বলশেভিক বিপ্লবের পর কিভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন সংগঠিত প্রয়াস শেষ পর্যন্ত ৪৬-এর ২৯ এ জুলাই উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করে. তিনি সে-ধারার বিবরণ দেন।

অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য জাতীয় সংহতি আন্দোলনের কয়েকটি সমস্যার কথা উল্লেখ করে শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে এই আন্দোলনকে সংহত করতে বলেন। শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রথম আরম্ভ ও তার ধারাবাহিক ক্রমবিকাশের এক অসাধারণ তথ্যপূর্ণ বিবরণ দিয়ে ত্রিশোত্তর যুগে ফাসীবিরোধী আন্দোলনের স্রোত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে কি অস্বাভাবিক সমস্যাসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগের আন্তর্জাতিক ঔপনিবেশিক মুক্তি আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে সম্মিলিত করেছিল— তার চমৎকার বিবরণ দেন।

আলোচনার শেষ দিনে ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে মুসলিমদের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনার উদ্বোধন করে অধ্যাপক শান্তিময় রায় এই ধরনের আলোচনার কৈফিয়ৎ হিসেবে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ঐতিহাসিকদের তিনটি ভ্রান্ত তত্ত্বের বিরাট প্রচার ও গভীর প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। সেগুলি হচ্ছে: (১) ভারতবর্ষ ১২০০ সাল থেকে পরাধীন; (২) ভারতে কোনোদিন সাংস্কৃতিক ঐক্য হয়নি; (৩) জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে মুসলিমরা বিশ্বাসঘাতক। বর্তমানকালের সাম্প্রদায়িকতার মনোভাবকে এই তিনটি প্রচারের দ্বারা সজীব রাখা হয়েছে! এই তিনটির মধ্যে শেষোক্তটি সম্পর্কে আলোচনার সময় তিনি সবিস্তারে সকল যুগে মুসলিমদের সংগ্রাম, ত্যাগ, সাহস, বীরত্বের বিভিন্ন উদাহরণ দেন। প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে বিপ্লবী মুসলিম দলগুলির মুক্তিপ্রয়াসে তিনি সেনাবিদ্রোহের বহু নিদর্শন দেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি গণবিপ্লবী আন্দোলন, সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং ৪৬-এর পুলিশ, সেনা ও নৌবিদ্রোহে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের মহিমময় মিলনের কথা ব্যক্ত করেন।

এই আলোচনায় অংশগ্রহণকারী স্বরযপ্রকাশ আনন্দ ও ডাঃ এইচ.এল. চোপরা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাঞ্জাবে দিল্লীর দেওবন্ধু মহাবিদ্যালয়ে শত শত মুসলিম যুবকের দুঃসাহসিক সংগ্রামের এক তথ্যপূর্ণ বিবরণ দেন। শেষ বক্তা ছিলেন আবদুর রেজ্জাক খাঁ। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে সুদীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী ব্যক্ত করে তিনি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে আবেদন করেন—পরস্পরকে জানতে ও বুঝতে হবে।

সভাপতি ডঃ আতাকরিম বার্কের ভাষণের পর আলোচনাচক্রের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এই আলোচনা, শহীদ প্রদর্শনী, পাঁচটি চলচ্চিত্র (মধুসূদন, বাঁশের কেল্লা, ক্ষুদিরাম, ভুলি নাই, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল) ও যাত্রা (বিনয়-বাদল-দীনেশ) প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রায় বিশ সহস্রাধিক নরনারী যোগদান করেন।

কল্যাণ চৌধুরী

‘সবুজ বিপ্লব’ বনাম কৃষি বিপ্লব

অধ্যাপক গানার মিরডাল এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা বিষয়ে আলোচনা করে কয়েক খণ্ডে ‘এশিয়ান ড্রামা’ নামে গবেষণামূলক একটি বই লিখেছেন। বইটিতে এশিয়ার দারিদ্র্য তথা উন্নয়নভিত্তিক নানা সমস্যার কথা বলা আছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও অত্যন্ত মূল্যবান গবেষণামূলক সৃষ্টিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত বইটিতে লক্ষ্য করা যায়। ভারতের গ্রাম তাঁর মতে, “যেন এক জটিল অণু, যার বিভিন্ন অংশে চূড়ান্ত টানাপোড়েন চলেছে। অবশ্য এই টানগুলি এমনভাবে ছড়ানো যে একটা ভারসাম্য তার ফলে বজায় রয়ে গেছে। ভাবা যেতে পারে, টানগুলি যদি একটু অন্যভাবে বণ্টিত হয়, অণুটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে যাবে। সম্ভবত নিজের থেকে এমন একটা কিছু ঘটবে না, তবে বাইরে থেকে কোনো শক্ত ধাক্কা এ-বিস্ফোরণ সম্ভবসাধ্য করে তুলবে।”

মিরডালের উক্তির মধ্যে অবশ্যই সত্য রয়ে গেছে। কিন্তু বাইরের ধাক্কাই যে কেবল ভারতের গ্রামঅর্থনীতি ও ভূমিব্যবস্থায় বিস্ফোরণ এনে দেবে এমন কথা বলা অর্ধসত্য মাত্র। আসলে ভারতের ভূমিব্যবস্থার মধ্যেই বিস্ফোরণের উপাদান পরিমাণমূলকভাবে সঞ্চিত হয়ে আছে, এখন গুণগত তাৎপর্যে তা বিস্ফোরণের অপেক্ষায় রয়েছে। অবশ্য গুণগত পরিবর্তনের জন্য বাইরের ধাক্কা

অনুঘটক বা ক্যাটালিস্টের কাজ করতে পারে। ভারতের কৃষিতে সাম্প্রতিক পুঁজিবাদী বিকাশের আঘাত, যার অন্যনাম বহু ঢাক পিটিয়ে 'সবুজ বিপ্লব' বলা হচ্ছে—সেই অনুঘটকের কাজ করতে পারে। এই অতি কথিত 'সবুজ বিপ্লব'-এর কার্যকরী ফল সম্পর্কে বড় মহলেও ভাবনার অন্ত নেই। এমন কি অর্থবান ধনী চাষীদের লক্ষ্য করে শ্রীচ্যবনও বলতে বাধ্য হয়েছেন, "এই 'সবুজ বিপ্লব' যদি সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়, আমার সন্দেহ হয় এ-সবুজ বিপ্লব আর সবুজ নাও থাকতে পারে।" কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে এ-কথা ঠিক যে এ-বছরই এ-দেশে প্রায় নয় কোটি ষাট লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হবে। কিন্তু এই উৎপাদন বৃদ্ধি ও তারই সঙ্গে গ্রামে ভূমিবণ্টনের অসমতা এবং শোষণ-বৃদ্ধি সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে।

রাষ্ট্রসংঘের সামাজিক উন্নয়নের আর্থনীতিক ও সামাজিক কমিশনের উদ্দেশে লিখিত একটি নোটে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সম্পাদক উ থাণ্ট উন্নয়মান দেশগুলির ভূমিসংস্কার বিষয়ে কিছু সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। ভারতের 'সবুজ বিপ্লব' সম্পর্কে বিশেষভাবে তাঁর সাবধানবাণী এড়িয়ে যাবার মতো নয়। বেশি ফলনের বীজ ব্যবহার, সার, সেচ ও কীটনাশক ঔষধের বর্ধমান ব্যবহারের ফলে যে উৎপাদন বেড়েছে, তাকে উ থাণ্ট "তৃতীয় বিশ্বে সাম্প্রতিককালের গ্রামদুনিয়ায় সন্দেহাতীতভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ" বলে অভিহিত করেও বলছেন, এই উৎপাদনবৃদ্ধিজনিত 'সবুজ বিপ্লব' বহুবিধ সামাজিক সমস্যাকে একেবারে সামনে এনে ফেলেছে। উ থাণ্ট আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "এই সবুজ বিপ্লব প্রথমত গ্রাসাচ্ছাদনে টিকে থাকা চাষীর উপকার না করে যে-চাষী ইতিমধ্যেই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপাদন করছে তারই উপকার করবে, এমন-কি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপাদনকারী চাষীদের মধ্যে বড় চাষীরা ছোটদের চেয়ে বেশি উপকৃত হবে.... এ-সম্পর্কে কাগজপত্র পড়ে ধারণা হয় যে সবুজ বিপ্লবের লাভ আপেক্ষিক ভাবে কম লোকজনের ভাগ্যেই জুটেছে।" উ থাণ্ট সম্ভাব্য পরিস্থিতিও খুঁটিয়ে দেখেছেন। লিখেছেন, "ছোট চাষীরা বড় চাষীর কাছে ক্রমশ বাজার থেকে হটে যেতে বাধ্য হবে এবং প্রজাউচ্ছেদ ঘটবে। যতক্ষণ চাহিদা যোগানের চেয়ে বেশি থাকবে, কৃষকরা জোরালো প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে না। যে-সব দেশ খাদ্য আমদানীকারী নয় কিন্তু বিদেশে জোরালো চাহিদার দাক্ষিণ্যে কৃষি উৎপাদনের রপ্তানীকারী, তাদের ক্ষেত্রে এমন অবস্থা প্রযোজ্য। কিন্তু কালক্রমে যখন যোগান আর চাহিদার মধ্যে আর ফারাক থাকবে না বরং

ক্রেতার বাজার দেখা দেবে, তখন ছোট চাষীকে বড় চাষীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে।" ফলে ভারতেও এই 'সবুজ বিপ্লব' বড় বড় জমির মালিকের ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে। উ থাণ্ট আরো বলছেন যে "পাঞ্জাবে সবুজ বিপ্লবে উপকার হয়েছে বিশ শতাংশেরও কম কৃষি পরিবারের। কর বেড়েছে, জমির দাম ক্রমশ চড়া হয়েছে, খাজনা ক্রমবর্ধমান, ফলে প্রজার অবস্থা ভালো না হয়ে বরং আরো খারাপ হয়েছে।"

ভারতের কৃষিমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামও গত ডিসেম্বরে বোম্বাইয়ে কংগ্রেস অধিবেশনের ভাষণে বলেছেন, "চাষের ক্ষেত্রে অগ্রগমন ঘটেছে। চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় এবং ঋণের ব্যবস্থারও উন্নতি হয়েছে। যারা কয়েকটি টাকার যৎকিঞ্চিতের উপরে টিকে রয়েছে তারা নয়, এতে লাভ হয়েছে সংখ্যালঘু —ধনী ও মধ্য চাষীর। কৃষিজীবী পরিবারগুলির ৪৭ শতাংশ, এক একর করে জমির মালিক, ২২ শতাংশের হাতে এক কণা জমিও নেই। তিন থেকে চার শতাংশ বড় চাষীর হাতেই সব ক্ষমতা। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিপুল। সরকারী যন্ত্রের সঙ্গে মিলে তারা সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারী সংস্থাগুলি যে কৃৎকৌশল, সম্পদ প্রভৃতির সুযোগ দেয়, এরা তার সবটাই কুক্ষিগত করে রাখে। গ্রামের বাকি দরিদ্র অর্ধাংশ আর কাকেই বা যৎকিঞ্চিৎ সুযোগ পাবার জন্যে ধন্যবাদ জানাবে!"

উ থাণ্ট বলছেন সামাজিক সুবিচারের দাবির কথা, বলছেন 'সবুজ বিপ্লব'-এর দাক্ষিণ্যে বিপনন ও জমির মালিকানার কেন্দ্রীভবনের কথা। ভারতের কৃষিমন্ত্রী বলছেন, সরকারী সংস্থাগুলির সহায়তায় কৃষিতে পুঁজিবাদের বিস্তারের কাহিনী। এক কথায় বলা যেতে পারে, ভারতের কৃষিতে এই তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লব' ধনীকে ধনী করেছে, দরিদ্রকে আরো দরিদ্র করেছে, গ্রামে শোষণের মাত্রা বাড়িয়েছে এবং গ্রামীণ অর্থনীতির পুরানো ভারসাম্য বদলে দিয়েছে। মিরডালের ভাষায় বলা যেতে পারে, এ-যেন বাইরের ধাক্কা। কিন্তু পুরোটাই কি বাইরের ধাক্কা? বুর্জোয়াশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগ ভিত্তিক ভারতের কৃষি-অর্থনীতির গত বিশ-বাইশ বছর বিকাশের মধ্যেই কি তার বীজ নিহিত ছিল না?

'সবুজ বিপ্লব-এর' সূত্রপাত হলো কি করে? ১৯৬৫ সালে শ্রী সুব্রাহ্মণ্যমের উদ্যোগে অধিক ফলনের জন্য "উন্নত যন্ত্রপাতি এবং আরও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সহ বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের সুশৃঙ্খল ব্যবহার" সাপেক্ষ এক 'নতুন রণনীতি' বা স্ট্র্যাটেজির প্রবর্তনা ঘটে। 'অধিক ফলনের বিবিধ কর্মসূচি' প্রয়োগের জন্য

প্রগাঢ় চাষের লক্ষ্যে বেছে নেওয়া কয়েকটি জেলায় এই 'নতুন রণনীতি' চালু করার ব্যবস্থা হলো। শ্রীসুব্রাহ্মণ্যম পূর্বতন খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী এস. কে. পাতিলের কাছ থেকে এই প্রকল্পের উত্তরাধিকার পান। ১৯৬১ সালে শ্রীপাতিল ফোর্ড ফাউণ্ডেশন-এর প্রগাঢ় কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচির (IADP) পাইলট প্রকল্প হিসাবে ১৫টি গম এবং ধান্যউৎপাদন অঞ্চল গ্রহণ করেছিলেন। এই কর্মসূচি সাধারণত 'প্যাকেজ প্রোগ্রাম' নামে পরিচিত! প্যাকেজ প্রোগ্রামের এলাকাগুলি এই নতুন রণনীতির অঞ্চল বলে ১৯৬৫ সালে বিবেচিত হলো। খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনায় আরও ছয় কোটি একর জমি এই নয়া নীতির অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে ধরা হয়েছে। বলা হচ্ছে, অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের ৭৫ শতাংশই নাকি আসবে এই ছয় কোটি একর থেকে।

এই 'নয়া রণনীতি' প্রয়োগের প্রথম থেকেই বামপন্থী দলগুলি এ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন, ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ব্যতীত বৈজ্ঞানিক কৃৎকৌশল ইত্যাদি জমিতে প্রয়োগ করা হলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। উপরন্তু ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য গ্রামাঞ্চলের জীবন অবধারিত-ভাবে সংগ্রামের সূচিমুখে উত্তীর্ণ করে দেবে। এ-সব কথা কমিউনিস্টদের হিস্টিরিয়া বলে উড়িয়ে দেওয়া হলো। শেষে যা ঘটল তাতে রাজশক্তির চোখেও সরষেফুলের ক্ষেত মাঝেমধ্যে ভেসে উঠছে। USAID-র বিশেষজ্ঞ ভারত সরকারের কৃষিমন্ত্রকের উপদেষ্টা শ্রীফ্রান্সিন ফ্রাঙ্কেল IADP বিষয়ে একটি বিবরণী উপস্থিত করলেন। বিবরণী পড়ে বোঝা গেল, ভারতের ভূমি সমস্যার আপাত স্থিতাবস্থার তলায় বারুদ জমে আছে, যে কোনো মুহূর্তে স্ফুলিঙ্গ ডিনামাইট ফাটিয়ে দেবে। আসলে ঐ 'নয়া নীতি' IADP ভারতের সমাজ-অর্থনীতির শিকড় ধরেই টান দিয়েছে, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে।

ফ্রাঙ্কেল সাহেব ঐ 'নয়া নীতি'র ফলে উদ্ভূত সমাজ-আর্থনীতিক সমস্যা ইত্যাদি পর্যালোচনা করতে চেয়েছিলেন। IADP তো বটেই, বেশি ফলনের বিবিধ কর্মসূচির প্রভাব কতখানি গ্রামভারতের আয়বণ্টনের উপরে, কতটাই বা গ্রামে সামাজিক ও আর্থনীতিক সম্পর্কের উপরে পড়েছে—সেটাই ফ্রাঙ্কেল সাহেব দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি IADP জেলাগুলির মধ্যে মাত্র পাঁচটি জেলা তাঁর গবেষণার কাজের জন্ম বেছে নেন। জেলাগুলি হলো লুধিয়ানা (পাঞ্জাব) পশ্চিম গোদাবরী (অন্ধ্র) তাঞ্জাভুর (তামিলনাড়ু), পালঘাট (কেরেলা) ও বর্ধমান (পশ্চিম বঙ্গ)।

ঐ গবেষণা থেকে ধরা পড়ল যে, যে-সব অঞ্চলে বেশি ফলনের বীজ, বেশি সার, সেচ ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার বেড়েছে, সে-সব অঞ্চলেই, বিশেষত গম-উৎপাদন অঞ্চলে, প্রায় সব শ্রেণীর কৃষকদেরই আয় ও উৎপাদন বেড়েছে। তবে ধান্য উৎপাদন অঞ্চলে কৃষি জলবায়ুর অবস্থার বৈগুণ্যে বেশি ফলনের বীজের তেমন উৎসাহব্যঞ্জক ফল পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও বলা চলে, ঐ ধান্য অঞ্চলেও সার, কীটঘ্ন ঔষধ এবং অন্যবিধ আধুনিক ব্যবস্থার প্রয়োগের ফলে 'দেশী' ধরনের বীজের উৎপাদনের চেয়ে বেশি উৎপাদন হয়েছে।

কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধিই বড় কথা নয়। উৎপাদন বৃদ্ধিজাত ফল কিভাবে বণ্টিত হয়েছে—সেটাই ভূমি অর্থনীতিতে বিশেষভাবে দেখবার কথা। এই 'নয়ানীতি'র ফল দারুণ অসমভাবে বণ্টিত হয়েছে। লুধিয়ানা জেলায় যেখানে অধিকাংশ চাষীরই ১৫ থেকে ২০ একর বা তারও বেশি জমি আছে, সেখানেও ফসল ও আয়বৃদ্ধির ফল অসমানভাবে বণ্টিত হতে দেখা গেছে। ১০ একর বা তারও চেয়ে কম জমির মালিক চাষীদের নিচুতলার শতকরা ২০ শতাংশের আর্থনীতিক অবস্থা বরং আরো খারাপ হয়েছে। আসলে, এই নতুন নীতির জন্যে প্রয়োজনীয় ছোটখাটো সেচব্যবস্থার মতো কোনো ব্যবস্থায় লগ্নি করা এদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেননা, তেমন মূলধনই তাদের আয়ত্তাধীন ছিল না। অন্যদিকে কিন্তু ২৫।৩০ একর বা তারও চেয়ে বেশি জমির মালিকেরা, জমি উন্নয়নের জন্য অনেক বেশি মূলধন লগ্নি বা যন্ত্রব্যবহার করতে পেরেছে। পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতরা এটাই আগে থেকে কল্পনা করে নিয়ে গদগদ হচ্ছিলেন। তাঁদের মতে, ছোট চাষীরা 'অযোগ্য চাষী'। তাঁরা চান এঁরা কৃষি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাক। তাঁরা মনে করেন বড় বড় কৃষিক্ষেত্র, প্রচুর মূলধন লগ্নি, কৃষির যন্ত্রীকরণ—সব কিছু মিললে পাঞ্জাবে দুধ ও মধু বয়ে যাবে। কিন্তু পাঞ্জাবে ভূমি ব্যবস্থাটি কেমন? সরকারী তথ্য অনুযায়ী লুধিয়ানার ৪৬ শতাংশ কৃষকই খাজনা বন্দোবস্তে জমির মালিকের কাছ থেকে জমি নিয়ে থাকে। পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাবে লুধিয়ানার আবাদযোগ্য জমির ২৫ শতাংশই এই প্রজারা চাষ করে থাকে। এই প্রজারাই ১০ একরের চেয়ে কম জমির চাষী। বলা যেতে পারে, 'সবুজ বিপ্লব'-এর হাতে হাতে পয়লা ফল হলো লুধিয়ানার এক তৃতীয়াংশ চাষীর জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া। একদিকে উচ্ছেদের সম্ভাবনা, অন্যদিকে ইতিমধ্যেই ভূ-স্বামীরা উচ্চহারে খাজনা দাবি করছে। পাঁচ বছর আগে যে-জমির খাজনা ছিল একর পিছু ৩০০—৩৫০ টাকা, তা এখন ৫০০

টাকায় দাঁড়িয়েছে। বর্গা ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। ৫০ : ৫০ ভাগ থেকে, এখন মালিক : ভাগচাষীর হার হয়েছে ৭০ : ৩০। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে ৮০ শতাংশ চাষী পরিবার আট একরের চেয়েও কম হারে জমি চাষ করে থাকে। সে-অঞ্চলে এই ধনী ও দরিদ্রের আপেক্ষিক অবস্থা আরও বিপজ্জনক মেরুপ্রস্থানে চিহ্নিত।

ধান্য চাষ অঞ্চলে ধনীদরিদ্রের এই বৈষম্য আরও বিস্তৃত হতে শুরু করেছে! ফ্রানসিন ফ্রাঙ্কেল পশ্চিম গোদাবরী, থানজাভুর, পালঘাট ও বর্ধমান জেলার তথ্য অনুযায়ী দেখেছেন, "চাষীদের গরিষ্ঠাংশের—ধান্য বলয়ে প্রায় ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ—আর্থনীতিক অবস্থার আপেক্ষিক অবনতি হয়েছে ; মৌখিক বন্দোবস্তে নিযুক্ত অরক্ষিত প্রজাদের জীবনযাত্রার মানের নিরঙ্কুশভাবে অবনয়ন ঘটেছে।" বর্ধমান জেলায় অধিকাংশ চাষীরই জমি নেই, কেউ বা তিন একরের চেয়ে কম জমিতে অলাভজনক চাষে নিযুক্ত। বর্তমানে এক তৃতীয়াংশ কৃষি পরিবার সম্পূর্ণই ক্ষেতমজুর পরিবার। বাকি দুই-তৃতীয়াংশ চাষী পরিবারের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই বর্গাচাষে নিযুক্ত। একটি সাম্প্রতিক তথ্যে জানা যাচ্ছে যে বর্ধমান জেলার অর্ধেক আবাদযোগ্য জমি বর্গাচাষের অধীন।

'সবুজ বিপ্লব'-এর হিসাব নিকাশ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বর্গাচাষী বা ভাগচাষীর জমিতে মূলধন লগ্নি করার মতো ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ বিক্রয় কৃত পণ্য থেকে এমন উদ্বৃত্ত আসে না, যা দিয়ে স্বল্পস্থায়ী (বীজ, সার) মধ্যস্থায়ী (বলদ কেনা) বা দীর্ঘস্থায়ী (জমি উদ্ধার, সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন, যান্ত্রিক লাঙল ব্যবহার) প্রয়োজন মেটানো যেতে পারে। ভূস্বামী বা স্থানীয় ব্যবসায়ীর কাছে বছরে ৩৬ শতাংশ সুদে কৃষিঋণ করতে তারা বাধ্য হয়। এ-ছাড়া স্থানীয় ধরনের ঋণ—'বাড়ি' বা 'টাকামী' ঘরানার—তো রয়েই গেছে। সম্প্রতিকালে 'বাড়ি' ঋণদাতা ভূস্বামী ব্যবসায়ী বা মহাজন কর্জা ধানের সুদ হিসাবে ধান না নিয়ে, ঋণ দেবার সময় ধানের দর অনুযায়ী সম্ভাব্য ধানের পরিমাণ সুদকে টাকায় হিসেব করে, ধান উঠবার সময় ঋণ দেবার সময়ে ধানের যা দাম ছিল বাজারে চলতি দামে সেই টাকার ধান এবং সুদের টাকার ধান বর্গাচাষীর কাছ থেকে নিতে শুরু করেছে। অর্থাৎ আধাআধি খাজনার আধিয়ার 'বাড়ি'র ধান পরিশোধের নামে ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবার মতো অবস্থায় গিয়ে পৌছায়। ফ্রাঙ্কেল অবশ্য এই বিশেষ ধরনের ঋণ নিয়ে খুব একটা আলোচনা করেননি। রাসায়নিক সার ইত্যাদি কেনবার মতো

টাকা ভাগচাষীর কাছে উদ্বৃত্ত না থাকারই কথা। ফলে প্যাকেজ কর্মসূচির বা 'নয়া নীতি'র সুযোগ নেওয়া ভাগচাষীর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অন্য-দিকে বড় জোতের মালিক এই প্যাকেজ কর্মসূচীতে বেশি লাভ পাওয়ায় বর্গাচাষীকে ক্রমশই দ্রুতহারে উচ্ছেদ করে চলেছে। ফলে ভাগচাষীর হাতে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। বহু ক্ষেত্রে তারা ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছে। বর্ধমান জেলার ১২ থেকে ২০ একর সেচের অধীন জমির মালিকের IADP ও 'নয়া নীতি'তে লাভ হয়েছে। তাদের উৎপাদনও বেড়েছে, আয়ও বেড়েছে। বর্ধমান জেলায় ধনী-দরিদ্রের মধ্যে মেরুপ্রস্থান লক্ষ্যণীয়ভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। বর্ধমানের ছবিই একটু রকমফের হয়ে 'সবুজ বিপ্লব'-এর দাক্ষিণ্যে পশ্চিম গোদাবরী, থানজাভুর ও পালঘাটে নজরে পড়ছে। ভাগচাষী কোনো কোনো অঞ্চলে উৎপাদনের ৭০/৭৫ শতাংশ খাজনা হিসাবে ভূস্বামীকে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

কেবলমাত্র ভাগচাষী উচ্ছেদই নয়, কোনো কোনো জায়গায় জমির মালিক জমি ডাকাতিও শুরু করেছে। উত্তর প্রদেশের তরাই অঞ্চলের নৈনিতাল, ফিলিবিট, লখিমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে লাঠিসোটা ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ধনী চাষীরা লেঠেল-ঠ্যাঙাড়ে লাগিয়ে আদিবাসীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে বনে জঙ্গলে ঠেলে দিচ্ছে। বক্সা অঞ্চলের ১১টি গ্রাম থেকে এই জমি ডাকাতেরা প্রায় ১৫,০০০ একর জমি দখল করেছে। নৈনিতাল জেলার কাকারিয়া বাঁধ প্রকল্পের ফলে ২০,০০০ একর জমি বেরিয়েছে, এই জমি ডাকাতেরা তার মধ্যে ২,০০০ একর জমি দখল করে চড়া দরে বিক্রয়ও করছে। তা ছাড়া বড় বড় খামার মালিকেরা (বিড়লা, বাজাজ গোষ্ঠী, পাতিয়ালার মহারাজা) জমি ডাকাতি বাড়িয়ে চলেছে। উত্তর প্রদেশে এই জমি ডাকাতদের মধ্যে সামরিক ও পুলিশ বিভাগের অনেক হোমরা-চোমরাও আছেন ('লিঙ্ক' জানুয়ারি ১৮,১৯৭০)। চাষীর এই যমযন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে এবং কেরলে কিছু করা সম্ভব হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় তিন লক্ষ একর খাস ও বেনাম জমি চাষীরা দখল করেছে। কেরলে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ২০ একর জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে ভূমিহীন ও বর্গাচাষীদের মধ্যে ভূমি বণ্টন শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও জমি মালিকানার সর্বোচ্চসীমা (২৫ একর) হ্রাস করার বিষয়ে কথা উঠেছে।

সরকারী হিসাব অনুযায়ী ভারতে ৪০ কোটি ২০ লক্ষ একর আবাদযোগ্য

জমি আছে। যদি ২০ একর মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমি পাওয়া যেতে পারে। ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ৫ কোটিরও বেশি ভূমিহীন চাষীকে ২ একর করেও যদি জমি দিতে হয়, প্রয়োজন হবে ১০ কোটি একর। সুতরাং এ-হিসাবে ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া সরকারী হিসাব মতো আকাশকুসুম মাত্র। তাদের মতে ভারতে মাথা পিছু জমি আছে ০·৮২ একর এবং ৫ শতাংশ মানুষ ৩৩ শতাংশ জমির মালিক। তাছাড়া এক-তৃতীয়াংশ ভারতবাসী দারিদ্র্যরেখার নিচে (শহরে ব্যয় ২৪ টাকা, গ্রামে ব্যয় ১৫ টাকা প্রতিমাসে) রয়ে গেছে, এক-পঞ্চমাংশের কিছু বেশি ভারতবাসী চরম দারিদ্র্যের তলায় (মাথা পিছু ব্যয় শহরে ১৮ টাকা, গ্রামে ১৩ টাকা প্রতি মাসে) রয়েছে। সম্প্রতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেশ্বর রাও একটি আলোচনায় দেখিয়েছেন, জমির সর্বোচ্চসীমা-আইন সংশোধন ও কার্যকরী করে, বেনামা জমি উদ্ধার করে এই মুহূর্তে ৯ কোটি একর জমি বের করা যায়। তাছাড়া সরকারী জমি পাওয়া যায় আরো ৯ কোটি একর। অরণ্যাঞ্চলের পতিত জমি আছে ২০৮০ কোটি একর। এই ২১ কোটি একর জমি অবিলম্বে বণ্টন করা যেতে পারে।

লোকসভার একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষাতে প্রমাণিত হয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ও উদ্যোগে জমির লড়াই গত কয়েক বছরে সবচেয়ে বেশি হয়েছে। কমিউনিস্টরাই এই 'ভূমি বিপ্লবের সংগ্রামে' আগ বাড়িয়ে লড়ছেন। কেরল-পশ্চিমবঙ্গে এ-সংগ্রামের কিছুটা সাফল্য হয়েছে। আসামে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জমি দখলের ডাক দিয়েছেন। বিহারেও কমিউনিস্টরা দরিদ্র চাষীকে নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হয়েছেন। রাজস্থানেও নতুন রাজনৈতিক পট উন্মোচনের পালা শুরু হয়েছে। অন্ধ্রে শ্রীকাকুলামে 'কমিউনিস্ট বিপ্লবী'রা, ভ্রান্ত পথে হলেও, জমির মালিকানা পরিবর্তনের মুখ্য বক্তব্যটি সামনে তুলে ধরেছেন। সারা ভারত জুড়ে ভূমিবিপ্লবের আহ্বান এসেছে। এবং এ-বিপ্লব সফল করতে হবে।

'সবুজ বিপ্লব' সত্যই সবুজ কিনা এ-প্রশ্ন সবার মনেই জাগছে। ভারতের কৃষিতে নির্লজ্জ ধনতান্ত্রিক বিকাশ একটাই প্রশ্ন সামনে তুলে আনছে—ভূমিজ উৎপাদন কি মূলধনতান্ত্রিক পথে হবে? না-কি অন্য কোনো পথ বেছে নিতে হবে। ১৯৬৮র ৩১শে মার্চের হিসাবে, জাতীয়করণ-কৃত ১৪টি ব্যাঙ্কের আমানত ছিল ২৭৪৯ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। অথচ নিজস্ব ফাণ্ড ছিল ৬৩ কোটি ২ লক্ষ টাকার মতো। আদায়ীকৃত মূলধন ছিল মাত্র ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

ভূমিতে উৎপাদনবৃদ্ধির দুটি পথ এখন খোলা। এক দিকে IADP পদ্ধতিতে ধনীকে আরো ধনী করা। দরিদ্র চাষীকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা। কিন্তু এই পুঁজিবাদী কৃষির বিকাশের পথও সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে চাষীর হাতে জমি দিয়ে, সমবায়-মূলক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা সহ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা করে অপুঁজিবাদী বিকাশের দিকে অগ্রসর হওয়া। ভূমিব্যবস্থা পরিবর্তন এখন ভারতবিপ্লবের কর্মসূচি। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লব। বিদেশী আর্থনীতিক চাপের বিরুদ্ধে 'কৃষি বিপ্লব' অন্য অর্থে জাতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিরও অন্তর্ভুক্ত। 'সবুজ বিপ্লব' যে-কথাটি ধামাচাপা দিতে চায়, সেই কৃষি বিপ্লব এখন সবচেয়ে জ্বলন্ত প্রশ্ন!

তরুণ সান্যাল

রাসেল আর নেই

রাসেল ছিলেন লেনিনের প্রায় সমবয়সী। লেনিন যখন নতুন জীবন গড়ছিলেন, রাসেল তখন জেলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। নিথর শান্তিবাদে উৎসর্গিত রাসেল রাজরোষে বন্দী হয়েছিলেন সেদিন। জেল থেকে বেরিয়েই ছুটেছিলেন রুশ দেশে। বৃটিশ শ্রমিকদলের সভ্য রাসেলের এই সফর-প্রতিক্রিয়া ভালো হয়নি। সমাজতন্ত্র তিনিও চান, কিন্তু এতো ধ্বংস, এতো হত্যা, এতো পীড়ন...ইত্যাদি সয়নি তাঁর।

১৯৬৭ সালে প্রকাশিত আত্মজীবনীতে তিনি বলেছিলেন তাঁর জীবনের তিনটি পরিচালিকা শক্তির কথা। অন্তবিহীন ভালোবাসার বাসনা, সীমাহীন জ্ঞানের পিপাসা আর দুর্গত মানুষের প্রতি বেদনার অপার অনুভূতি। স্বভাবতই এমন মানসিকতার এক প্রতিভার কাছে লোভনীয় মনে হয়নি বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ, বিদেশী আক্রমণ, দুর্ভিক্ষ তাড়িত সদ্যপ্রসূত একটি সমাজ।

কিন্তু বিশ্বের দরবারে চিরকালই রাসেল বিদ্রোহী। উদার মানবতাবাদী মানুষটিকে "বখাটে নৈরাজ্যবাদী" বিশেষণও পেতে হয়েছে। স্বদেশ তাঁকে সমাদর করেনি, সাম্রাজ্যবাদের জয়জয়াকারের দিনে তিনি গান্ধীর আন্দোলনের সমর্থনে সোচ্চার। ইণ্ডিয়া লীগ-এর সভাপতি। মার্কিন মুলুক তাঁর "চাকরি" খেয়ে তাঁকে সাগরপারে ফেরত পাঠিয়েছে "নৈতিকতা"র কারণে। ফাসীবাদীরা তাঁকে শত্রুর চোখে দেখেছে, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি আর নিথর শান্তিবাদী নন। জনযুদ্ধের এক প্রধান প্রচারক। অশীতিপর বৃদ্ধ রাসেলকে আবার জেল খাটিয়েছে ব্রিটেন, পরমাণু-অস্ত্র-কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযান করার জন্যে।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাসেল। যুদ্ধের বিরুদ্ধে তো বটেই। সমাজতন্ত্রও আদর্শ হিসাবে তাঁর প্রিয়। কিন্তু রাজনীতি তাঁর প্রধান জীব্য নয়। বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ব, সাহিত্য—তাঁর কিছু ছোটগল্প এককালে বাঙলাদেশকেও নাড়া দিয়েছিল—অঙ্কশাস্ত্র, যৌনতত্ব, সাংবাদিকতা....সর্বত্রই রাসেলের স্ফুরণ।

এ-যুগের মানুষ সবচেয়ে বেশি করে জানে শান্তির অতন্দ্র সাধক রাসেলকে। একটি হিন্দী চলচ্চিত্রে তাঁকে দেখা গিয়েছিল কিছুদিন আগে। অবাক হয়েছিলাম। পরে জেনেছিলাম তিনি ছবিটিতে থাকতে রাজি হয়েছিলেন, কারণ তাঁকে বোঝানো হয়েছিল, ছবিটি বিশ্বশান্তি বিষয়ক। ছবিটির নামটুকুই

শান্তি। 'আমন'। কিউবার সেই সঙ্কটময় মুহূর্তগুলিতে নিদ্রাহীন রাসেলের আর্তনাদের কাহিনী কে না জানে!

বিপ্লবোত্তর রুশদেশ থেকে ফেরার কিছুদিন পরে চীনে গিয়ে তিনি আবার আহত হয়েছিলেন। ঘোষণা করেছিলেন, স্বাধীনতার তৃষ্ণায় এরা মরিয়া হয়ে ছুটে চলেছে আর-এক সাম্রাজ্যবাদের দিকে—কমিউনিজমের দিকে। সে কতদিন আগের কথা। কিউবার সংকটের দিনে, অভিজ্ঞতায় প্রাজ্ঞতর রাসেল ঘোষণা করেছিলেন তাঁর আর-এক উপলব্ধির কথা। যখন জীবন আর ধ্বংসের মাঝখানের ক্ষীণ রেখাটুকু তাঁর সামনে তিল তিল করে বিলীয়মান, তখন তাঁর প্রত্যয় হয়েছিল—পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে এমন একটিই মাত্র রাষ্ট্র পৃথিবীতে আছে, আছেন একজনই রাষ্ট্রনেতা। সে-রাষ্ট্র "টোট্যালিটেরিয়ান" সোভিয়েত ইউনিয়ন, আর সে-নেতা "কমিউনিস্ট" খ্রুশ্চভ।

এই প্রাজ্ঞতারই পরিণত ফল ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধে রাসেলের মনপ্রাণ সমর্থন আর সহায়তা। পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর আপোষহীন সংগ্রাম। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তাঁর দৃঢ় প্রতিরোধ। রাসেল আর নেই। বিশ্ব তার শান্তির সংগ্রামে সবচেয়ে আগুয়ান এক সেনাপতিকে হারাল। সঙ্গে সঙ্গে বহুমুখী প্রতিভার সেই ক্ল্যাসিকাল যুগটিও বোধ করি শেষ হলো, বার্ট্রাণ্ড রাসেল যার অপরূপ প্রতিনিধি ছিলেন।

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

পাঠকগোষ্ঠী

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী অগ্রহায়ণ ১৩৭৬ 'পরিচয়'-এ 'লেখকদের শ্রেণীবিচার' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে দেখা যায় তিনি লেখকদের পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যেমন ১। গতানুগতিক, ঐতিহ্যাশ্রয়ী, রাজনীতিবিমুখ, ২। প্রগতিশীল ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ, ৩। গান্ধীবাদী চিন্তায় অনুপ্রাণিত, ৪। সংবাদপত্র-সেবী ও সংবাদপত্র-সেবিত ৫। জ্ঞানচর্চাকারী গবেষক ও সমালোচক। এভাবে ভাগ করতে যাওয়ার বিপদ অনেকটা সেই কর্ণরোগ বিশেষজ্ঞর মতো, যাঁর কাছে একজন ডান কানটিতে বেদনা নিয়ে দেখাতে গেলে তিনি বললেন যে আমি তো বাঁ কানের বিশেষজ্ঞ, তাই আমি ডান কান সম্পর্কে কিছুই বলতে পারব না।

আমার মনে হয়, লেখকের শ্রেণীবিভাগ করা উচিত অন্য সামাজিক মানুষের শ্রেণীবিভাগ যে-পদ্ধতিতে করা হয় সেই পদ্ধতিতেই। অর্থাৎ ধন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের শ্রেণীচরিত্র নির্ধারণের ভিত্তিতে। লেখকদের সম্পর্কেও সেই একই কথা। কিন্তু যেহেতু লেখকদের মধ্যে প্রায় সকলেই কৃষক ও মজুর শ্রেণীর বাইরে বিত্তবান ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মাঝ থেকে এসেছেন ও এখনও আসছেন, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের শ্রেণীচরিত্রও সেই শ্রেণীর।

অবশ্য এ-কথা স্বাভাবিক যে লেখকরা সজাগ ও সংবেদনশীল মনোভাব সম্পন্ন। তাই তাঁদের মধ্যে অনেকেই সমাজসচেতন হয়ে, লেখক হিসেবে তাঁদের সামাজিক কর্তব্য করার মাধ্যমে নিজেদের শ্রেণীচরিত্র ত্যাগ করে, সাধারণ মানুষ —তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা—ও প্রগতিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের লেখার মাধ্যমে নিজেদের যুক্ত করতে চাইছেন। প্রবন্ধলেখক তাঁর শ্রেণীবিভাগে যাঁদের দু-নম্বরে ফেলেছেন, তাঁরাই এঁরা।

লেখকদের রুজি-রোজগার করতে হয়, তার জন্য কেউ সংবাদপত্রে কেউ কেউ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন। আবার কেউ হয়তো অন্য পেশাতেও আছেন। পেশার চাপ, পেশা বা চাকুরীক্ষেত্রে উপরওয়ালাদের চাপ, এই সব অনেক সময়েই তাঁদের লেখাকে প্রভাবান্বিত করে। তার ফলে তাঁদের শ্রেণী-চরিত্র বদলে যেতে পারে। শ্রেণীচরিত্র বদলালে, তাঁদের শ্রেণীবিভাগও বদলে যাবে। এইভাবে বহু লেখকের রূপান্তর ঘটেছে ও ঘটছে।

এ-সম্পর্কে অনেক আলোচনা করা যায়, কিন্তু তা না করে শুধু এই কথা

বলব যে লেখক যদি অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করতেন, তাহলে ভালো হতো।

এ-ছাড়া আলোচনা করব লেখকের আর দুটি বক্তব্য নিয়ে। প্রথমটি হলো লেখক যাঁদের গতানুগতিক, ঐতিহ্যাশ্রয়ী ও রাজনীতিবিমুখ বলেছেন, তাঁদের সম্বন্ধেই আবার বলছেন যে "এঁদের অনেকেরই সাহিত্যপ্রেম নিখাদ এবং যে সাহিত্যের এঁরা পোষকতা করেন সে সাহিত্য দেশের মৃত্তিকার সঙ্গে সংযুক্ত।" কিন্তু লেখক যদি একটু তলিয়ে দেখতেন, তাহলে দেখতে পেতেন—যেসব লেখকদের বেশি রোজগারের আশায় বা কোনো বিশেষ সংবাদপত্রের পোষকতা পাবার জন্য শ্রেণীচরিত্র বদলাতে হচ্ছে, তাঁদের ক্রমশই মৃত্তিকার সঙ্গে যোগ কমে যাচ্ছে। তবে তাঁদের মধ্যে অনেকে লেখক হিসেবে প্রতিভাবান হবার জন্য, মৃত্তিকার সঙ্গে তাঁদের যোগচ্ছিন্নতা এখনও নজরে পড়ছে না।

আর-একটি কথা বলব গান্ধীবাদী লেখকদের সম্বন্ধে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যেমন গান্ধীবাদের উদ্ভব হয়েছিল, তেমনিই তার প্রভাবে কিছু লেখক গান্ধীদর্শনের প্রবক্তা হয়ে উঠেছেন। লেখক ঠিকই লক্ষ্য করেছেন যে "এঁরা" "স্বতন্ত্র" ও "আত্মাভিমানপুষ্ট"। গান্ধীবাদ আজ 'গান্ধী-বাদী'দের হাতে পড়ে সারা দেশেই খুব শোচনীয় অবস্থায় এসে গেছে। তাই রাজনীতিতে সৎ গান্ধীবাদীর যে-দুরবস্থা, সাহিত্যেও তাই হচ্ছে। তা থেকে বাঁচার চেষ্টাতেই সাহিত্যের গান্ধীবাদীদের স্বতন্ত্র ও আত্মাভিমানপুষ্ট হয়ে ওঠা ছাড়া আর উপায় কি ?

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

সবিনয় নিবেদন,

ডিসেম্বর সংখ্যা 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর 'লেখকদের শ্রেণীবিচার' প্রবন্ধটি সম্পর্কে 'পরিচয়'-এর পাঠক হিসেবে আমার কয়েকটি জিজ্ঞাসা নিবেদন করছি। শ্রীচৌধুরী সুপণ্ডিত এবং প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক। তাঁর বক্তব্যের যাথার্থ্য সম্পর্কে মতামত প্রকাশের ধৃষ্টতা আমার নেই। কিন্তু পাঠক হিসেবে কয়েকটি প্রশ্ন স্বভাবতই আমার মনে এসেছে। বিশেষত প্রগতি সাহিত্য, জাতীয়তা ও প্রগতিবাদ, প্রগতিশীলতা ও বামপন্থার পারস্পরিক

সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কিছু জিজ্ঞাসা আমার মতো অনেক পাঠকের মনেই থাকা স্বাভাবিক। শ্রীচৌধুরীর নিবন্ধটি সে-বিষয়ে আমার মনে আরও কিছু জটিলতা সৃষ্টির সহায়ক হচ্ছে বলেই আমার জিজ্ঞাসাগুলো আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সাহিত্যিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের অভাবের প্রতি শ্রীচৌধুরী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিষয়টি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তিনি সাহিত্যিক 'গোষ্ঠী' ও 'শ্রেণী'র ভিতর কোনও পার্থক্য আরোপ করেননি। প্রশ্ন থেকে যায়—'গোষ্ঠী' ও 'শ্রেণী' সমার্থক কি না! বিভিন্ন শ্রেণীর লেখক একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া বিচিত্র নয়, এবং এর দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সম্ভবত এরকম ঘটনার জন্যই এই গোষ্ঠীগুলির পক্ষে পারস্পরিক প্রীতিবিনিময় ভিন্ন অন্য কোনও উদ্দেশ্যে মিলিত হওয়া সম্ভব নয়। লেখকের শ্রেণীবিচারের ভিত্তিই বা কী। এ-প্রসঙ্গে শ্রীচৌধুরী কোনও আলোকপাত করেননি। সমাজের কোন শ্রেণী থেকে লেখক আগত, এ-প্রশ্ন এখন পর্যন্ত অবান্তর। কেননা, এ-পর্যন্ত প্রায় সমস্ত লেখকই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। তিনি সমাজের কোন শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিশীল, বা কোন শ্রেণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় গভীর এবং ফলত তাঁর সাহিত্যে তা কিভাবে প্রতিফলিত—শ্রেণীবিভাগের এ-রকম একটা মাপকাঠি যদি ধরে নেওয়া যায়—তা হলেও সমস্যার সমাধান হবে না। কেননা, শ্রেণীভিত্তিক আনুগত্য নিয়ে বেশি লেখক এখনো পর্যন্ত সচেতনভাবে কলম ধরেননি। সর্বহারাশ্রেণী বাঙলা সাহিত্যে বিষয় হিসেবে যদিও বহুদিন থেকেই উপস্থিত, কিন্তু সর্বহারার সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এমন সাহিত্যের অস্তিত্ব দুর্লভ এবং সম্ভবত তার অনুকূল পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিত এখনও সৃষ্টি হয়নি। লেখকের প্রতিভা যদি মানদণ্ড হয়—তা হলেও মূল প্রতিবন্ধক হবে সময়, কেননা সমকালীন সাহিত্যের যথাযথ বিচারে স্বকালের মতামতই চরম নয়। সম্ভবত এখনো পর্যন্ত সাহিত্যিকের গোষ্ঠী বিচারেই আমাদের তৃপ্ত হতে হবে।

কিন্তু শ্রীচৌধুরীর গোষ্ঠীবিচারের পদ্ধতিতে নিরপেক্ষতা সম্পর্কেও সংশয়ের অবকাশ আছে। শ্রীচৌধুরী ঘরোয়া বা আধা-ঘরোয়া সংগঠনের সঙ্গে পত্রিকাভিত্তিক সাহিত্যগোষ্ঠীর তুলনা করেছেন। 'রবিবাসর' 'কবি পরিষদ' ইত্যাদি আসরের সঙ্গে তিনি 'পরিচয়' 'মূল্যায়ন' ইত্যাদি পত্রিকা-ভিত্তিক সাহিত্যগোষ্ঠীকে সমান্তরালে স্থাপন করেছেন। বলা বাহুল্য, এই দু-ধরনের জমায়েতের মধ্যে উদ্দেশ্য, চরিত্র ও ক্রিয়াকর্মের কোনও মৌলিক সহধর্মিতা নেই। এ-কারণেই

প্রথমোক্ত জমায়েতকে আমরা আসর বলে থাকি—গোষ্ঠী বলি না, কেননা এসব মিলনক্ষেত্রের উদ্দেশ্য মূলত পারস্পরিক প্রীতিবিনিময়, অখ্যাতদের পক্ষে বিখ্যাতদের সাহায্য লাভ এবং অবসর বিনোদন। সাহিত্যের কোনও এক বিশেষ মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গি এঁদের মিলনের যোগসূত্র নয়। বরং 'দেশ' 'বসুমতী' ইত্যাদি অন্যান্য পত্রিকাভিত্তিক গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিতুলনা অনেক বেশি পরিমাণে সার্থক হতো।

প্রথমোক্ত আসরগুলির চরিত্রচিত্রনেও শ্রীচৌধুরী পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য উপস্থিত করেছেন বলে মনে হয়। এদের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—"এই সব সংস্থার সদস্যগণ প্রগতিশীল ভাবধারা সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ঘামান না, বরং অন্তরে অন্তরে এই ভাবধারা সম্পর্কে বিলক্ষণ বিরূপতা পোষণ করেন। .... নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের ব্যথা বেদনা এঁদের সাহিত্যে রূপায়িত হয় না বটে, তবে এঁদের সাহিত্যে আবহ, চরিত্র ষোল-আনা স্বদেশী।"

প্রগতিশীলতার বিরোধিতা ও নিপীড়িত মানুষ সম্পর্কে উপেক্ষা—এই কি স্বদেশীয়ানার মূল লক্ষণ বলে শ্রীচৌধুরী মনে করেন? দেশের পনেরো-আনা মানুষকে সাহিত্যে অপাংক্তেয় রেখে 'ষোল-আনা' স্বদেশী সাহিত্য কি করে সম্ভব—তাও ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। এবং শ্রীচৌধুরী যে-দুটি লক্ষণ চিহ্নিত করেছেন—উক্ত আসরগুলির অনেক সদস্যের প্রতিই তা আরোপিত হলে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে। ঐ আসরগুলির এমন পৃষ্ঠপোষকও আছেন, যাঁরা নিপীড়িত মানুষের সাহিত্যের পূর্বসূরী হিসেবে স্বীকৃতি-দাবি খুব সঙ্গত ভাবেই উচ্চারণের অধিকারী।

'পরিচয়' গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বিশ্লেষণকালে শ্রীচৌধুরী এমন একটি মতামত ব্যক্ত করেছেন—'পরিচয়'-এর পাঠক হিসেবে যার প্রতিবাদ না করে পারছি না। এঁদের প্রসঙ্গে শ্রীচৌধুরী বলেছেন "তাঁরা প্রগতিশীল ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ নতুন কালের চিন্তাচেতনাকে তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে রূপ দিতে সচেষ্ট, নতুন আঙ্গিক আর ভাষাশৈলী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সতত নিযুক্ত, শোষিত ও অবহেলিত শ্রেণীর মানুষদের অভাব-অভিযোগ স্বপ্ন-কামনার রূপায়ণে আন্তরিক যত্নপর, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সক্রিয় শরিক। এবং এর পরেই তিনি বলেছেন, "নতুন কালের অগ্রসর ভাবধারার সঙ্গে তা'ল রেখে চলতে গিয়ে এঁরা যেন কতক পরিমাণে জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে, সাহিত্যের ধারাক্রমাগত উত্তরাধিকারের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছেন।" তাহলে শ্রীচৌধুরী কি বলতে চান যে পূর্বোক্ত যে-গুণগুলো তিনি উল্লেখ করেছেন, সেগুলো বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের পরিপন্থী? সংরক্ষণশীলতা, প্রগতিবিরোধিতা ইত্যাদি গুণগুলো বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্য বলে স্বীকার করতে সম্ভবত শ্রীচৌধুরী নিজেও আপত্তি করবেন।

তাঁর উক্তির সমর্থনে তিনি আঙ্গিকের প্রশ্নটি তুলেছেন—"বিষয়বস্তুর নির্বাচনে এঁদের যে বলিষ্ঠতা, সেই বলিষ্ঠতার অনুরূপ প্রকাশভঙ্গি খুঁজতে গিয়ে এঁরা সচরাচর যে ইডিয়ম ও পরিভাষা ব্যবহার করছেন—তা বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের প্রবহমান সংস্কার থেকে কিয়ৎপরিমাণে বিশ্লিষ্ট বলে মনে হয়।"

তাহলে কি 'সংস্কার' ও 'ঐতিহ্য' শব্দ দুটি শ্রীচৌধুরী সমার্থক মনে করেন? আঙ্গিক সম্পর্কে নিরীক্ষা, বিষয় অনুযায়ী আঙ্গিকের বিবর্তন ও নতুন রীতির ইডিয়ম ও শব্দব্যবহার ইত্যাদি লক্ষণগুলিই তো বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্যানুসারী। সংস্কার ও সংরক্ষণশীলতাকে বাঙলা সাহিত্য কখনোই প্রশ্রয় দেয়নি—এবং সে-ধারার যথাযোগ্য উত্তরসূরী হতে হলে শ্রীচৌধুরী বর্ণিত লক্ষণগুলির অধিকারী অবশ্যই হতে হয়। 'পরিচয়'-এর পাঠক হিসেবে আমি অন্তত আনন্দিত যে শুধুমাত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠরাই নন, 'পরিচয়' গোষ্ঠীর অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং সর্বকনিষ্ঠ আগন্তুকরাও ঐতিহ্য আত্মীকরণের প্রয়াসে সততার স্বাক্ষর রাখছেন।

শ্রীচৌধুরী বর্ণিত গান্ধীবাদী সাহিত্যিক গোষ্ঠী বাঙলাদেশে আছেন বলে বর্তমান পাঠকের জানা নেই। একজন বা দুজন সাহিত্যিক বিচ্ছিন্নভাবে কোনও মতাদর্শ অনুসারে সাহিত্য চর্চা করলে তাকে গোষ্ঠী আখ্যা দেওয়া সম্ভবত সঙ্গত নয়। ব্যক্তিগত জীবনে কোনও মতবাদের অনুসারী হলেও সৃষ্ট সাহিত্যে তার প্রতিফলন না হলে তাকে কোনও বিশেষ মতবাদী সাহিত্য বলতে আপত্তি থেকে যায়। বাঙলা ভাষায় গান্ধীবাদ নিয়ে চর্চা কিছুটা অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু সৃষ্টিশীল সাহিত্যে গান্ধীবাদ বিষয়ী গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত—এ-রকম দৃষ্টান্ত বিরল। এর কারণ-বিশ্লেষণ অবশ্যই সাহিত্য-তাত্ত্বিকের এক্তিয়ার, কিন্তু বাঙলাদেশে গান্ধীবাদী সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অনুপস্থিতি সম্ভবত কালের গতিপথের অমোঘ নির্দেশ।

তরুণ সেন

সবিনয় নিবেদন,

ইয়ান টিনবারজেন-এর নাম অর্থনীতিবিদ মহলে সুপরিচিত। 'পরিচয়'-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় তাঁর সম্বন্ধে যে-সংক্ষিপ্ত অথচ সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাতে তাঁর "১৯৩৬ সালের জন্য আর্থনীতিক নীতি" প্রসঙ্গে বলা হয়েছে.... "প্রবন্ধটির অন্যতম বিশিষ্টতা হলো, এই রচনাটিতে কেইনসীয় কর্মসংস্থান ও মূলধনলগ্নি তত্ত্বের অনেকখানি পূর্ব ইঙ্গিত পাওয়া যায়।" অর্থনীতিতে আমার জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। তবু মনে হয়, উল্লিখিত মন্তব্যটি ঠিক নয়। কেইনস (কীন্স?) এর অনেক আগেই তাঁর কর্মসংস্থান ও মূলধনলগ্নি তত্ত্বের রূপরেখা এঁকেছিলেন। ১৯৩০ সনে প্রকাশিত তাঁর 'ট্রিটিস অন মানি' গ্রন্থে এই রূপরেখা অঙ্কিত

হয়। এই প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থের 'কদলী-কথা' (১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৬) উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৬ সনের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে কেইনসের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'জেনারেল থিয়োরী অব এমপ্লয়মেণ্ট, ইনটারেসট এ্যাণ্ড মানি' প্রকাশিত হয়। কাজেই টিনবারজেন-এর উক্ত প্রবন্ধে তাঁর তত্ত্বের পূর্ব ইঙ্গিত থাকার প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

সুকুমার মিত্র

সবিনয় নিবেদন,

সোবিয়েৎ সাহিত্যের তুলনায় সোবিয়েৎ চিত্রকলা কি ভাস্কর্যের পরিচয় বহির্বিশ্বে আজও অনালোকিত। অথচ রুশ চারুকলার ইতিহাস অনুজ্জ্বল নয়, যদিও সেই বাইজেনটীয় অধ্যায় থেকে অদ্যাবধি তার ধারা কিছু প্রচ্ছন্ন, বিঘ্নিত এবং জটিল আবর্তে বাহিত।

রুশ চারুকলায় আধুনিকতার সূত্রপাত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে রুশ ধনতন্ত্রের উন্মেষের প্রাক্‌কালে। তখনই সর্ব প্রথম গীর্জা বা জারের দাক্ষিণ্য ব্যতীত কিছু শিল্পীর সাধন প্রয়াস সম্ভব হল। পৃষ্ঠপোষকতার ভার নিলেন নতুন শিল্পপতিরা। মামেনতফ পত্তন করলেন এক শিল্পী-গ্রাম। শুকিন সংগ্রহ করে আনলেন তৎকালীন য়ুরোপীয় সেরা শিল্পীদের নিদর্শন—মান্‌এ থেকে পিকাসো। প্রায় রাতারাতি রুশ শিল্পের উত্তরণ ঘটল অতীত থেকে সমকালে। গতিবেগের প্রচণ্ডতায় সেদিন রুশ শিল্পের ব্যক্তিত্ব হয়তো ধ্বংস হয়ে যেত, যদিনা থাকত সেকাল-একাল প্রবাহিত, গির্জা বা রাজার শাসন-বহির্ভূত, লোকশিল্পের একটি সুস্থ ধারা। এই অধ্যায়ের শিল্পীদের ছিল আরও একটি ঐশ্বর্য, তাঁদের প্রাক্‌য়ুরোপীয় অতীত। এমন সন্ধিক্ষণে রুশ শিল্পের বর্তমান বলে কিছু না থাকলেও ছিল এই সত্ত্বগত অতীত আর ছিল আসন্ন আলোকিত ভবিষ্যৎ। সেদিনের চরমপন্থী শিল্পীদের লক্ষ্য ছিল কালোপ-যোগী কোনো সক্ষম প্রকাশরীতির অন্বেষণ। কিউবিজম এই লক্ষ্য ভেদ করায় রুশ শিল্প জগতে একটি নবযুগ সূচিত হয়। শিল্পী রাজ্যের রাজধানী পারী থেকে মসকোতে সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত হয়েছিল তারই ফলে।

রুশ শিল্পে 'কিউবিজম-এর আবির্ভাব বর্ণনা করতে গিয়ে হার্বার্ট রীড আজ বলছেন :

"Cubism marked in its own field the end of precisely that era—the era of capitalism, bourgeoise individuality and utilitarianism."

কাশিমির মালেভিচ ১৯২১ সালেই ঘোষণা করেছিলেন—"কিউবিজমই শিল্পের বৈপ্লবিক রূপ। ১৯১৭ সালের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে সংঘটিত বিপ্লবের পূর্বাভাস নিহিত ছিল সেখানেই।"

রুশ শিল্পীদের প্রকৃত বৈপ্লবিক ভূমিকা দেখা যায় ১৯১৩ থেকে ১৯২১-এর অধ্যায়ে। মালেভিচ-এর শুদ্ধবাদ, তাৎলিন বা রোদশেঙ্কোর গঠনবাদ, অপরদিকে কানদিনস্কির স্বাতন্ত্র্যবাদ একযোগে বিপ্লবের বছরটির দিকে এগোতে থাকে। কালে বিপ্লব ডাক দিয়ে আনে কয়েকজন নির্বাসিত শিল্পীকে। তার মধ্যে ছিলেন পেভসনার, ছিলেন নউম গাবো—সেদিনের অন্যতম বিপ্লবী নায়ক। তাঁর ১৯২০ সালের ১৬ই আগস্টের ইস্তাহারটির মর্ম এই :

"Art has its absolute, independent value and a function to perform in society whether capitalistic, socialistic or communistic. Art will always be alive as one of the indispensible expressions of human experience and as an important means of communication."

স্পষ্টতই এই বিপ্লবী শিল্পীরা শিল্পে সমাজ-সচেতনতা স্বীকার করলেও শিল্প-বিষয়ে রাজনৈতিক 'একদেশদর্শিতা'য় নারাজ ছিলেন। শুধুমাত্র কমিউনিস্ট সমাজের জন্যে কোনো শিল্পের ধারণাকে তাঁরা মানতে পারেননি। তথাপি এঁদের 'প্রতিক্রিয়াশীল' আখ্যা দেবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। এরেনবুর্গ প্রায় পঞ্চাশ বছর পর নিজভেস্তনি প্রমুখ আধুনিক শিল্পীদের বিচার প্রসঙ্গে ক্রুশেভকে দুটি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন—মায়াকভস্কি এবং পিকাসোর দৃষ্টান্ত। এবং বলেছিলেন—পার্টি যে-কথা বলতে চায়, আধুনিক শিল্পীরা রাজনৈতিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল, সেটি অনিবার্য সত্য নয়। (ল মঁদ, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬২)

১৯১৩ থেকে ১৯২১-এর অধ্যায়ের পর্যালোচনায় বোঝা যায় রুশ শিল্পের 'সুসময়' তখনই ছিল। শিল্পগত বৈপ্লবিক অধ্যায় হিসাবে, বিস্তৃত অর্থে, এই কালটিকেই চিহ্নিত করা যায়। সে-কারণে জন বার্জর-এর সম্প্রতি-প্রকাশিত 'আর্ট অ্যাণ্ড রেভল্যুশন' শিরোনামযুক্ত বইটিতে তৎকালীন ইতিহাসটিই প্রাসঙ্গিক ছিল। বার্জর বিপ্লব বলতে শিল্পগত বিপ্লবের কথা ভেবেছিলেন, নতুবা ১৯১৭র রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিপ্লবের অর্ধশতাব্দীর দূরান্তরের কোনো প্রতিভার অবতারণা তিনি করতেন না। আর্নস্ত নিজভেস্তনি সম্প্রতিকালে রাশিয়ায় একটি অন্যতম বিতর্কিত নাম। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ দিয়ে বার্জর পাঠকদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তবে, শিল্পগত বিপ্লব আলোচনায় সুখী করেননি তাঁদের, বরং কিছু বিভ্রান্ত করেছেন। 'পরিচয়' পত্রিকার গত সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ ১৩৭৬) প্রকাশিত আলোচনায় তার কিছু সাক্ষ্য আছে।

১৯১৩ থেকে ১৯২১-এর অধ্যায় সম্বন্ধে অবহিত থাকলে, এবং মালেভিচ, কানদিনস্কি, শাগাল, রোদশেঙ্কো, তাৎলিন, পেভসনার, গাবোর কথা স্মরণ করলে, রুশ পটভূমিতে নিজভেস্তনির আধুনিকতা 'কৃত্রিম' 'উদ্ভট' বা আকস্মিক মনে করার অবকাশ থাকে না। তাই আমার পূর্ববর্তী আলোচক অরুণ

সেনের আতঙ্ককে স্বাভাবিক মনে হয় না। বরং মনে হয়, পাঠ শুরু করার আগেই তিনি বার্জর-এর প্রতি অত্যধিক বিরক্ত ছিলেন, ফলে বইটির ঠিক দ্বিতীয় লাইন থেকেই তিনি স্বাভাবিক অর্থবোধের ক্ষমতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছেন। অরুণ সেনের একটি মোক্ষম অভিযোগ ছিল এই—বার্জর নিজভেস্তনির কাজ স্বচক্ষে দেখেননি। বার্জর নাকি "ভূমিকায় লিখেছেন তিনি শিল্পীর কাজের ফোটোগ্রাফ দেখেই এই গ্রন্থরচনায় উদ্যত হয়েছেন।" প্রকৃতপক্ষে বার্জর তাঁর পাঠকের উদ্দেশে সেখানে লিখেছিলেন—"তাঁকে কেউ এই প্রশ্ন করতে পারেন, "তুমি বলো, আমি পাঠক, শুধু আলোকচিত্রের সাহায্যে, একটিও শিল্পকর্ম চাক্ষুষ না করে, কোনো ভাস্করের কাজের বিচার কেমন করে করি"।" বার্জর-এর ইংরেজি দুর্বোধ্য নয়। তাছাড়া বার্জর যে আলোকচিত্রী জঁ মরকে এই উদ্দেশ্যে স্বয়ং মস্কো সফরে সঙ্গী করেন, সে-সংবাদ ঠিক পরের পৃষ্ঠাতেই ছিল। উপরন্তু তিনি যে স্বচক্ষে না দেখে শিল্প বিচারে নিশ্চিত অভিমত দিতে প্রস্তুত নন, তারও প্রমাণ আছে নিজভেস্তনি কৃত সরকারী প্রকল্পের প্রসঙ্গে বইটির ৭৮ পৃষ্ঠায়। সম্ভবত অরুণ সেন "এক প্রান্তের ভ্রান্তিমুক্তির উত্তেজনায় অপর প্রান্তের ভ্রান্তি"তে আক্রান্ত হয়েছেন, বা হয়তো সংক্রমিত হয়েছেন। তাঁর বিরক্তি এবং ক্ষোভের কারণটি বোঝা যায়। "সোবিয়েৎ বিষয়ে অপদস্ত করার ইচ্ছা" বার্জর মনে লালন করেন। বার্জর ক্রুশেভ-এর সম্মানহানি ঘটিয়েছেন, অপর দিকে, নিজভেস্তনির মতন শিল্পী—যিনি "প্রতিক্রিয়ার স্বাধীন একদেশ-দর্শিতা"য় অভিযুক্ত, যাঁর শিল্পকর্ম "রূপগত বিপর্যয়" বা "বিকৃতি"তে দুষ্ট, এবং যাঁর "স্নায়ু" ও "নান্দনিক মনের অস্বাচ্ছন্দতা" তাঁরই "জীবনগত কারণে"—তিনি বার্জর-এর প্রশংসার পাত্র হয়েছেন শুধু নয়, বিপ্লবী নায়ক বলে বিবেচিত হয়েছেন।

অরুণ সেনের সঙ্গে আমি এক্ষেত্রে একমত। নিজভেস্তনির বিপ্লবী নায়কত্ব অতিরঞ্জিত এবং তাঁর প্রবন্ধে নাটকীয়তা কিছু প্রকটিত, যদিও "ইতি গজঃ" কৌশলে বার্জর অস্ফুট বলে রেখেছেন একবার—"He is not a purist····not a rebel.।" নিজভেস্তনির কাজে শিল্পগত কোনো বিপ্লবের হদিশ দিতে বার্জর ব্যর্থ হয়েছেন, বরং সেখানে নান্দনিক দুর্বলতা তাঁর নিপুণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। অতএব সফল শিল্পী হিসেবেও নিজভেস্তনির বিশেষ দাবি থাকে না। তাঁর নায়কত্ব আরোপিত হয়েছে রুশ সরকারের সঙ্গে নির্ভীক বিতণ্ডায়, তাঁর অনমনীয় মনোভাবে। এখানে কিছু ইতিহাসের কারচুপি আছে। বার্জর উল্লেখ করেননি যে ১৯৬২ সালের ২৪এ এবং ২৬এ ডিসেম্বর, ১৯৬৩ সালের ৭ই মার্চ তারিখে নিজভেস্তনি জনসমক্ষে আত্মসমালোচনা করেন এবং তাঁর এই আত্ম-শোধনে সন্তুষ্ট সরকারী মুখপাত্র ইলিভিচ সভায় স্বীকৃতি দেন—শিল্পী 'নাগরিক সাবালকত্ব' লাভ করেছেন (মিশেল তাতুর বিবৃতি, ল মঁদ, ৯ মার্চ ১৯৬৩)। এ-ঘটনার অব্যবহিত পরে সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ে এবং পাইওনিয়র ভবনে ভাস্কর্যের

ভার তাঁকে দেওয়া হয় (নিউ স্টেটসম্যান, ১৬ আগস্ট ১৯৬৩)। যে-মূল্যের বদলে নিজভেস্তনিকে সরকারী প্রসন্নতা অর্জন করতে হয়েছে, তা অবশ্যই বার্জর-পরিকল্পিত তাঁর নায়কত্বকে নস্যাৎ করে। কিন্তু সেই সঙ্গে বোধহয় অরুণ সেনের দেওয়া বিদ্রোহী নিজভেস্তনির প্রতি সরকারী ঔদার্যের প্রশংসাপত্রটিকেও অনর্থক প্রতিপন্ন করে।

বার্জর বর্ণিত ক্রুশেভ-নিজভেস্তনি সংবাদে পাঠকের মনে হয়, নিজভেস্তনি এবং সমগোত্রীয় শিল্পীদের দুর্দশার মূলে ক্রুশেভ স্বয়ং এবং তাঁর সরকারী নীতি। অথচ তিনি তো উদারপন্থী মানসিকতার একটি প্রতীকের মতো। ১৯৬১তেই ক্রুশেভ 'তারুশার পৃষ্ঠা' প্রকাশের অনুমতি দেন। পরের বছর, নিজভেস্তনি প্রদর্শনীতে ধিকৃত হবার একমাস মাত্র আগে, জনসমক্ষে ইয়েভতুশেঙ্কো এবং সোলঝেনিৎসিন-এর প্রতি তাঁর সমর্থনের কথা ক্রুশেভ ঘোষণা করেন। সোলঝেনিৎসিন-এর উপন্যাসে কিছু সংশোধনের প্রস্তাবের জবাবে তিনি বলে-ছিলেন, গ্রন্থকারের ভাষ্য বদলের অধিকার অন্য কারো থাকতে পারে না। মনে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, এমন শিল্পনৈতিক-অধিকার-সচেতন মানুষটির নিজভেস্তনির প্রতি বিষোদ্গারের কারণ কী। নিজভেস্তনি উপলক্ষ মাত্র। লক্ষ্য ছিল তাঁর আধুনিক চারুকলা, যার দুর্বোধ্যতার সামনে দাঁড়িয়ে হয়তো অসহায় বোধ করতেন ক্রুশেভ। ক্রুশেভ শিল্প বুঝতেন না। মানুষ বুঝতেন। নিজভেস্তনিকেও ভুল বোঝেননি। কিন্তু আধুনিক শিল্প, বিশেষত বিমূর্ত শিল্প, তাঁর কাছেও 'উদ্ভট' 'কৃত্রিম' 'নিরর্থক'। বার্জর যে-প্রদর্শনীর মঞ্চে ক্রুশেভ-নিজভেস্তনি সংবাদ পরিবেশন করেছেন, সেখানেই ক্রুশেভকে বলতে শোনা যায়:

"When I was in England I reached an understanding with Eden. He showed me a picture by a contemporary abstractionist and asked me how I liked it. I said I didn't nuderstand it. He said he didn't understand either, and asked me what I thought of Picasso. I said I didn't understand Picasso, and Eden said he couldn't understand Picasso eithe1."

আধুনিক শিল্প সম্বন্ধে তাঁর তাচ্ছিল্য এই উক্তিতে খুবই স্পষ্ট এবং অকপট। শিল্পবোধের জন্য যে কিছু প্রস্তুতির দরকার আছে, সে-কথা জানতেন না ক্রুশেভ, এবং এই পরমক্ষমতাবান দেশপ্রধানকে হয়তো সাহস করে কোনো শুভার্থীই বুঝিয়ে বলেননি সে-কথা, যেমন একদা পিকাসো বুঝিয়েছিলেন আলেকজান্দার কাদয়েফকে।

কাঃ আপনার কোনো কোনো কাজ বুঝতে পারি না। কথাটা সোজাসুজিই বলছি আপনাকে। মাঝেমাঝে এমন সব আকার-আকৃতি বাছেন কেন, লোকে যা বোঝে না ?

পিঃ কমরেড ফাদয়েফ, স্কুলে কি পড়তে শিখিয়েছিল আপনাকে ?

ফাঃ নিশ্চয় !

পিঃ কেমন করে ?

ফাঃ (তীক্ষ্ণ উচ্চ হাস্যে) অ-জ, অজ।

পিঃ ঠিক এভাবে আমিও শিখেছিলাম, অ-জ, অজ। বাঃ, চমৎকার। আর শিল্প কি করে বুঝতে হয় আপনাকে শেখানো হয়েছিল কি ?

আলেকজান্দার ফাদয়েফ আর-একচোট হেসে প্রসঙ্গান্তরে যান।

বস্তুত কোনো দেশনায়কের শিল্পবোধের অভাব অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে না। এমনকি প্লেটোর কল্পনার সেই আকাদমি বা শাসক তৈরির কারখানাতেও শিল্পশিক্ষার স্থান অমুতাপজনক ছিল। ক্রুশেভ-এর কাছে শুধু প্রত্যাশিত ছিল আরও কিছু সহনশীলতা।

আধুনিক শিল্পের আন্দোলনকে সমর্থন করতে গিয়ে একদা এরেনবুর্গ বলেছিলেন—লেনিন শিল্পবিষয়ে নিজের অভিরুচিকে কখনও অন্যের উপর চাপানোর চেষ্টা করেননি, ভিন্নরুচিকে সহ্য করেছেন। অথচ আধুনিক শিল্প, বিশেষত বিমূর্তবাদ, ক্রুশেভ-এর কাছে এতই অসহনীয় যে নিজভেস্তনিকে বলেছেন, তাঁর শিল্পকর্ম মানসিক বিকারের লক্ষণ; থামকা অভিযুক্ত করেছেন তাঁকে সমকামিতার দায়ে। নিজভেস্তনির বিচারে ক্রুশেভ-এর প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন হিসেবেই সম্ভবত তাঁর ভাস্কর্যে যৌনশক্তির 'অসংলগ্ন উত্তেজনা' কারো কারো চোখে পড়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। জন বার্জর যদিও তাকে "স্বাভাবিক অনির্বাণ রূপ" বলে অভিহিত করেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন—নিজভেস্তনি ইরোটিক শিল্পী নন।

শিল্পবিচারে ক্রুশেভ-এর রায় দুভাবে রুশ চারুকলার অনিষ্টের কারণ হয়েছে। জনতার যে-অংশ তাঁরই মতো শিল্পান্ধ, তাঁদের কাছে রুশনেতার মুখের কথা অন্ধের যষ্টির মতো অবলম্বন। আর দ্বিতীয় বিপদটি আরও প্রত্যক্ষ। ক্রুশেভএর আধুনিক শিল্প সম্বন্ধে অন্ধতা এবং অশ্রদ্ধাকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করেছেন কিছু ক্ষমতালোভী স্বার্থসন্ধানী শিল্পী এবং তথাকথিত শিল্পবোদ্ধারা। আকাদমি গোষ্ঠীর প্রভাব তাঁর উপর অবাধ হয়। যে-কয়েকজনের প্ররোচনায় ক্রুশেভ রুশ শিল্প থেকে আধুনিকতাকে নির্বাসিত করতে চাইলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভ্লাদিমির সেরভ এবং আলেকজান্দার গেরাসিমভ। সেদিন নিজভেস্তনির প্রদর্শনীতে এঁদের সক্রিয় উপস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা ক্রুশেভ-এর কাছেকাছেই ছিলেন এবং নানা মন্তব্যে তাঁর আধুনিকতা-বিরোধী মনোভাবকে জাগিয়ে রাখতে সাহায্য করেন। ঠিক তিনদিন পর, ৪ঠা ডিসেম্বর, সেরভ আকাদমির সভাপতি নির্বাচিত হন অপেক্ষাকৃত মৃদু রক্ষণশীল বরিস উওগন-

সিনকে পরাজিত করে। অনতিবিলম্বে গেরাসিমভও শিল্পী য়ুনিয়নের প্রধান নির্বাচিত হন। গেরাসিমভ-এর আঁকা একটি স্তালিন-প্রতিকৃতি বার্জর তাঁর বইটিতে মুদ্রিত করেছেন। সেরভ এবং গেরাসিমভ স্তালিন আমলের স্মরণীয় নাম। "সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা"র রক্ষক তাঁরা।

অরুণ সেন যখন বলেন, "সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার যান্ত্রিক ব্যাখ্যার বিভ্রান্তিকর জয়যাত্রা প্রথম অবস্থায় অস্বীকার করার উপায় ছিল না"; অথবা যখন তিনি বার্জর-এর "পদস্খলন ঘটেনি" প্রমাণ করতে অদ্বিতীয় যুক্তি দেন যে "বর্জর স্তালিন আমলের শিল্পবিষয়ক অন্ধতার ইতিহাস রচনা করেন" তখন তিনি বিশ্বাস করেন সেই "বিভ্রান্তিকর জয়যাত্রা"টি তথা শিল্পবিষয়ে স্তালিনযুগের অন্ধতার অবসান হয়েছে ইতিমধ্যে। কিন্তু রূঢ় সত্যটি বোধহয় এই, শিল্প-বিষয়ে স্তালিনী অন্ধতা এখনও অনতিক্রম্য এবং সেই তৃতীয় দশক থেকে একই আধুনিকতা-পরিপন্থী নীতি আবহমান!

একথাটি না বুঝে বা অগ্রাহ্য করে সোবিয়েতে বর্তমান শিল্পের অবস্থাকে প্রশংসা করা কি কিছু বিপজ্জনক নয়?

অথচ ক্রুশেভ-এর শিল্পবিচার নির্বিচারে সমর্থন করতে গেলে গত্যন্তর থাকে না। অরুণ সেনকে তাই রুশ আকাদমির প্রতি সশ্রদ্ধ হতে হয়েছে। রুশ আকাদমি এবং ফরাসী আকাদমির চরিত্র বিশ্লেষণের চেষ্টায় একবার বলেছেন তিনি, "দুই আকাদমির পার্থক্য এইখানেই, ফরাসী আকাদেমির পাশে সর্বদাই থাকে একদল বিদ্রোহী শিল্পী এবং ফরাসীদের তো আছেই বাস্তববাদের ঐতিহ্য।" এই "পাশে" শব্দটির সাহায্যে যদি তিনি 'অন্তর্গত' বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে ফরাসী শিল্পের ইতিহাস শুধরে লিখতে হয়। আর যদি শব্দটি 'প্রতিবেশী' কি 'প্রতিদ্বন্দ্বী' বোঝায়, তাহলে ইতিহাস বলে, রুশ আকাদমির পাশেও বিদ্রোহী শিল্পীরা ছিলেন, আছেন।

কিন্তু বিশুদ্ধ বিশ্বাস অবশ্যই যুক্তি-নিরপেক্ষ এবং তর্কাতীত। এ-প্রসঙ্গে অরুণ সেনের শেষ কথাটিই তাঁর প্রবন্ধের শেষ লাইন, "জন বর্জর যাই বলুন বুর্জোয়া দেশের আকাদেমির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশের আকাদেমির তফাৎ আছেই।" তফাৎটি যথাযথ নির্দেশ করতে তাঁর আলস্যের দরুন জন বার্জর-এর ভ্রান্তিমুক্তি এ-যাত্রা সম্ভব হল না; এবং তাঁদের ধারণারও শুদ্ধি হল না যাঁরা আকাদমি মাত্রকেই দুষ্ট গ্রহবিশেষ মনে করেন, মনে করেন রাজা পিটার যেদিন ফরাসী অনুকরণে রুশ আকাদমির প্রতিষ্ঠা করেন সেইদিন থেকে রুশ শিল্পের চরিত্র—একদা যা ছিল ধর্মনিপীড়িত রাজ-কুক্ষিগত, তৃতীয় হস্তান্তরে আজও তাই—আকাদমি অধিকৃত।

অশোকনাথ মুখোপাধ্যায়

পরিচয়
বর্ষ ৩৯। সংখ্যা ৮
ফাল্গুন ১৩৭৬

সূচিপত্র

প্রবন্ধ ঃ

আর্থনীতিক উন্নয়নের দুই তত্ত্ব ঃ লেনিনবাদী ও পুঁজিবাদী। মঃ আভসেনেভ ৭৪৯॥ লেনিনের জীবনাবসানে ভারতীয় পত্র-পত্রিকাদির প্রতিক্রিয়া। শঙ্কর রায় ৭৬৯॥ প্রান্তীয় উত্তর বাঙলার মেচ উপজাতি। চারুচন্দ্র সান্যাল ৭৮৬॥ এস. ওয়াজেদ আলীর সাহিত্যভাবনা। গুরুদাস ভট্টাচার্য ৮১১

কবিতা ঃ

মণীন্দ্র রায় ৭৯৪। সরিৎ শর্মা ৭৯৪। শিবশম্ভু পাল ৭৯৬। রত্নেশ্বর হাজরা ৭৯৬। কমল চক্রবর্তী ৭৯৭। টু ফু (অনুবাদ ঃ গিরিজাপতি ভট্টাচার্য) ৭৯৮

গল্প ঃ

রাজযোটক। বিজনকুমার ঘোষ ৭৭৭॥ দিগম্বরী ছায়া আবুবকর সিদ্দিক ৮০৩

পুস্তক-পরিচয় ঃ

অলোক রায় ৮২১। শচীন বিশ্বাস ৮২৪

নাট্যপ্রসঙ্গ ঃ

তরুণ সেন ৮২৯

বিবিধ প্রসঙ্গ ঃ

শান্তিময় রায় ৮৩২। জ্যোতি দাশগুপ্ত ৮৩৬। ধনঞ্জয় দাশ ৮৩৭। সঞ্জয় দাশগুপ্ত ৮৩৯

বিয়োগপঞ্জী ঃ

কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৪২

পাঠকগোষ্ঠী ঃ

তরুণ সান্যাল ৮৪৫

প্রচ্ছদপট ঃ বিশ্বরঞ্জন দে

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। হিরণকুমার সান্যাল। সুশোভন সরকার। অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে চিন্মোহন সেহানবীশ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস।

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

পরিচয় প্রাইভেট [illegible] পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চা[illegible]গান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

মনীষার কয়েকটি বই

রূপনারানের কূলে

গোপাল হালদার

প্রবীণ সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক কর্মীর আত্মোপলব্ধির কাহিনী বিচিত্র অভিজ্ঞতামণ্ডিত জীবনের স্মৃতিকথায় বিধৃত।

মূল্য: ছয় টাকা

বসন্তবাহার ও অন্যান্য গল্প

আনা সেগার্স, ভিলি ব্রেডাল প্রভৃতি ফ্যাসিস্টবিরোধী গণতান্ত্রিক জার্মান-লেখকদের গল্প-সংগ্রহ।

মূল্য: তিন টাকা

কলিযুগের গল্প

সোমনাথ লাহিড়ী

রাজনৈতিক সংগ্রামের খড়্গাপাণিরূপে সোমনাথ লাহিড়ীকে সবাই জানে। 'কলিযুগের গল্প'-এ সোমনাথ লাহিড়ীর আর-এক পরিচয় কথাসাহিত্যিকরূপে। সে-পরিচয়ও সামান্য নয়, তার সাক্ষ্য সংকলনটির একাধিক সংস্করণ।

মূল্য: ছয় টাকা

পরিচয়
বর্ষ ৩৯ । সংখ্যা ৮
ফাল্গুন । ১৩৭৬

আর্থনীতিক উন্নয়নের দুই তত্ত্ব : লেনিনবাদী ও পুঁজিবাদী

ম: আভসেনেভ

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বর্তমান স্তরে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত বহু দেশই কোন পথ অনুসরণ করে অগ্রসর হবে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী নীতি অনুসরণের প্রশ্নও তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এইসব দেশের নেতারা উপলব্ধি করছেন যে, দীর্ঘমেয়াদী নীতি ছাড়া উন্নয়নের কর্মসূচী কতকগুলি প্রয়োজনীয় প্রকল্পের তালিকা ছাড়া আর কিছুই হবে না। এইসব প্রকল্পের রূপায়ণ কারিগরি ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা তাড়াতাড়ি দূর করে দেবে এমন কথা মনে করারও কারণ নেই। সদ্যস্বাধীন দেশগুলি যেসব প্রধান প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, সেগুলির সমাধান নির্ভর করছে মূলত উন্নয়নের পথ বেছে নেওয়ার ওপর। সমস্যাগুলির মধ্যে আছে অর্থনীতিতে অর্থ যোগানের পন্থা, বিদেশী পুঁজির সঙ্গে সম্পর্ক এবং কৃষি-সমস্যা সমাধানের উপায়। কোন পথ বেছে নেওয়া হবে—এই প্রশ্নকে ঘিরে দুটি মতাদর্শের (কমিউনিস্ট ও বুর্জোয়া) লড়াই চলছে। সারা দুনিয়া জুড়ে যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া চলেছে—সেই পুঁজিবাদ থেকে সমাজবাদে উত্তরণের প্রক্রিয়া এ-লড়াইতে প্রতিফলিত হচ্ছে। কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলনের দলিলে বলা হয়েছে, "জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের

বিরুদ্ধে লড়বার সময় সাম্রাজ্যবাদ একদিকে একগুঁয়েভাবে উপনিবেশবাদের অবশেষকে আঁকড়ে রয়েছে এবং আর-একদিকে নয়া-উপনিবেশবাদী পন্থার মাধ্যমে সন্ত-স্বাধীন দেশগুলিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনে বাধা দিতে চেষ্টা করছে।....সাম্রাজ্যবাদ সমাজতন্ত্রের পথে অথবা সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে দেয় এমন প্রগতিশীল অ-ধনতান্ত্রিক পথে উন্নয়নে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে।"

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা হাতেনাতে প্রমাণ করেছেন যে, সন্ত-স্বাধীন দেশগুলির পক্ষে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূর করার সবচেয়ে সোজা এবং অপেক্ষাকৃত কম যন্ত্রণাদায়ক পথ হলো সমাজতান্ত্রিক পন্থায় উন্নয়ন। এর কারণ হলো এই যে, সমাজতন্ত্রই নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি এবং দ্রুত জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি সুনিশ্চিত করে।

উন্নত পুঁজিবাদের স্তর অতিক্রম না করে অনুন্নত দেশগুলির সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষা হলো মোটামুটি এইরকম :

পুঁজিবাদ যখন আর একমাত্র বিশ্ব-ব্যবস্থা থাকছে না এবং বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়ে যখন তা সংহত হয়[১], তখন সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর কোনো কোনো জাতির সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্যে পুঁজিবাদী স্তর অতিক্রম না করেও প্রাক-পুঁজি সম্পর্ক থেকে সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

লেনিন এই বিষয়ে অনেক লিখেছেন, তবে এই বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিবৃতি তিনি দেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে। তিনি বলেছিলেন :

"....অনগ্রসর যে জাতিগুলি এখন মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছে এবং মহাযুদ্ধের পর প্রগতির দিকে যাদের কিছুটা অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়, তাদের অর্থনৈতিক বিকাশে পুঁজিবাদী স্তর অবশ্যম্ভাবী—এই বক্তব্য কি আমরা নির্ভুল মনে করব? আমাদের জবাব হলো—"না"। যদি বিজয়ী বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী তাদের মধ্যে ধারাবাহিক প্রচারকার্য চালায় এবং সোভিয়েত সরকারগুলি যদি

১। শুধু অর্থনৈতিক নির্দেশগুলি লক্ষ্য করে এটা বিচার করা যায়। এখন দুনিয়ার শিল্পজাত পণ্যের ৪০ শতাংশ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে উৎপাদিত হয়, যদিও তাদের মোট জনসংখ্যা দুনিয়ার মোট জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশের মতো।"

তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করে, তাহলে অনগ্রসর জাতিগুলিকে অবশ্যম্ভাবীরূপে উন্নয়নের পুঁজিবাদী স্তর অতিক্রম করতে হবে—একথা ধরে নেওয়া ভুল হবে। ....উন্নত দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর সহায়তায় অনগ্রসর দেশগুলি পুঁজিবাদী স্তর অতিক্রম না করেই সোভিয়েত ব্যবস্থায় উপনীত হতে পারবে এবং বিকাশের কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে কমিউনিজমে পৌঁছুতে পারবে।"

পরাধীনতার শৃঙ্খল যে-সব জাতি ছিন্ন করেছে, তাদের চেতনার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা যে ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতরভাবে প্রবেশ করছে এবং সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির বহু নেতাকে সেই ভাবধারা যে প্রভাবিত করছে—তা বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা উপলব্ধি করেছেন। এই জন্যেই তাঁরা এইসব দেশকে সমাজতন্ত্রের অভিমুখী হওয়া থেকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। পুঁজিবাদের প্রশস্তি গেয়ে এবং লেনিনের অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের তত্ত্বের বিরোধিতা করে পশ্চিমী দেশগুলিতে লেখার পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। এঁরা সর্ববিধ পন্থা অনুসরণ করছেন। "গভীর" তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা থেকে আরম্ভ করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবধারা, বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের দলিলাদি, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির এবং সমাজতন্ত্রের পথাভিমুখী দেশগুলির পরিস্থিতি সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্যাদির প্রকাশ্য বিকৃতি ঘটানো—কিছুই বাদ যাচ্ছে না।

পশ্চিমী অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদরা যুক্তি দেখান নানারকম। কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে অল্পই। আর এই সিদ্ধান্তগুলি শেষপর্যন্ত দুটি বুনিয়াদী তত্ত্বে পর্যবসিত হয়: সমস্ত, অন্ততপক্ষে অধিকাংশ, সদ্য-স্বাধীন দেশের পক্ষে সমাজতন্ত্র একটা অসম্ভব ব্যাপার এবং সমাজতন্ত্রের "বিকাশলাভের সম্ভাবনাগুলি"র পরিমাণগত নির্দেশক ও জাতিসমূহকে এর জন্য যে "মূল্য" দিতে হবে বলে ধরে নেওয়া হয় তার দিক থেকে বিচার করলে সমাজতন্ত্র "অকার্যকর"! বুর্জোয়া মতাদর্শে আচ্ছন্ন বলে এশিয়া ও আফ্রিকার যেসব অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ (সাধারণত এঁরা পশ্চিমী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে শিক্ষালাভ করছেন) পুঁজিবাদী বিকাশ পছন্দ করেন, তাঁরা এই তত্ত্বগুলি সমর্থন করেন।

উন্নয়নশীল দেশগুলির সমাজতন্ত্রাভিমুখী হওয়া কি সম্ভব ?

উপরের প্রশ্নের জবাবে অধিকাংশ বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ বলবেন "না"। তাঁদের যুক্তিগুলিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিম্নলিখিত উল্লেখ থাকবে:

সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির "অনুপযোগী শ্রেণী কাঠামো" (শ্রমিকশ্রেণীর

অস্তিত্ব নেই অথবা সমাজে অ-শ্রমিক অংশগুলিরই, প্রধানত কৃষককুলের, প্রাধান্য), প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী না থাকায় সোভিয়েত মডেল গ্রহণযোগ্য নয়, বৈষয়িক সম্পদসমূহ পর্যাপ্ত নয়, ইত্যাদি অথবা শেষপর্যন্ত সমাজতন্ত্র গঠনের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব শুধু ইয়োরোপের পক্ষে উপযোগী, এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিগুলির কাছে এই তত্ত্ব বিজাতীয় তত্ত্ব। পুঁজিবাদ অতিক্রম না করে উন্নয়নশীল দেশগুলি সমাজতন্ত্রে উপনীত হতে পারে —এই ধারণাকে মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের ডকটর এ. মেইসনর "গালগল্প" বলে অভিহিত করেছেন। ঐসব দেশের অধিকাংশ লোক চাষী, এই তথ্যকে ভিত্তি করে তিনি বলেন যে, উন্নত দেশগুলিতেও চাষীরা কখনও সমাজতন্ত্রের জন্যে লড়েনি, কাজেই কেন যে সনাতন সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ আফ্রিকান চাষীরা সমাজতন্ত্রের জন্য লড়বে তা তিনি ভেবেই পান না।[১] তাঁর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি তুলেই প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি. সিগমুণ্ড বলেন যে, "মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হলো ১৯শ শতাব্দী ও ২০শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইয়োরোপের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সৃষ্ট অতিসরলীকৃত মতবাদ"—যা আজকের দিন পর্যন্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দাওয়াই-এর মূলে বর্তমান রয়েছে।[২]

মালির মোদিবো কেইতা সরকারের পতনের কারণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জে. ভাংগজী (এঁকে 'জুনে আফ্রিক' পত্রিকায় বিশিষ্ট আফ্রিকান অর্থনীতিবিদ বলে অভিহিত করা হয়েছে) বলেন যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নকল করতে গিয়েই মোদিবো কেইতার পতন ঘটেছে। তাঁর সিদ্ধান্ত হলো সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মতো বৈষয়িক সম্পদ ও জনবল না থাকায় আফ্রিকার দেশগুলি "সোভিয়েত পরীক্ষা-নিরীক্ষা"র পুনরাবৃত্তি করতে পারে না।[৩]

অন্যান্য বুর্জোয়া লেখকরাও প্রায় এইরকম যুক্তি দেখান।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ "খাঁটি ইয়োরোপীয় মতবাদ" এবং এই মতবাদ

১। এ. মেইসনের-লা আফ্রিক, পুত-এল পারতির ? প্যারিস, ১৯৬৬, পৃঃ ১০। বলা বাহুল্য এই বক্তব্য যে-কোনো সদ্য-স্বাধীন দেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারা যায়।

২। 'দি আইডিওলজিস অব দি ডেভেলপিং নেশনস', নিউইয়র্ক, ১৯৬৪, পৃঃ ৩৭।

৩। 'জুনে আফ্রিক,' ২৭ জুন-২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯, পৃঃ ২৭।

ইয়োরোপের বাইরে প্রযোজ্য নয়, বুর্জোয়াদের এই মত এশিয়ার কয়েকটি দেশ ও কিউবার অভিজ্ঞতায় খণ্ডিত হয়েছে। আরও বড় কথা হলো এই যে, অনগ্রসর দেশগুলি পুঁজিবাদ অতিক্রম না করে সমাজতন্ত্রে উপনীত হতে পারবে না—এই তত্ত্বটিই সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, লেনিন যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আভাস দিয়েছেন, এই তত্ত্বে সেগুলি হয় উপেক্ষা করা হয়েছে আর না হয় সেগুলিকে বিকৃত করা হয়েছে। আগের অনগ্রসর যেসব দেশ এখন সমাজতন্ত্রের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাদের অর্থনীতিকে সাফল্যের সঙ্গে গড়ে তুলছে, তাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা ইচ্ছে করেই নিম্নলিখিত দুটি বিষয়কে গুলিয়ে ফেলেছেন : সমাজতন্ত্র গঠনের আশু সম্ভাবনা এবং সমাজতান্ত্রিক অভিমুখীনতা। সমাজতান্ত্রিক অভিমুখীনতা বলতে বোঝায় এমন এক কর্মনীতি যার লক্ষ্য হলো পরে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার অবস্থা সৃষ্টি করা। ঔপনিবেশিক বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেছে এমন যে-সব দেশ উন্নয়নের জন্য সমাজতন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে বা নেবে, তাদের কারুরই নিশ্চয় এখনই সরাসরি সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা নেই (থাকতেও পারে না)। ব্যতিক্রম হিসাবে শুধু উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এমন সম্ভাবনা থাকতে পারে। তাই, মার্কসবাদীরা নতুন রাষ্ট্রগুলি এখনই সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম এমন দাবি করেন না। সোভিয়েত রাশিয়ায় পর্যন্ত সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গোড়ার বছরগুলিতে সরাসরি সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতির নয় এমন বহু ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল। এইসব ব্যবস্থা শুধুমাত্র পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার অবস্থা সৃষ্টি করেছিল।

মোঙ্গলীয় জনগণ বিপ্লবের ২০ বছর পরে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করে। মার্কসবাদী সাহিত্যে যে-প্রক্রিয়াকে উন্নয়নের অ-ধনতান্ত্রিক পথ বলে অভিহিত করা হয়, তার অর্থ ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্রের উত্তরণের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা। পরে যেসব সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটবে—এই পথ আগে থেকেই সেইসব পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জমি তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ার সারবস্তু সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেনিন "প্রাক-পুঁজিবাদী সম্পর্ক থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য" কোন কোন মধ্যবর্তী পথ, পন্থা ও হাতিয়ার "দরকার হয়" তা বোঝবার প্রয়োজনের উল্লেখ করেছেন।

সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে সংগঠনের অভাব এবং কৃষকদের রাজনৈতিক

নিষ্ক্রিয়তার উল্লেখ করে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা বলেন যে, জনসাধারণের অ-শ্রমিক অংশ "বিপ্লব-বিরোধী" এবং সমাজতান্ত্রিক অভিমুখীনতার পথে অলংঘনীয় বাধা। একথা ঠিক যে, ঐসব দেশের অনেকগুলিতেই কৃষকরা অসংগঠিত এবং নিষ্ক্রিয়। কিন্তু কয়েকটি দেশে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চলার কালে কৃষকরা তাদের বিপ্লবী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। আলজেরিয়া, ভিয়েতনাম এবং আফ্রিকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের বহু দেশে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে কৃষকরা লড়েছে ও লড়ছে। সম্প্রতি কয়েক বছরের মধ্যে প্রবল কৃষক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে (১৯৬৩ সনে তুরস্কে এবং ১৯৬৪ সনে ভারতে)। গেরিলা আন্দোলনও চলেছে লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে। মস্কোয় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনের দলিলে বলা হয়েছে যে, কৃষকরা "সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় মুক্তি ও নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতাকে সংহত করার জন্য সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।"

সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে কৃষকদের সম্ভাব্য বৈপ্লবিক শক্তিকে অস্বীকার করে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা হয় বড় রকম ভুল করছেন, আর না হয় নিজেদের আবার আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন। কৃষকরা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা আয়ত্ত করতে অক্ষম, কাজেই অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক সংগঠনকেও বুঝতে অক্ষম—তাঁদের এই অভিমতের সঙ্গে তথ্যের কোনো মিল নেই। লেনিন বলেছিলেন যে, "আধা-সামন্ততান্ত্রিক অধীনতার অবস্থার মধ্যে থাকে এমন কৃষকরা সহজেই সোভিয়েত সংগঠনের চিন্তাধারাকে আয়ত্ত করতে ও তাকে কার্যকর করতে পারে।" অভিজ্ঞতা লেনিনের বক্তব্যের নির্ভুলতা প্রমাণ করেছে। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ২য় কংগ্রেসে লেনিন ঐ কথাগুলি বলেছিলেন। কয়েক মাস পরে সোভিয়েত-সমূহের নিখিল রুশ কংগ্রেসের ৮ম অধিবেশনে বোখরা, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহের সংহতি প্রসঙ্গে লেনিন বলেন: "সোভিয়েত সরকারের ধারণা ও নীতিগুলি যে কেবলমাত্র শিল্পোন্নত দেশগুলিতে নয়, কেবলমাত্র যেসব দেশে শ্রমিকশ্রেণীর মতো সামাজিক ভিত্তি আছে সেইসব দেশেই নয়, কৃষককুল যেসব দেশের সামাজিক ভিত্তি সেইসব দেশেও বোধগম্য ও প্রযোজ্য—এই প্রজাতন্ত্রগুলিই তার প্রমাণ। কৃষকদের সোভিয়েতের আইডিয়া জয়যুক্ত হয়েছে।" লেনিনের ধ্যান-ধারণাগুলি মঙ্গোলিয়াও প্রমাণ করেছে। জাতীয় শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত মঙ্গোলিয়ার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির প্রধান সামাজিক ভিত্তি এবং জনগণের বিপ্লবের চালিকাশক্তি

ছিল কৃষকদের গরীব ও মধ্য স্তর এবং যাযাবর পশুপালকেরা। কাজেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর কোনো দেশের জনসংখ্যার অ-শ্রমিক অংশগুলির আধিক্য কোনোক্রমেই সমাজতন্ত্রের উত্তরণের জন্য অবস্থা সৃষ্টির পক্ষে অলংঘনীয় বাধা হতে পারে না।

"সোভিয়েত উন্নয়ন মডেল" অধিকাংশ সদ্য-স্বাধীন দেশের পক্ষে গ্রহণের অযোগ্য বলে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা যে-দাবি করেন, তাও ভিত্তিহীন। তাঁদের বিবৃতি দেখে বোঝা যায় যে—যেসব নির্দিষ্ট পন্থায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা হয়েছে, সেইসব নির্দিষ্ট পন্থাকেই তাঁরা "সোভিয়েত মডেল" বলে বোঝেন। যেমন, জাতীয় অর্থনৈতিক অনুপাত, উন্নয়নের অর্থাদির উৎস, ইত্যাদি। কিন্তু কোনো দেশ যদি সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়, তাহলে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যা করেছে তাই করতে হবে এমন কথা মার্কসবাদীরা কখনোই বিশ্বাস করেন না। এটা অসম্ভব, কারণ, সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পথ অনুসরণ করাই স্বাভাবিক। কোনো দেশের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সাধারণ নিয়মগুলি ছাড়াও প্রত্যেক দেশের নিজস্ব বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। সমাজতন্ত্র গঠনের অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে যে, সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন সমূহ ঘটানোর নির্দিষ্ট পন্থা ও হারের মধ্যে যথেষ্ট রকম পার্থক্য আছে। যেমন, ছোট ছোট পণ্য উৎপাদনকারীদের সমবায় সমূহে সংগঠিত করা, পুঁজিবাদী সম্পত্তির সমাজতন্ত্রী-করণ, রাষ্ট্র-কাঠামোর বিভিন্ন রূপ, ইত্যাদি। ভবিষ্যতে অন্যান্য দেশ যখন সমাজতন্ত্রের পথ অনুসরণ করবে তখনও এই পার্থক্য থেকে যাবে। তাই, যেসব বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ উন্নয়নের সমাজতান্ত্রিক পথকে "সোভিয়েত মডেলের অন্ধ অনুকরণ" বলে মনে করেন—তাঁদের সম্পর্কে লেনিনের নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রযোজ্য :

"আমাদের ইয়োরোপীয় বাক্যবাগীশেরা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না যে, আরো বিশাল জনসংখ্যা ও সামাজিক অবস্থার বিপুলতর বৈচিত্র্য সমন্বিত প্রাচ্যের দেশগুলিতে পরবর্তীকালে যেসব বিপ্লব ঘটবে—রুশ বিপ্লবের চাইতে নিঃসন্দেহে সেইসব বিপ্লবে আরও বেশি বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাবে।"

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় উন্নয়নের অ-ধনতান্ত্রিক পথ সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষা নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে মধ্য-এশিয়ার প্রজাতন্ত্রসমূহ ও সুদূর উত্তরাঞ্চলের জাতিগুলি

রুশ জনগণের সহায়তায় পুঁজিবাদী স্তর অতিক্রম না করেই সমাজতন্ত্রে উপনীত হয়েছে। মঙ্গোলিয়ার জনগণের প্রজাতন্ত্রও অনুরূপভাবে সমাজতন্ত্রে উপনীত হয়েছে। একথা ঠিক যে, এইসব দেশে এমন সব উপাদান ছিল যেগুলি অধিকাংশ সদ্য-স্বাধীন দেশে নেই। সবচেয়ে বড় কথা হলো এই যে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উল্লিখিত অঞ্চলগুলি ও মঙ্গোলিয়া সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছিল এবং লেনিনের তত্ত্ব "বিশুদ্ধ রূপে"ই এসব অঞ্চলে কার্যকর হয়। এইসব অঞ্চল যাতে উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের ও প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন-সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্তরে অবস্থিত অন্যান্য দেশকে (তুরস্ক ও ইরান) পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে, তার জন্য সোভিয়েত সরকার সর্বতোভাবে ঐসব অঞ্চলকে সাহায্য করেছেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে লেনিনের তত্ত্বের পরিপূরক হিসাবে কাজ করেছে তৃতীয় একটি উপাদান। নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে রাখবার জন্য উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি এখন তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং কখনও কখনও সামরিক ক্ষমতা ব্যবহার করছে। কিন্তু এইরকম অবস্থাতেও কিউবার মতো, বিশেষ করে ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মতো, দেশগুলির অভিজ্ঞতা উন্নত পুঁজিবাদী স্তর অতিক্রম না করে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা সংক্রান্ত লেনিনের তত্ত্ব সপ্রমাণ করেছে। এইসব দেশ পুঁজিবাদী দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের সঙ্গেও এরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে। যে-সব দেশ উন্নয়নের সমাজতান্ত্রিক পথ বেছে নিয়েছে বহু প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও (যেমন, ভিয়েতনামে দেশবিভাগ, স্বাধীনতালাভের পর যুদ্ধের ফলাফলগুলি দূরীকরণের আবশ্যকতা এবং মার্কিন আগ্রাসন), তারা প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে। আরও বড় কথা হলো এই যে, কিউবা ও ভিয়েতনামের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বা দুর্লভ প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। উৎপাদনের সমাজতান্ত্রিক সম্পর্কের সুবিধা এবং আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শ্রম-বিভাগ ব্যবস্থা থেকে সরে দাঁড়ানোই হলো তাদের সাফল্যের প্রধান কারণ।

লেনিনের তত্ত্বে পুঁজিবাদী স্তর অতিক্রম না করেও সমাজতন্ত্রে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এমন দাবি করা হয়নি যে, এই সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হবেই। বাইরের উপাদানের (সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অস্তিত্ব উন্নয়নশীল দেশগুলিকে পুঁজিবাদী স্তর পার না হয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের

ব্যাপারে সাহায্য করবে) সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই আভ্যন্তরীণ পরিবেশ। এই পরিবেশ হলো শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক তৎপরতা, অ-ধনতান্ত্রিক পথে সমাজতন্ত্রে উপনীত হওয়ার জন্য তাদের সঙ্কল্প এবং সবশেষে, সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যোগ্য নেতৃত্ব গ্রহণে সক্ষম সংগঠিত সামাজিক শক্তি। তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ দেশেই এই পরিবেশ নেই। কিন্তু এই রকম পথের সম্ভাবনার কথা তর্কাতীত, তা সে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা যত উল্টো কথা বলার চেষ্টাই করুন না কেন।

উন্নয়নের সমাজতান্ত্রিক পথের কার্যকারিতা

আগের ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলি সমাজতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করতে পারে এ-কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে বহু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ জোর দিয়ে বলছেন যে এই পথ মোটামুটিভাবে কার্যকর নয়, অথবা অন্ততপক্ষে পুঁজিবাদী ভিত্তিতে উন্নয়নের চাইতে কম কার্যকর। চেজ মানহাটন ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট এবং সমসাময়িক মার্কিন ধনপতিগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড়দরের প্রতিনিধিদের অন্যতম ডেভিড রকফেলার পরিষ্কারভাবেই এমন ধরনের কথা বলেন। সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির সমস্যা সংক্রান্ত একটি আলোচনা সভায় তিনি এ-সব দেশের উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক লগ্নির প্রয়োজনের উল্লেখ করার পর তৃতীয় দুনিয়া ও তার সমস্যা সমূহের সঙ্গে সুপরিচিত বলে কথিত এক বন্ধুর উক্তি উদ্ধৃত করেন। উক্তিটি নিম্নরূপ:

"উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে আমি অনিবার্য শর্ত বলে মনে করেছিলাম, তা কোনো কাজে লাগে না। আসলে, এই বিপ্লব এক ধরনের পুঁজিবাদী বিপ্লব।"[১]

অন্যান্য বহু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ একই কথা বলেছেন। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডবলিউ· জোনস উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা কাজে না লাগানোর জন্য হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ফরাসী বিশ্বকোষের অন্যতম লেখক গিলবার্ত ব্লার্দোও অনুরূপ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।[২]

১। 'জুনে আফ্রিক', ৮ই অক্টোবর, ১৯৬৭, পৃঃ ১৯

২। 'ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ইন আফ্রিকা', অক্সফোর্ড, ১৯৬৫, পৃঃ ৪৯; 'এনসাইক্লোপিদি ফ্রাঁসে', ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৯, ৩৬

তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে অধিকাংশ বুর্জোয়া লেখক গিনি ও কিউবার মতো দেশগুলির অর্থনৈতিক বিপত্তির উল্লেখ করে থাকেন। কেউ কেউ আরও অগ্রসর হয়ে সোভিয়েত অর্থনীতির অকার্যকারিতার কথাও বলেন।[১]

যেসব বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ উন্নত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দিহান, তাঁদের সঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধের লেখক তর্ক করতে চান না। এই প্রশ্ন নিয়ে বহু প্রবন্ধ লেখা হয়েছে এবং সে-সব প্রবন্ধে সমাজতন্ত্রের সুবিধাগুলি সপ্রমাণ করা হয়েছে। আমি এই প্রবন্ধে উন্নয়নের প্রারম্ভিক স্তরের কার্যকারিতা প্রমাণ করতে চাই। এই স্তরটিকে ওয়াল্ট রোস্টো 'উত্থমের মুহূর্ত'' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই স্তরের কার্যকারিতা প্রমাণ করতে হলে আমাদের প্রথমে সামাজিক-অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূর করার প্রচেষ্টায় সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিকে কি কি কাজ করতে হবে—তা স্থির করতে হবে। এর জন্য আবার দরকার "সামাজিক-অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা" এবং "স্বল্পোন্নত"—এই শব্দগুলির সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা।

আমাদের সাহিত্যে ও বুর্জোয়া সাহিত্যে অনেক নির্ণায়ক আছে যেগুলির সাহায্যে আমরা কোনো দেশ উন্নত কি উন্নয়নশীল তা নির্ধারণ করি। এই সব নির্ণায়কের মধ্যে আছে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের পরিমাণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থাদির অবস্থা, জনপ্রতি ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ এবং জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে (শিল্প, কৃষি, জনসেবামূলক কাজকর্ম) নিযুক্ত লোকের অনুপাত ইত্যাদি।

উল্লিখিত সমস্ত নির্ণায়ককেই পরিমাণগত শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এগুলি গুরুত্বপূর্ণ হলেও একটা দেশকে উন্নত বা উন্নয়নশীল কোন গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলা যাবে তা ঠিক করার মতো একটি সম্পূর্ণ ছবি এই নির্ণায়কগুলি তুলে ধরতে পারে না। আমার মতে একটা দেশ স্বল্পোন্নত কিনা তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে পরিমাণগত নির্ণায়ক অপেক্ষা গুণগত নির্ণায়কই আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শুধু পরিমাণগত নির্ণায়কের সাহায্য নিলে তা একটা দেশের উন্নয়নের স্তরের বিকৃত

১। সুবিদিত মার্কিন "সোভিয়েত তত্ত্ববিদ" এ. বার্গসন জোর দিয়ে বলেছেন যে, সোভিয়েত অর্থনীতির অ-কার্যকারিতা "প্রমাণ"-এর জন্য লিখিত তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো তৃতীয় দুনিয়ার কাছে সমাজতন্ত্রকে হেয় প্রতিপন্ন করা। এ. বার্গসন রচিত 'প্ল্যানিং এ্যাণ্ড প্রোডাকটিভিটি আণ্ডার সোভিয়েট সোস্যালিজম', নিউ ইয়র্ক, ১৯৬৮, পৃঃ ১৬

ছবি সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, কুবাইত জনসংখ্যার মাথাপিছু জাতীয় আয়ের পরিমাণের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডের মতো দেশগুলিকেও অনেক পিছনে ফেলে দিয়ে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অথবা অন্যতম প্রথম স্থান অধিকার করেছে। কয়েকটি উন্নত পুঁজিবাদী দেশে সমাজের মোট উৎপাদনে কৃষিজাত পণ্যেরই প্রাধান্য লাভ করতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিউজিল্যাণ্ডের নাম করা যায়।

কোনো দেশ স্বল্পোন্নত কিনা তা নির্ধারণ করার দুটি মূল নির্ণায়ক আছে। একটি হলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত নয় বা প্রায় যুক্ত নয় (কোনো কোনো পশ্চিমী অর্থনীতিবিদ এই অবস্থাকে "অর্থনীতির নিগ্রন্থন"[১] বলে অভিহিত করেন) এমন আর্থনৈতিক অংশগুলির অস্তিত্ব। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি অংশ নিজস্ব ভিত্তিতেই ও নিজস্ব ধাঁচেই পুনরুৎপাদন করে চলে। এই অংশগুলি হলো সাধারণত প্রাকৃতিক (চিরাচরিত) ও স্থানীয় পণ্য (শহরের), আর রপ্তানী (সাধারণত বিদেশীদের হাতে)।[২] দ্বিতীয় নির্ণায়ক হলো সামাজিক সম্পর্ক সমূহের, বিশেষ করে উৎপাদন সম্পর্কের, মান্ধাতার আমলের রূপ। মান্ধাতার আমলের উৎপাদন-সম্পর্ক আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও উৎপাদন সংগঠনের কাঠামোর মধ্যে চালু উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে (যেমন শ্রমশক্তির সম্পদ) সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে দেয় না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, নিছক অর্থনৈতিক উপাদান ছাড়াও আরও কিছুর সঙ্গে "স্বল্পোন্নয়ন"-এর সম্পর্ক রয়েছে। দূরপ্রসারী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটিয়েই একে দূর করা যায়। পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করে কি তা করা যায়? পুঁজিবাদী ধারায় নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলির উন্নয়নের তিনটি সুনির্দিষ্ট ধরন স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করা যাক।

প্রথম হলো "চিরায়ত পুঁজিবাদী" পথ। পশ্চিম ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকা এই পথ অনুসরণ করেছে। এই পথ হলো: ক্ষুদ্রাকার পণ্য-অর্থনীতির স্বাভাবিক ভাঙনের ভিত্তিতে পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশ। কোনো কোনো

১। জে. এস. আলবারতিনি—'লে মেকানিজম দ্য সু-দেভেলপমেন্ত', প্যারিস, ১৯৬৭, পৃঃ ৪৫

২। কোনো কোনো স্বল্পোন্নত দেশে (নেপাল, ভূটান এবং অন্যান্য) অর্থনীতির এই অংশ হয় নেই, আর না হয় সামান্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

সরকারী ব্যবস্থার ('ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ডের ২৪শ পরিচ্ছেদে মার্কস বর্ণিত ব্যবস্থাগুলির মতো) দ্বারা ক্রমবিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এই হলো পুঁজিবাদের স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তির পথ। তৃতীয় দুনিয়ার সমস্যা সম্পর্কে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞ ডব্লিউ. এ. লিউইস বর্তমান শতকের চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি এই পথ অনুসরণের পক্ষে বলেছিলেন। মূলত এই পথ অনুসরণের প্রস্তাব করেছেন ওয়াল্ট রোস্টো। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ এ. এম. ক্যামার্ক এই পথ নিয়ে আলোচনা করেছেন।[১]

এই ধরনের পথ অনুসরণ করা সাধারণভাবে সম্ভব। কারণ, সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে যৌথ সম্পত্তির (যেখানে যেখানে আছে) ভাঙন এবং ক্ষুদ্রাকারে পণ্য উৎপাদনকারীদের মধ্যে স্তরভেদ সত্যিই বেশ তীব্রভাবে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু তা কার্যকর (আর বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা ঠিক এই কথাই বলছেন) কিনা তা নিশ্চিত করে বলা খুব শক্ত। এই পথ খুব দীর্ঘ। ঔপনিবেশিক পরাধীনতার বন্ধনমুক্ত সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রগুলির চাইতে অনেক ভালো অবস্থায় যেসব দেশ ছিল, সেই সব দেশেরও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমকালীন স্তরে পৌঁছুতে কয়েক শতাব্দী লেগেছে। আসল কথা হলো এই যে, তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ দেশের কাছেই এই পথ সর্বতোভাবে রুদ্ধ হয়ে গেছে। অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলি পর্যন্ত "উন্নয়নের স্বতঃস্ফূর্ত পদ্ধতি"কে বাতিল করতে এবং বেশ ব্যাপক আকারে অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে। পুঁজিবাদী উন্নয়নের এই ধরনের পথ অনুসরণ করে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর দেশগুলি অদূর ভবিষ্যতে তাদের অনগ্রসরতা দূর করতে সমর্থ হবে না। এর কারণ হলো : পুঁজিবাদের আমলে প্রচলিত শ্রমের আন্তর্জাতিক বিভাগ, ব্যক্তিগত লগ্নির জন্য যথেষ্ট উপায়ের অভাব এবং শিল্পভিত্তিক ধনিকশ্রেণীর দুর্বলতা ও কোনো কোনো দেশে এই শ্রেণীর সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। এ-সবই পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়ের প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক করে তোলে।

নিজেদের অবস্থানের দুর্বলতা বুঝে বহু বুর্জোয়া অথনীতিবিদ "বাইরের উদ্যম"-এর তত্ত্ব খাড়া করেছেন। এই তত্ত্বটি নিম্নলিখিতরূপ : উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির কাঁচামাল ও খাদ্যের প্রয়োজন হয় এবং তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে

১। ডব্লিউ.এ. লিউইস—'দি থিয়োরি অব ইকনমিক গ্রোথ', লণ্ডন, ১৯৫৬; এ.এম. ক্যামার্ক—'দি ইকনমিক্স অব আফ্রিকান ডেভেলপমেণ্ট', লণ্ডন, ১৯৬৭

এইসব কাঁচামাল ও খাদ্য উৎপন্ন হয়। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি এ-সকল জিনিসের উৎপাদন যাতে বৃদ্ধি পায় এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করে। (তারা তাদের প্রয়োজনীয় পণ্যাদির আমদানি বাড়াবে। এর অর্থ উন্নয়নশীল দেশগুলি আরও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে। এর ফলে শেষোক্ত দেশগুলি পুঁজি-সঞ্চয়ের সুযোগ পাবে। তখন এ-সব দেশ রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পুঁজি লগ্নি করবে এবং এর ফলে সদ্য-স্বাধীন দেশগুলি তাদের পুঁজির প্রয়োজন মেটাবার ব্যাপারে সাহায্য পাবে।) "বাইরের উদ্যম" উন্নয়নশীল দেশগুলির অধিবাসীদের আয় বাড়াবে। এই আয়ের কতকাংশ আভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হবে এবং আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বাজারের ক্ষমতাও সম্প্রসারিত হবে। এই ধারণার সমর্থকরা বলেন যে, এই "ধারা-প্রতিক্রিয়া"র চূড়ান্ত ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত কর্মোদ্যোগের ভিত্তিতে ব্যাপক অর্থনৈতিক জোয়ার দেখা দেবে। এই তত্ত্বে অর্থনীতির আনুষঙ্গিক কাঠামো (রাস্তাঘাট ইত্যাদি তৈরি করা—অঃ) গড়ে তোলার ব্যাপারে এবং কোনো বিশেষ অবস্থায় যেসব ক্ষেত্র ব্যক্তিগত পুঁজির কাছে "অনাকর্ষণীয়" মনে হবে—সেইসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে লগ্নিকারকের ভূমিকা দেওয়া হয়েছে।

এই তত্ত্বে উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতিতে প্রধানত বৈদেশিক লগ্নির উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ এটা স্পষ্ট যে, জনসাধারণের বর্তমান আয়ের পরিমাণ যদি দ্বিগুণও হয় (অদূর ভবিষ্যতে তা অসম্ভব), তা হলেও সঞ্চয়ের সমস্যার সমাধান করা যাবে না। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, বিত্তশালী শ্রেণীগুলির আয় কদাচিৎ উৎপাদনে লগ্নি করা হয়। তৃতীয় দুনিয়ার নয়া ধনীরা তাঁদের টাকা বিদেশে পাঠানোই পছন্দ করবেন। দেশের মধ্যে এ-টাকা তাঁরা ব্যবহার করবেন হয় ফাটকাবাজীর জন্য জমিজমা কিনতে, আর না হয় নবাবী করতে।

এখন দেখা যাক উল্লিখিত তত্ত্বটি কতটা কার্যকর। উন্নয়নের এ-পথাভিমুখী দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে সরাসরি কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

প্রথম, রপ্তানীর ক্ষেত্রে উন্নয়নের অর্থ অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও অগ্রগতি—এমন না হতেও পারে। বরঞ্চ, রপ্তানীর ক্ষেত্রে উন্নয়ন অর্থনীতির একটিমাত্র কৃষিজাত পণ্যভিত্তিক প্রকৃতিকে বজায় এমন কি তাকে আরও তীব্র করে তুলতে পারে। এই ধরনের ব্যাপার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে

সাধারণত ঘটে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সৌদী আরব এবং কুবাইতের উল্লেখ করা যায়। উভয় দেশেই তৈল আহরণ-শিল্পের অগ্রগতি ব্যাপক অর্থনৈতিক জোয়ারের সৃষ্টি করেনি। দুটি দেশেই রপ্তানীর জন্যই তৈল আহরিত হয়।

রপ্তানীর ক্ষেত্রে অগ্রগতি যদি রপ্তানীর সঙ্গে যুক্ত নয়—অর্থনীতির এমন সব ক্ষেত্রের অগ্রগতিতে কিছুটা সহায়ক হয়ও, তাহলেও শ্রমের বর্তমান আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী বিভাগের আমলে তাকে দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অগ্রগতির নির্ভরযোগ্য ভিত্তি বলে গণ্য করা যায় না। এক্ষেত্রে আফ্রিকার অন্যতম "সমৃদ্ধিশালী" দেশ আইভরি কোস্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ। সেখানে প্রায় এক লক্ষ টন "বাড়তি" কফি দুনিয়ার বাজারে বিক্রি করা গেল না বলে পুড়িয়ে ফেলা হলো। আইভরি কোস্টের অর্থনৈতিক "জোয়ারের" অন্যতম ভিত্তি হলো কফি উৎপাদন এবং সম্প্রতিকাল পর্যন্ত কফিই ছিল সে-দেশের মোট অধিবাসীর প্রায় অর্ধাংশের আয়ের প্রধান উৎস। এই অবস্থায় এই বিশেষ পথের অভিমুখী হওয়া কতটা বিপজ্জনক তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

দ্বিতীয়ত, বিদেশী পুঁজির দিকে (রপ্তানীর ক্ষেত্রে যে-পুঁজির প্রাধান্য, সেই পুঁজি সহ) ঝোঁকার ফলে দেখা দেয় বিদেশী লগ্নি থেকে প্রাপ্ত মুনাফার প্রবাহের সমস্যা। এ-কথা স্মরণ রাখা ভালো যে, সম্প্রতি কয়েক বছরে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিরা লাতিন আমেরিকায় তাদের লগ্নিকৃত অর্থের অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ মুনাফা ও সুদের আকারে আদায় করে নিয়েছে। অর্থাৎ স্পষ্টতই নতুন পুঁজি-প্রাপ্তির দিকটা এখানে শূন্য।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত বিদেশী লগ্নি এমন সব ক্ষেত্রে করা হয়—যেসব ক্ষেত্রে মুনাফা পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি। কিন্তু দেশের উন্নয়ন কর্মসূচীতে এইসব ক্ষেত্রের স্থান থাকে না বললেই চলে। প্রকৃতপক্ষে, বেকার সমস্যা সমাধানে কিছুটা সাহায্য করা ছাড়া উন্নয়ন কর্মসূচীর সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্কই থাকে না। বেকার সমস্যা অনুন্নত দেশগুলির একটি সাধারণ সমস্যা। বিদেশী কোম্পানিগুলি স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়োগ করে কিছুটা পরিমাণে এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। আবার উন্নয়নশীল দেশগুলি পুঁজিবাদী দেশগুলির কাছ থেকে যেসব সরকারী ঋণ ও জিনিসপত্র কেনার জন্য টাকা পায়—তা সবসময়েই গ্রহীতা দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা

করে না। সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট থাকায় ১৯৬৬ সনে মার্কিন সরকারের সাহায্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩ শত ৪০ কোটি ডলারের মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি ডলার) তৃতীয় দুনিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিছুমাত্র সাহায্য করেনি। এ-ছাড়া মনে রাখতে হবে যে, যেসব দেশ সাহায্য দেয়, তাদের নিছক অর্থনৈতিক সাহায্যও প্রায়শই সেইসব দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের রপ্তানীর ভরতুকি বাবদ দেওয়া টাকা ছাড়া কিছুই নয়।

চতুর্থত, উন্নয়নের এই ধরনের পুঁজিবাদী পথ অনুসরণের ফলে সত্য-স্বাধীন দেশগুলির শ্রমজীবী জনগণ কার্যত কিছুই পায় না এবং এই কারণে সরকারী কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় না। এই প্রসঙ্গে প্রগতিশীল ফরাসী সাংবাদিক জে. সুরেত-কানালের বিবৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি সঙ্গতভাবেই লক্ষ্য করেছেন যে, তৈল কোম্পানিসমূহের মুনাফা ধরে ভেনেজুয়েলায় মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির যে-হিসাব দেওয়া হয়, জনসাধারণের প্রকৃত আয়ের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই।

উল্লিখিত তথ্যগুলি থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, যেসব নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র "অগ্রগতির" এ-পথ বেছে নিয়েছে, সেইসব দেশে যদি পুঁজিবাদ বিকাশ লাভ করেও—তা হলেও সেইসব দেশে জাতীয় পুঁজির তথা জাতীয় অর্থনীতির বিকাশলাভের কথা বলা সম্ভব নয় বললেই চলে। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, এ-ধরনের পুঁজিবাদী পথ বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটাতে অক্ষম। এ-কাঠামোর আমূল পরিবর্তনই হলো এই সব দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূরীকরণের প্রধান শর্ত। প্রচলিত নির্দেশক-গুলি বিচার করলে দেখা যাবে যে, মেকসিকো গতিশীল অর্থনীতি সমন্বিত একটি "গড়-উন্নয়ন"-এর দেশ বলে বিবেচিত হতে পারে। মেকসিকোর মোট উৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধি হার হলো ছয় শতাংশের বেশি। সমগ্রভাবে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে ধরলে অনুরূপ বিচারে এই হার অনেক বেশি। মেকসিকোর মোট উৎপাদনের ৫৮ শতাংশ হলো শিল্পের ক্ষেত্রে এবং এই শিল্পের ৪০ শতাংশই হলো কাঁচামাল ব্যবহারোপযোগী করার শিল্প (Processing Industry)। অন্যান্য নির্দেশকেরও উল্লেখ করা উচিত। মেকসিকোর প্রধান প্রধান শিল্প পরিচালিত হয় মার্কিন বাজারের দিকে দৃষ্টি রেখে, দেশের বাজারের দিকে নয়। মোট জাতীয় উৎপাদনের মাত্র দশ শতাংশ রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পগুলিতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু মেকসিকোর লগ্নিকৃত পুঁজির এক-তৃতীয়াংশ খাটে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে।

বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ছত্রছায়ায় "সমৃদ্ধ হয়ে ওঠা" তৃতীয় দুনিয়ার বহু দেশেই মূলত এই হলো পরিস্থিতি। তাইওয়ানের কথা ধরুন। গত ১৬ বছরে তাইওয়ান মার্কিন সাহায্য হিসাবে পেয়েছে ৪ শত কোটি ডলারের মতো। অথবা ধরুন আইভরি কোস্টের কথা। এই দেশটি হলো পুঁজিবাদী আফ্রিকার একটি শো-কেস। এই দেশটির সর্বমোট জাতীয় উৎপাদনের মাথাপিছু পরিমাণের দিক (মূল্যের হিসাবে — অঃ) থেকে আফ্রিকায় অন্যতম প্রথম স্থান (১৯৬৬ সনে ২৬৭ ডলার। এর সঙ্গে তুলনীয়ঃ আলজেরিয়া — ২২১ ডলার, ক্যামেরুন—১৪৯ ডলার, কেনিয়া—১১৯ ডলার এবং উত্তর ভোল্টা —৪৮ ডলার) অধিকার করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য টাকা জোগানোর ব্যাপারে যেসব দেশ ব্যক্তিগত বিদেশী লগ্নিকেই প্রধান উৎস বলে মনে করে —এমন যে-কোনো দেশের তুলনাতেও আইভরি কোস্ট এ-ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলির অন্যতম। এসব দেশের প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই "উন্নয়ন ব্যতিরেকেই বৃদ্ধি" এই কথা স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায়, কারণ এসব দেশের বৃদ্ধি নিছক পরিমাণগত। বাইরের শক্তিসমূহের সমর্থনে এই বৃদ্ধি ঘটে এবং এর ফলে অর্থনীতির স্বতন্ত্র ক্ষেত্রগুলির বিচ্ছিন্নতা দূর করে নিজস্ব ভিত্তিতে পুনরুৎপাদন সুনিশ্চিত করতে সমর্থ কোনো অখণ্ড অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার মতো কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয় না।

বলাবাহুল্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা বিদেশী বলেই বিদেশী লগ্নিকে বাতিল করে দেয় না। কোনো কোনো অবস্থায় (রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং বিদেশী লগ্নি বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলি সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা) বিদেশী লগ্নি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে সার্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা যেসব দাওয়াই বাতলান—স্বভাবতই সেগুলিতে এইসব শর্তের উল্লেখ থাকে না। আর, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, পুঁজিবাদী পথ অনুসরণকারী দেশগুলির সরকাররা কখনও এসব শর্ত বলবৎ করেন না।

সবশেষে আলোচ্য হলো তাত্ত্বিক দিক থেকে সম্ভব তৃতীয় ধরনের পন্থা। এই পন্থায় "মিশ্র অর্থনীতি"র ভিত্তিতে উন্নয়নের কথা ধরে নেওয়া হয়। "মিশ্র অর্থনীতি" রাষ্ট্রায়ত্ত ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রগুলিকে যুক্ত করে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় এই পথে একটা দেশ তার নির্দিষ্ট সম্ভাবনাগুলিকে বেছে নিতে পারে, কিন্তু এই দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে এই পথে যথেষ্ট বিপদ থাকে।

সরকারী কর্মসূচি রূপায়ণে বাধা দেওয়া জাতীয় ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ হতে পারে এমন কি যদি এতে তাদের আর্থিক সুবিধা হয় তা হলেও। উন্নয়নের এই পন্থা অনুসরণের চেষ্টা এই শতকের চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সরকার করেছিলেন, কিন্তু সরকারী কর্মসূচিতে রেখাম্বিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করায় ধনিকশ্রেণীর স্পষ্ট অনিচ্ছা সরকারকে এই পন্থা ত্যাগ করতে বাধ্য করে।

এছাড়া প্রথম দুটির ন্যায় তৃতীয় ধরনের পন্থাও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধনে জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণ সুনিশ্চিত করে না এবং জনগণের অবস্থারও কোনো উন্নতি ঘটায় না।

শুধু পরিমাণগত নির্দেশকগুলি বিশ্লেষণ করলেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পুঁজিবাদী পন্থা বিশেষভাবে কার্যকর হবে এমন কোনো কারণ নেই। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির অর্থনৈতিক বৃদ্ধি-হার লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সম্প্রতি কয়েক বছরে বৃদ্ধি-হার পড়ে যাওয়ার প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই সব দেশের মোট উৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধি-হার ১৯৫০-৫৫ সনে যেখানে ছিল ৪·৯ শতাংশ, ১৯৬০-৬৬ সনে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪·৪ শতাংশ। ১৯৬৭ সনে বৃদ্ধি-হার আরও পড়ে গেছে। এ-সময়ের মধ্যে দেশের মোট উৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধি-হার অধিবাসীদের মাথাপিছু ২·৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২ শতাংশ দাঁড়িয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উন্নয়নের পুঁজিবাদী পথের তিনটি সম্ভাব্য ধরনের কোনোটিই কার্যকর প্রমাণিত হয়নি। পক্ষান্তরে, এ-তিনটি ধরনই প্রমাণ করেছে যে, পুঁজিবাদ এইসব দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধানে অক্ষম। কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বলা হয়েছে, "যে-সমস্ত দেশ পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করেছে—তারা তাদের যে-সমস্ত প্রধান প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তার একটিও সমাধান করতে পারেনি।"

উন্নয়নের সমাজতান্ত্রিক পথ অথবা আরও সঠিকভাবে যাকে বলা যায় সমাজতন্ত্রাভিমুখী পথ নিঃসন্দেহে অধিকতর কার্যকর। সমাজতন্ত্রের অভিমুখে পরিচালিত উন্নয়নের কাজ জনসাধারণের ব্যাপক অংশকে অধিকতর সক্রিয় করে তুলতে সাহায্য করে, কারণ জনগণ অনুভব করে যে, তারাই তাদের দেশের মালিক। এই ধরনের উন্নয়নের ফলে দ্রুত সম্পদসমূহ সমাবেশ করা এবং এই

সব সম্পদ নির্ধারক ক্ষেত্রগুলিতে কাজে লাগানো সম্ভব হয়। আর নির্ধারক ক্ষেত্রগুলির অগ্রগতি ধারা-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, অর্থাৎ অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। সবশেষে অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, সমাজতান্ত্রিক পথ কৃষিসমস্যার সমাধান করে বর্তমান উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে মুক্তি দেয়।

মঙ্গোলিয়ার জনপ্রজাতন্ত্র এবং ভিয়েতনামের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অগ্রগতির বিশ্লেষণ সুস্পষ্টভাবে সমাজতান্ত্রিক পথের সুবিধাগুলি দেখিয়ে দেয়। এই দুই দেশে যে-গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তার ফলে একটিমাত্র পণ্যভিত্তিক অর্থনীতিসম্পন্ন অনগ্রসর কৃষিপ্রধান দুটি দেশ বিবিধ পণ্যভিত্তিক অর্থনীতিসম্পন্ন কৃষি ও শিল্পে সমভাবে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। শান্তিকালীন নির্মাণকার্যের দশ বছরে (১৯৫৫-১৯৬৪) গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রে শিল্পসংস্থার সংখ্যা ৪০ থেকে বেড়ে ১,০১৪ দাঁড়ায়। ধাতু, যন্ত্রনির্মাণ ও রসায়ণ শিল্পের মতো শিল্পসমূহ স্থাপিত হয়েছে। মার্কিন আগ্রাসনের আগে ভিয়েতনামের মোট উৎপাদনের প্রায় ৫০ শতাংশই ছিল শিল্পজাত। মঙ্গোলিয়াতেও মোট উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশি শিল্পজাত। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার কালে (১৯৬১-১৯৬৫) মঙ্গোলিয়ার মোট উৎপাদন বেড়েছিল ৩০ শতাংশ। ১৯৫০ সনের তুলনায় মঙ্গোলিয়ায় শিল্পোৎপাদন ১২ গুণ বৃদ্ধি পায়। গত কয়েক বছরে গড় বার্ষিক বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১০·৫ শতাংশ। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৪ এই সাত বছরে ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের শিল্পোৎপাদন তিন গুণ বৃদ্ধি পায়। এই সব দেশে শিল্প ও কৃষির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের আয় বেড়েছে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে সমাজতন্ত্র অনুপযোগী—এ-কথা প্রমাণের জন্য বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের চেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সাম্রাজ্যবাদের তাত্ত্বিকদের বহুপ্রচারিত "ত্যাগস্বীকার তত্ত্ব"টিকে উপেক্ষা করতে পারি না। সমাজতান্ত্রিক পথ যদি দ্রুততর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চয় করে, এমন কি কোনো না কোনো স্তরে যদি জনসাধারণের জীবনযাত্রা উন্নতও করে, তবু তার জন্য অন্ততপক্ষে এক বা এমনকি একাধিক পুরুষের মানুষকে "বলি দিতে হবে" — উক্ত তত্ত্বের মূলে আছে এই বক্তব্য। বোর্দো বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষ্ণ আফ্রিকা গবেষণা কেন্দ্রের এ. তোলান্দের মতে "সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে হলে আগে থেকে ধরে নিতে হয় যে, পরবর্তী পুরুষগুলির মানুষের অবস্থার উন্নতির

জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই বহু পুরুষের মানুষকে বলি দিতে হবে।" শিল্পায়ন ও কৃষির যৌথকরণের যুগে "বঞ্চিত ও দুর্গত" সোভিয়েত জনগণের মর্মন্তুদ চিত্র তুলে ধরে তাঁদের বক্তব্যকে জোরদার করে ডব্লিউ. হ্যাটার, এল. শানিরো, সি. ক্লার্ক এবং অন্যান্য মার্কিন অর্থনীতিবিদরা একই মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

গবেষণাপ্রসূত এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রগুলির জাতিসমূহের উপর সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাফল্যের প্রভাব হ্রাস করা এবং জীবনযাত্রার মানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সমাজতন্ত্র গঠনকে মেলানো যায় না এই ধারণা তাদের নেতাদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টাই হলো এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য। তৃতীয় দুনিয়ার প্রায় সমস্ত নেতাই জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ব্যবস্থাসমূহ তাঁদের উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করায় (প্রধানত ব্যক্তিগত ভোগের বৃদ্ধি) পুঁজিবাদের সমর্থকরা মনে করেন যে তাঁদের যুক্তি একেবারে মোক্ষম। সমাজতন্ত্র যদি ভোগের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটাতে না পেরে বরং তা কম বেশি দূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত মুলতবী রাখে, তা হলে সমাজতন্ত্র অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে অনুপযোগী—বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সমালোচনার সামনে তাঁদের যুক্তি টিকবে না। একথা ঠিক যে, সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সময় সোভিয়েত জনগণকে বিপুল বাধাবিপত্তি অতিক্রম ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু এই বাধাবিপত্তি ও ত্যাগ স্বীকারের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। আধুনিক অর্থনীতি গড়ে তোলার সময় যে কোনো দেশ প্রয়োজনীয় ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য কিছুকালের নিমিত্ত ব্যক্তিগত ভোগ সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়। আজ যেসব দেশ অত্যন্ত পুঁজিবাদী দেশ হিসাবে গণ্য, শিল্পায়নের সময় সেই সব দেশের শ্রমজীবী জনগণকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশি দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা স্বভাবতই এ-কথা স্মরণ করা পছন্দ করেন না। ব্রিটেনের শিল্পায়নকাল ইংরেজ শ্রমিকদের কী মূল্য দিতে হয়েছিল এবং কিভাবে দিতে হয়েছিল তার বিবরণ সেই সময়কার বহু সরকারী দলিলে সবিস্তারে দেওয়া হয়েছে এবং মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে সেগুলি উদ্ধৃত করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুঃখকষ্টের বোঝা বইতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ বহিরাগত ও অ-শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের শিল্পায়নে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে টাকা জোগানো হয়েছে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিকে লুণ্ঠন করে। অবশ্য এই তথ্য নিয়ে আলোচনা আমরা এখানে করছি না।

সদ্য-স্বাধীন জাতিগুলির কল্যাণের জন্য যাঁদের "চোখে ঘুম নেই", সেই বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা যেসব চক্রের স্বার্থ রক্ষা করছেন—সেই চক্রগুলি যদি বাধা না দিত, তা হলে সোভিয়েত জনগণের বাধাবিপত্তি অনেক কম হত। যেখানে কিছু ছিল না, সেখানে আমাদের জনগণ অর্থনীতি গড়তে শুরু করে।

সামরিক হস্তক্ষেপ, বাণিজ্যে বৈষম্য, অর্থনৈতিক অবরোধ প্রভৃতি ক্রমাগত তাদের চেষ্টায় বাধা দেয়। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে (যদিও তারা তাদের নতুন অর্থনীতি গড়ে তোলে ঠাণ্ডাযুদ্ধের কালে) যে, আরো স্বাভাবিক অবস্থায় যেসব জাতি সমাজতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির সাহায্যের উপর নির্ভর করে, তারা সোভিয়েত জনগণের ভাগ্যে যেসব বাধাবিপত্তি ঘটেছিল তার অনেকগুলিই এড়াতে পারে।

সোভিয়েত জনগণ "ত্যাগস্বীকার" করেছে প্রধানত একটিমাত্র ক্ষেত্রে, ভোগ্যপণ্যের অভাবের জন্য ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা এই তথ্যটিকে উপেক্ষা করে থাকেন। এই ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রেও যা পাওয়া যেত তা জনসাধারণের সমস্ত অংশের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করা হতো, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এমনটি করা হয় না। অন্যান্য যেসব ক্ষেত্র বহুল পরিমাণে জীবন-যাত্রার মান নির্ধারণ করে, সেসব ক্ষেত্রে কোনো "ত্যাগস্বীকার" করতে হয়নি। পক্ষান্তরে, অতি সমৃদ্ধিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলির জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কাছে যেসব সুবিধা পুরোপুরি অপ্রাপ্য ছিল, সোভিয়েত শাসনের একেবারে গোড়ার দিক থেকেই শ্রমজীবী জনগণ সেগুলি ভোগ করছে। দিনে আটঘণ্টা কাজের ব্যবস্থা চালু হয় এবং পরে তা কমিয়ে সাত ঘণ্টা করা হয়। বিনা পয়সায় শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং উন্নত ও অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির অভিশাপ প্রকাশ্য ও গোপন বেকারী স্বল্পকালের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়।

আধুনিক শিল্পপ্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলির চাইতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের "ত্যাগস্বীকার"-এর কাল অনেক কম ছিল। যুদ্ধ বাদ দিলে এই কাল আট বছর (১৯২৯-১৯৩৬) স্থায়ী হয়। উদাহরণস্বরূপে বলা যায় যে, ইংলণ্ডে মোটামুটি কয়েক শতাব্দী একটানা সংগ্রাম চালাবার পর তবে শ্রমিকরা মোটামুটি বাঁচবার মতো জীবনযাত্রার মান আদায় করতে পেরেছিল।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলির জাতিসমূহের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক পথ অসম্ভব বা অসুবিধাজনক—একথা প্রমাণ করার জন্য বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের বাজে উপায় অবলম্বন করতে হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের তাত্ত্বিকেরা যে-কৌশলই খাটান না কেন, নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি ও তাদের নেতারা বুঝতে শুরু করেছেন যে যাত্রার তফাৎ থাকলেও লেনিন যে-পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন সেই পথই হলো অগ্রগতির সবচেয়ে কার্যকর পথ, বহু দেশের পক্ষে একমাত্র পথ।

অনুবাদক : সুকুমার মিত্র

'ভোপ্রোসি একোনোমিকি' পত্রিকায় ১৯৬৯ সনের ১০ম সংখ্যায় রুশ ভাষায় প্রকাশিত প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদের সামান্য সংক্ষেপিত বাঙলা অনুবাদ।

লেনিনের জীবনাবসানে ভারতীয় পত্র-পত্রিকাদির প্রতিক্রিয়া

শঙ্কর রায়

"মিত্রশক্তি বরাবর বলশেভিজম এবং ইহার নেতার কলঙ্ক রটনা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। লোকের চক্ষে লেনিনকে রক্তপিপাসু নররাক্ষস বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টাও বড় কম হয় নাই। ইহারা লোককে বুঝাইতে চাহিয়াছে যে লেনিন মানব-শত্রু এবং মিত্রশক্তিই একমাত্র মানবমিত্র। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও এই মহামানবের অনিষ্ট মিত্রশক্তি করিতে পারে নাই। লেনিনের চরিত্রগুণে এবং প্রতিভাশিখায় সকল কলঙ্ক-কথা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেছে। লেনিন ছিলেন গরীবদের মানুষ, তাহাদের দুঃখ তিনি নিজের দুঃখের মতো অনুভব করিতেন, একজন মানুষ দুঃখী থাকিবে এবং আর একজন সেই সময় সুখী হইবে, মহাপ্রাণ লেনিন ইহা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। পৃথিবীর দুঃখের এবং সুখের বোঝার ভার সকল মানুষকে সমানভাবে বহন করিতে হইবে এই ছিল লেনিনের মত।

"....সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের স্রষ্টা, ভাবুক দার্শনিক ও কর্মযোগী লেনিনের দেহাবসান ঘটিয়াছে।....

"....যেমন রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁহার বজ্রের ন্যায় কঠোর মন ছিল, অপর দিকে তেমনই ছিল রুশিয়ার কৃষাণকুলের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার কুসুমকোমল ভরন্ত প্রাণের সহানুভূতি। রুশিয়ার নিপীড়িত কৃষাণকুলের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগাইয়া তুলিয়া রুশ জাতিকে নূতন যুগের প্রবর্তক ও চালকরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই ইঁহার জীবনের ব্রত ছিল....

"....লেনিনকে বিশেষভাবে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন রুশ ঔপন্যাসিক ম্যাক্সিম গর্কি। গর্কি বলেন যে, 'বর্তমান যুগে লেনিনের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিকমাত্রায় মনুষ্যত্ব বিকশিত হইয়াছে। সমস্ত মনুষ্যগুণ তাঁহার মধ্যে যেরূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে এমনটি আর পাওয়া যায় না।'....

"....দেশের স্বার্থই লেনিনের স্বার্থ ছিল—তাঁহার স্বতন্ত্র কোনো স্বার্থ ছিল না। **কতকগুলি ইংরেজ ও আমেরিকান কাগজ লেনিনের সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু কুৎসা রটনা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তাহাদের কাজই ছিল কিসে বলশেভিজম্‌কে পৃথিবীর কাছে হেয় করা যায়—কিন্তু এত করিয়াও তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।**" (হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, 'লেনিন', 'আত্মশক্তি' ২ এপ্রিল ১৯২৪। 'প্রবাসী' থেকে পুনর্মুদ্রিত ঃ বড় হরফ আমার)

লেনিনের জীবনাবসানের আগে অন্তত দুবার রয়টার লেনিনকে মৃত বলে ঘোষণা করেছিল। লেনিনের মৃত্যু যখন সত্যই ঘটল, তখন অনেকেই বিশ্বাস করেনি। 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় লেখা হলো যে, লণ্ডনে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়েছে—"বিশ্ববিখ্যাত নিকোলাই লেনিন" মারা গিয়েছেন। সে-সময় লেনিনের পরিচিতি ছিল নিকোলাই লেনিন হিসেবে, ছদ্মনামে লেখার প্রথম পর্বে তিনি এই নামই গ্রহণ করেছিলেন।

লেনিন ও বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বুর্জোয়াচক্র কুৎসা রটনায় কখনো ক্ষান্ত হয়নি। কিন্তু ভারতবর্ষের তৎকালীন পত্র-পত্রিকাদির (অবশ্য 'ইংলিশম্যান,' 'স্টেটসম্যান' প্রভৃতি বাদ দিয়ে) এতে কখনো প্রত্যয় জন্মায়নি, বরং সেগুলি অসত্য প্রমাণ হয়েছে বারেবারেই। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সম্পাদকীয় স্তম্ভে ২৫ জানুয়ারি ১৯২৪-এ লিখলেন—

"The death of Lenin, which we believe has at last really taken place, removes one of the most outstanding personalities of modern times. Probably no one has been more greatly misrepresented and misunderstood by his contemporaries than this dominating figure of colossal influence in Soviet Russia. After what all has been said and done, when the dust of controversy and the shock of surprise will disappear, and the history of modern world will be impartially written, Lenin will come to be regarded as one of those men who, in spite of his shortcomings, made a most remarkable attempt to reconstruct society on the basis of communism. The experiment was novel but it was calculated, as pointed out by a prominent Bolshevist the other day, to destroy the whole fabric of society based on capitalistic system.

"Vested interests of the world were, therefore, naturally alarmed by this experiment and the whole capitalistic Europe rose against him, but be it said to the credit of this wonderful man, that nothing could daunt him and that by a combination of astounding power of organisation and resourcefulness he made the Red Army, the revolutionary messenger of the new cult of socialism, a formidable power in Europe. It will serve no usefule purpose today to discuss how far his ideal was practicable and how far in the pursuit of this ideal he had to adopt means which was the negation of all human freedom. But suffice it to say that the seeds of revolution which he had left broadcast over the world today shall never be easily destroyed. May the soul of this extraordinary personality rest in peace."

"এখন আমাদের মনে হচ্ছে, অবশেষে সত্যিই লেনিনের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যু আধুনিককালের একজন দিকপাল ব্যক্তিকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল। সোভিয়েত রাশিয়ার এই বিপুল প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের মতো আর কাউকে সম্ভবত তাঁরই সমসাময়িকদের কাছে এতখানি অধিকমাত্রায় ভ্রান্তভাবে চিত্রিত ও ব্যাখ্যাত হতে আর দেখা যায়নি। তাঁর সম্পর্কে যা বলা হয়েছে বা করা হয়েছে—সে-সব কিছু অবসিত হবার পর, যখন বিতর্কের ধুলো আর বিস্ময়ের ধাক্কা মিলিয়ে যাবে, যখন নিরপেক্ষভাবে আধুনিক দুনিয়ার ইতিহাস লেখা হবে, লেনিনের সব কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও তখন বলা হবে, যাঁরা কমিউনিজমের ভিত্তিতে সমাজ পুনর্গঠন করতে লক্ষণীয় প্রয়াস পেয়েছেন, তিনি তাঁদেরই অন্যতম। জনৈক বিশিষ্ট বলশেভিক সম্প্রতি বলেছেন, মূলধনতন্ত্রের উপরে নির্মিত গোটা সমাজব্যবস্থা চূর্ণ করার সেই পরীক্ষাটি একেবারে নতুন ধরনের, কিন্তু তা গণিতের মতোই গণনাবিধৃত।

"তাই দুনিয়ার কায়েমী স্বার্থ স্বাভাবিক কারণেই এ-পরীক্ষায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, সমস্ত মূলধনতান্ত্রিক ইউরোপ তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। তবু এই বিস্ময় জাগানো মানুষটির স্বপক্ষে বলতে হবে, কোনো কিছুই তাঁকে দমাতে পারেনি। বিস্ময়কর সাংগঠনিক ক্ষমতা ও সৃজনশীলতার সংমিশ্রণে তিনি রূপ দিলেন ইউরোপের এক মহাশক্তিধর বাহিনী, সমাজতন্ত্রবাদের বিপ্লবী বার্তাবহ লালফৌজকে। তাঁর আদর্শ কতখানি বাস্তবানুগ ছিল কিংবা আদর্শ

সম্পাদনে সমস্ত প্রকার স্বাধীনতা খর্বকারী পন্থা কী তাঁকে নিতে হয়েছিল তা আজ আর ভেবে লাভ নেই। তবে এটুকু বলাই তো যথেষ্ট যে, সারা বিশ্বে তিনি যে-বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে রেখে গেলেন, সে-বীজ সহজে ধ্বংস হবার নয়। এই অসামান্য ব্যক্তিত্বের আত্মা শান্তিলাভ করুক, এই আমাদের কামনা।"

লেনিনের মৃত্যু সকলের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। কেননা, সচেতন দেশবাসী জানতেন যে, লেনিন-বিরোধী অপপ্রচার ও মিথ্যা রটনা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র-লক্ষণ। প্রথম সম্পাদকীয় লিখলেন 'বম্বে ক্রনিক্‌ল্' (ডেথ রিপোর্টেড/ন্যাশনাল বিল্ডার এণ্ড লীডার কমরেড লেনিন)। তাঁরা লেনিনকে বলেছিলেন, "one of the thıee greatest living men of the world।" 'ট্রিবিউন' পত্রিকাও প্রথমে মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করেননি। সোভিয়েত সংবাদ সূত্রে সমর্থিত হওয়ার পর ২৯ জানুয়ারি তাঁরা সম্পাদকীয় লিখলেন লেনিন "piloted his country with no small success through a revolution of unprecedented magnitude।" ৩০ জানুয়ারি এস.এ. ডাঙ্গে তৎ সম্পাদিত 'সোশ্যালিস্ট' পত্রিকায় লিখলেন "The world of downtrodden and oppressed wanted him to live, to live for a hundred years, if that could be done, the world of oppressors wanted him to die, the next minute that he was Lenin....He left writing a book on revolution to work out a revolution. And he did it successfully." "(নিপীড়িত ও নিগৃহীতের পৃথিবী চেয়েছিল তিনি বাঁচুন, শতায়ু হোন, যদি তা সম্ভব হয়। অত্যাচারীদের জগৎ চেয়েছিল তিনি মুহূর্তকাল মধ্যে বিগত হোন। তিনি যে লেনিন। বিপ্লব সাধনের উপায় সম্পর্কে তিনি একটি বই লিখে গিয়েছেন। তিনি তা সফলভাবে সম্পন্ন করেও গিয়েছেন।")

সেই সংখ্যাটি ছিল 'সোশ্যালিস্ট' পত্রিকার ২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা। তিনি আরো লিখেছিলেন যে লেনিন "তাঁর অভ্রান্ত দৃষ্টিতে রুশ বিপ্লবের চাবিকাঠি অধিকার করেছিলেন। তিনি সোজাসুজি সৈন্য ও কিষাণদের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন—এরা কাপুরুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের থেকে দূরবর্তী ছিল। তাঁদের ও সর্বহারার উদ্দেশ্য একই—একথা তিনি বোঝালেন। "পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বিগত হলেন।" ('সোশ্যালিস্ট' পত্রিকাটি ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক দিকচিহ্ন। স্বয়ং লেনিন এই পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা পড়েছিলেন।)

লেনিনের জীবনাবসানে বোম্বাই শহরে এক মহতী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বক্তাদের মধ্যে এস. এ. ডাঙ্গে ও শওকত ওসমানী ছিলেন। খবরটি দিল্লীর উর্দু দৈনিক 'হামদর্দ'-এ সেই বছর ২৯ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়েছিল। বাঙলাদেশে 'হিন্দুস্তান', 'সুলতান', 'সচিত্র শিশির', 'বঙ্গবাণী', 'জ্যোতি' প্রভৃতি পত্রিকাও লেনিনের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছিলেন, এমন কি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'ও লিখেছিলেন। ইতিপূর্বে একবার প্রকাশ পেল যে, লেনিন আর নেই। বলা বাহুল্য, লেনিনের জীবিতাবস্থায় সেইটি লেনিনের মৃত্যুসম্পর্কিত দ্বিতীয় রয়টারী আবিষ্কার। সে-তারিখটি ছিল ২১. ৭. ১৯২২। 'আনন্দবাজার' লিখলেন এ-সংবাদ সত্যি হলে, বলতে হয় বিশ্বের এক বিরাট ক্ষতি হলো। ঐ দিনই 'নায়ক' পত্রিকা লিখলেন যে, বর্তমান বিশ্বে তাঁর মতো বিদগ্ধ ও প্রতিভাসম্পন্ন দার্শনিক আর কেইবা আছে! কাজেই লেনিনের মৃত্যু বিশ্বাস করা কঠিন। বিশ্বাস হলো যখন তখন এক স্তব্ধতা চতুর্ধারে বিরাজিত। 'দৈনিক বসুমতী' লেনিনকে মহান কীর্তিমান মানুষ বলে অভিহিত করে সম্পাদকীয় লিখলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা লিখলেন: "লেনিন ইজ অ্যালাইভ ইন দ্য হার্টস অফ ওয়ার্কার্স" অর্থাৎ মেহনতী মানুষের চিত্তে লেনিন বেঁচে আছেন। ঐ সময়ই অধ্যাপক অতুলচন্দ্র সেন 'বিপ্লব পথে রাশিয়ার রূপান্তর' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। রচনার কাজ লেনিনের জীবিতাবস্থায় শেষ হলেও বইটি প্রকাশ পেতে পেতে ফেব্রুয়ারি মাস চলে এল—তখন লেনিনের সবে মৃত্যু ঘটেছে। অধ্যাপক সেন তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন যে বুর্জোয়ারা চাইত লেনিনের মৃত্যু হোক। শ্রমিক-কিষাণ দলের শোকমূলক শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের কথাও তিনি ঘোষণা করেছিলেন।

বাঙলাদেশে সেই সময় 'আত্মশক্তি' পত্রিকা এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তখন নৈরাজ্যবাদ তথা সন্ত্রাসবাদ উচ্চসীমায়: যুগান্তর-অনুশীলন সংঘাত সেই সময় কমিউনিজমের দিকে প্রবণতাকে অনিবার্য করে তুলেছিল; 'আত্মশক্তি' লেনিন ও বলশেভিকবাদ সম্পর্কে অনেক লেখা পত্রস্থ করেছিল। লেনিনের মৃত্যুর পর 'আত্মশক্তি'তে নাতিদীর্ঘ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। বস্তুত, বুদ্ধিজীবী ও বিপ্লবী মহলে কমিউনিজমের প্রসারের এক সুমহান দায়িত্বপালন করেছিল 'আত্মশক্তি'—কেননা, ঐ পত্রিকার প্রেরণাস্থল ছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। হিন্দি ও উর্দু পত্রপত্রিকার মধ্যে 'দেশভক্ত', 'উৎস', 'বর্তমান', 'আজ',

'মেদিনা' 'মজদুর' প্রভৃতিতে লেনিন-স্মৃতি চয়ন করা হয়েছিল। 'বর্তমান' পত্রিকা লেনিনকে পীড়িতের ভগবান বলে অভিহিত করেছিল; 'উৎস' বলেছিল লেনিনের হৃদয়ে ভারতবর্ষের একটা স্থান রয়েছে এবং "লেনিনের বিরুদ্ধে প্রচার আসলে ভারতবাসীদের অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করা এবং তাঁদের বন্ধনমুক্তিতে বাধা দান করা।" কানপুর থেকে 'মজদুর'-এ একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে লেনিনকে বেহেশ্‌ত থেকে ভারতবর্ষে নেমে এসে দরিদ্র কৃষকদের রক্ষা করতে এবং তৎকালীন আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার কায়েমী সরকারকে উৎখাত করতে আহ্বান জানানো হয়।

দক্ষিণ ভারতেও 'স্বদেশমিত্রন্' (মাদ্রাজ, ২৫ জানুয়ারি), 'সম্পদ অভ্যুদয়' (মহীশূর, ২৫ জানুয়ারি), 'অন্ধ্র পত্রিকা' (মাদ্রাজ, ২৩ জানুয়ারি) প্রভৃতি পত্রিকাতে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে 'তামিলনাড়ু' পত্রিকার লেনিন-চয়ন উল্লেখ্য। তার এক স্থানে ছিল "লেনিন মারা গেলেও, তাঁর নীতি যে চিরদিন থাকবে এটা নিশ্চিত।"

লেনিন সম্পর্কে রচনা ও মৌলিক আলোচনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়ানো ছিটনো অবস্থায় রয়ে গেছে। সেগুলির অধিকাংশই এখন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। এ-সম্পর্কে বিশদ গবেষণার প্রয়োজন। নৈরাজ্যবাদ থেকে সাম্যবাদ এবং সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদী বামপন্থী আন্দোলনের উত্তরণ পর্যায়ের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে জানতে গেলে এইসব পত্রপত্রিকা পঠন-পাঠনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

এ-সম্পর্কে দু-তিনটি রচনার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। সেকালের একটি বিখ্যাত পত্রিকা 'লেবার কিষাণ গেজেট।' মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন খ্যাতনামা শ্রমিক নেতা ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ এম. সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার। গেজেটে এক টেলিগ্রাম ছাপা হলো। তাতে হিন্দুস্তান লেবার কিষাণ পার্টি থেকে সমস্ত আঞ্চলিক সংস্থাগুলিকে ৩১ জানুয়ারি অবধি 'লেনিন শোক সপ্তাহ'রূপে পালনের নির্দেশ জারী করা হয়: "Labour Kisan Central Committee requests all its provincial workers' organisations to observe the week ending 31st January as days of mourning for the death of Comrade Nicolai Lenin, Chairman of the Federated Soviet Republic of Russian workers. In his death, the world workers lost their great teacher and redeemer. Headquarters flying black flags halfmast." ("মজুর-কিষাণ কেন্দ্রীয়

কমিটি সমস্ত প্রাদেশিক শ্রমিক সংস্থাকে রুশ শ্রমিকদের সোভিয়েট সাধারণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ারম্যান কমরেড নিকোলাই লেনিনের মৃত্যুতে ৩১ জানুয়ারি অবধি শোকসপ্তাহ পালনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বের মেহনতী মানুষেরা তাদের মহান শিক্ষক ও পরিত্রাতাকে হারাল। কেন্দ্রীয় দপ্তরে কৃষ্ণ পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।") সেই সঙ্গে একটি শোকলিপি ছাপা হয়, যার প্রণেতা ছিলেন স্বয়ং সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার, তার বঙ্গানুবাদ (অংশ বিশেষ) এখানে সন্নিবেশিত হলো : "মহান লেনিন চলে গেলেন····পৃথিবী, মেহনতী মানুষের পৃথিবী আজ তার শিক্ষক ও পরিত্রাতার প্রস্থানে নিঃস্বতর····।

"মানুষের দুঃখ মোচনে যেসব সন্তান জন্মেছেন, তাঁদের মধ্যে নিকোলাই লেনিন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর নীতি-অনুসরণ নির্ভর করছে মেহনতী মানুষের উপর।··· নিকোলাই লেনিন দেখেছিলেন যে প্রকৃত "হেতু" বা কারণ স্বল্প সংখ্যক লোকের হাতে বহুজনের শোষণ এবং তাঁর নিজের দেশে এই সামাজিক অন্যায়কে অসম্ভব-এর পর্যায়ে নিয়ে যেতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন, রুশ শ্রমিকেরা আজ বিশ্বের শ্রমিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুখী। এর মূলে ছিলেন সেই অক্লান্ত কর্মী যাঁর মৃত্যুতে আমরা, তাঁরই কমরেডরা, শোকজ্ঞাপন করছি।" 'লেবার কিষাণ গেজেট'-এর উপরে লেখা থাকত "দুনিয়ার মজদুর এক হও" আর ঠিক পত্রিকার নামের তলায় ছিল 'ভারতে কমিউনিজমের পাক্ষিক পত্রিকা'। এই পত্রিকার ভূমিকা ও কার্যাবলী সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি না। কিন্তু মুক্তি আন্দোলনের সেই পর্বে এই পত্রিকার প্রভাবসৃষ্টিকারী ভূমিকা সম্পর্কে কিছু না জানাটাও অন্যায়।

বাল গঙ্গাধর তিলক ও অন্যরা যখন কারান্তরালে, লেনিন তাঁদের মুক্তির জন্য দাবি জানিয়েছিলেন। অক্টোবর মহাবিপ্লব তখনও সংঘটিত হয়নি। বিপ্লবের তিন মাস পরে কারাবাস শেষ করে 'কেশরী' পত্রিকায় লেনিন সম্পর্কে তিলক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে লেনিনের প্রভাব যে কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল, উক্ত প্রবন্ধে তার পরিচয় মেলে। লেনিনের জীবনাবসানে ধুন্ধিরাজ ত্রিম্বক গাদ্রে ২৯ জানুয়ারি এক প্রবন্ধ লেখেন : রুশ বিপ্লবের স্থপতি লেনিন। প্রবন্ধের একাংশ অনুবাদ করে দিচ্ছি : "১৭ থেকে ৪৭—এই তিরিশ বছর লেনিনের জীবন পরিত্যক্ত অবস্থায়, দারিদ্র্যের মধ্যে, নিজের পার্টির অন্তর্বর্তী সংগ্রামে ও গোপন-প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আত্মগোপন অবস্থায় কেটেছিল।

কিন্তু ঐ সংগ্রামসমূহে তিনি অতুলনীয় অধ্যবসায়, প্রতিভা ও শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন।....তিনি আত্মসম্মান অপেক্ষা রুশ জনগণের কথা বেশি চিন্তা করতেন। যখন দেখলেন ভোলগা অঞ্চলের কৃষকেরা দুর্ভিক্ষ কবলিত, তখন পুঁজিবাদীদের সঙ্গে স্বমত গোপন করেই তিনি আপস করেছিলেন। রুশ জনগণের তিনি প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এবং যদিও তাঁর শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রভূত কুৎসা রটিয়েছিল, রুশ জনগণ কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে অবিচল আস্থা পোষণ করত।"

লেনিনের মৃত্যু বিশ্বাস করতে ভারতবাসী যেমন সময় নিয়েছিল, তেমনি পরে লেনিন-স্মৃতিচয়ন অবিচ্ছিন্নভাবে পাঁচ মাস ব্যাপী চলেছিল। ভারতের বিপ্লবী কার্য-কলাপ তখন দেশে বিদেশে অব্যাহত ছিল। সুদূর ন্যু ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হতো 'ইয়াদেঁ ওয়তন'। তাতে ১ মে ১৯২৪ সালে 'আমাদের যুগের মহান নেতা' শীর্ষক একটি দীর্ঘ নিবন্ধ বেরিয়েছিল। তার মধ্যে লেনিনের শবানুগমনের এক মর্মস্পর্শী বিবরণী সন্নিবেশিত হয়েছিল: "প্রচণ্ড তুষারপাতসত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দেয় এবং তিন হাজার নর-নারীকে পদদলিত, মূর্ছিত বা শোকাহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। দেশের প্রত্যেক কোণ থেকে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কৃষক তাঁদের সদ্য বিগত নেতার শেষ দেখা পেতে মস্কো শহরে সমবেত হয়েছিলেন। রাশিয়ার ইতিহাসে এত বড় শবযাত্রা কখনো হয়নি।"

ভারতে 'ট্রিবিউন' পত্রিকাও এই শোকযাত্রার বৃত্তান্ত প্রকাশ করেছিল।

এরকম যে কত দৃষ্টান্ত আছে, আমরা তার হিসেব জানি না। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী গণ-আন্দোলনের পর তখন সাম্যবাদী আন্দোলনের উন্মেষকাল। সেই সময় এই ধরনের লেখা বা খবর প্রকাশিত হওয়ার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। গবেষকরা এ-সম্পর্কে যথোচিত গবেষণা করলে আমরা কৃতজ্ঞ হব।

রাজযোটক

বিজনকুমার ঘোষ

হেনাকে পর পর তিন দিন দেখল গোপাল। করিডরে বারান্দায় এবং ঘরের মধ্যে শুধুমাত্র সায়া আর বুকের ওপর সরু ব্রাসিয়ার এঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়িতে অন্যান্য লোকজন তো আছেই, দুটো জোয়ান মদ্দ চাকর আছে। একজনের নাকের তলায় সরু গোঁফ এবং অন্যজনের গলা ভাঙতে শুরু করেছে। একদিন কাকীমাকে আহ্নিক করতে দেখে একলা পেয়ে গোপাল বলেছিল, এভাবে ঘুরে না বেড়িয়ে একটা শাড়ি জড়িয়ে নিলেই পারিস। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এসেছিল, তোমরা যে ঘরে আণ্ডারওয়্যার পরে থাকো! আমার বুঝি গরম লাগে না?

গত বছর শ্রাবণ মাসে বিয়ে হয়েছিল গোপালের। লিলিকে নিয়ে পরদিন আসার সময় স্রোতে ট্যাক্সি আটকে গিয়েছিল। আজ রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর দরজা ভেজিয়ে ট্রাঙ্কের তলা থেকে দুখানা বই বের করল গোপাল। এক-খানা পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক। অন্যটি ডক্টর বামাকান্ত রায়চৌধুরী এম. বি. বি. এস. (ক্যাল.) লিখিত 'সমাজে যৌনতা ও সমস্যা'। বিয়েতে চিত্ত প্রেজেণ্ট করেছিল। আগে এইসব বই পড়বার জন্যে খাড়া রোদে দু-মাইল হেঁটে যেতে পারত। এখন হাতের কাছে পেয়েও থিয়োরিটিক্যাল কচকচি আর ভালো লাগে না। আজ অনেকদিন পর টেবিল ল্যাম্প জেলে 'কুমারী মন' চ্যাপ্টারটা খুলে ধরল। ঘরের গুমোট বাড়াবার জন্যে বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি নামল এই সময়। শ্রাবণ মাস। জয়েণ্ট পরিবার। আরো নানা রকম ফাইফরমাস খেটে লিলি শুতে এল। তার আগে মুখে খানিক স্নো পাউডার মাখল। অভ্যেস!

—দেখি কি পড়ছ। ওমা, 'কুমারী মন' কেন?

—বিবাহিত মন বিস্বাদ লাগছে বলে!

—আহা, ঢং! দ্যাখো—ভালো হবে না বলছি।

ইত্যাকার কিছু হাস্য-পরিহাসের পর গোপাল আসল কথাটা পাড়ল। শুনে চোখ বড় বড় করল লিলি।

—এই তোমার বুদ্ধি! এর জন্যে পড়তে হচ্ছে 'কুমারী মন'? তিন-তিনটে

ছোট বোনের বিয়ে দেখল হেনা বলি, বয়েস কত হলো ওরও তো একটা সাধ-আহ্লাদ আছে !

একটু হিসেব করল গোপাল।

—আমার চেয়ে এক বছরের ছোট। তা তেত্রিশ তো বটেই।

—তবে ? তোমরা বাইরে বাইরে থাকো, অনেক কিছুই জানো না। যখন তখন বেরিয়ে যায়। ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে অনেক রাত্রে ফেরে। গৌরাঙ্গের সামনেই বুকের কাপড় ফেলে দেয়। ছিঃ! ছিঃ! কাকীমা দেখেও দেখেন না। আমরা হলে ?

—লেখাপড়াটাও করল না। গোপাল বলে।

—কোনোদিকে মন আছে ? ঘরে যতক্ষণ থাকে, এর-তার সঙ্গে ঝগড়া। তারপর রুজ-লিপস্টিক মেখে বর খুঁজতে বেরুনো।

—তা হলেও তো বুঝতাম একটা কাজ করেছে।

—পুরুষ জাত যে, ছিবড়ে করে রেখে চলে যাও। কে বিয়ে করবে ? কি আছে শরীরে ?

গভীর সমস্যা। বই পড়ে কিছু হবে না। আলো নিভিয়ে বুকের উপর লিলিকে টেনে নিল। বাইরে অঝোর বৃষ্টি, ঘরের বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ। লিলি যদি হেনার মতো দেখতে হতো, আর ওই বয়েস—গোপাল তাহলে পছন্দ করত কি ? লিলির বুদ্ধি আছে। এক বছরের মধ্যেই ভূদেব মুখুজ্জের স্নেহধন্য জয়েণ্ট পরিবারের হালচাল বুঝে গেছে। পাড়ায় একবার টি টি পড়ে গিয়েছিল। অনেকেই এক বাস কণ্ডাকটরের সঙ্গে হেনাকে ঘুরতে দেখেছে। গোপালের ওসব বালাই নেই। পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে অতি কষ্টে সেই কণ্ডাকটরকে পাকড়াও করে চায়ের দোকানে। নাম সুখময় দে। রোগা লিকলিকে। গোপাল তখন রোজ সকালে একশো ভেজানো ছোলা খেয়ে বুকডন মারত। ওকে দেখেই বেচারা সুখময় ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করে।

—আমার বোনকে বিয়ে করতে চাও ?

—আজ্ঞে, আমরা কায়স্থ। যদি—

—সে প্রশ্ন নয়। ক-টাকা মাইনে পাও ?

—আজ্ঞে, সব মিলিয়ে একশো আশি।

—বাড়ি ঘরদোর আছে ?

—আজ্ঞে, বাঘা যতীন কলোনিতে। অর্পণপত্র পেয়েছি।

—কে কে আছে ঘরে ?

—আজ্ঞে, মা-দুই ভাই-এক বোন।

—ডিউটিতে যাচ্ছেন বুঝি ? চা খাবেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—দেখা যাক কি করতে পারি। ওহে, দুটো চা দাও। আর কেক।

কাকীমা বিনা চোখের জলে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলেন—নিজের বোনদের অফিসারের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিস আর আমার মেয়ের বেলায় বাস কণ্ডাকটর ? আমি কোথায় যাব গো, আমাকে নিয়ে যাও গো, আমার কেউ নাইরে—

এরপর গোপাল আর এগোয়নি।

মুস্কিল হয়েছে, দুই জ্যেঠতুতো দাদা এবং গোপালের নিজের দাদা—সকলেই ভালো চাকরি করে। কেউ প্ল্যাণ্ট ম্যানেজার, কেউ সুপারভাইজার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার—এই ধরনের। ছাত্র ভালো, সরকারী চাকরির দিকে কেউ ঝোঁকেনি। সুতরাং কোম্পানি থেকে কেউ পাঁচশো টাকা বাড়িভাড়া পায় ; কেউ মটর গাড়ি ; কাউকে রাত দুপুরে ডাকাডাকির জন্যে অফিস থেকে টেলিফোন বসিয়ে দিয়েছে। ছেলে মানুষ করতে হবে, সেই সুবাদে এইসব খ্যাতকীর্তি ভাইয়েরা সকাল সকাল বিয়ে করে নিয়েছে। যুগের হাওয়া অনুযায়ী তারা সকলেই পণপ্রথার বিরোধী। কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি প্রচুর, বাপের একমাত্র মেয়ে, ইত্যাদি যোগাযোগগুলি মিলিয়ে নিতে ভোলেনি। তারা ফুরুৎ ফুরুৎ বউ নিয়ে বেরিয়ে যায়। গড়ের মাঠে হাওয়া খায়। কুৎসিত বোনটার কেন বিয়ে হচ্ছে না তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায় ?

কিন্তু বাড়িতে গোপালের পজিশন সম্পূর্ণ উল্টো। স্কুল ফাইনালে বার দুয়েক ঘায়েল হয়। কিছুদিন পোস্ট অফিসের পিওন হয়েছিল। তখনই চোখ ফোটে, দাদারা ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত, বংশের কুলাঙ্গার ! ফলে ঝোঁক চেপে যাওয়ায় প্রাইভেটে বি. এ. পাশ করে। তারপর অনেক ধরাধরি করে সরকারি অফিসের কেরাণীর চাকরি। গরীব, সেইজন্যেই সংসারের সবদিকে নজর। ট্রাম-বাসের পয়সা বাঁচাতে রোজ সাইকেল মেরে খিদিরপুরের অফিসে যায়। খিদিরপুরে মসলাপাতি ডাল ইত্যাদি শস্তা। সাইকেলের রডে একটা বেতের কেরিয়ার লাগিয়ে নিয়েছে। ফেরার পথে মাসকাবারির বাজার নিয়ে আসে।

নিজেই ইলেকট্রিক বিলের টাকা জমা দেয়। হঠাৎ বড়দার ঘরের পাখা বন্ধ হয়ে গেলে যেন সুইচ অফ করে তক্ষুনি সারতে বসে। কেন না, খ্যাতকীর্তি ভাইদের এসব ছাতামাথা কাজে মন দেবার মতো সময় বা রুচি কোনোটাই নেই। হঠাৎ-বিধবা-হওয়া কাকীমা সেটা ভালো করেই জানেন। তাঁর কুৎসিত মেয়ের বিয়ে হলে ওরা হয়তো কিছু থোক টাকা ছুঁড়ে দেবে। কিন্তু আসল কাজটা এগিয়ে নিয়ে যাবে এই ছেলেটাই। গোপালের হয়েছে মুস্কিল। সব কাজে যেমন নাক গলাতে যায়, তেমনি ভুলচুক কিছু হলে বকুনিও মেলে প্রচুর। সেদিন হঠাৎ কান্নাকাটি করায় মনটা খুব দমে গিয়েছিল। কিন্তু খুশী হয়েছিল লিলি—বেশ হয়েছে, যেমন তোমার স্বভাব! বোঝো ঠ্যালা। কেন, হেনা তোমার একার বোন নাকি? কেউ কিছু করবে না, উনি ছুটে ছুটে যাবেন। কিন্তু কাকীমা হঠাৎ দিন কয় হল খাতির শুরু করে দিয়েছেন। গোপালের চেয়ার-টেবিলে জুৎ হয় না। রান্নাঘরে আসন পেতে খেতে বসে। ঠিক তখনি দরজার কাছে এসে দাঁড়াবেন।

—বৌমা মানকচু বাটা আছে, দিয়েছ?

—হ্যাঁ।

—মোচার ঘণ্ট গোপু ভালো খায়। নারকোল নেই ঘরে। তা হোক, বৌমা দাও।

কাকীমা সরে যেতেই গোপাল চোখ দুটোকে জিজ্ঞাসু করে তুলল। দেখে লিলি 'মরে যাই' মার্কা হাসি হাসল।

—হেনার একটা ভালো সম্বন্ধ এসেছে, তাই তোমাকে দরকার হচ্ছে।

—তাই নাকি। কে আনল সম্বন্ধটা?

—যেই আনুক। কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, তুমি এর মধ্যে যাবে না। মনে নেই সেদিন কাকীমা কি মুখ করলেন। এর পরেও যেতে চাও?

যেতে ঠিকই হয়েছে। অফিস থেকে ফিরেই চায়ের কাপ হাতে কাকীমার ঘরে গেছে। লিলি এখনো ছেলেমানুষ। জয়েণ্ট পরিবারে যে টাকা কম দেয় তাকে সব কাজেই ছুটে যেতে হয়। দাদারা পাড়ার চায়ের দোকানে কখনো যায় না। গেলে শুনতে পেত হেনার লেটেস্ট প্রেমিক নিয়ে কি রকম আলোচনা চলে। গোপালের পেশীগুলো তাই শুনে শক্ত হয়ে ওঠে। দৃশ্য তৈরি করার প্রবল ইচ্ছেটা চেপে গিয়ে ভাবে, হেনাকে তাড়াতাড়ি পার করা দরকার।

একটু পরেই শূন্য কাপ হাতে বেরিয়ে আসে গোপাল। কপালে চিন্তাজনিত

কয়েকটি রেখা। সম্বন্ধটা খুবই ভালো। কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না।

চিত্ত ভট্টাচার্য গোপালের ছেলেবেলার বন্ধু। একসঙ্গে ইস্কুলে পড়েছে। একই সঙ্গে ফেল। দু-জনের দু-জায়গায় চাকরি, তাই দেখাসাক্ষাৎ কম হয়। চিত্ত থাকে সানগর রোডে। গোপাল গায়ের ওপর পাঞ্জাবী চড়িয়ে সাইকেল নিয়ে বেরুল। চিত্তরও আলকাতরা প্যাটার্নের তিন বোন ছিল। তিনজনেরই ভালো বিয়ে দিয়েছে। মাথার ওপর বাপ নেই। টাকা পয়সার জোর তো কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু চিত্তর আছে ছুঁচের আগার মতো বুদ্ধি।

চিত্ত বাড়িতেই ছিল। গোপাল কাকীমার কাছে শোনা খবরগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে গেল। এক ছেলে। বি. এস. সি পাশ। ভালো চাকরি। দুই বোনের আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। মধ্যমগ্রামে নিজেদের বাড়ি। বাবা পেন্সন পায়—ইত্যাদি।

সব শুনে চিত্ত বলল, ছেলের বয়স কত বললি?

—বত্রিশ।

—আর হেনার?

—ওখানেই যত গণ্ডগোল। বেশি ছাড়া কম তো নয়ই। তবে বাড় নেই তেমন। কম বলে চালানো যায়।

—বাপ মা কেমন?

—ভালোই। এক পয়সা পণ চায় না। মেয়ে পছন্দ হলে এমনি নিয়ে যাবে। যাকে বলে মডার্ন।

—মডার্নদের নিয়েই তো মুস্কিল।— চিত্ত ফ্যানটা চালিয়ে থুতনিতে হাত রাখল।

—না, একেবারে মডার্ন বলি কি করে! এবার গোপাল থুতনিতে হাত রাখল: কুষ্ঠি দেখতে চেয়েছে। রাজযোটক না হলে চলবে না।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল চিত্ত।

—ইউরেকা। কুষ্ঠি আছে তোদের?

—দেশে থাকতে পিতু আচার্যি তৈরি করে দিয়েছিল। সে কবেকার কথা। কোথায় হারিয়ে গেছে।

—ব্যস, এই তো চাই। নতুন কুষ্ঠি তৈরি করাতে হবে। কাল বিকেল পাঁচটায় সময় হাজরা মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবি।

চিত্তর কথার ঠিক থাকে বরাবর। কিন্তু আজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাসের গা থেকে তিন হাত বেরিয়ে আসা ভিড় দেখল। সিনেমা পত্রিকার স্টলে বম্বের খবর পড়ে নিল বিনা পয়সায়। তবু চিত্তর দেখা নেই। হয়তো ভুলেই গেছে। ভাবতে ভাবতেই চিত্তকে দেখা গেল। মুখে বিগলিত হাসি।

—খুব রেগে গেছিস, তাই না? কি করব বল? অফিস থেকে বেরোতে যাব দেখি গেটের সামনে খাঁ সাহেব দাঁড়িয়ে। পেছনের দরজায় ভাইকে বসিয়ে রেখেছে। লাঠি হাতে ইয়া পালোয়ান।—চিত্ত ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে লাগল।

রেগে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু খাঁ সাহেবের কথায় খোঁচা খেল, শেষকালে কাবলীওয়ালার কাছ থেকে ধার করা শুরু করলি?

—কি করব। বোনদের বিয়ে দিতেই তো এই হাল। তা আমিও সোজা পাত্তর নই। চারতলার ছাদে উঠে গেলাম। আমাদের অফিসের পাশেই পরিমলের অফিস। মাত্র হাত পাঁচেক ফাঁক। একটা তক্তা ফেলে পগার পার।

—পরিমলের অফিসে দারোয়ান নেই? তোকে যেতে দিল?

—কেন দেবে না? আরো সেলাম করল। পূজোর সময় দু-টাকা বকশিস দিয়ে রেখেছি যে।

গল্প করতে করতে দুই বন্ধু একটা ঘিঞ্জি গলিতে চলে এল। শ্যাওলা ধরা বাড়ির কড়া নাড়তেই একটি নতুন শাড়ী পরা মেয়ে বেরিয়ে এল।

—বাবা আহ্নিক করছেন। আপনারা বসুন।

ছোট ঘর। খান কয়েক টুল। টেবিলে নানা ধরনের জ্যোতিষীর বই। দেওয়ালে হস্তরেখার ফটো। চিত্ত ফিসফিস করে বলল, এ বাড়িতে আমার খুব খাতির। আমি কিভাবে কথা বলি তুই শুধু লক্ষ্য করে যা —।

একটু পরে খড়মের আওয়াজ হতেই গোপাল তাড়াতাড়ি সিগারেট নিভিয়ে এ্যাসট্রেতে ফেলে দিল। মধ্যবয়সী। ভুঁড়ির ওপর ধবধবে পৈতে। বাঘছাল রঙের সিল্কের লুঙ্গি। চিত্তকে দেখে বললেন, এই যে বাবা চিত্ত, এতদিন তোমাকে দেখতে পাইনি। তারপর কি খবর বলো?

চিত্ত কোনোরকম ভনিতার মধ্যে না গিয়ে বলল, ঠাকুরমশাই আমার এই বন্ধুকে এনেছি। এর একটা কুষ্ঠি তৈরি করে দিতে হবে।

—নিশ্চয় নিশ্চয়! ওরে তুনি, বাইরে দু-কাপ চা পাঠিয়ে দে। — গোপালের দিকে ফিরে: কুষ্ঠি আপনার?

—আজ্ঞে না, আমার বোনের।

—বেশ বেশ। নাম, জন্ম-সন দিন-ক্ষণ দিয়ে যান। সাতদিন পর আসবেন। আমার রেট দশ টাকা! তবে চিত্তর সঙ্গে যখন এসেছেন এক টাকা কম দেবেন।— চশমার ভিতর দিয়ে কড়া চোখে তাকিয়ে রইলেন।

চায়ে চুমুক দিয়ে গলা খাঁখারি দিল চিত্ত।

—কিন্তু ঠাকুর মশাই একটু গণ্ডগোল পাকিয়ে দিতে হবে যে। মেয়ের বয়েস বত্রিশ, করতে হবে বাইশ। এ-বাদে আরো কিছু, যাতে রাজযোটক হয়।

—মিথ্যে কথা লিখতে হবে তো?—ঠাকুরমশাই ভুঁড়ি দুলিয়ে হেসে উঠলেন: সেটা আগে বলতে হয়। চার্জ ভাই বেশি লাগবে। ওতে খাটনি অনেক। ছেলের রাশি নক্ষত্র জানা আছে?

গোপাল মাথা নাড়ল।

—তার দরকার নেই। দেবগণ বিপ্রবর্ণ কন্যারাশি পুষ্যানক্ষত্র লাগিয়ে দিলে যে কোনো ছেলের সঙ্গে খেটে যাবে। ঠিক আছে, কিছু এ্যাডভান্স করে যান। দশদিন পরে আসবেন।

গোপাল মাথা চুলকে বলল, কিন্তু ঠাকুরমশাই, ছেলেপক্ষ যদি কুষ্ঠি দেখে ধরে ফেলে আমরা নতুন বানিয়েছি?

—আপনিও যেমন। ঠাকুরমশাই এ ধরনের অজ্ঞতায় যথেষ্ট খুশি হলেন: পুরোনো কাগজ আছে, ডটপেন দিয়ে লিখব, তারপর ঝুলকালি মাখিয়ে দিনকতক খাটের নীচে ফেলে রাখব। আপনার বন্ধুই কত মক্কেল জুটিয়ে এনেছে। অত সহজে ধরা পড়লে আমার এখানে ছুঁচো ডন মারত।

কাজের কথা হয়ে যাওয়ায় চিত্ত অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

—আপনার বাড়ি কদ্দূর?

—আর কদ্দূর! অর্ধেক করে ফেলে রেখেছি। টাকা নেই। তুমি আর মক্কেলও আনছ না।

—আনব। কমিশন দিতে হবে।—চিত্ত চোখ পিটপিট করল।

—নিশ্চয় নিশ্চয়। ঠাকুরমশাই রসিকতা ভেবে প্রাণখোলা হাসি হাসলেন: চলো তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। পথেই পড়বে।

গলি থেকে আরেকটা গলিতে ঢুকে ঠুঁটো বাড়িটা দেখতে পেল গোপাল। দরজা জানালা বসেনি। একজন বিহারী খাটিয়া পেতে শুয়ে আছে। ঠাকুর-মশাইকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

—তিন-তলার ভিৎ। আপাতত তিন রুমের প্ল্যান। গোপালের দিকে তাকিয়ে : বিস্তর খরচ বেড়ে গেছে মশাই। এই দেখুন না, আগে ইঁটের দর ছিল একশো দশ করে, এখন সোয়াশো। এক নম্বরের দাম আরো বেশি। আমি অবশ্য এক নম্বরই দিচ্ছি। বুঝলেন কিনা, যেটুকু করব, কোনো খুঁৎ রাখব না—হেঁ-হেঁ—

গোপাল মাথার উপর তাকাল। চাঁদ উঠেছে। আর কিছুদিন পর ওখানে তিন থাক কংক্রিটের ছাদ উঠবে।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনেক কথা হলো।

লিলি বলল, কুষ্ঠি জাল করে বোন-এর বিয়ে দিচ্ছ। ধরা পড়লে মজা টের পাবে, হুঁ—

—বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো। গোপাল আড়মোড়া ভাঙল।

—ছাই হবে। হেনার মতো মেয়ে করবে ঘর-সংসার! তবেই হয়েছে।

—তা আমরা কি জানি। ওদের বৌ ওরা বুঝবে।

—আহা, আমি ভাবছি সেই ছেলেটার কথা। বি. এস. সি. পাশ করেছিস, কুষ্ঠি-ঠিকুজির ওপর এত ভক্তি কেন রে? দেখে-শুনে একটা বিয়ে করলেই পারিস

—থামো।—গোপাল এবার ধমক দিল : ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে বলেই তো হেনার একটা হিল্লে হচ্ছে, সে খেয়াল আছে?

বিয়ের পরের দিন শ্বশুর বাড়ি যাবার সময় হেনা প্রচুর চোখের জল ফেলল। দেখে বুক শুকিয়ে গেল গোপালের। ফের চোখের জল ফেলে বাপের বাড়িতেই না ফিরে আসতে হয়।

বৌভাতের দিন ভিড়ের মধ্যে কোনোরকমে লুচি-মাংস খেয়ে চলে এসেছিল। বৎস তারপর আর ওমুখো হয়নি। বাড়ির লোকেরা মাঝে মধ্যেই গেছে। কাকীমাও বার কয়েক। যে-সমস্ত রিপোর্ট আসতে লাগল তা রীতিমতো রোমহর্ষক। গোপালের কিছুতেই যেন বিশ্বাস হতে চায় না। বখে যাওয়া মেয়েটার মধ্যে ঘর-বরের জন্যে যে এত মমতা ছিল তা কে জানত! কাকীমার কাছে ওর পজিশন বেড়ে গেল দারুণ রকম। যখনই ডিউটি দিয়ে ফিরুক, আলাদা উনুনের মোচার ঘণ্ট রেখে দেবেনই। লিলি কাছে নেই। ও মাসখানেকের ছুটিতে বাপের বাড়ি গেছে। না-হলে ডেকে বলত, দেখলে তো বলেছিলাম কি না, বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে।

কাকীমা একদিন বললেন, গোপু তোর কথা হেনা খুব বলছিল। শ্বশুরমশাই বলেন তুই নাকি ভুলেই গেছিস যে তোর একটা বোন ছিল।

কোনো দুঃসংবাদ না আসায় এই চার মাসে গোপালের ভয়ানক সাহস বেড়ে গেছে। অফিসের পর এক শনিবারে সোজা চলে গেল মধ্যমগ্রামে। সবাই খুশী। না খাইয়ে ছাড়লেন না। হেনা ময়দায় ময়াম মাখাতে বসে গেল। গোপাল কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে বলল, আপনার শরীর কেমন আছে?

—ভালো নেই বাবা। বাতে কষ্ট পাচ্ছি। তা আমার বৌমার কথা কি বলব! পরশু পাড়ার মেয়েরা সিনেমায় গেল, ওকে কত টানাটানি; বলল, মার শরীর খারাপ, যাব না। আমিও শেষে বললাম, যাও বৌমা। তা কি কথা শোনে!

—অল্পবয়সী বৌমা এনেছি যে! শ্বশুরমশাই গর্বের সঙ্গে গলা খাঁকারি দিলেন: যেমন শেখাবে তেমনি শিখবে। তোমরা বিশ্বাস করো না, কিন্তু শাস্ত্রে রাজযোটক বলে একটা কথা আছেই। কত ভালো ভালো সম্বন্ধ এসেছিল। আমি বলেছি, উঁহু। ও কি বাবা বিষম খেলে কেন! জল খাও, জল খাও—

অনেক রাতে বাড়ি ফিরে জামা-কাপড় না ছেড়ে গোপাল চেয়ারে বসে রইল। গৌরাঙ্গ বার কয়েক ডাকাডাকি করে গেল। মেজবৌদি জানালা দিয়ে উঁকি দিলেন। তারপর কোনোরকমে হাসি চেপে সোজা নিজের ঘরে।

—ওগো ছোট ঠাকুরপোর যেন কি হয়েছে!

—কি হয়েছে?

—সেই থেকে গোঁজ হয়ে বসে ঠিকুজি মুখস্ত করছে: দেবগণ কন্যা রাশি বিপ্রবর্ণ—

খানিক বাদে বড়বৌদিরও ব্যাপারটা নজরে এড়াল না। আধঘুমন্ত স্বামীকে টেনে তুললেন।

—আঃ জ্বালাতন!

—বলি তোমার ভাইটা যে পাগল হয়ে গেল সে-খেয়াল আছে?

—কিসে পাগলটা হল?

—বোঝো ঠ্যালা, তুমি নিজে গিয়ে দেখে এসো গে, জানালা দিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করছে, এক নম্বর ইঁট এক নম্বর ইঁট—

—বুঝতে পেরেছি।— বড়দা হাই তুললেন: বৌমাকে কালই টেলিগ্রাম করে দাও।

প্রান্তীয় উত্তর বাঙলার মেচ উপজাতি

চারুচন্দ্র সান্যাল

আমার কাজ গ্রামে, জঙ্গলে। যাহাদের বলা হয় তপশীলী ও উপজাতি, আমার যাতায়াত তাহাদেরই কাছে। লোকগুলি অতিথিবৎসল ও ভদ্র। মনে মুখে একই কথা। তাই তাহাদের সাথে মেলামেশায় আছে আনন্দ, পাওয়া যায় স্বচ্ছ প্রাণের স্পর্শ। ইহাদের চালচলন 'বনেদী ঘরের' মতো। এককালে হয়তো বড় ছিল, প্রধান জাতি ছিল, কিন্তু আজ দরিদ্র, অশিক্ষিত ও বর্বর বলিয়া গণ্য। ইংরাজ ছিল বিজেতা, এই সকল অরণ্যবাসীদের তাহারা বলিয়াছে 'জংলী', সেই সংজ্ঞা আমরা আজও দিতেছি। কিন্তু আজ খাঁটি ভারতীয় মনে এদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে নূতন ভাবে গবেষণার দিন আসিয়াছে।

এইবার প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গে হিমালয়ের পাদদেশে যে-সকল উপজাতি বাস করে তাহাদের মধ্যে মেচ উপজাতিদের বিষয়ে আলোচনা করিব। গত প্রায় কুড়ি বৎসর বিভিন্ন কার্য উপলক্ষে ইহাদের সহিত নিবিড় ভাবে মিশিবার ও তাহাদের গ্রামগুলিতে যাইবার সুযোগ হইয়াছে। অনেক মেচ আমার বন্ধু হইয়াছে। তাই ইহাদের জীবনকথা আলোচনা করিব ইহাদেরই একজন হিতৈষী বন্ধুরূপে। স্বাধীন ভারতে বিজেতা হিসাবে বিজিতদের জীবনী লিখিবার মনোভাবের কোনো অবকাশ নাই।

পশ্চিমবঙ্গের যে অংশ দক্ষিণে গঙ্গা ও উত্তরে হিমালয় পর্বত, সেই অংশটিকে সাধারণ ভাষায় উত্তরবঙ্গ বলা হয়। এই উত্তরবঙ্গের উত্তর প্রান্তে হিমালয়ের নীচে গভীর জঙ্গলে, জঙ্গলের পার্শ্বে উন্মুক্ত প্রান্তরে, অধিকাংশ নদীর তীরে, শহর হইতে অনেক দূরে ইহাদের বাস।

জনগণনার হিসাবে ১৯০১ সনে পশ্চিম বাঙলা অংশে মেচদের সংখ্যা ছিল ২৩,২৪৭ আর ১৯৬১ সনে ১৩,৫৬৮। ১৯০১ সনে জলপাইগুড়ি জেলায় ছিল ২২,৩৫০ জন আর ১৯৬১ সনে মাত্র ১৩,১৭৮ জন। ১৯০১ সনে দারজিলিং জেলায় ছিল ৩৪২ জন, আর ১৯৬১ সনে ২৩৭ জন। কুচবিহার জেলায়

১৯০১ সনে ছিল ৩৭৭৮ জন, আর ১৯৬১ সনে মাত্র ১৫৩ জন। ১৯০১ সন হইতে ১৯৩১ সনের ভিতরে প্রায় ১৮,০০০ মেচ খৃষ্টান হইয়া যায়।

১৯৬১ সনের হিসাবমতো দেখা যায়, মেচেরা সারা পশ্চিম বাঙলা জুড়িয়া আছে। যেমন বাঁকুড়াতে ৫৩, কলিকাতায় ৩, মেদিনীপুরে ২০৮, পশ্চিম দিনাজপুরে ৭৯, জলপাইগুড়িতে ১৩,১৭৮, দারজিলিং-এ ২৩৭ ও কুচবিহারে ১৫৩। দারজিলিং-এ ইহারা বাস করে অধিকাংশই শিলিগুড়ি মহকুমায়। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানায় ২০৯, মালে ৩৭৯, নাগরাকাটায় ১৪১, মাদারীহাটে ৬১৫, কালচিনিতে ৩,০৩০, আলিপুর দুয়ারে ৪,১৪৬ ও কুমারগ্রামে ৪,৪৭১ জন। অর্থাৎ নকশালবাড়িতে মেচী নদীর তীর হইতে আসাম পর্যন্ত ক্রমশ মেচ জন-বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। কুমারগ্রামের পূর্ব প্রান্তে শঙ্কোশ নদীর ওপারেই আসাম গোয়ালপাড়া। এখানেও ইহারা মেচ নামে পরিচিত কিন্তু আর একটু পূর্বদিকে গেলে ইহারা বোদো নামে খ্যাত। তাই ১৯০১ সনে গোয়ালপাড়ায় মেচ ছিল ৭৩,৭৬০, কিন্তু ১৯৬১ সনে মাত্র ১৪৭। অথচ বোদো সংখ্যা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ১,৬০,৩৫১তে।

মেচরা প্রধানত মোঙ্গল জাতিভুক্ত। বহু ক্ষত্রিয় রাজার সৈন্যদের শোণিত ইহাদের সাথে মিশিয়াছে। মহাভারতের যুগ হইতে ইংরাজ আমলের পূর্ব পর্যন্ত আসাম বা প্রাগ্‌জ্যোতিষে বহু অভিযান হইয়াছে। ফলে অনিবার্য মিশ্রণ ঘটিয়াছে। তাই ইহাদের মধ্যে কাছারী দল নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবি করিতে শুরু করিয়াছে। মনে হয় সম্পূর্ণ বোদো ও মেচ উপজাতিকে ক্ষত্রিয়সম্ভূত ক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে।

মেচ উপজাতির উৎপত্তি লইয়া গল্প ও গবেষণার অন্ত নাই। একটিও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

খৃষ্ট-জন্মের বহু বৎসর পূর্বে একদল মোঙ্গল জাতি বর্মার মধ্য দিয়া পাত্‌কই পর্বত অতিক্রম করিয়া উত্তরপূর্ব আসামে উপনীত হয়। ক্রমশ তাহারা আসাম এবং পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বহুস্থানে ছড়াইয়া যায়। মনে হয় উত্তর-পূর্ব আসাম হইতে প্রধানত তিন দিকে তিন ভাগে এই দল অগ্রসর হইতে থাকে। একদল দক্ষিণে কাছার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া কাছারী নামে পরিচিত হয়। একদল ব্রহ্মপুত্র নদীর উপকূল দিয়া আসামে প্রবেশ করিয়া বোদো নামে অভিহিত হয় ও এখানেও চারটি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। যথা মেচ, কোচ, রাভা ও গারো। একদল হিমালয়ের সানুদেশ দিয়া পশ্চিম দিকে নেপালের মেচী নদীর তীরে

বসবাস শুরু করে। তাহাদের নাম হয় মেচীয়া বা মেচ। এরাই মেচী নদী অতিক্রম করিয়া দারজিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের মধ্য দিয়া পুনরায় আসামের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই মেচদলই আমার আলোচ্য বিষয়।

পেমবারটন ১৮৩৮ সনে, হুকার ১৮৫৪ সনে, ড্যালটন ১৮৭২ সনে, হজসন ১৮৮০ সনে, রউনী ১৮৮২ সনে, গেইট ১৮৯১ সনে, সাণ্ডার ১৮৯৫ সনে, গ্রীয়ারসন ১৯০৩ সনে এই মেচ বা বোদো উপজাতির আচার, ব্যবহার, ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে বহু গবেষণামূলক পুস্তকাদি লিখিয়া গিয়াছেন। সত্যকথা বলিতে হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে বিজেতা দলের এইসকল পণ্ডিত ব্যক্তিদের অনুগ্রহে আমরা প্রাচীন বাঙলা ও আসামবাসীদের বিষয় জানিতে পারি। দুঃখের বিষয় গত ৬০ বৎসরের ভিতর এই মেচ উপজাতি বিষয়ে নূতন কোনো অনুসন্ধান হয় নাই। প্রায় ১৮ বৎসর পূর্বে শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ইহাদের কিরাত জাতির অংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বর্তমানের অনুসন্ধানের ফলাফল নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, যদিও মূলসূত্র পূর্বসূরীগণের পদাঙ্ক অনুসরণে হইয়াছে।

দুই

মেচদের গোত্র আছে সাতটি। যথা :—১। সম্প্রমারী বা চম্প্রমারী; ২। ঈশ্বরারি, ইহারা আর্য হিন্দু ব্রাহ্মণ পর্যায়ের; ৩। নারজিনারী, ইহারা ক্ষত্রিয় পর্যায়ভুক্ত; ৪। বসুমাতারী; ৫। বারগোঁও-আরী, ইহারা বৈশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত; ৬। মছারী; ৭। হাজোয়ারী, ইহারা শূদ্র পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু বিবাহাদি ব্যাপারে ইহাদের জাতিভেদ নাই। সব গোত্রের মধ্যেই অবাধে বিবাহাদি হয়। কাছারীদের নিকটেই মণিপুরে মেইতী জাতির মধ্যেও সাতটি গোত্র, যথা ১। আংগম্ ২। নিংথৌজা ৩। লুতয়াং ৪। খুমোল ৫। থাবাংঅংবা ৬। মৈরং ও ৭। চেংলোই। অথচ কোচ, রাভা ও গারো রাভাদের এমনি গোত্রভেদ নাই। তাই মনে হয় বোদো বা মেচ তাহাদেরই অন্য সম্প্রদায়গুলি হইতে বিভিন্ন।

মেচ উপজাতির বাসস্থানের নিকটে বিভিন্ন জাতি আসিয়া বসবাস করিয়াছে। চা বাগান সৃষ্টির পরে সাহেব, দক্ষিণ বাঙালি, উরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি বহু জাতি ও উপজাতি ডুয়ার্সে আসিয়াছে। কিন্তু এই মেচ উপজাতি এতকাল তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত অনেক মেচ বর্ণ হিন্দুদের সহিত বিবাহাদি করিতেছে।

বাঙলা বিভাগের পরে বহু দক্ষিণী হিন্দু বাস্তহারা ইহাদের নিকটেই বসবাস শুরু করিয়াছে। মনে হয় কালক্রমে পুনরায় মিশ্রণ ঘটিবে ও বর্ণ হিন্দুদের আচার ব্যবহার ইহাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিবে।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী ইহারা এতকাল অশিক্ষিত ছিল। কিন্তু এখন অনেক মেচ পুরুষ ও বালিকা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী অধিকার করিয়াছে, কেহ কেহ বিধানসভা ও লোকসভার সদস্য হইয়াছে। গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেচ বালক বালিকাদের পাঠে উৎসাহ দেখিয়া মনে হইল এই উপজাতি অল্প দিনেই বেশ শিক্ষিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু বর্তমানে শতকরা মাত্র পাঁচজন বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

ইহাদের আচার ব্যবহার অতি সুন্দর। গৃহগুলি অতি পরিষ্কার। বস্ত্রাদি নিজেরাই ধুইয়া পরিষ্কার রাখে। রোজ স্নান করে। অতিথি আসিলে খুশী হয়। স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ত্রী। তাহাদের খুব সম্মান। ব্যভিচার একেবারেই নাই। অবিবাহিত ছেলেরা ভিন্ন স্থানে নিদ্রা যায়। অবিবাহিতা কন্যারা মাতার কাছে গৃহমধ্যে কোনো কুটিরে নিদ্রা যায়। মিথ্যা কথা, মিথ্যা আচরণ ছিল অজ্ঞাত। বর্তমানে এই বিষয়ে শিথিলতা দেখা যাইতেছে। শিক্ষিত হইবার সাথে সাথে তাহাদের নাম ও পদবী বর্ণ হিন্দুদের অনুকরণে পরিবর্তিত হইতেছে।

মেচরা প্রধানত চাষী। খুব ভাল চাষী। পূর্বে ছিল 'ঝুম' প্রথা যখন মানুষ ছিল অল্প ও জমি ছিল অফুরন্ত। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে হাল গোরু দিয়া চাষের প্রথা শুরু হইয়া যায়। ধানই ইহাদের প্রধান চাষ। ইহারা পূর্বে তুলার চাষ করিত। প্রধান ক্রেতা ছিল জাপান। এখন এই বাজার নাই, কাজেই তুলা চাষে উৎসাহ নাই। সুপারির চাষে ইহারা ওস্তাদ। প্রায় প্রতি গৃহেই সুপারি বাগান দেখা যায়। অনেকে সুপারি বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ আয় করে। বর্তমানে ভুট্টার চাষ শুরু করিয়াছে। তরি-তরকারির চাষও শুরু হইয়াছে।

ধান রোপণের পূর্বে গৃহকর্ত্রী প্রথমে কয়েকটি চারা রোপণ করিবেন তাহার পর অন্য সকলে রোপণ শুরু করিবে। ধান কাটার সময় হইলে গৃহকর্ত্রী প্রথমে একটু ধান কাটিয়া গৃহে আনিবেন, তাহার পর ধান কাটা শুরু হইবে।

প্রতি গৃহেই ছিল এণ্ডির চাষ। গৃহেই পোকা পালন করা হইত, গৃহেই

পোকা হইতে সুতা প্রস্তুত হইত ও গৃহেই বস্ত্র বোনা হইত। তুলা হইতেও সুতা প্রস্তুত ও বয়ন হইত। কুমারগ্রামের এণ্ডি চাদর ছিল বিখ্যাত। সারা দারজিলিং, তরাই ও ডুয়ার্সে মেচরা তাহাদের গৃহজাত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিত। ক্রমে কলের সুতা ও বস্ত্রাদি বাজারে আসিল, সস্তায় রেশমের বস্ত্রাদি আসিল, ধীরে ধীরে গৃহশিল্প লোপ পাইতে শুরু করিল। এখনও স্থানে স্থানে এণ্ডির চাষ ও বস্ত্র বয়ন বাঁচিয়া আছে। উৎসাহ দিলে পুনর্জীবন লাভ করিতে পারে।

গৃহশিল্প নষ্ট হইবার সাথে সাথে বহু মেচকে নিকটের চা বাগানে ও সৈন্য ব্যারাকে দিন মজুরের কাজ করিতে হইতেছে। স্বাধীন লোক পরাধীন হইয়া যাইতেছে। বহু মেচ খেত মজুরের কাজে নিয়োজিত হইতেছে। যাহাদের কোনোদিন ঋণ করিতে হইত না, এখন ঋণজালে জড়াইয়া পড়িতেছে। চাকুরিজীবী শিক্ষিত মেচ তাহাদের বেতনে সংসার চালাইতে পারিতেছে না। একটি বিরাট সমস্যা আসিয়া গিয়াছে।

মেচরা যৌথ সংসারে বাস করিতে পছন্দ করে। পুত্র, বিবাহ করিয়াই পৃথক গৃহে চলিয়া যায় না। পিতা অনেক সময়ে পুত্রদের বিভিন্ন গৃহে বসবাসের অনুমতি দেন। তবুও পিতাই সমগ্র পরিবারে কর্তা। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রেরাই তাহার উত্তরাধিকারী হয়। কন্যারা কিছু পায় না। কিন্তু ভগ্নীদের ও বিধবা মাতাকে ভরণপোষণ করা পুত্রদের অবশ্য কর্তব্য। ইহা সামাজিক অলিখিত বিধি, ইহার অন্যথা কখনই সমাজ ক্ষমা করিবে না।

মেচদের দেবতা আছে অনেক। যে কোনও অ-মানুষিক শক্তিকে ইহারা দেবতা জ্ঞানে পূজা করে অর্থাৎ ইহারা প্রকৃতি-শক্তির পূজারী। তাই যে-সকল পার্বত্য নদী বর্ষাকালে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে ইহারা সেই নদীগুলিকে পূজা করে। তিস্তা, জলঢাকা, তোরসা, শঙ্কোশ নদী ইহাদের দেবতা। জঙ্গলে প্রবেশের পূর্বে একটি গাছকে বনদেবী কল্পনা করিয়া পূজা করা হয়। এই দেবী হইতেছেন 'হাগরা মোদোই' অর্থাৎ জঙ্গলে হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষা-কারিণী। আর এক বিশিষ্ট দেবতা হইতেছেন মনসা 'সিজ' গাছ। এই গাছ-দেবতার নাম 'বাঠৌ' বা মহাকাল। প্রতিটি মেচগৃহে উঠানের উত্তর-পূর্ব কোণে এই গাছ আছে। ইহাদের ধারণা, গাছ জন্তু ও মানুষের প্রাণ একই। গাছের ও জন্তুর প্রাণ মানুষে সঞ্চারিত হইতে পারে ও মানুষের প্রাণ গাছেও যাইতে পারে। তাই চাষ আবাদের পূর্বে কোনো প্রাণী বধ করিয়া তাহার রক্ত চাষের জমিতে দেওয়া হয়, যেন এই প্রাণীর প্রাণ শস্যবৃক্ষে প্রবেশ করিয়া

তাহাদের সতেজ করিবে এই ধারণায়। বিবাহের সময়ে আতপ চাউল বর ও কনের মস্তকে বর্ষিত হয়। ধান্য রৌদ্রে শুষ্ক করিলে চাউলের প্রাণটি থাকিয়াই যায়, এই প্রাণ বর ও কন্যার জীবন দীর্ঘতর করিবে এইরূপ আশায় ও ধারণায়।

ইহারা লক্ষ্মীর পূজা করে। লক্ষ্মীর নাম 'মাইনো'। উত্তরদিকের কুটিরে ইনি স্থাপিত। এই দেবী 'শক্তি'। মনসা, মহাকাল (শিব) প্রভৃতির পূজা প্রচলিত আছে। মেচরা ধর্মপ্রাণ। প্রতি মাসেই একটি বা ততোধিক দেব-দেবীর পূজা করে। ইহারা মূর্তিপূজা করে না। একটি করিয়া মাটির ঢেলা প্রতি দেবতার প্রতীক। ফুল, পাতা, আতপ চাউল, কলা প্রভৃতি পূজার উপকরণ। প্রতি পূজার প্রধান অঙ্গ হইতেছে পশু-পক্ষী বলি। মুর্গি, হাঁস, পাঁঠা, ছাগল, শূকর সবই বলি হয়। বলিদত্ত পশু-পক্ষীর রক্তটুকু দেবতাকে উৎসর্গ করে; যেমন দুর্গাপূজায় একটি মাটির পাত্রে রক্ত সংগ্রহ করিয়া প্রথম নিবেদন করা হয় দেবীকে।

সামাজিক জীবনের প্রধান আচারগুলি জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুকেন্দ্রিক।

প্রসূতিকে গৃহের যে কোনও কুটিরে রাখা হয়। কোনো পৃথক কুটির নির্মাণ করা হয় না। গ্রামের কোনো বর্ষিয়সী মহিলা 'দাই'-এর কার্য করেন। কাঁচা বাঁশের ত্বক হইতে নাড়ী কাটিবার ছুরি প্রস্তুত হয়। ইহা দ্বারাই কার্য সম্পাদন হয়। কন্যা হইলে পাঁচ পোঁচ ও পুত্র হইলে সাত পোঁচে নাড়ী কাটা হয়। তারপর শিশু ও প্রসূতিকে উষ্ণ জলে স্নান করান হয়। শিশুর মুখে একটু মধু দেওয়া হয় মাত্র। কোনো উৎসব, কোনো উলু দিবার প্রথা নাই।

বিবাহ হয় পুরুষের কুড়ি ও কন্যার ষোলো বৎসর বয়সে। পিতা-মাতাই ঘটকের (বারি) সাহায্যে ব্যবস্থাদি করে। প্রথমে ঘটক প্রস্তাবিত কন্যার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের প্রস্তাব হিসাবে তাহার হস্তে একটি টাকা দিবে। ইহার নাম 'গম-থন'। কন্যার পিতা ইহা গ্রহণ করিবে না। বারবার তিনবার এই 'গম-থন' টাকা দিয়া অনুরোধ করা হইবে। তিন বারই টাকা গ্রহণ না করিলে প্রস্তাব বিফল হইল। কিন্তু মুদ্রাটি গ্রহণ করিলে বা ফেরত না দিলে প্রস্তাব গৃহীত হইল। তাহার পর কন্যাপণ, পাত্র-পাত্রী দেখা ও বিবাহের দিন স্থির হইবে। বিবাহের পূর্বদিন বরযাত্রীর দল আসিয়া কন্যাকে লইয়া যাইবে ও বরের গৃহে বিবাহ হইবে, কন্যার গৃহে নয়। হিন্দু মেচদের বিবাহ হয় 'বাঠৌ' অর্থাৎ সিজবৃক্ষের সম্মুখে। ব্রাহ্মণ

মেচদের বিবাহ হয় অগ্নি সাক্ষী করিয়া আর খৃষ্টান মেচদের বিবাহ হয় চার্চে। কিন্তু বিবাহের পদ্ধতি সবক্ষেত্রেই প্রায় একই প্রকার। কন্যার কপালে সিন্দুর দান প্রথা ছিল না। এখন হইতেছে। হাতে শাঁখার বালা ছিল না, এখন হইতেছে। কন্যাপণ স্থলে এখন পাত্রযৌতুক দান প্রথা আসিয়াছে। বিবাহবিচ্ছেদ নাই বলিলেই চলে। বড় ভাই-এর বিধবাকে দেবর বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু ছোট ভাই-এর বিধবাকে বড় ভাই কখনই বিবাহ করিবে না।

এইবার মৃত্যু প্রথা। মেচরা মৃতদাহ করিত না। এখন কেহ কেহ শুরু করিয়াছে। কবর দেওয়াই প্রথা। মৃতের মস্তক থাকিবে দক্ষিণদিকে, পদদ্বয় উত্তরে যাহাতে সহজে মৃত আত্মা কৈলাস পর্বতে যাইতে পারে। তের দিন পরে শ্রাদ্ধ হইবে। সেইদিন প্রত্যেক খাদ্যের কিছু কিছু অংশ লইয়া পুত্র ও গ্রামের গণ্য-মান্য নিমন্ত্রিত কয়েকজন ব্যক্তি শ্মশানে যাইয়া কবরস্থানে খাদ্যদ্রব্যগুলি রাখিয়া মৃত আত্মাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিবে, 'এতকাল তোমার সহিত আমরা আহার বিহার করিয়াছি, আজ হইতে তাহা আর সম্ভব হইবে না। তুমি এই আহার্য গ্রহণ করিয়া অনন্তে মিশিয়া যাও। ফিরিয়া আসিয়া আর আমাদের বিরক্তি উৎপাদন করিও না।' তাহার পর শ্রাদ্ধবাসরে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভোজ পর্ব সম্পন্ন করিবে।

গ্রামের বিচার গ্রামেই হইত। গ্রামের একজন গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিকে গ্রামের লোক 'ফারিয়া' বা মণ্ডল নির্বাচন করিত। এই 'ফারিয়া' একজন গ্রাম্য চৌকিদার 'হাল-মা-জি', একজন পুরোহিত 'দেউলী' ও তাহার সহকারী 'পানথোল'-এর সাহায্যে বিচারাদি করিত। এখন পঞ্চায়েত প্রথা চালু হইয়াছে। তবুও সামাজিক ব্যাপারে পুরাতন প্রথা চলিতেছে।

মেচদের ভাষা ভোট-বর্মা ধর্মী। ঈশ্বর নামে ইহাদের কোনো শব্দ নাই। 'মোদায়' শব্দটি গ্রাম্য দেবতাদের বলা হয়। দরজা, জানালা, কড়াই, বালতি, আয়না, বাতি, পাইখানা প্রভৃতির কোনো মেচ শব্দ বা কথা নাই। ইহাদের ভাষায় অলিখিত ব্যাকরণও আছে। যেমন ভাল ছেলে 'মজাং গোথো'; আরও ভাল ছেলে 'মজাং সিন্ গোথো'; সবচেয়ে ভাল ছেলে 'বয়-নিস্তাই-সিন্-গোথো'। আবার এক কথায় বলা হয়—বাড়ি-'ন'; উত্তর-'ছা'; দক্ষিণ-'থ়া'; গাছ-'ফাং'; কাপড়-'সি'; জল-'দৈ' ইত্যাদি। আবার একই কথার উচ্চারণ ভেদে বিভিন্ন অর্থ হয়, যেমন-'ছা' মানে উচ্চ, উপরে, উত্তর দিক। 'থ়া' শব্দে নীচে, নীচু, দক্ষিণ

দিক। বাঙলায় যেমন তুই, তুমি, আপনি শব্দ আছে মেচদের ভাষাতেও এমনি আছে যেমন 'তোমার নিকট হইতে'—'বি-নি-ফ্রা' ; 'আপনার নিকট হইতে'—'বি-থাং-নি-ফ্রা'। আবার গৌরবে বহুবচনও আছে—যেমন 'তুমি'—'নং' ; আপনি 'নং-ছুরো' বা 'নং-থাং' বা 'নং-ছুর্'। এইরকম মৌখিক ভাষাতেও বিভিন্ন ভাবে সম্বোধনের ভাষা আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে ইহাদের শিক্ষা পদ্ধতি লইয়া। য়ুরোপ ও ভারতীয় মনীষীদের মতে মাতৃভাষাতেই প্রথম পাঠের ব্যবস্থা করিলে সত্বর সুফল পাওয়া যাইবে। খৃষ্টান পাদ্রীর দল এই দিকে প্রথম দৃষ্টি দিবার ফলে উপজাতি শিক্ষার কার্যে তাহারা এত দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিয়াছে ও তাহাদের নিকট এত প্রিয় হইয়াছে। পাদ্রীর দল তাহাদের ভাষা শিখিয়াছে, তাহাদের ভাষায় পুস্তকাদি লিখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহারা রোমান অক্ষরে লিখিয়াছে, আমরা বাঙলা অক্ষরে লিখিব পশ্চিম বাঙলায়, অসমিয়া অক্ষরে আসামে, হিন্দী অক্ষরে বিহারে। ভাষাটি হইবে উপজাতিগণের মাতৃভাষা। এইদিকে দৃষ্টি না দিবার ফলে ভারত সরকারের গত কুড়ি বৎসরের প্রচেষ্টা যেন ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে।

সর্বশেষে মেচদের 'জলকে-চল' গানটি দিয়া প্রবন্ধের ছেদ টানিয়া দিই।

'জোংলাই সিখোলা হাবাব্ জোংলাই সিখোলা,
থুনজুং লুনানৈ সি দানা নৈ
সংসার নি লোইজা খরগৌরা।
ফুংডাউ হাইলাই, নোউনি হাবা মাউনা,
সানজু ফুথিরাও জুংখার।
বেলাছে জাবোলা মিনি বালা বালা
দৈসো লাহিনো ক্ষাংডো
হাবাব্ জোংনি বোই, সিখোলানি সময়াও।'

অর্থাৎ

আমরা যুবতী, সরম লুকোতে
সুতো কাটি, বুনি শাড়ি,
সকালে গেরস্থালি-কাজ সেরে
দুপুরে চরকা ধরি,
বিকেলে সবাই ভরা-যৌবনে
কলসীতে জল ভরি।

এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে মেচদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি দিক।

অক্ষরের ট্রেনে উঠলে

মণীন্দ্র রায়

এক একটি জায়গায় যেতে
পায়ে পায়ে, নিশানাবিহীন,
একদিন দেখেছে সেও
দিগন্তের ট্রেনগুলি
সারি সারি অক্ষরের ক্রমাগত বিদ্যুতের মতো
চলে যায় গন্তব্যে স্বাধীন।

আজ সে নিজেই ঐ ট্রেনের ভিতরে
জানালায় ব'সে কী অবাক!—
পরিচিত দৃশ্য যেন নাচে ইন্দ্রজালে;
ছুটন্ত প্রান্তর গাছ ঘরবাড়ি দ্রুত ইতিহাস
কেবলি বদলায়, চলে; মাথার ভিতর
দিগন্তের বৃত্ত ভেঙে আরো দূর দিগন্তের দিকে
সেও তো চলেছে তাই,
একই জন্মে আরেক মানুষ!

আমাকে আমার পথ থেকে

সরিৎ শর্মা

আমাকে আমার পথ থেকে সরিয়ে দিও না
দেখো ঠিক খুঁজে পাব পথ
অন্য নাম নিতে আমায় বোলো না
দেখো এই নামে আমার সব অপচয় ঢেকে যাবে

আমার কিছু বলার আছে, কিছু শোনার
আমার কিছু দেখার আছে, কিছু জানার…

আমি কিছু ঘ্রাণ পাচ্ছি সময়ের…

জীবনের স্পর্শ বড় উপভোগ্য….

আমি জীবনের মোড়টাতেই দাঁড়িয়ে আছি
এর পরের মোড়টাকে লক্ষ্য করব ব'লে ..

এ-পথ দিয়ে সময় অনেকবার চলে গেছে
আমাকে বহু মনীষার আলো আর মানুষের ভালোবাসা
বহু সংগ্রামের সুস্থতা আর চেতনার নির্ভয়তা দিয়ে গেছে
হাতে তুলে….

আমি ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতায় দু-হাত ভরে গ্রহণ করেছি
অঞ্জলি উপচে প'ড়ে গেছে অক্ষমতায় কিছু
তবু সময় আসবে, সে সব কুড়িয়ে নিয়ে যাবে
আমারই মতো কারুর হাতে তুলে দিতে…

আমি ততক্ষণে পৌঁছে যাব আর-একটা মোড়ে
সেখানে তখন এই সব ঘর-গেরস্থালির কথা বলতে থাকব,
পৃথিবীর এ-পাড়া ও-পাড়ার হার্দ্য বোধির সংলাপ
শব্দের প্রতীতি নিয়ে নন্দিত সুষমায়
স্খলনে পতনে উত্থানে জীবনের সংযত বিচ্ছিন্নতায়

আর দেখব
আমার পথ দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে
　　মায়ের হাসির মতো—
পৃথিবীর হৃৎপিণ্ডে দোলালাগা সেই হাসির স্বরে
　　আমি একে একে বিছিয়ে দেবো
　　　　সময়ের দেওয়া আমার আনন্দ-বেদনা
　　　　　　আশা নিরাশার
　　　　ব্যর্থ সার্থকতা আর সার্থক ব্যর্থতার
　　　　　　সংহত উপহারগুলি।

উদাসীনতার পরিপার্শ্ব থেকে দূরে

(লেনিনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত)

শিবশম্ভু পাল

উদাসীনতার পরিপার্শ্বে গড়ে ওঠে
গন্ধহীন রঙচঙে গাছ
চারিদিকে সূক্ষ্মতম কাঁচ
কাঁচের ওপাশে যত কোলাহল, ধুলোমাটি, রক্তপদ্ম ফোটে।

সচেতন দেহলগ্ন জীয়ন্ত স্নায়ুর
যাতায়াত থেমে গেছে পরিব্যাপ্ত সাগরসঙ্গমে
নদী হতে ভুলে গেছে, জমে
নিমীলন, তন্দ্রাঘোর, স্মৃতিভারাতুর।

নির্গন্ধী রঙিন গাছ পেয়েছে আহার অন্তর্লীন
অভিশপ্ত মৃত্তিকায়, চারিদিকে হীনমন্য পরাভব, সূক্ষ্মতম কাঁচ ;
ওদিকে মাদল বাজে, লোকায়ত যূথবদ্ধ নাচ
নিরন্তু স্বাধীন।

সেখানে তোমারই সত্তা প্রকীর্ণ, লেনিন ॥

কেউ না কেউ সঙ্গে থাকেই

রত্নেশ্বর হাজরা

কাউকেই একা পাই না   কেউ না কেউ
সঙ্গে থাকেই
জলের সঙ্গে স্রোত হাওয়ার সঙ্গে গতি রোদের সঙ্গে তাপ
এঘর ওঘর এবাড়ি ওবাড়ি
কেউ না থাক
ছায়া থাকে
নিঃশ্বাসের সঙ্গে প্রশ্বাস তাপ বললে উষ্ণতার মতো—

দেওয়াল সরিয়ে দিলে চার চারটে দিক ঘিরে ধরল
ছাদ সরালাম তো আকাশ নিচু মেঘে উঠল উপরে
পথে নামলে পথই সঙ্গী
পিছনে অতীত সামনে ভবিষ্যৎ
জন্মের কাছে যাই
মৃত্যু তার কাঁধ ছুঁয়ে ঠায় দাঁড়ানো
অন্ধকারের সঙ্গে নক্ষত্রমণ্ডলী সারারাত ছায়াপথে ছায়াপথে

কাউকেই আর একা পাই না—
কেউ না থাক
অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতের সঙ্গে অতীত
আমার সঙ্গে আমি তাপ বলতে উষ্ণতা
থাকবেই—

এবার সাম্রাজ্য চাই

কমল চক্রবর্তী

বিরষারে তোর ফারসা কুথায়
পথে ঘাটে ইটা পাথর
বন বন বন মেলায় ঘুরে সারা বছর
অবশেষে দেখতে পেলাম
প্যাণ্ট্ কামিজ দাতন কাঠি
রাতে শুবার নরম পাটি
সব গিয়েছে
ভালুক মশাই ভালুক করে সব লিয়েছে
দুখার মায়ের চুলের কাটা
পান্থা খাবার পস্ত বাটা
এসব আজও চুপ মারলে নাকে আসে
মিঠা সুবাস বিয়ান এমন,
কাকড়ী নদী, বালি খুড়লেই

জল-জল-জল সগল ছবি
করমা পরব, মুরগা লড়াই
জলের জন্য লাঠালাঠি,
কলের গাড়ি এসে কি, বাপ
লালটিন-টা ভেঙে দিয়ে
দাপাই গেল চাষের মাটি ?

চিরঞ্জীব লেনিন

টু হু

লেনিন সমাধি-গৃহে এলাম গর্কিতে। যত কাছাকাছি আসি তীব্র হয় হৃদপিণ্ডে স্পন্দন। মনে হয়, দেখা হবে সঙ্গে তাঁরই, যেন তিনি পায়চারি করছেন। দূর থেকে শুনতে পাব সাদর আহ্বানে তাঁর গলা। শুনতে পাব পায়ের চলার শব্দ কাঠের মেঝেয়। দু-হাত বাড়িয়ে তিনি এগিয়ে আসবেন, আর অন্তরঙ্গ কথা হবে দু-জনায়, দুজন কমিউনিস্টে, মানুষে মানুষে যেন সমানে সমানে। ব্যস্ত তিনি কত কাজে, জানা-অজানায়, আছে কত চিন্তা তাঁর। ধ্বংস যুদ্ধ ঘিরে চতুর্ধার। তবু ভাবছি মনে, অন্তত মিনিট পাঁচ কথা হবে। তিনি তো জানেন আসছি, দূর থেকে। বলবেন, বসুন। বসব তাঁর পাশে। তিনি শুধোবেন ঢের কথা, মৃদু হাসি ফুটে উঠবে ঠোঁটে।

ঐ সারিবদ্ধ শুধু মানুষ মানুষ, অসংখ্য অগণ্য ; তাঁরা নতশির সমাধি-প্রাঙ্গণে, মনে শ্রদ্ধার অঞ্জলি।

এমনি করে বয়ে যায় দিন মাস বছর, বয় নিরবধি প্রবাহে সময়। স্মৃতির সন্তাপ পড়ে থাকে। সমাধি-উদ্যানে রাখা বেঞ্চগুলির কাঠে মাখা লেনিনের দেহের উত্তাপ। এখনি পুরনো এই খুশবাগে হাঁটবেন তিনি, বিশ্রাম নেবেন, আর মানুষের ভবিষ্য ভাববেন। উত্তর পথিকদের জন্যে তিনি অবিরল রচনায় জাগর রইবেন।

জুড়ে সমাধি-ভবন ছেয়ে আছে সান্দ্র শান্তি, স্তব্ধতা, কেবল গাইড-নারীর

শ্লথ উচ্চারণে স্তব্ধতায় ঢেউ। লেনিনের স্মৃতিভারে পড়ে থাকা এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়ে দেখান তিনি। তাঁর সে-স্বরতরঙ্গভঙ্গে ঝলে উঠছে দেশপ্রেম ; স্বদেশের লেনিনসন্ধান, সিদ্ধি বিপ্লবে, ক্রান্তিতে। মানুষের ভবিষ্যৎ জ্বলে উঠল সমুজ্জ্বল, মানুষের পূর্বাকাশে রক্তজবাসহাশে সুদিন। সে-কণ্ঠে নদীর স্রোত কথা কয়, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জয়। আমরা সে-গাইড-নারী কেন্দ্রে রেখে বৃত্তে উপচে পড়ি, কণ্ঠে পৃথিবীর বসন্তউল্লাস, যেন চিরযৌবনের লাবণ্য-বিভাসে কথা কয়। যুগযুগ নির্যাতিত লাঞ্ছিত মানুষ, তারই মুক্তির সন্ধানে-অনাগত ভাবী মানুষের জন্য শান্তির জীবন খুঁজে, লেনিন জুঝলেন, সঙ্গী সাথী বন্ধু, অবশেষে জয়।

লেনিনপ্রয়াণ বর্ষে চার বছরের খোকা হাঁটি হাঁটি পায়ে পায়ে চলেছি জীবনে। সে-জীবন সংগ্রামের, সে-জীবনে দিগন্তে তরুণ জয়সূর্য ডাক দিল, যাত্রা করো যাত্রা করো যাত্রীদল স্বদেশমুক্তির রণাঙ্গনে, শপথসাধনে কিংবা সর্বস্বপাতনে।

আমার জন্মের লগ্নে মা আমার খবর পাননি, এক নবীন দেশের জন্ম হলো। যেখানে মানুষ আর একা নয়, অন্য মানুষের নাম সাথী বলে ডাকে। একে অন্যে সহায়তা দেয়। সে-এক আশ্চর্য দেশ, সে-দেশের সার সত্তা-স্বপ্নগুলি সত্য হয়ে ওঠা। সে-এক অবাক রাজ্য, হাঁটু ভেঙে মাথা কুটে দেবতার পায়ে কেউ অশ্রুতে আকুল হয়ে প্রার্থনায় যাচ্ঞায় সহায়শূন্য নয়।

দৃষ্টি খুলল ফিরল হুঁশ
কর্মঘন নিষ্ঠ মানুষ, কাজকর্মের আলোকপাতে
দেশ ছেয়েছে বিজলিজালে
ট্রেন ছুটেছে গতির তালে রাতদিবসে দিবসরাতে
কবিতা ফুটে মালার মতো
লক্ষ হাজার গ্রন্থ কতো লেনিন যেন পূর্ণ তাতে
কারখানাতে চুল্লি জ্বলে

হিরণবরণ ফসল দোলে তরুণকণ্ঠে সুর হাওয়াতে।
ফুলবাগে ফুল কেমন ফোটে
হাওয়ায় কেমন সুবাস ছোটে, লেনিন ভাবনা পরাগ সাথে।

আধফোটা সব গোলাপ ফুলে
পুষ্পপুঞ্জে শাখায় মূলে লেনিন নামের জয়গাথাতে।
শঙ্কাহরণ যাত্রা পথে
ঝড় ঝাপটায় বিঘ্ন হতে রক্ষী তিনি অভয় হাতে

তিনি তো নায়ক, নেতা কমিউনিস্ট ব্রতী বাহিনীর, তিনি বন্ধু ক্ষুধার্ত পীড়িতদের, তাঁর নামে সৈনিকেরা বিশ্রামে বিমুখ। ঐ চাষী, মেহনতী মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ দল সমাগত সমাধি-চত্বরে। উন্মুখ আশায় তাঁরা যেন এই শতকের সত্তর সালের দীপ্ত দিন। বিশ্বে জয়ী হবে স্বাধীনতা। দুনিয়ার সুশাসন-ভার নেবে মেহনতী মানুষ নিশ্চয়ই।

লেনিন আছেন, লেনিন অন্তরঙ্গে আছেন অন্তঃকরণে
পথের দিশারী শ্রমতরঙ্গভঙ্গে রাঙা ভবিষ্য শরণে
ভেঙে গড়ি তাই বিশ্ব তাঁরই সঙ্গে, চলেছি দৃপ্ত চরণে

সিঁড়ি বেয়ে যেতে ভাবি, আর, লেনিনের অধ্যয়ন ঘরে
চিন্তাকুল, সিঁড়িতে পা তাঁর কিছু চিহ্ন রাখেনি কি ধরে
পারে নাকি কালের প্রহার স্মৃতি মুছে দিতে চরাচরে?

এই তাঁর হাওয়ায় চ্ছসিত বড় পাঠগৃহ। সারা রাত জেগে বসে ঐ তাঁর লেখার টেবিল। সূর্যালোক ছলকে যায় ঘরের মেঝেয়। সাজানো কেতাব খাতা উন্মন আকুল হয়ে লেনিনের প্রতীক্ষায়। না-ওল্টানো পাতা দোলে দেয়ালের ক্যালেণ্ডারে। তার কিছু ওপরে টাঙানো, দুলছে হাসিমুখ ছবিতে চেখভ।

তারিখ একুশে জানুয়ারি। না-ওল্টানো পাতা ক্যালেণ্ডার।
যুগযুগান্ত ধরে রাখবে তারি অফুরন্ত প্রতিধ্বনিভার
তাঁর মৃত্যু হয়নি তা মানি। চিরযাত্রী, মানুষের সাথী।
চিরজীব তিনি। তাঁর বাণী, তাঁর দীপ্তি প্রভাত-সম্পাতী।
কত না শতাব্দী যাবে চলে, মানুষের হৃদয় মন্দিরে
কালজয়ী কল্যাণকল্লোলে লেনিন তারকাদীপ্তি শিরে।

জন্ম নেবে এ-গ্রহে যারা ভবিষ্যতে তখন আর
মানব জাতির এমন প্রেমিক মিলবে কি আর তুল্য তাঁর
তিনি আছেন সঙ্গে সবার বিশ্ববাসীর ধ্যান মননে
জীবনপ্রেমিক কালের পথিক, কল্যাণ কাজ সম্পাদনে।

সারা সোভিয়েত ঘুরছি, সারা গ্রীষ্ম। পরিচয় ঘটে জনে জনে। মনে জেগে উঠে শেষে ঢলে পড়ে কত প্রশ্ন, সে-সবেরও বিনিময়, ব্যাখ্যা মেলে। আর, দেখলাম বিস্তৃত বনরাজি নীলা, সীমাহীন দেশ, সমুদ্র, সুনীল হ্রদ, সমতল, উদ্ধত পর্বতশৃঙ্গ, নতুন ও পুরাতন জনপদ। নগর-নগরী। সাইবেরিয়া যেন স্বপ্নপরীস্থান। ঘুরে দেখছি এখানে সেখানে। বাজার, বিপনি, মাঠ, রেড স্কোয়ার, সুদূরতুন্দ্রায়। লেনিন আছেন সব ঠাঁই। ঐ তিনি রয়েছেন শ্রমের কর্মিষ্ঠ হাতে গঠনে যোজনা-কল্পে। ধক ধক ইঞ্জিনে, কিংবা চাকার ঘূর্ণনে। সকলের সঙ্গী তিনি, সকলের অভীপ্সা, বান্ধব, পরিজন। সকলেরই ভাই।

ভেসে ওঠে চোখে মস্কো। শীতার্ত জর্জর সেই দিন।
এখানে ওখানে স্তূপে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা, রাস্তায় রাস্তায়
উদ্দাম নিষ্ঠুর বায়ে শোকগ্রস্ত পতাকা উড্ডীন
অন্তহীন চলেছে মানুষ, শেষের বিদায় দিতে, ধীর পায় পায়।
চলেছে চলেছে, বুকে নিয়ে ফেরে একটুকরো বেদনা অশেষ
শেলবিদ্ধ, কোনো ভাষা বোঝাতে পারে না মাত্র লেশ।

ভাবি না, আমি ভাবি না লেনিন প্রয়াত নাকি মৃত
ভাবি না, তিনি কথা বলায় স্তব্ধ নাকি আজ।
ঐ ছো তিনি জীবিত, তিনি জীবনে বিধৃত
জানি রুশের প্রবল শীতে দুটি বাহুর মাঝ
জননী যেন শিশুকে রাখে সুপ্তিস্নেহ মুড়ে
আদর করে বুকের ওমে বালাই থেকে দূরে।

জানুয়ারি। গলায় আলোর মালা নিশীথিনী। তবু আকুল বাতাসে বাজে বাঁশি। মৃদু কণ্ঠে পড়ে শোনাচ্ছেন ক্রুপস্কায়া মর্মন্তুদ কাহিনী 'জীবন তৃষা'।

বাতাসের আক্রমণে মর্মরিত বাইরে বৃক্ষশাখা। জগত উন্মুখ ছিল শুনতে সেদিনের বিবরণ। সে দিন তো অমরতা এসেছিল আমাদের ঘরে, অশুভ মৃত্যুকে চূর্ণ করে, বিঘোষিত জীবনের জয়ে।

যে দিকে চাই লেনিন, ঐ লেনিন
শক্তি তিনি, পথ চলার গতি
চলেছি তাঁরই সঙ্গী, তাঁরই ব্রতী
আনতে চাই আকাঙ্ক্ষিত দিন।

অনুবাদ : গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

ভিয়েতনামের এই মহান কবির রচনা আমরা ইতিপূর্বেও প্রকাশ করেছি।
—সম্পাদক

দিগম্বরী ছায়া

আবুবকর সিদ্দিক

পথ বটে। হাজার হাজার মানুষের পায়ে চলা পথ। শুধু মানুষ কেন? কুকুর গরু ছাগল মোষ সাইকেল রিক্সা আলতু ফালতু সবার লাথি খাওয়া তোবড়ানো পথ। তবু পদবী আছে। বনেদী টাউনের রোম-ওঠা ল্যাজের মতো। নামেই ধড়াচূড়া। তলায় তালপাতা। খান বাহাদুর রোড। হাজার হাজার পায়ের ঘায়ে বাহাদুরী যা, তা সব ফেরারী। বুকের মাংস খুবলে-খাবলে খান খান। কোনোমতে ভিমি খেতে খেতে খেয়াঘাট পর্যন্ত এসে জিভ ঝুলিয়ে হাঁপায়। ওপারের পানিতে সবুজ কালো ছায়ার হাতছানি দেখে দাপায়।

হাঁ। শহরের বিগতবিত্ত মধ্যবিত্তরা কুচোকাঁচা চাকরি চটকায়। মাসের শেষে রাত জেগে বৌয়ের সঙ্গে জীবনদর্শনের পাঁশ ঘাঁটে। সকালবেলায় সরলাঙ্ক সরল করে ভিতরে ঢুকোতে না পেরে এ্যাণ্ডাপ্যাণ্ডাগুলোর মাথায় রুলকাঠ ভাঙে। সন্ধ্যের পর রেডিওতে আবদুল আলীমের পল্লীগীতি শুনতে শুনতে হৃদয়পিণ্ডে গোঁত্তা খায়—আহা রে! গেরামে কী শান্তি। এপার দাপায় দূরে বসে ওপারের ছায়া দেখে।

—ধুস্ ছাতা! তার চেয়ে একখান খেয়া যদি পাতাম এই রহম।

নদীর মাঝামাঝি এসে রহম ভাবতে ভাবতে প্রায় সাত্ত্বিক হয়ে উঠল। গাঁয়ে কাতরানি কোন্দল। টাউনে শুলতানি গোল। বাঁচি কোথা? বাড়িতে হরেক হাপা। মা কঁকায় সূতিকায়। দেড় বছর দু-বছর অন্তর অন্তর বিয়োতে বিয়োতেও টিকে আছে। বাপের টেঁপাটেঁপির অন্ত নেই। ফাঁক-ফোকর পেলেই রহমের পকেট টেঁপে। পাঁচটা কী দশটা পয়সা খরচ করে টিপেটুপে। কিছু যদি না পায় হাতের কাছে ত রহমের বিয়েয় পাওয়া ট্রানজিস্টার-এর নাক টেঁপে একা একা। বৌটা আরেক কিসিম। কোলের বাচ্চার পালো এ্যারারুট মিশ্রি হরলিক্স চুরি করে গালে পোরে। আর, বাচ্চাগুলোর কথা ত ভাবতেই পারে না রহম। ওদের পানে তাকাতে সাহস হয় না। যেন বিদ্রোহের কালো পতাকা এক-একটা। ভবিষ্যতের বাতাসে

বেআইন বীজাণু ছড়াতে উদ্যত। ভাত-কাপড় লেখা-পড়া বায়না কুকম্মো-অকম্মের ঠেকা দেওয়া—বিয়ে-শাদী দেওয়া—এঃ আল্লা! এর চেয়ে প্লাস্টিক কয়েলে পয়সা কম।

কিন্তু বদ মেয়েমানুষটার ন্যাকামো সতেরো আনা—আমার ক্যামন জানি ব'য় অরে। শফীর মা বালোমানুষ, নিয়া রোগ বাদাইছে।

—ওঃ, এর চেয়ে—এর চেয়ে—লে বাবা! কী এর চেয়ে? কিসে যে রেহাই তা আর মাথায় আসে না। এত সহজে যদি মাথায় আসবে, তাহলে ত রহম আলী এতদিন আর সিনেমার কাউণ্টারে টিকিট বেচার নোকরি করত না।

রোজ রাতে বারোটার পর বড়সায়েব এসে ওর গুণে রাখা টাকাগুলো হাতব্যাগে পুরে নিয়ে যায়। ম্যানেজার কানাইবাবু তার পায়ে ঘোরে লটকে লটকে। বাঁধানো দাঁত বের করে ভক্তিরসের গ্যাঁজা জমায় দুই কষে। বড় সায়েব যাবার পর ফিরে এসে দরজা আঁটে। ফাউ পয়সার বখরায় ঘাপ্টি মারে রহমের কাঁধে হাত রেখে।

রহম আলীর আপন মনের গুলতানিতে বৈঠা মারল ধলা মিয়া। পাশ-কাটানো টাবুরে নাও থেকে হাঁক দিলো—ও রহম বাই! কী বই অতিছে হলে?

—বাঘী সেপাই।

—রূপবান আসতিছে বুলে?

উঃ। চদরীর আউশ কত! মাথায় চুল নাই, বগলে বাবরি। সখ দেখে গা জলে রহমের।

গাঁয়ের মাটিতে নেমে ফের রগ চটে। দুই ছেলে মামদোবাজী করছে খেয়াঘাটে। একটা প্রায় ন্যাঙটা। অন্যটার নাক ছড়ে রক্ত বেরোচ্ছে। খেলা ভঙ্গ দেওয়া ছেলের দল খেয়া ফেলকরা যাত্রী রিক্সাওয়ালা সবাই সহানুভূতি-বশে জায়গাটায় বড় করে ফাঁকা রেখে চারপাশে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। চোদ্দ পুরুষের ডিক্রি পাওয়ার মতো পাছা উঁচিয়ে লাফাচ্ছে। জুয়োড় দিচ্ছে। রাগের মাথায় উর্দু বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। বাঘা সেপাইয়ের কুদরত।

—শালা বান্‌চোত কা বাচ্চা। হারামিকা পয়দা।

ধাবড়া হাতের থাপ্পড় খেয়ে দুই সেপাই কাঁদতে কাঁদতে ঘরমুখো।

তারো চেয়ে জ্বালাশালটু বাদামতলার মোড়ে।

পেঁচীর মা তাকে দেখে বিশ হাত দূর থেকে ঘোমটা ঝুলিয়ে কচুবনে নেমে

গিয়ে দাঁড়াল। নাগালের মধ্যে আসতেই তামাক ঘষা দাঁত নাচিয়ে নথ নাড়িয়ে বলল—অ বাপ রহমান। তোমার শরীলডা সুস্থ অইছে ত ?

ওঃ হো। সেই মাসখানেক আগে দিনচারেক নাক দিয়ে রক্ত পড়া শুরু হয়েছিল। এখনো তার জের। এ সব দরদের মাথায় চোয়াদায় চেপে বসে সজাগ না থাকলে। তাই সাবধানে এককানচি হাসতে হলো রহমকে।

—আমাগো কি আর বিছেনধরা হলি চলে চাচী ? প্যাটের টানে খাড়াও অতি অয়, দোড়োতিও অয়।

কথা বলতে বলতে রহম হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। ফস করে বলে ফেলল পেঁচীর মা—তা কী শোনলাম য্যান—মানে ধুত্তোরি ঐ তোমার—রূপবান নাকি আসতিছে তোমাগো টকীর গরে ?

—রূপবান ? তা তা তুমি চাচী ? ওঃ হয় হয়—তা আসবে ত। আসবে। এই ত সামনের শুক্কুরবার।

—আর বাপ বুড়ো অয়ে আলাম পেরায়। কবে জানি ডাক আসে তেনার তরফথ্যে। পেচীর বাপ ত আগেই গেইছে। সেই বিয়ের বছর সেরাজদ্দৌলোর পালা ছাহাইল সাতে নিয়ে·······

পেঁচীর মা মধ্যিপথে টাটকা দিনের বেলায় সত্যি নাক ফোঁপাতে লাগল।

—কান্দে না চাচী। জীবনের এ্যাট্টা আউশ জানাইছ। ঠ্যাহে কিসি ? যাবা ছ্যামড়িগো সাতে। দেবানি চুহোয়ে।

রূপবান রূপবান রূপবান। গ্রাম টাউন মুল্লুকভর এক রব। ছাও-বুড়ো ভাদ্দুরে কুকুরের মতো খেপে উঠেছে।

ঘরে ফিরে গোসল করে খেতে খেতে বেলা প্রায় পগারপার। বৌটার সারী শরীর। খেপলে অল্পে ফেরে না। ছেলে দুটোকে মারার শোকে রহম আলীর চোখের উপর কুঁদে কুঁদে চিরেট খেয়ে পড়তে লাগল লেঠেলের মতো। অসহ্য হয়ে রহম দুই দাবড়ি কষতেই অমনি লাইন পেয়ে গেল। মাটিতে পড়ে ঘাড় ঘোরাতে ঘোরাতে দাঁতকপাটি ছিরকুটি লাগিয়ে দিল বৌটা। অগত্যা রহম পানি ঢেলে কাদা করে ফেলল উঠোন জামতলা বৌয়ের গা। একটা মাই ভেজাকাপড়ে কাদায় দম মেরে থমথম করছে। বুড়ো বাপজী বারান্দায় বসে কুঁই কুঁই করে তাকাচ্ছে। কোলেরটা এত কাণ্ডেও জাগেনি। লাল মশারির মধ্যে শুয়ে ঘুমের ঘোরে চুক চুক করছে। ছেলে দুটো হিল্লীদিল্লী করে বেড়াচ্ছে। ভাই-বোনগুলো সার দিয়ে দাঁড়িয়ে। বুড়ি মা কুঁতকে কুঁতকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ

বুড়োকে লাগাল ঠ্যাঙানি। আরেক কারবালার বিসমিল্লা। রহম তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে মাথায় তেল ঘষতে লাগল।

খাওয়ার সময় মা পিরিত দেখিয়ে নিজে বসে খাওয়াল। আর সেই ফাঁকে ক্যানক্যান করে লাগিয়ে দিল পাঁচ বছরের শুঁটকি ফুসলোনি—ও আপদ আর কতকাল ঝুলোয়ে রাখবি? ডাক্তার-কবিরেজে তো ঘোড়াও হলো না। এ্যাহন যাগো গলার জেল তারা আ'সে নিয়ে যাক।

বড়লোকের সুন্দরী মেয়ে আনার জন্যে তখন মারই গরজটা বেশি ছিল। তারপর কমলার মৃগীরোগ প্রকাশ হয়ে পড়লে সেই মা উল্টো ফোঁড়ে সুঁই ধরেছেন। শার্টের বোতামের মতো। একটা ছিঁড়লে আরেকটা লাগাও। ম্যাচের কাঠির মতো। একটায় না জ্বলে, আরেকটা ঘষো। আজকালকার সিনেমার কেস্‌সার মতো।

বিকেলের দিকে বদজোড়ার মাথায় টর্চের গাঁট্টা মেরে বই সামনে দিয়ে বসিয়ে বেরিয়ে এলো রহম। আসার সময় বাপ শুয়ে শুয়ে আওয়াজ দিল —বাপ রহম নাকি?

—হ। ক্যান?

—আ'জ নিউজি মোনাম খাঁ কইছে দ্যাশে আর চা'লির অভাব থাকবে না। এক বছরের মধ্যি সব মিটে যাবানে।

—তয় আর কী! ঐ আরামে থাহো।

—ওরে না রে। চা'ল আসতি লাগিছে চীনিরথ্যে।

—থা'ক। আর কিছু কবা?

—এক প্যাক বগা ছিকারেট আনিস।

এর নাম ঘোড়ারোগ। গাঁশুদ্ধ লোক পাইকেরি উপোষ মারছে। গম ভুট্টা চিবিয়ে পায়খানাটুকু দামী ওষুধের ক্যাপসুলের মতো করে এনেছে। ধারকর্জের টানাটানিতে চামড়া ছোলাছুলি চলছে। এরো মধ্যে ওঁর ছিকারেটটি চাই।

আরো কড়া নেশায় বুরবাকের মতো সুখ পেতে আসে সিনেমাদর্শকগুলো। আপিস-সংসার-দোকান-বাজার-পথ-ঘাট সব এক একটা পাগুনাদারের খাটাল। দুঃখের ডাণ্ডা মেরে মেরে জ্যান্ত রাখে। গুঁতো খেয়ে খানিকটে শস্তা স্বস্তি কেনার জন্তে গুঁতোগুঁতি করে এসে ঢোকে বড়সায়েবের রাঙা গুদোমে। হল থেকে বেরিয়ে এসে ফের গুঁতো না খাওয়া অবধি কেউ নাগর, কেউ আদর্শবাদী,

কেউ যোদ্ধা, কেউ বা আওয়ারা। ঐ সব বানানো সুখের লোভে গাঁ থেকেও লোক ছোটে। নতুন ধান বেচা গেরস্ত পয়লা বিয়ের দম্পতি ডুংগা মার্কা কাপ্তান ছেলে। ওপারের সিনেমা হলের গান ভেসে আসে সন্ধ্যের বাতাসে। টাউনের রেস্তোঁরায় ঝকঝকে আলোয় চা মামলেট বিস্কুট। স্কুল-কলেজ ছুটির পর রাস্তা বেয়ে পরিষ্কার মেয়েছেলেগুলোর ঘরে ফেরা। আরো কত কী। কামুকীর চোখের মতো টাউনের মায়া টানতে থাকে গাঁইয়াদের। খান বাহাদুর রোডের কুচো ইঁট ছিটকে ওঠে তাদের পায়ের সাহসে।

খেয়া নৌকোয় বসে মাথা টিপছিল রহম। রগ লাফাচ্ছে দুপুর থেকে। কানাইবাবুর ধাতানি আছে আজ কপালে। শো শুরু হয়ে গেছে এতক্ষণে। মান্নানই সামলে নিয়েছে মনে হয় সাঁঝের ভীড়। অবশ্য লোক নেই এ-বইটায়।

—কী মেয়া? চিনতি পারো? না চাকরীতি ঢুহে ভুলে গেছ? রহম ঘা খেয়ে খানিকক্ষণ বোকার মতো চেয়ে থাকল। তারপর চমকে উঠে লজ্জায় জড়িয়ে বলল—তওবা তওবা। কী যে কন। বালো আছেন ত?

—হ বাই বালোই আছি। বেহেশতের মতন।

রহম উত্তর দিল না। দেশের এখন দুঃসময়। না খেতে পাওয়াটাকে যার যেমন মর্জি রসিয়ে বিষিয়ে ব্যক্ত করছে।

হঠাৎ চোখ-মুখ সুঁচলো করে আরো কোল ঘেঁষে এলো মহব্বত আলী। কানে কানে বলল—দিছি কা'ল রাতি খতম অরে।

—এ্যা?

—হ মেয়া। ওর হাত চেপে ধরে মহব্বত আলী। চোখে কুলটা খুশির খেমটা-খেউড়।

—খবরদার। কবিনে কোনো ব্যাটারে। নমিজুদ্দিরে দিছি ফতে অরে। রামদাও দে কুচোয়ে বস্তায় ভরে দিছি গাংগে ডুবোয়ে। সাথে আধমণী কলস।

রহমের মুখ সেঁটে গেছে।

—তিন পুরুষির শত্তুরতা। নমিজির চাচারে খুন করিল আমার বাপে। নমিজ কোপাইছে আমার ম্যা'ভাইরে। আমি জন্মের শোধ দিয়ে আইছি নমিজরে। আজ এট্টু বা'স্কোপ ভাহতি অবে।

রহম শুধু টের পেল, তাহলে খেয়ানৌকোও নিরাপদ ঠাঁই নয়। বাঁচার

ঠাঁই নেই। এপারে। ওপারে। মধ্যিখানে। না। কোথাও না। মরবে? সে-মুরোদও নেই। বাপ-মা বৌ-বালবাচ্চা—এতগুলোকে নিয়ে মরার আয়োজন করা—সেও ত এক আমীরী খায়েস।

রাত বারোটার আগে বড়সায়েব এলেন। আঙুলের ডগায় মুস্কি কিমাম চাটতে চাটতে। ছিনাল মেয়েদের মতো ঢলাঢলি করে মিশতে লাগলেন সব পাতি কর্মচারীদের সঙ্গে। কেমন একটা অনভ্যস্ত নার্ভাসনেসে ঘেমে উঠল রহম আলী।

সবাইকে ফাণ্টা খাইয়ে আরো বিপন্ন করে তুললেন। তারপর নিপুণ ফায়ারম্যানের মতো এক লহমায় সবাইকে ফাঁদ থেকে ছাড়িয়ে নিলেন।

তাঁর প্রথমা কন্যারত্ন। এম. এ. পাশ করে বেকার বসে দামী গয়নার মতো শোভা বাড়াচ্ছিল পিতৃগৃহের। আজ তার বিয়ের সম্বন্ধ পাকাপাকি হয়ে গেল। ছেলে জুট টেকনলজি পড়তে ডাণ্ডী যাচ্ছে। যাবার আগে বড়লোক বাপের শাঁসাল দান কবুল করে যাচ্ছে। কানাইবাবু খুশিতে ফ্যাঁচ করে কেঁদে দিল মাপসই। বড়সায়েব তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এসেছিল সবার সহযোগিতা চাইতে ওরফে জাঁকটা জানান দিয়ে মন পাতলা করতে।

—আহা! এমন বিনয়গুণ না থাকলে কি আর এত বড়লোক হয়?

—ঠিকই। মিঠে না হলে কড়া হয় কী করে?

হঠাৎ ঠোঁট ফস্কে কথাটা বেরিয়ে গেল রহমের। আর বাড়াবাড়ির সুযোগ না রেখে বাইরে বেরিয়ে এলো।

পথে এসে পা দুটো বেহায়া লোভে ঘুস ঘুস করতে লাগল। যাবে নাকি একটু বড়সায়েবের মেয়ের কাছে? অনেকবারই ত গেছে। নানান অজুহাতে নাসিমা ওকে কাছে এগুবার প্রশ্রয় করে দিয়েছে। কে জানে, রহমের দেওয়া ভ্রূণ বয়ে নিয়ে সে উঠবে কী না বিদেশগামী স্বামীর পাল্কিতে?

শহরের এম. এ. পাশ নাসিমার হাবলা হাবলা বকুনির ছিটেফোঁটা কানের মধ্যে রণ রণ করে ওঠে এখনো—ইস! আপনারা ভিলেজ লাইফ লীড করেন। আপনার উপর খুব জেলাস আমি। জীবনানন্দের রূপসী বাঙলা কী ফাইন!

টাউন থেকে একরাশ গোঁজামিল ভাবনার বোঝায় কুঁজিয়ে ঘরে ফিরল রহম। রাত সাড়ে বারোটার পরে।

খান বাহাদুর রোডের পাশে পাশে ইঁটের স্তূপ। নতুন করে পাকা হবে।

দেড় লাখ টাকার কণ্ট্রাক্ট নিয়েছে তাদের বড়সায়েব হাজী তরীকতুল্লা। লোকে বলছে ভাঙা রাস্তার কপাল খুলল। এবারে একেবারে পাকা রাস্তা, মানে রাজপথ, হয়ে যাবে। হাজী সায়েবের বাস সার্ভিস চলবে। লোকের আর কষ্ট থাকবে না।

রহমের ছেলেপুলেগুলো হাঁটবে পাকা রোডের উপর দিয়ে। ব্যথায় না হাসিতে বোঝা যায় না গোঁফের ডগা চুমড়ে নুয়ে গেল।

পাকা রোড কাঁচা রোড হতে ক বছর আর লাগবে? পাঁচ বছর? সাত বছর? তার বেশি কিছুতেই না। বারকয়েক পাকা বানাবার দায়িত্ব পেলে বাকি মেয়ে দুটোকেও প্রথম জামাইয়ের স্ট্যাণ্ডার্ড মতো পাত্তরের হাতে তুলে দিতে সুবিধে হবে বড় সায়েবের। চাকরীর মালিক বড়সায়েবের কল্যাণচিন্তায় রাস্তা কাবার হয়ে গেল।

ফের সেই খেয়া। ও বেলা যাকে মনে হয়েছিল বাঁচার ঠাঁই। অন্তত দু-পারের কামড়াকামড়ি থেকে। এখন আর কোনো ভিত ঠাহর হলো না সেই ভরসার পাটাতনে বসে।

ভোলাবুগী হালে পেট বাধিয়ে খেয়া বাইছে। সকালে সে-পেটে চিঁড়ে-পানির জাউ কিছু পড়েছে কী না সন্দেহ। হালে শব্দ উঠছে কচাৎ কচাৎ করে। যেন পেটেই শব্দটা হচ্ছে। সে-পেট চোপসানো। ফাঁসানো। হালের সঙ্গে প্যাঁচানো। নেতানো। খোলামেলা নদীর উপর শুকনো খেয়ার কাঠামো আর তার গলায় ভোলাবুগীর হালকামড়ানো শুকনো দেহটা চাঁদের আলোয় জ্বলজ্বল করছে। রহমের বুক ঘুলিয়ে উঠল বমির তাড়নায়।

সন্ধ্যের দিকে এই খেয়ার উপর বসে মহব্বত আলী খুনের খবর জানিয়ে গেছে। বুকের মধ্যে বমি নয়। রক্ত ছলাত ছলাত করছে রহমের। বুকে নয়। নৌকোর গলুইয়ে। ফুটো দিয়ে তেড়ে ওঠা পানি ওলট পালট খাচ্ছে। মহব্বত আলীর রামদাও বেয়ে কত রক্ত ঝরেছে কে জানে?

বেশি বিদ্যের মানুষ নয় বেচারা রহম আলী। আই. এ. পাশ করে অভাবের টানে কলেজ পালিয়ে গো ব্যাক টু ভিলেজ। বেশি জটিল করে বেশিক্ষণ ভাবা তার কুলোয় না।

পাড়ে নেমে সর সর পা চালিয়ে ঘরে ফিরে এলো।

উঠোনে জামগাছের ডালে প্যাঁচা ডাকছিল। হাততালি দিয়ে তাড়িয়ে

দিল সেটাকে। রাতে বৌয়ের মাথা হাতের উপর নিয়ে শুয়ে শুয়ে রহম খোদাতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান দান করছিল। এই একটিই তার বগবগানি নির্বিকারে গেলার মতো একেবারে খাস তালুকের অধীন প্রজা।

—আমাগো কষ্ট কি ঘোচবে না ?

রহম চোখ বুজে কপালে ভাঁজ বসিয়ে বলে—খোদায় মালুম।

—হয়। খোদাই ত রিজিকদেনেওলা।

—খোদা মউতেরো মালিক।

—আচ্ছা। আমাগো দুঃখু দেহে খোদার পরান পোড়ে না ?

—আরে না! খোদার চামড়া পুরু অয়ে গেইছে নালিশ শুনতি শুনতি আর দুঃখু দেখতি দেখতি। সে-চামড়া ভেদ করে এ্যাহন আর পরানডা তামাৎ পৌছায় না কিছু।

—বান্দার জন্যি কি কান্দে না এট্টু? আপন বাচ্চা সব।

—আলো বোগদা। আমাগো খোদা কি বিয়েশাদী অরিছে নাকি হিন্দুগো মতন? বৌ নেই তার ছোয়াল পোয়াল। তার আবার কান্দন চান্দন।

কথা বলতে বলতে রহম ঠ্যাঙ তুলে দিল বৌয়ের গায়ে।

—উঁহু। আর না।

—বা! কেন?

রহমের হাত টেনে নিয়ে বৌ তলপেটের বাঁ-দিকে আবছা একটা ঢিবির উপর রাখল।

—অ! খালি খালি মা'ইয়েপাহী ডাহে বাড়ির পরে। আমার কষ্টের ভাত গাদাবি একধারদে, আরাকধারদে বিয়েতি থাকবি গণ্ডা গণ্ডা। জান পয়মাল খোদা। কান্ধে আর সয় না।

একটা হাই তুলে পাশ ফিরে শুলো বৌ।

নদীর এপাড়ের গাঁয়ে সবুজ হাতছানি জলছবি তার হ্যাংটো স্বরূপে মূর্তিমান হয়ে উঠতে পেরেছে এতক্ষণে। রাত্তিরের রঙ বলতে একে কালো, তার উপর জ্যোছনার আয়নায় দিগম্বরী ছায়া আরো মোক্ষম নিকষ হয়ে উঠেছে।

এস. ওয়াজেদ আলীর সাহিত্যভাবনা

গুরুদাস ভট্টাচার্য

এস. ওয়াজেদ আলীকে বাঙালি (হিন্দু) পাঠক-পাঠিকা চেনেন একটিমাত্র প্রবন্ধের মাধ্যমে। তার নাম: 'ভারতবর্ষ'।

হয়তো তাঁকে স্বজনও মনে করেন। যেহেতু, মুসলমান হয়েও তিনি হিন্দু-ঐতিহ্যের কালজয়িতার ছবি এঁকেছেন। এতদ্দ্বারা শিক্ষিত হিন্দুর অন্তর-নিহিত সুপ্ত সম্প্রদায়-চেতনা পরিতৃপ্ত হয় কিনা অথবা কতোটা হয়—তার বিচার সমাজ-বিজ্ঞানের এলাকাধীন। সে-আলোচনায় আপাতত যাব না।

অন্যপক্ষে, এই একটিমাত্র নিবন্ধ থেকেই জনাব আলীর মানসিকতার স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়—মধ্যযুগীয় সংস্কারমুক্ত একটি পরিপূর্ণ রেনেশাঁস-ব্যক্তিত্ব। আলিগড় ও ইংলণ্ডে শিক্ষিত এই 'মুসলমান' বুদ্ধিজীবীর যাবতীয় রচনার দুটি লক্ষ্য ছিল: (ক) স্ব-সম্প্রদায়কে গতি ও শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করা; (খ) ইসলাম-সংস্কৃতির ইতিহাস-আদর্শ-শিক্ষাকে, তাদের স্বরূপকে, নিজ সম্প্রদায় এবং ভিন্ সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরা। এবং এই দুটি লক্ষ্যেরই কেন্দ্রবিন্দু ছিল: মনুষ্যত্বের অনুশীলন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়-অধ্যুষিত ভারতে আধুনিক সামবায়িক রাষ্ট্রগঠনের আন্দোলন—পত্রিকাধৃত পূর্ববর্তী নিবন্ধে যার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। (এস. ওয়াজেদ আলী এবং ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। 'পরিচয়', মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৭৫।)

রেনেশাঁস-ব্যক্তিত্ব এস. ওয়াজেদ আলী। একদিকে যেমন যুক্তি-বুদ্ধির সমীপ, অন্যদিকে তেমনি আবেগোচিত রোমান্টিক। জীবনাদর্শকে তিনি বোঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে; তাঁর শিল্পাদর্শ রোমান্টিক। উভয় প্রান্তের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া সত্বেও একটা দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। তাই দেখা যায়, তাবৎ রোমান্টিকের মেজাজে যুক্তি-আবেগের নিগূঢ় ভারসাম্য সত্বেও উভয়ের দ্বান্দ্বিক ঘাত-প্রতিঘাত নিরন্তর। কিন্তু আশ্চর্য আলীসাহেবের মানসিক পরিমণ্ডল! বিবিধের সমাহারে যে-সমবায়ভাবনা তাঁর জীবনদর্শনে,

সেই সামবায়িক আলোকে তাঁর রোমান্টিক মেজাজও বিরোধহীন। সব-কিছুই যেন তাঁর কাছে স্বচ্ছ, সহজ, সমন্বিত, অবিরুদ্ধ এবং অনিরুদ্ধ! মন যেন গড়ানে পাথর—কিছুই বাধে না, কিছুতেই বাধে না! রোমান্টিক হৃদয়-অরণ্যে অপ্রত্যাজিত ব্যতিক্রম!

দুই

বাঙলা গদ্যের বিরলগুণ প্রাবন্ধিকদের অন্যতম এস. ওয়াজেদ আলী বাঙলা জানতেন না।

১৯১৫ সালে হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায়ের রুক্ষ ভূমিতে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর আলাপ ও ক্রমে ঘনিষ্ঠতা। শুধু লেখক নন, সম্পাদকও, সুপ্ত প্রতিভা আবিষ্কারে সিদ্ধহস্ত। তিনি আলীসাহেবকে বাঙলা শেখান; 'সবুজপত্র'-এ আত্মপ্রকাশ করে 'অতীতের বোঝা'। বাঙলা গদ্যের এক শক্তিমান শিল্পীর জন্ম হয়।

বলা বাহুল্য, আলীসাহেবের ভাষায় বীরবলী প্রভাব স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু সে-প্রভাবকে আত্মসাৎ করে তিনি নিজস্ব এক ভঙ্গিতে আত্মস্থ হতে পেরেছিলেন। তাঁর গদ্যে বীরবলী প্যারাডক্স স্মিত রূপ পেয়েছে সহজ সারল্যের স্পর্শ-কাতরতায়। স্বচ্ছতা, স্পষ্টতা, পরিমিতি, যাথার্থ্য, যুক্তিময়তা, তথ্যনিষ্ঠা ও ঋজু প্রকাশভঙ্গি তাঁর গদ্যের গুণ-লক্ষণ। বীরবলী ঢঙের একটি রূপান্তরণ-নিদর্শন: "আমি মুসলমান সমাজের বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ। আমি ভারতবাসী বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ। আমি বাঙালী বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ।"

বাক্যগুলি যেমন অনুশীলিত ভাষার, তেমনি একটি সুস্থ সুরুচিসম্মত পরিশীলিত মানসিকতার নির্ভুল প্রমাণপঞ্জী। বস্তুত, ওয়াজেদ আলীর জীবন ও শিল্প প্রসঙ্গে নিজস্ব আদর্শ, বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং তাঁর যাবতীয় রচনাবলী ও তদাশ্রয়ী ভঙ্গী, ভাষারীতি তারই প্রসারিত ব্যক্তরূপ। বীরবল-প্রভাবিত হয়েও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, যা অধিকাংশ বীরবল-শিষ্যে অনুপস্থিত।

ওয়াজেদ আলী জানতেন, তিনি কী চান, আর কী চান না। সুলভ জনপ্রিয়তার স্বগত আদর্শকে তরল বা বিকৃত কোনোদিন করেননি। পণ্ডিত ব্যক্তি তিনি, চিন্তাবিদ ও সমাজসচেতন। কিন্তু তাঁর রচনা পাণ্ডিত্যে

ভারাক্রান্ত নয়। হৃদয়সংবাদে ও মননশীলতায় উজ্জ্বল। তাঁর যাবতীয় ভাবনায় বেদী : মানবতা। একাধিকবার তিনি বলেছেন : "মানুষ সাহিত্যের জন্য নয়, সাহিত্যই মানুষের জন্য। মানুষের মঙ্গলই হবে সাহিত্যের লক্ষ্য।" এই লক্ষ্যে স্থির থেকে "আমি যে মুসলমান সাহিত্যিকের কল্পনা করি, সে এই জীবন্ত dynamic শ্রেণীর মানুষ হবে। সে বর্তমানকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে না....সে হবে গতিশীল জীবনের মূর্ত একটি প্রতীক।" তাই তাঁর সুহৃৎসম্মত সতর্কবাণী : "উচ্চতম আদর্শ এবং শ্রেষ্ঠতম উপকরণের সাহায্যে বিমল আনন্দের পরিবেশনই সাহিত্যিকের কাজ।....সাহিত্যের সাহায্যে উচ্চতর মানুষ গড়ে তুলতে হলে যেসব সংস্কার, যেসব সামাজিক ব্যবস্থা, যেসব পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৎ সাহিত্যের সম্যক বিকাশের প্রতিকূলতা করে, সে-সবের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে, সে-সবের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করতে হবে।"

শেষ উদ্ধৃতির প্রথম বাক্যটি—"সাহিত্যের কাজ আনন্দের পরিবেশন"—অনেকে মেনে নেবেন না, অনেক বিতর্কের ঝড় উঠবে, বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বাতিলও হয়ে যাবে হয়তো বা। কিন্তু, যদি বলি, দ্বিতীয় উক্তি, দীর্ঘ বাক্যটি, লাল কালিতে আণ্ডারলাইন করে রাখার মতো, তাহলে নিশ্চয়ই কেউ আপত্তি করবেন না। কারণ, এর চেয়ে বড় কর্তব্য সাম্প্রতিক বাঙালি সাহিত্যিকদের আর নেই।

তিন

বিশ্বজগৎ এক মহৎ শিল্প, মানুষের সৃষ্টি তারই প্রতিবিম্ব, এবং কবি দ্বিতীয় প্রজাপতি—গ্রীক নন্দনতত্ত্বে, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে, ইসলাম দর্শনে এই ভাববাদী তত্ত্বটিকে নানাভাবে ব্যক্ত ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'শিল্পী আর মহাশিল্পী' নামক ডায়ালগ বা সংলাপিকায় ওয়াজেদ আলী এই তত্ত্ব থেকেই যাত্রা শুরু করেছেন : "অন্তহীন বিশ্ব! শিল্পী তা থেকে রচনা করেছে ক্ষুদ্রতর এক বিশ্ব।" এই দ্বিতীয় ভুবনের একদিকে সীমা, অন্যদিকে অসীমতা—সেই রাবীন্দ্রিক লীলাবাদের বিচ্ছুরিত প্রতিভাস। এর সঙ্গে লেখক যুক্ত করেছেন আরিসততলীয় 'সম্ভাবনাবাদ' এবং আদর্শবাদ : "যা নেই আর যা থাকা উচিত—এর চেয়ে বড় উদ্দেশ্য আর কি?" মহাশিল্পী ও শিল্পী, দুজনেরই লক্ষ্য : "অসুন্দরকে তাড়িয়ে সুন্দর, অবিদ্যাকে বিদায় দিয়ে বিদ্যা, অশ্রেয়সকে ত্যাগ করে শ্রেয়োবোধ।" শিল্পীর প্রেরণা বিস্ময়, আনন্দ, আত্মচেতনা এবং সার্থকতা "সুন্দরের প্রতিষ্ঠায়"

সৃষ্টির আনন্দ, এবং এই সৃষ্টি 'প্রয়োজনাতীত' নয়, বরং "সমস্ত সৃষ্টিই তো প্রয়োজনের অকাট্য প্রমাণ।" এইখানে আলীসাহেব প্রমথ চৌধুরীর 'সাহিত্যিক আত্মলীলাতত্ত্ব' থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। এ-প্রয়োজনের তত্ত্ব তিনি পেয়েছেন ইসলাম দর্শনের কাছ থেকে : "ইন্নাজামানো কাদাস্তাদারা কাহিয়াতা ইউমা খালাকাল্লাহোস্‌সামাওয়াতে ওআল আরদে।"

জীবনের সমস্ত কাজ শেষ করে, সমগ্র আরবভূমিতে নবধর্ম প্রতিষ্ঠিত করে, মক্কায় বিদায় হজের সমাবেশে হজরত মোহাম্মদ বললেন : "আল্লা সৃষ্টির প্রথম দিকে—যেদিন তিনি আকাশ ও পৃথিবী রচনা করেছিলেন, সেদিন—বিশ্বকে যে রূপ দিয়েছিলেন, মহাকাল ঘুরেফিরে সেই রূপেই তাকে ফিরিয়ে এনেছে।" [অন্য একটি ভাষণের উপসংহার :] "সাহিত্যিক যদি বলতে পারে যে, ঐ রূপের একটা ক্ষীণ আভাস আমি দেখতে পেয়েছি, আর আমার কলমের সাহায্যে তাকে রূপায়িত করেছি, তাহলেই তার সাধনা সার্থক হবে।"

এক ভুবন ঈশ্বরের রচনা, দ্বিতীয় ভুবন তারই বিম্ব এই প্রত্যয়ভূমি ওয়াজেদ আলীর শিল্পতত্ত্বের। শিল্পী মহাশিল্পীর সন্তান। দুজনেই সৃষ্টি করেন কল্পনার সাহায্যে, অন্তর দিয়ে। তাই, "মানুষকে বারবার এইসব বাইরের জিনিসকে ছেড়ে নিজের অন্তরে ফিরে যেতে হবে" ('সাধনার লক্ষ্য')। কিন্তু তা বলে বাইরের জগৎকে তিনি অবহেলা করেননি। মানস-প্রতিমার পটভূমিকাও যে প্রয়োজন, সে-বিষয়ে তিনি অবহিত ছিলেন। 'পটভূমিকা' নিবন্ধে স্পষ্টতই বলেছেন, পটভূমিকাবিহীন শিল্পসাধনার প্রয়াস ব্যর্থ : "শিল্পের সাধনা হচ্ছে সুরের সাধনা, ঐক্যের সাধনা। পটভূমির সঙ্গে বিষয়বস্তুর ঐক্য, এই হল চিত্রশিল্পের সাধনা। প্রয়াসের সঙ্গে বেষ্টনীর ঐক্য, এই হল জীবন-শিল্পের সাধনা। ভূমার সঙ্গে আত্মার ঐক্য, এই হল তাপসের সাধনা।" অব্যবহিত-ভাবে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সামঞ্জস্যতত্ত্ব : ভূমির সঙ্গে ভূমার অবিনাযোগ। এই যোগপথেই রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা এবং জীবনদেবতার মরমীয়া অস্তিত্ব। এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থও। তথা রোমান্টিক কবিমাত্রেই।

ওয়াজেদ আলীও একইভাবে অনুভব করেছেন : "প্রকৃতি দেবীই হলেন সবের সেরা শিল্পী—শিল্পীদের রাণী।....আর্টের রাণী, আর্টের মন্ত্রের জন্য তাঁর কাছে যাওয়া ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই।" বস্তুত, তাঁর কাছে প্রকৃতি শিল্পরচনার অনন্য পটভূমিকা। কেবল পটভূমিকা নয়, ভূমিকাও বটে। যেহেতু,

মানব প্রকৃতির সন্তান, জীবনে মাতৃকা-প্রভাব অন্তহীন : "আমাদের শিল্প, আমাদের সাহিত্য, আমাদের ধর্ম, আমাদের সভ্যতা তো এই প্রকৃতিরই দান। আমাদের জীবন তো প্রকৃতিরই অন্যতম শিল্প-প্রয়াস মাত্র" ('জীবনে প্রকৃতির প্রভাব')।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগ প্রাক্-আদিম যুগের। তার সংস্পর্শে আজকের মানবমন সুদূরের এক সৌরভের সাক্ষাৎ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : "এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে" ('ছিন্নপত্র') বা "প্রকৃতি তাহার রূপরস বর্ণগন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে" ('আত্মপরিচয়')। উপলব্ধিটিকে আপন ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন ওয়াজেদ আলী : "সীমাহীন প্রান্তরে মন আপনা থেকেই অসীমের দিকে চলে যায়। অন্তহীন নীলাকাশে কল্পনার তরী যুক্তিতর্কের বহু দূরে এক অনির্বচনীয় অনুভূতির দেশে পৌঁছায়, যেখান থেকে স্বর্গরাজ্যের সোনার তোরণগুলি অতি নিকট বলে মনে হয়" ('পাহাড় ও প্রান্তর') এবং তখন ব্যক্তিহৃদয় নিরাশা-যন্ত্রণা-দুঃস্বপ্ন পেরিয়ে "নিজের কল্পকরোজ্জ্বল খেয়ালের রাজ্যে দিগ্বিজয়ী Alexander এর মতো সদর্পে পদসঞ্চালন করে বেড়াতে থাকে।"

শিল্পসৃষ্টি ব্যাপারে "স্মৃতি সহযোগে চর্বণা"র উল্লেখ করেছেন সংস্কৃত আলঙ্কারিক ; আর করেছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর প্রসিদ্ধ emotion recollected in tranquility-র সূত্রে। যেমন প্রকৃতি-প্রীতিতে, তেমনি স্মৃতি-আশ্রয়ী সৃষ্টি-লীলায় ওয়াজেদ আলী ওয়ার্ডসওয়ার্থ-অনুগামী। তাই তাঁকে বলতে শুনি : "মানুষের জীবনে দু'একটা সোনালী মুহূর্ত আসে, যার স্মৃতি মনের মণিকোঠায় চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকে। কবি এবং সাহিত্যিকদের কারবার হল এই সোনালী মুহূর্তগুলি নিয়ে। দেবসভার এই অমৃত নিয়ে। আমি তাই বলি, সত্যিকার যদি কবি হতে চাও, সত্যিকার যদি সাহিত্যিক হতে চাও, আজীবন তাহলে শিশু হয়েই থাকো" ('স্মৃতির ফসল')। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওয়ার্ডসওয়ার্থ একই কারণে ফেলে-আসা শৈশবের জন্যে আর্ত বিলাপ করেছেন।

কিন্তু শুধু ওয়ার্ডসওয়ার্থ-রবীন্দ্রনাথ নন, ঊনবিংশ-বিংশ শতকের রোমান্টিক

কবি ও শিল্পচেতনার প্রভাবিত স্বাক্ষর আলীসাহেবের তত্ত্বভাবনার ওতঃপ্রোত। সৌন্দর্যকে মাঝখানে রেখে তিনি নিকটাত্মীয় করেছেন জীবন ও শিল্পকে, এবং বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করেছেন: "সবচেয়ে বড় শিল্প হচ্ছে জীবনশিল্প" ('জীবনে শিল্পের স্থান')। অন্যদিকে অনিবার্যভাবে সেই "the true, the good, the beautiful": "সত্য-শিব-সুন্দরের অনুসন্ধানে দুই ভাবুক-প্রাণের একত্র-অভিযানের নামই হচ্ছে বাক্যালাপ। তার সাফল্যের জন্য দরকার ত্যাগ, ধৈর্য, সংযম এবং সহানুভূতি" ('বাক্যালাপ')।

রোমান্টিক 'জীবনদেবতাবাদ' ওয়াজেদ আলীর গদ্যনিবন্ধে লক্ষ্যগোচর। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা ও তন্নিষ্ঠ-জগৎ ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্বদেবতা ও বিশ্বৈক জগতে, আলীসাহেবের অন্তত একটি রচনায় এর কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়—বিপরীতভাবে। রচনাটির নাম 'মসজিদ'। পদকর্তাদের হৃদয়-মন্দির বা বৈষ্ণব সাধকদের "হৃদি-বৃন্দাবন"-এর মতো এখানেও মূল দৃষ্টিটি অধ্যাত্মভাবসিঞ্চিত: "খোদার উপযোগী এক মসজিদ আমিও প্রস্তুত করছি....নিত্য করছি।....আমার এই মসজিদ বিরাজ করে আমার অন্তরে।" তারপরেই যখন তিনি বলেন, "আমার এই মায়ার মসজিদ বিশ্বব্যাপী" এবং "আমার এই যাদুর মসজিদে খোদা আসেন....আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব করি.... আমি তখন আমার ক্ষুদ্র আমিত্ব ছেড়ে বিরাট এক কিছুতে মিশে যাই"; তখন তিনি কুরাণ শরীফের বিশ্বজ্ঞান ও ঈশ্বর-অনুভূতির 'তওহিদ' ভাবই প্রকাশ করেন। কিন্তু তার পরেই যখন তিনি এই জাদুর মসজিদের দেবতাকে ভালোবেসে কামনা করেন: "তিনি কি সশরীরে আবির্ভূত হবেন না? তাঁর প্রণয় লাভ করে আমিও কি পিগম্যালিয়নের মতই ধন্য হব না?"—তখন অধ্যাত্মভাবনায় এসে মেশে শিল্পভাবনা, বিশ্বদেব হন জীবনদেবতা।

কারণ, বাহির আর অন্তর—যে-কোনো মসজিদেই খুদাহ-তালার সশরীরে আবির্ভাব-প্রসঙ্গ ইসলাম ধর্মসাধনার অসম্ভব প্রস্তাব। দ্বিতীয়ত, উক্তিটির মধ্যে সুফীভাবের সৌরভ থাকলেও লেখক তদর্থে সুফী নন। তৃতীয়ত, পিগম্যালিয়ন-কাহিনী কালক্রমে শিল্পতত্ত্বের, শিল্পী ও তাঁর সৃষ্টির বহুমুখী সম্বন্ধের প্রতীক-রূপেই ব্যবহৃত। তাই এ-অনুমান সত্য যে, আলীসাহেব অধ্যাত্মচিন্তা থেকে এসেছেন শিল্পচিন্তায়; এবং বস্তুত উভয়ই তাঁর কাছে নিকটাত্মীয়, পরস্পর-ঘনিষ্ঠ। তাই মুহূর্তপূর্বে যে-মসজিদে খোদার নিরাকার আবির্ভাব কল্পনা করেছেন, পরমুহূর্তে সেখানেই দেখেছেন ভেনাসের ভাস্কর-চিত্রের আরোপন।

বিশ্বদেবতা থেকে জীবনদেবতা থেকে পুনশ্চ বিশ্বদেবতা। এই মিশ্রণ প্রক্রিয়া বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। এই রূপান্তরণ বিষয়ে ওয়াজেদ আলী কতটা ওয়াকিবহাল ছিলেন বা আদৌ ছিলেন কিনা, তা বলা শক্ত।

'সোনার তরী'-'চিত্রা'-য় জীবনদেবতা রবীন্দ্রনাথকে কেবলই নিয়ে গেছেন জানা থেকে অজানায়, রূপকথা থেকে চুপকথায় (কচিৎ জীবনের মাঝখানে)। আলীসাহেবের রূপবতী সুন্দরী জীবনদেবতাও মধুর হেসে বলেন: "আমায় অনুসরণ কর"; আবার, পথের শেষে কল্পনার অলকাপুরীতে এই "সুন্দরীই সেই সিংহাসনে উপবিষ্টা।" 'আবেদন'-এর কবি চেয়েছিলেন: "আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর"; আলীসাহেবের 'ভিক্ষুক'-এর প্রার্থনা: "তোমার রুদ্র মূর্তিটা একবার দেখতে চাই"; এবং অবশেষে: "স্নেহমাখা দৃষ্টিতে আমার দিকে তুমি চাইলে। তোমার কণ্ঠস্বর মধুর সঙ্গীতের মতো আমার কানে ঝংকৃত হতে লাগলো।"

তাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক ওয়াজেদ আলীর মন মুখ্যত যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত প্রাবন্ধিকের। কিন্তু তাঁর মননশীলতা নিরাবেগ ছিল না। পাণ্ডিত্য ও চিন্তাকে তিনি উপস্থিত করেছেন আকর্ষণীয় রস-রীতিতে। উল্লিখিত 'মসজিদ' রচনাতেই লেখকের আবেগান্বিত মননের সুন্দর পরিচয় আছে। এছাড়াও আরও কয়েকটি নিবন্ধ আছে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' গ্রন্থে, যেগুলি শ্রেণী হিসাবে 'রচনাসাহিত্য'। তাঁর বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধগুলি যেমন প্রমথ চৌধুরীকে স্মরণে আনে, তেমনি রম্য রচনাসাহিত্যগুলি রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ'র রসাত্মক নিবন্ধগুলির সজাতি। যেমন: "মানুষের মন এমনইভাবে গঠিত যে সীমার বন্ধনে সে আবদ্ধ থাকতে পারে না। সে মন ক্রমাগত অসীমের দিকে যাবার জন্য ছটফট করতে থাকে"—পঙক্তি দুটি মনোযোগী রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠকের কাছে অত্যন্ত পরিচিত বলে মনে হবে।

আলোচ্য গ্রন্থের 'প্রদীপ ও পতঙ্গ' নিবন্ধের বিষয় ও ভঙ্গী বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর অনুসারী হলেও মূল সুরটি রবীন্দ্রনাথের 'পাগল' রচনার অনুগামী। জীবনে জনতা আছে, নির্জনতাও আছে; জনসমুদ্রে আছে আনন্দ, জনহীনতায় হয়তো শুধুই যন্ত্রণা; তবু, একাকিত্বেরও প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে, তারও আছে অন্তহীন জীবনসাধনা। এই ভাব নিয়ে লেখা 'এভারেস্ট পর্বতের কথা': "নিজে নির্জনে জীবন কাটাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের জীবনকে আনন্দময়, ক্রীড়াময় করে তুলেছি

হয়তো রবীন্দ্র-প্রভাবেই, ওয়াজেদ আলীরও জীবন-দর্শন : চলনমন্ত্র। এ-বিষয়ে তাঁর একাধিক সুন্দর রচনা আছে। 'বাংলার প্রকৃতি' নিবন্ধে তিনি বলেছেন : "ছেলেবেলা থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে নদী কিংবা রাস্তা এ-দুটোর একটাকে আমি খুঁজেছি।" এই খোঁজার মধ্যে যেমন তাঁর সৌন্দর্য-পিপাসু মনের পরিচয় আছে, তেমনি আছে দার্শনিক ভাবনারও স্বাক্ষর। ফলে, এই ভাব নিয়ে লেখা নিবন্ধগুলি একই সঙ্গে কবিত্ব ও চিন্তাশীলতায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। যথা, 'নদী' : "বল দেখি গঙ্গে! প্রিয় সম্মেলনে কি তোমার প্রাণের আশা মিটবে? যার জন্য পাহাড় পর্বত নগর প্রান্তর অতিক্রম করে এই সুদূর দেশে এসেছ, তাকে দেখে কি তুমি শান্তি পাবে? না, আবার সেই বিপদসংকুল, আবেগ-উদ্বেগভরা কর্মক্ষেত্রে ফেরবার জন্য অন্তর তোমার কেঁদে উঠবে?" নদী জানে : মিলনে "উদ্যমহীন নিশ্চেষ্টতা", বিচ্ছেদে "উদ্দাম কর্মঠ জীবন"; তাইতো সে মেঘ হয়ে আবার ফিরে যায় উৎসমূলে, পুনশ্চ ছুটে আসে সমুদ্রের অভিসারে। আর লেখক? তিনিও নিত্যপথিক : "গঙ্গে! তোমার প্রাণ ঠিক আমারই মতো।" (তুলনীয় : জগদীশচন্দ্রের 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে')।

পরবর্তী রচনাটি 'সমুদ্র', যে-সমুদ্র দেশী-বিদেশী রোমাণ্টিক কবিদের মানসে নব নব ছন্দ ও ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। আরম্ভ রাবীন্দ্রিক রীতিতে, বক্তব্য স্বকীয় : "জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর, গতির সঙ্গে জড়তার, স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে অন্ধ সংস্কারের যে বিরামহীন দ্বন্দ্ব প্রকৃতির অন্তরতম সত্য, তার অভিব্যক্তি যেমন এই সমুদ্র আর বেলাভূমির অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্বের মধ্যে দেখতে পাই, তেমনটি কি প্রকৃতিতে, কি আর্টে আর কোথাও দেখি নি।" পুনরায় উদ্ধৃত করি "গতির সঙ্গে জড়তার, স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে অন্ধ সংস্কারের যে বিরামহীন দ্বন্দ্ব" : ধর্মবিশ্বাসী লেখক, তবু অন্ধ সংস্কার নয়, স্বাধীন চিন্তার উপাসক। এইখানেই তাঁর আধুনিকতা।

উল্লিখিত নিবন্ধগুলির প্রকাশভঙ্গীও লক্ষণীয়—কিছুটা নাটকীয়, কিছুটা কাব্যিক, কিছুটা প্রাবন্ধিক, সব মিলিয়ে ব্যক্তিসাক্ষিক রম্যরচনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। একই ভাববস্তু অবলম্বনে আরও কয়েকটি রচনা এ-বইয়ে আছে, রূপকধর্মী কাহিনীর আকৃতি-প্রকৃতিতে। যেমন, 'চলার শেষ' : গভীর অরণ্যে অতুলনীয় রূপবতী এক নারী; মুগ্ধ লেখক তাঁকে অনুসরণ করে চলতে লাগলেন বিচিত্র লোক পেরিয়ে পেরিয়ে, যার শেষ বিন্দুতে শিল্পী-কামনার মোক্ষধাম অলকা; কিন্তু সে-অলকা বহুৎ দূর অস্ত্। আপাতত "অন্তরীক্ষ অতিক্রম করে আমি

সুন্দরীর অনুসরণ করে চললুম।" অন্যত্র, 'ভিক্ষুক'-এও এই চলার কথা প্রেম ও সৌন্দর্যের সন্ধানে, এবং সেখানেও সেই অনির্বচনীয়া সুন্দরী।

গতিশীল জীবন তথা 'চরৈবেতি' তত্ত্ব উপনিষদের; নিত্য চলমান কাফেলার স্মৃতি-অনুষঙ্গ ইসলামী ঐতিহ্যেও। এবং খ্রীষ্টান ভাবনায়ও। পাশাপাশি তিন কবির তিন শ্লোক রাখছি। মহম্মদ ইকবালের 'তারানায়ে মিল্লাত':

"ইকবালকে তারানা / বাঙ্গে দরা হঁ্যয় গোয়া;
হোতা হয় জাদা পায়মা / ফের কারওয়ান হামারা।"
[ইকবালের এই গান—নতুন করে জয়যাত্রার আহ্বান। আমাদের কাফেলা এবার নতুন করে চলতে শুরু করুক।]

টি. এস. এলিঅটের 'জার্নি অফ দ্য ম্যাজাই':

"Then we came to a tavern with vine-leaves over the lintel,
But there was no information and so we continued."
["পৌছলেম সরাবখানায়, তার কপাটের মাথায় আঙ্গুরলতা।
কোনো খবরই মিলল না সেখানে,
চললেম আরও আগে।" (রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ)]

রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যা ও প্রভাত':

"ওরা পান্থশালা থেকে বেরিয়ে পড়েছে। ওরা পূবের দিকে মুখ করে চলেছে। ওদের কপালে লেগেছে সকালের সোনালী আলো। ওদের জন্যে পথের ধারের জানলায় জানলায় কালো চোখের করুণ কামনা অনিমেষ চেয়ে আছে। রাস্তা ওদের সামনে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি মেলে ধরল। বলল—এই পান্থশালা আর পথ আর থামা আর চলা।"

'একটি স্বপ্ন' রূপক রচনায় নতুন রীতি ও রসে পরিবেশিত। রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যা ও প্রভাত'-এ একদল যখন "বেরিয়ে পড়েছে", আর-একদল তখন "পান্থশালার আঙিনায় কাঁথা বিছিয়েছে"; এবং এলিঅটের 'তীর্থযাত্রী'তে: "যেতে যেতে সন্ধে হল; সময় পেরিয়ে যায় যায়, তখন খুঁজে পেলাম জায়গাটা।" আলীসাহেবের 'একটি স্বপ্ন'-এ: "একদল সেই সরাইখানাতেই রয়ে গেল। অবশিষ্ট আমরা সকলে আবার পথ চলতে লাগলুম।" এমনিভাবে চলতে চলতে আর দলছুট হতে হতে একলা অবশেষে "মণিমুক্তা-রচিত প্রাসাদ-তোরণের সামনে এসে উপস্থিত হলুম।" লেখাটির আর-একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: কাফেলা এক-এক 'মনজেল' বা স্তর পেরোচ্ছে, আর

লেখক বলছেন : "না, না, ও-রকম করলে চলবে না। চলবার সংকল্প যখন করেছি, তখন চলাই যাক।" এই এক বাক্য, বারবার (অন্তত ছ-বার) ঘুরে ঘুরে এসেছে ধ্রুপদী গানের প্রারম্ভিক ধ্রুবপদের মতো : "না, না, ও-রকম করলে চলবে না। চলবার সংকল্প যখন করেছি, তখন চলাই যাক।"

"I need only a corridor"—একথা তো আধুনিক কবির।

ওয়াজেদ আলী যখন 'বাদলের দিন' প্রবল ধারাবর্ষণে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন, মিলন নয় বিরহের ব্যাকুলতায় সীমাহীন আনন্দ পান, তখন অনুভব করি : তিনি পরিপূর্ণহৃদয় এক রোমান্টিক কবি। কিন্তু কল্পনাকে করতলগত করার অনিন্দ্য বাসনায় যখন তিনি বলে ওঠেন : "আমি নদীতীরের একটি বারান্দা চাই"—এই আশ্চর্য বারান্দা প্রসঙ্গে তখন স্বতই আমাদের মনে আসে, আধুনিক কোনো কবির পঙক্তি।

'একটি স্বপ্ন'-এ গদ্য-কবিতার বিশিষ্ট অবয়ব-নির্মাণ এবং রিফ্রেনের মতো একই বাক্যের পুনঃপুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করার মতো। টি. এস. এলিঅট বা আধুনিক কোনো কোনো কবির কাব্যকলারও তা leit motif। ওয়াজেদ আলীর বুদ্ধি-জীবিত বাসনালোকের কেন্দ্রে স্থিত উদারচরিত কবি-মানুষটিকে চিনে নিতে আর দেরি হয় না। বুঝতে পারি রোমান্টিকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হলেও দৃষ্টি তাঁর আধুনিকতার নয়া সীমান্তে প্রসারিত।

পুস্তক-পরিচয়

রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ডঃ শিশিরকুমার মিত্র। সারস্বত লাইব্রেরী। তিন টাকা।

উনবিংশ শতাব্দীতে একদিকে যেমন সমাজসংস্কার, ধর্মান্দোলন ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে, তেমনই সেই সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, অতীতের ভাষা ও সাহিত্যবিচার এবং ইতিহাসবোধ ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করতে থাকে। কোনো সন্দেহ নেই প্রথম ধারাটি যে-পরিমাণে সরব ও বহু প্রচারিত, শেষোক্ত ধারাটি তার তুলনায় অনেক নিঃশব্দ ও অদৃশ্যভাবে কাজ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর যে-নবজাগরণ সম্বন্ধে বাঙালি মাত্রেই কিছুটা গৌরববোধ করে থাকেন, তার মধ্যে জ্ঞানানুশীলনের নবজন্মকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অথচ শতাব্দীর ব্যবধানে হিসাবের খাতায় জমা-খরচ মেলাতে গিয়ে দেখি, অনেক আস্ফালন-বক্তৃতা ও আন্দোলনের চেয়ে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে গেছেন সেই লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধনারত মুষ্টিমেয় কয়েকজন জ্ঞানব্রতী, যাঁদের প্রাথমিক চেষ্টা-যত্ন সাধনা-অনুশীলনের ফলে ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস আজ আমরা জানতে পেরেছি—যে-ইতিহাস অনেক সময়েই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যকারণ ব্যাখ্যায় তাৎপর্যপূর্ণ। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবিদ্যাচর্চায় ভারতীয়দের মধ্যে পথিকৃৎ হলেন এক বাঙালি—তাঁর নাম রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১)। আরও কিছু পরে ভারতবিদ্যাচর্চায় বাঙালিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রামদাস সেন (১৮৪৫-৮৭), প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃত্যু ১৯০০), রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-৮৬) এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)। এঁদের অধিকাংশের রচনাবলী বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি ভ্রান্তিপ্রমাদসঙ্কুল ক্ষুদ্র জীবনীগ্রন্থ আছে—অন্যদের পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ এখনো লেখা হয়নি ; এঁদের রচনাবলীর পর্যালোচনা তো শুরুই হয়নি। এ-অবস্থায় উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য, 'হিউম্যানিজম' শব্দটির যথার্থ তাৎপর্যও ফলে অপরিজ্ঞাত।

ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র' গ্রন্থটি তাই বহুপ্রত্যাশিত। রাজেন্দ্রলালের জীবনী ও রচনাবলীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় না থাকলেও

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রাজেন্দ্রলালের উদ্দেশে যে-শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন, তা থেকে অন্তত তাঁর নামের সঙ্গে সকলেই পরিচিত। বাঙলা সাহিত্যের ছাত্র হয়তো সেই সঙ্গে আরো জানেন, রাজেন্দ্রলাল 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকা সম্পাদনাকালে বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যের সূত্রপাত করেন এবং রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতা, নাটক ও নৃত্যনাট্যের উৎস রাজেন্দ্রলালের *'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal'* গ্রন্থখানি। কিন্তু রাজেন্দ্রলালের সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের আলোচনায়, কয়েকটি বিশেষ অধ্যায়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস প্রণয়নে এবং সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা ও অনুবাদকর্মে।

ডঃ মিত্র তাঁর গ্রন্থে কয়েকটি পরিচ্ছেদে রাজেন্দ্রলালের জীবনকথা, গবেষণাকর্ম, গ্রন্থপঞ্জী রচনা, গ্রন্থ সম্পাদনা, ঐতিহাসিক বিষয়ে রচনা, বাঙলা সাহিত্য চর্চা, গবেষণা পদ্ধতি এবং সমসাময়িক যুগে ও পরবর্তীকালে রাজেন্দ্রলালের প্রভাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করেছেন। ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন, ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত একটি সর্বভারতীয় পাঠচক্রে *Historians and Historiography in Modern India* পর্যায়ে তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও তাঁর ইতিহাসচর্চার প্রণালী নিয়ে আলোচনা করেন। বলা বাহুল্য রাজেন্দ্রলালের "চল্লিশ বর্ষব্যাপী সাধনার মূল্যায়ন সহজ নয়, তথাপি ঐ পাঠচক্রের সীমিত পরিবেশে তাঁর গবেষণা প্রণালীর বৈশিষ্ট্যগুলি যথাশক্তি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা" করেছেন। সেই ইংরেজী প্রবন্ধটির বাঙলা অনুবাদ থেকে বর্তমান গ্রন্থটির জন্ম। বক্তৃতার উদ্দেশ্যে লেখা, ফলে প্রবন্ধের আকার সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য, কিন্তু মাত্র পঁচিশ পৃষ্ঠার মধ্যে রাজেন্দ্রলালের জীবন এবং তাঁর সকল জাতীয় রচনার পরিচয় দিতে যাওয়ার ফলে রচনা কিছুটা আংশিকতাদুষ্ট হতে বাধ্য। লেখকের কাছে আমরা বর্তমান পুস্তিকাটির জন্য কৃতজ্ঞ, কিন্তু আরো খুশী হতুম যদি তিনি পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ রচনার অবকাশ পেতেন। ভারতবিদ্যাচর্চার ইতিহাস পর্যালোচনায় লেখকের যোগ্যতা সন্দেহাতীত; তাঁর কাছ থেকে ভবিষ্যতে রাজেন্দ্রলাল এবং অন্যান্য ভারতবিদ্যা-সাধকদের গবেষণা পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু শুনতে পাব প্রত্যাশা রাখি।

অল্প কথায় সংযত পরিচ্ছন্ন ভাষায় রাজেন্দ্রলালের প্রাথমিক পরিচয় পাঠকের কাছে উপস্থিত করার কাজে ডঃ মিত্র সফল হয়েছেন। গ্রন্থটির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ রাজেন্দ্রলালের 'গবেষণা পদ্ধতি' এবং 'সমসাময়িক ও পরবর্তী

কালে রাজেন্দ্রলালের প্রভাব'। রাজেন্দ্রলাল সমগ্র জীবন ইতিহাসচর্চা করলেও কেন ভারতবর্ষের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখেননি, তার কারণ লেখক ঠিকই ধরেছেন, "আঞ্চলিক ইতিহাসের সুষ্ঠু রচনা ব্যতীত ভারতীয় কৃষ্টির এ ধরণের সামগ্রিক ইতিহাস প্রণয়নের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। দেশের ঐ সব আঞ্চলিক ইতিহাসের গবেষণালব্ধ ফলগুলি যথাযথ সন্নিবেশিত ও গ্রথিত করেই সমগ্র ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা সার্থক করা সম্ভব। রাজেন্দ্রলালের ইতিহাসচেতনা একটি বিস্তৃত পটভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।"

কিন্তু ডঃ মিত্র রাজেন্দ্রলালের সামাজিক ইতিহাস রচনা-প্রচেষ্টার বৈশিষ্ট্য বা পদ্ধতির উপর তেমন জোর দেননি। *'Indo Aryans'* গ্রন্থটি সম্বন্ধে আলোচনাও অসম্পূর্ণ। রাজেন্দ্রলালের বিখ্যাত রচনা *'Beef in ancient India'* পরবর্তীকালে একাধিকবার পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য, সম্প্রতি মনীষা গ্রন্থালয় প্রকাশিত স্বামী ভূমানন্দের ভূমিকা সম্বলিত সংস্করণ, ১৯৬৭)। ডঃ মিত্র প্রবন্ধটিকে কেন 'প্রাচীন ভারতে নিষিদ্ধ মাংস' নামে অভিহিত করেছেন বোঝা গেল না। গোমাংস যে প্রাচীন ভারতবর্ষে 'নিষিদ্ধ' ছিল না, রাজেন্দ্রলাল তাই তথ্যপ্রমাণ সহযোগে দেখিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক বিরোধের পটভূমিকায় বর্তমানে প্রবন্ধটির গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যদিকে, সম্প্রতিকালে পরিভাষা সংক্রান্ত বিতর্ক ও বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পটভূমিতে রাজেন্দ্রলালের আর-একটি পুস্তিকার তাৎপর্য নিতান্ত কম নয়—*'A Scheme for the rendering of European Scientific Terms into the Vernaculars of India'* (১৮৭৭)। ডঃ মিত্র রচনাটি নিয়ে কোথাও আলোচনা তো করেনইনি, এমন কি গ্রন্থপঞ্জীতে পর্যন্ত পুস্তিকাটিকে স্থান দেননি।

মাত্র পঁচিশ পৃষ্ঠার আলোচনাগ্রন্থে বহু প্রসঙ্গ অনুল্লেখিত থাকার কারণ হয়তো বোঝা যায়, কিন্তু এই অল্প কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে এতগুলি তথ্যগত ভ্রমপ্রমাদের কোনো কারণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বিশেষত লেখক নিজে যেখানে এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত এবং ঐতিহাসিকদের পাঠচক্রে প্রবন্ধটি পাঠ করেছেন। গ্রন্থটির শেষে প্রদত্ত রাজেন্দ্রলালের জীবনীপঞ্জী, বংশলতিকা, গ্রন্থপঞ্জী অংশে অসম্পূর্ণতা ছাড়াও অজস্র ভুল চোখে পড়ল। ছাপার ভুলও অসংখ্য। যেমন *'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal'* গ্রন্থের মধ্যে লেখক যে সাল-তারিখ ব্যবহার করেছেন, তার সঙ্গে 'ঘটনাপঞ্জী' ও 'গ্রন্থপঞ্জী'র তারিখ মিলছে না; যেমন রাজেন্দ্রলাল *LL. D.* উপাধি লাভ

করেন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে বলা হয়েছে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ; গ্রন্থপঞ্জীতে 'ললিত বিস্তর' গ্রন্থের সম্পাদিত সংস্করণের তারিখ ১৮৭৭, গ্রন্থের মধ্যে ১৮৫৩, অথচ প্রকৃত তারিখ ১৮৮১-৮৬ ; *'Antiquities of Orissa'* দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ-সাল ১৮৮০, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে দেখি ১৮৮৮ ; 'অষ্টসহস্রিকা'র প্রকাশ সাল গ্রন্থের মধ্যে ১৮৮৮, গ্রন্থপঞ্জীতে ১৮৮৬। অবশ্য খণ্ডাকারে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হওয়ায় লেখক অনেক সময় প্রথম খণ্ড বা অধ্যায়ের তারিখ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' (১৮৫৩ নয়, ১৮৫৪), 'অগ্নিপুরাণ' (১৮৭৩-৭৪ নয়, ১ম খণ্ড ১৮৭৩, ২য় ১৮৭৬, ৩য় ১৮৭৮), 'বায়ু পুরাণ' (১৮৮৬ নয়, ১ম খণ্ড ১৮৮০, ২য় ১৮৮৮) প্রভৃতি সবগুলি গ্রন্থের ক্ষেত্রেই সাল-তারিখ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। 'সম্পাদিত গ্রন্থাবলী'র মধ্যে *'Lalit Vistara, with an English translation'* নাম দেওয়া হয়েছে, আবার 'ইংরেজী গ্রন্থসমূহ'র তালিকার মধ্যেও *'English translation of Lalita Vistara'*-র উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী গ্রন্থ হিসাবে *'An Introduction to the Lalita Vistara'*-র নাম থাকা প্রয়োজন, যেটি অনুবাদ থেকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ, প্রকাশ সাল ১৮৭৭। 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকার প্রকাশ-সাল ১৮৬২ নয়, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস। এসিয়াটিক সোসাইটির শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত ইতিহাসের প্রকাশ সাল ১৮৮৫ নয়, ১৮৮৪। ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির মধ্যে তথ্যের ভুল এত বেশি যে তার দীর্ঘতর তালিকা প্রণয়ন ক্লান্তিকর ও নিরর্থক, কিন্তু ঐতিহাসিক রচিত ঐতিহাসিকের জীবনচরিতের যদি এই দশা হয়, তাহলে সাধারণ পাঠক কিছুটা বিমূঢ় বোধ করতে বাধ্য। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে লেখক তথ্যাদি সঙ্কলনে যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

অলোক রায়

সাক্ষ্য। যজ্ঞেশ্বর রায়। প্রান্তিক। পাঁচ টাকা
দশটি গল্প। শেখর বসু। এই দশক। তিন টাকা
রাতের সূর্যমুর্তি। সুনীল দাশ। মানস প্রকাশনী। আড়াই টাকা

আমরা যখন সত্তরের দশকে সংঘর্ষসঙ্কুল ইতিহাসের একটা সম্ভাবনাময় অবস্থায় এসেছি, তখন ভরসা হয় সাহিত্যে মানবসভ্যতার অস্তিবাচক বক্তব্য ক্রমশ সোচ্চার হবে। ফলে, আমাদের এ-সময়ের উপন্যাসে গল্পে সমাজমানসের

বাঁচার দাবি—খাওয়া-পরা, টিকে থাকা, এক কথায় অস্তিত্ব রক্ষার তরতাজা সমস্যা ও জিজ্ঞাসার, মন ও মননের প্রতিফলন—আমরা প্রত্যাশা করে থাকি। এ-কালের একখানা উপন্যাস বা গল্পগ্রন্থে সমাজমানসকে পেতেই হবে—যেভাবেই হোক, হয় ভীড়ে না হয় একক ব্যক্তিত্বে, কি প্রত্যাশায় কি হতাশায়। সুতরাং প্রাত্যহিকতার পথে আমার এবং পারিপার্শ্বিকের পরিচিত পৃথিবীই তার ভিত্তি। ("The novel gives a familiar relation of such things as pass everyday before our eyes such as may happen to our friend or to our selves") এ-যুগের মানুষ তার বৈচিত্র্য অথবা বৈচিত্র্য-হীনতা নিয়ে, তার কর্ম বা সংগ্রাম নিয়ে, মন বা মনন নিয়ে স্বক্ষেত্রে স্বকীয় নিশ্চয়ই, কিন্তু সত্যিই কি সে আমাদের যথার্থ অপরিচিত? কতক্ষণ সে আমাদের দেখার বা অনুভবের বাইরে থাকতে পারে? অন্তত লেখক আমাদের তন্ময় করে তুলবেনই—তাঁর শব্দের জগৎ আমাদের দেখার ও অনুভবের জগৎ হয়ে উঠবেই। ("My task which I am trying to achieve is, by the power of written word, to make you hear, to make you feel —it is, before all, to make you see...")

এ-সব কথা সত্য বা কথঞ্চিৎ সত্য হলেই 'সান্তনু' উপন্যাসের ভূমিকা-লিপির একটা অর্থ থাকে—"সান্তনু এমন একজন নায়ক, যে আমাদের প্রতিদিনকার এই বিস্বাদ বিবর্ণ পৃথিবীর মানুষ নয়, যার জীবনের ঘটনাপঞ্জী বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে কিছুতে মেলানো যায় না।" সান্তনু না হতে পারে আমাদের প্রতিদিনকার এই বিস্বাদ (কেবল বিস্বাদ কেন?) অথবা বৈচিত্র্যহীন (কেবল বৈচিত্র্যহীনই বা কেন?) দৈনন্দিন জীবনের একজন, হতে পারে সে একক, অনন্য; তবুও তার কথা যখন উপন্যাসে পড়ব, পড়া শেষ করব, তখন সে আর আমাদের অপরিচিত নয়—আমাদেরই একজন—কোনো না কোনো ভাবে—কাজে, ভাবনায় বা সম্ভাবনায়। 'সান্তনু' উপন্যাস 'সেক্সী' কি 'ডিভাইন' (প্রকাশকের নিবেদন) এ-সব প্রশ্ন পূর্বাহ্নে বড় করে তোলার কোনো সার্থকতা দেখি না। বরং তাতে সন্দেহ আরও বেড়ে যেতে পারে যে, যে-মানুষটা আমাদের প্রতিদিনকার পৃথিবীর কেউ নয়, অথচ ইন্দ্রিয় বা অতীন্দ্রিয় জগতে যার ঘোরাফেরা—তাকে সত্যি সত্যিই আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যৌবনাগমের অপসঙ্গতির উপর সান্তনুকে আমরা প্রথম দেখতে পাই। সে-সান্তনু তো আমাদের অচেনা ছিল না।

এ্যাডোলেসেন্সের কৌতূহল এবং বেদনা, অভিজ্ঞতা এবং রহস্যবোধে সে আমাদের অনেকেরই অতীত এবং বর্তমান। কিন্তু তারপর সান্তনুকে নিয়ে লেখকের যে-অভিযান—একের পর-এক রমণ-মিলনের ঘটনাবলী—তা অবিশ্বাস্য এবং আমাদের প্রতিদিনকার পৃথিবীর সঙ্গে তাকে মেলানো যায় না। আর যায় না বলেই সান্তনু শেষপর্যন্ত আমাদের সঙ্গে একাত্মতা (familiar relation) স্থাপন করতে সমর্থ হয়নি। শ্লীলতা-অশ্লীলতার তথাকথিত প্রশ্ন তুলতে চাই না, বিষয়ের বা শিল্পের দাবি থাকলে যৌন মিলনের দৃশ্যও আসতে পারে; কিন্তু জগৎ-সংসারের সর্বপ্রকার স্বাভাবিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুনঃপুন হেন মিলনের ব্যাপারগুলো যেমন একঘেয়ে তেমনি বিরক্তকর। লেখক অবশ্য পূর্বেই বলে নিয়েছেন "আমাদের প্রতিদিনকার এই বিস্বাদ বিবর্ণ পৃথিবীর 'মানুষ নয়'" সান্তনু। জানি না কেন আমাদের এই পৃথিবী কেবল বিবর্ণ বা বিস্বাদ। পৃথিবী সম্বন্ধে এমত ধারণা হলে সেখানে উপন্যাস কিভাবে সম্ভব? ("I should almost go so far as to say that without the concept of a normal society the novel is impossible.")

উপন্যাসের পাশাপাশি গল্প, এ-যুগের দুই অপ্রতিহত শিল্প-রূপ। অপ্রতিহত কিন্তু পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং পরিপূরক। ব্যক্তি বা সমাজমানসের একক ভাবনার যেসব ক্ষেত্রে উপন্যাস প্রবেশের পথ পায় না, ছোটগল্প সেখানে অনায়াসে তার পথ করে নেয়। প্রতিটি অণু-পরিমাণ কর্ম বা চিন্তা, ঘটনা বা মুহূর্তও তার বিষয়বস্তু হতে পারে। সে-বিচারে শেখর বসুর রচনাগুলিও গল্প নিশ্চয়ই, যদিও আকারে প্রকারে অভিনব, আমাদের সাধারণ পরিচিত গল্প-ঐতিহ্যে স্থাপিত নয়। ঘটনা বা কাহিনী এখানে নামমাত্র, চরিত্র আছে কি নেই, বিষয়বস্তু ধূসর এবং অস্পষ্ট। তবুও সেগুলি গল্প। মুহূর্তের ভাবনার ফসল 'দশটি গল্প'। আর শিল্প-ভাবনায় শেখর বসু অতি মাত্রায় সাবজেকটিভ হওয়ায় গল্পগুলি অনেকাংশে ব্যক্তিগত রচনার লক্ষণাক্রান্ত। আমাদের চারপাশের বস্তুপুঞ্জও তাঁর রচনায় সাধারণ চেহারায় থাকেনি। ঘরকে ঘর বলে বা মেঝেকে মেঝে বলে চেনা যায় না। "ঘরটা কি রকম যেন! চার পাশের দেওয়াল কোথায়" ইত্যাদি বাক্য দিয়ে 'দশটি গল্প'র প্রথমটা শুরু, এবং শেষ গল্পের এই ভাবে শেষ...."শুধু এই উষ্ণতা, বুক থেকে গলায়, গলার কাছে, শুকনো জিবে, কপালের দু'পাশের শিরায়, চোখের মণিতে—।" এমনিভাবে সর্বত্র একটা

অস্পষ্ট ধূসর রহস্যবোধ। চরিত্র আসতে আসতে মিলিয়ে যায়, মুহূর্তও জট পাকিয়ে যায় অন্যতর মুহূর্ত-ভাবনায়। বাক্যগঠনেও তিনি নিয়ম ভাঙেন, সিকোয়েন্স মানেন না। যেমন "তক্ষুণি, আমি যে এতকাল ধরে তার খোঁজ করছি, এবার তাহলে, দেখা হলে বলব, লোকটার ও-রকম বিশ্রী চেহারা না হলে কাঁধে হাত দিয়ে—মশাই আপনার হৃদয়, অথচ, প্রচণ্ড খুশীতে টেবিলে ঘুসি লাগাতেই টেবিলের চাইতেও ঠাণ্ডা কর্কশ গলায়

—তাড়াতাড়ি করুন।" ('অথচ')

অভ্যস্ত না হলে ছাপার ভুল আছে মনে হতে পারে। আসলে শেখর বসু ইচ্ছা করেই এ-সব নিয়ম ভেঙেছেন। হয়তো তিনি দেখাতে চান আমাদের মনে কোনো কিছুই ক্রম-পর্যায়ে আসে না। চিন্তা-ভাবনার মেশিনটা বড়ই অস্থির, হঠকারী। এবং সেইজন্য গল্পের গঠন-রীতিতেও তিনি অতি মাত্রায় তির্যক। কোনো ঘটনা, চরিত্র বা পরিবেশকেই স্ব-স্ব দাবিতে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে দেননি তিনি। একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য শেখর বসুর ছোটগল্পে দেখা যায়। গল্পের গত্যরূপে তিনি গীতিকবিতার মন্ময় অন্তর্লীন ভাবকল্পনা বেশ দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর 'দশটি গল্প' এই হেতু বিশিষ্ট, বিশিষ্ট এবং সীমিত। সীমিত এইজন্য যে, এই জাতীয় গল্পের আস্বাদন আবছায়া এবং দুরাশ্রয়ী হয়ে পড়বেই। কবিতার বিষয় হলে যা অবলম্বন হতে পারত, গল্পের বিষয় হয়ে তা নিরালম্ব হয়ে পড়ছে। কবিতা-গল্পে মিলন-সেতু? খুবই সম্ভব। আমাদের দেশেও বলতে গেলে গল্পের উদ্ভবকাল থেকেই আছে। কিন্তু তা প্রায়শ প্রকাশরীতিতে, বিষয়বস্তুতে ক্বচিৎ; সুতরাং সার্থক গল্পকার ঐ বিপজ্জনক ঝোঁক সম্বন্ধে সচেতন থাকেন।

সুনীল দাশের গল্পে কিছু স্বাদ-বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া গেল। সুনীলবাবু গল্প বলার প্রচলিত রীতি অনেকাংশে মেনেছেন, অন্তত আমার তা মনে হয়েছে। ঘটনাবিন্যাসে তিনি অধিক পক্ষপাতী, চরিত্রচিত্রণেও অকৃপণ। শেখরবাবু যতটা মুহূর্ত-ভাবনায় আত্মলীন, সুনীলবাবু ততটা নন। তিনি বরং গল্পকথা ছড়িয়ে দিতে চান। 'মৃত ডানার প্রার্থনা'য় তো বটেই, 'জন-গণেশ' বা 'শোক'-এও তার পরিচয় আছে। 'পাখিদের স্বর' পরীক্ষা হিসাবে উত্তম, 'রাতের সূর্যমূর্তি' গল্পটি কিন্তু সংহত হতে পারেনি। 'সমুদ্রের প্রতি'তে অবশ্য তিনি সচেতন এবং সংযমী। সুনীলবাবুর গল্পগুলি কমবেশি আলাদা

করে চেনা যায় এবং যেহেতু বিষয় ও চরিত্রের বিভিন্নতা বর্তমান, সেই হেতুই কিছু স্বাদ-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। 'শোক' গল্পের বৃদ্ধ রাধানাথ সাধারণ হয়েও তাঁর শোকের চেহারা নিয়ে অসাধারণ। স্ত্রীর মৃত্যুতে অবলম্বনহীন, কাঁদতে না পারার গুমরনো অবরুদ্ধ বেদনা পাঠকমনেও সঞ্চারিত হওয়ার অবকাশ আছে। 'মৃত ডানার প্রার্থনা'য় পিসিমার ট্রেন ধরতে না পারার দৃশ্যও স্বাভাবিক এবং সুন্দর। এ-সময়ের গতির সঙ্গে পেরে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব তো নয়ই। "পিসিমা যেন ট্রেন রকেটের দৌড় পাল্লার হিসেবটা তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন।" এ-যুগের দাম্পত্য জীবনও জটিল। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কচ্ছেদ এবং অতঃপর বিদিশা সোমের নিঃসঙ্গতার চিত্র 'পাখিদের স্বর' মনে রাখার মতো গল্প। কিন্তু অন্যত্র কয়েকটি গল্পে আবেগ বেশি প্রাধান্য পাওয়ায় গল্পের বক্তব্য প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। "আমি এমন এক মানুষ, যাকে কোলকাতার দিন শুধু নৈরাশ্য দিয়েছে আর রাত দিয়েছে অনিদ্রা আর যন্ত্রণা" ('রাতের সূর্যমূর্তি') প্রভৃতি বক্তব্য আবেগকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলেই এসেছে। অন্ধকার খাজুরাহো মন্দিরচত্বরে পাহারাদারের অশ্লীল হাসি অনুভব করা যায়, দেখাও যায় না তা নয়, কিন্তু লেখক এমন একাধিকবার দেখেছেন যে, মনে হয় চারপাশের অন্ধকারের কথা তিনি সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয়েছিলেন। ঠিক এই একই কারণে 'রাজা' গল্পটির শেষরক্ষা হয়নি। অথচ 'রাজা'র সম্ভাবনা নিশ্চয়ই ছিল।

আশা করব, শেখর বসু বা সুনীল দাশ কেউই থামবেন না; তরুণতর এই গল্পকারদের কাছ থেকে আরও সার্থক ছোটগল্প আমরা পাব।

শচীন বিশ্বাস

'নান্দীকার'-এর নাটক : 'তিন পয়সার পালা'

'তিন পয়সার পালা' ব্রেখ্‌টের নাটক 'থ্রি পেনি অপেরা'র রূপান্তর। স্বভাবতই ব্রেখ্‌টের নাটক থেকে দর্শকের প্রত্যাশা অনেক, কেননা 'এপিক নাটক'-এর ধারণা ও কাঠামো ব্রেখ্‌টেরই বিশিষ্ট কীর্তি ; এবং এর লক্ষণ, প্রয়োগ-পদ্ধতি ও সামাজিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য দ্ব্যর্থহীনভাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন নাটকের ভূমিকায় ও আলোচনাসূত্রে। ফলত ব্রেখ্‌টের নাটকের রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজনার দায়িত্ব অপরিসীম এবং স্বাধীনতা সীমিত—বিশেষত ব্রেখ্‌টীয় মূল ভাবনাগুলো উপস্থাপিত করার সিদ্ধান্ত যদি প্রযোজক নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন। 'নান্দীকার' গোষ্ঠীর কৃতিত্ব এখানেই যে তাঁরা ব্রেখ্‌টকেই উপস্থিত করেছেন বাঙালি দর্শকের সামনে এবং রূপান্তরে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টির মাধ্যমে 'তিন পয়সার পালা' একটি সার্থক মৌলিক নাটকও হয়ে উঠেছে।

অপেরা নাটক বস্তুটিই সম্পূর্ণ বিদেশী। নাটকে সঙ্গীতের বহুল ব্যবহার মাত্রেই তা অপেরা নাটক হয়ে ওঠে না, সংলাপের বিকল্প ও পরিপূরক হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গীতকেই মূলত ব্যবহার করা হয়। অথচ প্রচলিত অপেরার আধারে বাস্তবতার প্রতিফলন অংশত ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য—এ-তথ্য ব্রেখ্‌টের অজ্ঞাত ছিল না। প্রাচীন অপেরা প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত—"A dying man is real. If at the same time he sings, we are translated to the sphere of the irrational." কাজেই আধুনিক অপেরা নাটকে সঙ্গীতের ভূমিকা হবে আরও সুচিন্তিত। সঙ্গীতের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে ব্রেখ্‌টের নির্দেশ—"The music communicates, sets forth the text, takes up a position, gives the attitude." এবং এ-উদ্দেশ্য সম্পন্ন করতে গেলে সংলাপ ও সঙ্গীতের পৃথকীকরণের মাধ্যমে প্রত্যেককেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে, একটির কাজ অন্যটিকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া নয়। অথচ বিভিন্ন উপাদানগুলি একটি সম্পূর্ণ নাটক তৈরি করবে—একে অপরের উপর অসম্পূর্ণ কার্যভারের দায়িত্ব অর্পণ না করেই। তবেই সম্ভব 'এপিক অপেরা' নাটক সৃষ্টি, যার বিষয় উপস্থাপনা প্রসঙ্গে ব্রেখ্‌ট বলেছেন—"Once the content becomes, technically speaking, an independent component, to which text, music, and setting

adopt attitudes, once illusion is sacrificed to free discussion, and once the spectator, instead of being enabled to have an experience, is forced as it were to cast his vote, then a change has been launched which goes far beyond formal matters and begins for the first time to affect the theatres social function."
(Brecht : Notes on the opera—Fall of the town of Mahoganny.)

এই নির্দেশনামা অনুসরণ করে অপেরা নাটক রচনা যথার্থ দুরূহ কর্ম। যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গেই একটি নতুন আঙ্গিকের নাটক রচনার মাধ্যমে শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম পথিকৃতের কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন।

মূল নাটকটির উৎস গে এবং পেপুস্ক প্রযোজিত 'দি বেগারস অপেরা'। ব্রেখ্‌ট এই নাটকটিকে স্থাপন করেছিলেন তাঁর সমকালীন ইউরোপে অবক্ষয়ী সামন্ততন্ত্র ও সদ্যোজাত ধনতন্ত্রের সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে বিপর্যস্ত মূল্যবোধের উদ্ঘাটনকল্পে। 'তিন পয়সার পালা'র পরিপ্রেক্ষিত ১৮৭৬-এর কলকাতা। মূল নাটকের ম্যাকহীথ এখানে দুর্ধর্ষ ডাকাতসর্দার মহীন্দ্র। ম্যাকহীথের প্রণয়ী পলি উপস্থিত পারুল নামে। ভিক্ষুব্যবসায়ী, বারবণিতা, ভিক্ষুক ইত্যাদি চরিত্র-গুলোও যথাযথভাবে উপস্থিত। মূল নাটকের কয়েকটি চরিত্রের সামান্য পরি-বর্তন করেছেন নাট্যকার—পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী যা যথাযথ ও শিল্পসম্মত।

মহীন্দ্র, ভিক্ষুব্যবসায়ী, মহীন্দ্রের স্ত্রী পারুল, প্রণয়িনী বারবণিতাকুল, পুলিশের বড়সাহেব বাঘা কেষ্ট—এদের ঘিরেই কাহিনীটি গড়ে উঠেছে, এবং এই চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচন মারফৎ অবক্ষয়ী সামন্ত-তন্ত্রের মেকি মূল্যবোধ ও আগ্রাসী ধনতন্ত্রের যুগে পরিবর্তিত নতুন খোলসে শোষণের আবির্ভাব নাট্যকার মূর্ত করে তুলেছেন। ব্রেখ্‌টের নাটকের রূপান্তরে মূল কেন্দ্রবিন্দু থেকে নাট্যকার এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হননি—একথা বলা যায়। বিশেষত নাটকের কয়েকটি সংলাপ তিনি হুবহু উপস্থাপিত করেছেন মূল নাটক থেকে। প্রসঙ্গত পারুলের প্রতি মহীন্দ্রের উক্তি—"এবার ভাবছি ডাকাতি করা ছেড়ে দেব। একটা কারখানা খুলব...." ইত্যাদি অংশ উল্লেখ করা যায়। মঞ্চ পরিকল্পনায়ও 'নান্দীকার' গোষ্ঠী ব্রেখ্‌টকে সম্পূর্ণভাবেই অনুসরণ করেছেন—অন্তত ব্রেখ্‌ট ও কুর্টউইল-এর প্রযোজনায় বার্লিনে ১৯২৮-এর ৩১শে আগস্ট থেকে 'থ্রি পেনী অপেরা'র যে-প্রদর্শনী হয়—তার মঞ্চসজ্জার আলোকচিত্র থেকে একথাই মনে হয়। [John Willet এ-সংক্রান্ত তথ্য ও আলোকচিত্র

প্রকাশ করেছেন।] অথচ সংলাপে মৌলিক নাটকের স্বাদ সম্পূর্ণ উপস্থিত। যথাযথ আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য প্রথম দৃশ্যেই ভিক্ষুব্যবসায়ী যতীন্দ্রের সংলাপে উপমা ও অলংকারের উনিশ শতকী ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। আস্তাবল, থানার লণ্ঠন ইত্যাদির উপস্থাপনাও সুচিন্তিত। চরিত্রগুলির পোষাকপরিচ্ছদ নির্বাচনও যথাযথ।

সঙ্গীতাংশে কোনো বিদেশী যন্ত্র এঁরা ব্যবহার করেননি। গানগুলির সুরারোপ উনিশ শতকী তরজার ঢঙে। গানগুলির রচনায় নাট্যকার কোথাও আধুনিকতার প্রশ্রয় দেননি—ফলে সংলাপের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা হয়েছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাটকের শেষ দৃশ্যে 'অর্ধেক দেবতা আর অর্ধেক পুলিশ' বেশী বটকেষ্টর আবির্ভাবে মহীন্দ্রের মুক্তি ও বরলাভ। ব্রেখ্‌টের অভিপ্রেত 'Social function'-এর প্রতি সজাগ দৃষ্টিই সম্ভবত এ-পরিকল্পনার মূল প্রেরণা, এবং প্রশংসনীয় এইজন্যে যে দৃশ্যটি উপস্থাপনার নৈপুণ্যে মূল নাটকের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

অভিনয়ে দলগত নৈপুণ্যের পরিচয় 'নান্দীকার' গোষ্ঠী তাঁদের পূর্বতন নাটকগুলিতে উপস্থিত করেছেন। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন মহীন্দ্রের ভূমিকায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণের ভূমিকায় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এবং যতীন্দ্রের ভূমিকায় অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। পারুলের ভূমিকায় কেয়া চক্রবর্তীও অসাধারণ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে ব্রেখ্‌টের প্রতিপাদ্য অবক্ষয়ী সামন্তবাদ ও আগ্রাসী ধনতন্ত্রের আপাতমধুর চরিত্রের তাৎপর্য সমকালীন বাস্তবতার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত। এ-সময়ে এ-নাটকটি বাঙলার দর্শকের সামনে উপস্থিত করে 'নান্দীকার' গোষ্ঠী সমাজ ও সময়-সচেতন শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বাঙলার দর্শক নিশ্চয়ই তাদের অভিনন্দিত করবেন। কেননা যথার্থ শিল্পের ও শিল্পীর মর্যাদা এখনও বাঙলাদেশে দুর্লভ নয়—এ-বিশ্বাস আমাদের আছে।

তরুণ সেন

সারা ভারত সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সম্মিলন

সম্প্রতি এলাহাবাদে সাম্প্রদায়িকতা-প্রতিরোধ সমিতির আহ্বানে সারা ভারত সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সম্মিলন অনুষ্ঠিত হলো। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় শতাধিক প্রতিনিধি এই সম্মিলনে যোগ দেন। কানপুর, কলকাতা, পাটনা ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র ও অধ্যাপকদের মিলিত প্রতিনিধি-দল এই সম্মিলনে যোগদান করেন। বোম্বাই ও ভূপাল থেকে সমাজসেবীদের একদল প্রতিনিধিও যোগ দেন। তামিলনাদ, কেরালা ও কাশ্মীর থেকে সাংবাদিকেরা এসেছিলেন। তাছাড়া এলাহাবাদের প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীএন. সি. রায় ও শ্রীসুনীল বসু সেমিনারে যোগদান করেন। রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে যোগ দিয়েছিলেন নব-কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম ও শ্রীশুক্লা। কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীরমেশ সিনহা। পাটনা থেকে পি-এস-পি, কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ও বিপ্লবী কমিউনিস্টদের অন্তত দুইজন করে প্রতিনিধি সম্মিলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। সম্মিলনের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য অবশ্য ছিল নব-কংগ্রেসের পরেই নির্দলীয় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাপকদের। মুসলিম সংগঠনগুলির মধ্যে যোগদান করেন জামিয়াৎ উলেমা ও কেরালার মুসলিম লীগের প্রতিনিধিবৃন্দ। শ্রমিকনেতা ছিলেন মাত্র একজন, গয়ার কমরেড হবিবুর রহমান। যে-সব দল সম্মিলনে অংশ গ্রহণ করেননি বা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় আদি-কংগ্রেস, এস-এস-পি ও বি-কে-ডির। জনসংঘের কথা বলাই বাহুল্য।

এই সম্মিলন উদ্বোধন করলেন ভারতবর্ষের একজন শ্রদ্ধেয়া নারী—শ্রীমতী আয়েষা শেখ। ভারত-পাক যুদ্ধে অমিতসাহসী যোদ্ধা শহীদ মেজর কে-এম-এ শেখের বিধবা পত্নী। তিনি 'বীর চক্র' উপাধির অধিকারী ছিলেন। আবেগকম্পিত কণ্ঠে তিনি যখন তাঁর স্বামীর মহিমময় মৃত্যুবরণ-কাহিনীর পটভূমিকায় আমেদাবাদের মর্মন্তুদ ঘটনার কথা বলছিলেন—সভায় তখন এক নিথর স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। তিনি বললেন—"এই দেশের প্রতিটি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র। এই দেশ বাঁচলে আমরা বাঁচব—এই দেশ ডুবলে আমরা ডুবব....ভারত-পাক যুদ্ধে মুসলিমরা বিশ্বস্ততা প্রমাণ করার জন্য যুদ্ধ করেননি—তাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের পবিত্র মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য।" সম্মিলনের

প্রধান আহ্বায়িকা শ্রীযুক্তা সুভদ্রা যোশী বললেন—"যারা জাতীয় সংহতি নাশকারী জঘন্য অপরাধে অপরাধী—তাদের সংখ্যা নগণ্য হলেও তারা সুসংগঠিত। অন্যদিকে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শান্তিকামী মানুষদের কোনো সংহতি নেই। যার ফলে বার বার অন্যায়ের হাতে ন্যায় ধর্ষিতা হচ্ছে। আমাদের মধ্যে সাগ্রহ সহমর্মিতা ও সক্রিয় সহযোগিতাই একমাত্র এই অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে সমর্থ হবে। আমরা তাই এক দুর্বার সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই।" তারই রূপায়ণে এই সম্মিলন এক বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য পাঁচটি কমিশনে বিভক্ত হয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার পর পাঁচটি রিপোর্ট পেশ করেন। কমিশনগুলি যথাক্রমে (১) জাতীয় সংহতি-নাশক শক্তিসমূহ : সভাপতি—কামিলা তায়েবজী (২) রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা : সভাপতি—রমেশ সিনহা (৩) আইন ও প্রশাসন : সভাপতি—ডঃ বিধুভূষণ মালিক (৪) শিক্ষা ও গণসংযোগ : সভাপতি—সীতারাম শরণ (৫) ছাত্র ও যুবকের ভূমিকা : সভাপতি—শান্তিময় রায়। এই রিপোর্টগুলি অল্পবিস্তর সংশোধিত হবার পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই সম্মিলনে একটি সর্বভারতীয় সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির আহ্বায়ক হয়েছেন—ডি. আর. গোয়েল।

বিভিন্ন কমিশনের আলোচনা থেকে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলনে কয়েকটি জরুরি সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

প্রথমত অনেকে অভিযোগ করেছেন যে সম্মিলনে শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠিত আন্দোলনের কোনো প্রতিনিধি যোগ দেননি। সত্যিই এই আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষকের আত্মঘাতী অবহেলা দুর্বোধ্য। সারা ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যদি কোনো শ্রেণী সবচেয়ে বিধ্বস্ত হয়ে থাকে তো তা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী ও তার জীবিকার সংগ্রাম। ভিলাই, আমেদাবাদ, বরোদা, নারোদা, ইন্দোর, মেঙ্গালোর, রাঁচী, রূঢ়কেল্লা, টিটাগড়, জগদ্দল, তেলেনিপাড়া, শাঁকরাইল, জামশেদপুর, গোরক্ষপুর, মীরাট, সুরসুন্দ, কটক প্রভৃতি একশটা নাম লিখে দেওয়া কিছু কঠিন নয়। শুধু জাতীয় সংহতি পরিষদ বা সরকারের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে আমরা অশান্ত বিবেককে শান্ত করতে পারি।

বীভৎসতম নারকীয় ঘটনা ঘটছে। সাময়িকভাবে আমরা সবাই সত্যিই দিশেহারা হই, লজ্জিত হই, ম্রিয়মাণ হই, সরকারকে দোষ দেবার যা আছে তাও যান্ত্রিকভাবে দেই—কিন্তু মিলিতভাবে আন্দোলনের কথা কি

আমরা কখনো ভেবেছি না ভাবি! তা না হলে বারবার ঘৃণিত অপরাধ হয়? অথচ কঠোর শাস্তি নেই! কেন নেই? আইন সংশোধনের ব্যাপার আছে? ১৯৬৮ সালের পর দুই বছর চলে গেল। আমেদাবাদের ঘটনার মতো বীভৎস ঘটনাও ঘটল। ঘটল জগদ্দলেও। জগদ্দলে অন্তত একজন শ্রমিকবধূর উপর অত্যাচারের অভিযোগ রয়েছে।

এর জন্য কেন চরম শাস্তি হয় না? আইন বদলাতে হলে—বদলান। আইনের জন্য মানুষ? না, মানুষের জন্য আইন? আসলে আমরা নিজেরা কিছুই করিনি—করার মতো দৃঢ়তাও নেই। তা না হলে শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মিলনে প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়া প্রস্তাবের প্রয়োগ সম্পর্কে এই নিদারুণ অনীহা কেন? শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃবৃন্দ—আমেদাবাদে ও জগদ্দলে—শ্রমিকবধূর প্রতি নারকীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জ্জে উঠছেন না কেন? কেন নিচ্ছেন না এমন সক্রিয় কর্মপন্থা যাতে করে অন্তত এ-জাতীয় অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি বিধান করা হয়। জরুরি অবস্থার জন্য জরুরি ব্যবস্থার প্রয়োজন চাই। শুধু অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে লাভ নেই—আমাদের নিজেদের বিবেককেও বিধৌত করার প্রয়োজন আছে বৈকি। এলাহাবাদের সম্মিলনে শ্রমিক কৃষকের প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই এই সমস্যার কথা মনে হলো।

দ্বিতীয়ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনে সরকারের ব্যর্থতা (সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গ বাদে) অনেকবার প্রমাণিত হয়েছে। দাঙ্গাকারীদের প্রতি কঠোর ও দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী শাস্তি প্রয়োগের পক্ষে বাধা কোথায়? সবকিছুই দাঙ্গার পরেই স্বাভাবিক হয়ে যায় কেন? নিষ্কৃতি পেয়ে নরঘাতকগুলি আরও বেশি উৎসাহিত হয়। সাম্প্রদায়িকতার বিষে আমাদের গণতন্ত্র আক্রান্ত। সামাজিক আদর্শ অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যেসব দেশে বিপ্লব হয়েছে (সোভিয়েত বা চীনের কথা বাদ দিলাম)—ফ্রান্সে বা ইংলণ্ডে—বিপ্লব থেকে উদ্ভূত সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি সেখানে যারা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে, তাদের দমন করার জন্য তাঁরা জরুরি জঙ্গী আইনের আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমরাই বা তা কেন নেব না? জাতীয় সংহতির সমস্ত প্রস্তাব শুধু সদিচ্ছায় পর্যবসিত হচ্ছে না কি? যাঁরা এই প্রচেষ্টাকে বামপন্থা থেকে সমালোচনা করেন—তাঁরা একে হাস্যোদ্দীপক সংস্থা বলবার সুযোগ পাচ্ছেন। যাঁরা এই প্রচেষ্টাকে দক্ষিণপন্থা থেকে ঘৃণা করেন—তাঁরা একে অবহেলা করতে সাহস পাচ্ছেন। আর যাঁরা আন্তরিকভাবে একে সংগ্রামের পন্থা হিসেবে দেখেছিলেন, তাঁরা

নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। অথচ সরকারের পক্ষে এই দৃঢ়তা কি একান্তই অসম্ভব? বাধাটা কোথায় পরিষ্কার হয়ে যাক। তা না হলে সরকারের আন্তরিকতা সম্পর্কে কর্মীদের মনে সন্দেহ আসা অস্বাভাবিক নয়।

তৃতীয়ত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতাকে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করেন—তাঁদের হাবভাব কার্যকলাপ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী অভিযানে ভূমিকার আন্তরিকতা সম্পর্কেও অনেক কথাই আলোচনার মধ্যে বার বার উঠেছে। এর প্রধান কারণগুলি হচ্ছে—(১) নির্বাচনে জয়লাভের জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দান (২) শিক্ষাব্যবস্থাকে সাম্প্রদায়িকতা-বিষমুক্ত করা সম্পর্কে অনিচ্ছা বা দীর্ঘসূত্রতা (৩) সম্মিলিতভাবে নিম্নতম কর্মসূচি নিয়ে ব্যাপক প্রচার অভিযান করার অনিচ্ছা। গত ৩রা নভেম্বর দিল্লীতে সর্বদলীয় সভায় এই নীতি গ্রাহ্য হলেও আজ পর্যন্ত কার্যে পরিণত করা সম্ভব হচ্ছে না কেন? অথচ দাঙ্গা একটির পর একটি হয়ে যাচ্ছে। দাঙ্গার বিষ ছড়িয়ে পড়ছে জাতির মানসিকতায়। প্রশ্নটি সহজ—আমরা কি তাহলে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, না, যাচ্ছি এক-জাতিতত্ত্বের নয়া ফ্যাসিবাদের দিকে। দেখছি নাকি ভারতীয়ত্বে উদ্বুদ্ধ করার (Indianisation) নামে সাম্প্রদায়িকতার আক্রমণ চালাচ্ছে জনসংঘ-পন্থীরা। গণতান্ত্রিক দলগুলির মধ্যে চিন্তার দীনতা, অস্পষ্টতা ও আদর্শ-বাদীসুলভ ঐকান্তিকতার অভাব তো আছেই, তার সঙ্গে অভাব আছে একযোগে মিলেমিশে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ইচ্ছার—যে-সংগ্রামের উপর নির্ভর করছে আমাদের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ।

শান্তিময় রায়

সবার উপরে

চোদ্দটি বড় দেশী ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করায়, পার্লামেণ্টের আইনকে সুপ্রিম কোর্ট নাকচ করে দিয়েছিলেন। যেসব খুঁৎ দেখিয়ে আইনকে বেআইনী করা হয়, ভারত সরকার সেইসব ফাঁক মেরে নতুন একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন বটে, কিন্তু আইনবিশারদদের ধারণা যে সেই নতুন অর্ডিন্যান্সের ভিত্তিতে রচিত নতুন বিল এনে পাশ করা হলেও সুপ্রিম কোর্টের বিচারের ধোপে সেই আইনও টিকবে না। তাছাড়া সুপ্রিম কোর্টকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে নতুন অর্ডিন্যান্সে ব্যাঙ্ক মালিকদের প্রাপ্য খেসারতের টাকা যেভাবে প্রায় দেড়া করে দেওয়া

হয়েছে, তা অন্যদিকে দেশের মানুষকে ক্ষুব্ধ করেছে। পার্লামেন্টকে চলতে হয় দেশের মানুষের কথায়, তাঁদের ভোটে। সুপ্রিম কোর্টের সেই বালাই নেই। দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদাকে ব্যক্ত করে পার্লামেন্ট অর্ডিন্যান্সের বাড়তি খেসারতকে খাটো করেও দিতে পারেন। ফলে আইনটিকে পুনরায় সুপ্রিম কোর্টের কোপে পড়তে হবেই। এরূপ পরিস্থিতির মধ্যেই একটি গুরুতর জাতীয় প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে—কে বড়? পার্লামেন্ট বড় কিংবা সুপ্রিম কোর্ট বড়? পার্লামেন্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট, উভয় সংস্থাই ভারতের রাষ্ট্রের দুটি স্তম্ভ। এদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ভারতের রাষ্ট্রেরই দ্বন্দ্ব। ভারতের সংবিধান রচনার বিশবছর পর ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের আবির্ভাব ভারতের রাজনীতির নতুন মোড় নেবারও সূচনা।

কে বড়, পার্লামেন্ট কিংবা সুপ্রিম কোর্ট—প্রশ্নটি এভাবে সরাসরি হাজির হয়ে পড়লে পার্লামেন্টের সুপ্রিমত্বকে অগ্রাহ্য করে এমন বুকের পাটা কারুর নেই। সেজন্যেই কায়েমী স্বার্থের তল্পিবাহকেরা প্রশ্নটিকে বেঁকিয়ে দুমড়ে বিকৃত করে উপস্থাপনের জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছেন। ঐ সব ব্যক্তিরা বলছেন যে, পার্লামেন্টের আইন করার অধিকারকে সুপ্রিম কোর্ট কখনো অস্বীকার করেননি, তবে সেই আইনকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারের কষ্টিপাথরে "ন্যায়সঙ্গত" বলে সার্টিফিকেট পেতে হবে। কথাটাকে যতই "তৈলাধার পাত্র কিংবা পাত্রাধার তৈল" করে গুলিয়ে দেবার চেষ্টা করা হোক না কেন, সুপ্রিম কোর্টের শেষ কথা বলার এই অধিকার আসলে তো পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বকেই অস্বীকার করা। আর সেই অস্বীকৃতির ফলে উদ্ভূত প্রশ্ন এবং তার জটিলতা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যায়।

প্রশ্নটিকে নিয়ে প্রখ্যাতনামা বিচারপতিরাও ভাবিত। নিজেদের পেশা ও কর্তৃত্ব এবং যশ ও অধিকারের উপর ইতিহাসের এমন হামলায় তাঁরা বিচলিত হবেন সেটা খুবই স্বাভাবিক। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী এস. আর. দাস এহেন পরিস্থিতির মধ্যে সম্পূর্ণ একটি অভিনব দাওয়াই বাতলিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, পার্লামেন্ট ও সুপ্রিম কোর্টের সম্মুখ-দ্বন্দ্বকে যেমন করে হোক এড়িয়ে যেতে হবে এবং তার উপায় হলো "মানুষের ইচ্ছা"কেই সুপ্রিম বলে গণ্য করা।

রাষ্ট্রের দুই স্তম্ভের দ্বন্দ্বে "মানুষের ইচ্ছা"কে সুপ্রিম করা প্রকৃতপক্ষে একটি বিপ্লবী কথা। বস্তুত সেই বিপ্লবী সমাধান ছাড়া বর্তমান দ্বন্দ্ব থেকে কোনো

মুক্তিও নেই। পার্লামেন্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট—দুটি স্তম্ভই সংবিধানের কেতাবে আটকে গেছে। পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সুপ্রিম কোর্টকে খাটো করা হবে, তা যদি বা সম্ভব, তবু সম্পত্তির শাশ্বত অধিকার সংক্রান্ত সংবিধানের মৌলিক অধিকারের ধারা পার্লামেন্টে শতকরা একশ জন সদস্য ভোট দিয়েও বদলাতে বা সংশোধন করতে পারেন না বলে সুপ্রিম কোর্টের অপর একটি রায় এমনভাবে বহাল হয়ে রয়েছে যে, সংবিধানের কোনো কোনো প্রবক্তা নতুন সংবিধান রচনা ছাড়া পরিত্রাণের কোনো বিকল্প পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। কেউ কেউ আবার বলছেন যে, নতুন সংবিধান রচনার ডাক দেবার কোনো অধিকারও পার্লামেন্টের নেই। একমাত্র উপায় হলো সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত ধারাকে নাকচ করার জন্য জাতীয় রেফারেণ্ডাম বা গণভোট গ্রহণ করা।

ভারতের পার্লামেন্ট এবং ভারতের বিচার বিভাগকে পরস্পর নির্ভরশীল করেই রচিত যে-সংবিধান, তার মধ্যের বিরোধের মীমাংসা এখন কে করবে? রাষ্ট্রের মধ্যেরই দুই প্রধান স্তম্ভের দ্বন্দ্ব কিভাবে মিটবে? জটিল এই প্রশ্নের জবাবেই বলতে হচ্ছে "সবার উপরে মানুষ সত্য।" মানুষকে সেই শক্তি না দিয়ে রাষ্ট্রেরও মুক্তি নেই।

ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শক্তির এই যুগ যেন হেলাফেলায় নষ্ট না হয়।

জ্যোতি দাশগুপ্ত

সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার

সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির মধ্যে এবার বাঙলা দেশের দুজন কৃতী লেখকের রচনাকে স্বীকৃতি প্রদান করায় আমরা সত্যিই গর্ব অনুভব করছি। এঁদের একজন স্বনামখ্যাত গবেষক ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, অন্যজন প্রখ্যাত কবি মণীন্দ্র রায়। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর ইংরেজীতে লেখা গ্রন্থ 'অ্যান আর্টিস্ট ইন লাইফ' এবং মণীন্দ্র রায় তাঁর বাঙলা ভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থ 'মোহিনী আড়াল'-এর জন্য সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

ডঃ রায় ও কবি মণীন্দ্র রায়—দুজনই বহুকাল থেকে 'পরিচয়'-গোষ্ঠীর আপনজন। তাঁদের এই কৃতিত্বে আমরা যেমন সানন্দে অংশগ্রহণ করছি তেমনি

বাঙলার সৎ-শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল সংস্কৃতিসেবীর পক্ষ থেকে তাঁদের উভয়েরই উদ্দেশে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাত-কীর্তি অধ্যাপক। অধুনা তিনি ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজের অধিকর্তারূপে বহুব্যাপ্ত গবেষণাকার্য পরিচালনা করছেন। তাঁর মনীষার দীপ্তি অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত তাঁর ইংরেজী গ্রন্থ সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারে ধন্য হলেও বাঙলাদেশের গবেষক-ছাত্রেরা ডঃ রায়ের বাঙলা ভাষায় রচিত 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা' নামক গ্রন্থখানির সঙ্গে দীর্ঘকাল সুপরিচিত। বরং বলা যায়, রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুধাবনের জন্য যে অঙ্গুলিমেয় আকরগ্রন্থ আজও সুধী-সমাজে সমাদৃত, ডঃ রায়ের 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা' তার মধ্যে অন্যতম। আমার ধারণা, ডঃ রায়ের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)' নামক সুবিশাল গবেষণাগ্রন্থ। একক মানুষের কী অসাধারণ নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্য এই সুবিশাল গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় বিধৃত হয়ে আছে, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। সত্যি কথা বলতে কি, ডঃ রায়ের নিরলস গবেষণার ফলেই বাঙলা তথা বাঙালীর ইতিহাসের বহু লুপ্তপ্রায় ছিন্নসূত্র প্রত্নতাত্ত্বিক অসংখ্য সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এ-দিক থেকে সমগ্র বাঙালী জাতি তাঁর কাছে যথেষ্ট ঋণী। এ-ছাড়া তাঁর আরও অনেক গবেষণাপত্র দেশ-বিদেশে সমাদৃত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপকরূপেও তিনি ছিলেন খ্যাতির শীর্ষ-চূড়ায়। যাহোক, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতো পণ্ডিত-মনীষীকে আমলাতন্ত্র পরিবেষ্টিত দিল্লীর সাহিত্য আকাদেমী-কর্তৃপক্ষ এতদিনে যে সম্মান দেখাতে পারলেন, অবহেলিত বাঙলার পক্ষে নিঃসন্দেহে তা এক সু-সংবাদ!

অবশ্য কবি মণীন্দ্র রায়কে সম্মানিত করে সাহিত্য আকাদেমী এবার যে সুবুদ্ধি ও কর্মতৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। না-কি এও আমলাতন্ত্রের এক বিচিত্র লীলা! ঘটনা যে-ভাবেই ঘটুক তার ফলাফল অন্তত সন্তোষজনক, এ-কথা সানন্দেই স্বীকার্য।

কবি মণীন্দ্র রায় বাঙালী কাব্য-পাঠকের কাছে একটি সুপরিচিত নাম। এই 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠাতেই প্রায় তিরিশ বছর আগে তাঁর কাব্য-সাধনার সূত্রপাত। বিগত তিরিশ বছরে তিনি অজস্র কবিতা লিখেছেন। বলা যায়, চল্লিশের দশকের তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে কবিতার সংখ্যা-প্রাচুর্যে তিনিই বোধহয় অগ্রণী। ১৯৩৯ সাল থেকে এ-পর্যন্ত প্রকাশিত ১৫ খানি মৌলিক কাব্যগ্রন্থ

এরই জ্বলন্ত স্বাক্ষর। কিন্তু শুধু সংখ্যা-প্রাচুর্যে নয়, মণীন্দ্র রায়ের কবিতা গুণগত বৈশিষ্ট্যেও সমুজ্জ্বল। অন্তত চল্লিশের দশকের যাঁরা প্রধান কবি—মণীন্দ্র রায় তাঁদের অন্যতম। তিনি তাঁর এই দীর্ঘ কাব্য-সাধনায় বারংবার নতুন পথ-পরিক্রমায় অগ্রসর হয়েছেন। ফলে, মণীন্দ্র রায়ের কবিতায় বিষয়বৈচিত্র্য এবং আঙ্গিকগত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষারও অনেক মনোমুগ্ধকর সমাবেশ ঘটেছে। বর্তমান আলোচক মণীন্দ্র রায়ের কাব্য-সাধনা ও তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইতিপূর্বে কয়েকটি প্রবন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। ১৩৭৬ সালের শ্রাবণ মাসে 'পরিচয়' পত্রিকার বিশেষ সমালোচনা সংখ্যাতেও আমি মণীন্দ্র রায়ের 'এই জন্ম, জন্মভূমি' কাব্য-গ্রন্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমার মতামত ব্যক্ত করেছি। সহৃদয় পাঠক সেই নিবন্ধটি পাঠ করলে ইতিহাস-সচেতন, মানবমহিমায় আস্থাবান কবি মণীন্দ্র রায়কে কিঞ্চিৎ অনুধাবন করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন বোধ করছি। যে 'মোহিনী আড়াল' কাব্যগ্রন্থখানি পুরস্কৃত হয়েছে তা একটি দীর্ঘ কবিতা মাত্র। সাম্প্রতিক কালে এই দীর্ঘ কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও তিনি বোধহয় অন্যতম পথিকৃৎ। অবশ্য পরবর্তীকালে মণীন্দ্র রায় আরও দীর্ঘ কবিতা উপহার দিয়েছেন তাঁর 'এই জন্ম, জন্মভূমি' কাব্যগ্রন্থে। 'মোহিনী আড়াল' কাব্যগ্রন্থে যার সূচনা, তার সার্থক পরিণতি বোধহয় 'এই জন্ম, জন্মভূমি'তে। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'ভিয়েতনাম'-এ এরি অনুরণন লক্ষ্য করেছি। সবচেয়ে বড় কথা, মণীন্দ্র রায় সজীব কবি। সৃষ্টির প্রাচুর্যে এখনও তিনি অক্লান্ত। প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনেও তিনি আমাদের বন্ধু-সাথী। তাঁর এই সজীবতা, অক্লান্ত কাব্য-সাধনা এবং কর্মনিষ্ঠা দীর্ঘকাল অব্যাহত থাক, আপনজন রূপে এটাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা। আমরা ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ও কবি মণীন্দ্র রায়কে পুনর্বার আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ধনঞ্জয় দাশ

ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সংঘের সম্মেলন

কটক শহরের সুসজ্জিত স্টেডিয়ামে ৬ই মার্চ থেকে ৮ই মার্চ ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সংঘের নবম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। লেনিনের জন্মশতবর্ষে অনুষ্ঠিত ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সংঘের এই সর্বভারতীয় সম্মেলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সম্মেলনের উদ্যোক্তা এবং প্রতিনিধিরাও যে এ-বিষয়ে যথেষ্ট

সচেতন ছিলেন তা সম্মেলনের উদ্বোধন দিবসে সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের বক্তৃতায় যেমন পরিস্ফুট তেমনি পরবর্তী দুই দিনের বিভিন্ন কমিশনের আলোচনায় এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সজীব বিতর্কের মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সংঘকে আরও ব্যাপক গণভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে এই দুই মহান দেশের মৈত্রী, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে না পারলে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশ যে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছতে পারবে না, তিন দিনের এই সম্মেলন থেকে পাঁচশতাধিক প্রতিনিধি অন্তত এই সারসত্যটুকু উপলব্ধি করে এসেছেন বলে আমার বিশ্বাস। বিশেষ করে লেনিনের জন্মশত-বর্ষে তাঁর শিক্ষার আলোকে আমরা যাতে আমাদের দেশের অন্ধকার দুহাতে সরিয়ে, সুখী-সমৃদ্ধিশালী, নতুন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে পারি—এই সম্মেলন থেকে 'লেনিন-জন্মশতবর্ষের ঘোষণা'-য় তারই আশ্চর্য সুন্দর এক অভিব্যক্তি ঘটেছে। আমরা 'পরিচয়'-পাঠক তথা বাঙলা দেশের ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর অকৃত্রিম সুহৃদদের জন্য সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাটি নিচে প্রকাশ করছি।

লেনিন-জন্মশতবর্ষের ঘোষণা

লেনিন বেঁচে আছেন····
দেশে দেশে যে-সব নর-নারী শান্তি, মানুষে-মানুষে বন্ধুত্ব ও মানব-প্রগতির জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টারত, তাঁদের হৃদয় এবং মনে লেনিন বেঁচে আছেন····

সাম্রাজ্যবাদ এবং নতুন ও পুরনো ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত জাতির মুক্তি-সংগ্রামের মধ্যে লেনিন বেঁচে আছেন····

গণতন্ত্রের জন্য, ক্ষুধা-দারিদ্র্য এবং শোষণের হাত থেকে চিরমুক্তির জন্য মানব-জাতির সকল প্রচেষ্টার মধ্যে লেনিন বেঁচে আছেন····

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, যার স্থপতি লেনিন, সেই রাষ্ট্রই মানবতার পূজারীদের কাছে লেনিনের সবচেয়ে মূল্যবান অবদান।

যেখানেই মানুষ শান্তির জন্য সংগ্রামরত, সেখানেই তাঁরা জানেন লেনিনের স্বদেশ তাঁদেরই পাশে দাঁড়িয়ে। যেখানেই মানুষ মুক্তির জন্য লড়াই করছেন, সেখানেই তাঁরা জানেন লেনিনের দেশ তাঁদের পাশে আছে।

লেনিনের কাছ থেকে প্রেরণা এসেছিল, আমাদের দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম পেয়েছিল নতুন উদ্দীপনা। অক্টোবর বিপ্লবের যে-অগ্নিশিখা লেনিন প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদের শৃংখল ভাঙ্গায় তাই জুগিয়েছিল আমাদের শক্তির উপর আস্থা।

যে-মহামূল্য উপাদানে গঠিত স্তম্ভের উপর শান্তি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের বিধি-বিধানগুলি প্রতিষ্ঠিত, যার সঙ্গে আমাদের দেশের জনগণ অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, সেই নীতিগুলি নির্ধারিত করেছিলেন লেনিন।

লেনিন যে-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই রাষ্ট্রের কাছ থেকেই এসেছিল আমাদের স্বাধীনতার জন্য অমূল্য সমর্থন।

লেনিনের দেশ থেকে আজও আসে সেই ঐকান্তিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা যা ভারতের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার শক্তিশালী রক্ষাকবচ রূপে কাজ করছে, যা ক্রমবর্ধমানভাবে আমাদের আর্থনীতিক উন্নয়ন এবং আত্মনির্ভরতার পক্ষে অপরিহার্য শক্তিরূপে বিরাজমান।

লেনিনের জন্মশতবর্ষে অনুষ্ঠিত ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সংঘের এই নবম জাতীয় সম্মেলন—নতুন পৃথিবী গড়ার জন্য সংগ্রামরত মানুষের প্রতিটি রণক্ষেত্র যাঁর পদচিহ্নলাঞ্ছিত, আমাদের যুগের সেই মহামানবের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছে।

প্রতিটি মহাদেশে যাঁরা শান্তি, জাতীয় স্বাধীনতা এবং সাম্রাজ্যবাদের অবসানের জন্য কাজ করছেন, লেনিনের জন্মশতবর্ষ সেই সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য দ্বিগুণ প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করছে।

আমাদের দেশে নতুন ভারত গড়ার জন্য অনেক শহীদ সংগ্রামে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। সেই নব ভারত'গঠনের জন্য লেনিন জন্মশতবর্ষের বাণী সকল দেশ-প্রেমিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করুক।

সঞ্জয় দাশগুপ্ত

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে

ভাবের গভীরতায়, চিন্তার স্বচ্ছতায় এবং বিশ্লেষণের প্রত্যয়ে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমার মনে যে-ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেছেন, তা আজীবন মনে থাকবে। তাঁর মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি, যা আমার মনকে উদ্দীপ্ত করেছে, অনুপ্রাণিত করেছে, চমৎকৃত করেছে।

বরাবর দেখেছি তাঁর মধ্যে চিন্তার অতলস্পর্শী গভীরতা আর সমস্ত প্রতিপাদ্যকে সহস্র খুঁটিনাটির মধ্য দিয়ে বিচার করে দেখবার ক্ষুরধার প্রবণতা। অধ্যাপক হিসাবে ছাত্রদের পক্ষে এমন সহায়ক আদর্শ শিক্ষক-দুর্লভ বললেও চলে। কোনো বিষয়ের কোন তাৎপর্যটি কোন বিশ্লেষণটি সঙ্গত—তা যেন তাঁর নখদর্পণে ছিল। সেইমতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে, বিচার করে, সর্ববিধ অর্থ উদ্ধার করে বিষয়টি তিনি তাঁর ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতেন। অনায়াসনৈপুণ্যে তিনি যে কোনো দুরূহ বিষয়ের গভীরে নিয়ে যেতে জানতেন। তাঁর অধ্যাপনার মধ্যে বাগ্মিতার ছটা দেখা যেত না, প্রকাশ পেত অনন্যসাধারণ মনস্বিতা এবং উপলব্ধির গভীরতা।

সকল বিষয় তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে পড়িয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক হিসাবে তিনি যখন বিদ্যাপতি পড়িয়েছেন, তখন তাঁর রসিক ও ভাবুক মনের দুর্লভ পরিচয়টি ব্যক্ত হয়েছে; তেমনি যখন তিনি আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তখনও তাঁর আশ্চর্য রসগ্রাহিতা ও বিশ্লেষণক্ষমতার সমান পরিচয় দিয়েছেন। বিদ্যাপতি তিনি পড়িয়েছেন শিল্পীর ভাবদৃষ্টি ও দার্শনিকের তত্ত্বদৃষ্টির সমন্বয়ে। আধুনিক সাহিত্য পড়িয়েছেন তার নতুন তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত করতে।

তাঁর সাহিত্য-সমালোচনায় শুধুই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাইনি, পেয়েছি পুরাতনকে পুনঃসৃষ্টির প্রয়াস। তাঁর লেখায় শুধু মনন নেই, রয়েছে মননের সুষমামণ্ডিত প্রকাশ। ভাবের গভীর অতলতায় ডুব দিয়ে যে মণি-রত্ন তিনি সমালোচনা-প্রসঙ্গে উদ্ধার করে দিয়ে গিয়েছেন, তা আমাদের কাছে চিরদিনের সম্পদ হয়েই থাকবে।

মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান শিল্পী—সুন্দরের পূজারী। তাই শুধু সাহিত্যে নয়, সঙ্গীতেও ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। তাঁর সাহিত্যকর্মের সঙ্গেই বাঙলার জনসাধারণ পরিচিত। তাঁর সঙ্গীতানুরাগের দিকটি হয়তো

অনেকের কাছেই অপরিজ্ঞাত। ক্লাসিক গানের তিনি ছিলেন একজন বোদ্ধা এবং বাইরে কোনো আসরে গান না গাইলেও বাড়িতে তিনি গানের চর্চা করেছেন—এ দেখেছি।

আলোচনা সভায় দেখেছি তাঁর তীক্ষ্ণধী মননের প্রকাশ। রাজনীতি, সাহিত্য, সমাজ-সমস্যা, অর্থনীতি—যে-কোনো বিষয়েরই আলোচনা হোক, বিভিন্ন বক্তার ভাষণের পর শ্রীকুমারবাবু যখন বলতে উঠতেন, তখন সেই ভাষণের মধ্যে পেতাম নতুন আলোকপাত, নতুন ব্যাখ্যা। উচ্ছ্বাস নেই, কথার মধ্যে ফুলঝুরি নেই—আছে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ আর সূক্ষ্ম বিচার। সব সময়েই অকাট্য যুক্তি দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতেন। তাঁর বহুবিধ রচনার মধ্যেও এই অলোকসামান্য মননশীলতার পরিচয়টি রয়েছে।

আর-একটি বৈশিষ্ট্য যা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি, তা হলো মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা এবং নিঃশর্ত আনুগত্য। শরীর অশক্ত, মন বিক্ষিপ্ত, কিন্তু তবুও বাঙলা সাহিত্যের কোনো অনুষ্ঠানে ডাক পড়লে তিনি তা উপেক্ষা করতে পারতেন না। নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ভারতব্যাপী নানা স্থানে অনুষ্ঠিত কোনো অধিবেশনেই বোধকরি তিনি অনুপস্থিত থাকেননি। জয়পুর, আগ্রা, মাদ্রাজের নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম। সে-সময়ে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছি এবং বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ যে কত গভীর তা জেনেছি। দেশ বেড়াবার সখে নয়, অথবা সভায় গিয়ে বিশিষ্ট আসনে বসবার স্পৃহায় নয়, পথের এবং শরীরের কষ্ট সহ্য করেও অন্তরের প্রেরণায় তিনি সেইসব অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন, আলোচনা করেছেন এবং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিচারবুদ্ধি দিয়ে বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে নানা গঠনমূলক পরিকল্পনা ও প্রস্তাব রেখেছেন।

স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি নিবিড় ভালোবাসার পরিচয়ও তাঁর মধ্যে পেয়েছি। দেশের এবং বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণে তিনি যে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতেন, তা শুনে বিস্মিত হয়ে বহুবার ভেবেছি—এমন করে আমরা তো কখনও বিষয়টিকে চিন্তা করিনি। তাঁর সঙ্গে যে-কোনো বিষয়ে আলোচনার পর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন চলে এসেছি, তখন মনে হয়েছে—যেন আজ অনেক সম্পদ সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম।

তাঁর মধ্যে স্বজাতিপ্রীতির পরিচয় পেয়েছি নানা কর্মে—যথা, বহু গণ-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যুক্ত থাকার মধ্য দিয়ে। শুধু আপন নামটিকে বিভিন্ন

জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত রেখে যশ অর্জনের স্পৃহায় নয়, তাঁর চিন্তা এবং পরিকল্পনা দিয়ে, তাঁর সাহচর্য দিয়ে, অভিমত ও উপদেশ দিয়ে কিসে তাদের, তথা দেশের ও দেশবাসীর উপকার হয় সেই নিঃস্বার্থ চেষ্টাই বরাবর ছিল তাঁর। অনেকের কাছে হয়তো তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার এই দিকটি অজ্ঞাত।

নিজেকে প্রচার করবার আসক্তি তাঁর ছিল না কোনোদিনই। তাই তাঁর গুণমুগ্ধ অনুরাগীদের মধ্যে অনেকেই জানতেন না যে তিনি কোন কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। এও তাঁর চরিত্রের একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

তিনি যে-সব আসরে গিয়ে বসতেন, যে-সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাদের কাজ চলবে, আসর বসবে, আলোচনাও হবে—প্রস্তাব এবং পরিকল্পনাও তৈরি হবে, পেশ করা হবে। কিন্তু জ্ঞানের যে-আলোকবর্তিকাটি সেইসব আসরে ও অনুষ্ঠানে অম্লান শিখায় জ্বলত—তা আর দেখা যাবে না—ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণে এই অনুভূতিটিই মনের মধ্যে সব চেয়ে বেশি করে জাগছে।

কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালি লোকসংস্কৃতির সেবক, বাউলগানের একনিষ্ঠ সংগ্রাহক ও বিশিষ্ট বিদ্বান উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পরিণত বয়সে সম্প্রতি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বাঙলাদেশ তাঁর মৃত্যুতে বাঙালি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একজন শ্রেষ্ঠ সংগ্রাহক ও গবেষককে হারাল। আমরা তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাঁর অগণিত আত্মীয়পরিজন ও স্বজনবান্ধবদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

আন্তর্জাতিক নারীআন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেত্রী ও বৃটিশ জনজীবনে বিশিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব মনিকা ফেলটনের সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে। আন্তর্জাতিক শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব ও গণতন্ত্রের পক্ষে তিনি নিরলস সংগ্রাম করে গেছেন। নারীমুক্তির মহৎ সংগ্রামের এই মহিয়সী নেত্রীর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকার্ত।

সম্পাদক পরিচয়

সবিনয় নিবেদন,

পৌষ-মাঘ সংখ্যা পরিচয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীসুকুমার মিত্রের চিঠিখানি পড়লাম। আপাতদৃষ্টিতে শ্রীযুক্ত মিত্রের চিঠিটির বিষয়বস্তুর যাথার্থ সন্দেহ করি না। জন মেনার্ড কেইনস (কেউ কীনস বলেন কেউ বা কেইনস—অবশ্য বিলিতি বইতে দেখেছি Keynes pronouned to rhyme "rains") সত্যই তাঁর 'এ ট্রিটিজ অন মানি'তে অনেক কিছুই নতুন কথা বলেছিলেন। অবশ্য বইখানি বেরোতে না-বেরোতেই কেইনস নতুন পথের সন্ধানে প্রায় বই খানিকে বরবাদ করেও দিয়েছিলেন।

কিন্তু শ্রীযুক্ত মিত্রের উল্লেখিত 'কদলী চক্রের' লগ্নি ও সঞ্চয়ের তত্ত্বটি কি কেইনসেরই আবিষ্কার? 'এ ট্রিটিজ অন মানি'র দ্বাদশ পরিচ্ছেদের (যে পরিচ্ছেদে শ্রীযুক্ত মিত্রের উল্লেখিত উদাহরণটি আছে) সূত্রপাতেই কেইনস তাঁর সঞ্চয় ও লগ্নিতত্ত্বের জন্য লুদভিগ মাইজেস (গ্রন্থটির প্রকাশ কাল ১৯১২), জোসেফ সুমপেটার, ডি. এইচ. রবার্টসন, আবরাটি প্রভৃতিকে উত্তমর্ণ মনে করেছেন। স্বয়ং কেইনসও তাঁর ট্রিটিজ-এর বিষয় ভিন্ন মত পোষণ করতেন [When I finished it (A Treatise on Money), I had made some progress towards pushing monetary theory back to becoming a theory of output as a whole.. I failed to deal thoroughly with the effect of changes in the level of output]. আর যদি তাঁর জেনারেল থিয়োরি অব এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট, অ্যাণ্ড মানি তত্ত্বের ক্ষেত্রেও একাধিক পূর্বসূরীর নাম উল্লেখ করা যায়, প্রসঙ্গত টমাস ম্যালথস-এর সাধারণ উদ্বৃত্ত (general glut) সহ কার্যকরী চাহিদার তত্ত্ব (অর্থাৎ পূর্ণনিয়োগ রাখতে হলে পরগাছা সমাজের ভোগব্যবস্থা চালু রাখতে হবে) থেকে ক্নুট উইকসেলের স্বাভাবিক সুদের হারের তত্ত্ব (কেইনসের মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার অনেকাংশে পূর্বসূরী) বহু কিছুই এসে পড়ে। এমন-কি তাঁর বহু আলোচিত নগদ পছন্দের সূত্রসাপেক্ষ সুদের হারের তত্ত্বপ্রসঙ্গেও মঁতেস্কুর কাছে কেইনসের ঋণ স্মর্তব্য (This truth was discerned very precisely by Montes quieu...in respect of the theory of interest it harks back to the doctrines of Montesquieu. Keynes : Preface to the French edition of the General Theory : International Economic Papers,

No 4, pp 68-69)। শ্রীযুক্ত মিত্র যে 'কদলীচক্রের' উল্লেখ করেছেন, তাতেও কেইনস যে নতুন পথ কেটে বেরিয়ে এসেছেন এমন কথাও মনে করা যায়না। কেইনসের মতে, কেবলমাত্র কদলীভোগী ও উৎপাদক কোনও স্বর্গরাজ্যে (Eden) সহসা মিতব্যয় ও সঞ্চয় বাড়ানোর প্রচারের সাফল্য হলে, গড় খরচার সমপরিমান দামে বিক্রেয় কদলী কমদামে বিক্রি হয়ে যাবে। কেননা, কলা জমিয়ে রাখা যায় না, পচে যেতে পারে বলে। ফলে ক্রেতাদের টাকার ক্রয়ক্ষমতা বাড়লো বটে, কিন্তু উদ্যোক্তাদের লোকসানের ফলে মজুর ছাঁটাই শুরু হয়ে যাবে। ফলে দেশের আয় আরও কমবে। পরম্পরায় ছাঁটাই বাড়বে। উৎপাদন কমবে। আয় কমবে। এর ফলে তিনটি অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। (ক) উৎপাদন শূন্যতায় পৌঁছালো, দেশবাসী না খেয়ে মারা পড়লো। (খ) মিতব্যয়িতার প্রচার বন্ধ হলে বা দারিদ্রের ফলে সঞ্চয়করার অভ্যাসও চলে গেল। (গ) লগ্নির সুযোগ করা গেল যাতে লগ্নির ব্যয় কোন ক্রমেই সঞ্চয়ের চেয়ে কম নয়। সঞ্চয় ও লগ্নির, এই তত্ত্বে একটা কেন্দ্রীয় জায়গায় ফাঁক রয়ে গেছে। অর্থাৎ কি ভাবে একটি অর্থনীতি দীর্ঘস্থায়ী মন্দার মধ্যে থেকে যায় তা এতে বোঝা যায় না। ঢেঁকির ওঠাপড়ার মতো সঞ্চয়-লগ্নিতে বিপরীত ভাব এলে, আবার উল্টো দিকে অর্থনীতি ছুটবে। একবার মন্দার দিকে। আরেকবার ফাঁপতির দিকে। অথচ কেইনসের জেনারেল থিয়োরির মূল প্রতিপাদ্য হলো স্বল্পসময়ে মূলধনতান্ত্রিক অর্থনীতি স্বাভাবিকভাবে অপূর্ণকর্মসংস্থানে লগ্নি ও সঞ্চয়ে ভারসাম্য বজায় রাখে। পূর্ণ কর্মসংস্থানের আগেই তারল্যের ফাঁদে অর্থনীতি হোঁচট খেয়ে পড়ে।

একথা ঠিকই যে কেইনস জেনারেল থিয়োরির সপ্তম পরিচ্ছেদে যে সঞ্চয় ও মূলধন লগ্নিরতত্ত্ব দিয়েছেন, তাঁরই মতে তা "...is essentially development of the old" অথচ "the exposition in...Treatise on Money, is of course, very confusing and incomplete in the light of further developements...p. 38"

জেনারেল থিয়োরি লেখবার আগে কেইনস মার্কস-এঙ্গেলস পাঠ করেছিলেন বার্ণার্ড শ-র অনুরোধে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আর্থনীতিক মন্দার কারণ অন্বেষণে। অবশ্য তাঁদের রচনা কেইন্স পছন্দ করেন নি। ১৯৩৫ সালে কেইনস শ-কে লিখলেন, ...you have to know that I believe myself to be writing a book on economic theory which will largely revolutionise....the way the world thinks

about economic problems." আর এ-বইখানিতে কয়েকটি ব্যাধির কথা তিনি বললেন, যেমন, ১। মন্দার স্তরে অর্থনীতি অনেকদিন থেকে যেতে পারে, নিজস্ব কোন শক্তিতে তা নাও উঠে দাঁড়াতে পারে; ২। দেশের সম্পদ নির্ভর করে লগ্নির উপরে, সঞ্চয় যদি কাজে না লাগানো যায়, অর্থনীতিতে সংকোচন দেখা দেয়; ৩। লগ্নি ব্যাপারটাও খুবই অনিশ্চিত, লগ্নিবৃদ্ধিজাত মূলধনের লগ্নিকারীদের লাভ কমে যাওয়ায় ও অতি মূলধনের ফলে, লগ্নি থেমে যেতে পারে। কেননা সুদের হার মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার সমান হয়ে যাবে বলে। লক্ষ্যণীয়, এপ্রসঙ্গে অনেক ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ সহ মার্কসের 'মুনাফার হ্রাসের হার' নিয়মের কথাও মনে হয়। যদিও কেইনস মার্কসের কাছে কৃতজ্ঞতা আদৌ স্বীকার করেন নি। ফলে সমাধান, সরকারী ব্যয়। এর ফলে যদি লগ্নির পরিমাণ বাড়ানো যায়।

টিনবারজেনের গবেষণা প্রবন্ধটিতে বলা বাহুল্য'এই লগ্নি, সঙ্কটের স্বরূপ, প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা রয়ে গেছে। একথা ঠিক কেইনসও বিস্তৃতভাবে সে-সব ব্যাপার আলোচনা করেছেন। কিন্তু বহু বিজ্ঞানী তথা অর্থনীতিবিদ তো একই ব্যাপারে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত না থেকেও সমসিদ্ধান্ত নেন। প্রান্তিক আলোচনার ক্ষেত্রে যেমন জেভনস, মেঙ্গার, পারেতো, ভাইজার, ফন থুনেন, দেশ তফাতেও একই প্রায় সিদ্ধান্ত করে গেছেন। তবে টিনবারজেনের প্রবন্ধটিতে আরও লক্ষ্যনীয়, তিনি ভোগ প্রবণতা বিষয়েও আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত টিনবারজেন-এর সিলেকটেড পেপারের ভূমিকায় সম্পাদকবৃন্দও এ প্রসঙ্গে বলেছেন "In the article "An Economic Policy for 1936" it is not without interest to note that a number of ideas, especially those of the consumption function and its role in the problems of employment policy, anticipated the Keynesian theory." (L. H. Klaseen, L. M. Koyck, H. J. Wittereen)। শ্রীযুক্ত মিত্রকে পুনরায় সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই।

তরুণ সান্যাল

পরিচয়
বর্ষ ৩৯। সংখ্যা ৯
চৈত্র ১৩৭৬

সূচিপত্র

প্রবন্ধ :
অক্টোবরের সেই দিনগুলি। নাদেজদা ক্রুপস্কাইয়া (অনুবাদ : তরুণ সান্যাল) ৮৪৯॥ ভারতের পূর্বাঞ্চলের উপজাতি সমস্যার বিশিষ্টতা। সুনীল সেনগুপ্ত ৮৬৪॥ সমাজ ও আত্মজিজ্ঞাসা। অসীম রায় ৮৭৫॥ ছোটগল্প-বিষয়ক ভাবনা ৯১৬
কাহিনী :
রাজদ্রোহী ঘোড়া। বল্লভী বকসী ৮৮৮
কবিতা :
ধনঞ্জয় দাশ। শান্তিকুমার ঘোষ। বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত। পবিত্র মুখোপাধ্যায়। শিবেন চট্টোপাধ্যায়। তুলসী মুখোপাধ্যায়। সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সেন। মনীন্দ্রমোহন রায়। অমিয় ধর। সত্য সেন। ৯০১—৯১৫
গল্প :
অরাজনৈতিক। দিলীপ সেনগুপ্ত ৯২৪ ॥ "জয়যাত্রায় যাও হে"। দেবেশ রায় ৯২৯
পুস্তক-পরিচয় :
বিষ্ণু দে ৯৪৪ অলোক রায় ৯৪৬
বিবিধ প্রসঙ্গ :
জ্যোতি দাশগুপ্ত ৯৫০ অমিতাভ দাশগুপ্ত ৯৫১। স্বপ্না দেব ৯৫৩। মৃন্ময় ভট্টাচার্য ৯৫৭
বিয়োগপঞ্জী :
শান্তিময় রায় ৯৬০
পাঠকগোষ্ঠী :
নারায়ণ চৌধুরী ৯৬৩
সম্পাদকীয় :
লেনিন সরণী ৯০৩
কাম্বোডিয়ায় মার্কিন আগ্রাসনের প্রতিবাদে বাঙলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের বিবৃতি ৯৭৪

প্রচ্ছদপট : বিশ্বরঞ্জন দে

সম্পাদক
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও

পরিচয়
বর্ষ ৩৯ । সংখ্যা ৯
চৈত্র । ১৩৭৬

অক্টোবরের সেই দিনগুলি

নাদেজদা ক্রুপস্কাইয়া

অক্টোবরে জয়ী হবার মতো শক্তিসমাবেশ ঘটালেন শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি বলশেভিকরা। জুলাই মাসেও এক স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান হয়। কিন্তু পার্টি ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি ওজন করে দেখলেন। বুঝলেন, ক্ষমতাদখল করার অভ্যুত্থানের অনুকূলে তখনও পরিস্থিতি অপরিণত। বাস্তব অবস্থা খুঁটিয়ে বিচার করে দেখা গেল: সাধারণভাবে জনগণ তেমন ধারা বিদ্রোহের জন্য তৈরি নয়। ফলে, কেন্দ্রীয় কমিটি ঘটনাবলীর দ্রুত পটপরিবর্তনের রাশ টেনে ধরাই সাব্যস্ত করলেন। রণক্ষেত্রে যারা ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এক-পা তুলেই আছে, তাদের ঠেকিয়ে রাখা খুবই অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তা ছাড়া বলশেভিকরা তাদের ঠেকিয়ে রাখতেও অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু ঐ উদগ্রীব বিপ্লবীদের রাশ টেনে ধরাটাও ছিল দারুণ দায়িত্বের কাজ। বলশেভিকরা জানতেন সময় মতো আঘাত হানাটাই হলো আসলে গুরুত্বপূর্ণ।

এমনি করে ক-মাস গড়িয়ে গেল। পরিস্থিতিরও বদল হলো। লেনিন তখন ফিনল্যাণ্ডে আত্মগোপন করে আছেন। ১২-১৪ সেপ্টেম্বর পার্টির কেন্দ্রীয়, পেত্রগ্রাদ এবং মস্কো কমিটিগুলিকে তিনি ফিনল্যাণ্ড থেকে চিঠি পাঠালেন: "বলশেভিকরা দু-রাজধানীতেই শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, এবার তারা রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নিতে পারে এবং

তাদের নিশ্চিতভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নিতে হবে।" ইলিচ বললেন, এমন মাহেন্দ্রমুহূর্ত বয়ে যেতে দেওয়া চলে না। কেননা পেট্রগ্রাদের সম্ভাব্য আত্মসমর্পণ জয়ের সম্ভাবনাই দুর্বল করে দেবে। বৃটিশ ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে আলাদা এক শান্তিচুক্তির তখন আলোচনা চলছে। "জাতিসমূহের কাছে এখন শান্তি প্রস্তাব দেওয়ার অর্থই হলো বিজয়ী হবার পথ," লেনিন লিখলেন।

কেন্দ্রীয় কমিটিকে লেখা একটি চিঠিতে লেনিন বিস্তৃতভাবে ক্ষমতা দখল করার অভ্যুত্থানের উপযুক্ত সময় ও প্রস্তুতির বিষয়ে আলোচনা করেন। "সফল হতে গেলে, চক্রান্ত বা কোনো একটি পার্টির উপরে অভ্যুত্থানকে নির্ভরশীল করা চলবে না, অভ্যুত্থানের সাফল্য নির্ভর করে অগ্রগামী শ্রেণীর উপরে। এটি হলো প্রথম শর্ত। জনগণের এক বিপ্লবী উদ্দীপনের উপরে অভ্যুত্থান নির্ভর করে থাকে। এ-হলো দ্বিতীয় শর্ত। যখন জনগণের মধ্যে অগ্রগামী বাহিনীর কার্যকলাপ একেবারে তুঙ্গে এবং যখন শত্রুবাহিনীর মধ্যে ও দুর্বল অর্ধোৎসুক অস্থিরসঙ্কল্প বিপ্লবের বন্ধুদের মধ্যে দোদুল্যমানতাও চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছে—সেই ক্রমবর্ধমান বিপ্লবের ইতিহাসের বাঁক নেবার মুহূর্তের উপরে থাকে অভ্যুত্থানের ভিত্তি, এটি হলো তৃতীয় শর্ত।"

ঐ চিঠির শেষদিকে লেনিন বিপ্লবী অভ্যুত্থানের বিষয়ে মার্কসবাদী মত আলোচনা করলেন "বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে মার্কসবাদী পন্থায়, অর্থাৎ কোনো শিল্পকর্মের মতো করে দেখতে হলে, আমাদের একটি মুহূর্তও এখন নষ্ট করা চলবে না। একই সময়ে আমাদের এখন দরকার বিপ্লবী বাহিনীগুলির হেড কোয়ার্টার সংগঠন, আমাদের সৈন্যবাহিনী বণ্টন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিশ্বাসী দলগুলিকে প্রেরণ, আলেকসানদ্রিস্কি থিয়েটার ঘিরে ফেলা, পিতর ও পল দুর্গ দখল, সেনাপতিমণ্ডলী ও সরকারকে গ্রেপ্তার করা এবং অফিসার ক্যাডেটদের ও স্যাভেজ ডিভিসনের বিরুদ্ধে এমন বাহিনী প্রেরণ করা—যারা নগরীর সামরিক গুরুত্বের জায়গাগুলিতে শত্রুসৈন্যদের এগোতে দেবার আগে মৃত্যুবরণ করবে। সশস্ত্র শ্রমিকদের বাহিনীভুক্ত করে শেষ ও মরিয়া যুদ্ধের জন্য ডাক দিতে হবে। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অবিলম্বে দখলে আনতে হবে। আমাদের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের হেড কোয়ার্টার কেন্দ্রীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জে সরিয়ে নিয়ে সব কারখানা, সৈন্যবাহিনী এবং সশস্ত্র লড়াইয়ের কেন্দ্রগুলির সঙ্গে টেলিফোনে তার-সংযোগ সাধন করতে হবে।"

"অবশ্য এসব কথা উদাহরণ দিতেই উল্লেখ করা মাত্র। তবে শুধু এ-কথাটাই বর্তমান মুহূর্তে ব্যাখ্যা করতে চাইছি যে, মার্কসবাদের নিকটে অনুগত এবং বিপ্লবের প্রতি অনুগত থাকতে গেলে এখন **বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে একটি শিল্পকর্ম হিসাবে না দেখতে শেখা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার।"**

ইলিচ ফিনল্যাণ্ডে শঙ্কিত হচ্ছিলেন, পাছে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মাহেন্দ্রলগ্ন বয়ে যায়। সাতই অক্টোবর তিনি পেট্রগ্রাদ নগর সম্মেলন, কেন্দ্রীয়, মস্কো ও পেট্রগ্রাদ কমিটি এবং পেট্রগ্রাদ ও মস্কোর সোভিয়েতগুলির বলশেভিক প্রতিনিধিদের কাছে চিঠি দিলেন। আর, পাছে সময় মতো চিঠি তাঁদের কাছে না পৌঁছয়, সেই আশঙ্কায় ৯ই তারিখে তিনি স্বয়ং পেট্রগ্রাদে এসে হাজির হলেন। এবং ভাইবোর্গ সাইড অঞ্চলের একটি ফ্ল্যাটে আত্মগোপন করে অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির ব্যাপারে নির্দেশ দিতে লাগলেন।

মাসের সেই শেষ দিনগুলি ধরেই তিনি ঐসব প্রস্তুতির কাজে একেবারে ডুবে রইলেন। তাঁর চিন্তার মধ্যে আর তখন অন্য কোনো কিছুই ছিল না। তাঁর উৎসাহ আর বিজয় সম্পর্কে দৃঢ় আস্থা চারপাশের কমরেডদের মধ্যে উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলল।

উত্তরাঞ্চলের সোভিয়েত কংগ্রেসের বলশেভিক প্রতিনিধিদের কাছে ফিনল্যাণ্ড থেকে লেখা তাঁর সর্বশেষ চিঠিটি ছিল অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি লিখলেন...."সশস্ত্র অভ্যুত্থান এক **বিশেষ** আকারের রাজনৈতিক সংগ্রাম, তারও বিশিষ্ট নিয়মকানুন আছে—যেসব বিষয়ে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। কার্ল মার্কস অতুলনীয় স্বচ্ছতায় সেই সত্যই প্রকাশ করেছেন যখন লিখেছেন **'বিপ্লবী অভ্যুত্থান যুদ্ধের মতোই এক শিল্পকর্ম।"**

"এই শিল্পকর্মের মূল নিয়মগুলি বিষয়ে মার্কস নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দেশ করেছেন :

"(১) বিপ্লবী অভ্যুত্থান **নিয়ে খেলা করো না,** কিন্তু যখন একবার শুরু করবে দৃঢ়ভাবে মনে রেখো **সমস্ত পথটাই** তোমাকে যেতে হবে।

"(২) সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়ে **বিপুল উন্নততর শক্তিসমাবেশের** কেন্দ্রীভবন ঘটাতে হবে। তা না করতে পারলে তাদের ভালো প্রস্তুতি ও সংগঠনের সুবিধা-সুযোগ নিয়ে শত্রুবাহিনী বিপ্লবী অভ্যুত্থান-কারীদের ধ্বংস করে দেবে।

"(৩) বিপ্লবী অভ্যুত্থান একবার শুরু হয়ে গেলে, দৃঢ়তম সংকল্পে সকল

রকমে, অভ্রান্তভাবে আক্রমণকারীর ভূমিকা নিতে হবে, 'আত্মরক্ষামূলকতাই হলো প্রতিটি বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মৃত্যু'।

"(৪) শত্রুদের হতচকিত করে তাদের পরাস্ত করার চেষ্টা চালাতে হবে আর যখন শত্রুর শক্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ঠিক সেই সময়টাই হলো আক্রমণের মাহেন্দ্রক্ষণ।

"(৫) দৈনিক-সাফল্যের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যতটুকুই হোক-না কেন (নগরীর ব্যাপার হলে, ঘণ্টামাফিক সাফল্য) এবং যে-কোন মূল্যে 'নৈতিক ভাবে উচ্চতর শক্তিধর অবস্থা রক্ষা করতে হবে'।

"মার্কস সব বিপ্লবের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের শিক্ষার বিষয়ে বিপ্লবী নীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা দাঁতঁর কথামতো এক কথায় বলেছিলেন *'de l'audace, de l'audace encore de l'audace'* (দুঃসাহস, দুঃসাহস, পুনরায় দুঃসাহস)।

"রুশদেশে এবং ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে, এসব কথার অর্থ হলো একই সঙ্গে পেট্রগ্রাদে আক্রমণ চালাতে হবে, যতটা সম্ভব আকস্মিক ও দ্রুত। আক্রমণ চালাতে হবে ভেতর ও বাইরে থেকে, শ্রমিকদের বস্তি ও ফিনল্যাণ্ড থেকে, রেভেল ও ক্রনস্টাডট্,—সমস্ত নৌ-বাহিনী থেকে, ১৫০০০ বা ২০,০০০ আমাদের 'বুর্জোয়া গার্ড' (ক্যাডেটদের স্কুল), আমাদের 'ভেনদি বাহিনী' (কশাকদের একাংশ)-র চেয়ে ঢের বেশি বিপুল শক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে এবং ইত্যাদি।

"আমাদের তিনটি মূল শক্তি—নৌবহর, শ্রমিকশ্রেণী ও সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলি—এদের মধ্যে এমনভাবে সমন্বয় ঘটাতে হবে যাতে অভ্রান্তভাবে দখল করা এবং যে কোনো মূল্যে দখলে রাখা যায়—(ক) টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, (খ) টেলিগ্রাফ অফিস, (গ) রেলওয়ে স্টেশন, (ঘ) আর সবার উপরে সেতুগুলি।

"সব চেয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিদের (আমাদের 'চমক বাহিনী' এবং তরুণ শ্রমজীবীরা তো বটেই তাদের সঙ্গে সরেশ নৌ-সেনানীদের) নিয়ে ছোট ছোট জাঠা গড়তে হবে, যাতে সব গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি দখল করা যায় এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণে প্রতিটি অঞ্চলেই যাতে অংশ গ্রহণ করা যায়, যেমন উদাহরণ স্বরূপ—

"পেট্রগ্রাদকে ঘিরে ফেলা এবং বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, নৌ-বাহিনী, শ্রমিকরা এবং সৈন্যবাহিনীর যুক্ত আক্রমণে পেট্রগ্রাদ দখল করা—এ হলো এমন এক কর্তব্য যাতে নৈপুণ্য এবং তিনগুণ দুঃসাহসিকতা প্রয়োজন।

"সরেশ শ্রমিকদের নিয়ে বাহিনী গড়ে তুলতে হবে, শত্রুর কেন্দ্রগুলিকে (ক্যাডেটদের স্কুল, টেলিগ্রাফ অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ) আক্রমণ ও ঘিরে ফেলার জন্য। রাইফেল ও বোমা দিয়ে তাদের সশস্ত্র করতে হবে।

"তাদের মন্ত্র হবে '**শত্রুকে পথ ছেড়ে দেবার আগে শেষ ব্যক্তিটির মৃত্যুও কাম্য**"।

"আশা করা যাক, আক্রমণের সিদ্ধান্তই যদি গ্রহণ করা হয়, তা হলে নেতৃবৃন্দ দাঁতঁ ও মার্কসের সিদ্ধান্তগুলি কাজে লাগাবেন।

"রুশদেশের ও বিশ্ববিপ্লবের সাফল্য দুই অথবা তিন দিনের লড়াইয়ের উপরে নির্ভর করছে।

চিঠিটি লেখার তারিখ ২১ অক্টোবর (পুরনো মতে ৮ই)। তার পরের দিনই লেনিন পেট্রগ্রাদে পৌঁছলেন। তার পরের দিনই কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে যোগ দিলেন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ সমগ্র অভ্যুত্থানের বিরোধিতা করলেন। তাঁরা বললেন, অবিলম্বে কেন্দ্রীয় কমিটির এক বর্ধিত সভা ডাকা হোক। কামেনেভ তো কেন্দ্রীয় কমিটি থেকেই সাড়ম্বরে পদত্যাগ করে বসলেন। লেনিন বললেন, শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে পার্টি এঁদের গুরুতর শাস্তি বিধান করুক।

সুবিধাবাদী ধারাগুলিও পরাস্ত হলো। অভ্যুত্থানের জন্য দ্রুত প্রস্তুতি চলল। ২৬ অক্টোবর (১৩ই) পেট্রগ্রাদ সোভিয়েত-এর এক্সিকিউটিভ কমিটি সামরিক বিপ্লবী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন। ২৯ (১৬ই) কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি সংগঠনগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ঐ একই দিনে বিপ্লবী সামরিক কেন্দ্র স্থাপিত হলো। সদস্য হলেন কমরেডস স্টালিন, স্ভের্দলভ, দ্ঝারঝিনস্কি, এবং অন্যান্যরা—যাঁরা অভ্যুত্থানে বাস্তব নেতৃত্ব দিতে সক্ষম।

তার পরের দিন পেট্রগ্রাদ সোভিয়েত-এর সকলেই সামরিক বিপ্লবী কমিটি গঠনে সমর্থন জানালেন। এর পাঁচদিন পর রেজিমেণ্টাল কমিটিগুলি একটি সভায় একে পেট্রগ্রাদের সর্বোচ্চ সামরিক সংস্থা বলে মেনে নিলেন। তাঁরা ঠিক করলেন সামরিক হেডকোয়ার্টার-এর নির্দেশ এই কমিটিদ্বারা স্বাক্ষরিত না হলে তা মানা হবে না।

সামরিক বিপ্লবী কমিটি বিভিন্ন সামরিক ইউনিটগুলির জন্য পাঁচই নভেম্বর (২৩ অক্টোবর) কমিসার নিয়োগ শুরু করলেন। তার পরদিনই অস্থায়ী সরকার, কমিটির সদস্যদের আদালতে সোপর্দ করার জন্য হুকুম দিলেন, হুকুম

ছিলেন সামরিক কমিসারদের গ্রেপ্তার করায়। শীত প্রাসাদে সামরিক বিদ্যালয়ের শিক্ষানবীশ অফিসারদের এনে জমায়েত করা হলো। কিন্তু তখন ঢের দেরি হয়ে গেছে। সৈন্যবাহিনী তখন বলশেভিকদের সমর্থন করছে। শ্রমিকরা চাইছে সোভিয়েতগুলি অবিলম্বে সরকার হাতে নিক। বিপ্লবী সামরিক কমিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তখন কাজ করছেন। বস্তুত কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ সদস্যই এই কমিটির মধ্যে ছিলেন, যেমন, স্টালিন, স্ভের্দলভ, মলতফ, দ্ঝারঝিনস্কি এবং বুবনভ। অভ্যুত্থান প্রস্তুত হচ্ছিল।

৬ই নভেম্বর (২৪ অক্টোবর)। ইলিচ তখনও ভাইবোর্গ সাইডের একটি বাড়িতে গোপনে অবস্থান করছেন। বাড়িটি পার্টি-সদস্যা মার্গারিতা ফোফানোভার (৪২ নং বাসা, ৯২/১ নম্বর বাড়ি, বোলসায়া স্যাম্প্‌সোনিয়েভস্কায়া এবং সারদোবোলস্কায়া রাস্তাদুটির সঙ্গমস্থলে)। অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির খবরাখবর তিনি পাচ্ছিলেন। কিন্তু নিজে তো আর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছিলেন না। অধৈর্যে তিনি ছটফট করছিলেন। সেদিন মার্গারিতা মারফত আমাকে দিনভর অনেকগুলি চিঠি পাঠালেন উচ্চতর কমিটিকে পৌছে দেবার জন্য। বারবার সেই একই কথা। আর দেরি নয়, আর দেরি নয়। সন্ধ্যাবেলায় জনৈক ফিনল্যাণ্ডের কমরেড এ্যাইনো রাহজা লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। কলকারখানা ও পার্টি সংগঠনগুলির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। পার্টি সংগঠনগুলির সঙ্গে লেনিনের যোগাযোগ রাখার জন্যই তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এ্যাইনো জানালেন, রাস্তায় রাস্তায় এখন নতুন নতুন টহলদারী সৈন্য ঘুরছে। খুলে নেওয়া যায়, নেভা নদীর এমন সাঁকোগুলি অস্থায়ী সরকার তুলে নেওয়ার নির্দেশ পাঠিয়েছেন, যাতে নগরী থেকে শ্রমিকাঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ব্রিজগুলির প্রহরায় আছে সামরিক বাহিনী। স্পষ্ট বোঝা যায়, বিপ্লবী অভ্যুত্থান শুরু হয়ে গেছে। ইলিচের ইচ্ছা স্টালিন তাঁর সঙ্গে এসে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করুন। কিন্তু এ্যাইনো বললেন, স্টালিনের পক্ষে এসে পৌছনো এখন প্রায় অসম্ভব। অবিলম্বে তো নয়ই। রাস্তায় ট্রাম চলছে না। সম্ভবত স্টালিন তখন স্মোলনিতে সামরিক বিপ্লবী কমিটির অধিবেশনে ব্যস্ত। ইলিচ তৎক্ষণাৎ ঠিক করলেন, এক্ষুনি তাঁকে স্মোলনিতে পৌছতে হবে। মার্গারিতার জন্য একটি চিরকুট রেখে গেলেন "যেখানে আমাকে কিছুতেই পাঠাতে চাননি, সেখানেই চললুম। পরে দেখা হবে। ইলিচ।"

সারা রাত ধরে ভাইবোর্গ সাইডের জনগণকে সশস্ত্র করা হলো। দলের

পর দল শ্রমিকরা জেলা কমিটিতে অস্ত্রশস্ত্র ও নির্দেশাবলীর জন্য আসতে লাগল। অনেক রাতে ফনকোভার ফ্ল্যাটে গিয়ে শুনলাম, লেনিন স্মোলেনির দিকে রওনা হয়ে গেছেন। জানতে চাইলাম স্মোলনিতে ভালোভাবে পৌঁছেছেন তো তিনি। আমাদের অঞ্চল থেকে একটি ট্রাক রওনা হচ্ছিল ও-দিকেই। ভাইবোর্গ-এর জেলা সম্পাদক ঝেনিয়া ইয়েগোরোভার সঙ্গে ঐ ট্রাকে উঠলাম। আমার মনে পড়ছে না, ইলিচের সঙ্গে আমার স্মোলনিতে দেখা হলো কিনা। কিংবা ওখানেই তিনি আছেন কিনা তা দেখা বা শোনা। সে যাইহোক, আমাদের মধ্যে কথাবার্তা যে হয়নি সেটা নিশ্চিত। কেন না, তিনি তখন বিপ্লবী অভ্যুত্থানে নির্দেশ দেওয়ার কাজে মগ্ন ছিলেন। তাঁর স্বভাব অনুযায়ী যথারীতি বিস্তৃতভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কর্তব্য সম্পাদনে তিনি ডুবে ছিলেন।

স্মোলনিতে তখন আলোর প্লাবন বইছে। মৌচাকে চলেছে যেন কাজের ব্যস্ততা। রেড গার্ড, কলকারখানার প্রতিনিধি ও সৈন্যরা নগরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নির্দেশ নেবার জন্য সেখানে আসছিলেন। অনবরত চলেছে টাইপ-রাইটারের খটখট, টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং। আমাদের মেয়েরা টেলিগ্রামের স্তূপের উপরে ঝুঁকে পড়ে কাজ করছে। আর চারতলায় বসেছে সামরিক বিপ্লবী কমিটির নিরবচ্ছিন্ন অধিবেশন। বাইরের স্কোয়ারে সাঁজোয়া গাড়িগুলির ইঞ্জিন চালু রয়েছে। রয়েছে তিন ইঞ্চি হাঁ-মুখের একটি ফিল্ডগান আর যে কোনো সময় ব্যারিকেড তৈরি করার জন্য জ্বালানি কাঠের স্তূপ। দেউরিতে মেশিনগান বসানো। দরজায় দরজায় সান্ত্রী।

বেলা দশটা, ৭ই নভেম্বর (২৫ অক্টোবর)। পেট্রগ্রাদ সোভিয়েত-এর সামরিক বিপ্লবী কমিটি তাঁদের ঘোষণা 'রুশদেশের নাগরিকদের প্রতি' ছাপাখানায় পাঠালেন। ঘোষণায় বলা হয়েছে:

"অস্থায়ী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। রাষ্ট্রশক্তি এখন পেট্রগ্রাদ-এর শ্রমিক ও সৈন্যদের সোভিয়েত-এর ডেপুটিদের মুখপাত্র, পেট্রগ্রাদ-এর প্রোলেতারিয়েত ও সৈন্যবাহিনীর প্রধান বিপ্লবী সামরিক কমিটির হাতে এসেছে।

"যেসব লক্ষ্যগুলির জন্য জনগণ লড়াই করেছে, যথা, অনতিবিলম্বে গণতান্ত্রিক শান্তির উদ্যোগ, ভূ-সম্পত্তির মালিকানার অবলোপ, উৎপাদনে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং সোভিয়েত ক্ষমতার সংস্থাপন—সেই লক্ষ্যস্থল অর্জিত হয়েছে।

"শ্রমিক, সৈনিক এবং কৃষকদের বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!"

স্পষ্টতই বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে। কিন্তু সামরিক বিপ্লবী কমিটি ২৫ সকালেও একের পর এক সরকারী সংস্থা দখল ও সেগুলিতে প্রহরী মোতায়েনের কাজে নিরতিশয় ব্যস্ত রইলেন।

বেলা আড়াইটায় পেট্রগ্রাদের শ্রমিক ও সৈন্যদের সোভিয়েত-এর প্রতিনিধিরা একটি সভায় মিলিত হলেন। সভায় আনন্দের ঝড় বয়ে গেল যখন প্রতিনিধিরা শুনলেন অস্থায়ী সরকারের আর কোনো অস্তিত্বই নেই। কয়েকজন মন্ত্রী গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং অন্যান্যদের জন্যও তল্লাসি চলেছে। প্রাক-পার্লামেণ্ট (অস্থায়ী সরকারকে উপদেশ দেবার সংস্থা) ভেঙে দেওয়া হয়েছে। রেলওয়ে স্টেশন, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস এবং স্টেট ব্যাঙ্ক দখলে এসে গিয়েছে। শীতপ্রাসাদে আক্রমণ চলেছে, যদিও এখনও তার পতন ঘটেনি। তবে তার ভাগ্যও আমাদের হাতে। সৈন্যরা অদৃষ্টপূর্ব সাহস দেখাচ্ছেন। সত্যিকারের ক্ষমতা-দখল সম্পূর্ণ রক্তপাতহীনভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।

লেনিন হল-এ প্রবেশ করলেন। তুমুল জয়ধ্বনিতে সবাই ফেটে পড়লেন। অধিবেশনে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখলেন। বক্তাসুলভ আড়ম্বর বা অলঙ্কার বাহুল্যহীন তাঁর বাচনভঙ্গীতে তিনি বললেন, জয় হয়েছে। তারপর স্বভাবসুলভ রীতিতে চলে এলেন যে-কর্তব্যগুলি অবিলম্বে পালন করতে হবে, সেগুলির কথায়।

তিনি বললেন, রুশদেশের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটল। বুর্জোয়াদের বাদ দিয়েই সোভিয়েত সরকার কাজ চালাতে পারবে। একটি ঘোষণায় ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটানো হবে। সত্যিকারের শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন আনা হবে। এবার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই। পুরাতন রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করা হবে। এবং নতুন এক শক্তি, সোভিয়েত সংগঠনসমূহের ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা করা হবে। আমাদের হাতে শক্তি যোগাবার মতো গণসংগঠন আছে। যে কোনো বিরোধিতাকে সে-শক্তি পরাস্ত করতে সক্ষম। এখন অনতিবিলম্বে শান্তি প্রতিষ্ঠাই হলো আশু কর্তব্য। এ-জন্য মূলধনপতিদের পরাস্ত করতে হবে। আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণী ইতিমধ্যেই বিপ্লবী উদ্দীপনা দেখিয়েছেন। তাঁরা আমাদের শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করবেন।

সোভিয়েত-এর সদস্যরা যেন তাঁর কথাগুলি গিলছিলেন। সত্যিই তো, এক নতুন যুগ ইতিহাসে শুরু হয়ে গিয়েছে। গণসংগঠনগুলি হয়ে উঠেছে অপরাজেয়। জনগণ উঠে দাঁড়িয়েছেন। বুর্জোয়াদের ক্ষমতা ধূলিসাৎ হয়ে

গেছে। এবার আমরা জমিদারের জমি নিয়ে নেবো, কারখানার মালিকদের খর্ব করব, আর সবার চেয়ে বড় কথা, শান্তি আমরা অর্জন করে নেবো। বিশ্ববিপ্লব আমাদের সহায়তায় এগিয়ে আসবে। লেনিন তো ঠিক কথাই বলেছেন লেনিনের বক্তৃতা শেষ হলো। বিপুল হর্ষধ্বনি! জয়-জয়কার!

সন্ধ্যা বেলায় সোভিয়েতগুলির দ্বিতীয় কংগ্রেস-এর অধিবেশন বসবার কথা। সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা তাঁরাই ঘোষণা করবেন। তাঁরাই অর্জিত বিজয়কে আইনসিদ্ধ করবেন।

প্রতিনিধিরা আসতে শুরু করলেন। তাঁদের সমর্থন পাবার জন্য প্রচার চলল পুরোদমে। শ্রমিকদের শাসনে তো কৃষকদেরও সমর্থন পেতে হবে। সোশালিষ্ট রেভল্যুশনারিদের কৃষকদের মুখপাত্র বলে মনে করা হতো। দক্ষিণ-পন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা ধনী কৃষক কুলাকদের প্রতিনিধিত্ব করতেন। বামপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা ছোট চাষীদের ভাবাদর্শের প্রতিভূ ছিলেন বটে, কিন্তু বুর্জোয়া আর সর্বহারার মধ্যে পেটি বুর্জোয়াসুলভ তাঁদের দোদুল্যমানতাও ছিল।

সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি দলের পেট্রগ্রাদ কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন নাতানশন, স্পিরিদোনোভা ও কামকভ। প্রথম প্রবাসের যুগে ইলিচ নাতানশনকে চিনতেন। সেই ১৯০৪ সালে নাতানশন মার্কসবাদের বেশ কাছাকাছি এসেছিলেন। তাঁর কাছে কেবল মনে হতো, সোশাল ডেমোক্রাটরা চাষীদের ভূমিকাকে বড়োই খাটো করে দেখেন। স্পিরিদোনোভা বেশ জন-প্রিয় ছিলেন। প্রথম বিপ্লবের সময়, ১৯০৬ সালে, মাত্র সতেরো বছর বয়সে তামবভ্ গুবেরনিয়ায় কৃষক আন্দোলন দমনকারী লুজেনোভস্কিকে তিনি হত্যা করেন। ফলে গ্রেপ্তার হন এবং অমানুষিক অত্যাচারের সম্মুখীন হন। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব পর্যন্ত তিনি কঠোর সশ্রম কারাদণ্ডে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত ছিলেন। পেট্রগ্রাদের বামপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরাও জনগণের বলশেভিক মানসিকতায় প্রভাবিত ছিলেন। অন্যান্যদের চেয়ে বলশেভিকদের প্রতি তাঁদের মনোভাবও বেশ প্রসন্ন ছিল। তাঁরা দেখেছেন, জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে চাষীর হাতে জমি দেওয়ার ব্যাপারে বলশেভিকরা কি দারুন উৎসাহী। বাম-সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা বলতেন জমির মালিকানায় সমানাধিকারের কথা। বলশেভিকরা বলতেন গোটা কৃষিঅর্থনীতিই সমাজতান্ত্রিক পন্থায় পুনর্গঠন করার কথা। ইলিচ মনে করতেন, প্রাথমিক কাজ হলো—অবিলম্বে

জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্তকরণ; তারপর সময়ই দেখিয়ে দেবে কোন পথে পুনর্গঠন চলবে। কি-ভাবে জমির ঘোষণাপত্রটি রচিত হবে, সে-কথাই তিনি তখন ভাবছিলেন।

কোকানোভার স্মৃতিচিত্রনে একটি চমৎকার অংশ আছে। তিনি লিখছেন: "আমার মনে পড়ছে, লেনিন আমাকে নিখিল রুশ কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের বুলেটিনগুলি সংগ্রহ করে তাঁকে এনে দিতে বললেন। সেগুলি অবশ্য এনেও দিলাম। কতগুলি সংখ্যা তা আমার মনে নেই। তবে বলতে পারি কাগজপত্তরের এক স্তূপবিশেষ। অর্থাৎ, পড়াশোনা করার এক বিপুল সম্ভার। দুদিন ধরে অনেক রাত পর্যন্ত ভ্লাদিমির ইলিচ ওসব নিয়ে পড়াশোনা করলেন। সকালে বললেন, "বেশ মনে হচ্ছে সব সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিকেই চিনে ফেলেছি। এখন কেবল তাঁদের ক্ষুদে চাষী (মুঝিক) ম্যানডেটটি পড়াই বাকি আছে আজকের জন্যে।" কয়েক ঘণ্টা বাদে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। হাতের পত্রিকার খণ্ডটি তিনি খোস মেজাজে হাত দিয়ে চাপড়াচ্ছিলেন। (দেখলাম আগস্ট ১৯-এর বুলেটিন)। "এতক্ষণে বাম-সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের সঙ্গে মতৈক্য হলো। ২৪২ জন ডেপুটি যে-ম্যানডেটে সই করেছেন সে-ম্যানডেট তো আর তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার ব্যাপার নয়। এবার আমরা এর উপরে ভিত্তি করেই ভূমি-আইন রচনা করব। দেখি কি-ভাবে বামপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা আমাদের সঙ্গে না এসে পারেন।" তিনি আমাকে পত্রিকাখণ্ডটি দেখালেন। কোনো কোনো অংশে নীল পেন্সিলের দাগা বোলানো। বললেন, "এখন আমাদের দিকেও কিছু দরজা খোলা রাখতে হবে যাতে আমাদের পথেই তাঁদের সামাজিকীকরণ নতুন ছাঁচে গড়ে তোলা যায়"।

মার্গারিতা পেশায় ছিলেন কৃষি বিশেষজ্ঞ। তাঁর পেশার জন্যই তাঁকে এমন সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো। ইলিচ সব সময়েই মার্গারিতার সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহ দেখাতেন।

এখন প্রশ্ন, বাম-সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন কি যাবেন না?

দ্বিতীয় নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস-এর অধিবেশন বসল পঁচিশে তারিখের রাত দশটা পঁয়তাল্লিশে। কংগ্রেস-এর গঠন, সভাপতিমণ্ডলীর নির্বাচন এবং তার ক্ষমতার সংজ্ঞা নির্ধারণ—এ-সবই ছিল সে-রাতের আলোচ্যসূচি। ৬৭০ জন প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র ৩০০ জন ছিলেন বলশেভিক।

তারপরই হলো সবচেয়ে বড় গোষ্ঠী ১৯৩ জন প্রতিনিধি নিয়ে সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা। মেনশেভিক প্রতিনিধি ছিলেন ৬৮ জন। দক্ষিণপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি, মেনশেভিক ও বুন্দপন্থীরা সীমার বাইরে চলে গেলেন। 'সোভিয়েতে প্রতিনিধিত্ব করে যে রাজনৈতিক দল ও গ্রুপ' তাদের তুচ্ছ করে বলশেভিকদের সামরিক চক্রান্ত ও ক্ষমতা দখলের প্রতিবাদে বলশেভিকদের উপরে গালিগালাজ বর্ষণ করে একটি বিবৃতি পাঠের পর তাঁরা সভাস্থল পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। আন্তর্জাতিকতাবাদী মেনশেভিকদের মধ্যেও কেউ কেউ সভাস্থল ত্যাগ করলেন। বামপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের ১৯৩ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৯ জনের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ছিলেন। সবশুদ্ধ প্রায় পঞ্চাশ জন প্রতিনিধি কংগ্রেস ত্যাগ করে গেলেন। ২৫ তারিখের অধিবেশনে লেনিন যোগ দেননি।

কংগ্রেসের যখন অধিবেশন শুরু হলো, তখন শীতপ্রাসাদের উপরে আক্রমণ চলছে। কেরেনস্কি নাবিকের ছদ্মবেশে আগের দিনই একটি মোটর গাড়িতে প্‌শ্‌কোভ-এ পালিয়েছেন। যদিও তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য ডাইবেঙ্কো ও ক্রাইলেঙ্কোর নির্দেশ প্‌শ্‌কোভ সামরিক বিপ্লবী কমিটির কাছে ছিল, কিন্তু তাঁরা কেরেনস্কিকে গ্রেপ্তার করলেন না। কেরেনস্কি ছুটলেন মস্কোতে সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে। লক্ষ্য, পেট্রগ্রাদে যে-শ্রমিকরা ক্ষমতা দখল করেছে—তাদের আক্রমণ করা। বাকি মন্ত্রীরা কিশকিনের নেতৃত্বে শীতপ্রাসাদে আশ্রয় নিলেন। সমরশিক্ষার্থী ক্যাডেট ও নারী সৈন্যদের 'চমকবাহিনী' শীতপ্রাসাদ রক্ষা করছিল। মেনশেভিক, দক্ষিণপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি ও বুন্দপন্থীরা পাগলের মতো কংগ্রেসে শীতপ্রাসাদ অবরোধের বিরোধিতা করলেন। আরলিশ্‌ তো ঘোষণাই করলেন যে গোলাবর্ষণ বন্ধ না-হলে নগরীর পৌর প্রতিনিধিদের কয়েকজন প্রাসাদ স্কোয়ারে নিরস্ত্রভাবে যাবেন এবং মৃত্যুর ঝুঁকি নেবেন। কৃষক ডেপুটিদের সোভিয়েতের মেনশেভিক ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারি গ্রুপের কার্যকরী কমিটি পৌর প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগ দেওয়া সাব্যস্ত করলেন। মেনশেভিক ও সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা সভাস্থল ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর সকাল ৩-১০ পর্যন্ত সভা স্থগিত রাখা হলো। ঘোষণা করা হলো শীতপ্রাসাদ দখল করা হয়েছে, মন্ত্রীরা গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী ও ক্যাডেটদের নিরস্ত্র করা হয়েছে।

কেরেনস্কি যে-তৃতীয় সাইকেল বাহিনী পেট্রগ্রাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন, তারা বিপ্লবী জনগণের সঙ্গেই যোগ দিয়েছে।

যখন বোঝা গেল বিজয় সুনিশ্চিতভাবে অর্জিত হয়েছে, নিঃসংশয় হওয়া গেল বামপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা কংগ্রেস বয়কট করছেন না, তখন স্মোলনি ত্যাগ করে লেনিন বাকি রাতটুকু কাছাকাছি পেশকিবাসী বন্ধু ক্রুয়েভিচদের বাড়ি বিশ্রাম নিতে গেলেন। আগের রাত্রিও তিনি প্রায় একবারও চোখের পাতা এক করেননি। নির্দেশ দিচ্ছিলেন অভ্যুত্থানের। তাঁকে ঘুমোবার জন্য একটি আলাদা ঘর ছেড়ে দেওয়া হলো। কিন্তু সে-রাতও তিনি ঘুমোতে পারলেন না। কাউকে না জাগিয়ে তিনি শয্যা ত্যাগ করে জমির জন্য ঘোষণাপত্র রচনায় বসলেন। ঐ ঘোষণাপত্রটির ব্যাপারে তিনি নানা দিক থেকেই খতিয়ে দেখে তখন সঠিক চিন্তায় এসে পৌঁছেছেন।

২৬ অক্টোবর (৮ই নভেম্বর) তিনি ভূমিসংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে কংগ্রেসে বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, "এখানে কেউ কেউ বলছেন ভূমি-বিষয়ক ঘোষণাপত্র এবং ম্যানডেট সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা রচনা করেছেন। তাতে কি হয়েছে? কারা রচনা করেছেন, তাতে এসে যায় কি? গণতান্ত্রিক সরকার রূপে, আমরা যে-সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করি, জনগণের সে-সিদ্ধান্তও আমরা তুচ্ছ করতে পারি না। অভিজ্ঞতার অগ্নিপরীক্ষায়, প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘোষণাপত্রটি কাজে লাগিয়ে, স্থানীয়ভাবে এটিকে কার্যকরী করে চাষীরা নিজেরাই বুঝবেন সত্য কোথায় রয়েছে....। অভিজ্ঞতাই হলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, আর অভিজ্ঞতাই বুঝিয়ে দেবে কে ঠিক, আর কেই বা বেঠিক। নতুন রাষ্ট্ররূপের গঠনসংক্রান্ত বিশ্লেষণের ব্যাপারে অভিজ্ঞতাই আমাদের বিপ্লবের সাধারণ প্রবাহে মিলিয়ে দেবে।....আমাদের বিপ্লবের আট মাসে চাষীরা কিছু শিক্ষা লাভ করেছেন, ভূমির তাবৎ সমস্যা তাঁরা নিজেরাই সমাধান করে নিতে চান। সে জন্য এই খসড়া আইনের উপরে যে কোনো সংশোধনীরই আমরা বিরোধী। আমরা এর বিস্তারিত বিবরণ চাই না, আমরা কেবল একটি ডিক্রি রচনা করছি, কাজের জন্য কর্মসূচি রচনা করছি না।"

এইতো পুরোপুরি লেনিন! তুচ্ছ অহঙ্কারের ছিটেফোঁটাও কোথাও নেই। আসল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আদর্শটুকু। কে তা আনলেন, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সাধারণ মানুষের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা, বিপ্লবের সঙ্গেই সাপেক্ষ

সৃজনশীল শক্তি সম্পর্কে ধারণা, জনগণ সব কিছুর ঊর্ধ্বে প্রয়োগের ও ঘটনার তাৎপর্যেই আলোড়িত হয় সেই গভীর বোধ, এবং নিশ্চিতভাবে সেই ঘটনাবলী, জীবন নিজেই, তাদের বুঝিয়ে দেবে যে বলশেভিকদের মতবাদই সঠিক। জমির যে-ঘোষণাপত্র লেনিন প্রস্তাবনা করলেন তা গৃহীত হলো। তারপর ষোলো বছর কেটে গেছে (এ-স্মৃতি চিত্রণের রচনাকাল ১৯৩৩, সঃ পঃ) জমিদারি লোপের পর, পুরাতন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিষয়ক মনোভাব ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে নতুন ধরণের ব্যবস্থা ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। বর্তমানে চাষী গেরস্থির অধিকাংশটাই যৌথখামার ভিত্তিক। পুরনো ছোটমাত্রার চাষ আবাদ এবং পুরনো ছোট মালিক সুলভ মনোবৃত্তি অতীতের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির জন্য এক শক্ত ও কঠিন মৌলভূমির পত্তন ঘটেছে।

২৬ তারিখের সন্ধ্যাবেলার অধিবেশনে শান্তি ও জমির ডিক্রিগুলি গ্রহণ করা হলো। এ দুটি ক্ষেত্রে সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা একমত হলেন। কিন্তু সরকার গঠনের ব্যাপারটা তেমন সহজ সরল হলো না। যদিও বামপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা সভা ছেড়ে চলে যাননি—কেননা তাঁরা বুঝেছিলেন এ-কাজ করলে সাধারণভাবে চাষীদের কাছে একেবারে সম্পূর্ণভাবে প্রভাব হারিয়ে ফেলবেন—দক্ষিণপন্থী সোশাল রেভল্যুশনারি ও মেনশেভিকদের আগের দিন বলশেভিক অতিবিপ্লবীয়ানা, ক্ষমতা দখল প্রভৃতি নিয়ে হুল্লোর করে সভাস্থল ছেড়ে যাওয়ায় তাঁরা খুবই চিন্তিত ছিলেন। দক্ষিণপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যু-শনারি ও অন্যান্যরা সভাস্থল ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বাম-সোশালিস্ট রেভল্যু-শনারি দলের জনৈক নেতা কামকভ বললেন, তাঁরা সংযুক্ত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে। এমন একটি সরকার গঠন করার ব্যাপারে তাঁরা বলশেভিক ও যাঁরা কংগ্রেস পরিত্যাগ করে চলে গেছেন তাঁদের মধ্যে আলাপআলোচনার ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগী হতে রাজি আছেন। বলশেভিকরা এমন সমঝোতায় রাজি ছিলেন। কিন্তু ইলিচ বুঝেছিলেন এসব আলোচনায় কোনো ফলই হবে না। সোভিয়েত শকটে এমন অকেজো বাহনযুথ জুতে দেবার জন্য তো আর বিপ্লব কার্যকরী করা বা জয় অর্জন করা হয়নি যে এমন সরকার গদিতে বসল যারা কিছুতেই একমত হবে না, ফলে যাত্রাই শুরু হবে না। কিন্তু বাম-সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের সহযোগিতা পাওয়া সম্ভবপর—ইলিচ এসব কথা ভাবছেন। ২৬ অক্টোবরের কংগ্রেস অধিবেশনের ক-ঘণ্টা আগে বলশেভিকরা বামপন্থী

সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিদের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হলেন। আমার স্মৃতিতে সেই বৈঠকের ঘটনাপুঞ্জ মুদ্রিত হয়ে আছে। একটি লাল টকটকে নরম সোফামণ্ডিত স্মোলনির একটি কক্ষ। ওরকম একটি সোফায় স্পিরিদোনোভা বসে আছেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে লেনিন নিচু গলায় সনির্বন্ধভাবে কথা বলছেন। ঐকমতে আসা গেল না। বামপন্থী সোশালিস্ট রেভল্যুশনারিরা সরকারে আসবেন না। লেনিন প্রস্তাব করলেন, তাহলে কেবল বলশেভিকদের মধ্য থেকেই প্রথম সমাজতন্ত্রী মন্ত্রী নেওয়া হোক।

২৬ তারিখে রাত্রি নটায় অধিবেশন বসল। আমি ঐ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। মনে পড়ছে, কেমন সাদামাঠাভাবে লেনিন জমির ঘোষণাপত্রটির উপরে রিপোর্ট পেশ করলেন।

প্রতিনিধিরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাঁর বক্তব্য শুনছিলেন। যখন ঐ ঘোষণা পত্রটি পড়া হচ্ছিল আমার কাছে বসা মধ্যবয়সী চাষী চেহারার জনৈক প্রতিনিধির মুখের ভাব দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর সারা মুখ যেন ভেতরের কোনো আগুনের আঁচে জ্বল জ্বল করছিল।

যুদ্ধক্ষেত্রে অবাধ্যতার জন্য কেরেনস্কি যে মৃত্যুদণ্ড প্রবর্তন করেছিলেন, তা বাতিল করা হলো। শান্তি, জমি ও শ্রমিকদের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের ঘোষণাপত্রগুলি গৃহীত হলো। কেবলমাত্র বলশেভিকদের নিয়ে গঠিত মন্ত্রীমণ্ডলীর নামও ঘোষণা করা হলো। ভ্লাদিমির উলিয়ানভ (লেনিন) হলেন মন্ত্রীমণ্ডলীর সভাপতি। তা ছাড়া অন্যান্য দপ্তরগুলি নিম্নলিখিত ভাবে বণ্টন করা হলো : এ. আই. রাইকভ—স্বরাষ্ট্র ; ভি. পি. মিল্যুতিন—কৃষি ; এ. জি. স্যাপনিকভ—শ্রম ; ভি. এ. ওভসেয়েঙ্কো (অ্যানতোনোভ), এন. ভি. ক্রাইলেঙ্কো ও পি. আই. ডাইবেঙ্কোকে নিয়ে একটি কমিটির অধীনে—স্থল ও নৌবাহিনী ; ভি. পি. নোগিন—শিল্প ও বাণিজ্য ; এ. ভি. লুনাচারস্কি—জনশিক্ষা, আই. আই. স্কভোরৎসোভ (স্তেফানভ)—অর্থ ; এল. ডি. ব্রনস্টাইন (ত্রৎস্কি)—বৈদেশিক বিষয় ; জি. আই. ওপ্পোকভ (লোমোভ)—বিচার ; আই. এ. টিওডোরভিচ—খাদ্য ; এন. পি. আভিলভ (গ্লেবভ)—ডাক ও তার বিভাগ ; এবং জে. ভি. দ্জুগাশভিলি (স্টালিন)—জাতীয়তা বিষয়ক মন্ত্রকের সভাপতি। রেলওয়ে মন্ত্রকের পদটি খালি রইল।

কমরেড এ্যাইনে রাহজা সেদিনের কথা আমাকে বলেছেন। সেদিন তিনি

এক কোণে বসে বলশেভিক প্রতিনিধিদের সম্ভাব্য মন্ত্রীদের নাম নিয়ে আলোচনা শুনছিলেন। প্রস্তাবিত নামা জনৈক কমরেড পিপলস কমিশার (মন্ত্রী)-এর পদপ্রার্থী হতে নারাজ হয়ে বললেন, ও-ধরনের কাজে তাঁর কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। লেনিন হেসে ফেললেন। "আমাদের মধ্যে ওরকম অভিজ্ঞতা কার আছে বলে আপনার ধারণা ?"—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। এ-কথা ঠিক এ-ধরনের কাজে কারও কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু লেনিন ইতিমধ্যেই বুঝেছিলেন জনগণের কমিশার এক নতুন ধরনের মন্ত্রী। জনগণের সঙ্গে নিবিড় সংযোগের মধ্য দিয়ে তিনি হবেন তাঁর বিশেষ সরকারী বিভাগের সংগঠনকারী ও নেতা।

অনুবাদ : তরুণ সান্যাল

ভারতের পূর্বাঞ্চলের উপজাতি সমস্যার বিশিষ্টতা

সুনীল সেনগুপ্ত

উপজাতি বা আদিবাসী সমস্যা আজ বহু মহলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে অস্থিরতা যতই বেড়ে উঠছে, ততই ভারতীয় সমাজের প্রান্তীয় এই অংশটির গতিবিধি সম্পর্কেও জল্পনা-কল্পনা ও উদ্বেগ বাড়ছে।

নকশালবাড়ি আন্দোলন রাজধানীর ড্রইংরুম রাজনীতির বাইরে যতখানি বাস্তবে প্রসারিত, তা প্রধানত উপজাতি অঞ্চলের কয়েকটি পকেটকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে

উপজাতি সমস্যা নিয়ে সরকারী তরফেও খানিকটা নাড়াচাড়া পড়েছে। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় নিয়োজিত কেন্দ্রগুলিতেও এই সমস্যা খানিকটা গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। এবার অন্ধ্রের ওয়াল্টেয়ারে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কৃষি-অর্থনীতি সম্মেলনে আগামী বৎসরের যে-আলোচ্য বিষয় নির্ধারিত হয়েছে, তার একটি হলো 'উপজাতির মধ্যে কৃষিবিকাশের সমস্যা'।

সম্প্রতি' উপজাতি' সমস্যা নিয়ে আসামের জোরহাটে দেশের কৃষি-অর্থনীতি গবেষণাকেন্দ্রগুলির একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো। বোধহয় উল্লেখযোগ্য যে, এই সেমিনারে আসাম সরকারের প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করেছেন তাই নয়, ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, রকফেলার ফাউণ্ডেশন এবং মিসোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কিন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিরাও সেমিনারের আলোচনায় রীতিমতো উৎসাহী অংশ গ্রহণ করেছেন।

উপজাতি সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার নানা পদ্ধতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাড়াও এমন কতকগুলি বিষয় নিয়ে সেমিনারে আলোচনা হয় যা হয়তো 'পরিচয়'-এর পাঠকদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করতে পারে। তার একটি হলো 'ভারতে পূর্বাঞ্চলের উপজাতি সমস্যার বিশিষ্টতা'। এই বিশিষ্টতা প্রমাণ স্বভাবতই দেশের অপরাপর উপজাতির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার উপর নির্ভরশীল।

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা এই বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকছে। বর্তমান আলোচনায় সমস্যার রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে যে-উল্লেখ রয়েছে, সেমিনারের আলোচনায় বলাবাহুল্য তা উত্থাপিত হয়নি।

ভারতে তপশীলভুক্ত উপজাতি-জনসংখ্যা ১৯৬১র আদমসুমারী অনুসারে ছিল ২,৮৯,৭৯,২৪৯ বা তিন কোটির মতন। সমগ্র জনসংখ্যার হিসাবে এর অনুপাত শতকরা ৮·৭ ভাগ। বা প্রায় এগারো ভাগের এক ভাগ।

সারা দেশের মানচিত্রে যদি উপজাতি-জনসংখ্যার বসতির ধরনটা লক্ষ্য করা যায় তবে দেখা যাবে উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের একটা অঞ্চল জুড়ে আদিবাসীদের একটা ঘনবসতি অঞ্চল রয়েছে (সমগ্র রাজ্য-জনসংখ্যার শতকরা ২৪ ভাগ উড়িষ্যায়, ২১ ভাগ মধ্যপ্রদেশে ও ৯ ভাগ বিহারে আদিবাসী জনসংখ্যা)। দ্বিতীয় আরেকটি ঘনবসতি অঞ্চল গুজরাট ও রাজস্থানের সংলগ্ন একটি ক্ষেত্র জুড়ে (রাজ্য জনসংখ্যার শতকরা ১৩ ভাগই গুজরাটে, ১১ ভাগ রাজস্থানে)। তৃতীয় ঘনবসতি ভারতের পূর্বপ্রান্তীয় অঞ্চল জুড়ে (আসামে শতকরা ১৭, নেফায় শতকরা ৮৯, নাগাল্যাণ্ডে শতকরা ৯৩, মণিপুরে শতকরা ৩২, ত্রিপুরায় শতকরা ৩২)।

আদিবাসী বা উপজাতি অনধ্যুষিত বা প্রায়-অনধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যে পড়ে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল (তামিলনাড়ুতে শতকরা ১, কেরালায় শতকরা ১, মহীশূরে শতকরা ১)। অন্ধ্রের যে-অংশ উড়িষ্যার সংলগ্ন, সেখানে একটি উপজাতি বসতি রয়েছে এবং তাতে অন্ধ্রের উপজাতি-জনসংখ্যার অনুপাত শতকরা ৪এ উঠেছে। অপরদিকে মহারাষ্ট্রের যে-অঞ্চল গুজরাটের ও মধ্যপ্রদেশের সংলগ্ন, সেখানেও একটি উপজাতি ঘনবসতি থাকায় মহারাষ্ট্রের উপজাতি-জনসংখ্যার অনুপাত শতকরা ৬। পশ্চিমবাঙলার যে-অংশ উড়িষ্যা অথবা বিহারের সংলগ্ন (বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম), সেখানে এবং যে-অংশ সিকিম-ভূটানের সংলগ্ন—সে-অঞ্চলে উপজাতি-জনসংখ্যার এলাকা রয়েছে এবং এই রাজ্যে উপজাতি-জনসংখ্যার অনুপাত শতকরা ৬, পাঞ্জাবে উপজাতি-জনসংখ্যা শতকরা ১-এরও কম। অপরদিকে পশ্চিম-হিমালয়-অঞ্চল হিমাচল প্রদেশে উপজাতি-জনসংখ্যার অনুপাত শতকরা ৮।

ভারতের উপজাতি-জনসংখ্যার অতএব তিনটি মূল বসতি পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমটি পূর্বপ্রান্তীয় অঞ্চল (আসাম, নাগাল্যাণ্ড, নেফা, ত্রিপুরা, মণিপুর)।

দ্বিতীয়টি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ-এর পরস্পর সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চল। তৃতীয়টি রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের পরস্পর সংলগ্ন অঞ্চল। আরও দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট বসতি রয়েছে। একটি দক্ষিণ-উড়িষ্যা ও অন্ধ্রের সংলগ্ন অঞ্চল এবং উত্তর-প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল, হিমালয়ের পাদদেশের অঞ্চল।

জনসংখ্যার দিক থেকে পূর্বপ্রান্তীয় অঞ্চলের উপজাতি সংখ্যাই তিনটি মূল অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে কম—৩২ লক্ষের মতন বা সমগ্র উপজাতির শতকরা ১২ ভাগের মতন। দ্বিতীয় অঞ্চলটিই উপজাতি-জনসংখ্যার প্রধান বসতি—১৮৮ লক্ষের মতন, শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ আদিবাসী এই অঞ্চলে। তৃতীয় অঞ্চলে আছে ৬০ থেকে ৭০ লক্ষের মতন উপজাতি-জনসংখ্যা।

আসামের মূল পার্বত্য উপজাতিগুলির মধ্যে লুসেই, গারো, খাসি, মিকির অন্যতম। তাছাড়া নাগাল্যাণ্ডের নাগা উপজাতি, নেফা অঞ্চলের দাফ্‌লা, আবর, তাগিন, মিসমি, মিরি প্রভৃতি; মণিপুরের থাভো, তানখুল, কাবুই; ত্রিপুরার ত্রিপুরী বা টিপরাই—পূর্বপ্রান্তীয় অঞ্চলের এই উপজাতিগুলি রয়েছে। মধ্য-ভারতীয় অঞ্চলে আছে সাওতাল, মুণ্ডা, ওরাও, গোন্দ, খারিয়া, কোন্ধ, থারওয়ার, কোল, ভিল প্রভৃতি উপজাতি। পশ্চিম-অঞ্চলের প্রধান উপজাতি ভিল, মিনা প্রভৃতি।

আসাম, নাগাল্যাণ্ড, নেফা, মণিপুর এবং ত্রিপুরার যে-পার্বত্য উপজাতিগুলির উল্লেখ করা হলো—তার থেকে মধ্যভারত বা পশ্চিম-ভারতীয় উপজাতির কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে—যে-পার্থক্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতেও প্রতিফলিত হচ্ছে। যদিও ভারতের উপজাতিগুলির বসতির মধ্যে এই মূল সাদৃশ্য পাওয়া যাবে যে, প্রধানত পাহাড়, জঙ্গল ও অপেক্ষাকৃত দুর্গম এবং কৃষিগতভাবে কৃপণ অঞ্চলে এই উপজাতিদের প্রধান বাস (যার জন্য 'হরিজন' শব্দের অনুকরণে 'গিরিজন' শব্দই উপজাতিদের ক্ষেত্রে সম্প্রতি ব্যবহৃত হচ্ছে)। তবু আসামের উপজাতিগুলি মধ্যভারত বা পশ্চিম-ভারতের তুলনায় অনেক বেশি পাহাড় ও দুর্গম অঞ্চলে অধ্যুষিত। ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে এই অঞ্চলগুলি অনেক বেশি ভারতের কেন্দ্রীয় সভ্যতা থেকে পৃথক থেকেছে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারতশাসন পর্বেও এই উপজাতিগুলি উনবিংশ শতাব্দীতে মাত্র বৃটিশ আধিপত্যে এসেছে। এই কারণে এই উপজাতিগুলি এবং তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠী-

গুলি নিজেদের আদিম রাজনৈতিক সংস্থা সমূহের স্বাতন্ত্র্য দীর্ঘকাল বজায় রাখতে পেরেছেন।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক জীবনেও দেখা যায় প্রধানত বিরল বসতির ফলেই এই উপজাতিগুলির মধ্যে আজও পর্যন্ত ভূমিবণ্টনের কৌম ব্যবস্থা প্রায় অব্যাহত রয়েছে। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা খুব সামান্যই এই উপজাতিগুলির মধ্যে আছে। অপরদিকে চাষ-ব্যবস্থার আদিম রূপ এখনও এই উপজাতিগুলির মধ্যে বিপুল পরিমাণে বর্তমান। চাষের এই আদিম রূপ হলো ঝুম্ চাষ বা জঙ্গম চাষ (Shifting cultivation)—বিস্তীর্ণ পাহাড়ী অঞ্চলে আগুন ধরিয়ে জঙ্গল সাফ করে প্রায় হাতে চাষ করার নাম ঝুম্ চাষ। এক জায়গায় এক বছর চাষের পর আবার নতুন জায়গায় জঙ্গল সাফাই হবে এবং অন্তত পাঁচ বছরের আগে পুরনো জায়গা চাষের যোগ্য উর্বরতা ফিরে পাবে না।

আসামের পার্বত্য উপজাতিগুলির চাষ সম্পর্কিত এক সাম্প্রতিক হিসেবে দেখা যায় যে, পার্বত্য উপজাতিগুলির শতকরা ৫৮ ভাগ এখনও ঝুম্ চাষের উপর নির্ভরশীল।

১৯৬১র আদমসুমারীর হিসাবে দেখা যায়, জীবিকা হিসাবে আসামের উপজাতিগুলির (পার্বত্য ও সমতল সহ) শতকরা ৮৪ ভাগ কৃষি ও শতকরা ৪ ভাগ খেতমজুরির উপর নির্ভরশীল।

নাগাল্যাণ্ডে শতকরা ৯৫ ভাগ কৃষি ও ১ ভাগ খেতমজুরির উপর, মণিপুরে শতকরা ৯২ ভাগ কৃষি ও ১ ভাগ খেতমজুরি এবং ত্রিপুরার শতকরা ৮৬ ভাগ কৃষি ও ৪ ভাগ খেতমজুরির উপর নির্ভরশীল।

এর সঙ্গে যদি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার উপজাতিগুলির জীবিকা তুলনা করা যায় তবে দেখা যাবে—কৃষি ও খেতমজুরির অনুপাতটা এই রকম :

	কৃষি	খেতমজুরি	মোটকৃষি
বিহার	৭৮	১০	৮৮
উড়িষ্যা	৬২	২২	৮৪
মধ্যপ্রদেশ	৭২	২০	৯২
পশ্চিমবঙ্গ	৪৯	২৮	৭৭

গুজরাটে এই অনুপাত হলো শতকরা ৫৯ ও ৩১ ; মহারাষ্ট্রে ৫২ ও ৩৮ এবং রাজস্থানে ৮৭ ও ৪।

জীবিকার অনুপাতের এই তুলনামূলক আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—একমাত্র রাজস্থান (যার বিস্তীর্ণ অঞ্চল উষর) বাদ দিলে সমগ্র মধ্য ও পশ্চিম ভারতের উপজাতিগুলি স্থায়ী চাষ-ব্যবস্থায় এর বিরাট খেতমজুর বাহিনীতে পরিণত হয়েছে এবং কৃষি হিসেবে যে-জীবিকা দেখানো হয়েছে—তারও একটু বিশদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কৃষিতে নির্ভরশীল এই জনসংখ্যার এক বড় অংশই ভাগচাষী। পশ্চিমবঙ্গে কৃষি ও খেতমজুরের আওতার বাইরে যে-অংশটা রয়েছে, তার মধ্যে শতকরা ৮ ভাগ খনি, বাগিচা, পাথরকাটা প্রভৃতি জীবিকায় রয়েছে।

মধ্যভারত ও পশ্চিম-ভারতের অ-কৃষি জীবিকার মধ্যে এ-ধরনের বা অনির্দিষ্ট মজুরের সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণ।

অপরদিকে আসাম, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা, মণিপুর অঞ্চলের উপজাতিরা এখনও তাদের উপজাতি স্তরের অর্থনীতির মধ্যে অনেকাংশে রয়ে গেছে যেখানে খেতমজুর বা ভাগচাষের আদৌ অস্তিত্ব নেই। সেখানে কৃষির এক বিপুল অংশ অস্থায়ী ধরনের এবং সেখানে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সামান্যই উদ্ভব ঘটেছে, অ-কৃষি জীবিকার অংশও সামান্য।

মধ্য ও পশ্চিম ভারতে যারা ছিল আদিবাসী, তারা অপেক্ষাকৃত উন্নত কৃষিব্যবস্থার ও সভ্যতার চাপে ধীরে ধীরে জমিচ্যুত হয়েছে এবং নিজেদের আদিম অর্থনীতি থেকে ধীরে ধীরে বিচ্যুত হয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নততর কৃষি তথা অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে হীন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর পাশাপাশি আসাম ও পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য উপজাতিগুলির অবস্থা গুণগতভাবে স্বতন্ত্র। উল্লেখযোগ্য, আদিবাসী শব্দটি পূর্বাঞ্চলের উপজাতিগুলি সম্পর্কে আদৌ লাগসই নয়।

সামাজিক দিক থেকে লক্ষ্য করলেও একটা মূল পার্থক্য নজরে পড়বে।

শুধু ভাষাগোষ্ঠী হিসেবে আসামের পার্বত্য উপজাতিগুলি মধ্যভারত বা পশ্চিম-ভারত থেকে যে পৃথক কেবল তাই নয়—ভারতের কৃষিকেন্দ্রিক হিন্দু-সভ্যতা আসামের পার্বত্য উপজাতিগুলির মধ্যে সামান্যই প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। অপর দিকে ভারতের ইতিহাসের মূল আবর্তের মধ্যে এসে, ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষের তাৎপর্যে বহুদিন ধরে মধ্যভারত ও পশ্চিম-ভারতের কোল, ভিল, সাওতাল, মুণ্ডারি প্রভৃতিদের মধ্যে এমন এক প্রক্রিয়া চলেছিল যার ফলে ব্রাহ্মণ্যসাব্র ভ্যতার বহু ছাপ এদের মধ্যে এসেছে। এমন উপজাতিও আছে

যাদের মধ্যে হিন্দুসভ্যতায় অনুকরণে জাতিভেদ প্রথাও কিছু পরিমাণে এসেছে। এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে বহু উপজাতি হিন্দুসভ্যতার মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে নিম্নবর্ণ জাতে পরিণত হয়েছে। সমাজতত্ত্ববিদেরা ভারতের বর্ণভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থার বিন্যাসের চরিত্র নির্ণয় করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, উপজাতি ও হিন্দু-সমাজ দুটি ঠিক স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা নয়। হিন্দুসমাজের ধারা অনুসরণ করেই উপজাতিগুলির সমাজে এমন প্রান্ততম প্রদেশ খুঁজে পাওয়া যাবে যেখানে বৃহত্তর ব্যবস্থায় বিলুপ্ত হবার অথবা তার থেকে পৃথক থাকার পরস্পর-বিরোধী প্রক্রিয়া সতত চলেছে।

আসাম বা পূর্বাঞ্চলে এ-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বস্তুত আসামের সমতল-বাসী হিন্দুসমাজের দিকেও যদি লক্ষ্য করা যায় তবে দেখা যাবে সেখানে বর্ণভেদ-প্রথা আদৌ শিকড় গাড়তে পারেনি। আসামে হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যশ্রেণী বলে কোনো শ্রেণী কোনো কালে ছিল না। বল্লাল সেনী বর্ণভেদ-প্রথা প্রোথিত হবার সঙ্গেই সেখানে শঙ্করদেবের নেতৃত্বে বর্ণভেদ-বিরোধী বৈষ্ণব আন্দোলন প্রসারিত হয়েছে। ত্রিপুরা ও মণিপুর অঞ্চলেও বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল।

আসামের পার্বত্য উপজাতিগুলির মধ্যে আরেকটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। শুধু গারো, খাসি ও জয়ন্তিয়া উপজাতিগুলি যে মাতৃশাসিত তাই নয়, এই পার্বত্য উপজাতিগুলির মধ্যে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মধ্য বা পশ্চিম ভারতে উপজাতিগুলির মধ্যে হিন্দুসমাজের তুলনায় নারীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, হিন্দুসভ্যতার পুরুষপ্রাধান্য এই উপজাতিগুলিকেও প্রভাবান্বিত করেছে ও করছে।

আসামের পার্বত্য উপজাতিগুলির মধ্যে বাইরের সভ্যতার যে-প্রভাব এসেছে, তা প্রধানত গত একশতকে—বৃটিশ আমলে। খৃষ্টান মিশনারিরা দীর্ঘকাল ধরে হিন্দুসভ্যতামুক্ত এই অঞ্চলে কাজ করেছে এবং সারা ভারতে উপজাতি-জনসংখ্যার মধ্যে যে ১৭ লক্ষ লোক (শতকরা ৫·৫ ভাগের মতন) খৃষ্টধর্মাবলম্বী, তার অধিকাংশই পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য উপজাতির মধ্যে।

গত ৫০ বছর বা আরও সামান্য কিছু সময়ের মধ্যে প্রধানত মিশনারি প্রভাবে মিজো, খাসি, নাগা, গারো, বিশেষত এই উপজাতিগুলির মধ্যে শিক্ষার বিস্তারও ব্যাপক হয়েছে।

সারা ভারতে এবং বিভিন্ন রাজ্যে উপজাতিগুলির সাক্ষরতার হার এইরূপ :

সামাজিক শ্রেণী অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যে সাক্ষরতার হার

	সাধারণ	নিম্নবর্ণশ্রেণী	উপজাতি
সারাভারত	২৮	১০	৯
বিহার	২২	৬	৯
উড়িষ্যা	২৫	১২	৭
মধ্যপ্রদেশ	২০	৮	৫
পশ্চিমবঙ্গ	৩৪	১৪	৭
আসাম	৩৩	২৪	২৪
ত্রিপুরা	২৪	১৩	১০
মণিপুর	৩৬	২২	২৭
নাগাল্যাণ্ড	২০	০	১৫
নেফা	৪৮	০	২৯
রাজস্থান	১৮	৬	৪
গুজরাট	৩৬	২২	১২
মহারাষ্ট্র	৩৫	১৬	৭

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, পূর্বপ্রান্তের অঞ্চলগুলিতে উপজাতির মধ্যে সাক্ষরতার হার সর্বভারতীয় উপজাতির গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। কেবল তাই নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা সর্বভারতীয় সাধারণ গড়ের সঙ্গেও তুলনীয়। এই উপজাতিগুলির মিজো (লুসেই) দের মধ্যে সাক্ষরতার হার শতকরা ৪৪। খাসি সম্প্রদায়ের মধ্যেও সাক্ষরতার হার দ্রুতবর্ধমান। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, জীবনধারণের মানের ক্ষেত্রেও এই উপজাতিগুলির মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে।

আসাম কৃষিঅর্থনীতি-গবেষণাকেন্দ্র কয়েকটি খাসি, লুসেই, গারো গ্রামে সমীক্ষা করেছেন। তাতে গৃহস্থালীর জিনিসপত্রের নিম্নলিখিত হিসাব পাওয়া যায়ঃ

উপজাতি গ্রামে গৃহস্থালীর জিনিসপত্রের হিসাব

	(১) লুসেই গ্রাম (হ্মুন পুই)	(২) গারো গ্রাম (বানসিত্রয়া)	(৩) খাসি গ্রাম (মওত্মুম)
পেতলের বাসনপত্র		৬৬	১৫৫
কাঁচের বাসনপত্র		৭+৬২	১১৩
এ্যালুমিনিয়াম বাসনপত্র	৬৮০	—	৪২৫
কাঠের বাক্স	৬৪	—	—
লণ্ঠন	৪৯	৪১	৪০
বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল	৬০	৪৪	৭৯
খাট (কাঠের)	৮৪	২৩	৩১
আলমারি	২	২	১০
স্টীল ট্রাঙ্ক	২৫	—	—
সেলাইয়ের কল	১১	—	২
হাতঘড়ি	৮	২	৩
দেওয়ালঘড়ি	—	—	৩
গ্রামোফোন	১	১	—
টর্চ	৩৪	১১	১১
বন্দুক	৮	২	৪
রেডিও	—	২	২
সাইকেল	—	৭	৪

[পরিবার সংখ্যা (১) ৪৪, (২) ২৮, (৩) ৩৫]

ভারতের গ্রামের সঙ্গে যারা সামান্যতম পরিচিত—তারাই এই গৃহস্থালী-জিনিসপত্রের তালিকায় চমৎকৃত হবেন, কেননা এ-ধরনের জিনিসপত্র ভারতের অন্যত্র উপজাতি-পরিবারে কেন সাধারণ গৃহস্থ গ্রামীণ-পরিবারেও সচরাচর মিলবে না। স্বভাবতই উচ্চতর শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জীবনের প্রভাবে পার্বত্য উপজাতিগুলির গৃহস্থালীও প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছে।

এছাড়া বিশেষত গত দুই দশকে পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য উপজাতিগুলির মধ্যে চাকুরির ঝোঁক বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। যদিও আমরা আগে দেখেছি যে

সামগ্রিক জীবিকার মধ্যে অ-কৃষিক্ষেত্রের জীবিকা এই উপজাতিগুলির মধ্যে খুবই সামান্য (১৯৬১র আদমসুমারি অনুসারে)। কিন্তু আলোচ্য গ্রামসমীক্ষার ভেতর থেকে এবং সাধারণ নজরেও নতুন ঝোঁকটি সুস্পষ্ট।

সমগ্র আয়ের শতকরা অংশ

	লুসেই গ্রাম (হ্‌মুনপুই)	গারো গ্রাম (বানসিত্নয়া)	খাসি গ্রাম (মওত্‌রুম)
অ-কৃষি মজুরী ও অন্যান্য জীবিকা	১০·৬	৫·৭	২·৬
মাস মাইনের চাকুরি	৮·০	৭·৩	১৭·৬
গ্রামে অর্থপ্রেরণ		১·৩	—

গত দুই দশকে অর্থাৎ স্বাধীনতা ও দেশবিভাগ পরবর্তী পর্বে এই উপজাতিগুলির মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। দেশবিভাগের ফলে লুসেই, গারো ও খাসি অঞ্চলের সঙ্গে পূর্ব-বাঙলার স্বাভাবিক জীবন ছিন্ন হয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যিক লেনদেনে এক বিপর্যয় আসে। অথচ আসাম বা সমগ্র ভারতের মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে নতুন অর্থনীতি গড়ে ওঠারও কোনো প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, উপরন্তু, সমতলবাসী অসমীয়ারা কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসামে যে-সীমাবদ্ধ ক্ষমতা পায়—সেই ক্ষমতা পার্বত্য উপজাতিদের বিরুদ্ধেও যেতে থাকে।

আমরা এর আগেই আসামের তথা পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য উপজাতিগুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি :

(১) অপেক্ষাকৃত রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য এবং আদিম ক্ষমতা সম্পন্ন সংস্থাগুলির অস্তিত্ব।

(২) অর্থনীতিতে আদিম কৌম লক্ষণ এবং অপেক্ষাকৃতভাবে অর্থনীতিতে কম বহিরাক্রমণ। জঙ্গল ও পাহাড় প্রভৃতি সম্পদে স্বীয় ক্ষমতা রক্ষা।

(৩) সামাজিকভাবে হিন্দুসভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষ বা মিলনের প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত থাকা।

তারই পাশাপাশি আমরা সাম্প্রতিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করছি :

(১) খৃস্টান মিশনারিদের প্রভাব ও দ্রুত খৃস্টান ধর্মে অন্তর্ভুক্তি

(২) আধুনিক শিক্ষার প্রসার

(৩) জীবনযাত্রার মানে আধুনিকতার প্রভাব

(৪) আধুনিক চাকুরি ও জীবিকাক্ষেত্রে প্রবেশের ঝোঁক

লক্ষণীয়, প্রথম স্তরের প্রধানত প্রথম দুইটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দ্বিতীয় স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলির বিরোধ রয়েছে। একদিকে ঝুম্ চাষের মতন আদিম চাষের প্রবল অস্তিত্ব, অপর দিকে আধুনিক শিক্ষার প্রসার বা জীবনযাত্রার মানে আধুনিকতার প্রভাব—এর মধ্যে স্পষ্টতই স্ববিরোধ আছে। এই স্ববিরোধের টানাপোড়েনের ফলে পার্বত্য উপজাতিগুলি যখন ক্রমবর্ধমান শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে সঙ্গত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা খুঁজছিল, সেই সময়ই ভারত বিভাগ তার প্রসারের সামান্যতম পথগুলিও রুদ্ধ করে দেয়।

এই পটভূমিকাতেই নাগাবিদ্রোহ, মিজোবিদ্রোহ প্রভৃতি ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে বৃহত্তম পার্বত্য উপজাতি বিদ্রোহগুলিকে দেখতে হবে। শুধুমাত্র সীমান্ত অঞ্চল বলেই নয়, এই পার্বত্য উপজাতিগুলির স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য সমূহ তাদের এই বিদ্রোহগুলিকে এক 'জাতীয়' বিদ্রোহের ব্যাপ্তি দিয়েছিল। রাজনৈতিক ফল-শ্রুতি হিসেবে তাই আমরা নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয় প্রভৃতি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অঞ্চলের আবির্ভাব দেখতে পাচ্ছি। মণিপুর, ত্রিপুরারও রাজনৈতিক মর্যাদায় পরিবর্তন ঘটছে।

রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করা—এ-ঘটনাকে অপেক্ষাকৃতভাবে স্বতন্ত্র উপজাতিগুলির অগ্রগতির প্রথম ধাপ হিসেবে আমরা দেখতে পারি। রাজ-নৈতিক স্বায়ত্তশাসন এই মুহূর্তে চাকুরিক্ষেত্রের সুযোগ খানিকটা প্রসারিত করলেও, মূল অর্থনৈতিক উৎপাদনক্ষেত্রে তার বিশেষ কোনো সুরাহা করবে না।

অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত অলাভজনক ও আদিম চাষ থেকে বেরিয়ে আসা এবং তার পরিবর্তে বিস্তীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলে ফল ও তরিতরকারির চাষ বা বাগান-চাষ গড়ে তোলা এই মুহূর্তের প্রয়োজন। সেদিকে যে ঝোঁক রয়েছে তা খাসি-পার্বত্য অঞ্চলের পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে। কিন্তু এর জন্য একদিকে যেমন আসামের সমতল অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের দ্রুত ব্যবস্থা প্রয়োজন—অপরদিকে তেমনি টিনের প্যাকিং-এ ফল বা ফলের রস তৈরির

ব্যবস্থারও দ্রুত প্রয়োজন যাতে এগুলি বাইরে চালান হতে পারে। এছাড়া জল-বিদ্যুতের যে-প্রচণ্ড সম্ভাবনা এখানে রয়েছে, তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করে সম্ভাব্য শিল্পপ্রসার ঘটানোর ভেতর দিয়েই পূর্বাঞ্চলীয় উপজাতিগুলির জীবনে নতুন সম্ভাবনা উৎসারিত হতে পারে। অন্যথায়, রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করে সেক্রেটারিয়েট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক চাকুরিক্ষেত্রে যে-সাময়িক সুযোগ উপজাতিগুলির অপেক্ষাকৃত উচ্চ শিক্ষিত অংশ পাবে—তাতে অর্থনীতির মূল সমস্যার আদৌ সমাধান হবে না। উপরন্তু, রাজনীতি ও চাকুরিক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে সারা ভারতের প্যাটার্নে একটি সুবিধাবাদী 'এলিট' সৃষ্টি হবে যারা অঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যকে মুষ্টিমেয়ের সুবিধাভোগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ হিসেবে নিরন্তর ব্যবহার করবে। সীমান্তে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ঘটানোর উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হবে।

পরিশেষে পূর্বাঞ্চলের বিশিষ্ট অবস্থায় উপজাতি সমস্যার এই তুলনামূলক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বোধহয় একথা অনুমান করা যায় যে, পূর্বাঞ্চলের মতন মধ্য বা পশ্চিম ভারতে আদিবাসী সমস্যা রাজনৈতিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত স্বতন্ত্র অঞ্চলের আন্দোলনের কোনো সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী রূপ (ঝাড়খণ্ড আন্দোলন সত্ত্বেও) অদূর ভবিষ্যতে পাবে না। এখানকার আদিবাসী আন্দোলন প্রধানত ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীর আন্দোলন। জমি থেকে উৎখাতের বিরুদ্ধে আন্দোলন তথা ভূমিসংস্কারে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবার লক্ষণই ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। এই আন্দোলনে আদিবাসীদের নিকটতম শরিক ভারতের নিম্নবর্ণের হিন্দুরা—যারাও প্রধানত ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ভাগচাষী ও গরীব চাষীশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এ-ছাড়া বিশিষ্ট সমস্যা হিসেবে মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের এক বিরাট অবকাশ রয়েছে। স্বভাবতই আদিবাসী সমাজের অভ্যুত্থান (যার লক্ষণ পশ্চিমবঙ্গে ও অন্যত্র দেখা যাচ্ছে) এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বিরাট শক্তি যোগাবে। সেই শক্তির উৎস আদি-বাসীদের তীর-ধনুক শুধু নয়। সেই শক্তির উৎস আদিবাসী সমাজের সামাজিক ঐক্যের বিরাট ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে সভ্যতর সমাজের হাতে বারংবার মার খাবার যৌথ স্মৃতি, আত্মরক্ষা ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার মানবিক আবেগ।

সমাজ ও আত্মজিজ্ঞাসা

অসীম রায়

সাম্যবাদ যে যৌবনের এক আশ্চর্য সম্ভাবনাপূর্ণ সমার্থক শব্দ তা ভারতবর্ষের নবলব্ধ স্বাধীনতার পর বিশ বছর আগে যৌবনে পা দিয়ে অনেকের মতো আমাদেরও মনে হয়েছে। ইতিমধ্যে কিছু পরিমাণ সাহিত্যে দীক্ষা ঘটেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎস-উচ্ছ্বসিত সাহিত্যের ঘোলা জলের উজান ঠেলে। আমরা কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের কবিতা থেকে ইয়েটসের শেষ পর্বে এসেছি, প্রাক্-বিপ্লব রুশ ও উনবিংশ শতাব্দীর দিকপাল ফরাসী ঔপন্যাসিকদের হাত ধরে টমাস মানের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে কেউ। এবং এই বিরাট চিন্তাপর্বের উত্তরাধিকার আপনার ভেবে আমাদের যৌবনের সার্থকতা খুঁজেছি এক নতুন মানবতাবোধে অথবা আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে মার্কসবাদে। যদিও এ-সত্য আমাদের কাছে তখনও যেমন স্পষ্ট ছিল এখনও তেমনি পরিষ্কার যে মার্কস থেকে মাও পর্যন্ত চিন্তানায়কদের সাহিত্য-শিল্প আলোচনা যৎসামান্যই, তবে যেহেতু বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো দুঃস্থ দেশের আপামর জনসাধারণের ভবিতব্যের সঙ্গে মার্কসীয় চিন্তা ও তার সঙ্গে অপরিহার্য সংগ্রাম দিন ও রাত্রির অবিচ্ছিন্নতায় যুক্ত, তাই সাহিত্যের ভবিষ্যতে অনাস্থার কারণ ঘটেনি। বিশ বছর পরেও এ-অনাস্থার কারণ যে শুধু ঘটেনি তা নয়, ইতিমধ্যে বাঙলা সাহিত্যে এক শক্তিশালী কালচারাল এস্টাব্লিশমেন্টের জন্ম এবং এক নিকৃষ্ট বাজারি সাহিত্যের প্রচারে তার অনলস উদগ্র চেষ্টায় আমাদের নতুন মানবতা-বোধের প্রত্যয় আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার অপেক্ষা রাখে। সঙ্গে সঙ্গে আজ লেখক ও শিল্পীর পক্ষে কি নতুন ভাবে আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজন নেই? দেশে ও বিদেশে মার্কসীয় শিল্পতত্ত্ব ও তার প্রয়োগবিধির যেসব ত্রুটি দেখা গেছে, সেগুলো ধামাচাপা না দিয়ে সে-ত্রুটির পুনরাবৃত্তির পথ থেকে সরে আসা প্রত্যেক সংস্কৃতিকর্মীর এক নতুন দায়। এ-দায় সাহিত্যের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই।

আমাদের কাল দুরন্ত। আধুনিক জ্যোতিষীর অপর নাম রাজনৈতিক

সংবাদদাতার চলতি পথে পা না-বাড়িয়েও সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চেহারা মাথায় রেখে এ-কালের সংঘর্ষময় ভবিষ্যৎ চোখ এড়ানো মুস্কিল। এই সংঘর্ষের পটভূমিকায় লেখক ও শিল্পীর স্থান কি? তাঁদের ভবিতব্যও যখন ভারতবর্ষের এই ঘনঘটার অংশ, তখন সাম্যবাদী জগতের চালু আপ্তবাক্য যথেষ্ট নয় নিশ্চয়। শুধু জীবিকাবোধ জীবনবোধের সরল সমীকরণ বা বুর্জোয়া সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কে নাটকীয় উষ্মার পৌনঃপুনিক উদ্গার কাজ দেয় না। গত বিশটা বছর নানা অভিজ্ঞতায় স্বদেশে বিদেশে লেখক ও শিল্পীদের খুঁটি ধরে নাড়া দিয়েছে। আমরা সেই নাড়া খেয়ে নিজেদের ওলোটপালট করে দেখব এবং এই আত্মানুসন্ধানই হতে পারে আমাদের দুরন্ত কালের সহায়ক—এ-প্রত্যাশা নিশ্চয় অপ্রাসঙ্গিক নয়।

একালের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েক রকম ভবিষ্যৎ লেখকের সামনে। যা সহজেই অনুমেয়—আগামী দিনের প্রথম পর্যায়ে চলতি জনপ্রিয়তাকেই যান্ত্রিক ঐতিহ্যবাদের দোহাই দিয়ে নতুন মানসিকতার ভেক পরানো হবে। এই সহজ রাস্তাই খুব স্বাভাবিক। আমাদের দেশেও যেমন কোনো লেখক চীন-ভ্রমণের পরেই চৈনিক প্রীতিতে গদগদ আবার রাজনৈতিক ঘটনার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল চীনবিরোধী। এই ভবিতব্য খুব স্বাভাবিক। কারণ লেখকের জীবনবোধের ব্যাপারটাই ফ্যাশান, যেমন সেক্স-ফ্যাশান। আর সমাজতান্ত্রিক পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাঁদের উপর ন্যস্ত তাঁদের যথেষ্ট সদিচ্ছা সত্ত্বেও শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে নজর না থাকায় সদিচ্ছা কিছু পরিমাণ ফিকে হয়ে যাওয়া প্রায় অবশ্যম্ভাবী। তখন মার্কস-এঙ্গেলসের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটা কথার উপর নির্ভর করে তীক্ষ্ণ কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট পলেমিকে আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আর সমাজতান্ত্রিক জয়যাত্রা যে সব সময় বুদ্ধি প্রখর করেছে, হৃদয়ে গভীরতা সঞ্চার করেছে—শুধু তারই নজির নেই; সঙ্গে সঙ্গে আছে নতুন চিন্তাধারা স্বীকার করায় চরম আমলাতান্ত্রিক ঔদাসীন্য, জনগণের গতিময় ব্যঞ্জনাময় সম্ভাবনার থরথর চিত্রকল্পের বদলে স্থান পেয়েছে এক ভোঁতা প্রাণহীন পুতুল এবং তখনই 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব'-এর প্রয়োজন ঘটেছে। এ-ঘটনার নজির যত্রতত্র ছড়ানো। যে-কালের ধারায় আমলা পাল্টায় কিন্তু আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তি নতুন দাপট অর্জন করে, তেমনি প্রবল যান্ত্রিকতাদোষে দুষ্ট এবং মানসিক মেদস্ফীতিতে আক্রান্ত লেখকও ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দুই দুনিয়াতেই তারিফ কুড়ান। আমাদের দেশেও

যে এই ধরনের নজিরের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, বরং খোলা চোখে এই ভবিতব্যের স্বাভাবিকতা মেনে নেওয়াই সাবালক মানসিকতার লক্ষণ। লেখক তাঁর আত্মানুসন্ধানের দায়ে সাম্যবাদের দিকে পা বাড়ান, প্রাইজের জন্তে নয়। তাঁর হারাবার কিছু নেই।

আর এক প্রবল সম্ভাবনাও অনস্বীকার্য। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় যে-নবীন সাংস্কৃতিক এস্টাব্লিশমেণ্ট তৈরি হবে, তার মুখপাত্র রূপে সাহিত্যশিল্পে সার্থকতা অন্বেষণ। এ-পথে যে সার্থকতা নেই এমন নয়, কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও যান্ত্রিক চিন্তার চাপে নতুন এক শ্রেণীর আমলার পংক্তি আরও লম্বা করার করুণ ভবিষ্যতও অস্বীকার করা যায় না। রাজনৈতিক কর্মীর পক্ষে শিল্প-সাহিত্যকে কেবল অস্ত্ররূপে চিন্তা করার মানসিকতা যখন উদগ্র, যখন শিল্প-সাহিত্যের পরম্পরা ও তার বিশেষ চাহিদা সম্পর্কে চিন্তা মুলতুবি থাকলেও থাকতে পারে—তখন অস্ত্রের নামে প্রস্তরযুগের অস্ত্রের পর্যায়েও আমরা ফিরে যেতে পারি। একটা ছোট্ট সীমাবদ্ধ লক্ষ্য আর তার ঝটাপট সমাধান—এই ছকে চিন্তা করতে করতে শিল্প-সাহিত্যের আজীবন গভীরতা ও ব্যাপ্তির যে-সংগ্রাম, তা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য নাও মনে হতে পারে। যা একেবারে প্রত্যক্ষ ঘটনা তার কার্যকারণে না গিয়ে কোনো অখণ্ড মানসিকতার আশ্রয় গ্রহণ না করে তার সযত্ন কিন্তু সঙ্কীর্ণ অনুধাবন মহৎ সাহিত্যের সমগোত্রীয় রূপে চিহ্নিত হতে পারে। এই তীব্র নিপুণ গ্র্যাচারালিজমের ছবি আমরা পাই বিখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক ইলিয়া এরেনবুর্গের রচনায়। আমাদের ছাত্রাবস্থায় বারেবারেই নতুন মানসিকতার সন্ধানে এরেনবুর্গের দরজায় ধাক্কা দিয়ে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। অত্যন্ত পরিশ্রমী ডকুমেণ্টেশান চরিত্রে রূপায়িত হয়নি। হাজার পাতা ব্যাপী জমিতে চোখের সামনে ঘুরে বেড়িয়েছে মানুষ, কিন্তু অনাত্মীয়ভাবে। প্রাক্‌বিপ্লব রুশ উপন্যাসের যে-মহৎ নিদর্শন জলন্ত নবীন এক বসন্তের মতো বারবার আমাদের ডাক দেয় এবং যে-বসন্তের রূপ আমরা আবার প্রত্যক্ষ করি পরবর্তীকালে আলেক্সি তলস্তয়ে কিংবা শলোকভে—সে-রূপ কোথায়? এরেনবুর্গের মানসিকতার তো কোনো গণ্ডগোল ছিল না। ফাসিস্তবিরোধী বিরাট গৌরবময় যুদ্ধ এবং নবীন মানসিকতার তিনি প্রবক্তা। কিন্তু কেন গ্রন্থ শেষে হাওয়ায় শুকনো পাতার মতো উড়ে যায় তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো আমাদের মন থেকে?

এরেনবুর্গ আমাদের আলোচ্য, কারণ দেশে দেশে সাহিত্যক্ষেত্রে নবীন

মানসিকতার প্রবক্তা হয়েও তিনি শিল্পের উৎকর্ষতায় আমাদের ধরে রাখতে অসমর্থ। এরেনবুর্গের মতো আমরা আরও কিছু রুশ ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টান্ত চোখের সামনে রাখতে পারি। যেমন রুশ-জার্মান যুদ্ধের গৌরবময় কাহিনী অবলম্বনে লেখা বরিস পলেভয়ের উপন্যাস। স্যাচারালিজমের এইসব দৃষ্টান্তের উল্লেখ নিশ্চয় আমাদের রুশ সাহিত্যবিরোধিতার মিথ্যাভাষণের পথে ঠেলে দেয় না; কারণ সেখানেও শিল্প-সাহিত্যে সামগ্রিক দৃষ্টির নজির আমাদের নিশ্চয় চোখে পড়ে। কিন্তু রিয়ালিজম-স্যাচারালিজমের দ্বন্দ্বে প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে রিয়ালিজমের নামে এক সঙ্কীর্ণ অগভীর জীবনবোধ প্রশ্রয় পেয়েছে। মার্কসীয় শিল্পতত্ত্ব ও তার প্রয়োগে এক বিশেষ সঙ্কটের জন্যেই এ-দৃষ্টান্ত উল্লেখ্য।

আমাদের দুরন্তকালের পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় সম্ভাবনা হলো লেখকের মৌনে প্রবেশ। এই মৌনে প্রবেশ অসম্ভব আত্মকেন্দ্রিকতার লক্ষণ বলে চিহ্নিত হলেও সীরিয়াস লেখকের কাছে কঠিন বাস্তব। কারণ নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে যেমন লাভ নেই, তেমনি নতুন পরিস্থিতির আশু ভয়ঙ্কর রূপ তাঁর সমস্ত সত্তাকে নাড়া নাও দিতে পারে। বিশেষ করে তিনি যদি আকাঙ্ক্ষা রাখেন বৃহত্তর পাঠক-সমাজ তাঁর নিঃসঙ্গ ব্যক্তিগত তীর্থযাত্রায় যোগ দেবেন, তাহলে তাঁর অন্তরের এই স্বাভাবিক চাহিদা নাও মিটতে পারে। তখন তাঁর কাছে তাঁর স্বপ্নের সাম্যবাদ এবং বাস্তবের সাম্যবাদের মধ্যে ফারাক দুস্তর হতে থাকে এবং সেই দুস্তরতা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যখন তাঁর অতীত কর্ম ও কল্পনার দিকে তাকিয়ে মৌনে প্রবেশই আত্মকেন্দ্রিকতার লক্ষণ না হয়ে সৎ লেখকের একমাত্র পথ। কারণ তাঁর চোখের সামনে ভাসে সেই সব ধরনের লেখকের জয়যাত্রা যাঁরা দুই দুনিয়াতেই জনপ্রিয়তার বিজয়কেতন ওড়ান। একদিকে প্রবল বাণিজ্যিক মূল্যবোধ আর একদিকে কল্পনাশূন্য আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের চাপে তাঁর কাছে লেখকের দুর্গম পথের বদলে কাম্য হয় সাধারণ সুস্থ নাগরিকের কর্মময় প্রাত্যহিকতা। অবশ্য এই স্বাভাবিক পথ থেকে সরে আসা এক ধরনের লক্ষ্যভ্রষ্ট মানসিকতার নজিরও আমাদের চোখে পড়ে। লক্ষ্যভ্রষ্ট লেখক তাঁর শিল্পের দায়ের কথা অস্বীকার করে ছোটেন পশ্চিমের দিকে, ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার দিকে; যখন ধনতান্ত্রিক দুনিয়ারই কিছু কিছু ক্ষমতা-শালী লেখক ক্ষয়িষ্ণুতার চ্যালেঞ্জরূপে সমাজবাদের দিকে হাত বাড়িয়েছেন।

লেখকের আর এক ভবিষ্যৎ আমাদের মতো সংস্কৃতিকর্মীদের টানে। তা হলো এই সমস্ত ক্ষয়, অন্তর্দ্বন্দ্ব, আমলাসুলভ ঔদাসীন্য, প্রাইজের লোভ, অর্থাৎ

আমাদের দুরন্তকালের জমিতে দাঁড়িয়ে সমস্ত রকম টানাপোড়েন সম্পর্কে সচেতন থেকেও নিজের শিল্পকর্মের তীর্থযাত্রায় অবিচল থাকার সাহস ও আত্মবিশ্বাস। কারণ সত্যিই আমাদের কল্পনায় মহৎ লেখক এক নতুন প্রোলেতারিয়েত যাঁর হারাবার কিছুই নেই এবং যাঁর সামনে সম্ভাবনা অনন্ত। কারণ তাঁর প্রবল নৈর্ব্যক্তিকতায় তিনি সমস্ত রকম প্রত্যক্ষ আন্তরিক অভিজ্ঞতায় তীক্ষ্ণ প্রাতিস্বিক অনুভূতিগুলো বাঁধতে পারেন এক অখণ্ড মালায়, এক গভীর রিয়ালিজমের সমগ্রতায়। কাজেই দুর্গম তাঁর কাছে দুর্গম নয়, দুস্তরতা স্বাভাবিকতারই নামান্তর, জটিলতা সাফল্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য এবং কালের বিপুল নাট্যে সমস্ত দ্বন্দ্বই জীবনের রূপক। কাল তাঁর কাছে প্রাণদায়িনী, মৃত্যুসূচকমাত্র নয়। কালের নাট্যে তিনি ছেদ ও অনবচ্ছেদের অন্তহীন লীলার কালহীন চিত্রের দর্শক। কাল হেঁচকায়, কাল আবার বয়ে নিয়ে চলে। লাফ এবং মন্থর হাঁটার এই দ্বৈত ও সমন্বিত ডায়ালেকটিক রূপ তাঁর হৃদয়ে বিধৃত বলেই সমস্ত উপেক্ষা উৎসাহব্যঞ্জক, নিঃসঙ্গ তীর্থযাত্রা আত্মকেন্দ্রিকতার পরিচয় তো নয়ই বরং নতুন মানসিকতার সমৃদ্ধরূপে পৌঁছানোর প্রায় একমাত্র রাস্তা। এভাবে চলতে চলতে আশা করা যায় এ-শতাব্দীর শেষে যখন দ্বন্দ্ব এক সমন্বয়ের রূপ পাবে, পরস্পরের প্রতি ভয় ও অবিশ্বাসের পরিচ্ছেদগুলো পেছনে ফেলে আসা যাবে, তখন শেষোক্ত লেখক ও চিন্তানায়কদের ক্ষেত্রে ঘটবে লেখক-পাঠকের চিরকালের সাযুজ্যআকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা।

হাঙ্গেরীয় সমালোচক জর্জ লুকাচ প্রায় দুই দশক আগে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইওরোপীয় রিয়ালিজম সমীক্ষা'র মারফত আমাদের দেশে পরিচিত হন। এই মূল্যবান গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য—কেন রিয়ালিজম নেচারালিজম অপেক্ষা আরও গভীর ও ব্যাপ্ত সমাজচেতনার সমন্বিতরূপের মাধ্যম বলে তা ঔপন্যাসিকের আরাধ্য, কেন জোলা ও বালজাকের তুলনায় খুঁটিনাটির ওপর অপূর্ব দক্ষতা সত্ত্বেও জোলা ক্ষুদ্র এক সীমিত জগতের নায়ক আর বালজাকের সমগ্রতার দিকে দৃষ্টি থাকায় কোনো সিচুয়েশানই বিচ্ছিন্ন চমৎকারিত্বের আলোয় ঝলমলে মাত্র নয়··· তা সমস্ত চরিত্রের অগ্রগতির সঙ্গে অবিভাজ্য। চরিত্র ও ঘটনার এই অবিভাজ্য সমন্বিতরূপের জন্যে হাজার পাতাব্যাপী লক্ষ্যভ্রষ্ট নায়ক-নায়িকারা হেঁটে বেড়ান না পাঠকের চোখের সামনে। আমাদের ক্রমাগত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে করতে তাঁরা হন আমাদের হৃদয়ের শিলায় খোদিত।

বালজাক স্তাঁদাল তলস্তয়ের এইটাই সবচেয়ে বড় পরাক্রম তাঁরা প্রত্যক্ষ প্রাত্যহিককে গভীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উষ্ণতায় সঞ্জীবিত করে এক প্রকাণ্ড নৈর্ব্যক্তিক অখণ্ডতা মাঝখানে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপীয় উপন্যাসের এ-ঐতিহ্য ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দুই দুনিয়ার লেখকের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অদ্যাবধি মার্কসীয় শিল্পতত্ত্বে এই মূল প্রতিপাদ্যটি অস্বীকার করা হয়নি বটে, কিন্তু এ-প্রসঙ্গে যথেষ্ট মনোযোগও দেওয়া হয়নি। বরং একথা মনে না হয়ে পারে না যে বালজাকের চেয়ে জোলার প্রতি আকর্ষণ আরও জোরাল।

মনোহারী ও বিক্ষিপ্ত চিত্রণের প্রতি ঝোঁক ছাড়াও আর এক গোড়ায় গলদ চোখ এড়িয়ে যায় না। বোধহয় তীক্ষ্ণভাবে বলার ইচ্ছায় আর্টের এক বিশ্লিষ্ট রূপ এঙ্গেলসের 'সুপারস্ট্রাকচার' ব্যাখ্যায় বিধৃত। সমাজ ও রাজনীতি স্ট্রাকচার এবং শিল্প সুপারস্ট্রাকচার। এই ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে বহুল পরিমাণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে মার্কসীয় শিল্পতত্ত্ব আলোচনায় এবং রাজনৈতিক কর্মীর মুখে মুখে। আলোচনা প্রসঙ্গে কথাটা শেষপর্যন্ত দাঁড়িয়েছে যে শিল্প মূল কাঠামোর এক বহিরাংশ, যেমন চিত্রবিচিত্র ছাদের আলসে কিংবা চিলেকোঠা অথবা এমন একটি অংশ যা সমস্ত কাঠামোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত নয়, বড়জোর একটি অলঙ্কার, কাজেই তন্ময় অন্বেষণের উদ্দেশ্য নয়।

শিল্পের এই বিশ্লিষ্ট রূপের মাঝখানে হয়তো তীব্র উজ্জ্বল কবিতা কিংবা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধকারী সংক্ষিপ্ত নাটক সম্ভব। কিন্তু শিল্পকর্ম যেখানে গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে পাঠকসমাজের মনোযোগ দাবি করে, তা এই বিশ্লিষ্টরূপে পলাতক। শিল্পের সংশ্লিষ্ট রূপেই বস্তুজগৎ ও মানসিকতার প্রবল গুণগত পরিবর্তন ধরা পড়ে। সাহিত্যের শিক্ষা শিল্পের এই সংশ্লিষ্টরূপ। যখনই শিল্প-সাহিত্যকে বিচ্ছিন্নপ্রায় অব্যবহার্য চিলেকোঠা বা এক পোষাকী বৈঠকখানা ভাবা হয়, তখনই শিল্পকর্মের গুরুত্ব অস্বীকৃত। এঙ্গেলসের মূল ব্যাখ্যায় সুপারস্ট্রাক-চারের রূপ হয়তো ঠিক এরকম ছিল না, কিন্তু কালের ধারায় নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশেষকরে সংঘর্ষময় কালে শিল্পের বিশ্লিষ্ট চেহারা পায় সৌখীন রূপ, তা যেন এমন এক ধরনের মোগলাই খানা যা স্বাদে গন্ধে অভিনব কিন্তু যার প্রয়োজন কালেভদ্রে, বোধহয় অনাগত ভবিষ্যতে।

সাহিত্যের ইতিহাস আমাদের শেখায় তা সৌখীন ব্যাপার নয়, তা নিঃশ্বাসের মতোই প্রয়োজনীয়। সেইজন্যেই মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে তার গুরুত্ব

এতখানি। প্রত্যেক কালের রূপ যেরকমই হোক, মহৎ সাহিত্যিক সব সময় চেষ্টা করেছেন তাঁর কালকে বিধৃত করতে তাঁর রচনায় এমন এক প্রবল নৈর্ব্যক্তিকতায় যা তাঁর শ্রেণীর ঊর্ধ্বে ; যে-কারণে আমাদের বহুপরিচিত রাজতন্ত্র বিশ্বাসী বালজাকে আপাত-বৈপরীত্যের পরম প্রসাদ। এই আপাত-বৈপরীত্য শিল্পে নৈর্ব্যক্তিকতার সাধনা ছাড়া আর কিছু না। লেখক ও শিল্পী একজন 'হোলটাইম ওয়ার্কার' যাঁর অখণ্ড মনোযোগ যেমন সাম্প্রতিকে, প্রত্যক্ষে ; তেমনি এই প্রত্যক্ষের মণিমালায় গ্রথিত এক নৈর্ব্যক্তিক মানসিকতায়। কাজেই আগামীকালের সুস্থ সমাজের স্বপ্নেই নয়, বর্তমানের প্রবল প্রত্যক্ষের বাস্তব জমিতেই তাঁর বাস।

প্রায় দুই দশক আগে 'কলমের বদলে বন্দুক' এই রকম স্লোগান অস্পষ্টভাবে আমাদের কাছে পৌঁছেছিল। এ-স্লোগান শিল্পতত্ত্বের মূল ধর্ম অস্বীকার করে তার জোরদার বাচনভঙ্গী সত্ত্বেও। ইয়োরোপের বুকে বসে এই তত্ত্ব অগ্রাহ্য করা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বা ভারতবর্ষে এ-দাবি মাঝে মাঝে উঠতে বাধ্য। কারণ কলম ও বন্দুকের মাঝখানে এক প্রকাণ্ড বৈপরীত্য গড়ে তোলা অস্বাভাবিক নয়। এক্ষেত্রে ধৈর্য ও সাহসের পরীক্ষায় লেখক ও শিল্পী অনুপ্রেরণা পেতে পারেন ভিয়েতনামের চাষী অথবা মায়েদের কাছ থেকে যারা প্রচণ্ড দুর্যোগেও ধান বোনেন, সন্তান পালন করেন। তাঁদের এই অপরিসীম ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে আনে মানবসভ্যতার ভবিষ্যতে পরম আস্থা। লেখক ও শিল্পীও ইয়োরোপের অপেক্ষাকৃত শান্ত পটভূমিকায় কাজ করবার আর সুযোগ পাবেন না। দুর্যোগ ও ঘনঘটা তাঁর অপরিহার্য সঙ্গী। সাহিত্য ও শিল্পের গুরু দায়িত্ব তাঁর পক্ষে বহন প্রায় অসম্ভব যদি দেশকালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি আরও ধৈর্যশীল সাহসী না হন। যা ইয়োরোপ আমেরিকায় কিছু পরিমাণ ঘটেছে—অর্থাৎ শিক্ষাজগতে আংশিক আশ্রয়—ভারতবর্ষের মতো অনগ্রসর দেশে তা প্রায় অসম্ভব। কারণ শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো এমন ভাবে তৈরি যে সেখানে দেশে-বিদেশে পরিবর্তমান পরিস্থিতিতে নতুন মানসিকতা অর্জন করার সাধনার বদলে সঙ্কীর্ণ চাকরিসর্বস্ব মানসিকতা গড়ে তোলাই প্রধান লক্ষ্য। একালের যাঁরা নেতা, অর্থাৎ রাজনৈতিক জগতের লোকজন, শিল্প-সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই তাঁদের। আমাদের দেশে বিশ বছর আগে সাহিত্যগোষ্ঠী বলে যে-বস্তুটি ছিল, তাও ক্ষীয়মান। থাকবার মধ্যে জাঁকাল কালচারাল এস্টাব্লিশমেন্ট, যেখানে প্রবেশের অর্থ লেখক

ও শিল্পীর আত্মিক মৃত্যু। কারণ সেখানে খাদ্য-সরঞ্জাম অঢেল, ছুরি কাঁটা খানসামা আবহসঙ্গীত অপর্যাপ্ত, কিন্তু খাদ্য নেই। ফলে এক-একটি দশক জুড়ে শুধু সাবালক পাঠকদের ক্রমবর্ধমান অনাহার এবং শেষ পর্যন্ত খাদ্যে অরুচি।

সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে অপরিহার্য সমাজচিন্তার এক শক্তিশালী রূপ কয়েক বছর আগে প্রকাশিত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হার্বার্ট মার্কুসের 'একমাত্রিক মানুষ' আমেরিকা এবং টেকনলজিতে অগ্রসর দেশগুলির এক অনিবর্তনীয় করুণ ভবিষ্যতের মর্মান্তিক চিত্র। এই অসাধারণ অগ্রগতির অর্থ শুধু কায়িক সুখ নয়, এক কঠিন আমলাতান্ত্রিক যূপকাষ্ঠে আত্মবিসর্জন—যেন মেফিস্টোফিলিসের কাছে শেষ পর্যন্ত ফাউস্টের আত্মদান। এই আত্মদান এমন পর্যায়ে যে মার্কুসের মতে বেশির ভাগ মানুষের পক্ষে এই প্রকাণ্ড হৃদয়হীনতা পরিবর্তনের চিন্তাও অপ্রাসঙ্গিক; সমস্ত মৌলিক পরিবর্তন অপ্রাসঙ্গিক যেহেতু পরিবর্তনের প্রবৃত্তি ক্রমশ সঙ্কুচিত এবং শেষ পর্যন্ত অনুপস্থিত; কল্যাণরাষ্ট্র এবং যুদ্ধযাত্রা-সজ্জিত রাষ্ট্রের চেহারাও অঙ্গাঙ্গী, টেলিভিশন-প্রসার এবং ভিয়েতনাম-আক্রমণ যেমন অঙ্গাঙ্গী। খুঁটিয়ে না বললেও রুশদেশ সম্পর্কে তাঁর প্রায় একই বক্তব্য। অর্থাৎ টেকনলজিতে অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং ধনতান্ত্রিক দেশের মূলত একই রূপ। মার্কুসের এ-বক্তব্য কিন্তু আন্তর্জাতিক দুনিয়ার দিকে খোলা চোখে তাকানোর দৃষ্টান্ত নয়। কারণ রুশদেশে শিল্প-সাহিত্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক প্রতাপের নজির আমাদের সামনে থাকলেও একথা স্পষ্ট যে অনগ্রসর এবং সামন্ততান্ত্রিক দেশগুলির গত মহাযুদ্ধ-পরবর্তী যে-কটি বৃহত্তর সংগ্রাম চলেছে, সে-সংগ্রামের শরিক রুশদেশ। আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা এবং এশিয়ার দেশবাসীদের পক্ষে আমেরিকার যে-ভয়ঙ্কর সাম্রাজ্যবাদী রূপ এবং বিপরীত শিবিরে রুশদেশের বরাবর অবস্থান—তা কখনোই ভুলবার নয়। এক্ষেত্রে টেকনলজির জয়যাত্রার নামে আমেরিকা ও রুশদেশকে মুড়িমুড়কির বিচারে দেখা দৃষ্টিবিভ্রম ছাড়া কিছু নয়।

অনগ্রসর দেশের বিকল্প ভবিতব্যের সম্ভাবনার কথা অবশ্য মার্কুস-গ্রন্থে অস্বীকৃত নয়। হাজার হাজার মাইল ব্যাপী অনাহার, অর্ধাহার, অন্ধকার ও নগ্নতার পাশে টেকনলজির জয়যাত্রা বিজ্ঞানের পরম পরাজয়। মানুষের এই আত্মিক মৃত্যুর সঙ্গে মনোপলি ক্যাপিটেলের অবিচ্ছেদ্য যোগের কথা মার্কুস প্রায় সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন। বিজ্ঞানের পরম পরাজয়ের জন্যে বিজ্ঞান দায়ী নয়,

তার দুরবস্থার জন্যে দায়ী রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালক, একথা বোঝার জন্যে অসাধারণ চিন্তাশক্তির প্রয়োজন নেই। অনগ্রসর দেশে মাছিমারা কেরানির মতো পাশ্চাত্যের মডেলে টেকনলজির জয়যাত্রা অনুকরণ করার বদলে কিভাবে অগণিত মানুষের হাত এবং সাধারণ যন্ত্রপাতির সমন্বয় ঘটানো যায় তার এক উজ্জ্বল পরীক্ষা চলেছে চীনদেশে। মার্কুসের প্রশ্নের সঙ্গে এইসব ঘটনা অবিচ্ছেদ্য, নইলে মার্কুস-নির্দেশিত করুণ ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে আমাদের কেউ কেউ যন্ত্রবিরোধী সৌখীন কাপট্যে আশ্রয় নিতে পারেন।

মার্কুস বর্ণিত যন্ত্রসভ্যতার করাল রূপ আমাদের ভয়ঙ্কর লাগলেও সে-এক অচেনা দেশে ভূত দেখার ভয়। অন্তত ভারতবর্ষের অধিবাসী আমাদের ক্ষেত্রে এ-ভয় মুলতুবী থাকতে পারে। ইতিমধ্যে আশা করা যায় এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার অনগ্রসর দরিদ্র দেশগুলির সঙ্গে তাল রেখে সমাজতন্ত্রের পথে ভারতবর্ষের যাত্রা থাকবে অব্যাহত। সেইজন্যেই মার্কুসের গ্রন্থের চেয়েও বলিভিয়ার কারাগারে বন্দী অসমসাহসী ফরাসী সাংবাদিক রেগি দেব্রের গ্রন্থ 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব'-এর গুরুত্ব আমাদের কাছে আরও বেশি। দেব্রের এই বইয়ের গুরুত্ব গরিলাযুদ্ধ প্রণালীর ব্যাখ্যায় নয়, যদিও সুনিপুণভাবে উপস্থাপিত সেই ব্যাখ্যা। দেব্রে আমাদের এক নতুন ভূতের ভয় দেখিয়েছেন—সর্ষের মধ্যে সেই ভূতের অবস্থান। তাঁর মতে কমিউনিস্ট পার্টির জয়যাত্রায় বিশেষ করে ক্ষমতালাভের পর সংগঠন ক্রমশ সাধারণ মানুষ থেকে বিযুক্ত এক অ্যাবস্ট্রাক্ট স্বয়ম্ভু রূপ নেয়। তা যতো বিশালতা পায় ততো পরিণতি লাভ করে সুদক্ষ যন্ত্রে, সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক আর সে থাকে না, পতাকা হয় জগদ্দল পাথর। যা ছিল স্পষ্ট দৃঢ়, ঋজুতার ভঙ্গীতে সুঠাম, তার গুণগত পরিবর্তন ঘটে। দেব্রের এই ভয়ের যথেষ্ট ভিত্তি বর্তমান। কাজেই বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লবের প্রয়োজন যেমন কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে তেমনি প্রত্যেক দেশের লেখক ও শিল্পীর পক্ষে এই অন্তর্লীন বিপ্লব অপরিহার্য। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে লেখক যদি লাল পতাকা স্বপ্ন দেখেন কেবল এক সংঘর্ষের মাথায় এবং বিপ্লবের আগে ও পরের মাঝখানে ভাবেন এক প্রকাণ্ড ফারাক, যেমন ইংরেজ তাড়ানোর প্রসঙ্গে আমাদের দেশে কেউ কেউ ভেবেছিলেন, তাহলে নতুন মানসিকতার জন্ম অন্ধকারেই আবৃত। কারণ লেখক সেইখানেই লেখক যখন তিনি নিজের অভিজ্ঞতায় ক্রমাগত ঠেকে ঠেকে শেখেন এবং অন্যের ঝাল না খেয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা স্পষ্ট করে বলতে পারেন। এই গভীর

রিয়ালিজমের পথের পথিক বলেই তিনি সৌখীন ছুৎমার্গগামী মানুষ নন, তাঁকে কাঁধ মেলাতেই হয় রাস্তার মানুষের কাঁধের সঙ্গে। সেই রাস্তার মানুষ শুধু মিছিলই করে না, সমাজতন্ত্রের পথে সচেতন এমন কি অচেতন অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব ভাবনা, ধ্যানধারণা আছে তাঁর। পিপ্‌লের নামে মৃতের পূজা, তা যত ঘটা করেই হোক—লেখকের পক্ষে আত্মহত্যার সামিল। কাঠের পুতুলের কারবারী নন লেখক। মানুষ যখন জীবন্ত তখনই সে আকর্ষণীয়, জীবন্ত বিপ্লবও তাঁর স্বপ্ন ও বাস্তব প্রেরণা। কিন্তু মানুষ যদি হয় কাঠের পুতুল এবং বিপ্লব রূপ পায় এক মর্মান্তিক অভিনয়ে শূন্যতার দিকে ধাবমান শক্তিক্ষয়ের তুমুল প্রতিযোগিতায়, তাহলে লেখকের অন্তর্লীন বিপ্লবভাবনা অনিবার্য।

সাহিত্যশিল্প ক্ষেত্রে সংগঠনের জগদ্দলচাপ, 'কলমের বদলে বন্দুক' স্লোগান, সুপারস্ট্রাকচারের নামে সৌখীন শিল্পভাবনা, ন্যাচারালিজম বা বাস্তবের একান্ত দাসত্ব, এছাড়াও সমাজতান্ত্রিক জগতের শিল্পচিন্তায় আবৃত দৃষ্টি নজরে পড়ে। সেক্স পশ্চিমের দেশগুলোর চালু ব্যবসা নিশ্চয় কিন্তু সেইজন্যেই নরনারীর সম্পর্ক একেবারে কথামালাসুলভ সারল্যে পর্যবসিত নয়। ইয়োরোপ, আমেরিকার কিছু কিছু শক্তিশালী লেখকের লেখায় প্রকাশিত এ-সম্পর্কের বিচিত্র রূপ। ব্যবসাসুলভ মনোবৃত্তিপ্রসূত রূপের প্রকাশ যেমন নিন্দনীয় তেমনি কি প্রশংসনীয় নয় সত্যের তাগিদে লেখা নরনারীর চরিত্র চিত্রণ? পশ্চিমী অবক্ষয়ের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে আমরা কি শেষপর্যন্ত ব্রহ্মচারীর মানসিকতা অর্জনে সচেষ্ট হব? শরীর ও মনের যে-অনুদ্‌ঘাটিত স্তর, যে-পারস্পরিক সম্পর্ক, আবার কখনও কখনও যে-সমান্তরাল যাত্রা—তার অনুসন্ধানে লেখক নিশ্চয় সচেষ্ট হবেন। এক্ষেত্রে জঁ্যা পল সার্তের বক্তব্য—মনের অনেকখানি তো শরীরে অনুপ্রবিষ্ট—উল্লেখ না করেও আমরা মানুষের অন্তর্জগতের খবরসন্ধানী, লেখকের কাছে নিশ্চয় কোনো সিধে নাক-বরাবর রাস্তার প্রত্যাশী নই।

সম্প্রতি তরুণ ইংরেজ কলাসমালোচক ও ঔপন্যাসিক জন বার্জার তাঁর সুলিখিত সুবর্ণিত 'শিল্প ও বিপ্লব' গ্রন্থে শক্তিশালী রুশ ভাস্কর আর্নেস্ট নিজভেৎস্নি-র সাধনা প্রসঙ্গে লুকাচ-নির্দেশিত নেচারালিজম ও রিয়ালিজম ব্যাখ্যা সাহিত্য থেকে ছবি ও ভাস্কর্যে প্রয়োগে প্রয়াসী হয়েছেন। নিজভেৎস্নি অবশ্য ইতিমধ্যেই পশ্চিমী সাংবাদিকদের উৎসাহে পরিচিত হয়েছেন নাটকীয়ভাবে রুশদেশের বাহিরে। তাঁর ক্রুশ্চভের সঙ্গে সাক্ষাৎকার পশ্চিমের বড় বড় কাগজে

ঘোষিত। যাঁদের স্মৃতিশক্তি কিঞ্চিৎ প্রবল তাঁরা নিশ্চয় ভোলেননি গত মহাযুদ্ধ শেষে লণ্ডনে পিকাসোর একজিবিশান দেখে প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের মন্তব্য, "ইচ্ছে হয় লোকটার পশ্চাদ্দেশে লাথি মারি।" বার্জারের বইখানা আমাদের আরও ভালো লাগত যদি তিনি নিজভেৎস্নির প্রদর্শনীতে ক্রুশ্চভের চোখা গালমন্দের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন ইংরেজী কাগজে প্রকাশিত চার্চিলের এই অনির্বচনীয় সাধের প্রসঙ্গে দুই দেশের রাজনৈতিক নেতাদের শিল্পভাবনার মাঝখানে খুঁজে পেতেন গভীর সাদৃশ্য। অনাদৃত অবহেলিত শুধু নয়, রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রবল তাড়নায় তাড়িত এই শক্তিমান রুশ শিল্পীকে তাঁর কাজের জন্যে চুরিচামারি মারফত ব্রোঞ্জ জোগাড় করতে হয় একথা শোনার পর প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভের প্রশ্ন, কেমনভাবে এতদিন ধরে রাষ্ট্রীয় পেষণ তিনি সহ্য করলেন এবং নিজভেৎস্নির উত্তর, "কতগুলো খুব ছোট্ট নরম জীবাণু বর্তমান, গণ্ডারের ক্ষুর গলাতে সক্ষম এমন প্রচণ্ড নোনা জলেও তারা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সমর্থ।"

লুকাচীয় ব্যাখ্যা অবলম্বনে বার্জার মার্কসীয় শিল্পতত্ত্বের আপেক্ষিক ব্যর্থতার সূত্র খুঁজে পান দুই দৃষ্টিকোণের তফাতে। যা ঘটেছে তা কেবল ভক্তিভরে আরাধনা অথবা ঘটনার দাসত্ব আর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠিত এক নৈর্ব্যক্তিক কাঠামে পরিবর্তমান জগতকে নির্ভয়ে ধরার প্রয়াস। তাঁর মতে রিয়ালিজমকে সচরাচর দেখা হয় এক প্রকরণের পর্যায়ে, কোনো কোনো বিষয়বস্তু জনপ্রিয় ও বলিষ্ঠ প্রকাশের বাহনরূপে যা বিশ্বস্তভাবে অথচ ন্যাচারালিজমের চেনাজানা খুঁটিনাটি এড়িয়ে প্রকাশের জন্য সচেষ্ট। বাস্তবের সামগ্রিক চেহারা ধরবার জন্যই যে রিয়ালিজমের পথ, সে-ভাবনা কদাচিৎ।

সম্প্রতি হাঙ্গেরীর চিন্তাজগতে জর্জ লুকাচের সগৌরবে প্রত্যাবর্তন আমাদের অনেকের কাছেই যেন মরা গাঙে চাঁদের আলো। 'নিউ হাঙ্গেরীয়ান কোয়ার্টারলী'তে প্রকাশিত এক দীর্ঘ প্রশ্নোত্তরে তিনি কতগুলো মূল প্রশ্ন রেখেছেন পাঠকের সামনে। যেমন ইতিহাস রচনায় সত্য ভাষণ। লুকাচ বলেন তিনি নিশ্চয় ট্রটস্কি-প্রেমিক নন, কিন্তু ১৯১৭ সালের যে-ইতিহাসে ট্রটস্কির নামগন্ধ নেই সে-ইতিহাস নিশ্চয় বিশ্বাসযোগ্য নয়। সমাজতন্ত্রের যে-উন্নত মূল্যবোধ, তা চিন্তাশীল মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হওয়া চাই, সেটি রাজনৈতিক নেতাদের খেয়ালখুশির ব্যাপার নয়। তাঁর মতে পশ্চিমী বই নিষিদ্ধকরণ সেসব বইয়ের চটক বাড়ায় মাত্র, কারণ যা নিষিদ্ধ তা-ই সচরাচর আকর্ষণীয়। তার বদলে দুই দুনিয়ার মধ্যে তিনি খোলাখুলি সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের কথা বলেন যার

ফলে পাঠক কোনো কবিতা কিংবা গল্পের গুণেই আকৃষ্ট হবেন, দেশের লেবেল দেখে নয়।

লুকাচ বিশ্বাস করেন স্বদেশ ও বিদেশের বিপর্যয়ে আমেরিকান জীবন-বোধের ফানুস ফাটছে। এ-সময়ে সারা দুনিয়ার চিন্তাশীল মানুষের সামনে এক নতুন ও উন্নত জীবনবোধের বিশ্বাসযোগ্য চিত্র তুলে ধরার দায়িত্ব সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার। সেক্ষেত্রে কি লেনিনের 'সাম্রাজ্যবাদ'-এর উপর এক নতুন ভাষ্যের মাধ্যমে আর একবার আমেরিকান অর্থনীতিতে প্রবল সঙ্কটের স্বপ্ন দেখে আমাদের কর্তব্য শেষ করব? লুকাচের মতে এই ধরনের স্বপ্ন দেখা পলিটিকাল ইকনমি নয়, কারণ তা সত্যের বিকৃতি। যদিও সমাজবাদ পশ্চিমী দুনিয়ায় একান্ত নিন্দিত তথাপি যখন কেউ অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক কারণে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দিকে হাত বাড়ান তখন তাঁর প্রশ্নের বুদ্ধিগ্রাহ্য জবাবের বদলে যদি আসে আমলাতান্ত্রিক জবাব কিংবা জনৈক ছেঁদো লেখকের বই মডেলস্বরূপ, তবে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সম্ভ্রম তো অসম্ভব। সাম্প্রতিক হাঙ্গেরীতে শিল্প-সাহিত্য জগতে এক আজব মৈত্রী লুকাচ অবাক হয়ে দেখেন যান্ত্রিক চিন্তাচ্ছন্ন ডগ্‌মাপন্থী মানুষ এবং বিচারবিবেচনাশূন্য আধুনিকদের মধ্যে। লুকাচ লক্ষ্য করেন পেছন থেকে দড়ি-টানা বর্তমান গণতন্ত্রের যে-চেহারা সে-সম্পর্কে ইয়োরোপ ও আমেরিকার জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান সচেতনতা এবং যত দিন যাবে প্রকৃত গণতন্ত্রের দিকে তাঁরা ঝুঁকতে বাধ্য। এক্ষেত্রে লুকাচের মতে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার নেতৃত্ব খণ্ডিত দুই কারণে। পশ্চিমে অর্থনীতি-ক্ষেত্রে নতুন নতুন কলকাঠি নাড়ানো এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় পরিবর্তনের নামে ওপরে ওপরে জমি নিড়ানোয় প্রকৃত গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ।

আমরা কেন লুকাচ-দেব্রে-বার্জার-সার্ত প্রসঙ্গ তুলছি? কেন আমরা ভাবতে পারি না বাঙলাদেশ মানে বাঙলাদেশ এবং বাঙালি লেখকের আর কোনো ভাবনা নেই? বাঙলাদেশ এই বিশ্বমানসিকতারই অংশ, তার সমস্ত বাঙালিত্ব নিয়েই—একথা যে-বাঙালি লেখক এই পরিবর্তমান বাস্তবের জমিতে আমাদের জীবননাট্যের সমগ্রতা খুঁজবেন তাঁরই ভাবনা। কারণ আমাদের সামনে পথ যত বন্ধুর, আমাদের অভিজ্ঞতার শিক্ষাও তত সমৃদ্ধ। আর বর্তমান ও আগামী দিনের সংঘর্ষময় কালেও যে-বাস্তবের রূপ—তার এক প্রবল ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য। এ-সৌন্দর্য লেখকের কাছে দাবি করে আরও ধৈর্য, আরও সাহস ও সযত্ন অনুশীলন, আরও গভীর সমাজ ও আত্মজিজ্ঞাসা। লেখককে আজ

পৌঁছতে হয় সেই পর্যায়ে যেখানে তিনি প্রায় পৌরাণিক জগতের এক নায়ক অথবা তাঁর অবধারিত প্রায় নিঃসঙ্গ এক তীর্থযাত্রায় মানুষের আশার চিত্রকল্প।

এক্ষেত্রে আরও একটি প্রশ্ন উত্তরের অপেক্ষা রাখে। প্রেরণার বদলে প্রতিবন্ধকের ফিরিস্তি যখন এত লম্বা, এতই অনিশ্চিতিপূর্ণ যখন যাত্রা, তখন লেখক-শিল্পী নেহাত আত্মরক্ষার তাগিদে কেন চোখ ফেরাবেন না এডেন-হংকং প্রসারিত ইঙ্গ-মার্কিন সাংস্কৃতিক ব্যাকওয়াটারের বিস্তৃত ঘোলা জলের দিকে? এর উত্তর কিন্তু পরিষ্কার। লেখক-শিল্পীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার অপেক্ষায় নেই সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি। তার গতিপথ এখন প্রায় নির্দিষ্ট—ইংল্যাণ্ডের সৌখীন সমাজতন্ত্রের পথ তা নিশ্চয় নয়। রুশ চীন কিউবা নির্দেশিত সমাজতন্ত্রের পথে বেশির ভাগ মানুষের ভাগ্য বাঁধা পড়েছে একই ভবিতব্যে। বর্তমান দুঃখ-দারিদ্র্য অবসান শেষে ভারতবর্ষেও সমাজতন্ত্রের আওতায় আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। এই মূল লক্ষ্য যেমন রাস্তার মানুষের, তেমনি লেখক-শিল্পীরও। দেশের এই মূল গতি থেকে বিযুক্ত হওয়ার অর্থ যেমন নিজদেশে পরবাসী হয়ে বাস, তেমনি সে-অবস্থায় সাহিত্য-শিল্পের ভবিষ্যতও সুদূর। লেখক ও শিল্পীর বিশেষ সমস্যা, এই বিস্তৃত দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের শরিক হয়েও তাঁর সাধনার পথের দুর্গমতা অবশ্যম্ভাবী। এমন কি আপ্তবাক্যবিলাসী মানুষের কাছে মনেও হতে পারে রাজনৈতিক কর্মী ও লেখকের যাত্রা দুই সমান্তরাল রেখায়। সেই জন্যেই তো লেখকের পক্ষে প্রতীক্ষার রাত এত দীর্ঘ, আত্মপরীক্ষা এত অগ্নিময়।

রচনাটির কোনো কোনো সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা ভিন্নমত পোষণ করি। এই প্রবন্ধ সম্পর্কে তাই আমরা সুচিন্তিত আলোচনা আহ্বান করছি। —সম্পাদক

রাজদ্রোহী ঘোড়া

বল্লভী বক্সী

কোনো সুদূর অতীতের কথা নয়, কোনো ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অবিস্মরণীয় ঘোড়ার কাহিনীও নয়। সাধারণ একটি ঘোড়া, যার এমনকি আকৃতিতেও কোনো বৈশিষ্ট্যের দাবি ছিল না। ফুটফুটে সাদা রঙ, বলিষ্ঠ গড়ন, মাঝারি আকৃতির সাধারণ 'দেশী' ঘোড়া। তবে প্রকৃতিতে বৈশিষ্ট্য ছিল বৈকি। ময়মনসিংহ জেলার আদিবাসী মানুষের জীবনসংগ্রামে ঘোড়াটি ছিল সাথী, তাদের ঐক্য ও অগ্রগতির জীবন্ত প্রতীক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল। স্বাধীনতা অর্জনের দুর্বার উন্মাদনায় পরাধীন ভারত তখন অধীর। সেই সময় এল ভিয়েতনাম দিবস, সাম্রাজ্যবাদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের অজেয় মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে ভারতব্যাপী ছাত্রদের অভিযানের দিন। সেই ডাকে সেদিন ময়মনসিংহ শহরের ছাত্ররাও পথে নেমেছিল। নিরস্ত্র, সুশৃঙ্খল একটি ছাত্রমিছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জ্বলন্ত ঘৃণায় দীপ্ত। তখন বৃটিশ ব্যাস্টিন সাহেব জেলাশাসক। তার হুকুমে এই ছাত্রমিছিলটি ভেঙে দিতে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ছুটে এল। পথ আটক করে, রাইফেল বাগিয়ে ধরে তারা তৈরি। এদিকে ছাত্রমিছিলও এগিয়ে চলল। ভয়কে উপেক্ষা করে সামনে চলার আহ্বানে তাদের কণ্ঠ মুখরিত। রাইফেল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চলল মিছিলের উপর। ছাত্রনেতা অমলেন্দুর বুকের পাঁজর গুঁড়িয়ে দিলো বুলেট। তাঁর নিষ্প্রাণ দেহ লুটিয়ে পড়ল পথের উপর। বুলেটে আহত হলো মিছিলের আরো অনেকে। সদর্পে পুলিশ আহত ছাত্রদের বন্দী করে নিয়ে চলে গেল।

এদিকে ছাত্রহত্যার মর্মান্তিক সংবাদ মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। রাজপথে ছাত্রদের সঙ্গে জেলার আপামর জনতা রক্তের স্বাক্ষরে মিলিত হলেন। এই নির্মম হত্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন তাঁরা। তরুণ শহীদের রক্তাপ্লুত দেহ ঘিরে হাজার হাজার অশ্রুসিক্ত ক্রুদ্ধ মানুষ জেলা-শহরের পথে পথে সমবেত হলেন। তাঁরা জেলা-কোতোয়ালী অবরোধ করে এই হিংস্র নির্মমতার কৈফিয়ৎ দাবি করলেন। জনতা পুলিশ হাজত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এলেন সমস্ত ছাত্রবন্দীদের।

আন্দোলনের ব্যাপকতায় ভীত বৃটিশ জেলাশাসক জেলাময় একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করল। জেলার সর্বত্র সভা-সমিতি মিছিল বে-আইনী ঘোষিত হলো।

এদিকে ছাব্বিশে জানুয়ারি আসন্ন। ১৯৪৭ সনের স্বাধীনতা-দিবস। এক বৃটিশ আমলার একশো চুয়াল্লিশ ধারার ভয়ে স্বাধীনতা-দিবস প্রতিপালিত হবে না, সেও অসম্ভব। জেলাময় প্রস্তুতি চলল। ব্যাপক গণ-জমায়েতের প্রবল বন্যায় এ-নিষেধাজ্ঞা ভাসিয়ে দিতে হবে।

প্রস্তুতি চলল ময়মনসিংহের পাহাড়-অঞ্চলের আদিবাসী এলাকাতেও। এবার জমায়েত নিজেদের গ্রামের সীমানাতে নয়। ব্যাপক সমাবেশ নিয়ে নিকটবর্তী সুসং শহরে সভা করা ঠিক হলো। সুসং ছিল ছোট্ট একটি শহর। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের তা ছিল এক জবরদস্ত ঘাঁটি।

তারপর নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে পতাকা-ফেস্টুনে সুসজ্জিত আদিবাসী নারী-পুরুষের তিনটি জাঠা তিনটি এলাকা থেকে এসে মিলিত হলো সুসং শহরের উপকণ্ঠে। যেন প্রবল বর্ষণে পাহাড়ে সঞ্চিত বিপুল জলোচ্ছ্বাস নেমে এল শীর্ণ ঝর্ণার দু-কূল প্লাবিত করে। ত্রিধারার এই মিলনে সমাবেশটি আকারে যেমন হলো বিশাল, প্রকৃতিতেও তেমনি দুর্বার। সহস্র কণ্ঠের বজ্র নিনাদে কম্পিত হলো চারিদিক।

সেই বিশাল জনস্রোতের সামনে সাদা ফলের মতো একটি সাদা ঘোড়া ভাসছিল। ঘোড়াটি ছিল মুক্তির বিশাল পতাকা বহন করে এই মিছিলের পুরোভাগে। মাথা উঁচু করে সাদা কেশরে দোলন তুলে ঘোড়াটি চলেছে সহস্র কণ্ঠের শ্লোগানের তালে তালে পা ফেলে।

মিছিল এগিয়ে চলেছে। সম্মুখে সুসং রাজবাড়ি। প্রবল পরাক্রান্ত সামন্ত-তন্ত্রের অতি বনেদি ও প্রাচীনতম একটি স্তম্ভ।

কথিত আছে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঈশা খাঁর এক উচ্চ সামরিক কর্মচারী এই অঞ্চলে এসে এই জমিদারির গোড়াপত্তন করেছিলেন। সীমাহীন লাঞ্ছনা আর মাত্রাহীন শোষণ-অত্যাচারে সে-জমিদারির আয়তন কালক্রমে বর্ধিত হয়েছে। বংশপরম্পরায় জমিদারগণ শক্তিশালী হয়েছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কৃপায় সম্মানিত হয়েছেন রাজার খেতাব লাভ করে। আবার রাজা থেকে তাঁরা মহারাজার গৌরবেও গৌরবান্বিত।

গারো পাহাড়ের গভীর অরণ্যে এক কালে এই রাজাদের হাতি ধরার

ব্যবসা ছিল। বনের হাতি ধরে এনে পোষা হাতির সঙ্গে রেখে সেগুলিকে পোষ মানানো হতো। তারপর দেশ-বিদেশে সে-হাতি বিক্রি করে রাজাদের আসত বিস্তর অর্থ আর প্রচুর সম্মান। কিন্তু হাতি ধরার কাজ ছিল যেমন কঠোর শ্রমসাধ্য তেমনি মারাত্মক বিপদসঙ্কুল। হাজং কৃষকদের ধরে এনে এ-কাজ করানো হতো। দিনের পর দিন মাসের পর মাস নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পরিবার-পরিজন ফেলে হাতি ধরার ফাঁদগুলিতে তাদের বাস করতে বাধ্য করা হতো। সেখানে বাইরে শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্য আর হাতি ধরার ফাঁদগুলিতে লোভী স্বার্থপর বিবেকহীন মালিক। এই দুই নিষ্ঠুর বন্ধনের মধ্যে পঙ্গু জীবনগুলি অভিশপ্তের গ্লানি বহন করত। অবাধ্য হাজংদের শাস্তি দেওয়া হতো রাত্রির অন্ধকারে তাদের তাজা রক্তমাংসে হিংস্র পশুদের মহোৎসবের ব্যবস্থা করে।

হাতি ধরার এ-কাজের বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিকের প্রশ্নই ছিল না। রাজার আইনে এ-কাজের নাম ছিল বাধ্যতামূলক হাতি-বেগার।

ঊনবিংশ শতকে বাধ্যতামূলক এই হাতি-বেগারের বিরুদ্ধে জেগে উঠল হাজং বিদ্রোহ। মহারাজার নির্মম অত্যাচার ও পৈশাচিক নিপীড়ন চলল গ্রামের পর গ্রামে। শত শত আদিবাসী নারী-পুরুষের রক্তে রঞ্জিত হলো বনভূমির শ্যামল প্রান্তর আর গ্রামের পথঘাট। কিন্তু বিদ্রোহ স্তব্ধ হলো না। দিনে দিনে আরো ব্যাপক, আরো তীব্র হয়েই চলল। সন্ত্রস্ত মহারাজা চক্রান্তের জাল ফেললেন। আপসের প্রস্তাব করে বিদ্রোহী নেতাদের রাজবাড়িতে ডেকে আনলেন। তারপর রাজবাড়িতে মনা সর্দারকে উন্মত্ত হাতির পায়ের তলায় ফেলে পিষে হত্যা করলেন। অমানুষিক নির্যাতনের পর খাদ্য পানীয় বন্ধ করে হত্যা করলেন ধানপাড়ার গয়া মোড়লকে এবং মনা ও ংংলু সরদারকে।

বিংশ শতাব্দীর এই সেদিনও 'টংক' চাষীদের ধরে এনে এই রাজবাড়িতে দিনের পর দিন আটক করে রাখা হতো। বর্বর নির্যাতনে অর্ধমৃত তৃষ্ণার্ত কণ্ঠের মর্মান্তিক আর্তনাদ রাজবাড়ি ঘিরে ভীতি ও আতঙ্কের কুয়াশা রচনা করত। এই রাজবাড়ির লোকলস্কর, হাতি, লাঠিয়াল বুভুক্ষু কৃষকের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে, জীর্ণ কুটির ভেঙে দিয়ে, ক্ষেতের পাকা ফসল নষ্ট করে, অসহায় মানুষগুলির অন্তরে মহারাজের সীমাহীন 'শৌর্যের' নিষ্ঠুর পরিচয় এঁকে দিত।

শিশুর আর্তনাদ, কৃষক বধূর শতাব্দীব্যাপী চোখের জলের উপর গড়ে

উঠেছে সুসং রাজবাড়ির সীমাহীন বিলাসিতা ও বল্গাহীন ব্যভিচারের এই অনুপম সৌধ।

চিরবঞ্চিত, লাঞ্ছিত, মূক, অসহায় মানুষগুলিই দল বেঁধে এগিয়ে আসছে। মহারাজার পদপ্রান্তে কোনো উপঢৌকন পৌঁছে দিতে নয়। তারা আজ আসছে বিদ্রোহের নিশান ঊর্ধ্বে তুলে। প্রতিবাদের ক্রুদ্ধ গর্জনে মুখর মিছিলের পুরোগামী পতাকাবাহী ঘোড়াটি আজ যেন অন্ধকার যুগের অবসানকারী বর্ণালী প্রভাতী সূর্যের রক্তিম রশ্মির মতো নূতন দিনের বার্তাবাহী।

মিছিল রাজবাড়ির ঠিক সামনে। আক্রমণ হবে··· ? রাজবাড়ির লোকলস্কর এগিয়ে আসবে ? গুলি চালাবে ?

চলুক গুলি। আজ সবাই ভয়ভাবনার শৃঙ্খল মুক্ত। আজ সবাই সঙ্ঘবদ্ধ।

কিন্তু রাজবাড়ি যেন জনমানবশূন্য। রাজপ্রাসাদ যেন অন্ধকার। জানালা-কপাট সবই যে বন্ধ। দৃপ্ত এ-মিছিলের সহস্র কণ্ঠের বজ্র নিনাদে রাজপ্রাসাদের রুদ্ধ বাতায়নগুলি কেবল অসহায় আর্তনাদে বারবার ঝনঝন শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

সুসং মহারাজা আজ সপরিবার পলাতক। আজ মনে পড়ে ঊনবিংশ শতকের হাতি-বেগারের বিরুদ্ধে হাজং বিদ্রোহের সময়ে এমনি আর এক অবিস্মরণীয় কাহিনী। আপসের নামে মহারাজা বিদ্রোহের নেতাদের রাজবাড়িতে ডেকে এনে নির্মমভাবে হত্যা করেছেন। বিদ্রোহ স্তব্ধ করে দেওয়ার কৃতিত্বে তিনি তখন স্বপ্নে বিভোর। পারিষদদল বেষ্টিত মহারাজা তখন দেখছেন বিদ্রোহী হাজংরা কম্পিত হৃদয়ে চোখের জলে করুণা ভিক্ষা করে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে। সেই সময় এই নির্মম বঞ্চনার পৈশাচিক দুঃসংবাদ গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। হাজার হাজার আদিবাসী কৃষক দলবেঁধে দামামা আর মাদল বাজিয়ে, নিজেদের অস্ত্রগুলি শক্ত মুঠিতে তুলে নিয়ে, উন্মত্ত ক্রোধে এই রাজবাড়ির দিকেই ছুটে আসছে। বিদ্রোহীদের সে-অভিযান সেদিনও মহারাজের কল্পনাবিলাস কেড়ে নিয়েছিল। ভীত, সন্ত্রস্ত সেদিনের মহারাজাও ঠিক আজকের মতো সপরিবারে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পালিয়েছিলেন। কালের বিচিত্র গতিপথে ঘটনার কি ভয়ঙ্কর সাদৃশ্য নিয়েই ইতিহাস যুগে যুগে হাজির হয়।

মিছিল চলেছে। সম্মুখে সুসং বাজার। এই অঞ্চলের দশ-বারো মাইলের ভিতর এইটিই সবচেয়ে বড় হাট। রাজবাড়ির সিংহদ্বার ছেড়ে খানিকটা ফাঁকা

মাঠ। তারপরই শুরু হয়েছে ছোট-বড় সারি সারি হাটের চাল। মাঝে চওড়া একটি পথ। পথটি সোজা এগিয়ে গেছে দক্ষিণ প্রান্তের সোমেশ্বরীর উঁচু তীর পর্যন্ত। হাটের চালাগুলির শেষে দুই প্রান্তে দেখা যায় মহাজনদের নানা জিনিসপত্রের ছোট-বড় স্থায়ী দোকানপাট। এদের ভিতর কেউ কেউ আছে যারা আদিবাসীদের 'দুঃসময়'-এর মহাজন। তারা সুদের উপর সুদ গুণেছে। বঞ্চনার অপার কৃতিত্বে স্ফীত সৌভাগ্যের ঠিকানা পেয়েছে। ওদের চিনে নিতে কোনো অসুবিধে নেই। আজকের বন্ধ দোকান-পাটগুলিই ওদের চিনিয়ে দিচ্ছে।

বাজারের রাস্তাটি ধরেই মিছিল চলেছে। সহস্র পায়ের সতেজ স্পর্শে পথের ধূলিকণা কুণ্ডলী পাকিয়ে উড়ছে। শীতের পড়ন্ত বেলার একফালি রোদ খণ্ড খণ্ড মেঘের ফাঁকে ধূলির কুণ্ডলী ভেদ করে মিছিলের উপর এসে পড়েছে। নির্যাতিতের এ-অভিযান যেন সোনালী আশীর্বাদ।

সহস্র কণ্ঠের তূর্য নিনাদে চারিদিক কম্পিত করে মিছিল চলেছে। ঐ দূরে চোখে পড়ে বিস্তীর্ণ বালুচরের শেষে শান্ত শীর্ণ সোমেশ্বরীর কালো জলধারা। এই অঞ্চলের আদিবাসী জীবনের চিরসঙ্গী এ-নদী তাদের সর্ব কাজের প্রধান অবলম্বন। সোমেশ্বরীর জলধারার তানে মিশে আছে এই মানুষগুলির চিরকালের ইতিহাস, তাদের সংগ্রামের অমর গাথা। সোমেশ্বরীর শীতল হাওয়ায় মিছিলের পতাকাগুলি বর্ণচ্ছটার লহরী তুলে সশব্দে উড়ছে। যেন এ-এক দিগ্‌জয়ী সেনানীর বিজয় অভিযান।

সামনে সুসং পুলিশ থানা। মিছিল হুঁশিয়ার। সতর্ক অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। বিদেশী সরকারের ১৪৪ ধারার বাধা এ-মিছিল মানেনি। কোনো আঘাতই আজ এ-মিছিলকে রুখতে পারবে না। পারবে না ঐ কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে।

হাতের মুঠিতে পতাকাগুলি আরো দৃঢ়। কণ্ঠে কণ্ঠে স্লোগান আরো সোচ্চার। পুলিশের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা যাদের মাথার উপরে, সেই নেতারাই সবার সামনে। থানার ঠিক মুখোমুখি মিছিল দাঁড়িয়ে। বৃটিশের ঘাঁটিকে চ্যালেঞ্জ। সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান। চরম উত্তেজনায় মিছিলে চরম অস্থিরতা। অবিস্মরণীয় কয়েকটি মুহূর্ত। দেখতে দেখতে থানার মজবুত লোহার গেটটি উড়ে গেল। তবু থানার ভিতর থেকে কেউ বাধা দিতে এগিয়ে এল না—গুলিও

চলল না। থানার ভিতরে তেমনি নীরবতা, তেমনি নিষ্ক্রিয়তা। দু-তিন জন পুলিশ যেমন রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি আছে।

শোনা গেল সুসং থানার কর্তারা আজ কেউ থানায় নেই। এ-মিছিলের পদধ্বনি তাদের থানায় থাকার মনোবল কেড়ে নিয়েছে। ভীত সন্ত্রস্ত বাবুরা সব থানা ছেড়ে স্থানীয় সরকারী ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আত্মগোপন করেছে।

পুলিশের এই নিষ্ক্রিয়তা মিছিলে হতাশা এনেছে। এ-অভিযান যে বাধা-বিঘ্নহীন এমন অবন্ধুর হবে তা কল্পনাতীত ছিল।

মিছিল অগত্যা এগিয়ে চলল নিকটবর্তী স্কুলের মাঠের দিকে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প ঘোষণা এবং সংক্ষিপ্ত ভাষণে মিটিং শেষ হলো। বিজয় গর্বে, বিপুল উৎসাহে মিছিল ফিরে চলেছে।

জনপদে প্রতিধ্বনি তখনও ফিরছে। মিছিল চলেছে গারো পাহাড়ের কোলে—নিজেদের গ্রামের দিকে। সম্মুখে দিগন্ত প্রসারিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর। প্রান্তরের এপারে সুসং শহর আর ওপারে নীল আকাশে গা-এলিয়ে গারো পাহাড়। আকাশ, পাহাড় আর প্রান্তর....তিনে মিলে এই মানুষগুলির জীবন। তাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখ, সম্পদ, দুঃখ, বেদনা সবই এই তিনে বাধা।

আকাশের কালো মেঘ স্বচ্ছ স্ফটিক ধারায় তৃষিত মাটির বুকে আনে স্নিগ্ধতার আমেজ। আর ঐ পাহাড় থেকে উর্বরতা এনে এই প্রান্তরে ঢেলে দেয়। ভিজে মাটির গন্ধে ভরে ওঠে বাতাস। আদিবাসী নারী-পুরুষ সবাই তখন প্রান্তরে ছুটে আসে। অসম্ভব এক কাজের নেশায় মেতে ওঠে সবাই। বর্ষণমুখর আকাশের জলধারার সঙ্গে এই মানুষগুলির তপ্ত ঘাম এক সঙ্গে মিশে ছড়িয়ে পড়ে প্রান্তরের সিক্ত কালো মাটিতে। তাই বর্ষার শেষে এ-প্রান্তরের বুক জুড়ে জেগে ওঠে সাদা সাদা জলের উপর কচি কচি ধানের গাছগুলি।

আস্তে আস্তে শ্যামল শোভায় ডুবে যায় এ-প্রান্তর। যেদিকেই চোখ যায় কেবল সবুজ আর সবুজ। যেন অসীম এক সবুজ সাগর। গারো পাহাড়ের উত্তুরে দুষ্টু হাওয়া এসে সবুজ সাগরের বুকে ঢেউয়ের দোলা জাগায়। মাতন লাগে আদিবাসী মনের গোপন কোণে।

শূন্য প্রান্তর ভরে যায় চাষীর ঘামে আর শ্রমে বোনা সোনার ফসলে। অপরূপ রূপের মেলা বসে গোটা প্রান্তর জুড়ে। আনন্দের বান ডাকে চারিদিকে।

সেই হিল্লোল ওঠে আদিবাসী পল্লীতে পল্লীতে। সৃষ্টির সার্থকতায় স্রষ্টার যে-আনন্দ। সে-আনন্দ ক্ষণিকের। এই সোনার ফসলের তারা যে শুধু স্রষ্টা। মন ভোলানো এ-রূপের শুধুই শিল্পী। ততক্ষণই তাদের অন্তরে আনন্দের স্থায়িত্ব যতক্ষণ প্রান্তরের বুক জুড়ে সোনার ফসল শোভা পাবে। তারপরে এ-সম্পদে ভাণ্ডার পূর্ণ হবে যত রাজা, মহারাজা, জমিদার, তালুকদার, মহাজনদের। নিশ্চিন্ত বিলাসিতায় ভরে উঠবে সুখ-সম্পদে ভরা তাদের জীবনযাত্রা। কেন না তারা মালিক। আর বঞ্চনায় ভরা ডালা মাথায় তুলে ফিরে যাবে কৃষক তার রিক্ত গৃহকোণে। অভাবের সহস্র দংশনজ্বালায় জর্জরিত তার দুর্বিষহ জীবন চলবে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সঙ্গে আপস করে। তাইতো সৃষ্টি হয়েছে টংক, ভাওয়ালী....এমনি কতসব প্রথা। বিচিত্র নামের কতশত পবিত্র আইন। ন্যায্য অধিকার থেকে কৃষককে বঞ্চিত করার কতশত কৌশল। এই ব্যবস্থাই চলে আসছে আবহমান কাল ধরে নানা নামে, নানা কৌশলে।

আজ তাই বিদ্রোহ এ-মিছিলে। তাই সহস্র কণ্ঠের সোচ্চার ঘোষণা—আর দেব না, আর দেব না রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো।

শূন্য প্রান্তর থেকে এখন ঘন কুয়াশার কালো চাদরে গা মুড়ি দিয়ে শীতের সন্ধ্যা নেমে এসেছে। মিছিল তারই ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। শুধু তাদের দৃপ্ত ঘোষণার উদাত্ত ধ্বনি ছড়িয়ে আছে চারিদিকে।

যথা সময়ে জেলা সদরে এই মিছিল, এই মিটিং-এর বিশেষ জরুরি রিপোর্ট চলে গেল। সেখান থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পাহাড়ী অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে।

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ঘোড়াটির বিরুদ্ধেও এল। সূক্ষ্ম ন্যায়ের দণ্ডধারী বৃটিশরাজ। রাজদ্রোহই সে-বিচারে সব চেয়ে বড় অপরাধ। তা, সে-অপরাধী মানুষই হোক আর ঘোড়াই হোক। এ-ন্যায়ের চোখে অপরাধী সবাই সমান। বিশেষত যখন বিদ্রোহ আর বিদ্রোহ। চারিদিকে কেবল বিদ্রোহ।

সুসং থানার চারিদিকের চত্তর জুড়ে সারি সারি তাঁবু উঠল। দেখতে দেখতে রাইফেল ও নানা অস্ত্রে সজ্জিত সশস্ত্র পুলিশের স্পেশাল রেজিমেণ্ট এল। তাঁবুগুলি ঘিরে তাদের নূতন ছাউনি বসল। পুলিশের বড় কর্তারাও এলেন। এইবার শুরু হলো গ্রামে গ্রামে হামলা। রাজদ্রোহীদের তারা সব ধরে নেবেন, কৃষকদের ঘর থেকে ধান ছিনিয়ে নেবেন, দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনবেন।

এদিকে গ্রামে গ্রামে সকল মানুষের দৃঢ় ঐক্যে গড়া প্রতিরোধের দুর্বার সঙ্কল্প। কর্মতৎপরতায় সমস্ত এলাকা চঞ্চল। অনবরত মিটিং-বৈঠক চলেছে। কত প্রশ্ন উঠছে। গভীর আলোচনা হচ্ছে—মীমাংসা হচ্ছে। পরিকল্পনা ঠিক হচ্ছে। গ্রাম রক্ষা ধান রক্ষার প্রশ্নই সব প্রশ্নের মূল প্রশ্ন। যে-যার দায়িত্ব বুঝে নিয়ে কাজে মেতে উঠেছে। প্রতি গ্রামে গ্রামরক্ষী জঙ্গীবাহিনী গঠিত হচ্ছে। প্রতিরোধের নানা কৌশল আয়ত্ত করতে তাদের নিয়মিত মহড়া চলছে। প্রতি গ্রামে রাতদিন পাহারা চলছে।

আদিবাসী এলাকার বাইরে আন্দোলন ও সংগঠন প্রসারিত করে প্রতিরোধের শক্তি বাড়াতে হবে। তাই প্রতি গ্রামের কর্মী বাছাই করে ছড়িয়ে দিতে হবে মুসলমান ও গারো কৃষকদের মধ্যে। শুরু হলো ব্যাপক অভিযান। মুসলমান ও গারো কৃষকরাও সমর্থন জানাল। স্থানে স্থানে সংগঠনও গড়ে উঠল।

কোনো গ্রামের পথে পুলিশ দল এলেই পাহারায় নিযুক্ত গ্রামরক্ষীদের সঙ্কেত-ধ্বনি বেজে ওঠে। গ্রামের লোক সতর্ক হয়ে যায়, পরিকল্পনা মতো যে-যার দায়িত্ব পালন করে। আক্রান্ত গ্রামের সঙ্কেতধ্বনি নিকটবর্তী গ্রামগুলিকে সতর্ক করে। আবার তাদের সঙ্কেতধ্বনি বেজে ওঠে। এমনি ভাবে মুহূর্তে এলাকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিপদসঙ্কেত পৌঁছে যায়।

কালো কালো পাহাড়গুলির উঁচুনিচু গা বেয়ে লাল ঝাণ্ডার পেছনে সারি সারি মানুষ পিল পিল করে এগিয়ে আসে। তাদের হাতের অস্ত্রগুলি সূর্য-কিরণে চোখ ধাঁধানো ঝিলিক ছড়ায়। গ্রামের চারিদিকের ঝোপজঙ্গলের আড়াল থেকেও দলে দলে মানুষ বেরিয়ে আসে। সম্মুখের মাঠ-প্রান্তরের বুক জুড়ে দেখা যায় লাল ঝাণ্ডার মিছিল। এদিক সেদিক থেকে ছুটে আসা মানুষ, একজনের পিছনে একজন করে অসংখ্য লাইন। মনে হয় প্রতিরোধের জোয়ার যেন বাঁধ ভেঙে উত্তাল তরঙ্গে ধ্বংসের রক্তিম ত্রিশূল ঊর্ধ্বে তুলে চারদিক থেকে এগিয়ে আসছে। তাদের ইনকিলাব জিন্দাবাদ গর্জন পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে শত-সহস্র কণ্ঠে গর্জে ওঠে।

পুলিশ দলের বুক কেঁপে যায়। তারা পালিয়ে যাওয়ার পথ খোঁজে। এমনি করে দিনে দিনে গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ দুর্বার হতে থাকে।

ঘোড়াটিরও মুহূর্ত অবসর নেই। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সে ছুটে চলেছে। সারা এলাকায় দ্রুত যোগাযোগের গুরুদায়িত্ব তার উপর। পথে-

ঘাটে পুলিশ দলের আনাগোনা লেগেই থাকে। তাকে ছুটতে হয় কত কৌশলে। আত্মরক্ষা করে।

সেদিন ছিল পুব অঞ্চলে এক জরুরি মিটিং। মধ্য এলাকা থেকে ঘোড়া ছুটেছে, পিঠে সোয়ার। ঠিক সময়টিতে পৌঁছতে হবে। বাঁধা পথ নেই। বনবাদার মাঠ-জঙ্গল পার হয়ে ঘোড়া ছুটছে। মাথার উপর উজ্জ্বল সূর্যের কিরণমালা। বাতাসে হিমেল ফেব্রুয়ারির শীতল ছোঁয়া। একটি ছোট্ট ঝর্ণা পার হয়ে এসে সামনে কিছুটা জায়গা। মানুষের পায়ের চিহ্নে অস্পষ্ট রেখা আঁকা। রেখাটি ক্রমেই ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন কতকগুলি টিলার গা ছুঁয়ে এঁকেবেঁকে বা দিকে সরে গেছে। বাঁ পাশে দুর্গম উঁচু পাহাড় আর ডান দিকে জল-কাদায় খাল-ডোবায় ভরা জঙলী মাঠ। এ-পথটুকু এড়িয়ে চলার উপায় নেই। অথচ চোখের দৃষ্টি সামনের টিলা-টিপিতে সীমাবদ্ধ। নির্জন শ্বাপদসঙ্কুল এই পথে পথিকের দেখা মেলে কদাচিৎ, চোখ-কানের উপর সমস্ত মনোযোগ টেনে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে সোয়ার চলেছে।

হঠাৎ মানুষের কণ্ঠস্বর ও সমবেত হাসির হিল্লোল। বিপদের নির্ভুল ইঙ্গিত। আর মাত্র কয়েক গজ পথ। টিলাটি ঘুরে পথের বাকটি পার হয়ে এলেই একদম মুখোমুখি হবে। অসহায় ভাবে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার এক নিশ্চিত আশঙ্কা। ঘোড়ার সোয়ার কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এক মুহূর্ত চিন্তা করার সময় পর্যন্ত নেই। যা কিছু করণীয় তা এই মুহূর্তেই করতে হবে। সোয়ারটির বুকে যেন শত হাতুড়ি পিটনোর বিকট শব্দ, কান দিয়ে আগুনের জলন্ত স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে বেরুচ্ছে। মুহূর্তে মনে হলো ঘোড়াটি সঙ্গে থেকেই যত বিপদ হয়েছে। ঘোড়া নিয়ে লুকনোর মতো ঝোপ-জঙ্গল কোথাও চোখে পড়ছে না। ঘোড়ার জন্য আজ ধরা পড়তে হলো। ঘোড়াটি না থাকলে কত সহজে আত্মরক্ষা করা যেত। এক হতবুদ্ধিকর পরিস্থিতি। সে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল।

ঘোড়া কিন্তু থেমে গেছে। তার কান দুটি খাড়া। তড়িৎ গতিতে পিছনে ঘুরে ছুটে কয়েক গজ এগিয়ে গিয়ে এক ঝোপের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঝোপটি পথ থেকে সামান্য উপরে, টিলার গায়ে। ছোট্ট ঝোপ, তবু পথ থেকে সহজে চোখে পড়ে না। এতক্ষণে ঘোড়ার সোয়ার সম্বিৎ ফিরে পেল। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঝোপের ভিতর বসে রইল। একটু পরেই নিজেদের গল্পে ও হাসিতে মশগুল পুলিশদল পথ দিয়ে চলে গেল। কোনো দিকে তারা তাকালও না। ঘোড়া ও সোয়ার দুই-ই রেহাই পেল।

এমনি ছোট-বড় অসংখ্য ঘটনায় আপন বুদ্ধির কৃতিত্বে ঘোড়াটি আদিবাসী কৃষকদের প্রতিরোধ-সংগ্রামের ভেতর আরো অপরিহার্য। আজ সে সবার অতি প্রিয়।

আদিবাসী কৃষকের প্রতিরোধের সঙ্কল্প এমনিভাবেই তখন এগিয়ে চলেছিল। সেই সময় এক নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে সোমেশ্বরীর তীরে এল পরীক্ষার প্রথম লগ্ন। ত্রিশ জনের একটি সশস্ত্র বাহিনী বহেরাতলী গ্রামে এল। গ্রামের ভিতরে ঢুকে তারা দেখল গ্রাম প্রায় ফাঁকা। নারীপুরুষ প্রায় সবাই তখন ছিল গ্রামের বাইরে। সুযোগ মনে করে পুলিশদল ঘরে ঢুকে যুবতী বধূ সরস্বতীকে চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে বের করে এনে দল বেঁধে নিয়ে চলল জঙ্গলের দিকে। বিপন্ন সরস্বতীর প্রাণপণ চীৎকার ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। যে যেখানে ছিল সবাই ছুটে এল। সেই চীৎকারে একদিক থেকে ছুটে এল সুরেন, সঙ্গে তার বাহিনী এবং অন্য দিক থেকে নারীবাহিনী নিয়ে রাসমণি। তারা দুদিক থেকে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল পশুগুলির উপর। হঠাৎ এমনিভাবে আক্রান্ত হয়ে পুলিশদল প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর সরস্বতীকে ছেড়ে দিয়েই গুলি ছুঁড়ল। ততক্ষণে সুরেনের তীক্ষ্ণ বর্শার ফলকে বিদ্ধ হয়ে একটি পুলিশ ধরাশায়ী হয়েছে। রাসমণির হাতের দা-ও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়নি। ধরাশায়ী পুলিশের সংখ্যা দুটি হলো। সেই মুহূর্তে এক জোড়া বুলেট প্রায় একই সঙ্গে সুরেন ও রাসমণির বক্ষ বিদীর্ণ করে দিলো। তাদের অসাড় দেহ সেইখানেই লুটিয়ে পড়ল। গ্রামবাসী ও জঙ্গী বাহিনী ততক্ষণে ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে স্থান করে নিয়েছে। সেখান থেকে শুরু হয়ে গেছে অবিরাম শিলাবৃষ্টি ও ধনুক থেকে তীরবর্ষণ। সেই সঙ্গে ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি। মৃত্যুবর্ষী রাইফেলের সঙ্গে আদিবাসী কৃষকের সাধারণ-অস্ত্রের অভূতপূর্ব পাল্লা। জঙ্গী বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ ও সুকৌশলী আক্রমণে অল্পক্ষণের মধ্যেই পুলিশবাহিনী ভীত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। তারা হাতের রাইফেল ফেলে প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল।

বীরের মৃত্যু বরণ করে সুরেন ও রাসমণি নারীর ইজ্জৎ রক্ষা করলেন। প্রতিরোধের নূতন শক্তি আদিবাসীদের হাতে তুলে দিয়ে তাঁরা শহীদ হলেন। দুই শহীদের অপূর্ব আত্মত্যাগ ও অমর বীরত্ব, সংগ্রামী আদিবাসীদের অন্তরে এনে দিলো নূতন প্রেরণা, আত্মবিশ্বাস ও শক্তি। আদিবাসী কৃষক রমণীর ইজ্জৎ অসীম গৌরবের অধিকারিণী হলো। অপর দিকে অগ্রগামী বৃটিশ রাজের পুলিশ

বাহিনীর অবশিষ্ট মনোবল ধূলিসাৎ হয়ে গেল। গ্রামের পথে পা বাড়ানো তাদের বন্ধ হলো।

সশস্ত্র স্পেশাল পুলিশ বাহিনীর উপর ভরসা ছেড়ে কর্তৃপক্ষ এবার সামরিক বাহিনীর কর্তাদের ডাকলেন। আদিবাসী কৃষকদের আন্দোলনের উপর নূতন আক্রমণের পরিকল্পনা রচিত হলো তাঁদেরই পরামর্শ মতো।

তারপর একদিন স্টেন, গ্রেন ও মেশিন গানে সুসজ্জিত সামরিক কনভয়ের সতর্ক পরিবেষ্টনে যুদ্ধযাত্রা করে ব্যাস্টিন সাহেব লেঙ্গুরা গ্রামে উপস্থিত হলেন। পাহাড়ের শেষ প্রান্তে, গণেশ্বরী নদীর পারে, প্রকৃতির এক অপূর্ব পরিবেশের মধ্যে এই গ্রামটি ছিল আদিবাসী আন্দোলনের আদিকেন্দ্র। কৃষক সমিতির প্রধান অফিস এখানে। প্রথমে গ্রামটিকে সশস্ত্র বেষ্টনে ঘিরে ফেলা হলো। এরপর এক সশস্ত্র দল নিয়ে সাহেব মানুষগুলির উপর বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নির্বিচারে নৃশংস মারপিট চলল। ঘরে ঘরে যথেচ্ছ লুটপাট হলো। অবশেষে সাহেব পেট্রল ঢেলে নিজ হাতে আগুন জ্বেলে দিলেন। সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত সাহেব সগর্বে দাঁড়িয়ে দেখলেন আগুনের শিখা গরীবের জীর্ণ কুটিরগুলি একে একে পুড়িয়ে ছাই করে দিলো। পৈশাচিক আনন্দে সাহেবের অট্টহাসি বিকট শব্দে ফেটে পড়ল। মিথ্যা শৌর্য আর অন্ধ প্রতিহিংসার সে-অট্টহাসি আটক পড়ে রইল সেই নিভৃত গ্রামের কোণেই। কিন্তু সাহেবের আপন হাতের অগ্নিশিখা তার অজ্ঞাতে শত-সহস্র লেলিহান জিহ্বা মেলে ছড়িয়ে পড়েছিল পরাধীন ভারতের সর্বপ্রান্তে। ভারতে বৃটিশ রাজত্ব পুড়িয়ে ছাই করে তবেই সে-শিখা নিভেছে।

শুরু হলো আদিবাসী কৃষকদের অন্দোলনের উপর অতি নির্মম, অতি বর্বর এক সামরিক আক্রমণ। সমগ্র এলাকার চারিদিকের সীমানা জুড়ে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার ও আসাম রাইফেল বাহিনীর কয়েক হাজার শক্ত ঘাঁটি তৈরি হলো। গারো পাহাড়ের দক্ষিণ পাদদেশের ১০০ মাইল দীর্ঘ ও ১০ মাইল বিস্তৃত অবরুদ্ধ আদিবাসী অঞ্চলটি বহির্বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ ভাবেই বিচ্ছিন্ন হলো। বর্বর এক বন্দীশিবিরে পরিণত করা হলো অঞ্চলটিকে। লাখ লাখ ইস্তাহার ছড়ানো হলো গ্রামের উপরে এরোপ্লেন থেকে। ব্যাস্টিন সাহেবের স্বাক্ষরিত ইস্তাহার। এইভাবে সাহেব মুসলমান ও গারো কৃষকদের আদিবাসী কৃষকদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার বৃথা চেষ্টা করলেন।

নেতাদের সঙ্গে এবার ঘোড়াটির খোঁজেও শুরু হলো ব্যাপক সামরিক তৎপরতা। ঘোড়াটিকেও সম্পূর্ণভাবে আত্মগোপন করতে হলো।

গ্রামে গ্রামে উন্মত্ত অত্যাচার, নির্মম তাণ্ডবের বন্যা বয়ে গেল। সামরিক বাহিনীর এই বর্বর অভিযানে দিনরাত্রি, সকালসন্ধ্যার কোনো পার্থক্য রইল না। যে-কোনো সময় গ্রামে ঢুকে তারা শুরু করত নির্মম নিপীড়ন, হিংস্র মারপিট ও ব্যাপক লুণ্ঠন। নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধের কোনো বাছবিচার ছিল না। বিবেকহীন এক উন্মত্ত পশুশক্তি সমস্ত আদিবাসীদের ঘিরে ধরে তার প্রতিহিংসার লালসাকে দিনের পর দিন চরিতার্থ করে চলল।

সর্বাত্মক এই সামরিক আক্রমণের মুখে প্রতিরোধের কৌশল পরিবর্তন করা হলো। প্রবল শক্তিশালী শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রামে প্রতিরোধ অসম্ভব। সর্বপ্রথম প্রয়োজন প্রতিরোধের শক্তিকে অসহায়ভাবে বিধ্বস্ত হতে না দেওয়া। তই গারো পাহাড়ের ভিতরে অত্যন্ত দুর্গম স্থানগুলিতে কেন্দ্র স্থাপন করা হলো। সেই কেন্দ্রগুলিতে কর্মী ও নির্যাতীত গ্রামবাসীদের রক্ষার ব্যবস্থা সংগঠিত করা হলো।

কিন্তু মুস্কিল ঘোড়াটিকে নিয়ে, তাকে রক্ষা করার উপায় নেই। পাহাড়ের দুর্গম সেই পথে ঘোড়াটিকে ওপরে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। সামরিক আক্রমণের প্রথম কয়েক দিন ঘোড়াটি গ্রামের কাছাকাছি পাহাড়ের ঝোপ-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েই আত্মরক্ষা করত। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামেও তাকে স্থানান্তর করা হয়েছে। কিন্তু কয়েক দিনের ভিতরই সব গ্রামই সমান বিপদসঙ্কুল হয়ে দাঁড়াল। গ্রামবাসীরাও গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ের গভীরে আশ্রয় নিলো। শূন্য গ্রামগুলি খাঁ খাঁ করত আর ঘোড়াটি পাগলের মতো পাহাড়ের ধারে জঙ্গলে জঙ্গলে ছোটাছুটি করত। সামরিক অভিযান পাহাড়েও শুরু হলো। ঘোড়াটিকে এই অবস্থায় রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ল।

তখন একে পাঠানো হলো এলাকার বাইরে। কিন্তু নিকটবর্তী কোনো গ্রামেও একে রাখা গেল না। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরে ঘুরে অবশেষে ঘোড়াটি আসামের এক সুদূর প্রান্তে গিয়ে পৌঁছল।

সম্পূর্ণ অজ্ঞাত গ্রাম, অপরিচিত পরিবেশ। আশ্রয়দাতা ছিল হাটুয়া ব্যবসায়ী। আশ্রয়দাতার কাছে ঘোড়াটির পরিচয় মাত্র একটিই ছিল—মালিকহীন ভারবাহী একটি জীব। আশ্রয়দাতার ভারী ভারী মালগুলি ঘোড়াটির পিঠে স্থান লাভ করল। প্রায় প্রতিদিনই তাকে ভারবহন করে দূরবর্তী হাটে হাটে

যেতে হতো। অনভ্যস্ত কঠোর পরিশ্রম। প্রয়োজনীয় খাদ্য ও যত্নের অভাব। সর্বোপরি এমন এক পরিবেশ—যেখানে সংগ্রামী সঙ্গীরা কেউ নেই, একটি দরদী স্পর্শ পর্যন্ত নেই। এই অবস্থায় কঠোর পরিশ্রম ঘোড়াটি বেশি দিন সহ্য করতে পারল না। নানা কঠিন রোগে সে আক্রান্ত হলো। তবু ভারী ভারী সেই সব মাল বহন করে দুরবর্তী পথে চলার কাজে তার ছুটি মেলেনি। নির্মম চাবুকের তাড়নায় তাকে চলতেই হয়েছে।

তারপর একদিন পঙ্গু দেহ নিয়ে পথের ধূলিতেই সে লুটিয়ে পড়ল। শত তাড়নাতেও সে আর চলার শক্তি ফিরে পেল না। অল্পদিনের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ঘোড়াটি চিরদিনের মতো পরিত্রাণ লাভ করল।

এমনিভাবে সংগ্রামী সাথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন এক সুদূর পল্লীতে সহানুভূতিহীন পরিবেশের মধ্যে সীমাহীন যন্ত্রণা নিয়ে একটি রাজদ্রোহী জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে।

জানি না শহীদের গৌরবের সামান্যতম কোনো অংশ এই ঘোড়াটির প্রাপ্য হবে কি না!

'তিতুমীর নগর' (বারাসত)-এ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সারা ভারত কৃষক সম্মেলন উপলক্ষে পুরনো দিনের এই স্মৃতিচারণটি প্রকাশ করা হলো। —সম্পাদক, পরিচয়

তোমার নাম মনে পড়লে

ধনঞ্জয় দাশ

তোমার নাম মনে পড়লেই
আমার চোখের সামনে
জ্বলতে থাকে
স্বপ্নের পৃথিবী।
তোমার নাম মনে পড়লেই
আমি শুনতে পাই
শৃঙ্খল-মুক্ত ভালোবাসার গান।
তোমার নাম মনে পড়লেই
আমি স্পষ্ট দেখতে পাই
রাত্রির আকাশজোড়া সূর্যের বল্লম
ক্রমশই ছিঁড়ে আনছে অনিবার্য দিন।

কমরেড লেনিন,
আমি কবি, এই বাঙলাদেশে বসে
তাই আত্মজিজ্ঞাসায় ভাবি :
এ-প্রজন্ম কবে শুধবে তোমার সেই ঋণ,
কবে আমাদের রক্তে বাজবে
ধ্বনি-প্রতিধ্বনি : লেনিন....লেনিন !

নিবেদিতা

শান্তিকুমার ঘোষ

প্রকৃতি কি শক্তি ধরে ....
নৌবহর টেনে আনে,
নিরাপদ রাখে কি বন্দরে ;
কিম্বা ডুবো পাহাড়ে সহসা
আছড়িয়ে ভাঙে ?
.... সব তুচ্ছ ক'রে
আলোকস্তম্ভের মতো নারী
নিজের যৌবন থেকে
অগ্নি জ্বেলে নিয়ে
দাঁড়িয়ে দিশারী

উন্মুক্ত পদ্মার তট
এই বুঝি সূর্যোদয়ে রাঙে—
কে আগে চলেছে গৌরী দীঘল গড়ন,
পিছে পিছে যত গ্রামজন ;
— জেগেছে সহস্র প্রাণ যেন মন্ত্রবলে :
কবি সঙ্গে চলে

ছুটির পর

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

কলকোলাহলময় নগরীর হাত থেকে আমি
শুকনো কাগজ, বাসি ফুলফল, টুকিটাকি শিল্প ও প্রগতি
কিনেছি দু-মাস। এই দু-মাসের রাহা খরচের
হিসেবনিকেশগুলি মোটামুটি বিশ্বাসজনক,
তবু লাভালাভ জেনে নিতে যখনই আমার মহাজন
আড়চোখে তাকায়, আমি সদুত্তর ভুলে যাই।
আলো ও রঙমশাল প্রভৃত খরচ ক'রে মানুষের মুখ ও বুকের
যেটুকু সংবাদ এই দু-মাসের উত্তাল শহরে অধিগত,
যে-পণ্য ফুটপাতে, ভরা ট্রেনের কামরায়, কিংবা সন্ত্রস্ত বিকেলে
নিসর্গপ্রতিম, তাকে ব্যাগে পুরে বিদেশ ভ্রমণে যেতে
কে না ভালোবাসে! কিন্তু আমার ভ্রমণ
রাহা খরচের মধ্যে বেসামাল, ধারদেনা শুধু যায় বেড়ে।

আমি মফঃস্বলী ব'লে আমাকে ভিড়ের মধ্যে থামতে হয়,
ভুল হয় ঠিকানা ও যোগাযোগ, চেনামুখ, অচেনা লোকজন।
পোস্টাপিশে বত্রিশ মিনিট কিউ দিয়ে দাঁড়িয়েও
যখন জানতে হয়—"রং নাম্বার!"
যখন মাইক্রোফোনে দু-রকম গলা, আর হরেকরকম বিবৃতির মাঝে
আমি প'ড়ে যাই একলা, তখন পথের দিশা দিতে পারে
এ-রকম একজনও কি নেই আর; বহু রিসিভার শুঁকে দেখি।

তোমার নিশান আমি চিনে গেছি, কিন্তু তুমি আমার নিশান
কেন বুঝে ছাখোনাকো; জানো তো রেলওয়ে আজো সবুজ ও লাল
যেমন প্রয়োগ করে, তার কোনো দ্ব্যর্থ নেই আর।

আমি হাত তুলে তোমাকে থামতে বলি, তুমি সে-ইঙ্গিত
ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে যাও, কিংবা তুমি যে-ভাষায়
আমাকে যোগ দিতে বলো তোমার মিছিলে
তখন আমার সামনে ট্রাফিকের দুরন্ত হামলা,
আমি রাস্তা খুঁজে পেতে না-পেতেই ততোক্ষণে তোমরা উধাও !
আমি যাকে থামতে বলেছি, সে থামেনি ; আমি যার
পাশাপাশি চলবার চেষ্টায় ঘুরে যাই মোড়,
সে-তখন কেবলই পিছিয়ে যায় ।
তার নিশানের সঙ্গে আমার নিশান
কেবলই বিচ্ছিন্ন হয় ; তবু ঠিক—মাইক্রোফোনে দু-রকম গলা
অন্তত দশরকম পরস্পর-বিরুদ্ধ বিবৃতি
নগরীর দেওয়ালে-দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে ফেরে প্রতিদিন ।

আমাকে থামতে হয়, থেমে থেমে, ভেবেচিন্তে খানিকটা একাই চলতে হয় ;
কোথায় কতোটা জল, কী রকম আলো ও আগুন
আজ এ-শহর ঘিরে আছে, বুঝে নিই । কোথায় মাকড়শা,
ইঁদুর ও কুকুরের উপদ্রব—তাও হয় জানা ।
তবু এভিন্যুয়ে আলো ঢের, বাতাসও এখনি উষ্ণ, কাগজে-কাগজে
যতো লেখালেখি, তার অনেকটা অংশই আজো পরস্পরের
কমিউনিকেশন থেকে দূরে, যে-রকম দূর নিয়ে
ফিরতে হয়েছে আজ আমাকেও,
নগরীর থেকে এই কঠিন পাহাড়ে ।
আমার ছুটির মাসদুটি তবু ব্যর্থ নয়, অন্তত এখনি
ট্রাফিক সিগনাল ভুলে বলা যায়,
মুখোশ সরিয়ে আজ মুখগুলি ভ'রে তোলে আমার ক্যানভাস,
ফোনে ও মাইক্রোফোনে এখন নতুনতর যোগাযোগ
গ'ড়ে নিতে ব্যস্ত আমি ; শুধু আর শুকনো কাগজে
সুখ নেই, কী শহরে কিবা মফঃস্বলে ।

আমি

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

তোমার কথা ভেবে আমি দুঃখ পাই
যেমন তুমি পাও আমার কথা ভেবে
কী দুঃসময়েই না আমরা জন্মেছি
যেন ইহুদি ক্রীতদাস জন্মসূত্রে অর্জন করেছি
মিশ্রীয় প্রভুদের ঘৃণা আর চাবুক
মিশর, আমার বন্দীশিবির আমাদের বধ্যভূমি
তুমি তো জন্মভূমিও
তবে কেন কেন এই উদাসীনতা
কেন ধরিত্রী দুভাগ হবে না রামেশিষ! তোর পায়ের তলা থেকে
কেন পশ্চিমা বায়ু বহন ক'রে আনবে না
লক্ষ লক্ষ মৃত্যুবাহী পঙ্গপাল

তোমার কথা ভেবে আমি দুঃখ পাই
উদয়াস্ত জোয়াল কাঁধে বলদ
মুষড়ে যেতে যেতেও পাথর ভাঙে
আদিতে ছিল যে শব্দ
তার শূন্য জরায়ুতে বপন করো দেবদূতের ভ্রূণবীজ
মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেও পাখা ঝাপটাও প্রাণপণে
'নীলিমা' 'নীলিমা' ব'লে চীৎকার করে নীরক্ত চোখের মণি
অথচ সময় এখন বিলকুল বদলে গেছে

আমার কথা ভেবে তুমিও দুঃখ পাও
আমি
আয়নার সামনে মুখ তুলতে পারি না—
চোখের কোটরে জল জল করছে ক্ষুধার্ত সাপ

দাঁতে ফুটন্ত বিষের থলি
কোষে কোষে প্রতিহিংসা
এতো পাপ নিয়ে তোমার কাছে দাঁড়াই কি ক'রে

মরতে মরতে বেঁচে আছি
সে-কোন দেশের রাজা তুমি পরিত্রাতা
কোন মরুভূমি পার হয়ে এলে
কোন অলৌকিক ক্ষমতা তোমার যাদুদণ্ডে সঞ্চিত
মরতে মরতে বেঁচে-থাকা মানুষগুলো
তোমার কথাই ভাবছিলাম।

দুহাত তুলে বৃষ্টি নামাও
আর দুভাগ করো সমুদ্র
আর ইব্রীয়দের পরপারে পৌঁছে দাও
আর ফেরৌন ভেসে যাক অতল অনস্তিত্বে
আর আমি বরণ ক'রে নিলাম মৃত্যুদণ্ড

আমার জন্য দুঃখ ক'রো না

মরুবিজয়ের আগে

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

সিঁড়িতেও জলস্রোত
তুমি কিন্তু ভাবোনি কখনো
গরাদ বাঁকানো হাত
রাজপথ ছাড়িয়ে কখন
সীতা উদ্ধারের ব্রতে
নেমে পড়বে কঠিন মাটিতে।

আজ সেই রথযাত্রা
জনারণ্যে
উচ্চকিত শব্দের মৈনাক,
মরুবিজয়ের আগে
চাকার ঘর্ঘর শুনে
থমকে দাঁড়িয়ে দেখি
ছুটে যায় ক্রুদ্ধ বলরাম।

সমস্ত ব-দ্বীপ খাড়ি এইমাত্র ভেঙে গেছে
কালভৈরবের পদপাতে
গরাদ বাঁকানো হাতে
লাঙলের সুকঠিন ফাল
ডুবে গেলে মাটির জঠরে
সিঁড়িতেও জলস্রোত
ভয়ঙ্কর তীব্র হয়ে ওঠে।

বেশ কিছুকাল যাবৎ

তুলসী মুখোপাধ্যায়

বেশ কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করছি
আমি এবং প্রধানত আমিই
পৃথিবীর যাবতীয় নাশকতামূলক কাজকারবার চালিয়ে যাচ্ছি
সূর্যের যে-পিঠে যখন ছায়া
আমি তখুনি দপ্ করে উঠি সেখানেই
কখনো হয়তো বেবীফুডে মিশিয়ে দিচ্ছি ঘাসের বীচি
কখনো বা কর্ডনিং ভেঙে চাল পাচার করছি কালো গুদামে
আবার কখনো গুণ্ডা সেজে হামলা করছি রাজপথে
কখনো বা নিক্সন হয়ে বোমা ফেলছি ভিয়েতনামে
অর্থাৎ পৃথিবীর তাবৎ নাশকতামূলক কাজকারবার
আমি এবং প্রধানত আমিই করে যাচ্ছি প্রবল প্রতাপে
আইন-আদালতের পুরো পৃষ্ঠায় রোজই আমার ঘাতকমুখ।

ক্রমে আমি দেখতে পাচ্ছি
আমার নিশ্বাসে নীল হয়ে ঢুলে পড়ছে শিশু
আমার স্পর্শে গাছের বাকলে লাগছে ঘুণ
আমার লালা লেগে নোনা হচ্ছে শস্যের সাহস
অথচ কয়েক লক্ষ ফাঁসির রায় বিলি করেও
আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো গেল না
আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো গেল না!

বেশ কিছুকাল যাবৎ লক্ষ্য করছি
আমি এবং প্রধানত আমিই
পৃথিবীর যাবতীয় নাশকতামূলক কাজকারবার চালিয়ে যাচ্ছি

হৃদয় কথাটি

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

হৃদয় কথাটি কানের পর্দা ছুঁয়ে গেলে
জীবনের শেষ সম্বল
হাতের কড়ি যেন টুপ ক'রে
খসে পড়ে অথৈ জলের বুকে
শূন্য হাতে ভিখারী কাঁদে
কোথায়? কোথায়?

হৃদয় কথাটি কানের পর্দা ছুঁয়ে গেলে
হা-ভাত হা-অন্ন আকাল সংসারে
মমতায় ফুলের পসারী নাকাল
স্নেহের পুত্তলি নাচে মায়ের কোলে
দামাল ছেলে যেন
ল্যাজ-ঝোলা পাখির হদিস নিতে
ইতি উতি ধায়।

হৃদয় কথাটি কানের পর্দা ছুঁয়ে গেলে
হুস করে কখন যায় উড়ে
হটর হটর মন পবনের না
কোন দরিয়ায় বৈঠা যায়
কেউ তা জানে না।

কিছু বলাবেই

তরুণ সেন

কারা যেন দেয়ালগুলোর মুখে সারারাত কারুকাজ সেরে যায়

লাল, নীল, কালো
হরেক রঙের কাজ
কিছু বুঝি কিছুটা বুঝি না।

আমার উৎসাহ নেই কে-কখন কোন পটুয়ার তারিফে চীৎকার করছে

দেখে যাচ্ছি রোজ একটা ভিখমাঙা দিন
চুপি চপি ওখানে এসেই ফাঁসি যাচ্ছে
ভোর না হতেই লাশটা উধাও

তারপর
তদন্তকারী হাওয়া রঙ-চং কারুকাজ কিছুই মানছে না
মূল সাক্ষী দেয়ালগুলোকে হরদম খুঁচিয়ে যাচ্ছে—
কিছু বলাবেই।

চারিদিক জেগে আছে সুরে

মনীষীমোহন রায়

স্বকীয় শ্রমের সব অপার দুর্গতি দেখে
বেছে নেবে, নাও তুমি আত্মরতি
এ-কেমন সকরুণ অসুখ তোমার ?
একথা তো তোমার জানাই ছিল, আছে—
অফুরান হাততালি অঢেল মোহর পায় বাইনাচ
সামন্ত হাতের থেকে অনেক ইনাম।

ওঠো জাগো, দেখো চেয়ে ওই
কট্টর রোদের ফলা মুখের ওপরে পড়ে
কোনাকুনি ত্রিশূলের মতো।
এঁদো পুকুরের মলিন স্তরের মতো স্থবিরতা থেকে
"যাত্রা শুরু, যাত্রা শুরু" ধ্বনি
ওঠে পড়ে ফিরে যায় দারুণ ভীষণ এক
হত অভিমানে।
আবেগ লতানো কিছু সুঠাম বুদ্ধির সব
কারুকাজ, ফলা
নিপাট বিরস পাকে ঘোল খায়, ধরাশায়ী হয়....

দেখো চেয়ে, যখন পুকুরময় ঘোর স্থবিরতা
বদ্ধ হাওয়া, শীত
গতির কাঙাল জল নিরুপায় শুয়ে থাকে শোকে
মলিন দামের স্তরে, কচিৎ তখনি এক জলপিপি
ডেকে ওঠে সুরে।
চারিদিকে বেজে ওঠে "যাত্রা শুরু যাত্রা শুরু" ধ্বনি
কেন তুমি সকরুণ দারুন ঘূর্ণির পাকে
ঘোরাও নিজেকে
ছড়াও ছিটোও কালি স্নায়ুতে শোণিতে ?
শানাও নিজেকে তুমি, হাতে নাও কট্টর রোদের ফলা
শানিত কৃপাণ
দেখো চেয়ে মলিন দামের স্তরে গতির আগুন জেলে
পায়ে পায়ে সপাটে এগিয়ে চলে জলপিপি....
চারিদিক শানিত সজ্জিত হয়ে জেগে আছে সুরে।

নীলকণ্ঠ পাখির পালক

অমিয় ধর

হৈচৈ

চড়কের মাঠ থেকে ফিরে আসি, বাঁয়ে ফেলে রথতলা

ছায়ারৌদ্র ঝিলিমিলি পরণ-দীঘির ঘাটে।

সর্ সর্ শব্দে রোদ

ঝি-কি-মিকি

নেশাধরা সোঁদাগন্ধে বাঁশবন

ঢাউস চোখের দৃষ্টি মেলে দিই

হলুদ রোদ্দুর মাথা বাবলায়—

কার যেন পথ চেয়ে গোঁসাইতলির বাঁকে :

জলের শরীর ছুঁয়ে

অবুঝ কাঁকন বাজে—

কি করুণ বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুর

মনে পড়ে কার কথা!

চিক্কন সবুজ বুকে

ঢেউ রেখে,

আজো যেন বলে যায়

এই দেখো হাতে আছে

নীলকণ্ঠ পাখির পালক :

ছোঁও দেখি,

ছোঁও দেখি,

ছোঁও দেখি!

গণিতের থেকে মুক্তি দাও

সত্য সেন

মৃত্যু চুমু খেতে চায় জীবনের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে।
গলায় পরাতে চায়, অঙ্গারের
উজ্জ্বল জ্বলন্ত মালা। ভালোবেসে।
এ-প্রেমের পরিণতি 'আমি'রা প্রত্যেকে জানি।

অতএব অব্যক্তই থাক।

জানি তাই চরিত্রকে সুরক্ষিত রেখে
ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি এই প্রেম স্বৈরিণীর।
অসহায় অনুচ্চার ভীতি।
তাকে ঘিরে
ঘৃণাটাই যদিও সোচ্চার।

তবু তাও অব্যক্তই থাক।

এ-সুর বড়ই কাঁপা। তবু,
রাগিনীর এই রূপ।
এই সুরই অভিপ্রেত জীবনের গানে।
গৌরবেই গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাক
এ-অসহায়তা। ততদিন,
যতদিন মানুষের হাতে
স্বৈরিণীর চরিত্রটা শোধন-সাপেক্ষে।

এ-অসহায়তা।
হয়তোবা এটাকেই ফ্রাস্ট্রেশন বলে।
স্বল্পবুদ্ধি। আমিই বুঝিনি এতদিন।
আধুনিক সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে
তাই, আমিও বিপ্লবী।

ফ্রাস্ট্রেশন বুনো ওল যদি
আমিও পেয়েছি বাঘা তেঁতুলের স্বাদ।
পেয়ে গেছি শিল্পসাহিত্যের
অধুনা ভাণ্ডারে :

যৌনতা। চরিত্রহীনতা।

চলার ছন্দে নেই বালখিল্য কোনও ভীতি
উচ্চগ্রামে সুর বাঁধা।
জীবনের জয়গান গেয়ে
এসে দাঁড়িয়েছি হাড়-কাটা গলির মোড়েতে। মুখে পান।
পানের বোঁটার চুন ঘসছিলাম জিভে।
পা-ছুটোও ঘসছি তখনও।

সমুখেই হাড়-কাটা গলির বিবর।

এগিয়ে আসছে এক বরযাত্রার মিছিল।
যে-মিছিলে প্রত্যেকেই বর।

প্রতি ওষ্ঠে ওষ্ঠে যার চুম্বনের উলঙ্গ চ্যালেঞ্জ।

আমিও তো অনুরূপ বরযাত্রার যাত্রিক। অথচ :
"বহু বচন"-এর আমি চলে গেল আমাকেই ফেলে।

গোধূলির রক্তাক্ত আলোয়
প্রত্যেকেই যেন ওরা সূর্য-সহচর।

বন্যার বন্ধনমুখ উৎসারিত যেন।
গণিতের মুখে লাথি মেরে
এগিয়ে আসছে ছুটে অগণিত সূর্যের সারথী।
সমুখে দাঁড়িয়ে সেই মৃত্যুনাম্নী-স্বৈরিণী রমণী।
চুমু খেতে চান যিনি জীবনের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে।

গলায় পরাতে চান, অঙ্গারের
উজ্জ্বল জ্বলন্ত মালা। ভালোবেসে।
কন্যাপক্ষ কন্যারই আড়ালে হাতে রাইফেল।

জীবন-মৃত্যুতে মুখোমুখি।
আরও
আরও আশ্লেষ সান্নিধ্য। বন্ধন আশ্লেষ।
চুম্বনের সশব্দ প্রত্যয়ে গোধূলির প্রায়ান্ধকার উচ্চকিত
আলোকিত পুণঃ পুণঃ বিস্ফার আলোকে।
বরযাত্রী অনেকেরই গলায় দুলছে, অঙ্গারের
উজ্জ্বল জ্বলন্ত মালা।
মিছিলের দুর্বিনীত নিষ্ঠুর কামনা :
আরও মালা চাই অগণিত।
দিতে চাই
নিতে চাই
অজস্র চুম্বন।

মৃত্যুর "চুম্বন-সাধ"
আপাদ-মস্তক ওরা
ঢেকে দিতে চায় যেন চুম্বন-কফিনে।

মুগ্ধ।
বিমুগ্ধ আমি।
জীবনের এ-অপার দুঃশ্চরিত্রতায়।
দর্শকের ভূমিকায় সাত্ত্বিক-চরিত্র পিতা
সেও দেখি, আশিস ঝরায়
সন্তানের এ-চরিত্র-হননে।

শেষ দৃশ্যে চেয়ে দেখি : সূর্যকে পিছনে রেখে
প্রাণভয়ে ধাবমানা পর্যুদস্তা, বিবস্ত্রা স্বৈরিণী।
তার পিছে ধেয়ে চলে মহামানবতার মিছিল।
পায়ে বাঁধা গতিশক্তি যার
মহা-পার-মানবিক।

"হে মহান অগণিত"
আমার প্রার্থনা রাখো :
গণিতের থেকে মুক্তি দাও।

মস্কোয় একটি
বিতর্কমূলক আলোচনা-সভার
বিবরণ

ছোটগল্প-বিষয়ক ভাবনা

ছোটগল্পের সামাজিক পট উক্ত শিল্প-রীতির সফল বিকাশের একমাত্র ভিত্তিভূমি—এই মতটি সোভিয়েত ছোটগল্প-বিষয়ে এক আলোচনা-সভায় সম্প্রতি সর্বসম্মত বলে গ্রাহ্য হয়। সভাটি ছিল মস্কোর **'সাহিত্য-বিষয়ক সমস্যা'** নামের পত্রিকার দ্বারা পরিচালিত নিয়মিত গোলটেবিল বৈঠকের অন্যতম।

গোলটেবিল আলোচনা-বৈঠকে যোগদানকারীরা এ-বিষয়ে একমত হন যে অন্য যে-কোনো শিল্প-মাধ্যমের মতো ছোটগল্পও জীবনের অনুসারী এবং জীবনেরই প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তনশীল। কয়েকজন আলোচক ছোটগল্পের বর্তমান অবস্থা ও তার প্রধান লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ করেন। তাঁরা দেখান, কয়েক বছর আগের লেখা থেকেও সাম্প্রতিক সোভিয়েত ছোটগল্পের ধরনধারণ স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট। আলোচকরা বর্তমান ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে তাদের ক্রমবিকাশের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং গল্পে প্লটের গুরুত্বের উপর জোর দেন। 'প্রামাণ্য তথ্য-সংবলিত' ও 'স্বীকারোক্তি-মূলক' সাহিত্যের সংজ্ঞা দুটি নিয়েও প্রচুর বিতর্ক জমে ওঠে। ছোটগল্পের রচনাশৈলী ও তার নবতন প্রকাশরীতি বিষয়ে পরস্পর-বিরোধী মতামত ব্যক্ত হয়।

বৈঠকে যোগদানকারী লেখক-আলোচকরা তাঁদের যে-লিখিত বক্তব্য সভায় পেশ করেন, নিচে সংক্ষেপে তা বিবৃত হচ্ছে।

প্রথমে **নিকোলাই আতারোফ** তাঁর 'উদ্দেশ্য-চেতনা' নামের নিবন্ধে লেখক হিসেবে নিজের তরুণ বয়সের কথা স্মরণ করেন। সেকালে "পুনর্গঠনের কর্মে রত জনগণের মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া"-ই কর্তব্য বলে লেখকদের মনে হয়েছিল, বিবেচিত হয়েছিল—নতুন জীবন-গঠনের কর্মে লিপ্ত শ্রমজীবী মানুষের কথা সাহিত্যের উপজীব্য হওয়া উচিত। গল্পে চরিত্র-নির্বাচন ও তার পরিণতির পথনির্দেশেই একমাত্র ব্যক্তিগত অভিরুচির ব্যাপারটি নিহিত ছিল। তবে একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতা বস্তুটি ছিল সর্বথা পরিত্যাজ্য। তিরিশ দশকের লেখকরা "তাঁদের সমকাল" সম্বন্ধে লিখতেই অভ্যস্ত ছিলেন আর ফাঁকে ফাঁকে নেহাতই আকস্মিকভাবে "নিজের" কথা লিখতেন। তবে এর মধ্যে জবরদস্তির

ব্যাপার ছিল না। পারিপার্শ্বিক জগতে বাইবেল-কথিত ঘটনাসদৃশ বিরাট সব পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছিল, জন্ম নিচ্ছিল নতুন ধরনের মানুষ। তাই এই দৃষ্টিভঙ্গি সেদিন স্বাভাবিক ছিল।

এরপর বক্তা যুদ্ধ-পরবর্তী যুগের লেখকদের সম্পর্কে আলোচনা করলেন। যুদ্ধের সময় এবং বিশেষ করে যুদ্ধের পরের বছরগুলিতে পৃথিবী থেকে যখন আপাত-শৃঙ্খলার ভাবটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তখন তরুণ লেখকরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিশাল ভাণ্ডার উন্মোচিত করে তাঁদের নিজেদের মধ্যেই প্রধানত জীবনের উপাদান সংগ্রহে ব্যাপৃত হন। ফলে, অন্তত কিছুকালের জন্যেও আত্মমুখ কাব্যিক গদ্যের প্রচলন ঘটল। তবে যুদ্ধপূর্ব বছরগুলির মতো তখনও শ্রেষ্ঠ বর্ণনাত্মক রচনাই শেষপর্যন্ত মহাকালের গলার মালায় স্থান পেল। আভারোফ তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন চেখভের উদ্ধৃতি দিয়ে "সবসেরা লিখিয়ে হলেন তাঁরাই, যাঁরা বাস্তববাদী, যাঁরা জীবনকে যেমনটি দেখেন তেমনটিই আঁকেন। তবে, যেহেতু এঁদের লেখার প্রতিটি ছত্র বৃক্ষে বহতা রসধারার মতো একটি বিশেষ উদ্দেশ্যবোধে অভিষিক্ত, পাঠক সেইহেতু তা থেকে শুধু যে জীবনের হুবহু স্বাদটুকু লাভ করেন তাই নয়, জীবনের পক্ষে যা হওয়া উচিত তাও অনুভব করেন এবং করে মুগ্ধ হন।"

ইউরি ত্রিফোনোফ তাঁর আলোচনা-প্রবন্ধের নামকরণ করেন 'প্রোসাস-এর যুগে প্রত্যাবর্তন'। রচনায় কারুকৃতির সমস্যা, বিশেষ করে এ-যুগের গদ্যের নির্দিষ্ট লক্ষণ ও প্লটের সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনা করলেন।

তিনি বললেন, কোনো বিশেষ শিল্প-শরীরের সঠিক সীমারেখা নির্ধারণ কঠিন কাজ, উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে একমাত্র দৈর্ঘ্য ছাড়া যেমন অপর কোনো মৌল পার্থক্য নির্দেশ করা কষ্টকর। চেখভের ছোটগল্পগুলি আসলে "চেখভের শিল্পের প্রচণ্ড 'শক্তির চাপে' পিষ্ট উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত, সঙ্কুচিত রূপমাত্র।" অপরপক্ষে দস্তোইয়েভস্কির **'পাপ ও শাস্তি'র** মতো উপন্যাস—যেখানে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র কর্মকাণ্ড আবর্তিত এবং সমস্ত ঘটনা মাত্র এক বা একাধিক দিনে সংঘটিত—সে-ক্ষেত্রে তাকে গভীরতর, অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ছোটগল্প ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আসল বিবেচ্য বিষয় হল, অন্তর্নিহিত গতি। এই গতির পূর্ণতা থাকলে জাঁদরেল এপিক উপন্যাস ও পাঁচ পৃষ্ঠার ছোটগল্পও তুল্যমূল্য।

এই মৌল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ত্রিফোনোফ গদ্য-সাহিত্যের বিকাশ সম্বন্ধে

সাধারণভাবে আলোচনা করলেন। কয়েক শতাব্দীর অস্তিত্বের ফলে গদ্য-সাহিত্যের নিজস্ব আইনকানুন, আদর্শ ও রচনারীতির উদ্ভব ঘটেছে। আবার এও স্মরণীয় যে গদ্য বা ইংরেজিতে যাকে 'প্রোজ' বলা হয়, সেই পরিভাষাটি লাতিন ভাষার বিশেষণ শব্দ 'প্রোসাস' থেকে উদ্ভূত। আর এই 'প্রোসাস' শব্দটির অর্থ : মুক্ত, অকপট ও অদম্য।

বক্তা তাঁর নিজ অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে গল্পে প্লটের কার্যকারিতা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করে প্লটের চরম আত্মমুখ-ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। তাঁর মতে আসল ব্যাপার হলো, এক মুহূর্তের জন্যেও লেখককে গল্পে প্রতিফলিত জীবনের সার সত্যকে ভুললে চলবে না। আর তাহলে ওই সত্যই প্লটের উন্মোচনে সহায়ক হবে।

ইউরি ত্রিফোনোফও পরিশেষে চেখভের শরণ নিলেন। সহজ বিষয় সহজ করে লেখা সম্পর্কে সাহিত্যাচার্যের মন্তব্যটির উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, প্লট-বিষয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান ওই উক্তিটিতে নিহিত।

প্লট সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপিত করার পর শেষকালে ত্রিফোনোফ বললেন "প্লট-বিষয়ে আমি এতাবৎ যে-মত এখানে ব্যক্ত করলুম, তা সবই যে-সাহিত্য পৃথিবী আবিষ্কারের অভিযাত্রী সেই সাহিত্য সম্পর্কিত। কিন্তু এছাড়া আরও একপ্রকার সাহিত্য আছে যা জগৎ সৃষ্টি করে, যা বাস্তব পৃথিবীকে রূপকথার জগতে পরিণত করে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্লট হয়ে ওঠে প্রচণ্ড, সময়ে সময়ে অলৌকিক, শক্তি-সম্ভব। গোগোল আর এডগার অ্যালান পো-র ছোটগল্প আর দস্তোইয়েভস্কির উপন্যাস এমন সব প্লটের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যাতে প্রতিভাবানের জাদুর ছোঁওয়া লেগেছে।"

লেখক **ইউরি কুরানোফের** আলোচনা-নিবন্ধের নাম 'প্লট ছাড়া ছোটগল্প নামে বস্তু নেই'। ছোটগল্পের শিল্পশরীরের গুরুত্ব ও তার বর্তমান সাফল্যের দিকনির্ণয় এবং সাম্প্রতিক ছোটগল্পে প্লট-সম্পর্কিত ধারণার বিবর্তনের রূপরেখা নির্দেশ ছিল এঁর প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

আধুনিক সোভিয়েত ছোটগল্পে শিল্পগত গুণের লক্ষণীয় ক্রমোন্নতির উপর জোর দিলেন কুরানোফ। তিনি দেখালেন, গল্পে ঘটনাবর্ণনকে যোগ্যতার সঙ্গে গেঁথে তোলা, ঠিক ঠিক সুরটি বাজানো, যথাযথ শব্দপ্রয়োগ, ইত্যাদি এ-যুগের ওস্তাদ ছোটগল্প লিখিয়েদের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। শ্রেষ্ঠ সোভিয়েত ছোটগল্পের আবেদন তাদের মানবধর্ম এবং পরিপার্শ্ব আর জগৎ সম্পর্কে ও তার

পরিবর্তনের রঙ-বদল বিষয়ে গুরুতর অভিনিবেশে নিহিত। বহু বিভিন্ন ঘটনা-বলীর মধ্যে বিচিত্র জটিল পারস্পরিক যোগসূত্রের উদ্‌ঘাটনের কাজে লিপ্ত সোভিয়েত সাহিত্য। আর এই কাজটি সবচেয়ে সুষ্ঠুভাবে সম্ভবত সম্পাদন করছে ছোটগল্প। এর কারণ, ছোটগল্পের শিল্প-শরীর যেমন চনমনে তেমনই সংবেদনশীল এবং এটি সহজে প্রয়োগসাধ্য ও দ্রুত সুফলদানে সমর্থ।

প্লটের কথা বলতে গিয়ে কুরানোফ জানালেন যে প্লট ছাড়া ছোটগল্প বস্তুটির অস্তিত্ব আদপে সম্ভবই নয়। প্লট ছাড়া ছোটগল্পের এই ধারণার উৎস হয়তো এইখানে যে আধুনিক ছোটগল্প এমন প্লট অবলম্বন করতে চায় যা তার বাহ্য অবয়বমাত্র হবে না, হবে অন্তরিন্দ্রিয় সদৃশ। অর্থাৎ, এই প্লট এমন বস্তু যা গল্পের চরিত্রের অন্তরজগৎ ও বহির্বিশ্বের মধ্যে এবং ঘটনাবিশেষের অন্তঃসার ও বাহ্য অবয়বের মধ্যে সেতুবন্ধস্বরূপ হবে ও তাদের পরস্পর-প্রভাবের পথ সুগম করবে। আর এরই ফলে সাম্প্রতিক যুগে গদ্য ও কবিতার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে চমৎকার একটি বোঝাপড়ার ভাব গড়ে উঠছে—যার পরিণতিতে আবেগে, প্রাণস্পন্দনে, রূপকের গভীরতায় গদ্য হয়ে উঠেছে আরও সজীব, আরও তরতাজা। আধুনিক ছোটগল্পে তাৎপর্যের ফল্গুপ্রবাহ তাই আজ আরও অর্থবহ, তাই সে আজ ছোটগল্পের নিত্যসঙ্গী।

এড্যায়ার্ড শিম তাঁর 'আবেগের পারা চড়াই আসল কথা' নামের নিবন্ধে জানালেন যে তাঁর মতে সত্যিকার ছোটগল্প হল প্রধানত "জীবন সম্পর্কে যথাযথ নৈতিক মনোভঙ্গি প্রকাশের অন্যতম বাহন।" এটাই তাঁর কাছে ছোটগল্পের সত্যিকার মূল্য যাচাইয়ের মাপকাঠি। অনেক লেখকই আজকাল গল্প লিখতে গিয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দেন, অনেকে রীতিমতো ঝলমলে স্টাইলে লিখে থাকেন; কিন্তু কখনও কখনও এই দক্ষতা, এই মসৃণ লাবণ্যই পাঠকের কাছে ক্লান্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত গল্পে প্রায়শই যেমন চমৎকার স্টাইলের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই পাওয়া যায় শিল্পের যথাযথ আবহাওয়া আর খুঁটিনাটি বিষয়ের নিখুঁত বর্ণনা। তবু সব সত্ত্বেও ফিরে ফিরে আপনার কেমন যেন মনে হবে, সমস্ত ব্যাপারটার উৎস লেখকের 'মস্তিষ্ক,' তাঁর 'হৃদয়' নয়। অথচ লেখকের আবেগের উত্তাপ বা "পারা চড়া"টাই তো এক্ষেত্রে আসল কথা। সত্যি বলতে কি, খাঁটি প্রেরণা, স্বাধীনতা আর স্বাভাবিকতা বর্জিত অগভীর ছলাকলা, ফ্যাশনদুরস্ত শব্দ-শিকার আর নিরস

ত্রুটিহীনতায় ভরা "পারানামা" ইষদুষ্ণ গল্প পড়তে পড়তে পড়তে বিরক্তি ধরে যাবার যোগাড় হয়েছে।

বক্তৃতার শেষে শিম জানালেন সোভিয়েত লেখক ইউনিয়ন ভবনে 'ছোটগল্পের ক্লাব' প্রতিষ্ঠার কথা। সম্প্রতি গড়ে-ওঠা এই আড্ডায় সুখ্যাত লিখিয়েরাও তাঁদের নতুন লেখা পড়ছেন। তিনি আরও জানালেন, এই ক্লাব শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের সংগ্রহ সম্পাদনায় বিশেষ আগ্রহী।

লেখক আঁদ্রেই বিতোফ সোভিয়েত ছোটগল্পের সাম্প্রতিক কৃতসঙ্কল্প দীর্ঘ পদক্ষেপের ফলে তার যে অভাবনীয় ব্যাপ্ত শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে সেকথা জানালেন। ছোটগল্পই এখন সবচেয়ে নিখুঁত এবং সুসমঞ্জসভাবে গড়ে ওঠা শিল্প-মাধ্যম ; তবু এই শিল্পরীতিটি ইতিমধ্যেই "খাবি খাওয়ার অবস্থা"য় পৌঁছেছে। বক্তা মনে করেন, গদ্যশিল্পের আরও বিকাশ ঘটতে বাধ্য। উৎকৃষ্ট গদ্যলেখকের অবশ্যই ছোটগল্প লেখার পাঠ নেওয়া কর্তব্য। তবে তাঁকে আরও বেশিদূর অগ্রসর হতে হবে।

বিতোফ বললেন, এখন এমন সব কৌতূহলোদ্দীপক ছোটগল্প লেখা হচ্ছে, যেগুলিকে একাধিক শিল্প-মাধ্যমের সীমান্তবর্তী বলা চলে। তাঁর মতে, সোভিয়েত ইউনিয়নেও এই ধরনের 'নতুন রীতি'র বেশকিছু ছোটগল্প দেখা যাচ্ছে, যাতে বিশিষ্ট শিল্প-মাধ্যমের "চৌহদ্দি অস্পষ্ট" হয়ে এসেছে এবং "জীবনের সীমাহীন বিস্তার" পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এই ধরনের রচনাগুলিকে ছোটগল্প না বলে দীর্ঘতর কোনো রচনার একাধিক অধ্যায় বলাটাই বোধহয় সঙ্গত। গল্প পড়তে পড়তে পাঠকের যেন মনে হয়, ওইসব অধ্যায়ের সংলগ্ন (অনুপস্থিত !) আরো অনেক অধ্যায় আছে। যেন অনুপস্থিত অধ্যায়গুলি অলক্ষ্যে উপস্থিত। এ-ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক হেমিংওয়ের অর্থের অন্তঃপ্রবাহ নয়। পূর্বোক্ত গল্পে আছে মুক্ত বাতাসের স্পর্শ, আছে দূরবিসার প্রান্তর আর জীবনের অনুভব।

বিতোফ তাই কোনো একটি বিশেষ শিল্প-মাধ্যমের সমস্যা নিয়ে নয়, সমগ্রভাবে গদ্যের সমস্যাবিষয়েই আলোচনায় অগ্রসর হন। তাঁর মতে 'স্বীকারোক্তি' জাতীয় গদ্যের ভবিষ্যৎ সবচেয়ে উজ্জ্বল। খাঁটি রূপকথার মতো এ-ধরনের রচনাকেও কোনো একটি বিশেষ সাহিত্যরীতির মুঠোয় আঁটানো যায় না। 'স্বীকারোক্তি' -ধরনের লেখা আবার 'রম্যরচনা'র চেয়ে "প্রামাণ্য তথ্য সংবলিত" গদ্যের অপেক্ষাকৃত নিকট জাতের।

পরিশেষে আঁদ্রেই বিতোফ মন্তব্য করলেন, ছোটগল্প শেষপর্যন্ত এমন একটা

সাহিত্যরীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে-রীতিতে লেখক ব্যক্তিগত ও অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে সবচেয়ে অপারগ। তাই লেখক যখন লেখার টেবিলে বসবেন তখন কোন সাহিত্যরীতি তিনি আশ্রয় করবেন তা আগে থেকে ভাবা তাঁর একেবারেই উচিত হবে না। তা যদি ভাবেন তাহলে তিনি সরাসরি সেই রীতির খপপরে পড়ে যাবেন। বরং সেই লেখকের ভাবা উচিত তিনি কোন বিষয়ে লিখবেন এবং কেনই বা লিখবেন। তাহলেই—বলা যায় না —হয়তো দেখা যাবে রচনাটি আচমকা একটি ছোটগল্পের রূপ নিয়েছে।

মায়া গানিনা তাঁর 'অতিরিক্ত শিল্পীপনা না-ফলিয়ে' নামের আলোচনা নিবন্ধের শুরুতেই এড্যোয়ার্ড শিমের বিরুদ্ধমত ঘোষণা করলেন। শিম বলেছিলেন, গল্পটি যদি সৎ হয় তাহলেই হলো, কিভাবে তা লেখা হয়েছে তাতে কিছু যায়-আসে না। আর গানিনা বললেন, ছোটগল্পের শিল্পরীতি কোন খাতে বইছে, তার লক্ষ্য কী, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনদিকে তা মোড় নিচ্ছে, এসব বিষয়ে অনুধাবন এবং পারস্পরিক মত-বিনিময় অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। লেখিকা অতঃপর 'প্রামাণ্য তথ্যসংবলিত' এবং 'স্বীকারোক্তিমূলক' রচনাপদ্ধতির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন। বললেন, দীর্ঘায়ত শিল্পরীতির ক্ষেত্রে 'প্রামাণ্য তথ্য'-মূলক এবং সংক্ষিপ্ত রচনার ক্ষেত্রে 'স্বীকারোক্তি'-জাতীয় পদ্ধতিতে যথাক্রমে ওই দুই শিল্পরীতির ভবিষ্যৎ নিহিত। 'প্রামাণ্য তথ্যসংবলিত' রচনা বলতে গানিনা বোঝাতে চান সেই ধরনের লেখাকে যা যতদূর সম্ভব বাস্তব তথ্যের অনুসারী, যা প্রকৃত ঘটনা ও চরিত্রকেই শিল্পরূপভাত করে, যে-রচনায় স্পষ্ট চোখে পড়ার মতো তৈরি করা কোনো প্লট নেই অথচ আছে লেখকের চিন্তার সততার প্রাচুর্য, এবং ইত্যাদি।

মায়া গানিনা তাঁর আলোচনা শেষও করলেন বিতর্ক দিয়ে। এবং এবার বিতোফের সঙ্গে। বিতোফের কোনো কোনো মতে আপত্তি জানিয়ে তিনি বললেন, ছোটগল্পের শিল্পরীতি কয়েক শতাব্দী ধরে টিঁকে আছে এবং এখনও বহুকাল তা থাকবে, শিল্পমাধ্যমটি প্রয়োগের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা কঠিনসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও। তিনি আরও বললেন, লেখার টেবিলে বসে লেখক বা লেখিকা কোন শিল্পরীতি অবলম্বন করে লিখবেন তা তাঁকে আগে থেকে সঠিকভাবে জানতে হবে বৈকি।

বোরিস আনাশেন্‌কোফ 'সামাজিক ভিত্তিভূমির উপর' নামে তাঁর আলোচনা-প্রবন্ধে আরও বিতর্কের ঘূর্ণি তুললেন। বললেন, "ভৌগোলিক

জ্ঞান বেশকিছু পরিমাণে" পূর্বতন যুগের লেখকদের মতিগতি "নিয়ন্ত্রিত করেছে"। আজ কিন্তু এক্ষেত্রে মানুষের হৃদয়দেশের ভূগোল পৃথিবীর ভূগোলকে স্থানচ্যুত করেছে। এদিনের ছোটগল্পে বাহ্য ঘটনাবলী গল্পে বর্ণিত চরিত্রকে আর পুরোপুরি অভিভূত করতে সক্ষম নয়, বরং তা নৈতিক কর্তব্যের সমস্যার দিকে, অর্থাৎ তার নিজের দিকেই, চরিত্রটির মনোযোগ তীক্ষ্ণ করে তোলে। তাই মনে হয় একালের ছোটগল্পে বুঝি প্লট নেই। এ-কারণেই ছোটগল্পের "বিশেষ" রীতি অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রধান ও 'স্বীকারোক্তিমূলক' চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর তাই প্রচলিত অর্থে যাকে প্লট বলা হয় তাই হয়ে পড়ছে গৌণ, প্রধান হয়ে দাঁড়াচ্ছে নৈতিক ও সামাজিক যোগসূত্র, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, গল্পে বর্ণিত চরিত্রের আন্তর গতি। অর্থাৎ, প্লটের মৃত্যু হয়েছে, প্লট দীর্ঘজীবী হোক!

'গল্পরচনার পাঠশালা' নামের আলোচনা-নিবন্ধে **ভাসিলি আকসিওনোফ** গল্পে কারুকৃতির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, নিছক ঘটনা-বর্ণন থেকে পাঠক যা পান সত্যিকার খাঁটি গল্প রচনা তাঁকে তা থেকে আরও বেশি কিছু দেয়, খাঁটি গল্প পাঠকের চোখে বাস্তব তথ্যের আন্তর জীবনের ছবিটি তুলে ধরে। আকসিওনোফ লেখকদের মধ্যে রচনারীতির আঙ্গিক ও কারুকৃতি নিয়ে "কামারশালাগত" বা ব্যবসায়গত আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন।

আলেক্সান্দর রেকেমচুক বিতোফের সঙ্গে বিতর্কের মধ্যে দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি বলেন, ছোটগল্পের শিল্পরীতি একটি শাশ্বত ব্যাপার। বোক্কাচ্চিও ও নাভারের মার্গারেতের ক্লাসিক নভেলা বা উপন্যাসধর্মী রচনাকে একদিন রুশোর 'স্বীকারোক্তিমূলক' ও ভোলত্যারের দার্শনিক গল্প উৎসাদন করেছিল। আবার, তারপর, হঠাৎ একদিন দেখা দিয়েছিলেন মেরিমি, ক্লিইস্ত ইত্যাদি। ছোটগল্পের রচনারীতি যেহেতু চিরকালের মতো টিঁকে যাবে, অতএব আমরা নিশ্চিন্তে তার কারুকৃতি এবং বিশেষ করে প্লটের সমস্যার দিকে নজর দিতে পারি। বক্তা ছোটগল্পে প্লটের অনুপস্থিতিতে বিশ্বাসই করেন না। প্লটের অভাব পাঠকের চোখে ধাঁধা-লাগানো সাহিত্যগত কৌশল ছাড়া কিছু নয়। সত্যিকার খাঁটি ছোটগল্পে সবসময়েই এমন একটি বিশেষ মুহূর্তের সন্ধান পাওয়া যাবে যা কোনো বিশেষ ঘটনা বা ছোট্ট কাহিনীকে ওই গল্পের মূল প্লট থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট করে তোলে। আর ওই বিশেষ মুহূর্ত-

টিতেই গল্পের অন্তঃসার একটি গভীর সামান্যীকৃত বক্তব্যের রূপ নিয়ে ঝলমল করে ওঠে।

আলেক্সান্দর রেকেমচুকের আলোচনার পর আধুনিক সোভিয়েত ছোটগল্পের সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা-বৈঠকটির অবসান ঘটে। আলোচনার গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করলে বোঝা যায়, ছোটগল্প আজ এত বিভিন্ন ও বিচিত্র পথে বিকশিত হয়ে উঠছে যে তার মধ্যে কিছু কিছু দিক কালক্রমে পরীক্ষিত ও জনগ্রাহ্য হলেও, এমন আরও কিছু সমস্যা রয়ে যাচ্ছে যা পরস্পর-বিরোধী ও বিতর্কমূলক মূল্যায়নের জন্ম দিচ্ছে। আভারোফ যখন বলেন যে যুদ্ধপূর্ব-যুগের সোভিয়েত গল্প "সমকালকে" বর্ণনা করে কার্যত মূল সাহিত্যিক দায়ের অংশবিশেষ মাত্র পালন করেছে এবং অন্যপক্ষে যুদ্ধ-পরবর্তী যুগের গল্পলেখকরা প্রধানত "নিজেদের কথা"ই লিখেছেন, তখন তাঁর মত যে কিছুটা ছকবাঁধা ও তর্কসাপেক্ষ তা মানতেই হয়। আবার শিম ও বিতোফ যখন বলেন, আজকের দিনের অধিকাংশ ছোটগল্প লেখকের পক্ষে শিল্পরীতির বিশিষ্ট কারুকৃতি ও আঙ্গিকের প্রশ্নটি অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং তাঁরাই যখন লেখকদের ছোটগল্পের বিশিষ্ট শিল্পরীতি ত্যাগ করে নতুন রীতি তল্লাস করতে বলেন, তখন স্পষ্টতই তাঁরা কিছুটা বাড়াবাড়ি করছেন বলে প্রতীতি জন্মায়। তবে একটা কথা ঠিক যে লেখকদের উপরোক্ত বিতর্কমূলক মতামতগুলি আসলে ছোটগল্প-বিকাশের বিচিত্র পন্থা নিয়ে বিচারবিশ্লেষণ করার গুরুত্ব ও সময়োপযোগিতার কথাই বারেবারে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

অরাজনৈতিক

দিলীপ সেনগুপ্ত

সহদেব যে বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে ঝিলের ধারে মরে পড়ে আছে, রাতভোর অন্ধকারে উপুড় হয়ে থেকে কারখানা আর ঘরে নিশ্চিত কামাইয়ের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করেছে, সে-খবর সবার শেষে যে জানল—কপট ভাগ্যের বলে সে-ই সহদেবের মা মনোরমা।

মুরগী ডাকার সকালে বিছানা ছেড়ে খানিকক্ষণ ঠাকুরের কাছে সহদেবের জন্যে কিছু অসম্ভব প্রার্থনা জানায় মনোরমা। প্রার্থনাগুলো আগের থেকে কয়েক দফা বেড়েছে এখন। আগে সহদেবের বাপ বেঁচে ছিল। মাথার ওপরে বটগাছের মতন। এখন ফাঁকা। ফাঁকা জায়গায় ঠাকুর ডেকে বসানোর চেষ্টায় পীড়াপীড়ি বেড়েছে এখন। ঠাকুর যতটুকু দিয়েছে সহদেব তা এমনিতেই পেত কি না কে জানে, তবে মনোরমা তার নিজের ধ্যানধারণা বলে এইটুকু পর্যন্ত স্থির বিশ্বাসে পৌঁছে গেছে যে, বেশি কিছু দিক আর না দিক, এমন কিছু ঠাকুর আলবৎ করবে না, যা তার একমাত্র সম্পদ সহদেবের পক্ষে আরও বিপদজনক হয়। "আরও বিপদজনক" বলার কারণ এই যে, সহদেবের মাঝখানে চাকরি ছিল না। কারখানা বন্ধ ছিল প্রায় দুমাস। মুরগীর ভোরে ঠাকুরের পায়ে মাথা কুটে কুটে ছেলের কারখানা খুলিয়েছে মনোরমা। এখন তাই নিশ্চিন্ত।

এইরকম একটি প্রত্যয়ী সকালে যখন উঠোনের রোদ ঘর ছুঁই ছুঁই করছে, ছোঁয়নি তবু, বাইরে থেকে ব্যগ্র গলার ডাক এল। "মাসীমা—তাড়াতাড়ি আসুন—"

ডাকের একটা মাহাত্ম্য আছে। শুনেই ছ্যাঁৎ করে উঠল মনোরমার বুকের ভেতর। নিজে ঘুঁটে দেয় রোজ। সকালবেলা ঘুঁটেগুলো বহির্দেয়াল থেকে ছাড়িয়ে ঝুড়িতে সাজিয়ে রাখে। বেলা বাড়লে কিছু বেচে দেয়। প্রয়োজনের গর্ত তবু খানিকটা বোজে আরও। কিছু ঘুঁটে পায়ের কাছে পড়ে রইল। দৌড়ে বাইরে এল মনোরমা। "কি রে—কি—! কি হয়েছে?"

খবর দিতে এসে মনোরমার মুখের চেহারায় থমকে গেল পাড়ার অল্প বয়স্ক ছেলেটি। যে-অস্থিরতা নিয়ে বাইরে থেকে মনোরমাকে ডেকেছিল, এখন তা থিতিয়ে গেল। কি বলবে! এ-খবরের বাহক সে না হলেই পারত ইত্যাদি দু-একটা ভাবনা শেষেও মুখ ফোটাতে পারল না।

"কাকে খুঁজচিস ? সহদেবকে ? ওর তো নাইট ডিউটি, আসে নি এখনও।" অতি বড় বুদ্ধিমতীও বিপদের সময় বোকামী করতে পারে। ইচ্ছে করেই করে। যেমন মনোরমা করল। যা অনুমান, তা কিছুতেই নয়, এমন একটা ভাব প্রকাশ করল গলার স্বরে। কথার তোড়ে অমঙ্গলকে হটিয়ে দেবার ফন্দি।

অল্পক্ষণ রাতের বেড়ালের মতো তাকিয়ে থেকে এবার হাউ হাউ করে কেঁদে দিল ছেলেটি। "মাসী, সহদেবদা আর—"

বারান্দা আর মাটির সিঁড়ি এক লাফে টপকে ছেলেটিকে প্রায় জড়িয়ে ধরল মনোরমা। "কি বললি—ভালো করে বল!"

ভালো করে বলার মতো খবর আনেনি ছেলেটি।

কয়েক মুহূর্ত আগের শান্ত মাসীমা কত অল্প সময়ের মধ্যে কি বেনিয়ম বিভ্রান্ত হতে পারে তা লক্ষ্য করে হতচকিত সংবাদদাতা আর কথা খুঁজে পেল না। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন জমে গেছে এদিক-ওদিক। মৃতের মাতৃদর্শনই লক্ষ্য। একমাত্র ছেলে মরে গেলে ছেলের মাকে কেমন দেখতে লাগে ? তায় জোয়ান ছেলে। মৃত্যুও অস্বাভাবিক।

মনোরমা সংবাদদাতাকে ছেড়ে দিয়ে সমাগত দর্শকদের একবার দেখে নিল। তারপর ক্ষিপ্রগতিতে পশ্চাদপসরণ করল হঠাৎ।

যারা সহদেবের শবদেহ দেখে এসে এখানে ভিড় করেছে, তারা আরও একটা জ্যান্ত শবদেহ দেখার মতো আঁতকে উঠল মনোরমাকে দেখে।

ঠাকুরের পায়ে মাথা ঠোকার মা, দেয়ালে গোল গোল করে ঘুঁটে লেপটে দেবার মা, সহদেবের খাকির প্যাণ্টে বাঙলা সাবান ঘষতে ঘষতে কুয়োপাড়ে গুন গুন করার মা, দুপুরে অন্য মায়ের সঙ্গে নিজের ফারাক-মিলকে হাসি-আলোচনায় যাচাই করে দেখার মা— কি আশ্চর্য !

চোখ দুটো সহদেবের মতো বেরিয়ে আসছে। দুটো ঠোঁটই বেঁকে আছে। শুকনো গালে গুটি গুটি উঠে না-ফর্সা না-কালো মুখে বীভৎস তাণ্ডব শুরুর প্রস্তুতি ঘোষণা করছে।

পুত্রের মৃত্যুতে মায়ের স্বাভাবিক শোক মোটামুটি সকলেই দেখেছে, কিন্তু এই রকম ভাবা যায় না। সকলেই পরবর্তী দৃশ্যের জন্যে রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। কেউই জানে না এরপর কি হবে। তবে সম্ভাব্য ঘটনা উথালি-পাথালি কান্না। তা-ও হল না।

দরজার ওপরে আমপাতার শেকল ঝুলছে। সরস্বতী পুজো করেছিল

সহদেব। ধাবিত মায়ের হাওয়া লেগে আমপাতা নড়ল। শুকনো বলে দুলল না। নরম ভাব নেই বলে দুলল না।

মিনিক দেড়েক পরে বেরিয়ে এল মনোরমা। গায়ে ব্লাউজ ছিল না এতক্ষণ। এখন তা দেখা গেল। যে-ছেলেটি খবর দিতে এসেছে, তার সামনে এসে দাঁড়াল। ছেলেটি ভয়ে সেরকমই দাঁড়িয়ে আছে।

"বল, কি করে মরেচে সহদেব?"

এ যেন পুলিশ জেরা করছে আসামীকে। ছেলেটি ভাবল, মাসী তাহলে সব জানে? অনুমানগুলো সব ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ায় ছেলেটি শোক, তাপ ও সহদেবকে ভুলে খানিক দমে গেল। তবু, মাসীমাকে বেকায়দায় না ফেলে তার সোয়াস্তি নেই। ছেলে খুন হলে ছেলের মা অহঙ্কার দেখায় নাকি এরকম?

"আমি জানি না।" ছেলেটি যে ভঙ্গীতে জবাব দিতে চেয়েছিল, তা হল না অবশ্য। কিন্তু আশাহতের অসন্তোষ ফুটে উঠল গলার স্বরে।

"সত্যি কথা বল।" আবার জেরা।

অচেনা মূর্তি ঢের ঢের আছে পৃথিবীতে। কিন্তু এইরকম কল্পনাতীত অচেনা মূর্তির সামনে ছেলেটি ভয়ানক অসহায় বোধ করতে লাগল। রক্ষে পাবার পন্থা পায়ের ওপর আছড়ে পড়া।

"পায়ে পড়ি মাসীমা—ওরকম করবেন না।"

মনোরমা যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে সকলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—"খুন হয়েছে—তাই না?"

সমবেত চক্ষুকুল বিস্ফারিত হল।

বুকে সাহস নিয়ে একজন অস্ফুটে বলল—"তুমি কি করে এসব জানলে?"

মনোরমা নির্বিকার।

"গ্যাছে—মাথাটা গ্যাছে।" আর একজনের নিচু মন্তব্য শোনা গেল।

মনোরমা স্তব্ধ।

কাল থেকেই যেন এইরকম একটা খবরের জন্যে ওঁৎ পেতে ছিল মনোরমা। ঠিক করে ছিল, খবরটা এলে খুব একচোট কেঁদে গঙ্গাস্নান করে আসবে। কাঁদা হল না।

শরীর জ্বলে যাচ্ছে। পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে বুকের ভেতরটা।

"আমাকে ওরা মেরে ফেলবে মা।"

"না রে—মানুষ মারা কি অত সহজ?"

"না মা, দেখো, আমি আর ফিরব না ডিউটি থেকে।"

"সত্যি ফিরলি না রে—সত্যি ফিরল না সহদেব—!" মনোরমা সকলের প্রত্যাশা মাফিক এতক্ষণে চীৎকার করে কেঁদে উঠল।

অন্য আর এক মহিলা তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল তাকে।

সহদেবের মা চৈতন্য হারাল।

গরীবের ছেলে হলেই যে রোগা হয় না, সহদেব তার প্রমাণ। দৈর্ঘ্যে সাড়ে পাচ ফুটের বেশি না হলেও প্রস্থে নিয়মিত ব্যায়াম চর্চার লক্ষণ। গায়ে জোর থাকলে সর্বত্রই বন্ধু-বান্ধবরা খাতির যেমন করে, ভরসাও তেমনি। আস্তে আস্তে দেখা গেল, পাড়া-সম্পর্কিত যে কোনো হই-হাঙ্গামায় সহদেব এক অনিবার্য সম্পদ হয়ে উঠল। প্রতিপক্ষ নাক কুঁচকে বলল, ফুটো মাসতান।

কিন্তু সহদেবকে কেউ ঝাণ্ডা আর ইনকেলাবি কথাবার্তায় কখনও নাক গলাতে দেখেনি। কারখানার ইউনিয়নে সে মাসকাবারি চাঁদা মিটিয়ে দিয়েই খালাস। রাজনীতির সাতে পাঁচে নেই। সুবিধাবাদী, পাতি-বুর্জোয়া, ও. পি. আই ইত্যাদি নানান শক্ত-সহজ সম্বোধনও নির্বিকারভাবে হজম করত সহদেব।

কারখানা বন্ধ থাকাকালীন গেটের মিটিং বা রাস্তার মিছিলে একদিনও অংশ নেয়নি। খুলেছে যখন, অনায়াসে ঢুকে পড়েছে। ফলে অনেকে ধরে নিল সহদেব দালাল। তারা বলল—"সহদেব সম্বন্ধে হুঁসিয়ার!"

সব কথাই মায়ের কাছে বলত সহদেব।

"কি জানি বাবা, ওসব তোরা বুঝিস। তবে যে-রকম মারধোর হচ্ছে চারদিকে, একটু সাবধান থাকিস বাবা।" রোজই গোটাকয়েক খুনখারাপি, বোমা-পটকার বিস্ফোরণ শুনতে পায় মনোরমা। দেশজুড়ে চলছে সমানে। যার বড় দল, তার বেলায় বলার কেউ নেই বলে নাকি থামছেও না।

"বিপিনকে আজ মারব মা" ঘরে ঢুকে জামা খুলতে খুলতে বলল সহদেব।

"কেন—বিপিনের সঙ্গে কি হল তোর?"

মনোরমা জিজ্ঞেস করতেই চটে গেল সহদেব, "আবার জিজ্ঞেস করচ কি হয়েচে? শুয়োরের বাচ্চাটা কাল অরুণকে মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে।"

অরুণকে চেনে মনোরমা। অন্য একটা পার্টি করে। বড় দলে ঘেঁষে না। দাঙ্গা মারামারিতে নেই। অরুণকে মিছিলে মাঝে মধ্যে দেখা যায়।

আবার বিপিনকেও মনোরমা আলবৎ চেনে। গেল বছর পুলিশ এসে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, রেলের মালপত্তর চুরি করে ঘরে রেখেছিল বলে।

ছাড়া পেয়ে ঝাণ্ডার নিচে জায়গা পেয়ে গেছে। বড় দলের ঝাণ্ডার।

"কি দরকার তোর ওসবের মধ্যে যাবার?" মনোরমা বিপিন প্রসঙ্গে একটু ভয় পেল যেন। বিশ্বাস নেই, দলের জোরে যা খুশি তাই করতে পারে বিপিন। চতুর্দিকে খুন-খারাপি।

বিকেলে সত্যি সত্যি বিপিনকে মারল সহদেব। অরুণের গায়ে অযথা হাত তোলার শোধ তুলল।

বাড়ি এসে বলল, "মা, ওরা কেউ ডাকতে এলে বলো আমি বাড়ি নেই। একে তো ওদের দলে নাম লেখাইনি বলে আমার ওপর আগে থেকেই রাগ, তার ওপর বিপিনকে দিয়েছি একচোট। বলা যায় না, শালারা এখন খুন ছাড়া কথা বলে না।"

খুন যে কি কঠিন বস্তু, ছেলেমানুষ সহদেব তা বুঝলে এমন করে মায়ের সামনে তা উচ্চারণ করতে পারত না।

কিন্তু বস্তুতই কঠিন কি না, সে-সম্বন্ধে একটু পরেই সন্দেহ জাগল মনোরমা। দিকে দিকে সহদেবের মতো ছেলে তো মাঝে মাঝেই মরছে।

ঠাকুরকে বার কয়েক ডাকল মনোরমা।

ছেলে গেল ডিউটি সারতে কারখানায়।

জীবদ্দশায় এর বেশি কিছু বলার নেই সহদেব সম্পর্কে। এখন মৃত।

অচৈতন্য মনোরমার মাথায় জল ছিটিয়ে, হাওয়া খাইয়ে, চৈতন্য ফেরানো হল সত্যি, কিন্তু এমন চৈতন্য বর্ধিত ভিড়ের কোনো মানুষ আগে দেখেনি।

"আমাকে বিপিনের কাছে নিয়ে চল।" এ-যেন গর্জন। "চল—নিয়ে চল।" সংবাদদাতা ছেলেটি সুদ্ধু অন্য সকলে হা করে তাকিয়ে রইল। বয়স্কদের একজন প্রবোধ দেবার চেষ্টা করল, "পাগলামী করো না—কপালে অপঘাত ছিল সহদেবের—কি করা যাবে?"

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল মনোরমা। ভিড় ফুঁড়ে ছুট মারল সোজা।

সহদেব উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পিঠের মাঝখানে একটা গর্ত। থুতনির মাংস লেপটে আছে মাটিতে। পা দুখানা টান টান। যেন পায়ের দিকটা মরেনি। মুখের দিকটাই গেছে।

"হ্যাঁরে সহদেব, বিপিনটাকে শেষ করে যেতে পারলি না?" সহদেব নড়ল না।

"মরে গেচিস, কি করা যাবে আর? তবে, এইভাবে মরলি? বিপিন যে এবার অরুণকেও মারবে তার কি হবে? কে বাঁচাবে অরুণকে?"

মনোরমা গাল পেতে দিয়েছে সহদেবের পিঠের ওপর। কাঁদছে না, কিন্তু ছেলে-বুড়ো যারা জড় হয়েছে, তাদের চোখের জল বাগ মানল না।

'বিপিন' নামটার বার বার উচ্চারণে তারা ভয়ও পেল।

মনোরমা বলছে "যদি তুই গুণ্ডার দলটাকে ধুয়ে মুছে যেতে পারতি, একটুও কাঁদতাম না আমি।"

মনোরমা চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করল। কে যেন বলল—"পুলিশের গাড়ি আসছে।" সকলে একটু একটু সরে দাঁড়াল। রাস্তার দিকে ঝুঁকল।

মনোরামা এক ইঞ্চিও নড়ল না। যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল সহদেবের পিঠের ওপর। ক্ষতস্থানে।

"জয়যাত্রায় যাও হে"

দেবেশ রায়

আকুলুদ্দিন মাঠ পার হচ্ছিল।

সন্ধ্যা ঘণ্টা দুই উতরেছে। ঠিক সামনে মাঠটার শেষে জলজ্যান্ত চাঁদটা যেন আকুলুদ্দিনের জন্যই ঝুলে আছে। যেন আকুলুদ্দিন ঐ চাঁদটায় যাবে বলেই কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে, মোজা জুতো পরে, এই ভর সন্ধ্যেবেলায় হন হন করে এগচ্ছে। এই মাঠটার মাঝে মাঝে বাড়িঘর আছে। কিন্তু চাঁদ, এমন ভর-ভরন্ত চাঁদ, যখন কপাল বরাবর জলজলায়, তখন মাটির ওপরের গাছপালা বাড়িঘরগুলো আলোর সঙ্গে মিশে যায়। সারাটা দিন সূর্যের দিকে একবার না-তাকিয়ে বা সূর্যের কথা এক পলক না-ভেবে কাটিয়ে দেয়া যায়। অথচ, এমন আস্ত একখানা হলে তো কথাই নেই, আধখানা বা সিকিখানা চাঁদও যদি আকাশে লেপটে থাকে—তাহলেও জেগে থাকার দু-চার ঘণ্টা চাঁদের দিকে না-তাকিয়ে উপায়ই নেই। এমন কি মাঝরাতে গরুকে পোয়াল দিতে উঠলেও একবার তাকাতে হয়।

পা দুটোকে চোখেচোখে রাখতে না-রাখতেই কখন একসময় আবার চোখে চাঁদটা আটকে গিয়ে সব ঝাপসা করে দেয়। দুই-চারবার হোঁচট খেয়ে সারাদিনের ভাত না-পড়া পেটে আর সারাটা দুপুরের গরম সাঁই সাঁই হাওয়ায় জ্বালা ধরা শরীরে নিজের মনেই খিঁচিয়ে ওঠে আকুলুদ্দিন। এর চাইতে সোজা পশ্চিম বরাবর গিয়ে বড় রাস্তায় উঠলেই হতো, চাঁদটা এমন হাঁ করে কপাল বরাবর থাকত না। পশ্চিম বরাবর যেতে হলে নারান মল্লিকের পাড়া দিয়ে উঠতে হতো। ওরাও নিশ্চয়ই আজ মিটিংটিটিং করছে। তাকে যদি একলা পায়, তাহলে মেরে ফেলতেও পারে।

সেজন্যই চাঁদ বরাবর চলছে—ওটা আরেকবার মনে পড়ে যাওয়াতে সে বিরক্ত হলো চাঁদেরই ওপরে। পারলে আকুলুদ্দিন মাঠ থেকে ঢেলা তুলে চাঁদের গায়ে ছুঁড়ত।

আসলে রেডিওটাই সমস্ত গোলমাল করে দিয়েছে। যদি শুনত

অজয় মুখার্জি পদত্যাগ করেনি, যুক্তফ্রণ্ট টিকে গেল, তাহলে এই সারাদিনের খালি পেট আর রোদ-পোড়া মুখেই প্রায় উড়ে উড়ে ফিরত। হাঁক-ডাক দিয়ে দু-চার পাড়ার লোকজনকে জানিয়ে জাগিয়ে, হয়তো আরো দু-চার জায়গায় বসে দু-চার কথার আলাপন সেরে, বাড়ি ফিরে ঘটিভরা জল খেয়েই রাত পুইয়ে দিত। কিন্তু অজয় মুখার্জির নিজের গলায় পদত্যাগের কথা শুনে ফেলার পর এখন মাঠ ঘাট রাস্তা চাঁদ ক্ষিধে সারাদিনের রোদ—এ-সব কিছুই যেন বদলে যায়। নারান মল্লিকদের পার্টি আগামী কাল জোর করে আর একা হরতাল করবে, সেই হরতালে জুলুম হলে বাধা দিতে হবে, এখন সন্ধ্যাবেলায় একা একা পশ্চিম বরাবর বড় রাস্তায় উঠতে গেলে নারান মল্লিকদের পাড়া দিয়ে যেতে হবে, তাকে একলা পেলে নারান মল্লিকরা মেরে ফেলতে পারে, কাঁধের ব্যাগের ভেতর খাদ্যত্রাণ কমিটির একগাদা সি-পি লোনের দরখাস্ত খসখস করছে, যেন মরা মানুষটার জামাকাপড় কাগজপত্র ব্যাগে ভরে নিয়ে যাচ্ছে, জ্যোতিবাবু সরকার তৈরি করতে চান, তার মানে কি, আবার আইন-অমান্য, নাকি রাষ্ট্রপতির শাসন—এত অনিশ্চিত অবস্থায় আকুলুদ্দিনের সব রাগ গিয়ে পড়ে রেডিওর ওপর। রেডিওর খবর শোনার জন্যই সে মালিপাড়ার সি-পি লোনের এনকোয়ারির কাজকর্ম সেরে অমাকান্তের বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছিল, সারাদিনের ঘোরা-ফেরার মধ্যেও সে কোনো সময়ই রেডিওর খবর শোনার কথা ভোলেনি, দুপুর বেলাতেও। কেলাবের হাটের ওপরে নারান মল্লিকের দোকান থেকেই খবর শুনে নিয়েছে, এ-সব দিব্বি ভুলে গিয়ে কপাল বরাবর চাঁদের দিকে হনহনিয়ে যেতে যেতে আকুলুদ্দিন নিজের মনেই খিস্তি করে ওঠে—শালা ফ্রি-রেশনের লাইন দেছে, সি-পির তানে পিটিশন কইচছে আর বালিশের বদলত্ মাথাত ট্যানজিস্টার দেছে ; শালা দাও সব ট্যানজিস্টার পাজার জলত, অয়-অয় তিস্তার জলত ফেলি।

রেডিও না-থাকলে খবরটা তাকে শুনতে হতো না, কাল সকালের সার্ভিস এলে শুনলেই হতো, আর হরতাল ও হরতাল-ঠেকানো সবই একদিন পেছিয়ে যেত—এইসব ভাবতে ভাবতে চাঁদভরা এতবড় মাঠ একা একা পেরতে পেরতে আকুলুদ্দিন কিন্তু এ-হিসেবটা ভোলে না যে এ-বছর পাজা আর পাজা নেই, তিস্তা নদীই পাজা দিয়ে ঢুকে পড়েছে। মাইলের পর মাইল জলে ডুবে যাওয়ার পর নারান মল্লিক আর সে একসঙ্গে হাজার

খানেক লোকের মিছিল নিয়ে সদরে মন্ত্রীর সামনে বিশাল বিশাল ইঞ্জিনিয়ারদের মুখে মুখে তর্ক করেছে—এবারের বন্যায় পাঙ্গা দিয়ে তিস্তার বাড়তি জলটুকুই শুধু ঢুকেছে নাকি পাঙ্গা আর পাঙ্গা নেই তিস্তা হয়ে গেছে। স্লোগানটাও বাঁধা হয়েছিল ভালো—পাঙ্গা আর পাঙ্গা নাই, তিস্তা নদীর বাঁধ চাই। একা আছে বলে তো স্লোগানটা বদলে দিতে পারে না।

সামনে একটা উঁচু আল। এখান থেকে দেখায় চাঁদটা যেন মাটির ওপরে শুয়ে আছে—নিচু জমি থেকে আকুলুদ্দিনের মনে হলো। উঁচু জমিটার ছায়া নিচু জমির ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ছায়া থেকে লাফ দিয়ে আকুলুদ্দিন উঁচু জমিটার ওপর উঠতেই চাঁদটাও যেন লাফ দিয়ে আকাশের ওপরে উঠে গেল আর চাঁদে ভাসা সেই উঁচু জমিটার ওপর ভাসতে ভাসতে আকুলুদ্দিন অ্যাপলো এগারোর যাত্রী হয়ে যায়। আকুলুদ্দিন এ্যাপলো এগারো জানে। আমেরিকা থেকে বাঙলা বিবরণ সে তার ট্রানজিস্টরে শুনেছে।

গা-টা একটু শিরশির করে উঠতেই আরাম বোধ হলো। শরীরে সারা-দিনের ঘাম শুকিয়ে চড়চড় করছে, অথচ সন্ধ্যা হলো কি হলো না অমনি ঠাণ্ডা পড়ে যাচ্ছে। রাতে কম্বল গায়ে দিতে হয়। বড় বানে অন্তত একটা উপকার করেছে—কম্বলটা পাওয়া গেছে।

বানা। আর বানা। দুই সন থেকে তিস্তা যেন উকুনের মতো পেছনে লেগেছে। শালা অফিসার হলে কি মাথাতে একটু বুদ্ধি থাকতে নেই। তর্ক লাগল, তিস্তা নদীর শুধু বাড়তি জলটুকু পাঙ্গা দিয়ে ঢুকেছে—ওটা তিস্তার নতুন সোতা না। সোতা হোক চাই না-হোক—দু-ই কাদোবাড়ির পুব থেকে দু-ই বারো নম্বরের দক্ষিণ পর্যন্ত তামান এলাকাটা যে ভাসি গেইল, এটা কি সাচা না মিছা। তারা দুই পার্টি মিলে মিছিল-মিটিং-ঘেরাও করেছিল বলে শেষ পর্যন্ত বাঁধের কাজটা শুরু হলো। নারান মল্লিকটা রাগারাগি করতে পারে ভালো, ঢাকাইয়া তো, জিভের জোরেই ডাঙায় নৌকা চালায়।

নরম মাটিতে হঠাৎ পা দেবে যেতেই থমকে গেল। চারপাশে তাকাল। মাঠটা তো ঠিক বুঝতে পারছে না। কোথায় এলো। চাঁদের আলোতে রাস্তা চেনা মুশকিল—ঘাসের গায়ে দাগ দেখা যায় না, সবই সমান মনে হয়। একবার পেছন ফিরে দেখল সে কোনদিক থেকে এলো। উত্তর-পুব বরাবর

জোড়বাদীর ওখানে বড় রাস্তায় উঠবে। মাটির ওপর উবু হয়ে দেখল— চাষ দিয়েছে, না-কি বানায় নরম। না। একেবারে ধবধব করছে বালি-পলি। শালা কোনদিকে এলো।

আকুলুদ্দিন সোজা উঠে দাঁড়িয়ে ডান-বাঁ দুইদিকে তাকিয়ে একটা নিশানা ঠিক করার চেষ্টা করতে লাগল। বোঝাও যায় না দূরের ওগুলো গাছের মাথা, নাকি ভাসা মেঘ। শালা চাঁদের পাছায় লাথি। অন্ধকারে রাস্তা চলা অনেক সুবিধা। তা না, একেবারে চোখ ঝাপসা করে দেয়।

একটা আন্দাজ মতো ধরে আকুলুদ্দিন পা বাড়াল। কিন্তু মাটিটা নরম হওয়ায় খুব শক্ত পায়ে এগোতে পারে না। বেশ খানিকটা এগোনর পর একটু অস্বস্তি বোধ করে। এতো নরম মাটিতে এতো পা আন্দাজে যাওয়ার আর সাহস হয় না। শক্ত মাটিতে ফিরে যেতে বাঁদিকে ফিরল।

গত সনের আগের সনে গেল বড় বানা। এ-বছর বর্ষার শুরু থেকেই তো তিস্তা পাজা দিয়ে ঢুকে একেবারে পাগলের মতো ঘুরতে লাগল। শালা কোথা দিয়ে ঢুকে যে কোথায় পড়ল তার ঠিকঠিকানা নেই। বর্ষার শুরুতে পাজা দিয়ে জল ঢুকে দুই পাড় ভাসাল ; সুদক্ষ পল্লী, ভবতারিণী, মালিপাড়া, গৌড়চণ্ডী। আর বর্ষার শেষে বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর জল আবার নতুন বাঁক নিল বোধনির দিকে। পুরনো খাতে পলি পড়ে জল আর এগুতে পারেনি। পনর দিন পর পর যদি বানা হয় আর ভাঙা হয়—তাহলে এই চাঁদে তো দূরের কথা, ঠা ঠা রোদেও পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এখন পথ গোলমাল করে পাকিস্তানে গিয়ে না পড়ে। এখন পড়লেই বা কি। পচাগড়ে গিয়ে শ্বশুর বাড়িতে কদিন খেয়ে আসবে।

শক্ত মাটিতে পা ফেলে, ডান পাশে নরম জমিটা রেখে, এবার আকুলুদ্দিন হনহন করে সোজা উত্তরে হাঁটতে লাগল। চাঁদ থাকল তার ডাইনে। ছায়া থাকল তার বাঁয়ে। আর বালি আর পলির নরম ধবধবে কুয়াশার মতো প্রান্তরে চাঁদটার একটা ঘষা প্রতিফলনও আকুলুদ্দিনের সঙ্গে তরতরিয়ে বইতে লাগল।

একটা বিড়ি বার করে ধরাবে, দেশলাইয়ের কাঠির আগুনটাকে বাঁচাতে তাকে ঘুরে দাঁড়াতে হলো। তাতে যেন বাতাসের ঝাপটাটা কতো জোরে আসছে সে বুঝতে পারল। আর সেই তীব্র নিশুতি বাতাসে বিড়ি ধরাবার মতো একটা হামেশা ব্যাপার মুহূর্তের মধ্যে আকুলুদ্দিনকে মানুষের ছোঁয়া

বা সাতার জন্ম অস্থির করে তুলল। কলকাতার মাঠটাতে মিটিং শুনতে গিয়েছিল মাস চার আগে। সকালবেলায় যখন গিয়ে পেঁছিল, সারাটা মাঠ খাঁ খাঁ করছে। অত বড় মাঠের ভেতর নিজেদের দলের সঙ্গে থাকতেও খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। শেষে বিকেলের দিকে সারা মাঠটা মানুষে আর ঝাণ্ডায় ভরে যাওয়া শুরু হলে আকুলুদ্দিনের মনটি ভরভরাট হয়ে যায়। অয়-অয়, কলকাতার অত বড় আন্তায় গাড়িঘোড়া থামি গেইল্, এ-তো জোরে জোরে শ্লোগান দিছু এই মাস চার আগত। আর এ্যালায় নিজের বাড়ির থাটা চিনিবার না পার।

কায়-ও আছ হে-এ। কোটত আইচছু হে-এ। হে-এ মনোহর।—কিন্তু জায়গাটার হদিশ না করে আকুলুদ্দিন এসব বলে চেঁচায় কি করে। কাছা-কাছি তো কোনো ঘর দেখতে পাচ্ছে না। আর, ঘর তো এদিকে থাকার খুব কথাও নয়। সব তো ক্যাম্পে কি রাস্তায়। কিন্তু জায়গাটা কোথায়। শেষে না-চিনে হাঁক দিক, আর যদি তার পার্টির পাড়া না-হয়ে ওদের পার্টির পাড়া হয়, নারান মল্লিকের পার্টির পাড়া হয়, ওদের লোকজন লাঠি-শড়কি-বল্লম নিয়ে ছুটে এসে আকুলুদ্দিনকে এখানে খুঁচিয়ে মেরে ফেলে পাশের এই নরম ধবধবে পলিবালির মধ্যে পুঁতে দিক—কায়ও জানিবার পারিবে না।

আকুলুদ্দিন ভয়ে ভয়ে পাশের নরম প্রান্তরটার দিকে তাকাল, যেন তার কবর।

কিন্তু যদি তার পার্টির পাড়া হয়, যদি আকুলুদ্দিনদের লোকেরা পাশাপাশি কোথাও না-থাকে, তাহলেও আকুলুদ্দিনের "কায়-ও আছ হে" "হে-এ মনোহর" হাঁক শুনে লাঠি শড়কি বল্লম নিয়ে বেরিয়ে আসবে। যদি নারান মল্লিকদের পার্টির লোকদের পায়, একহাত দেখে নেবে।

অবস্থাটা এমনই দাঁড়িয়েছে যে আকুলুদ্দিন যদি একবার চরে হারিয়ে যাওয়া বলদের মতো টানা হাঁক দেয়—"কায় আছ হে"—তাহলে কেউ না-কেউ আকাশ ফুঁড়ে মাটি ফুঁড়ে বেরবেই বেরবে, যেহেতু তার গ্রামে-হাটে-বাজারে জলপাইগুড়ি বা কলকাতার রাস্তায়-মাঠে তার পার্টি বা ফ্রন্টের মিছিলে-মিটিঙে, আকুলুদ্দিনের গলার "কা-য় আছ হে" ডাক তার পার্টি ও নারান মল্লিকের পার্টি ও অন্যসব পার্টির লোকদের কানে লেগে আছেই আছে।

হামরালার গলাটা গত চার সনত এত চিনা হয়্যা গেইল্, এ্যালায় হে ধরিত্রী হে চন্দ্রদেবতা, তোমরালার কাছত কাথা কহিবার না পারি। হামরালার মনত মনত কাথা কহিলেও কায়ও শুনিবার পারিবে। এতো চিনা-জানা কণ্ঠ হামার, হামরালা পথ হারাইয়া পথ চাহিবার পারি না হে।

আকুলুদ্দিন একটা আন্দাজি হিসেবে এগচ্ছে। ডান পাশের নরম মাটিটার প্রান্তর না পেরিয়ে সে বড় রাস্তার দিকে এগতে পারবে না। কিন্তু জায়গাটা কোথায় না-বুঝে সে অমন অনিশ্চিত মাটিটায় পা রাখে কেমন করে। যদি উত্তর বরাবর হাঁটে তাহলে একটা কোথাও নিশ্চয়ই নরম মাটিটা শেষ হবে। তখন দেখা যাবে। নরম মাটিটা শক্ত হয়ে গেল কিনা বোঝার জন্য সে নজর রেখেছিল তার সঙ্গে তরতরিয়ে বয়ে যাওয়া নরম বালিপলিতে চাঁদের অস্পষ্ট প্রতিফলনের ওপর। তাই এক খোপ উঁচু মা েতে বা একটুখানি কাঁটা ঝোপেও চাঁদের প্রতিফলনটা লুপ্ত হয়ে গেলে আকুলুদ্দিন চমকে চমকে উঠছিল।

এতোক্ষণ তাও আকাশের ওপর একটা টলটলে চাঁদ আকুলুদ্দিনকে সঙ্গ দিচ্ছিল, আর এখন পাশের থকথকে ধবধবে মাটিতে তার বাপের চোখের মতো চাঁদটার ওপর নজর রাখতে রাখতে আকাশটার দিকে চোখ ফেলতেই পারছে না।

আকুলুদ্দিন ফিসফিসিয়ে বলল "কা-য় আছ হে।" গলাটা যেন একটু অচেনা ঠেকল। ফিসফিসানি কেউ চিনতে পারবে না—বউও না। ঐ সব অ্যালায় গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর ছাড়ো কেনে, যা ভাবিবেন কহি ফেলান, যা কহিবেন এই আকাশের তলায় চেচাঁইয়া কহেন, দশ ভাই শুনুক, অ্যালায় দশ ভাইয়ের আজত্ব, বড় দেউনিয়ার আজত্ব শেষ।

নিজের কাছেই অপরিচিত গলায় ফিসফিসিয়ে আকুলুদ্দিন পথ শুধাবে কি ঐ ঘষামাটির চাঁদের কাছে।

ঘষামাটির চাঁদ হঠাৎ বাঁ দিকে একটু বেঁকে আকুলুদ্দিনের প্রায় পায়ের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে গেলে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার মানে এই নরম থকথকে বালিপলি বাঁ দিকে বেঁকে গেছে। এখন এই জমিটা বাঁচিয়ে যাবার জন্য কি আকুলুদ্দিন আবার পশ্চিমে বেঁকবে। তাহলে বোধহয় গিয়ে মালকানির রাস্তায় উঠবে। তার মানে যে-পশ্চিমের পাড়া এড়িয়ে যেতে সে পুবে মাঠ বরাবর রওনা দিয়েছে, সেই পশ্চিমের

পাড়ায় গিয়েই তাকে উঠতে হবে। নারান মল্লিকের পাড়া, লাঠি-শড়কি-বল্লম।

এটাও আন্দাজ, অত নিশ্চিত ভাবে যদি কোন মাটি কোন দিকে গড়াচ্ছে বুঝতেই পারত—তাহলে পথও বের করতে পারত আকুলুদ্দিন। পথ বের করতে পারুক চাই না-পারুক, তাই বলে পশ্চিম দিক থেকে এসে আবার পশ্চিম দিকে ফিরে যাওয়ার মতো কালাহোলায় ধরেনি আকুলুদ্দিনকে।

আর পথ তো চেনাই আছে। সিধা যদি এই থকথকে মাঠটা পার হয়ে যায়, তাহলে ওদিকে একটা শক্ত মাঠ পাবেই। কিন্তু কেউ সাড়া দিক না-দিক খুব উঁচু গলায় "কা-য় আ-ছ হে" বলে একটা হাঁক না-দিয়ে এমন অনিশ্চিত মাটিতে পা দেয় কি করে।

পায়ের কাছে চাঁদ নিয়ে আকুলুদ্দিন বিচার করল—নদী এইঠে বাঁক খাসে। পশ্চিমত দক্ষিণে বাঁক খাসে। বাঁকত নদী চাওড়া হয়। এ্যালায় এই ঠে কতো বড় নদী কায় জানে। এ্যালায় মুই কি কর। পাছুত সরু হবা পারে। আগত সরু হবা পারে। পাছুত যাম না আগত যাম।

বানার জল যখন এখানে বাঁক খেয়েছে, তখন জায়গাটা নিশ্চিত চওড়া। পেছনের জায়গাটা তাহলে সরু ছিল, সহজে পেরনো যেত, সামনেও সরু থাকতে পারে। এখন আকুলুদ্দিনকে এই সবচেয়ে চওড়া জায়গাটি পার হতে হবে ?

হবা নাগে তো হও কেনে।

আকুলুদ্দিন বাঁয়ে না-বেঁকে সিধে চলা শুরু করল। আর অমনি মাটির ঘষা চাঁদটাও মাটির ওপর দিয়ে তার পায়ে পায়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এগতে লাগল—যেন আকুলুদ্দিন চাঁদটাকে বলের মতো নাচিয়ে নাচিয়ে নিচ্ছে। পা-টা বসে বসে যাচ্ছে, কিন্তু তেমন নয় যে হাঁটতে অসুবিধে। বালিতে এর চাইতে বেশি গেড়ে যায়। মাটিটা শক্ত হছে, আর মাস-খানেক নাগিবা না হয়, দিন পনরত শক্ত হবে, কাথা ছিল বুলডোজার আসিয়া বালি সাফ করি দিবে, কাথা ছিল ট্রাক্টার বা পাওয়ার টিলার আসিয়া ছুইটা চাষ দিয়া যাবে, এই মাটিত বুলডোজার নাগিবা না হয়, বালি কম। বালির ভাগ বেশি থাকা পারলে এই ঠে চাঁদের ছায়া না পড়ে। মাটিটা রসবতী হয়্যা আছে। পাটা বুন হে। অ্যালায় কায় বা বালি

সরাবে, কায় বা চাষ দিবে? সুতরাং আকুলুদ্দিন আকাশে চোখ তোলে। চাঁদের মাটিটা কি এ্যানং নরম। পলিমাটি বালিমাটি। না-অয়, রেডিওতে কসে কাঠকয়লা যেনং। এ্যালায় হামরালার ছায়া যেনং এই নরম মাটিত, তেনং ছায়া চাঁদের মাটিত। অয়, অয়, হামরালার ছায়া ত চাঁদের মাটিত পড়িবা না হয়। এক যদি চাঁদত মিছিল যায় সেলায় যাবার পারিম।

চাঁদ দেখলে মানুষ আর মিছিল মনে পড়ে এখন। মাটির চাঁদকে পায়ে পায়ে খেলাতে খেলাতে আকুলুদ্দিনের আরো মনে আসে আজি হয় সোমবার, কালি নারান মল্লিকদের স্ট্রাইক, হলদিবাড়ির হাট, বুধ বাদে বিষুদ বারত মোহরম, শুক্কুর শনির পর দেওবারত দোল, সোমবারত কাদাখেলা।

অয়, অয়, মোহরমের তানে আর দুইদিন বসি থাকিবার না নাগে, কালি স্ট্রাইকের তানে মোহরম হবা পারে, আর লাঠি-শড়কি খুব চালাবার পারলে দোল-খেলাও হবা পারে। হা হা, কালি মোহরম, কালি দোল। একই চাঁদের হিসাবে দোল আসে, মোহরম আসে, আজিকার রেডিওটা তারিখ আগায় দেসে।

সামনে অনেকখানি জুড়ে দুটো ছায়ার তাক দেখতে পেয়ে খুশি হলো আকুলুদ্দিন। তাহলে বোধহয় নরম মাটিটা শেষ হলো। সামনে একটা উঁচু আল—তার ছায়া এই মাঠে ছড়িয়েছে। তার পরে আরো একটা উঁচু আল—তার ছায়া সামনের উঁচু মাঠটা জুড়ে আছে। দিকজোড়া বিরাট বিস্তীর্ণ ছায়া-চাঁদে রচিত সিঁড়ি যেন কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সামনের উঁচু আলটার ওপর পা দিয়ে উঠতেই পাড়টা ভেঙে গেল। তাহলে এটাও শক্ত মাটি নয়। সামনের উঁচু আলটা শক্ত হবা পারে। কিন্তু সামনের আলটার দিকে তাকাতেই আকুলুদ্দিন দেখতে পেল একটা কিছু সোজাসুজি দাঁড়িয়ে আছে। গাছ হবা পারে। ঘর হবা পারে। মানুষ হবা পারে। "কায়রে" জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে আকুলুদ্দিন দাঁড়িয়ে পড়ল। যদি মানুষ হয়, তার গলার স্বরটা যদি চিনিবার পারে। যদি নারান মল্লিকের পার্টি হয়।

উঁচু আলের ঐ দাঁড়ানো কিছুর দিকে তাকিয়ে আকুলুদ্দিন নিজেও দাঁড়িয়ে থাকল। থাকতে থাকতে তার মনে হলো সে উঁচু আলটার ছায়া দেখতে পেলে বুঝতে পারত মানুষ না গাছ না ঘর। তার নিজের ছায়া পড়ছে না। এই মাঠ জুড়ে উঁচু আলের ছায়া।

চাঁদ আর ভেজামাটির মধ্যে আকুলুদ্দিনই ছিল একমাত্র চলন্ত। সে-ও থেমে যাবার পর মনে হলো সবই থেমে আছে।

কিন্তু থেমে থাকলে তো উপায় নেই। এই নরম মাটিতে কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। তার বাপের মতো ফিসফিসিয়ে আকুলুদ্দিন বলল— "কায় হে, কায় হে।"

এতো মিছিল কইছু—এ্যালায় হামার গলা দিয়া কাথা বাহির হওয়ার উপায় নাই—গলার স্বরটা মোর সকলের কাছে বড় চিনা—

আকুলুদ্দিনের মনে হলো সে ছায়ায় থাকায় বোধহয় সামনের বস্তুটি যেমন স্পষ্ট, তেমন স্পষ্ট নয়। সে যদি এখন বসে পড়ে, বসে বসে সামনের উঁচু আলটার তলায় যায়—তারপর লুকিয়ে দেখে নেয়, ছায়াটা মানুষের না গাছের না ঘরের!

আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও যখন সামনের ছায়াটা নড়ে না, তখন বসা ছাড়া আর উপায় থাকে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে পায়ের পাতা দুটি মাটিতে বেশ অনেকখানি ডুবেছে, বসার পর পাতা দুটি তুলে এক পা এক পা করে বসে বসে এগোতে লাগল। বসার পর মূর্তিটির শুধু মাথাটুকু দেখা যাচ্ছিল। উঁচু আলটার যতো কাছে এগচ্ছে, আলের ওপরের মূর্তিটি একটু একটু করে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তারপর আর দেখা গেল না।

উঁচু আলটার নিচে গিয়ে বসে একটু জিরিয়ে নিল আকুলুদ্দিন। এতোটা বসে বসে আসতে তার কষ্ট হয়েছে। একটুখানি বসে সে অত্যন্ত ধীরে ধীরে মাথাটা উঁচু করতে লাগল। তারপর হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে মাথাটা নাবিয়ে দিল। যদি মানুষ হয়, যদি নারান মল্লিকের পার্টির মানুষ হয়, তাহলে তো তার মাথায় লাঠি মারতে পারে। আকুলুদ্দিন একটু সরে গিয়ে আলের ওপর দিয়ে চোখ উঁচিয়ে দেখতে গিয়ে আবার বসে পড়ল। হঠাৎ তার মনে হলো দরকার কি তার দেখার। তার চাইতে এমনি আড়ালে-আড়ালে কেটে গেলেই তো হয়। যদি ওটা গাছ বা ঘর হয় হলো। আর যদি ওটা মানুষ হয়, হলো। আর যদি ওটা নারান মল্লিকের মানুষ হয়—সাবধানের মার নেই। সুতরাং উঁচু আলের তলা ঘেঁষে ঘেঁষে আকুলুদ্দিন বসে বসে এগতে লাগল। এমন করে খানিকটা এগিয়ে সে পিঠ বেঁকিয়ে, হাঁটুটাও খানিকটা বেঁকিয়ে, নিচু

হয়ে প্রায় দৌড়ের মতো করে এগতে লাগল। পায়ের তলায় নরম মাটি থেঁতলে যায়।

সামনে আবার চাঁদ ভরা মাঠ বিস্তৃত হয়ে যেতে দেখে আকুলুদ্দিন বোঝে সে আলের শেষে পৌঁছে গেছে। তবু মূর্তিটার দাঁড়িয়ে থাকার জায়গা থেকে কতোটা সরে আসতে পেরেছে দেখতে পেছন ফিরে শুধু অস্পষ্ট অন্ধকার আর চাঁদনি দেখল।

আলটা তো শেষ হলো। সামনে বেশ নিচু মাঠ। লাফ দিয়ে নামতে হবে। আর ডানদিকে বেঁকে গেলে উঁচু মাঠটার একেবারে কিনারে উঠতে পারে। আকুলুদ্দিনকে ভাবতে হচ্ছে—কি করবে। সামনে নিচু জমি। তার মানে ওখানকার জমি নরম, কাদাও থাকতে পারে। যদি কাদা থাকত, তাহলে চাঁদ মাঠে পড়ে চকচক করত। নরম কি না এতো উঁচু থেকে বোঝা যাবে না। কিন্তু উঁচু মাঠটার ওপর যদি ওঠা যায় তাহলে মূর্তিটা তাকে দেখে ফেলতে পারে।

সিদ্ধান্তে পৌঁছনর জন্য মূর্তিটা আছে কিনা দেখতে আকুলুদ্দিনকে পেছন ঘুরে একটু একটু করে চোখ উঁচু করতে হয়। কিছু দেখতে না-পেয়ে মাথাটা তুলতে হয়। কিছু দেখতে না-পেয়ে পিঠটা উঁচু করতে হয়। কিছু দেখতে না-পেয়ে আর একটু সোজা হতে হয়। তবু কিছু দেখতে না-পেয়ে একেবারে সোজা হওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না। এমন কি নরম মাটির ওপর দুই পায়ের আঙুলের ভর দিয়ে উঁচু হয়েও কিছু দেখতে না-পেয়ে আকুলুদ্দিন আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটাই মূর্তিটার মানুষ হওয়ার নির্ভুল প্রমাণ। টুপ করে সে বসে পড়ে।

মানুষটা তাহলে তার পিঠের ওপরের মাঠটাতেই কোথাও আছে। সে যে বসে বসে এগিয়েছে, সেটা তাহলে সেই মানুষটা দেখেছে। সেই মানুষটা লাঠি, শড়কি বা বল্লম নিয়ে মাথার ওপরের মাঠটাতে হয়তো তার মাথার ঠিক ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে আকুলুদ্দিন তার পাল্লার ভেতর? সুতরাং জল থাকুক আর ডাঙা থাকুক সম্মুখের ঐ নিচু জমিটাতে লাফ দিয়ে নেমে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

আকুলুদ্দিনের দাঁড়াবার জায়গাটি অন্ধকার। তার পায়ের নিচে থই থই জ্যোৎস্নায় মাঠটা চারদিকে গড়িয়ে গেছে।

সেই অন্ধকার থেকে লাফ দিতেই দীপ্ত জ্যোৎস্নায় নিচু মাঠের মধ্যে আগে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ছায়া, আর সেই ছায়ার ঘাড়ে আকুলুদ্দিন হুড়মুড়িয়ে পড়তেই কে যেন অপ্রস্তুত কণ্ঠে চমকে উঠল "হে-ই।" নিজের ছায়ার ঘাড়ে চাপা আকুলুদ্দিন বাতাসের স্বরে হিসিয়ে উঠল— "কা-য় হে।" যে-আলটার ওপর থেকে আকুলুদ্দিন লাফ দিয়েছে, তার গায়ের অন্ধকার থেকে কেউ যেন আকুলুদ্দিনের বাপের মতো ফ্যাসফেসে গলায় বলে উঠল—"কে হে।" শোনামাত্র আকুলুদ্দিন নিজের ছায়া দুপায়ে মাড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঠে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল "নারান— খবরদার, এক পা আগু ফেলিস না নারান—।" অন্ধকার থেকে নারান জবাব দিল—"আকুল, তোর লাশ কিন্তু পাওয়া যাবে না, সাবোধান।" "নারান, আমি তর লাশখান তর বউয়ের কাছত পাঠাম—আয় কেনে, এইঠেই সুবিধা, কায়ও নাই।"

"আকুল, আমার নামটা মনে রাখিস"

"রাখ কেনে, তর বাপার নামটা মনে কর কেনে"

"আকুল" নারানের গলার স্বরে যেন দাঁতে দাঁত ঘষার আওয়াজ পাওয়া গেল "আমি নারান মল্লিক"

"মল্লিক" আকুল শব্দ করে থুতু ফেলল "মোর নাম মোহাম্মদ আকুলুদ্দিন"

"আকুলুদ্দিন মোহাম্মদ—আমার পার্টির কাথাটা স্মরণ রাখিস, তর দুয়ারে যম খাড়াইয়া"

"নারান মল্লিক—হামার পার্টির কাথাটা ভাবিস না তুই, তর লবাবি চলি গেইল্, রেডিও শুনিস নাই, এ্যালায় আর দারোগা তর কাথা শুনিবে না"

"তুই রেডিও শুনছিস? আকুল"

"তুই শুনিস নাই?"

"শুনছি" নারান মল্লকের গলার স্বরটা একেবারে স্বাভাবিক আর নরম শোনাল। ওরা এতক্ষণ কথা বলছিল চাপা অথচ তীব্র স্বরে। যে-কোনো মুহূর্তে একজন অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। দুজনের কেউই এক মুহূর্তের জন্য নিজের প্রস্তুতভঙ্গি শিথিল করেনি। কিন্তু

নারান মল্লিকের শেষ কথাটা যেন সমস্ত পরিস্থিতিটাকেই শিথিল করে দিল।

"আকুল, তর ব্যাগে কি আসে রে?"

"তর ব্যাগত যা রহে!"

"সি-পি আর এচ-বি লোন, আর ঘর জ্বালানির দরখাস্ত আর জে-এল-আর-ও অফিসের জমা দিবার লিস্টি—এইগুলা আর নিয়া যাস ক্যা, এইহানে ফ্যাল"

"শালা, তর পার্টির তানে ত হইল্, শালা হাত্তির পাঁচ পা দেখিবার ধরসেন, শালা তরা লুটপাট করেন কেন, খুনাখুনি করেন কেন এ্যানং, মানষিলার মনত তরা বিষ ঢুকাসেন"

"হে-এ-এ আকুল, তর এখানে কতগুলা খুন করছি রে, কতগুলা লুট করছি রে? ক, ক, আজি ত শুইনতে হবে হে, শুইনতে হবে"—নারান মল্লিক মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলতে বলতে বসে। ওদের মাঝখানে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। যেন একটা খুঁড়ে রাখা কবরের দুপাশে দুজন। মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটুকু পার হয়ে অপরের অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণের সুযোগ নেয়া সম্ভব নয়। মনে হয় ওরা যেন নিজের মনে কথা বলছে। কথাগুলো এতো ধীরে এতো অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হচ্ছে যেন ওরা নিজের সঙ্গে অথবা আকাশের গলা-সোনারঙের চাঁদ বা আকাশ-মাটি ঘেরা কুয়াশার মতো চাঁদনির সঙ্গে কথা বলছে।

"না নারান, তর পার্টি এইঠে কোনো লুঠ করে নাই, খুন করে নাই, চা-বাগানত কইচছিস"

"কোথথন শুইনছিস রে আকুল।"

"হামার পার্টির নেতা মানষির ইপোর্ট, কয়লাখনিতেও তরা খুন কইচছিস। তুই মানষিটা, এইঠে তর মানষিগুলা, খারাপ না হয়। কিন্তুন তর পার্টি টা বড় গুণ্ডা, তরা অজয় মুখার্জিটাকা তাড়াই দিলু—"

"ঘাড় ধরি?"

"না নারান, তরা বড় লোভী, তরা নিজেদের আজত্ব চাস, তর নেতার সরটা লাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করসে—"

"কেন করব না রে, অজয় মুখার্জিটা সরকারটা ভাঙছে, আমরা ধরছি, তরা আমাদের সাপোর্ট করস নাই কেন। তয় ত সরকারটা থাইকত।"

"তরা সরকারটা ভাঙিবার ধইলন্ু, আর তোমরালাই সরকারটার মালিক হবা ধরিবেন ? এ-এ ক্যানং কাথা ?"

"আকুল—অয় অয়, আমারে তুই সরকারটার মালিক করবি না। আর মালিক করবি ঐ মহেশ্বররে ?"

"কেনে, ঐ শালা গুণ্ডা বদমাস জোতদারটার নাম ধরিস কেনে হে"

"রাগস ক্যারে আকুল, রাগস ক্যা, উই মহেশ্বরটা তর অজয়বাবুর দলের লিডার হইসে না ভোটের পরে ?"

"অয় ত অয়, উমরার সঙ্গে হামরার কি। মোর পার্টিখান তো কমুনিস্ট পার্টি"

"হ, হ, হরে কমুনিস্ট পার্টি, মহেশ্বর আর নারান মল্লিক, কে তোর বেশি কাছেং রে, হরে কমুনিস্ট পার্টি ?"

"নারান, মহেশ্বরর পার্টিটার তলায় বড় জঞ্জাল, কিন্তু আগাটা সিধা। তর পার্টিটার আগাটায় বড় জঞ্জাল, তলাটায় তর মতন ভালা মানষি থাকিবা পারে"

"তুই ত তলার মানুষ, তুই কি কস"

"নারান, তোরা মাতাল হবা ধরিসেন হে, ক্ষ্যামতার মদ। যেনং কংগ্রেস মাতাল ছিল। নারান, তোর পার্টির মাথাটায় ক্ষ্যামতার আগুন ধরিবার নাগে। নারান, তরা শত্রুবৃদ্ধি করিবার ধরসেন। নারান রে, আমায়নের কাথা শুনিসেন কখনো ?"

"ক, তুই ক, শুনি, হালা, মুসলমানের কাছে রামায়ণ শুনি"

"নারান, আজি রাত্তির আগে কখনো তর মনত আইচছে আমি মুসলমান ?"

"না, কিন্তুন এখন তুই হালা মুসলমান। হালা, আমিও চাহার পোলা। হালা এহানে বস্তা খুব লিডারি কইরব্যার ধরস। আর পাকিস্তানে আমাদের থাকার উপায় নাই—" নারান উঠে দাঁড়ায়। আকুলও।

"নারান, সাবোধান, শালা ঢাকাইয়া, ভাটিয়ার ঘর, হামার দেশি ভাইগুলার উপর যমদুতের তানে আসি পড়ি গেইল্, শালা নারান ভাটিয়া, চলি যা আমার মাটিত, চলি যা—"

"খবরদার আকুল"

"সা-বো-ধা-ন নারান"

চারদিকের সহসা নিশ্চুপে পুব থেকে এক ঝোড়ো হাওয়া মাটি ঘেঁষে আসতে আসতে মাথা তুলে হঠাৎ হঠাৎ জ্যোৎস্নায় মাখামাখি ধুলোবালি পাতাসহ দুজনকে ঘিরে ধরে ঘুরে-ঘুরে ঘুরে-ঘিরে উত্তর পশ্চিম দিকে রণপায়ে ধেয়ে চলে যায়। তাদের দুজনের মাঝখানে জ্যোৎস্নার শবের ওপর একটা বিড়ি ছুঁড়ে দিল নারান মল্লিক, বিড়িটা আকুলুদ্দিনের কাছে এলো না। কুড়োবার জন্য আকুল এগোয় কিনা নারান যেন দেখতে লাগল। আকুল না-এগিয়ে নিজের পকেটে বিড়ির জন্য হাত দিতেই নারান মল্লিক আর একটা বিড়ি জোরে ছুঁড়ল। হাত দিয়ে আকুলুদ্দিন সেটা কুড়িয়ে নিতে নিতেই নারান মল্লিক দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল। নারান সামনের দুটো দাঁতে চিপে ঠোঁট ফাঁক করে বিড়ি ধরায়, আর এতো দূরে থেকেও আকুলুদ্দিন যেন দেখতে পায়—ভঙ্গিটা তার এতো চেনা। নারান নিজের কাঠিটা নিবিয়ে ফেলে দিয়ে শালাইটা ছুঁড়ে দেয়ার আগেই আকুলুদ্দিন নিজের দিয়াশলাই বের করতে পকেটে হাত দেয়।

"নারান, তুই এইঠে আলু কেনং করি?"

"বড়কামাতে হজ-র বাড়িতে রেডিও শুইন্যা কালক্যার মিছিলের হরতালের কথা কয়্যা সিধ্যা রওনা দিয়্যা ভাবল্যাম, তগ পাড়ার উপর দিয়া যাওয়াডা নিরাপদ না। চিনব্যার পাইরলে খুন হয়্যা যাব। মাঠ বরাবর রওনা দিসি, হালা বেশ আসত্যাছি, হঠাৎ দেহি—বাঃ শালা ঘাস শ্যাষ, এমন তুলতুলানি মাটি, পা কোটে থম, আর কোটে না থম, আর তই লা দোলপুর্ণিমা আর মোহরমের চাঁদা, শালা চোখখান ঝাপটা করি দেয়"

"এই বর্ষায় হালা ঘণ্টায় ঘণ্টায় নদী মোড় নিসে, বর্ষা শেষ, শালা শীত-জলেও বানা। চিনব্যার আর কোন উপায় থোয় নাই"

"হাঁক দিবার পারি না, নারান, কোন জায়গা চিনিবার পার না। কোন পাড়া বুঝিবার পার না। এতো মিছিল কইচছু, হামার গলাটা বদলাম কেনং করি, সগায় চেনে"

"সগায় চেনে রে আকুল্যা, সগায় চেনে। আমার নাম নারান মল্লিক, হাঁক দিয়া জিগাম এইডা কোন পাড়া হে-এ, তার উপায় নাই, শুধু তর জইন্য, আকুল্যা, তর পার্টির জইন্য। আমারে এহানে একলা পাইলে খুন কইর‍্যা নরম মাটিতে কবর দিয়্যা রাইখলে এত্তো রাত্তিরে কাগও নাই যে দেইখবে"

"আমি তোমরাক দেখি ত আলের আড়ালত মাথা ঢাকি, এই মাঠত

নাফ দিছু রে নারান, নরম মাটি, নাফ দিবার তানে ভয় ধরসে—হাটু গাড়ি যাবা পারে"

"হয়, হয়, বালি নাই রে আকুইল্যা, বুলডোজার লাইগত না, একডা দুইডা চাষ ট্র্যাকটর দিয়া দিব্যার পাইরলে হতো। তবু দেইখ্যা তো আমি নোর পার্‌য়্যা আস্‌তা এই হানটায় চুপ দিলাম"

"তর আর হামার যাওয়ার কাথা আছিল্—ডোজার আর ট্র্যাকটরের তানে, অ্যালায় কায় যাবে রে নারান—"

"জানি না রে আকুইল্যা। তুই আর আমি একসাথ যাব্যার দিন শ্যাষ রে। তুই আর আমার কমোরেড না। তুই মুসলমান, আমি হিন্দু। তুই দেশি, আমি ভাটিয়া"

"এই জমিটা কার হয় রে নারান"

"জানি না রে আকুইল্যা"

"এই পাড়া কুন পাড়া রে নারান"

"চিনি না রে আকুইল্যা"

"এইটে কুন নদীর বানা আসিল্ রে নারান ?"

"বুঝি না রে আকুইল্যা"

"হামরালা কুনঠে যাম রে নারান"

"তুই কুথায় যাবি, আমি ক্যামনে জানব। আমি কোথায় মেলা করছি তোক কব্যার পারব না। তুই যা, যেমন যাছিস। আমি যাই, যেমন যাছি।"

নারান ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। আকুলুদ্দিন সেটা খেয়াল করা মাত্র ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"হাঁক দিয়্যা জিগ্যাবার পারব না—কোন মাঠ, কোন নদী, কার পাড়া, কার ঘর। পা-আন্দাজে চলো, শুধু চ—লো, চ—অ—লো।" একটু একটু পা ফেলে নারান আলের গা ঘেঁষে ঘেঁষে পশ্চিম দিকে এগতে থাকে।

আকুল পুব দিকে চলতে থাকে। ওদের দুজনের মাঝখানের ফাঁকটা বাড়তেই থাকে। ওরা দোল মোহরমের চাঁদ আর আপাতত দিগন্ত লোপাট শূন্যতার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে।

"দেশ গাঁ জন্মভূমি যদি ঘণ্টায় ঘণ্টায় নতুন নতুন বানায় ডোবে আর ডাঙায় ভাসে, কেনং করি ঘাটা-আঘাটা চিনিবারে পাম—"

"খুঁজিবার নাগিবে হে, খুঁজিবার নাগিবে—"

পুস্তক-পরিচয়

অধিকার রক্তের কবিতার। গণেশ বসু। পরিবেশক: মনীষা গ্রন্থালয়। দু-টাকা

তরুণ কবিদের কবিতা প্রায়ই পড়ি এবং সংখ্যায় তাঁরা অনেক—কিন্তু মানতে হয় যে মাঝে মাঝে তাঁদের ভাবনা-চিন্তার বা লেখারই ধরন-ধারণ অস্বস্তিকর লাগে। সব সময়ে নয়, এবং সেটাই আমার আত্মচিন্তাকে আশ্বস্ত করে।

শ্রীমান গণেশ বসুও তরুণ কবি, কিন্তু তাঁর মনের জগৎ বয়স্কের পাঠে খুব একটা অচেনা লাগেনি। মনে হয়েছে, তার কারণ তাঁর কাব্য-জগতের পুরুষার্থ আমাদের জগৎ থেকে ভিন্ন নয়। তাঁর কবিতা তাই আমার মতো পাঠকের কাছেও অনাত্মীয় ভাষা মনে হয় না, যদিচ, তাঁর তারুণ্য কয়েকটি বই পড়েই মনে হয়েছে যথার্থ নবীনতাই। তাঁর চারটি বই পড়ে মনে হয়েছে যে তাঁর কবিতার আবেগপ্রেরণা উৎসারিত নিঃস্বার্থ সৎ উৎসাহী তরুণের এবং কর্মী-তরুণের জীবনানুগতা থেকে। এই বৈশিষ্ট্য সব সময়েই সাহিত্যচর্চাকে গভীরতা দেয় এবং তাই থেকে আঙ্গিকের উপরে কর্তৃত্ব বিশেষ তাৎপর্য ও বিকাশ পেতে থাকে। তার ফলে আমাদের জীবন-যাত্রার নানা সমস্যা, তার উপরে একাধিক ন্যায্য সাংস্কৃতিক কাজ-কর্মের নৈর্ব্যক্তিক অর্থাৎ নিঃস্বার্থ উৎসাহ হয়তো বিশুদ্ধ কবিতার সেবায় বা গজদন্তমিনারের স্বপ্নলোকে গণেশ বসুর মতো তরুণ কবিকে কালহরণ করতে দেয় না। তৎসত্ত্বেও তাঁর কবিতার অজস্র প্রাণশক্তি ও তার বিকাশ দেখে খুশি লাগে।

কেউ কেউ বলেন যে সমাজ-সচেতন ব্যক্তিকোত্তর লেখকদের নাকি অসুবিধা হচ্ছে যে তাঁরা বিশুদ্ধ কাব্যচর্চার মানসিক অবকাশ পান না নানা-বিধ কর্মের ব্যস্ততায়। কিন্তু অন্তপক্ষে বলা যায় যে এঁদের সাহিত্য সৃষ্টির ও চর্চার বৈশিষ্ট্যই, তার মূল চারিত্র্যই ক্ষতিগ্রস্ত হতো যদি এঁরা ব্যক্তিগত তথা বৃহত্তর আবেগ থেকে পালিয়ে বার্-কাফে-মিনারে আশ্রয় নিতেন।

গণেশের বইকটিতে সে সুস্থ সবল মানবিকতার মানস পেয়েছি, তার

প্রভাবই তাঁর কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্যে। এ-কবির পক্ষে ধীরে সুস্থে লেখার ঘরে বা বৈঠক-ঘরে বসে বসে কবিতার রূপাঙ্গিকচর্চা সম্ভব নয়। তাঁর কবিতা যেন স্বরূপ পেয়েছে তাঁর 'সমুদ্রমহিষ'-এর দুরন্ত আবেগের প্রতীকেই। বোঝা যায় কেন গণেশের কবিতার বইয়ের নাম হয়—'রক্তের ভিতর রৌদ্র'।

বর্তমান বইটি দেখছি তরুণ কবির পঞ্চম প্রকাশ এবং নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘ ও বহুরীতিবিন্যস্ত কবিতার প্রথম ও প্রশংসনীয় প্রয়াস—লেনিন শতবার্ষিকীতে 'অধিকার রক্তের কবিতার'। কারণ—"শিরায় শিরায় হাঁকে ভালোবাসা লেনিন লেনিন।" এ-অধিকার ঘোষণায় বয়স্ক লেখকও বিমূঢ় বোধ করে না, নিজেকে আনাত্মীয় ভাবে না।

মনে হয় এই কবিতায় গণেশ বৃহৎ একটি আবেগের প্রেরণাতেই দীর্ঘ বৈচিত্র্যময় কাব্য লিখতে পেরেছেন। আমার তো বরং মনে হলো, কোনো একটা কারণে, কিছুর তাড়নায়, তিনি হঠাৎ কবিতাটিতে যতি টেনেছেন। এমন কি একবার তো আমার মনে হলো হয়তো শেষের কয়েকটি পৃষ্ঠা বাঁধাবার সময় বাদ পড়ে গেছে। কবিতাটির আরম্ভ আঁটসাট কথার কাটাকাটা আবেগবহ বাক্যের পর পর যোজনায়—সংক্ষিপ্ত কিন্তু সোচ্চার বাক্যগুলির নাট্যতরঙ্গের গতি ও পূর্ণচ্ছেদগুলিকে মেলে দিয়ে ছাপিয়ে ওঠে একটা আততস্নায়ু স্ট্রফিক বা শ্বাসপর্বলয়ের গতিতে। তারপরে আসে নিয়মিত পদ্যছন্দের ক্ষিপ্র আততির ভারসাম্য :

> "ছিন্নমূল আমি সে কিশোর
> দোরে দোরে ঘুরেছি লোকের
> স্মৃতি তেতো ঘৃণা ও ধুলোর
> কান্নাজমা বিপুল বুকের। ...."

তবু—দিকে দিকে প্রাণের শিকড়—তারপরেও পদ্যছন্দই মিলান্ত কিন্তু ছাপিয়ে উঠে উঠে কাটা-কাটা অথচ দীর্ঘলয় পদ্যছন্দই।

কিন্তু পুস্তক-পরিচয়ে বাকবিস্তার নিষ্প্রয়োজন। বিশ-একুশ পৃষ্ঠা-ব্যাপী কবিতা যে-কবি লিখতে পারেন, সাধুবাদ তাকে জানাতেই হবে, যদি সে-কবিতা হয় সুস্থ প্রাণময় সততার কবিতা, হয় যৌবন-সূর্যের অধিকার, যদি তার হৃদয়ে থাকে একটি নাম, যে-নাম লেনিন—শাশ্বত সংগ্রাম।

বিষ্ণু দে

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি। অবন্তীকুমার সান্যাল। সারস্বত লাইব্রেরী। পাঁচ টাকা

রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আমরা আজ যে-গদ্য নিত্য ব্যবহার করে থাকি, তা যে অনেক পরিমাণেই রবীন্দ্রপ্রভাবিত সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধন করেননি, বাঙলা গদ্যরীতিও তাঁর হাতে বহুল পরিবর্তন লাভ করে। কিন্তু তাঁর কবিখ্যাতির আতিশয্যে তাঁর গদ্যশিল্পী পরিচয় কিছুটা অপরিজ্ঞাত থেকেছে। গদ্য আমরা প্রতিনিয়ত নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করি বলেই তার বিবর্তন সম্বন্ধে আমরা সব চেয়ে অজ্ঞ এবং কৌতূহলশূন্য। আসলে গদ্যও যে মহাশিল্পীর দান, তা আমরা ভুলেই থাকি। আর যে-গদ্য এখন প্রাত্যহিক ব্যবহারের ফলেই অতিপরিচিত ও কিছুটা প্রথাসিদ্ধ, তাও একদিনে সৃষ্টি হয়নি। বিশেষত বাঙলাদেশে গদ্যের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন নয়। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের ঋণের পরিমাণ অপরিসীম। অন্য দিকে, রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল ধরে গদ্য নিয়ে যে-পরীক্ষা করেছেন, তার দ্বারা আমরা লাভবান হয়েছি সন্দেহ নেই, কিন্তু উত্তর-রবীন্দ্র বাঙলা গদ্যও ইতিহাসের নিয়মেই অগ্রসর হয়েছে এবং সম্ভবত গত তিরিশ বছরে গদ্যের এই রূপান্তর অনেক বেশি দ্রুততর ও চমকপ্রদ বলেই মনে হবে। আসলে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকে অবলম্বন করেই তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে—বাঙলা গদ্যের রূপ ও রূপান্তরের ইতিহাস তাই বিচার-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখা হলেও, পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এ-যাবৎ লেখা হয়নি। শ্রীঅবন্তীকুমার সান্যালের 'রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি' (কার্তিক ১৩৭৬) গ্রন্থটি সেই প্রয়োজন কিছুটা মেটাতে সক্ষম হয়েছে, গ্রন্থটি রচনার জন্য অবন্তীবাবুকে অভিনন্দন জানাই।

গ্রন্থের সূচনায় 'বক্তব্য' অংশে লেখক গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন, "ভাষার রীতির রূপপরিবর্তন যে কখনই লেখকের খেয়াল-খুশির পরিণাম নয়, ভাববস্তুর প্রকাশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত—এইটি মনে রেখে তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) গদ্যরীতির রূপপরিবর্তনের ধারাবাহিকতা এবং চরম পরিণতির গতিরেখাটি স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছি।" বলাবাহুল্য, ভাব ও ভাষার অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধবন্ধন অবিসংবাদিতভাবে একটি

চিরন্তন সাহিত্যিক সত্য। তবে 'গদ্যরীতি'র আলোচনা করতে হলে সাধারণভাবে 'স্টাইলিসটিকস'-এর আলোচনাই করা হয় এবং তার প্রয়োজনও নিতান্ত কম নয়। মার্জারি বৌলটনের 'The Anatomy of Prose' (১৯৫৪) জাতীয় কোনো গ্রন্থ বাঙলায় এখনো লেখা হয়নি, রবীন্দ্র-গদ্যরীতির সে-জাতীয় বিশ্লেষণ তো দূর-প্রত্যাশিত! অবন্তীবাবু "বাক্যগঠন, শব্দপ্রয়োগ, অলঙ্করণ ইত্যাদির" আলোচনাকে "নিছক বহিরঙ্গ" বিচার বলেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির "বহিরঙ্গ" বিচারেরও দরকার আছে, আর তাছাড়া 'স্টাইলিসটিকস-'এর আলোচনাকে "নিছক বহিরঙ্গ" আলোচনা বলা যাবে কিনা, তাও বিতর্কনির্ভর।

অবন্তীবাবু আলোচনার সুবিধার জন্য রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনাকে চারটি পর্বে ভাগ করে নিয়েছেন: প্রথম পর্ব ১৮৭৬—১৮৭৯, দ্বিতীয় পর্ব ১৮৮১—১৮৯৮, তৃতীয় পর্ব ১৮৯৮—১৯১২, চতুর্থ পর্ব ১৯১৬—১৯৪১। তারপর ধারাবাহিকভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রধান গদ্য রচনাগুলির বিবর্তন দেখিয়েছেন। প্রথম পর্বের গদ্যরীতি সম্বন্ধে লেখকের সিদ্ধান্ত, "কল্পনা ও মননের যে দ্বৈতরূপটির সর্বোত্তম ও সর্বাতিশয়ী অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যে পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষ করি, তার সূচনা একেবারে প্রথম পর্ব থেকেই।" সম্ভবত, লেখকের চোখে রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্যটুকুই বেশি করে ধরা পড়েছে। কারণ বঙ্কিমযুগের গদ্যরীতি হিসাবে যুগগত সামান্য ধর্ম তিনি নির্দেশ করেননি। দ্বিতীয় পর্বে, চলতি ভাষার ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের সামর্থ্য ও সাফল্য একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। লেখক এখানে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব দেখাবার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর গদ্যরীতির ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন, এই ইতিহাস বিবৃতির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু লেখকের অনেকগুলি সিদ্ধান্তবাক্য তথ্যসমর্থিত কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ জাগে। যেমন—

"কেরির কথোপকথনের **কাঠামোটি সাধু**।" (পৃ: ১১)

"অভিনেয় নাটকের সংলাপ কথ্যরীতি ছাড়া সাধুরীতিতে রচিত হলে নাট্যের বাস্তবতা পীড়িত হয়, তাই সে ক্ষেত্রে কথ্যরীতি অপরিহার্য। প্রথম দিকে যে বিখ্যাত বাংলা নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল, রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুলসর্বস্ব **এইজন্যই** অনাটকীয়।" (পৃ: ১১)

"মধুসূদনের চলতি ভাষার **পরিপূর্ণরূপ** ধরা পড়েছে তাঁর মায়াকানন নাটকে।" (পৃ: ১২)

তৃতীয় পর্বই "রবীন্দ্রনাথের সাধু গদ্যের শ্রেষ্ঠ পর্ব।" এই সময়ে লেখা 'নষ্টনীড়'-এর মতো অসামান্য গল্প, 'প্রাচীন সাহিত্য'-র আলোচনা এবং 'গোরা' উপন্যাস। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আলঙ্কারিক কবিত্বপূর্ণ গদ্য এখন অতুলনীয় সরলতা ও দ্রুতি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে নিজের গদ্যরীতি প্রসঙ্গে বলেছেন—"আমার প্রথম দিককার গদ্যে, যেমন 'কাব্যের উপেক্ষিতা', 'কেকাধ্বনি' এসব প্রবন্ধে, পদ্যের ঝোঁক খুব বেশি ছিল, ওসব যেন অনেকটা গদ্য-পদ্য গোছের। গদ্যের ভাষা গড়তে হয়েছে আমার গল্প প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে। মোপাসাঁর মতো যে-সব বিদেশী লেখকের কথা তোমরা প্রায়ই বল, তাঁরা তৈরি ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা গড়তে হলে তাঁদের কী দশা হতো জানিনে।" ('সাহিত্য, গান ও ছবি,' 'প্রবাসী', আষাঢ় ১৩৪৮) "পদ্যের ঝোঁক" অতিক্রম করার চেষ্টা অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনই করেছেন, কিন্তু একমাত্র 'জীবনস্মৃতি'ই বোধহয় এদিক থেকে তাঁর সাফল্যের সীমারেখা।

চতুর্থ পর্বে, রবীন্দ্রনাথ চলতি গদ্যকেই সাহিত্যের একমাত্র বাহনরূপে গ্রহণ করলেন, অবশ্য 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসখানি "রীতিবদলের সন্ধিক্ষণের রচনা।" অবন্তীবাবু রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ পর্বের গদ্য সম্বন্ধে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, "এই ভঙ্গির গদ্যের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ গদ্য ও পদ্যের ব্যবধানটি যেন ঘুচিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। ভাব ও রূপের মিলন-বিরহের বিচিত্র লীলারহস্যের সন্ধানী রবীন্দ্রনাথের কাছে এই সময় জগৎ ও জীবন যেন ভাবরূপের হর-গৌরী-মিলনে ধরা দিয়েছিল। তাই গদ্য ও পদ্যের পার্থক্যও ঘুচে গিয়েছিল।" (পৃঃ ৬৬) বলা বাহুল্য এই উক্তিটি অবলম্বনে রবীন্দ্র-গদ্যরীতির নূতন করে আলোচনার সূত্রপাত হতে পারে। অবন্তীবাবু রবীন্দ্র-গদ্যে 'ভারসাম্য'র উপর বেশি জোর দিয়েছেন।

কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির যে-অন্তরঙ্গ রূপটির বিবর্তন দেখাতে চেয়েছিলেন, তার আলোচনা সাতষট্টি পৃষ্ঠার মধ্যেই সম্পূর্ণ। গ্রন্থের শেষাংশে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ যোগ করা হয়েছে, যথাক্রমে, 'নাটকের গদ্য', 'গদ্যরীতি ও পদ্যরীতি', 'অলঙ্করণ', 'স্টাইল'। শেষ দুটি প্রবন্ধের স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থে স্থান পাওয়ার যৌক্তিকতা কতখানি জানি না। অলঙ্করণ ও স্টাইল বলতে লেখক গদ্যের তথাকথিত 'বহিরঙ্গ' রূপের আলোচনা করেননি—সে-অবস্থায় গদ্যের

বিবর্তন প্রসঙ্গেই তো এই জাতীয় আলোচনার অবকাশ ছিল। 'অলঙ্করণ' নামে পরিচ্ছেদের সুচনাতেই লেখক জানিয়েছেন, "ব্যাপক দৃষ্টিতে রচনায় প্রযুক্ত অর্থময় শব্দের যেকোনো বিশিষ্টতা—সন্ধি, সমাস, বিশেষণ, বাক্যবন্ধ ইত্যাদি যেকোনো কিছুই—এই অলঙ্করণের বিষয়বস্তু হতে পারে।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লেখক রবীন্দ্রনাথের গদ্য থেকে কয়েকটি প্রচলিত শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেছেন মাত্র।

'গদ্যরীতি ও পদ্যরীতি' পরিচ্ছেদের প্রথম বাক্য—"রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী কোনো গদ্য লেখকই পদ্য লেখক ছিলেন না।" কথাটির অর্থ বোঝা গেল না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অধিকাংশ গদ্য লেখকই তো পদ্য লিখতেন, যার ভালো দৃষ্টান্ত দীনবন্ধু মিত্র; অন্যদিকে পদ্য লেখকদের মধ্যে প্রায় সকলেই গদ্য লিখেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র পর্যন্ত। আসলে মনে হয়, লেখক বলতে চেয়েছেন, গদ্য ও পদ্য উভয়ক্ষেত্রেই সমান প্রতিভার প্রকাশ দুর্লভ; কিন্তু লেখক যে-বাক্যটি ব্যবহার করেছেন তা আক্ষরিক অর্থে বিভ্রম সৃষ্টি করে। এই পরিচ্ছেদেই লেখক একাধিকবার 'পয়ার ছন্দ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন (পৃঃ ৮১—৮২), কিন্তু 'পয়ার' কোনো ছন্দের নাম নয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজেও কখনো এই ভুলই করেছেন, কিন্তু আজকের দিনে কোনো ছন্দোবিজ্ঞানীই একে ভুল ব্যবহার ছাড়া আর কিছু বলবেন না। অন্যদিকে 'পয়ার জাতীয় মাত্রাবৃত্ত ছন্দ' বলতে লেখক কি বুঝছেন? সেখানে কি 'পয়ার' অন্য অর্থে ব্যবহৃত?

অবশ্যই, রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি নিয়ে প্রথম আলোচনাকালে সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি খুব একটা বড়ো কথা নয়। লেখকের আলোচনা-পদ্ধতি সাধারণভাবে উপভোগ্য, কারণ তিনি নিজে সাহিত্যের মূল রহস্যটি ধরতে পেরেছেন এবং সাহিত্যরসের আস্বাদ পাঠককেও দিতে সক্ষম হয়েছেন। সমগ্র গ্রন্থটি স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রসন্ন মনে দ্রুত পড়া যায়, এবং যদিও লেখক কোনো কোনো সময়ে বড়ো বেশি সংক্ষেপে সবকিছু সেরেছেন মনে হয়, তবু এই সংক্ষিপ্তিই অধিকাংশ বক্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ ও চিন্তাদ্যোতক করে তুলেছে।

গ্রন্থটিতে সূচীপত্রের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করেছি। ছাপার ভুল একটু বেশি, কয়েকটি রীতিমতো বিভ্রান্তিকর। পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠবে প্রত্যাশা রাখি।

অলোক রায়

সারা ভারত কৃষক সভার বিংশ সম্মেলন

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে সারা ভারত কৃষক সভার বিংশতি সম্মেলন চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাত (তিতুমীর নগর)-এ অনুষ্ঠিত হলো। পাঁচ-দিনব্যাপী সম্মেলনের আগে-পিছে আরও কয়েকটি দিন নিয়ে প্রায় দশদিন বারাসাত শহরে যে-প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল, তার অসাধারণ অনন্যতা বহু মানুষের কাছে ধরা পড়েছে। কৃষকের সম্মেলনকে বারাসাত শহরের অকৃষক মানুষেরা এমন আপন করে নিয়েছিলেন—যার শোভা কারুর দৃষ্টি এড়াতে পারে না। ইদানিংকালে রাজনৈতিক প্রত্যেকটি প্রশ্নে প্রভূত বিবাদ পরিলক্ষিত হয় এবং সেই বিবাদই শ্রেণীসংগ্রাম বলে প্রতিনিয়ত বিস্তর প্রচার চালানো হয়। কিন্তু বারাসাত কৃষক সম্মেলনে কারুর মনেই আসেনি যে, কৃষকদের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম দেশের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অঙ্গ ছাড়া অতিরিক্ত কিছু মারমুখী কিংবা নির্দয়।

অথচ বারাসাত কৃষক সম্মেলনে প্রতিনিধিরা সরাসরি সংগ্রামের ময়দান থেকে এসেছিলেন। কৃষক সম্মেলনের সংলগ্ন একটি ছোট হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল। এখানে এমন একজন রোগীরও অস্ত্রোপচার করা হয়, যার পায়ের গোড়ালি থেকে বন্দুকের বুলেট অপসারিত করতে হয়েছে! মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জাকষা বীর, কিন্তু মাটির মতোই সহিষ্ণু এই মানুষেরা বারাসাতে আজকের বাস্তবরূঢ় লড়াইয়ের সঙ্গে আগামীদিনের স্বপ্নকে সেতু বন্ধনে জোড়া লাগাতে জড়ো হয়েছিলেন।

বারাসাত সম্মেলন অত্যন্ত বিষয়নিষ্ঠ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ৭০সাল তীব্র কৃষক সংগ্রামের বছর হবে। পশ্চিম বাঙলার কৃষক সংগ্রামের বহু বিচিত্রতা রয়েছে। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কৃষক নিজেই তার ভূমি-বিপ্লবের সূচনা করেছে। যুক্তফ্রণ্টের পতন ও রাষ্ট্রপতির শাসনে অবশ্যই অনেক বিঘ্নের সৃষ্টি হবে। কিন্তু কৃষক আন্দোলন মোটের উপর এই স্থির প্রত্যয় রাখে যে, তাদের অর্জিত সাফল্যকে যেমন কেড়ে নিতে দেওয়া হবে না, তেমনই নতুন নতুন সাফল্যের জন্য সংগ্রামই হলো অর্জিত সাফল্যকে রক্ষার জন্যও সর্বশ্রেষ্ঠ রণকৌশল।

পশ্চিম বাঙলার কৃষক সংগ্রামের সবলতা সারা ভারতের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। বারাসাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই প্রতিবেশী আসাম এবং

বহু দূরের মহারাষ্ট্র থেকেও কৃষক সংগ্রামের যে-খবরগুলি আসতে শুরু করেছে, তার মধ্যেই বারাসতের আহ্বানকে চেনা যাবে।

বারাসাতে কৃষক সম্মেলনের আর একটি উদাত্ত ডাক হলো একতার। কৃষক-ঐক্য স্থাপনের দুটি পথ। এক, কৃষকদের নিজস্ব সংগঠনে একতা গড়া। দুই, কৃষকদের মধ্যে কর্মরত সকল দলের সকল প্রতিষ্ঠানের যুক্তফ্রন্ট গড়া। বারাসাত কৃষক সম্মেলনের মঞ্চ থেকে ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রখ্যাত নেতা শ্রীহেমন্তকুমার বসুর বক্তৃতা, এস ইউ সি দলের নেতা শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ প্রভৃতি ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য দিনে দিনে বিকশিত হবে। বারাসাতের সাফল্য এখানেও যে, বারাসাতের পরই সি পি এম পরিচালিত কৃষক সভার সঙ্গে সারা ভারত কৃষক সভার যুক্ত আন্দোলনের নিমিত্ত পারস্পরিক আলোচনায় তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে।

বারাসাতের কৃষক সমাবেশটি বৃহৎ ও বলিষ্ঠ হয়েছিল, মাত্র একথা বললে তার প্রকৃত মূল্যায়ন স্পষ্ট হবে না। যুক্তফ্রন্ট সরকার পতনের অব্যবহিত পরে রাজ্যে নানা প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার যে-মেঘ জমছিল, বারাসাত মুহূর্তের মধ্যে তা পরিষ্কার করে দিয়েছে। যুক্তফ্রন্ট নিশ্চয়ই মানুষকে সাহস ও আত্মপ্রত্যয় দিয়েছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর সেই শক্তি কি ভেঙে পড়বে? বিভিন্ন দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট যখন ভেঙে গেল, তখন গ্রামের গরীবদের কি মন ভেঙে যাবে? তার জবাবে বারাসাতের শিক্ষা হলো এটাই যে, একতার শিক্ষা শুধু নেতারাই দেয় না। বরং নেতারা যখন ব্যর্থ হন, তখন মানুষ নেতাদের শেখায়, পৃথিবীর যুক্তফ্রন্টের ইতিহাস সেই শিক্ষাতেই ভরা।

জ্যোতি দাশগুপ্ত

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের পঁচিশতম বার্ষিকী

সমাজতান্ত্রিক জার্মানিতে একটি সঙ্গীত খুব জনপ্রিয়। তার প্রথম পঙক্তিটি হচ্ছে "চিতাভস্ম থেকে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি।" আজ থেকে পঁচিশ বছর পূর্বে জার্মানির মাটিতে ফ্যাসিবাদের উপর চূড়ান্ত আঘাত হেনেছিল মানবতা ও গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী সোভিয়েত লালফৌজের দুর্জয় সেনানীরা। পৃথিবীর প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষের আশীর্বাদধন্য লালফৌজ

ফ্যাসিস্ত নায়ক হিটলারের দেশের এক বিরাট অংশে ফ্যাসিবাদের কবর রচনা করেছিল, সেই সঙ্গে রচনা করেছিল সারা দুনিয়ায় নাৎসী বর্বরতার বিরুদ্ধে যোগ্য ও সংগ্রামী প্রতিরোধ।

পঁচিশ বছর পূর্বে, খোদ হিটলার-শাসিত জার্মানির একটি অংশে নাৎসী স্বৈরাচারী শাসনের বিরোধিতা এক অভ্যুত্থানের জন্ম দিয়েছিল এবং সেই অভ্যুত্থানের ফলস্বরূপ জন্ম হয়েছিল জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র নামে নতুন একটি রাষ্ট্রের। দু-দুটি বিশ্বমহাযুদ্ধ যে-জার্মানির ভূখণ্ড থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল, সেই দেশের অর্ধাংশে এই শান্তিপ্রিয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি ইতিহাসের দিক থেকে এক বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মহান বিজয় এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রচিত হয়েছিল। ওয়ারশ, রোটারডাম, কভেন্ট্রি, ফ্লোরেন্স, স্তালিনগ্রাদ—যেখানেই মানুষ ফ্যাসিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করেছে—সেই অমর শহীদদের স্বপ্নের সফল রূপ এই জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। ফ্যাসিবাদের কেন্দ্রস্থলে যে-আঘাত পঁচিশ বছর আগে হানা হয়েছিল, তারই ফলশ্রুতি হিসেবে মানুষের মুক্তির দিশারী হয়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংহতি, দেশপ্রেমিক মানুষের মহান ঐক্য এবং নানা দল ও মতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মোর্চার সংগ্রামী ইতিহাস ইয়োরোপে এক নতুন সম্ভাবনার জন্ম দিল।

জন্মমুহূর্ত থেকে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র জার্মানির মাটি থেকে ফ্যাসিবাদ ও সামরিক একনায়কত্বতন্ত্রকে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলার গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। অপর দিকে পটসডাম চুক্তিকে পদদলিত করে প্রাচীন নাৎসী অনুচরেরা আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস পশ্চিম জার্মানিতে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন আশঙ্কাজনকভাবে সংঘবদ্ধ হচ্ছে।

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এখন হিটলারের ফ্যাসিবাদকে অনুসরণ করে চলছে। ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্বোডিয়ায় তারা সবচেয়ে নৃশংস ও আদিম পদ্ধতিতে আগ্রাসন-নীতির বিস্তার ঘটিয়েছে এবং বিশ্বশান্তির বিরুদ্ধে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। সন্‌মাই এবং অন্যান্য ভিয়েতনামী অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ নিরীহ গ্রামবাসীকে খুন করে আমেরিকার ভাড়াটে সৈনিকেরা নাৎসী যুদ্ধ-নায়কদের হিংস্রতাকেও বহু ক্ষেত্রে অতিক্রম করেছে।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানবতার পঁচিশতম বিজয়-বর্ষে কেবল অতীতের সংগ্রামের গৌরবপূর্ণ অধ্যায়ের কথা স্মরণ করাই যথেষ্ট নয়। ভিয়েতনাম, পশ্চিম জার্মানি, গ্রীস, স্পেন, এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, দক্ষিণ আফ্রিকা, লাওস, কাম্বোডিয়া বা পৃথিবীর যে-কোনো স্থান, যেখানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য মানুষ জানপণ লড়াই করছে—তার সপক্ষে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের সঙ্কল্প গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই এই রজত-জয়ন্তী উৎসব সঠিকভাবে উদ্‌যাপিত হতে পারে।

ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্র সুহৃত সমিতি দোসরা মে সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যারে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের পঁচিশতম বার্ষিকী উপলক্ষে যে-সভা ও অনুষ্ঠান করলেন - সেখানে এই দায়িত্ববোধের প্রকাশ সঠিকভাবেই পাওয়া গেল। (স্মরণে রাখা প্রয়োজন, ১৯৪৫-এর ৮ই মে সারাভারতে প্রথম কলকাতায় এই সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার—প্রাক্তন ওয়েলিংটন স্কোয়্যার—থেকেই ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামের বিজয় মিছিল বের করেছিলেন ২৫,০০০ শ্রমিক) মেয়েরা তাঁদের হাতে-তৈরি জিনিসপত্র দিয়ে ভিয়েতনাম-বাজার বসিয়েছিলেন। সেখানে বেচাকেনা যা হলো—তার সমস্ত অর্থটাই যাবে ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে।

মাত্র এই একটি উদাহরণেই বোঝা যায় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই কত বিচিত্রগামী এবং তা দেশে দেশে কত রূপেই না চলেছে।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ সাক্ষরতা কনভেনশন

গত ২৫ এবং ২৬এ এপ্রিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গ সাক্ষরতা কনভেনশন হয়ে গেল। সচরাচর যেমন হয়ে থাকে এইসব সীরিয়স ব্যাপার-স্যাপারে, সেই মাছি তাড়াবার অবস্থার বদলে দু দিনের অধিবেশনই বেশ জমজমাট দেখলুম। বাঙলাদেশের ১২টি জেলা থেকে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ১২৮ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা সবাই যে সাক্ষরতা আন্দোলনের সঙ্গে পূর্বাপর যুক্ত এমনও নয়। এঁদের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এবং মাস্টারমশাইরা ছিলেন, শ্রমিক সংস্থার প্রতিনিধিরা ছিলেন,

আর ছিলেন বিভিন্ন সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন শিক্ষানুরাগী মানুষ। শনিবার দুটো থেকে সাড়ে ছটা পর্যন্ত এই অধিবেশন চলেছে। মাঝে চা আর মধ্যাহ্নভোজনের বিরতি। ফাঁকে ফাঁকে নাচগানের কোনো ব্যবস্থাও উদ্যোক্তরা রাখেননি (সবশেষে কবি এক্রাম আলির নিরক্ষরতার উপর কবিগান ছাড়া), তবু আশ্চর্য, এই ১২৮ জন প্রতিনিধির প্রায় প্রত্যেকে আগাগোড়া বসে সাক্ষরতা বিষয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত শুনেছেন, নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সম্ভবত এইবারের সাক্ষরতা কনভেনশনের সার্থকতা এইখানেই। এই প্রতিনিধিরা কেউই তাঁদের উপস্থিতিমাত্র দিয়ে কনভেনশনকে ধন্য করতে চাননি। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তুলবার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করা তাঁরা কর্তব্য মনে করেছেন।

ভারতবর্ষের সাক্ষরতা-মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে নবম স্থানে রয়েছে। স্বাধীনতার ২৩ বছর পরেও দ্বিতীয় স্থান থেকে নবম স্থানে তার এই ক্রমাবনতির কারণ প্রধানত সরকারী ঔদাসীন্য কিন্তু আমরা যারা শিক্ষানুরাগী বলে নিজেদের পরিচিত করতে ভালোবাসি এবং রাজনৈতিক দলগুলি—আমরা কেউই একেবারে দোষমুক্ত নই। বরং আমরা যদি সমস্যাটির গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতাম, তবে সরকারী ঔদাসীন্যের প্রশ্রয়ে সমস্যাটি নিশ্চয়ই এতদূর বাড়তে পেত না।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য যে-সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা সেখানে একটি আলোচনা-সভায় মিলিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের নিরক্ষরতা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার পর একটি রাজ্য কমিটি গঠন করেন এবং ঐ সম্মেলনের ছ-মাসের মধ্যে একটি কনভেনশন আহ্বানের সিদ্ধান্ত নেন। এই কনভেনশনে বাঙলা-দেশের প্রতিটি শিক্ষানুরাগী মানুষ এবং সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিক-কৃষক সংস্থা মিলিত হয়ে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলবেন—সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের এমনতর একটা আশা ছিল। বলাবাহুল্য, বাঙলাদেশে শিক্ষানুরাগী মানুষের অভাব না থাকলেও, এই কনভেনশনের জন্য অনেকেই তাঁদের মূল্যবান সময় ব্যয় করতে পারেননি। কিন্তু যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সুখের বিষয়, সমস্যাটিকে তাঁরা বিভিন্ন দিক থেকে তলিয়ে বিচার করেছেন। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বহু মূল্যবান তথ্য সাধারণের গোচরে এনেছেন। পশ্চিমবঙ্গের

রাজ্যপালের কাছে পেশ করবার জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ সংগঠনী সমিতি যে-সাক্ষরতা সনদটি (Literacy charter) রচনা করেছিলেন, তার ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার জন্য তিনটি শাখা কয়েক ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছিল। তারপর সনদটি গভীরভাবে পর্যালোচনা এবং পুনর্বিবেচনার জন্য পাঁচজনের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি আগামী দেড় মাসের মধ্যে সংশোধিত সনদটি পেশ করলে জনমত সংগ্রহের পর তা রাজ্যপালের কাছে উপস্থাপিত করা হবে। এই সনদে সাক্ষরতা পর্ষদ গঠন, বাঙলাদেশের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট সময় সীমা বেঁধে দেয়া, নিরক্ষর শ্রমিক–কর্মচারীদের পড়াশোনার জন্য দৈনিক একঘণ্টা সবেতন ছুটি, সাক্ষরতার কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য নির্দিষ্ট ব্যয়-বরাদ্দ, ইত্যাদি দাবি জানানো হবে।

এই কনভেনশন থেকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী পালনের জন্য ডঃ দৌলত সিং কোঠারীর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। যদিও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মবার্ষিকী পালন সাক্ষরতা আন্দোলনের কর্মীদের একচেটিয়া ব্যাপার নয়, কিন্তু অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন এ-ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না বলেই, সাক্ষরতা আন্দোলনের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও এঁরা সামিল করে নিলেন। গত বছর ১২ই আশ্বিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুণ্যজন্মদিনে কলেজ স্কোয়্যারে সাক্ষরতা আন্দোলনের কর্মীরা যে-অনাড়ম্বর উৎসবের আয়োজন করেছিলেন, তাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন বাঙলাদেশের জনসাধারণের কাছে বিদ্যাসাগর জন্ম-সার্ধশতবার্ষিকী পালনের জন্য এক আন্তরিক আবেদন জানিয়েছিলেন। বাঙলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান আজ আর আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যাঁরা অনীহা বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করে থাকেন, তাঁদের বর্ণ-পরিচয়ও সম্ভবত 'বর্ণ-পরিচয়' থেকেই। অথচ উপাচার্যের আবেদনের পর সাত মাস কেটে গেছে, আজও কোনো স্তরে কোনো রকম উদ্যোগ আয়োজন চোখে পড়ছে না। ধরে নেয়া যেতে পারে, এই মুহূর্তে সাক্ষরতা আন্দোলনের কর্মীরা ছাড়া বিদ্যাসাগরকে নিয়ে কারোর মাথা ব্যথা নেই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কপাল মন্দ। তাঁর শতবার্ষিকীতে দেশে শতবার্ষিকীর রেওয়াজ শুরু হয়নি। আর, ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতেও তাঁর রচনা আর কর্মের নব মূল্যায়ন করবার,

ঘরে ঘরে তাঁর কর্মধারাকে ব্যাপ্ত করে দেবার কোনো প্রচেষ্টাই পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সম্ভবত আমাদের দেশের অগ্রগতির সঙ্গে তিনি তাল রাখতে পারেননি। একটু পুরনো হয়ে গেছেন!

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনকে সভাপতি করে এই কনভেনশন থেকে 'পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি' নামে একটি কমিটিও গঠন করা হলো। এই কমিটি আগামী এক বছরের জন্য নিম্নলিখিত ১৫ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন:

(১) নিরক্ষরতা দূরীকরণের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি সংগঠন এবং নরনারীকে এই কনভেনশন থেকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করা।

(২) নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে জাতীয় উদ্যোগ সংগঠিত করবার জন্য ব্যাপক জনমত গঠন করা।

(৩) আগামী এক বছরের মধ্যে অন্তত ১৫০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা।

(৪) আন্দোলনকে প্রতিটি জেলায় ছড়িয়ে দেবার জন্য জেলা সংগঠন গড়ে তোলা; প্রথম দফায় অন্তত প্রতিটি জেলায় অন্তত একটি আদর্শ বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করা।

(৫) আন্দোলন সম্পর্কে প্রতিটি শিক্ষিত মানুষকে সজাগ করার জন্য আন্দোলনের গতি-প্রগতি নির্ধারণের জন্য, একটি মুখপত্র প্রকাশ করা।

(৬) সদ্য-সাক্ষরদের উপযোগী সাহিত্য প্রকাশ করা।

(৭) নিয়মিত বয়স্ক শিক্ষা শিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করা।

(৮) প্রাক-সাক্ষরতা স্তর থেকে কার্যকরী শিক্ষার স্তর পর্যন্ত একটি সুচিন্তিত সিলেবাস তৈরি করা।

(৯) এই সমস্ত কিছুরই মূল্যায়ন ও বৈজ্ঞানিকীকরণের জন্য একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।

(১০) পঠন-পাঠন কর্মসূচীকে সজীব ও আকর্ষণীয় করার জন্য পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। Mass mediaকে যতদূর সম্ভব ব্যবহার করা।

(১১) 'জাতীয় সেবা প্রকল্প' (National Service Scheme)-এর কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করা।

(১২) [illegible]

(১৩) সাক্ষরতা প্রসারে সরকারী ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করা।

(১৪) বিভিন্ন সময়ে সাক্ষরতার বিভিন্ন সমস্যা ও দিক নিয়ে আলোচনা-সভার আয়োজন করা।

(১৫) সাক্ষরতা অভিযানে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য পুরস্কার দান।

কনভেনশনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা যে-উৎসাহ এবং ধৈর্যের সঙ্গে কনভেনশনকে সফল করেছেন, তা যদি পূর্বাপর বজায় থাকে, তবে আশা করা যায়, বাঙলাদেশে সাক্ষরতা আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সত্যিই আর অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকবে না।

স্বপ্না দেব

বিশ্ব-শিক্ষা-সম্মেলন

ইউনেস্কো ১৯৭০ সালকে শিক্ষাবর্ষ বলে ঘোষণা করেছে। সারা বিশ্বের শিক্ষক সমাজ বিশ্ব-শিক্ষক সংস্থা (FISE)-র নেতৃত্বে শিক্ষাবর্ষকে পালন করল বিশ্ব-শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ছয় থেকে দশই এপ্রিল জি ডি আর-এর রাজধানী বার্লিন শহরে। ১৯৭০ আবার লেনিনের জন্মশতবার্ষিকী বছর। তাই এগারোই এপ্রিল বিশ্বের শিক্ষক সমাজ লেনিনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন লেনিন ও শিক্ষা এই বিষয়ের ওপর একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। বারোই এপ্রিল শিক্ষকরা মিলিত হলেন এক সংহতি কনভেনশনে। তাঁরা সংহতি ঘোষণা করলেন অমর ভিয়েতনামের সংগ্রামী শিক্ষক ও শ্রমজীবী মানুষদের সঙ্গে; প্যালেস্টাইন ও অন্যান্য আক্রান্ত আরব দেশের শিক্ষকদের সঙ্গে; কিউবা, উত্তর কোরিয়া এবং পূর্ব জার্মানির শিক্ষকদের সঙ্গে; লাতিন আমেরিকা ও আফ্রো-এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে। সমস্ত দেশেই মেহনতী মানুষকে হিংস্র সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

[illegible] জার্মান জাতি অতিথি-

ছিল একসঙ্গে বারোটি ভাষায়। অর্থাৎ যে-কোনো প্রতিনিধি বেতার-তরঙ্গ মাধ্যমে যে-কোনো ভাষার বক্তৃতা ঐ বারোটি ভাষার মধ্যে তার পছন্দমতো যে-কোনো একটি ভাষায় তাৎক্ষণিক অনুবাদ মারফৎ শুনতে পেতেন। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল বার্লিনের সেরা আন্তর্জাতিক হোটেল 'বেরোলিনায়া' এবং 'উন্তের দেন লিন্দেন্' (লেবুগাছের নিচে)-এ।

সম্মেলন নিজেকে চারটে কমিশনে বিভক্ত করে তার কাজ পরিচালনা করে। চারটি কমিশনের আলোচ্য বিষয় ছিল [১] কারিগরী বিদ্যা ও বিজ্ঞানের যুগে শিক্ষা এবং শিক্ষকদের ভূমিকা [২] শিক্ষার গণতন্ত্রী-করণ [৩] শিক্ষকের সামাজিক সম্মান ও আর্থিক নিরাপত্তা [৪] শিক্ষকের যোগ্যতাবৃদ্ধি ও শিক্ষক শিক্ষণ। এই চারটি কমিশন প্রচুর আলোচনা ও বিতর্কের পরে সম্মেলনের কাছে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। দশই এপ্রিল সম্মেলনের প্লেনাম এই চারটি কমিশনের সিদ্ধান্ত ছাড়াও পাশ করে 'পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষকদের নিকট আবেদন'। এই আবেদনে প্রধানত বলা হয় যে শিক্ষক তার পেশা অনুযায়ী শ্রবজীবী জনগণের অংশ। শ্রমিক ও কৃষক তার নিকটতম মিত্রশ্রেণী। শিক্ষায়তন এবং শিক্ষাব্যবস্থা সমাজ পরিবর্তনের এক শক্তিশালী অস্ত্র। শিক্ষককে এবং শিক্ষক প্রতিষ্ঠানকে তাদের কার্য পরিচালনা করতে হবে প্রয়োজনীয় শ্রেণীসচেতনতার সঙ্গে। শিক্ষক সংগঠনের কাজ হলো গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিরলস সংগ্রাম করা, আর গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার অর্থ হলো এমন শিক্ষা-ব্যবস্থা—যেখানে প্রতিটি শিশু সর্বোন্নত শিক্ষার সুযোগ পাবে। জাতিগত, ধর্মীয়, বর্ণগত কোনো বৈষম্য এর অন্তরায় হবে না। সর্বোচ্চ শিক্ষালাভে আর্থিক অক্ষমতা বাধা সৃষ্টি করবে না। কিন্তু গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোয় সম্ভব নয়। তাই শিক্ষক সংগঠনকে সংগ্রাম করতে হবে গণতন্ত্রের জন্য, শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য। পুঁজিবাদী দেশে, বিশেষ করে অনুন্নত দেশে, শিক্ষকদের চাকরিতে আইনগত বা আর্থিক নিরাপত্তা বা সামাজিক সম্মান কোনোটাই নেই। ব্যক্তি-মালিকানায় পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক বিত্তবানের ভৃত্যের পর্যায়ভুক্ত। শিক্ষক সংগঠনগুলোকে এক্ষেত্রে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে শ্রমিক ও অন্য শ্রমজীবী মানুষের সহযোগিতায়। এর জন্য ব্যাপক প্রচার, ধর্মঘট এবং অন্যান্য সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হতে পারে।

শিক্ষককে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের সুযোগ দিতে হবে যাতে সে নিজের বিষয়ে সর্বোচ্চ বিদ্যা অধিগত করতে পারে। সম্মেলন আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (ILO)-এর কাছে আবেদন করেছে-যেন অবিলম্বে শিক্ষকদের সম্পর্কে আন্তর্জাতিক শালিসি সভা (International Consultative Commission) প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমস্ত দেশের সরকার যেন ILO, UNESCO-র ১৯৬৬র যুক্ত সুপারিশ কার্যকর করে। পরিশেষে সব শিক্ষকদের ভবিষ্যত মানবজাতির প্রতি তাদের দায়িত্বের কথা; নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার, সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাদের নিরলস সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব বিষয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর এবং সেখানকার শিক্ষার ও শিক্ষকদের অগ্রগতির কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করা হয়েছে।

সম্মেলন, আলোচনাচক্র এবং সংহতি কনভেনশনের পর আমরা গেলাম জি ডি আর ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে শহরে স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ওদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার মানুষ আমরা আমাদের শিক্ষকতার ও শিক্ষা আন্দোলনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে শিখলাম অনেক দেখলাম জানলাম আরও বেশি।

মৃন্ময় ভট্টাচার্য

আনা লুই স্ট্রং

সম্প্রতি বিপ্লবী সাংবাদিক এবং সোভিয়েত ও চীন বিপ্লবের ভাষ্যকার আনা লুই স্ট্রং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আনার জন্ম ১৮৮৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেব্রাস্কায়। ১৯২১ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সদ্যবিপ্লবসমাপ্ত রুশ দেশে তখন চলেছে মানব-ইতিহাসকে নতুন মর্যাদা দেবার মহাযজ্ঞ। বিশ্বের মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা প্রথমেই এই মহাবিপ্লবের তাৎপর্য অনুধাবন করেছিলেন, শ্রীযুক্তা আনা লুই স্ট্রং তাঁদের একজন। রুশ দেশের চতুর্দিকে তখন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন ; ভেতরে চলেছে পুরনো আমলাতন্ত্রী, জমিদার, পুঁজিপতি, প্রতিক্রিয়াশীলদের শ্বেত-সন্ত্রাস, শ্বেত-রক্ষীদের আক্রমণ। একদিকে গৃহযুদ্ধ ও আগ্রাসন ; অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মৃত্যু শিশু-সোভিয়েতকে ভেতরে বাইরে পিষে মারতে চায়। আর তখনই ১৯২১ সালে আনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে 'আমেরিকার মিত্র সেবাদল বাহিনী' নিয়ে রুশিয়ায় ছুটে এলেন। আনা হয়ে উঠলেন বিপ্লবের সহমর্মী, বিপ্লবের সাংবাদিক, ভাষ্যকার। দুনিয়া জুড়ে সোভিয়েত-বিরোধী প্রচারের বিরুদ্ধে তিনি কোমর বেঁধে দাঁড়ালেন, প্রতিষ্ঠা করলেন 'মস্কো নিউজ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা। বহু দেশের মানবদরদী বহু মনীষী 'মস্কো সংবাদ'-এর কাছে সত্য খবর জানতে পারলেন। রমা রঁলা, এইচ. জি. ওয়েল্‌স, বার্নাড শ, টমাস মান, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, আঁদ্রে জিদ, মরিস হিনডাস প্রভৃতি মনীষীরা কুৎসার কুয়াশা ভেদ করে নতুন রুশের নবজাতক মূর্তিটি দেখতে পেলেন। আনা সেই থেকে সোভিয়েত ভূমিতে রয়ে গেলেন। নতুন সভ্যতার তীর্থভূমি শোষণমুক্ত সোভিয়েত সমাজতন্ত্র। সোভিয়েত ভূমিতে বসেই তিনি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির লেনিনবাদী কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করলেন। দেখলেন, ইওরোপে জার্মানি-ইতালিতে সাম্রাজ্যবাদ কি বীভৎসরূপ ধরে এলো ফ্যাসিবাদ-নাৎসীবাদের সভ্যতাঘাতী দমনরাজ বন্দুকরাজ হয়ে। প্রজাতন্ত্রী স্পেনের মাটিতে ফ্যাসি-বাদীরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ড্রেস-রিহার্সালের মহড়া দিল। দেখলেন, তরুণ সোভিয়েত ভূমির বিরুদ্ধে পশ্চিমী গণতন্ত্রের বাক্যবাগীশের দল কেমন করে দস্তুর ফ্যাসিবাদকে আক্রমণের জন্য ঠেলে দিতে চাইল। ভার্সাই চুক্তির

শবাধারে গণতন্ত্রের শবদেহ রাখার অভিযানে মত্ত পাশব শক্তি ফ্যাসিবাদের দাপট তিনি দেখলেন। সেই রূঢ় রাজনৈতিক ঝড়-বাদলে তিনি পথ হারালেন না। আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন মুক্ত মানবতার তীর্থ-ক্ষেত্র সোভিয়েত ভূমিকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে আনা লুই স্ট্রং জনযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক হয়ে উঠলেন।

তারপর ১৯৪৫এ রাইখস্টাগে লাল পতাকা উড়ল। যুদ্ধ শেষ। শান্তি এলো। এরপর ঠাণ্ডাযুদ্ধের যুগ। স্তালিন তখন ক্ষমতার উচ্চশিখরে। ব্যক্তিপুজার অন্ধ সংস্কারের বন্ধনে তখন তিনি সজ্ঞানে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। লেনিনগ্রাদ-মস্কো-স্তালিনগ্রাদের বিজয়ী স্তালিন সন্দেহ-সংশয়ে শঙ্কিত বিপর্যস্ত। আর সেই স্তালিনের অধঃপতনের যুগে চঞ্চল হয়ে উঠলেন আনা। মর্মবেদনায় বিক্ষত তিনি পা বাড়ালেন মহাচীনের দিকে। তাঁর পরিচয় হয়েছিল ইতিপুর্বেই মাও সে তুং, মাদাম সুং চিং লিং, চু তে, লিও সাও চি, চু এন লাই-এর সঙ্গে। স্তালিন-শাসনের শেষ পর্যায়ে মর্মাহত আনার ভাগ্যে আরও কিছু বাকি ছিল। পশ্চিমী দেশের গুপ্তচর সন্দেহে আনা সোভিয়েত ইউনিয়নে বন্দী হলেন! দুনিয়া জুড়ে প্রগতিবাদী মানুষ এ-খবরে হতচকিত হলেন। মুক্তিও পেলেন তিনি। মুক্তির পর আনা কেবল বললেন, "আমার প্রতি অবিচার হয়েছে।" আর কিছু নয়। পাছে তাঁর কথা নিয়ে পশ্চিমী শক্তিরা সোভিয়েত-বিরোধী কুৎসা ছড়ায় —তাই কিছুই আর তিনি বললেন না!

আনা লুই স্ট্রং এবার এলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তখন রোজেনবার্গ দম্পতির বিরুদ্ধে মার্কিন সরকার গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ এনে বিচার প্রহসন চালাচ্ছে। আনা এই শান্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দম্পতিকে মুক্ত করার জন্য মামলা চালাবার অর্থ-সংগ্রহের কাজে সক্রিয় অংশ নিলেন। তাঁর প্রতি অবিচার হয়েছে—এ-কথা ঠিক। কিন্তু সেই বেদনায় তিনি সোভিয়েত ভূমিকে বর্জন করলেন না। আমৃত্যু রইলেন সোভিয়েতের বন্ধু। রোজেনবার্গ দম্পতির মুক্তির লড়াইয়ে অংশ নিয়ে এবং সোভিয়েতের প্রতি একনিষ্ঠ থেকেই তিনি স্তালিনের অন্যায়ের জবাব দিলেন!

দ্বিতীয় প্রতিবাদ আরও বিস্ময়কর। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে নিকিতা খ্রুশ্চোভ যখন ব্যক্তিপুজার অধঃপতনের যুগে স্তালিনের বহুবিধ অন্যায় কাজ প্রকাশ করলেন, তখন তার ফলে দুনিয়া জুড়ে

প্রগতিশীল মানুষের মধ্যে কিছু কিছু বিভ্রান্তিও দেখা দিল। আর ব্যক্তিপুজার প্রতিবাদ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কেউ কেউ সোভিয়েত গঠন ও মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে স্তালিনের অবদানই তুচ্ছ করতে শুরু করলেন। তখন বেরোল আনার 'স্তালিনের যুগ'। তাতে তিনি লিখলেন :

"I think that, looking back, men will call it 'The Stalin Era.' Tens of millions of people built the World's first socialist state but he was the engineer. He first gave voice to the thought that the peasant land of Russia could do it. From that time on, his mark was on all of it on all the gains and all the evils.

"To my friends of the west, I would say: this was one of history's great dynamic eras, perhaps its greatest. It changed not only the life of Russia but of the world. It left no man unchanged of those who made it. It gave birth to millions of heroes and to some devils. Lesser-men can look back on it now and list its crimes. But those who lived through the struggle and even many who died of it, endured the evil as part of the cost of what was built.

"Nor for this only. The Stalin Era built not only the world's first socialist state and the strength that stopped Hitler. It built the economic base for all those Socialist states today in which are one third of mankind."

১৯৫৪ সালে তিনি চীন দেশে স্থায়ীভাবে বাস করতে এলেন। মহাচীন পুনর্গঠনের মহাবিপ্লবের তিনি একজন সক্রিয় অংশীদার হলেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'দি চাইনিজ কন্‌কার চায়না' ও 'দি ওয়াইল্ড রিভার' চীনের নবজাগরণের এক নিখুঁত শিল্পপ্রয়াস

আনা লুই স্ট্রং একদিক দিয়ে সত্যই ভাগ্যবতী। সোভিয়েত বিপ্লব, পরিকল্পনা, মহা দেশপ্রেমিক যুদ্ধ যেমন তিনি মনপ্রাণ দিয়ে জেনেছেন; তেমনি চীনের বিপ্লব ও পুনর্গঠনের তিনি অংশভাগিনী। আধুনিক ইতিহাসের এই বিপজ্জনক ও দুঃসাহসিক বাঁক সার্থকভাবে অতিক্রম করেছেন আনা লুই স্ট্রং। জন রীড, লিনকন স্টিফেন, অ্যানি স্মিডলি, বার্চেট ও এডগার স্নো—এই বিখ্যাত বিপ্লবসাধক সাংবাদিকদের সঙ্গে আনা লুই স্ট্রং আমাদের যুগের বহুবিধ সাংবাদিক-বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে মানবতার পক্ষে স্পষ্ট অঙ্গীকার। আনা লুই স্ট্রং-এর মৃত্যুতে আমরা শোকার্ত। শ্রদ্ধাবনত।

শান্তিময় রায়

'পরিচয়' পৌষ সংখ্যায় শ্রীজ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীতরুণ সেন 'পরিচয়'-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত মদীয় রচনা 'লেখকদের শ্রেণী বিচার' প্রবন্ধের কোনো কোনো বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিবাদ বা প্রত্যালোচনা সব সময়ই সুস্বাগতম্, কেননা এর দ্বারা বোঝা যায় রচনার উদ্দিষ্ট বক্তব্য অন্তত কিছু পাঠকের মনকে নাড়া দিয়েছে এবং তাঁদের মতামত অনুকূল বা প্রতিকূল যা-ই হোক তাঁদের ভাবনাকে তা উদ্রিক্ত করেছে। লেখক তো তা-ই চান—পাঠকের মনে চিন্তার তরঙ্গ তোলা, তাঁর ভাব-ভাবনাকে আলোড়িত করা। লেখকের কাছে এর চেয়ে বড়ো কাম্য আর কী হতে পারে যে তাঁর লেখা নিয়ে লোকে অন্তত কিছুক্ষণ ভাবুক, তদন্তর্গত প্রতিপাদ্যের সমর্থনে অথবা প্রতিকূলে কিছুক্ষণ ব্যাপৃত থাকুক। গুচ্ছের লেখা হলো অথচ তা-ই নিয়ে লোকের মনে কোনো সাড়াই জাগল না এমন অবস্থা কোনো লেখকের পক্ষেই শ্লাঘাকর নয়।

সুতরাং প্রতিবাদীদের আলোচনায় আমি খুব খুশী হয়েছি। আমার আত্মাভিমানকে তৃপ্ত করার জন্যে মনে মনে আমি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়েরা চান যে আমি ওই দুটি প্রতিবাদের উত্তরে কিছু লিখি। ওই তো ওঁরা মুশকিল বাধালেন। কেউ প্রতিবাদ করলেই সে-প্রতিবাদের আবার প্রতিবাদ করতে হবে—এ-যে বড়ো সমস্যার কথা হল। সাহিত্য পত্রিকার নিয়মে এমন কি কোনো বিধান আছে যে, লেখকের পক্ষে তাঁর বক্তব্য নিবেদন করাটাই যথেষ্ট নয়, ওই বক্তব্য সম্পর্কে কেউ যদি লিখিতভাবে কোনো অভিমত প্রকাশ করেন তো এমনতরো প্রতিটি আলোচনার বেলায় লেখককে আবার প্রত্যালোচনার জন্য কলম ধরতে হবে? লেখককে জেরবার করবার এ-একটি সম্পাদক-রচিত সযত্ন ফাঁদ নয় কি? একে তো বর্তমান লেখক এমনিতেই কুঁড়ের হদ্দ, মূল লেখাই তার কলম থেকে সহজে বেরুতে চায় না, তার উপরে যদি আবার তাকে নূতন লেখার প্রতিবাদের প্রতিবাদ লিখতে হয়—তবে তো তা কুঁড়েমির আরাম কাটাবার একটা বাধ্যতামূলক ব্যায়াম হয়ে যায়। হায়, লেখককে কাবু করতে সম্পাদকের মনে এই ছিল! এমন জানলে আদৌ কি আমি কলম ধরতুম!

কিন্তু আপশোস করে লাভ নেই। তীর যখন একবার ছোঁড়া হয়েছে,

সে-তীর আর তূণীরে ফিরে আসবে না। লেখকদের শ্রেণীবিচার করতে বসে একবার যখন মনোজাত ভাবনাকে ভাষাগত রূপ দিয়েছি, তখন আর তা আমার আয়ত্তের মধ্যে নেই, তা সকলের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে গেছে। সকলের—অর্থাৎ আলোচনায় যাঁরা ইচ্ছুক, তাঁদের। সুতরাং ছাপা সামলানোর জন্য তৈরি থাকতে হবে বইকি। দুম করে লোকের মাথা তাক করে একটা বক্তব্য ছুঁড়ে দেব, আর সে-বিষয়ে কেউ কিছু বলতে চাইলে হাত গুটিয়ে নেব, মুখে কুলুপ আঁটব—তা তো হয় না। সাহিত্যক্ষেত্রে এমন আবদারকে কেউ প্রশ্রয় দেবে না। কাজেই সম্পাদকদ্বয়ের ফরমায়েস পালন না করে উপায় কী! এ তো ফরমায়েস নয়, হুকুম। হুকুম তামিল না করে যে মানে মানে সটকে পড়ব, তার পথ তো নিজের হাতেই বন্ধ করে দিয়েছি ওই মূল লেখাটি কলমস্থ ও পত্রস্থ করে। অতএব মাভৈঃ "বাঁচি ক মরি" করে উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক বিতর্কে নেমে পড়া যাক।

প্রথমে শ্রীজ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

আমি লেখকদের শ্রেণীবিচার করবার চেষ্টা করেছিলাম মূলত তাঁদেব দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে। যেমন রাজনীতিবিমুখ অথবা রাজনীতি-সচেতন ঐতিহ্যবাদী সাহিত্যিক; অগ্রসর চিন্তার ধারক ও বাহক প্রগতিশীল কিন্তু দুর্বল ঐতিহ্যচেতনাসম্পন্ন সাহিত্যিক; গান্ধীবাদী সাহিত্যিক; সংবাদপত্র-সেবী ও সংবাদপত্র-সেবিত সাহিত্যিক; অ্যাকাডেমিক ধারার অর্থাৎ অধ্যাপকীয় গোত্রের লেখক। আমার এই শ্রেণাবিভাগ হয়তো লেখকদের বিজ্ঞান-সম্মত বর্গীকরণের কোঠায় পড়ে না, কিন্তু আমার বিনীত অভিমত এই যে, বাঙলা সাহিত্যে বর্তমানে লেখকদের মধ্যে যে-ধরনের গোষ্ঠীবদ্ধতা মেলামেশা আকর্ষণ-বিকর্ষণের পালা চলছে—তার মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য প্রতিফলন উপরের ঐ শ্রেণীবিভাগের মধ্যে পাওয়া যাবে।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় আমার শ্রেণীবিভাগের নীতিতে আপত্তি তুলেছেন। তিনি বলেছেন, "আমার মনে হয়, লেখকের শ্রেণীবিভাগ করা উচিত অন্য মানুষের শ্রেণীবিভাগ যে-পদ্ধতিতে করা হয়, সেই পদ্ধতিতেই। অর্থাৎ ধন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের শ্রেণীচরিত্র নির্ধারণের ভিত্তিতে। লেখকদের সম্পর্কেও সেই একই কথা।" তাঁর এই শ্রেণী-বিভাগ হয়তো আদর্শ শ্রেণীবিভাগ, কিন্তু তাঁর এই আদর্শ অনুযায়ী লেখক-

দের শ্রেণীচরিত্র নির্ধারণের কাজ আজ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে সাধিত হয়েছে কি? "কি হওয়া উচিত" আর "কী আছে" এই দুই অবস্থার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। জ্যোতির্ময়বাবু যে-শ্রেণীবিভাগের কথা বলেছেন, তা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হলে খুবই সুখের কথা হত। কিন্তু সত্যিই কি তেমন ধারার শ্রেণীবিভাজন আমাদের লেখকদের মধ্যে চোখে পড়ছে? কই, আমার এই সাদা চোখে তো তেমন স্বর্গীয় দৃশ্য কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। তেমন দৃশ্য চোখে পড়লে দেখে চোখ জুড়নো যেত।

আসলে, জ্যোতির্ময়বাবুর অভীপ্সিত আদর্শের সঙ্গে আমার বিরোধ নেই। হয়তো তাঁর কথাই ঠিক, হয়তো তাঁর মাপকাঠি অনুযায়ী লেখকদের শ্রেণীবিচার হলে সেটাই বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিচার হত; কিন্তু জিজ্ঞাস্য, তেমন শ্রেণীবিচার আজও হয়েছে কি? শ্রেণীবিচার তো পরের পরের কথা, সে-প্রশ্ন দেখা দেবে যখন লেখকেরা একটা বিশেষ রীতিতে বা ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ হবেন; কিন্তু সত্যিসত্যি লেখকেরা তেমন ভাবে (অর্থাৎ ধন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার ভিত্তিতে) শ্রেণীবদ্ধ হয়েছেন কি? আমার তো মনে হয়, একেবারেই হননি। তবে আর আদর্শ শ্রেণীবিভাগের কথা বলে লাভ কি?

মদীয় শ্রেণীবিচারের ভিত্তি বিজ্ঞানোচিত না হতে পারে, তাতে অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে, থাকতে পারে অদর্শন ও অতি-দর্শনের ত্রুটি, কিন্তু এ-কথা বললে আশা করি আত্মাভিমানের দায়ে পড়ব না যে, পশ্চিমবঙ্গে লেখকেরা বর্তমানে যে-কটি মূল ধারায় বিভক্ত—তার একটা মোটামুটি প্রতীতিযোগ্য ছবি আমার বর্গীকরণের মধ্যে পাওয়া যাবে। মানলুম এটা বিজ্ঞানসম্মত বর্গীকরণ নয়, মানলুম এর ভিতর আদর্শ শ্রেণীবিচারের লক্ষ্য অস্পষ্ট রয়েছে, কিন্তু যা চোখের উপরে রয়েছে তাকে না দেখে বা এড়িয়ে গিয়ে আদর্শ শ্রেণীবিভাজনের কথা বললেই কি সেটা সত্যকথন হত?

জ্যোতির্ময়বাবু তো ধন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লেখকের শ্রেণীবিচার হওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তিনি বুকে হাত দিয়ে বলুন তো কার্যক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ কোথাও অনুসৃত হয়েছে কিনা। বাঙলা সাহিত্যে এই ভিত্তিতে লেখকেরা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছেন কিনা।

বরং আমি তো দেখি নানা উল্টোপাল্টা চিত্র—নানা গোঁজামিলের কারসাজি। ধনিকশ্রেণী থেকে যে-লেখক উদ্ভূত হয়েছেন, বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা যাঁর রক্তে—তিনি হন সাম্যবাদের প্রবক্তা; আর যে-লেখক দারিদ্র্যের বেদনার মধ্যে জন্মেছেন এবং দারিদ্র্যকেই জীবনের নিত্যসঙ্গী করেছেন—তিনি সামাজিক অন্যায়, শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-মুখর হলেও তাঁকে অনুচিতভাবে ঠেলে দেওয়া হয় রক্ষণশীল লেখকদের কোঠায়, যেহেতু কিনা তিনি সাহিত্যের অগ্রগতি বিধানে ঐতিহ্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন! যদি বলা হয়—ধনিকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত লেখক হলেই যে তিনি অপরিবর্তনীয় ও অনিবার্যভাবে ধনিক স্বার্থের প্রতিভূ লেখক হবেন এমন তো কোনো কথা নেই, মনোভাবের দিক দিয়ে তিনি সমাজতন্ত্রী তথা সাম্যবাদী প্রত্যয়ের প্রবক্তাও হতে পারেন; কারও একটা বিশেষ শ্রেণীতে জন্মানোটাই তো চরম কথা নয়, সঙ্কল্প ও চেষ্টা দ্বারা আপনাকে স্বীয় শ্রেণীর মানসিকতা থেকে বিচ্যুত করে তাঁর পক্ষে declassed হওয়া কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়।

এই কথার উত্তরে বলব যে, অসম্ভব ব্যাপার হয়তো নয়, কিন্তু তেমন ঘটনা আমাদের দেশের লেখকদের মধ্যে এখনও ঘটেনি বলেই আমার ধারণা। ইওরোপের শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে বোধহয় কিছু কিছু এ-জাতীয় ঘটনার নজির আছে, যদিও সে-বিষয়ে আমি খুব সুনিশ্চিত নই; তবে আমাদের সাহিত্যে এমনতরো এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত বা অবনীত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি—এ-কথা একপ্রকার নির্দ্বিধায়ই বলা যায়।

বরং বিপরীত চিত্র আছে। কেউ যদি অপরাধ না লন তো বলি, আমাদের দেশের সাহিত্যেই বোধ করি এ-রকম অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দেখানো যাবে যে, সারাটা জীবন বহাল-তবিয়তে সরকারী চাকরি ও বুর্জোয়া জীবনযাত্রার ধারায় জীবন পরিচালনা করে এবং অবসরান্তে পেন্সনের ভোগী হয়েও অক্লেশে বামপন্থী শিবিরের পুরোভাগে থাকা যায়। কায়েমী স্বার্থের পোষক আর স্থিতাবস্থার রক্ষক যে-সরকার, তার অধীনে কার্যরত থাকার সুবিধাদির পানটি থেকে চুনটি পর্যন্ত খসাতে হচ্ছে না, এদিকে ঝাণ্ডা হাতে 'দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ' 'গণতন্ত্র বাঁচাও' কিংবা 'ভিয়েতনাম দিবস'-এর মিছিলের সামিল হতেও আটকাচ্ছে না—এ-জাতীয় আশ্চর্য সহাবস্থান বুঝি আমাদের দেশেই সম্ভব। পৃথিবীর কুত্রাপি সম্ভবত এমন "গাছের খাওয়া" এবং "তলার

কুড়ানো" রূপ অবিশ্বাস্য দ্বৈধতার নজির নেই। "ভুড়ও খাব, টামাকও খাব", সরকারী (ইংরেজ ও কংগ্রেসী আমলের) চাকরিও করব, আবার সাম্যবাদও করব—দুটো জিনিস, সবিনয়ে নিবেদন করি, একসঙ্গে হয় না।

যদি বলেন জীবিকার খাতিরে কোনো-না-কোনো কাজ করতেই হবে' তা সে সরকারী কাজই হোক বেসরকারী কাজই হোক ; তার জবাবে বলব— এই যুক্তি সচেতন বুদ্ধিজীবী আর শিল্পী-সাহিত্যিকদের বেলায় অন্তত খাটে না। শিল্পকর্ম একটা ব্রত, একটা সাধনা, শিল্পীর গোটা অস্তিত্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ; তা নিয়ে হেলা-ফেলা করা চলে না। আর চলে না বলেই বি· াসের ঘরে ফাঁকি রেখে সেখানে দু-নৌকোয় পা দেওয়ার উপায় নেই। নিজের প্রতি খাঁটি আর স্বকীয় সাধনার প্রতি একনিষ্ঠ হতে গেলে সেক্ষেত্রে অন্য নৌকোটিকে পা দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়ে একটিমাত্র নৌকোকেই আশ্রয় করতে হবে। বুর্জোয়া-জীবনসুলভ সরকারী চাকরি আর সাম্যবাদ—দুইয়ের ভিতর রফার কোনো অবকাশ নেই। বিপ্লবপূর্ব রুশ সাহিত্যের ইতিহাস আমার যতদূর জানা, সেদেশে জারতন্ত্রের বিরোধী এমন একজন কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সমালোচক দেখানো যাবে না যিনি কিনা একই সঙ্গে বিপ্লবী সাহিত্য আর জারতন্ত্রের সেবা করেছেন। বিপ্লবী রুশ লেখকেরা বুকের রক্ত দিয়ে সাহিত্যের সেবা করতেন, তাঁদের পক্ষে অন্য কিছুর বা অন্য কারুর সেবা করা সম্ভব ছিল না। আর এদেশে? পেন্সনভোগী আই-সি-এস লেখকের মুখেও স্বাধীন আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গালভরা বুলি শোনা যায়, দেখা যায় কখনও কখনও প্রগতিশীল শিবিরভুক্ত লেখকদেরও ধনতন্ত্রের তল্পিবাহক খবর-কাগজে বাজারী লেখকদের গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে চলতে। বাঙলাদেশের সামাজিকতার অভ্যাস এক সাংঘাতিক ব্যাধি। তা এ-দল ও-দলের সম্পর্ককে গুলিয়ে দেয় এবং দলমতবিশ্বাস নির্বিশেষে সকল লেখককে এক বিভ্রান্তিকর আত্মীয়তার হরিহর ছত্রের মেলায় এনে হাজির করে। আত্মীয়তাটাকে 'বিভ্রান্তিকর' বললুম এজন্য যে, যে-আত্মীয়তা প্রীতিচর্চার অজুহাতে শিল্পীর স্বধর্মকে ভুলিয়ে দেয়, তার ন্যায় ক্ষতিকর আর কিছু নেই।

এই তো হলো বাঙলা সাহিত্যের হাল। এমতাবস্থায় জ্যোতির্ময়বাবু লেখকদের শ্রেণীবিচারের যেসব norm বা আদর্শ নির্দিষ্ট করেছেন, কার্য-ক্ষেত্রে তার সার্থকতা কোথায়? ধনোৎপাদন আর ধনবণ্টন পদ্ধতির

ভিত্তিতে কোথায় কবে কখন আমাদের সাহিত্যে লেখকের শ্রেণীবিভাগ হয়েছে ? বরং মদীয় শ্রেণীবিচার যতই অসম্পূর্ণ আর ত্রুটিযুক্ত হোক, তার একটা বাস্তব ভিত্তি আছে এবং সেই আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই শ্রেণী-বিচারকে সমর্থন করে। জ্যোতির্ময়বাবুর কথিত আদর্শটি হয়তো সত্যি, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই সত্যি ; কিন্তু বিনীতভাবে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেব তাঁর শ্রেণীবিভাজন কিতাবী গন্ধযুক্ত, আমাদের সাহিত্যের বাস্তব স্থিতি তার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের এই বাস্তব স্থিতি সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন এবং তা যে ছিলেন তার প্রমাণ জীবনের সায়াহ্নে রচিত তাঁর 'ঐকতান' কবিতাটি। ওই কবিতায় স্পষ্টই তিনি লিখেছেন, "কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন. কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন, যে আছে মাটির কাছাকাছি" তেমন কবিরা এখনও পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেননি। তেমন কবির জন্যে তিনি কান পেতে ছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের উনত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাঁর সে-প্রত্যাশা আজও বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেনি। কৃষকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত একজন সত্যিকারের কবির আজও অবধি আমরা দেখা পাইনি। শ্রমিকশ্রেণীর দুঃখ-বেদনা নিয়ে বাঙলায় বহুতর কবিতা ও ছোটগল্প লেখা হচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে-সকল রচনার নিরানব্বই ভাগই বোধকরি শ্রমিকশ্রেণীর দুঃখে বিগলিত চিত্ত মধ্যবিত্ত লেখকের লেখনপ্রসূত। এমন বলব না যে এ-সব 'নকল' বা 'সৌখিন মজদুরি'র দৃষ্টান্ত, কিন্তু এ-সত্য কোনোমতেই বিস্মৃত হওয়া চলে না যে, ওই রচনাগুলি শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা নয়। একজন অদ্বৈত মল্লবর্মণ কিংবা একজন গুণময় মান্নাকে দিয়ে গোটা বাঙলা সাহিত্যের স্বরূপ-লক্ষণ নির্ণয়ের চেষ্টা করলে মস্ত ভুল করা হবে।

এইবারে শ্রীতরুণ সেন-এর পত্রটির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

শ্রী সেন তাঁর পত্রে আমার প্রবন্ধে ব্যক্ত মতামতগুলিকে "পরস্পর বিরোধী" আখ্যা দিয়ে পত্রের আবরণে নাতিদীর্ঘ এক নিবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর সকল যুক্তির উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ তা করতে গেলে দীর্ঘ প্রবন্ধ ফাঁদতে হয়। ইতোমধ্যেই লেখা বেশ বড়ো হয়ে গিয়েছে। শুধু তাঁর একটি উক্তি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই এবং আমার মনে হয়

ওই আলোচনায় তাঁর উত্থাপিত সব কয়টি আপত্তিরই সূত্রাকার জবাব রয়েছে।

কথাটা উঠেছে 'পরিচয়' কিংবা অনুরূপ প্রগতিশীল অগ্রসর ভাবের কাগজগুলি সম্পর্কে। আমার প্রবন্ধে এই পত্র-পত্রিকাগুলির আদর্শের সানুরাগ প্রশংসা ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই মৃদু নালিশ ছিল যে এঁদের অগ্রসর ধারণা-ভাবনার সঙ্গে সমানুপাত রক্ষা করে এঁদের ঐতিহ্যের চেতনা যদি আরও একটু জোরদার হত তো কী সুখের বিষয়ই না হত।

তরুণবাবু আমার এ-কথায় আপত্তি করেছেন, বলেছেন, এইসব প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকা যে অগ্রসর ভাবের চর্চা করছেন তাতেই কি প্রমাণ হয় না যে এঁরা বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের সংস্কারকে অনুসরণ করে চলেছেন? আমি আমার প্রবন্ধে লিখেছিলাম: "বিষয়বস্তুর নির্বাচনে এঁদের যে বলিষ্ঠতা, সেই বলিষ্ঠতার অনুরূপ প্রকাশভঙ্গি খুঁজতে গিয়ে এঁরা সচরাচর যে ইডিয়ম ও পরিভাষা ব্যবহার করছেন—তা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রবহমান সংস্কার থেকে কিয়ৎ পরিমাণে বিশ্লিষ্ট বলে মনে হয়।" তার উত্তরে তরুণবাবু লিখছেন—"তাহলে কি 'সংস্কার' ও 'ঐতিহ্য' শব্দ দুটি শ্রীচৌধুরী সমার্থক মনে করেন? আঙ্গিক সম্পর্কে নিরীক্ষা, বিষয় অনুযায়ী আঙ্গিকের বিবর্তন ও নতুন রীতির ইডিয়ম ও শব্দ ব্যবহার ইত্যাদি লক্ষণগুলিই তো বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্যানুসারী।"

এ-বিষয়ে আমি স্পষ্টতই ভিন্নমত পোষণ করি এবং সবিনয়ে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে সেই মতভিন্নতার কথা জানাতে চাই।

আমার প্রথম কথা হচ্ছে: প্রগতিশীলতা-বিদ্রোহ-বিপ্লব ইত্যাদি অভীপ্সিত বিষয়গুলি কখনও আঙ্গিকের অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ভাষার চঙ-বদলের মধ্যে নিহিত থাকে না—থাকে ভাবের বিপ্লবের মধ্যে। আমরা প্রায়শ ভুল করে আঙ্গিক আর ভাষার বিপ্লবটাকেই সত্যিকার বিপ্লব বলে মনে করি এবং তার দ্বারা নিজেকে প্রবঞ্চিত ও অপরকে বিভ্রান্ত করি। যুগবদলের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের প্রকাশরীতির যুগোচিত বদল ঘটবেই এবং সেটা কাম্যও বটে। কিন্তু ওই পরিবর্তনটাই প্রগতিশীলতা নয়, প্রগতিশীলতার প্রমাণ খুঁজতে হবে ভাবের নিত্য নতুন চরিত্রবদলের মধ্যে।

এইখানেই আমাদের প্রগতিঅভিমানীরা ভুল করেন বলে আমার ধারণা। প্রকাশরীতি বা আঙ্গিকের বিপ্লব বিপ্লব নয়, বিপ্লব হয় ভাবের ও

চিন্তার নতুন নতুন দিগন্ত প্রসারে। আমরা ভাবের বিপ্লবে যত না যত্নবান—তার চেয়ে বেশি যত্নবান আঙ্গিকের নবনব পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, ভাষাভঙ্গি নিয়ে নিত্যনতুন কসরত করায়। বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্যানুমোদিত শব্দসংস্কার, ইডিয়ম, পরিভাষা ইত্যাদিকে বেঁকেচুরে দুমড়ে, কখনও কখনও চিনতে পারা যায় না এমনভাবে তার খোল-নলচে বদলে, প্রগতির পথে অগ্রসর হচ্ছি বলে আমরা মিথ্যা আত্মপ্রসাদ অনুভব করি। কিন্তু একথা আমরা খেয়াল করি না যে, ট্রাডিশন বা ঐতিহ্য থেকে পুরাপুরি বিচ্যুত হলে ভাষা বা আঙ্গিক কখনও জোরাল হয় না বরং দুর্বলতারই সূচনা করে। প্রত্যেক ভাষারই একটা স্বীকৃত রূপ থাকে, যাকে সেই ভাষার স্ট্যাণ্ডার্ড বলা যায়। সাহিত্যচর্চার অজুহাতে ওই স্ট্যাণ্ডার্ডকে দলে-পিষে তার জায়গায় কিম্ভুত ভাষাভঙ্গি দাঁড় করানোর অধিকার আমাদের কারও নেই —না গদ্যে, না কাব্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাজগৎ থেকে আজকের লেখকের চিন্তাজগৎ অনেক দূরে অবস্থিত এবং একথা আমি গর্বের সঙ্গে স্বীকার করব যে—ও-ব্যবধান শুধু দূরবর্তিতারই নয়, অগ্রবর্তিতারও সূচক। কিন্তু তা-ই থেকে যদি কারও এরূপ মনে হয়ে থাকে যে, আমরা বাঙলা সাহিত্যের পঠন-পাঠন-অনুশীলন কালে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারীতিকে স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করতে পারি তবে তার চেয়ে মূঢ়তা আর কিছু হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কল্পনা যে-জগৎ আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছিল, তা যত মধুর আর রম্যই হোক, তার চেয়ে ভিন্নতর ও নূতনতর কাব্য-কল্পনার জগৎসৃষ্টিতেই আজকের কবিদের সার্থকতা। কিন্তু তার মানে যদি এই হয় যে, রবীন্দ্রনাথের কিংবা তৎপূর্ববর্তী সুবিশাল বাঙলা কাব্য-ঐতিহ্যের শব্দ বা ছন্দোসংস্কারকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার আমরা ছাড়পত্র পেয়েছি, তা হলে তার চেয়ে শেকড়-বিচ্ছিন্নতা আর কিছু ভাবা যায় না।

আমার অভিযোগ আঙ্গিক আর ভাষা-প্রকরণের ক্ষেত্রে প্রগতির শিবির-ভুক্ত এই নতুন লেখকদের শেকল-ছেঁড়া মত্ততার বিরুদ্ধে! শুধু 'পরিচয়', 'সাহিত্যপত্র', 'সারস্বত', 'এষা', 'উত্তরসূরী' প্রভৃতি বিশিষ্ট পত্রিকাসমূহের অথবা 'কৃত্তিবাস', 'শতভিষা', 'ধ্রুপদী' 'একক' ইত্যাদি নিরবচ্ছিন্ন কবিতা-পত্রিকাগুলির শিবিরভুক্ত কবিদের কথাই বা বলি কেন, আমার নালিশ খোদ জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ আধুনিক কবিকুলের পুরোধাদেরই বিরুদ্ধে। বিনম্র দৃঢ়তার সঙ্গে এ-কথা বলতে চাই

যে, তাঁদের কাব্যসৃষ্টি প্রবহমান বাঙলা কাব্যে লক্ষণীয় নতুন রঙ-রস আর অনুভাবনীয় নতুন স্বাদ-গন্ধ যোজনা করলেও, তাঁদের কাব্যের শব্দসংস্কার আশানুরূপভাবে বাঙলা কাব্যের ঐতিহ্যানুমোদিত নয়। তাঁরা যে-পরিমাণে পাশ্চাত্য কাব্যকলার সংস্কার দ্বারা চালিত হয়েছেন, বাঙলা কাব্যের দীর্ঘকাল-পুঞ্জিত কাব্যসংস্কারে তার সিকির-সিকিও লালিত হননি, আর ওইখানেই তাঁদের কাব্যের অপূর্ণতা। আধুনিকতার অভিমানে এ-কথা আজ অনেকেই হয়তো স্বীকার করতে চাইবেন না। কিন্তু বাঙলা কাব্যের ঐতিহ্যকে যদি আমরা মনেপ্রাণে ভালোবেসে থাকি, তাহলে এ-কথা একদিন স্বীকার করতেই হবে।

আর, সাহিত্যে জাতীয়তার সমর্থনে এ-কথা আমরা বলতে চাই যে, যখনই মাতৃভাষার অনুশীলনে আমরা নিরত হই, তখনই জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষভাবে জাতীয় ভাবের অঞ্চল-সংলগ্ন হয়ে পড়ি। জাতীয়তার অনুশীলন বিহনে মাতৃভাষার অনুশীলন হয় না, কেন না মাতৃস্তন্য পানের মধ্য দিয়ে যে-ভাষার বিকাশ, তাকে অবলম্বন করে কিছু প্রকাশ করতে গেলেই নাড়ির বন্ধনের মতো দেশের আকাশ-বাতাস জল-হাওয়া মাটি ও মানুষ অবলীলায় সে-ভাষার বন্ধনে অচ্ছেদ্যভাবে ধরা পড়ে। সাহিত্য অর্কিডের ফুল নয় যে মাটির সঙ্গে সংযোগবিহীনভাবে তার চাষ হতে পারে। যাঁরা কথায় কথায় কাব্য বা সাহিত্যচর্চার বেলায় পাশ্চাত্যের দোহাই পাড়েন, তাঁরা সাহিত্যের এই মূলগত সত্যটিই বিস্মৃত হন।

আমি আমার বর্গীকরণে প্রথমে যাঁদের স্থান দিয়েছি : "রাজনীতি বিমুখ ঐতিহ্যাশ্রয়ী সাহিত্যিক"—ইতালীয় সাম্যবাদী তাত্ত্বিক সংগ্রামী যোদ্ধা অ্যাণ্টোনিও গ্রামচি ঐ শ্রেণীর লেখকদের বলেছেন "ঐতিহ্যবাদী বুদ্ধিজীবী" এবং তাঁদের কঠোর সমালোচনা করেছেন—তাঁদের মানসিকতার যতো অসম্পূর্ণতাই থাকুক, তাঁদের এই একটা জোর যে তাঁরা জাতীয়তার থেকে বিচ্যুত নন। অহেতুক পাশ্চাত্যপ্রেম তাঁদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায় না। তাঁরা বাঙলা সাহিত্যের গত হাজার বছরের ট্রাডিশনের সঙ্গে কম-বেশি পরিচিত, যে-ট্রাডিশনের কয়েকটি বিশিষ্ট দিকচিহ্ন হল—বৈষ্ণব কাব্য, মঙ্গল কাব্য, রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ ভাণ্ডার, যাত্রা-কবি-পাঁচালি প্রভৃতি লোক-সংস্কৃতির স্তরসপুষ্ট অমার্জিত কিন্তু খাঁটি দেশজ সাহিত্য, ঈশ্বর গুপ্ত-রঙ্গলালের দেশাত্মবোধক কাব্য, মধুসূদন-হেম-নবীনের ওজঃগুণ বিশিষ্ট

জাতীয়ভাবাত্মক আখ্যানধর্মী কাব্য, বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে প্রবাহিত শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব্যকলার কলস্বনা স্রোতোধারা, মোহিতলাল-নজরুল-যতীন্দ্রনাথ-কুমুদ-কালিদাস-করুণানিধান-প্রেমেন্দ্র প্রমুখের মধুস্বাদী কবিতা ; গদ্যশিল্পে বিদ্যাসাগরের শ্রীমণ্ডিত সুঠাম গদ্য, অক্ষয়-ভূদেব-বঙ্কিম-রামেন্দ্রসুন্দরের যুক্তিধর্মী গদ্য, বঙ্কিম-শরৎ-বিভূতিভূষণ-মানিক-তারাশঙ্কর-প্রেমেন্দ্র-শৈলজানন্দ-সুবোধ ঘোষের অপূর্ব শিল্পসৌন্দর্যের গল্পোপন্যাস, বলেন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথের অনবদ্য চিত্রধর্মী রোমান্টিক গদ্য, প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধি-দীপ্ত মননশীল প্রবন্ধ ইত্যাদি। এই সুবিশাল জাতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে ভালো করে পরিচয় সাধন না করে আধুনিক সাহিত্যের চর্চা করতে গেলে তাতে একদেশদর্শিতার বড়াই প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু প্রকৃত রচনাশক্তির অধিকারী হওয়া যায় না।

নারায়ণ চৌধুরী

এই সংখ্যা ছাপার কাজ যখন শেষ হয়ে এসেছে, তখন খবর এল মনস্বী কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের জীবনাবসান হয়েছে। একদা 'পরিচয়' ও প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমরা এই মনস্বীর স্মৃতির উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। ভবিষ্যতে 'পরিচয়'-এ ওদুদ সাহেব সম্পর্কে যথাযোগ্য আলোচনা প্রকাশিত হবে। —সম্পাদক

লেনিন সরণী

বাইশে এপ্রিল পৃথিবী জুড়ে লেনিন জন্মশতবার্ষিকী দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। পৃথিবী গ্রহকে লেনিনের নামের যোগ্য করা এবং আগামী শতাব্দীতে গ্রহান্তরে লেনিন-উৎসবকে সম্প্রসারিত করার প্রস্তুতিই হচ্ছে এই শতবার্ষিকী উৎসবের মূল কথা।

ভারতবর্ষে, বিশেষত বাঙলাদেশে, বেশ ব্যাপক আকারেই লেনিন উৎসব হয়েছে। উৎসব এখনও অব্যাহত। ভারত-সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির উদ্যোগে কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে স্থাপিত হয়েছে সোভিয়েত-ভারত সুহৃদ সমিতির উপহার লেনিনের একটি মূর্তি। সংগ্রাম ও সৃষ্টির পীঠস্থান কলকাতার ঐতিহাসিক ধর্মতলা স্ট্রীটের নতুন নাম এখন লেনিন সরণী।

ভারতবর্ষে ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে লেনিনের পথে চলার নবতর আহ্বান এসেছে। এই পথ মানুষেরই তৈরি। এই পথে মানুষই চলে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একদিন সংগ্রাম ও সৃষ্টির এই পথেই তার মুক্তি অর্জন করবে।

কাম্বোডিয়ায় মার্কিন আগ্রাসনের প্রতিবাদে বাঙলাদেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের বিবৃতি

যখন সমগ্র পৃথিবী আশা করছিল হয়তো এইবার ভিয়েতনামের যুদ্ধ বন্ধ হবে, হয়তো এতদিনে মানুষ এশিয়া ভূখণ্ডের এক বিস্তৃত অঞ্চলে শান্তি ও স্বাধীনতার বিজয় পতাকা ওড়াবে, নতুন ভবিষ্যৎ গড়বে—তখন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী আমরা অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম ভিয়েতনামে পরাজিত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার যুদ্ধের এলাকা সম্প্রসারিত করার নীতি অক্ষুণ্ণ রেখে কাম্বোডিয়ার বুকে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

যখন পৃথিবীর দেশে দেশে আলোকপূজারী মানুষ লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উৎসব করছিলেন, যখন পৃথিবীর দেশে দেশে তিমিরবিনাশী মানুষ ফ্যাসিবাদের ঐতিহাসিক পরাজয়ের পঞ্চবিংশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করছিলেন—তখন হিটলারকেও লজ্জা দিয়ে অপ্রস্তুত আর শান্ত কাম্বোডিয়ায় মার্কিন ঘাতকদের বন্দুক গর্জন করে উঠল।

মেকং নদীতে তাই আজ সার বেঁধে দেশপ্রেমিক মানুষের শবদেহ ভাসছে। কাম্বোডিয়ার বৈধ সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে অপসারিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের অনুগ্রহপুষ্ট সামরিক চক্র গোটা কাম্বোডিয়াকে বন্দীশিবিরে পরিণত করেছে। আর—জেনেভা চুক্তি, আন্তর্জাতিক আইন ও সভ্য সমাজের সমস্ত রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে পালে পালে মার্কিন সৈন্য কাম্বোডিয়ায় নরকের আগুন জ্বালছে।

নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, প্যারিস বৈঠককে পায়ে মাড়িয়ে, প্রেসিডেণ্ট নিকসন উত্তর ভিয়েতনামে নতুন করে বোমাবর্ষণ শুরু করেছেন। লাওস এবং কাম্বোডিয়ায় সেই একই মিথ্যাচার আর দানব বৃত্তি। সাম্রাজ্যবাদ যে সহজে তার চরিত্র বদলায় না—মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আবার তা প্রমাণ করলেন।

কিন্তু মানুষ অজেয়। তাই খাস আমেরিকাতেই নিকসন-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে চারজন ছাত্রছাত্রী প্রাণ দিলেন। মানুষ অজেয়। তাই গোটা আমেরিকা জুড়েই আজ সাম্রাজ্যবাদের এশীয় নীতির বিরুদ্ধে শিল্পী-সাহিত্যিক-ছাত্র-যুবক-দেশপ্রেমিক জনগণ উত্তাল আন্দোলন করছেন। জর্জ ওয়াশিংটন, এব লিঙ্কন, ওয়াল্ট হুইটম্যান, মার্টিন লুথার কিং-এর অস্ত

আমেরিকা এঁদেরই বীরত্বে মূর্ত হয়ে উঠছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমগ্র পৃথিবীর বিবেকবান মানুষদের কণ্ঠস্বর। পাবলো পিকাসো, জাঁ পল সার্ত্র প্রমুখ শিল্পী-সাহিত্যিকও নীরব নেই।

রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী আমরা আমাদের মহৎ ঐতিহ্যকে ভুলতে পারি না। সভ্যতার এই সঙ্কটকালে তাই আমরাও আমাদের কণ্ঠ মেলাই বিশ্ববিবেকের সঙ্গে।

আমরা প্রতিবাদ করি সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার দানববৃত্তির। আমরা প্রতিবাদ করি কাম্বোডিয়ার সার্বভৌমত্বের ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপের। আমরা সমর্থন জানাই সিহানুক সরকারকে। আমরা সমর্থন জানাই ইন্দোচীনের মুক্তি-সংগ্রামকে।

সাম্রাজ্যবাদের এই অন্যায় আগ্রাসনকে প্রতিহত করতেই হবে। কারণ—আমরা জানি তা সম্ভব না হলে আমাদের ভালোবাসার ভারতবর্ষও বিপদ এড়াতে পারবে না। কারণ ইন্দোচীনের স্বাধীন সার্বভৌম দেশগুলির সঙ্গে আমাদের ভাগ্যও অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত।

তাই আমাদের দাবি: কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র দপ্তর অবিলম্বে আক্রান্তের পক্ষে দাঁড়ান, আক্রমণকারীকে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করুন। আমাদের দাবি: ভারত সরকার জোটনিরপেক্ষ ও শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রগুলিকে এই আগ্রাসন নীতির বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করুন। আমাদের দাবি: মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই মুহূর্তে কাম্বোডিয়া থেকে, ভিয়েতনাম থেকে, গোটা এশীয় ভূখণ্ড থেকে তার ঘরে ফিরে যাক।

স্বাক্ষর ঃ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, গোপাল হালদার, মনোজ বসু, বিমলচন্দ্র ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দিনেশ দাশ, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, বিমল কর, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, নরহরি কবিরাজ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, মৃণাল সেন, সুব্রত সেনশর্মা, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিনয় রায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ,

রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ধনঞ্জয় দাশ, অবন্তীকুমার সান্যাল, জীবেন্দ্র সিংহরায়, সত্যপ্রিয় ঘোষ, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, কৃষ্ণ ধর, অমল দাশগুপ্ত, বীরেন্দ্র নিয়োগী, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অরুণাচল বসু, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, উমানাথ ভট্টাচার্য, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি দাশগুপ্ত, রণধীর দাশগুপ্ত, নারায়ণ চৌধুরী, শৈলেনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদ্যোৎ গুহ, অমূল্য চক্রবর্তী, রবীন্দ্র মজুমদার, সুকুমার মিত্র, শান্তিময় রায়, কালীপদ ভট্টাচার্য, শঙ্খ ঘোষ, দেবেশ রায়, তরুণ সান্যাল, অমলেন্দু চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, যুগান্তর চক্রবর্তী, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তুষার চট্টোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল, মানস রায়চৌধুরী, ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়, শান্তিকুমার ঘোষ, বীরেন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্র বিশ্বাস, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক ভট্টাচার্য, নির্মাল্য আচার্য, প্রসূন বসু, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্কর চক্রবর্তী, শৈলেন চৌধুরী, উৎপল ভাদুড়ী, জগন্নাথ ভট্টাচার্য, বিভূতি গুহ, প্রফুল্ল রায়, অসীম রায়, মানিক মুখোপাধ্যায়, কানাই পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, বিতোষ আচার্য, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, নিখিল সরকার, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, দিলীপ বসু, বীরেশ্বর ঘোষ, পল্লব সেনগুপ্ত, শ্যামল ঘোষ, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরজিত বসু, বেদুইন চক্রবর্তী, বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, গণেশ বসু, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, সত্য গুহ, রঞ্জিত রায়-চৌধুরী, তুলসী মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ সেন, অমিয় ধর, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, প্রভাত চৌধুরী, বিশ্বরঞ্জন দে, অসিত ঘোষ, দীপেন রায়, শিশির সামন্ত, দিলীপ সেনগুপ্ত, দুলাল ঘোষ, শুভ বসু, শুভাশিস গোস্বামী, কালীকৃষ্ণ গুহ, যিশু চৌধুরী, মৃণাল বসুচৌধুরী, বিপ্লব মাজী, চণ্ডী মণ্ডল, প্রলয় সেন, রমেন্দ্র রায়, শঙ্কর রায়, গণেশ সেন, ফিরোজ চৌধুরী, শঙ্কর দাশগুপ্ত, চন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গৌতম মুখোপাধ্যায়, মলয় দাশগুপ্ত, বাণীব্রত চক্রবর্তী, শুভঙ্কর ঘোষ, অভিজিৎ সরকার, নিমাই চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু মৈত্র, বিমল চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর চক্রবর্তী, শশধর রায়, রমেন আচার্য, মিহির রায়চৌধুরী, শ্যামলকুমার ঘোষ, ধূর্জটি চন্দ, মৃণাল দত্ত, পদ্মনাভ দাশগুপ্ত, অজয় গুপ্ত, নির্মলকান্তি দাশগুপ্ত, অমর রায়, সুমিত্রা ঘোষ, প্রণব মাইতি, সত্যরঞ্জন বিশ্বাস, গৌতম সান্যাল, তপন দত্ত, ইন্দ্র লাহিড়ী, দেবব্রত চক্রবর্তী, অরুণ সেন, শঙ্কর মজুমদার, অলোক সিংহ, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, জীবন সরকার, মুকুল রায়, সুকোমল রায়চৌধুরী, বিনয় মাহাতো, বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণগোপাল মল্লিক, শান্তি লাহিড়ী, অরুণাভ দাশগুপ্ত, দিলীপ চক্রবর্তী, রণেন মোদক, কমল সমাজদার, মণীন্দ্র চক্রবর্তী, কল্যাণ চক্রবর্তী, রণজিৎ সিকদার, বাধন দাশ, শিপ্রা আদিত্য, নবেন্দু সেনগুপ্ত, বিষ্ণু দাশ, পিন্টু ভট্টাচার্য, শৈবাল চট্টোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি দাশ, অনন্ত দাশ, অহীন ভৌমিক, বৈদ্যনাথ সাহা

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিসট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের
৮ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১। প্রকাশের স্থান—৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—মাসিক

৩। মুদ্রক—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ভারতীয়; ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭

৪। প্রকাশক— ঐ ঐ ঐ

৫। সম্পাদক—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয়; ৭৬৫, পি ব্লক, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩

তরুণ সান্যাল, ভারতীয়; ৬০এ, হরমোহন ঘোষ লেন, কলকাতা-১০

৬। পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর যে-সকল অংশীদার মূলধনের একশতাংশের অধিকারী, তাঁদের নাম ও ঠিকানা :

১। গোপাল হালদার, ফ্ল্যাট ১৯, ব্লক এইচ, সি. আই. টি. বিলডিংস, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪॥ ২। সুনীলকুমার বসু, ৭৩ এল, মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-৯॥ ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯॥ ৪। হিরণকুমার সান্যাল, ৮, একডালিয়া রোড, কলকাতা-১৯॥ ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭॥ ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭॥ ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭॥ ৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ৫বি, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯॥ ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১।৩, কার্ন রোড, কলকাতা-১৯॥ ১০। শীতাংশু মৈত্র, ১।১।১, নীলমণি দত্ত লেন, কলকাতা-২২॥ ১১। বিনয় ঘোষ, ৪৭।৪, যাদবপুর সেনট্রাল রোড, কলকাতা-১২। ১২। সত্যজিৎ রায়, ৩, লেক টেম্পল রোড, কলকাতা-২৯॥ ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায় (মৃত), ৪২।৭এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯॥ ১৪। হরিদাস নন্দী, ২৯এ, কবির রোড, কলকাতা-২৬॥ ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২বি, সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-২৯॥ ১৬। শান্তিময় রায়, 'কুমুদিকা', গরফা মেন রোড, কলকাতা-৩২॥ ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, ভুবনেশ্বর, ওড়িশা॥ ১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (মৃত), ৯।১, কর্নফিল্ড রোড, কলকাতা-১৯॥ ১৯। নিবেদিতা দাশ. ৫৩বি. গড়চা রোড. কলকাতা-১৯। ২০। নারায়ণ

গঙ্গোপাধ্যায়, ৩সি, পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ২১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলকাতা-২০ ॥ ২২। শান্তা বসু, ১৩।১এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ ॥ ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬২, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ২৪। ধীরেন রায়, ১০।৬, নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া ॥ ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ ॥ ২৬। দ্বিজেন্দ্র নন্দী, ১৩ডি, ফিরোজ শাহ্ রোড, নয়াদিল্লী ॥ ২৭। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৫০, রামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬ ॥ ২৮। সুনীল সেন, ২৪, রসা রোড সাউথ (থার্ড লেন), কলকাতা-৩৩ ॥ ২৯। দিলীপ বসু, ২০০ এল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ৩০। সুনীল মুন্সী, ১।৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯ ॥ ৩১। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ২, পাম প্লেস, কলকাতা-১৯ ॥ ৩২। হিমাদ্রিশেখর বসু, ৯এ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৩৩। শিপ্রা সরকার, ২৩৯এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৪৭ ॥ ৩৪। অচিন্ত্যেশ ঘোষ, ৯, সামবানদম রোড, টি. নগর, মাদ্রাজ-৭ ॥ ৩৫। চিন্মোহন সেহানবীশ, ১৯, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ৩৬। রণজিৎ মুখার্জি, পি ২৬, গ্রেহামস লেন, কলকাতা-৪০ ॥ ৩৭। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ফ্ল্যাট ২, 'সী গাল', কার্মিচেল রোড, বম্বে-২৬ ॥ ৩৮। অমল দাশগুপ্ত, ৮৬, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৫ ॥ ৩৯। প্রদ্যোৎ গুহ, ১এ, মহীশূর রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ৪০। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭ ॥ ৪১। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৫বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯ ॥ ৪২। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৬৫, পি ব্লক, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩ ॥ ৪৩। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥ ৪৪। নির্মালা বাগচি, ফ্ল্যাট নং বি সি ৩, পিকনিক পার্ক, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৬৯ ॥ ৪৫। তরুণ সান্যাল, ৬০এ, হরমোহন ঘোষ লেন, কলকাতা-১০ ॥ ৪৬। বিদ্যা মুন্সী, ১৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯ ॥ ৪৭। বেদুইন চক্রবর্তী, ফ্ল্যাট ২, ১০, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ ॥ ৪৮। অমিয় দাশগুপ্ত, ২, যদুনাথ সেন লেন, কলকাতা-৬ ॥ ৪৯। অজয় দাশগুপ্ত, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥ ৫০। সুরেন ধরচৌধুরী, ২০০, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥

আমি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

(স্বাঃ) অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

১০. ৩. ৭০

পরিচয়
বর্ষ ৩৯ । সংখ্যা ১০-১১
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ । ১৩৭৭

সূচিপত্র

লেনিন-জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা । ১৯৭০

লেনিন ও বর্তমান যুগ । হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৯৭৭
লেনিনের শিক্ষার আলোকে জাতীয় সংহতির সমস্যা ।
সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ৯৮৭
বিপ্লবের স্তর বিচারের প্রশ্নে লেনিন । নরহরি কবিরাজ ১০০৫
লেনিনের আর এক নাম ভালোবাসা । সুকুমার মিত্র ১০১৮
শিক্ষা সম্পর্কে লেনিন । শ্যামল চক্রবর্তী ১০২৬
বলশেভিজমের সূচনা ও বিপ্লবী রাজনীতির সামাজিকতা ।
অশোক সেন ১০৩৭
লেনিন ও বিজ্ঞানচিন্তা । জয়ন্ত বসু ১০৫৫
প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা ও লেনিন । গৌতম চট্টোপাধ্যায় ১০৬১
বাঙলা সাহিত্যে লেনিন । গোপাল হালদার ১০৬৭
নয়াবাম মানসিকতার একদিক । ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১০৮১
ভারতের কৃষি-সম্পর্ক বিশ্লেষণে লেনিন-নির্দেশিত পথ । ভবানী সেন ১০৯৭
লেনিনের রাষ্ট্র । জ্যোতি দাশগুপ্ত ১১১৭
ডায়ালেকটিক এবং লেনিনের রাজনীতি । বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ১১২৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য । হিরণকুমার সান্যাল । সুশোভন সরকার ।
অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র । গোপাল হালদার । বিষ্ণু দে । চিন্মোহন সেহানবীশ ।
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় । সুভাষ মুখোপাধ্যায় । গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণ সান্যাল

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত ।

নিত্য ব্যবহারে
নিম
টুথ পেষ্ট
ছেলেবেলা থেকে এই টুথ পেষ্ট ব্যবহার করলে দাঁত শক্ত ও মাঢ়ী সুদৃঢ় হয়।
একটি
ক্যালকেমিকো
অবদান

পরিচয়
বর্ষ ৩৯। সংখ্যা ১০-১১
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ। ১৩৭৭

লেনিন ও বর্তমান যুগ

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতকের প্রথম বৎসর ১৯০০ সালে জার্মানিতে প্রবাসকালে লেনিন প্রতিষ্ঠা করেন 'ইসক্রা' সংবাদপত্র এবং বিপ্লবী সাথীদের সহায়তায় গোপনে আইনের বেড়াজাল এড়িয়ে রুশদেশে তার প্রচারের ব্যবস্থা করেন। 'ইস্ক্রা' শব্দটির অর্থ হলো 'স্ফুলিঙ্গ'—কাগজের নাম যেখানে ছাপা, ঠিক তার নিচে লেখা থাকত : "এই স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুন জ্বলবে"। জার্মানিতে 'স্ফুলিঙ্গ' পত্রিকার স্থাপনা; শত্রুর তাড়নায় তাঁকে ১৯০২ সালে যেতে হয়েছিল লণ্ডনে, আর সেখানেও বিঘ্ন দেখা দিলে যেতে হলো জেনিভা। মার্কস-এঙ্গেলস-এর উত্তরাধিকারে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন লেনিন তাঁর বিপ্লবী চিন্তা ও কর্মের সমন্বয় প্রতিভার অনন্য পরিচয় দিয়ে—মার্কসবাদের অমোঘ শক্তিবলে মেহনতী মানুষের বিশ্ববিজয়কেতন উড্ডীন রেখেছিলেন দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রাম্যমান এই তুলনাহীন মানুষটি।

'ইসক্রা' প্রকাশিত হওয়ার পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে রুশ দেশে আগুন জ্বলল। জনতার রক্তে নির্বাপিত হয়েও আবার দাবানল এল ১৯১৭ সালে। ফেব্রুয়ারি মাসে যার সূচনা, নভেম্বরে দেখা গেল তার সার্থকতা। অন্ধ বিনা সকলের কাছেই স্পষ্ট বোধ হলো—অকাট্যভাবেই নভেম্বর বিপ্লবের বাণী বিশ্বময়

ছড়িয়ে যাবে। তার জয়যাত্রাকে রোধ করা কারও সাধ্য নয়। মার্কস-এর জন্মের (১৮১৮) পর একশো বৎসর কাটার আগেই ঘটেছে প্রথম বিপুল সফল সোশালিস্ট বিপ্লব। আজ গোটা দুনিয়ার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বাস করছে সোশালিস্ট সমাজব্যবস্থায়। মার্কস-এর মৃত্যুর (১৮৮৩) পর একশো বৎসর যখন কাটবে, তখন জনতার এই জগৎজোড়া জয়যাত্রা কোন স্তরে হাজির হবে তা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়াসে প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলো লেনিনের জন্ম-শতাব্দী পরিপূরণ উপলক্ষে ঐ বিপ্লবী মহানায়কের জীবনকাব্য বিষয়ে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন—প্রয়োজন আমাদের যুগের যিনি যুগন্ধর, তাঁর শিক্ষা আত্মস্থ করে আজকের পরিস্থিতিতে সমাজ রূপান্তরের কাজে এগিয়ে যাওয়া।

মহৎ ব্যক্তি সম্বন্ধে মহামনস্বী হেগেল-এর সংজ্ঞা বোধহয় সবচেয়ে গ্রহণ-যোগ্য। অতি-মানবের আবির্ভাব বিষয়ে যে-ধরনের কথা শোনা যায়, তা নিয়ে অতিরিক্ত মস্তিষ্ক প্রয়োগের এখানে প্রয়োজন নেই। ব্যক্তিপূজা মাঝে মাঝে যে ইতিহাসকে কিছু পরিমাণে বিকৃত করেছে, তাতেও সন্দেহ নেই। প্রকৃত শক্তিধর ব্যক্তির ভূমিকাও নিঃসন্দিগ্ধ। আকস্মিকভাবে তাঁরা যে ইতিহাসের স্বাভাবিক ও সঙ্গত গতিচ্ছন্দে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য এনে থাকেন, তা মনে করারও যথাযথ কারণ নেই। হেগেল-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো এক যুগের প্রকৃত মহৎ প্রতিনিধি হলেন তিনি যিনি সেই যুগের কামনাকে বাক্যে প্রকাশ করতে পারেন, যিনি নিজের যুগকে বলতে পারেন তার ঈপ্সিত উদ্দেশ্য কি, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনেও নামতে পারেন। "যা তিনি করেন তা হলো তাঁর যুগের মর্ম; তাঁর যুগের সত্তার গভীরে নিহিত। মহৎ ব্যক্তি হলেন নিজের যুগের বাস্তব মূর্তি।" এই সংজ্ঞা অনুসরণ করে বলা যায়, লেনিন হলেন বিংশ শতাব্দীর নায়ক, বিংশ শতাব্দীর প্রতিভূ, বিংশ শতাব্দীর ভাবধারা—রূপকের ভাষায় যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি সম্বন্ধে "দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে" বলা সাজে, তাঁদেরই একজন সর্বাগ্রগণ্য।

জওয়াহরলাল নেহেরু আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন যে তাঁর চেনা কমিউ-নিস্টদের প্রায়ই কেমন যেন বেখাপ্পা ধরনের মানুষ বলে মনে হয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের একটা বৈশিষ্ট্য মহার্ঘ বলে মানতে সঙ্কোচ হয়নি। লেনিনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল সবচেয়ে জাজ্বল্যমান, আর কম-বেশি পরিমাণে সব কমিউনিস্টের মধ্যেই একে তিনি দেখেছিলেন। এই বৈশিষ্ট্য হলো

"ইতিহাসের সঙ্গে তাল রেখে পা ফেলে চলা" বিষয়ে ভরসা। এর চেয়ে দামী প্রশংসাপত্র কমিউনিস্টদের বোধহয় প্রায় নেই।

ইতিহাসের গতিচ্ছন্দ হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা লেনিন আয়ত্ত করেছিলেন মার্কস-এঙ্গেলস-এর শিক্ষা থেকে। সকল অনন্যসাধারণ ব্যক্তির মতোই তিনি একযোগে ছিলেন ইতিহাস কর্তৃক গঠিত এবং সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের নির্মাতা—যে-সামাজিক শক্তিপুঞ্জ দুনিয়ার চেহারা আর মানুষের চিন্তাধারাকে পালটে দেয়, একাধারে তার প্রতিনিধি এবং তার স্রষ্টা ছিলেন। চিন্তাশীল এবং তীক্ষ্ণধী ইংরেজ ইতিহাসবিদ ঈ-এচ-কার মহৎ ব্যক্তির ভূমিকা আলোচনা ব্যপদেশে যথার্থই বলেছেন যে, লেনিন মহত্তের মধ্যে মহীয়ান এই কারণে যে শুধু পূর্ব-নিয়ন্ত্রিত শক্তির তরঙ্গে ভাসমান থেকে মহত্ত্বে উত্তীর্ণ হননি (যা বলা যায় নেপোলিয়ন কিম্বা বিসমার্ক সম্বন্ধে), তিনি সমাজে বিবর্তনের সংসাধক শক্তির একজন স্রষ্টাও ছিলেন। এ-কথার যাথার্থ্য অনস্বীকার্য, কারণ লেনিন শুধুমাত্র মার্কস-কথিত সুসমাচারের প্রবল প্রবক্তা ছিলেন না, শুধুমাত্র ফলিত মার্কসবাদের উত্তরসাধক ছিলেন না—সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাজ-শক্তি বিশ্লেষণে মার্কসবাদে গুণগতভাবে নূতন সংযোজনা দেবার মতো সৃষ্টিক্ষমতা রাখতেন। যাগযজ্ঞে যারা কেবল ব্যাপৃত, তাদের চেয়ে বহু উচ্চে স্থান হলো মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির।

বলশেভিক পার্টি গঠনের মধ্য দিয়ে বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন বলেই লেনিন সাম্যবাদী আন্দোলনে স্বীকৃতি অর্জন করতে পেরেছিলেন। 'ইসক্রা' প্রকাশ হওয়ার পূর্বে রুশ দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্বন্ধে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ; ১৯০২ সালে প্রকাশিত হলো বিখ্যাত বই 'কি করা যায়'? যা আজও সকলের অবশ্য পাঠ্য। কিন্তু তখন মার্কসবাদীদের শিরোমণি ছিলেন অগাধ পণ্ডিত বলে পরিচিত কার্ল কাউটস্কি। ১৮৯৯-১৯০০ সালে আর এক বিরাট পণ্ডিত বের্নস্টাইন যখন পার্লামেণ্টারি রাজনীতির সঙ্গে মালাবদল ঘটিয়ে মার্কসবাদকে ঘষে-মেজে "ভদ্রস্থ" করতে লাগলেন, তখন সেই 'সংশোধনবাদ'-এর বিপক্ষে কণ্ঠ উত্তোলন করেছিলেন এঙ্গেলস-এর স্বলাভিষিক্ত কাউটস্কি। পরে আবার এই কাউটস্কি প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের যুগে নির্বিত্ত মানুষের বিপ্লবী অভিযানকে অস্বীকার করলেন, যুধ্যমান সাম্রাজ্যবাদের সপক্ষে দাঁড়ালেন এবং সোভিয়েত বিপ্লব ঘটার অব্যবহিত পরে তার প্রখর বিরোধিতা করলেন। কাউটস্কির মতো বিশ্ববিদিত তাত্ত্বিকের বক্তব্য খণ্ডন করলেন লেনিন—এটা

স্বাভাবিক ঘটনা, কারণ ইতিমধ্যে স্টুটগার্ট, কোপেনহাগেন ও সিমেরভাল্ড এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সমাবেশে রুশ-বলশেভিকদের এই ক্লান্তিহীন, ক্ষুরধার, তেজস্বী অথচ সতত স্থিতধী প্রবক্তাকে দেখা গিয়েছিল এবং তাঁরই অনুপম নেতৃত্বে জগতের এক-ষষ্ঠাংশব্যাপী যে-জারসাম্রাজ্য, সেখানে বিপ্লব সংসাধিত হলো। একদিকে যেমন লেনিন দলত্যাগী কাউটস্কিকে ধিক্কার দিলেন (১৯১৮), যেমন দেখা গেল ১৯০৫ সালে লেখা 'সোশাল-ডেমক্রাসির দুই কৌশল' শীর্ষক রচনার সৃষ্টিশীল প্রয়োগ, যেমন সবাই পেল 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' বিষয়ে তাঁর স্বচ্ছ চিন্তা (১৯১৭), তেমনই পরে বামপন্থী বাক্যবাগীশপনার উগ্র আতিশয্যকে তিনি তীক্ষ্ণ গভীর ভঙ্গীতে নিন্দা করলেন। লেনিন-রচনাবলী নিয়ে আলোচনা এটা নয়, কিন্তু বলে রাখা ভালো যে দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস-রাজনীতির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিভাগে অসামান্য ব্যুৎপত্তি এবং তত্ত্ববিচারের ভিত্তিতে বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতি সংগঠন ও পরিচালনার নীতি ও কৌশল বাস্তবে রূপায়িত করার প্রতিভা একীভূত হয়ে লেনিন চরিত্রকে একটা বিশেষ গরিমা দিয়েছিল বলেই ইতিহাস আজ তাঁকে স্মরণ করে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের গুরু ও নেতা বলে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মুখ্য সংগঠক বলে, জগতের প্রথম সমাজবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বলে, একাধারে মনীষী ও বিপ্লবী বলে, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত নিরহঙ্কার ও সহৃদয় মানুষ বলে।

গত বৎসর ক্যানাডার প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা টিম্ বাক্ একটি প্রবন্ধের নাম দেন — 'আমাদের কালের সমস্যা বিষয়ে লেনিনের পরামর্শ গ্রহণ'। আজকের যুগের প্রধান স্রষ্টা বলে লেনিনের কথা স্মরণ করলে বাস্তবিকই পথের সন্ধান মিলতে সাহায্য পাওয়া যায়। অটল বিশ্বাসের সঙ্গে সমীচীন বিনয় চরিত্রে অঙ্গীভূত ছিল বলে একেবারে শেষ দিকের লেখা 'Better less but Better' রচনাতে লেনিন বলেন যে সব চেয়ে খারাপ হলো নিজেদের একেবারে সব বিষয়ে "সব জানতা" ধরে নেওয়া। মার্কস ঘৃণা করতেন সেই মনোবৃত্তিকে যার ফলে মানুষ বলে : "এই হল সার সত্য, এর সামনে হাঁটু গেড়ে থাকো!" কিন্তু সন্দেহ নেই যে জ্ঞান, বুদ্ধি এবং জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমান যুগে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা অবান্তর হওয়া দূরে থাকুক, তার প্রাসঙ্গিকতা, তার যাথার্থ্য, তার বাস্তব প্রয়োজন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আজ অচল ও অবান্তর প্রমাণ করার জন্য বহু তীক্ষ্ণবুদ্ধি

পণ্ডিত বুর্জোয়া জগতে ব্যস্ত; মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনকে একটু প্রশংসা জানিয়ে বাতিল করার কাজে নেমেছেন তথাকথিত Marxologist এবং Kremlinologist-এর দল। আজকের ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্র, জটিল, যুযুৎসু জীবনকে সমগ্রভাবে দেখতে অপারগ কিম্বা অনিচ্ছুক গবেষণা লেনিনের শিক্ষার মূল সত্যকে স্বীকার করতে অক্ষম — এ-হলো লেনিনবাদের বিরোধিতা করে ম্রিয়মাণ বুর্জোয়াব্যবস্থায় প্রাণ সঞ্চার করার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। অবশ্য সকল প্রশ্নের যে সহজ উত্তর অবিলম্বে মিলবে তা নয়। মনে রাখতে হবে লেনিনের মন্তব্য যে "বহু আভ্যন্তরীণ বিরোধ ব্যতিরেকেই ইতিহাসের অনুগ্রহে আমরা নূতন চরিত্রের এক গণতন্ত্র পেয়ে যাব" মনে করা বাস্তবিকই অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাসেরই সমতুল্য।

মস্কোতে গত বৎসর জুন মাসে বহু দেশের কমিউনিস্ট পার্টির যে-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে লেনিন জন্মশতাব্দী সম্বন্ধে বিশেষ প্রস্তাবে বলা হয়েছিল "অনেকগুলি দেশে সোশালিস্ট বিপ্লব জয়ী হয়েছে; জগদ্ব্যাপী একটা সোশালিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে, ধনবাদী দেশসমূহেও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন অগ্রসর হচ্ছে; পূর্বতন পরাধীন ও অর্ধ-পরাধীন দেশের জনতা আত্মশক্তি বলে সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে স্থান নিচ্ছে; সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভূতপূর্ব অভিযান ঘটছে। এ-সবই হলো প্রমাণ যে ইতিহাসের পরীক্ষায় লেনিনবাদ নির্ভুল এবং বর্তমান যুগের মৌলিক প্রয়োজনগুলি লেনিনবাদেই প্রকাশ পাচ্ছে।"

বুর্জোয়া বিদ্বানেরা অবশ্য এ-কথা মানবেন না। লেনিনকে তাঁদের পক্ষে 'নস্যাৎ' করা সম্ভব নয়, তাই কথার মারপ্যাঁচ খেলিয়ে, লেনিনকে যেন দু-একটা 'সার্টিফিকেট' দিয়ে, তাঁরা বলে থাকেন যে প্রতিভাবান মানুষ হলেও লেনিনের হিসাবে মস্ত ভুল ইতিহাস ঘটিয়ে দিয়েছে (যেমন তাঁরা বলেন মার্কস-এর ক্ষেত্রেও নাকি ঘটেছে)! এঁদের কাছে শুনি যে লেনিন 'সাম্রাজ্যবাদ' সম্বন্ধে দামী কথা কিছু লিখেছিলেন বটে, কিন্তু আজ বেঁচে থাকলে তিনি নাকি বলতেন যে 'সাম্রাজ্য' ব্যাপারটাই তো উঠে গেছে! তিনি নাকি আরও দেখতেন যে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড এবং বুর্জোয়া দুনিয়ার অন্যান্য আগুয়ান দেশে শ্রমিকরা এমনই সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করছে যে বিপ্লবের কথা ঘুণাক্ষরে তাদের মনে আর নেই। এমন কি, সোশালিস্ট নামধেয় দেশগুলি দেখে আজ লেনিন খুব অপ্রতিভ না

হয়ে পারতেন না — 'সাম্রাজ্যের অবসান' এবং অন্যান্য রচনায় জন স্ট্রেচি এ-বিষয়ে বলছেন : "কমিউনিস্টরা ভয়ঙ্কর উপায় অবলম্বন করে ফল যা পেয়েছে তা হলো অকিঞ্চিৎকর!" স্ট্রেচি তাঁর বিচিত্র জীবনে অনেক ঘাটের জল খেয়েছিলেন, কিছুকাল গোঁড়া কমিউনিস্টের নামাবলীও ধারণ করেছিলেন। এ-ধরনের বেসামাল কথা তাঁর কাছ থেকে একেবারে অপ্রত্যাশিত অবশ্য নয়।

লেনিন বলেছিলেন যে সমাজবাদে উত্তরণ করবে মানুষ "একটা গোটা ঐতিহাসিক অধ্যায়" জুড়ে সংগ্রামের ফলে, এবং সেই অধ্যায়ে ক্রমাগত এবং সহজে জয়লাভ ঘটার কথা নয়, হরেকরকম মুশকিলের আহ্সান করে তবেই সমাজ এগিয়ে যেতে পারবে। সুতরাং আজ দেশে-বিদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মত এবং পথ নিয়ে পার্থক্য, পরস্পর সম্পর্কে কটূক্তি এবং মাঝে মাঝে খেদকর সংঘর্ষ আপাতদৃষ্টিতে নৈরাশ্যের সঞ্চার ঘটালেও ঐজন্য হাল ছেড়ে দেওয়া হবে একান্ত অকর্তব্য। স্বয়ং মার্কস একবার এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সর্বদা অনায়াস বিজয় প্রতীক্ষা করলে কখনও ইতিহাস সৃষ্টি সম্ভব হবে না — নিজেদেরই মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে যুগের পরিবর্তন সাধন সোজা কাজ নয়। বর্তমানের বহু সঙ্কট ও সমস্যাকে ছোট করে না দেখেই অবশ্য বলা যায় যে লেনিন যে পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন, সেই পথে চলাই আজকের কর্তব্য। লেনিনের শিক্ষাকে যাঁরা বাতিল প্রমাণ করতে কোমর বেঁধে লেগেছেন, তাঁদের হিসাবেই খুব বড় দরের ভুল রয়ে গেছে, সমাজবাদের অমোঘ অগ্রগতি রোধ করতে তাঁরা পারবেন না, ঐরাবতকেও স্রোতের তোড়ে ভেসে যেতে হয়।

প্রধান যে-কথা লেনিন শিখিয়ে গেছেন, তার কিয়দংশের উল্লেখ করলেই হবে। সোশালিজম-এর জন্য লড়াই, আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শক্তির শ্রেণীগত সংগ্রাম এবং পরাধীন দেশসমূহের মুক্তি প্রচেষ্টা, এই ত্রিবেণীকে লেনিন যুক্ত করেছিলেন। পাশ্চাত্যের অগ্রগামী দেশে সোশালিস্ট বিপ্লব না ঘটে জার সাম্রাজ্যে তা ঘটায় বিচলিত হওয়া দূরে থাক রীতিমতো আশান্বিত হয়ে তিনি বলেছিলেন আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় ঐ এক দেশেই সোশালিজম প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং সমীচীন, সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছিলেন যে সোভিয়েতের কর্মকাণ্ড দুনিয়ার বুর্জোয়া শক্তির সমবেত ও ঐকান্তিক শত্রুতাকে পরাভূত করে দেশ থেকে দেশান্তরে সমাজবাদের জয়যাত্রা

আনতে প্রচণ্ড সহায়তা করবে। সাম্রাজ্যশাসনে পীড়িত পরাধীন দেশগুলির অবশ্যম্ভাবী মুক্তি সম্বন্ধে একাগ্র অভিনিবেশবলে লেনিন সিদ্ধান্ত করেন যে সাম্রাজ্যের শৃঙ্খল ছিন্ন করে তারা অচিরে বুঝবে যে স্বাধীনতার প্রকৃত পরিণতি হলো সমাজবাদ এবং সেজন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যন্ত্রণাকে এড়িয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা তাদের করতে হবে—পৃথিবীর কতিপয় দেশে সোশালিজম জয়ী হওয়ার কল্যাণে ধনবাদী পথ পরিহার করেই তারা স্বকীয় বিকাশ সাধনে সমর্থ হবে। আজকের যুগ সম্বন্ধে বলা যায় যে লেনিনের ঋষিনেত্রে যা গোচরীভূত হয়েছিল, তা আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সাম্রাজ্যবাদ বস্তুটি আজ প্রায় পৃথিবীর কোথাও নেই, এ-কথা দুনিয়া যেমন মানবে না—তেমনই ধনতন্ত্রের প্রসাদে অগ্রসর দেশগুলো বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে বলে বিপ্লব বাতিল, এ-কথাও মানা চলে না। লেনিনের সংজ্ঞা অনুযায়ী "ধনতন্ত্রের চরম স্তর" হিসাবে সাম্রাজ্যবাদ আজও নির্মূল হয়নি। প্রত্যক্ষভাবে আজ সাম্রাজ্যবাদ মরিয়া হয়েও মাটি আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করছে পর্তুগীজ, আঙ্গোলা, মোজাম্বিক, গিনি-বিসু প্রভৃতি দেশে আর দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডীশিয়ার মতো এলাকায়। পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদ আজ ব্যস্ত দুনিয়ার সর্বত্র—সোশালিজমকে ধ্বংস করার হাজার পরিকল্পনা ছাড়াও নির্লজ্জ নোঙরা লড়াই চালাচ্ছে ভিয়েতনামে, কোরিয়ায়, কিউবার বিপক্ষে, গোটা মধ্যপ্রাচ্য আর সবকটা সদ্যস্বাধীন দেশে। যত পুরু বোরখা পরিধান করুক না কেন, সাম্রাজ্যবাদের নবরূপ দেখিয়ে কাউকে ভোলানো চলছে না—তার শঠতা, তার ক্রূরতা, তার বীভৎসতা ঢেকে রাখবার নয়।

একচেটিয়া কারবার সম্বন্ধে লেনিনের সিদ্ধান্ত আজ অচল বলার মতো বাতুলতা নেই। বেশি কথার দরকার নেই—হয়তো যথেষ্ট হবে দু-একটি মার্কিন দৃষ্টান্ত। এই শতাব্দীর প্রথমে U. S. Steel Corporation সবচেয়ে বড়ো শিল্পসংস্থা বলে যখন বিখ্যাত ছিল, তখন তার শ্রমিক ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা ছিল ২,১০,১৮০। আজকের সবচেয়ে প্রকাণ্ড ব্যবসা হলো General Motors, যার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ হলো বিড়লার হিন্দুস্থান মোটরসের মুরুব্বি। এই 'জেনারেল মোটরস'-এর কর্মীসংখ্যা হলো ৭,৬০,০০০;

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত আঠারোটি রাজ্যের মোট রাজস্বের চেয়ে বেশি এই শিল্পসংস্থার নীট মুনাফা — নিউইয়র্ক এবং ক্যালিফর্নিয়া ছাড়া অন্য কোনো রাজ্যেরই রাজস্ব পরিমাণে 'জেনারেল মোটরস'-এর নীট লাভের কাছাকাছি আসতে পারেনি ১৯৬৫ সালের হিসাব অনুযায়ী। দু-লক্ষের মধ্যে দুশো কোম্পানি সেখানে দেশের শতকরা শিল্পোৎপাদনে ষাটভাগ কবুল করে রেখেছে। আমেরিকার ধনপতিদের বিদেশে লগ্নি করা পুঁজির পরিমাণ ৫০০০ কোটি ডলার (প্রায় ৩৮ হাজার কোটি টাকা)। একে বাঁচানো এবং বাড়ানোর জন্য তার যুদ্ধায়োজন—ভিয়েতনামে, মধ্যপ্রাচ্যে এবং অন্যত্র হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে চলা, নৃশংসতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখানো, মানুষ মারার অভিনব উপায় উদ্ভাবন, পরমাণু যুদ্ধের আতঙ্কে জগৎকে অভিভূত করে রাখা ইত্যাদি নয়া-সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অপরিহার্য। খুব উচ্চস্তরের এক সরকারী রিপোর্টে জানা যায় যে যুদ্ধের জন্য এই অপরিসীম অপব্যয়কে সংযত করার উপায় অবলম্বন করা আমেরিকার পক্ষে সম্ভব নয়—করতে গেলেই অর্থনীতির বনিয়াদ ভেঙে পড়বে। 'Report from the Iron Mountain' শীর্ষক গ্রন্থটি পড়লে আতঙ্কিত না হয়ে উপায় নেই। সোশালিস্ট দুনিয়া চায় শান্তি, যাতে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য ও সর্ববিধ উৎকর্ষ সাধনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু ধনবাদী দুনিয়া শান্তিকে ভয় করে—বিপুল ব্যবসা এবং তদনুপাতে প্রত্যাশিত মুনাফাকে নিশ্চিত করার জন্য যুদ্ধসম্ভাবনা এবং যুদ্ধায়োজনের উপর নির্ভর তাকে করতেই হবে। উপায়ান্তর নেই। এরই বিপক্ষে আমেরিকার মতো দেশের মধ্যেই প্রচণ্ড প্রশ্নের ঝড় উঠেছে—সেখানকার তরুণ মনে জিজ্ঞাসা : "আমরা কেন ভিয়েতনামের জঙ্গলে যুদ্ধ করতে যাব, কার স্বার্থে যাব, কেনই বা যাব ?" অনেকে সেখানে সমাজকে পরিহার করে উদ্ভট উৎকট জীবনের দিকে যাচ্ছে, আর অনেকে বুঝছে লেনিনের শিক্ষার সত্যতা—ধনতন্ত্র সঙ্কটাপন্ন, একান্ত রুগ্ন, প্রায় মুমূর্ষু, এর রূপান্তর ঘটাবার দায়িত্ব আজকের সমাজের।

'The Year 2000' নামে এক গ্রন্থ সম্প্রতি লিখেছেন দুই মার্কিন পণ্ডিত Hermann Kahn ও Anthony J. Wiener. এঁদের হিসাব হলো যে ২০০০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জাতীয় উৎপাদনের মূল্য হবে আনুমানিক তিন লক্ষ তেইশ হাজার একশো কোটি ডলার, আর তখন ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদনের মূল্য হবে আনুমানিক ২৬ হাজার কোটি ডলার।

এঁরা আরও হিসাব করেছেন যে মাথাপিছু আয় ২০০০ সালে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের হবে ভারতের চল্লিশ গুণ বেশি!

ধনতন্ত্র দারিদ্র্যের সমস্যা সমাধান করে ফেলেছে বলে যে রূপকথা প্রায়ই প্রচারিত হয়ে থাকে, তার ফাঁদে পা দেওয়া সম্বন্ধে লেনিনের শিক্ষা আমাদের সতর্ক করে রেখেছে। আমেরিকার কিম্বা পশ্চিম ইয়োরোপের কোনো কোনো দেশে জীবনের মান বেড়েছে সন্দেহ নেই — তারা দারিদ্র্যকে রপ্তানী করতে পেরেছে আমাদের মতো মন্দভাগ্য দেশে আর পেরেছে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের কৌশল প্রয়োগ করে। সেই কৌশলকে বজায় রাখারই আপ্রাণ চেষ্টা তারা আজ করছে। ঐসব দেশেও সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার পরিমাণ কম নয়, সামাজিক বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা সেখানে যথেষ্ট প্রকট — বহু লক্ষ শ্রমিকের সমবেত দীর্ঘায়ত সংগ্রামী ধর্মঘট তাই প্রায়ই সেখানে ঘটে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নীগ্রো অধিবাসীদের বিপুল যে অভ্যুদয় গত দশকের অবিস্মরণীয় ঘটনা, তার অনুধাবন করার প্রয়োজন তাই এত বেশি। কিউবার সোশালিস্ট বিপ্লব যে গোটা দক্ষিণ আমেরিকায় ভূমিকম্পের সঙ্কেত, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিদারুণ দুশ্চিন্তা থেকেই প্রমাণ হচ্ছে। আমাদের মতো পিছিয়ে-পড়া দেশগুলোকে কুক্ষিগত করে অনাহারে অশিক্ষায় আটক না রাখতে পারলে ধনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নেই। গরীব দুনিয়া মূল্য দিচ্ছে আর পাশ্চাত্যের সচ্ছল দেশগুলি খোশ মেজাজে বহাল তবিয়তে থাকছে — এই স্ববিরোধী ব্যবস্থা বাঁচতে পারে না। তার সংহার ঘটিয়ে নব সমাজের প্রতিষ্ঠা সর্বত্র সফল করার মূলসূত্র রয়েছে লেনিনের শিক্ষায়, লেনিনের নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলার সঙ্কল্পে, লেনিনের নায়কত্বে স্থাপিত সমাজবাদী ব্যবস্থার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত নীতি এবং কৌশলগত সিদ্ধান্তে।

"সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু" — ভারতবর্ষের এই চিরন্তন আকুলতা নিহিত ছিল লেনিনের মানসে। পরাধীনতার অভিশাপ লুপ্ত হোক, মুক্ত মানুষ সম-সুযোগের সমাজে সার্থকতার সন্ধানে চলতে সমর্থ হোক, মেহনতী মানুষের অভ্যুত্থান বিশ্বব্যাপী শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটাক, এই ছিল লেনিনের কামনা। মার্কস-এর মতোই তিনি বলতে পারতেন যে ষাঁড়ের চামড়া যখন আমাদের নয় তখন মানুষের দুর্দশা দেখে পিঠ ফিরিয়ে থাকি কেমন করে? চিন্তা ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর জীবনে। আমরা দেখলাম তাঁকে

শুধু মনীষী রূপে নয়—দেখলাম অমিততেজ, অক্লান্ত, বুদ্ধিদীপ্ত, সমাহিতপ্রাণ কর্মবীর রূপে।

কাউটস্কির সোভিয়েত-বিরোধী বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন (১৯১৮) যে "সর্বহারার একাধিপত্য সবচেয়ে অগ্রসর গণতন্ত্রের চেয়ে হাজার গুণ শ্রেয়।" সোশালিজম সম্বন্ধে তাঁর মনের নিশ্চিতি ছিল অটল, অকাট্য, অমোঘ। সোশালিস্ট সমাজ নির্মাণে বহু বাধা বহু প্রতিবন্ধক তিনি জানতেন; বিপ্লবের মূল্য যে মর্মান্তিক হতে পারে তাও তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল। কিন্তু সোশালিজমকে যেন তিনি বলেছিলেন প্রাচীন ভারত-ঋষির ভাষায়:

"প্রিয়ানাম্ ত্বা প্রিয়তমম্ হবামহে।
নিধীনাম্ ত্বা নিধিতমম্ হবামহে।"

তিনি তাই সসাগরা ধরিত্রীর সর্বত্র মানুষকে জাগিয়ে তোলার ডাক দিয়েছিলেন—অণুক্ষণের জন্যও ভোলেননি ইয়োরোপের বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী মুক্তি-প্রয়াসের সম্পর্ক, সহস্র প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মতো দেশ নিয়ে তিনি এত অনুশীলন করেছিলেন, জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে সর্বদা সহায়তায় উদগ্রীব ছিলেন। তাই আন্তর্জাতিকতা ছিল এই মানুষটির স্বাভাবিক ভূষণ, জাতিবৈরের স্পর্শ মাত্র থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন।

তরুণ বয়সে কার্ল মার্কস-এর জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় চক্ষু উন্মীলিত করে নিয়ে এই ভাস্বর মনস্বী কর্মক্ষেত্রে উত্তুঙ্গ বিপ্লবী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে ইতিহাসকে প্রদীপ্ত করে রেখেছেন। লেনিনের মরদেহ আজও মস্কো শহরে রক্ষিত, প্রতিদিন সেখানে অবিরাম জনসমাগম। কিন্তু শুধু সেখানে তাঁর অবস্থিতি নয় — তিনি আজ সর্বব্যাপ্ত। শিবহীন যজ্ঞ অসম্ভব বলা হতো এককালে, তেমনই লেনিনের জাগ্রত প্রেরণা বিনা নব-সমাজ আজও অচিন্তনীয়। শোষণের অবলুপ্তি যে ঘটবে, তা আগামী প্রভাতের সূর্যোদয়ের মতো অকাট্য। তেমনই অকাট্য হলো ঐ অবলুপ্তিকরণের সঠিকতম অস্ত্র রূপে লেনিনের শিক্ষা, লেনিনের দীক্ষা।

লেনিনের শিক্ষার আলোকে জাতীয় সংহতির সমস্যা

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

জাতীয় সংহতির সমস্যাটি বেশ কিছুদিন থেকে দেশের চিন্তাশীল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে গভীর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উগ্র প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণগত বিরোধ, ভাষাগত দ্বন্দ্ব, আঞ্চলিক বিরোধ ইত্যাদি জাতীয় ঐক্যের পক্ষে নিতান্ত অশুভ অমঙ্গলের রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। এই সব অশুভ শক্তি বিভিন্ন সময়ে দেশের কোনো-না-কোনো অংশে হঠাৎ নিদারুণ হিংস্র মূর্তিতে দেখা দিয়ে মেহনতী মানুষের শ্রেণীআন্দোলন এবং সমগ্রভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রচণ্ড আঘাত হানে।

স্বাধীনতা লাভের আগের যুগেও জাতীয় সংহতির সমস্যা দেশপ্রেমিক চিন্তানায়কদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু তখন অনেকেরই ধারণা ছিল যে তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ বিদেশী শাসকের উপস্থিতি এবং চক্রান্তই এইসব অশুভ শক্তিকে উৎসাহ দিচ্ছে। তাঁরা মনে করতেন যে উস্কানি দেওয়ার মতো তৃতীয় পক্ষ এ-দেশ থেকে চলে গেলে সমস্যার সমাধান সহজ হবে। স্বাধীনতা লাভের ২২/২৩ বছর পরেও সমস্যার বীভৎস হিংস্র প্রকাশ ঘটতে দেখে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। তাই বেশ কিছুদিন থেকে অজস্র সভা-সমিতি, সম্মেলন, আলোচনাচক্র প্রভৃতি নানা মঞ্চে এই সমস্যা নিয়ে মতামত প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু ঐ'সব বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবে বোঝার চেষ্টা এ-যাবৎ বিশেষ হয়নি। এমন কি, সমস্যার যা মূল চরিত্র সেদিকেও বিশেষ কেউ দৃষ্টিপাত করেননি।

ভারত হলো বহুজাতির ও বহু ভাষার দেশ। এখানে নিজস্ব সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিভিন্ন জাতিসত্তার অস্তিত্ব রয়েছে। সুতরাং এখানে জাতীয় সংহতি বা ঐক্যের প্রশ্নটি হলো আসলে মহাজাতিক বা বহুজাতিক ঐক্যের প্রশ্ন। আর একটু বিশদভাবে বলতে গেলে আমাদের দেশে জাতীয়

সংহতির সমস্যা হলো মূলত এইসব বিভিন্ন জাতির মধ্যে যথার্থ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতা গড়ে তোলার সমস্যা। জাতি-সমস্যা সম্বন্ধে লেনিনের শিক্ষা এই সমস্যার মূল চরিত্র ও তার বিভিন্ন দিককে বুঝতে সাহায্য করে, তেমনি আলোকিত করে এই বহুমুখী জটিল সমস্যা সমাধানের পথকে।

লেনিন বলেছেন—সমস্ত সামাজিক প্রশ্নের মতো জাতি-সমস্যাকেও বিচার করতে হবে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সীমার মধ্যে এবং বিশেষ কোনো দেশের জাতি-সমস্যা বিচারের সময় সেখানকার পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যগুলির উপরে মনোযোগ দিতে হবে।

আমাদের দেশের বর্তমান অধ্যায়ে জাতি-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার আগে এই প্রশ্নে লেনিনের শিক্ষার কয়েকটি মূলসূত্রের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার। সেগুলি হলো [১] জাতি বিকাশের ঐতিহাসিক পটভূমি [২] জাতি-সমস্যার বিভিন্ন যুগ এবং সাম্রাজ্যবাদের যুগে জাতি-সমস্যা [৩] বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ ও তার দুই রূপ [৪] জাতি-সমস্যায় শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা [৫] জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন।

জাতি-বিকাশের ঐতিহাসিক পটভূমি

লেনিনের শিক্ষা অনুযায়ী জাতি হলো একটি ঐতিহাসিক সত্তা অর্থাৎ তার পিছনে থাকে গঠনের সুদীর্ঘকাল ব্যাপী প্রক্রিয়া। ইতিহাসের ভাঙা-গড়ার খেলায় বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী এবং উপজাতির সংমিশ্রণে এক-একটি মানবসমষ্টি এক সূত্রে গ্রথিত হতে থাকে। তা জাতিসত্তা রূপে গড়ে ওঠে চারটি বিশিষ্ট উপাদানের একত্র সমাবেশে। সেগুলি হলো যথাক্রমে এক সাধারণ ভাষা, সাধারণ বাসভূমি, অর্থনৈতিক জীবন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা মননভঙ্গী। বহু শতাব্দী ধরে একই নির্দিষ্ট বাসভূমিতে পাশাপাশি বসবাস, অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফলে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ঐক্যের যে-যোগসূত্র গড়ে ওঠে—তা প্রতিফলিত হয় ভাষাগত ঐক্যের মধ্যে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কয়েকটি ভিন্ন ভাষা-ভাষী জনসমষ্টি একটি উন্নততর ভাষা ও সংস্কৃতির বাঁধনে এক সূত্রে গাঁথা হয়েছে।

জাতি-বিকাশের এই প্রক্রিয়া পরিপূর্ণ রূপ নেয় সমাজের অগ্রগতির একটি

নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছে অর্থাৎ পুঁজিবাদের অভ্যুদয়ের যুগে। তার আগে উপরোক্ত উপাদানগুলির উপস্থিতি এবং কাজ করে যাওয়া সত্ত্বেও জাতীয় ঐক্যবোধের জাগরণ হয় না। প্রাক-পুঁজিবাদী তথা সামন্তযুগের পরিবেশ তার পক্ষে অনুকূল নয়। কেননা, সামন্তযুগীয় অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষের চেতনা ও দৃষ্টি দুইই থাকে নানা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বন্দী। মানব-ঐক্যবোধ থাকে স্থানীয়, গোষ্ঠী, বর্ণ ও সম্প্রদায়গত গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। সামন্তযুগীয় ধ্যান-ধারণা ও বিধি-নিষেধ মানুষের মনকে শৃঙ্খলিত করে রাখে। সে-দিনের মানুষ জাতি বলতে বুঝত নিজের বর্ণ বা সম্প্রদায়কে, দেশ বলতে সঙ্কীর্ণ সীমিত অঞ্চলকে। কিন্তু অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়ম অনুসারে পুঁজিবাদের অভ্যুদয় এবং সামন্তযুগীয় সমাজের ভাঙনের প্রক্রিয়ায় ক্রমশ ঐ সব গণ্ডী ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং আদান-প্রদান। আধুনিক পুঁজিবাদের উন্নতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ভাষার ঐক্য এবং অবাধ বিকাশ নিতান্ত প্রয়োজন। সত্যকার স্বাধীন বাণিজ্য, জনগণকে বিভিন্ন শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত করা এবং বাজারের সঙ্গে প্রত্যেক মালিক, বড় ও ছোট ক্রেতা-বিক্রেতাদের নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপনের পক্ষে ভাষাগত ঐক্য কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা সহজে বোঝা যায়।

পুঁজিবাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যে-পরিমাণে জাতীয় বাজার সংগঠিত হতে থাকে এবং একই জাতিসত্তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক যোগা-যোগ ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়, ততই একই সাধারণ ভাষার আঞ্চলিক রূপভেদের পিছনে রয়েছে যে-মূলগত ঐক্য—তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তখন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ঐক্য সম্বন্ধে সচেতনতা জাগ্রত হয়। জাতীয় ঐক্যবোধের ধারক ও বাহক রূপে জাতীয় ভাষা ও জাতীয় সাহিত্য রূপ নেয়, প্রতিষ্ঠিত হয় নিজ মর্যাদায়, সমগ্র জাতির মনকে ঐকতানে ছন্দিত করে তোলে। জাতি নিজেকে খুঁজে পায়। তার সৃজনী প্রতিভা নানা বিচিত্র পথে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহাশক্তিধর স্রষ্টা, কর্মী, চিন্তানায়ক আবির্ভূত হন নবজাগ্রত ঐক্যবোধকে নিজ কর্ম ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রতিফলিত করে।

কিন্তু জাতীয় ঐক্য জাগরণের এই প্রক্রিয়া সহজ-সরল রেখায় অগ্রসর হয় না। তাকে পথ রচনা করে এগিয়ে চলতে হয় দ্বন্দ্বের মাধ্যমে। পুঁজিবাদকে আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে হয় সামন্তযুগীয় অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সংগ্রামের পথে। পুঁজিবাদ

জাতীয় চেতনার জাগরণের অনুকূল বিষয়গত পরিবেশ সৃষ্টি করলেও সেই চেতনার জাগরণ তো স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা পরিবেশের যান্ত্রিক প্রতিচ্ছবি হিসাবে গড়ে ওঠে না! মানুষের মনের প্রাক-পুঁজিবাদী যুগের চিন্তা, সংস্কার, অভ্যাস ইত্যাদির পুঞ্জীভূত অবশেষগুলির বিরুদ্ধে ভাবাদর্শগত সংগ্রামের ফলেই জাতীয় ঐক্যবোধের পক্ষে আত্ম-প্রতিষ্ঠা সম্ভব। পুঁজিবাদের বিকাশ যদি হয় বিভিন্ন কারণে ব্যাহত খণ্ডিত ও বিলম্বিত—সে-ক্ষেত্রে সামন্তযুগীয় অবশেষগুলি জাতীয় ঐক্যবোধের পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। আবার যদি একই জাতি-সত্তার বাসভূমিতে পুঁজিবাদের বিকাশ হয় অ-সমভাবে, তাহলেও ঐ চেতনার অগ্রগতিতে তারতম্য ঘটে। ফলে জাতীয় ঐক্যবোধের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সাম্প্রদায়িক ও বর্ণগত মনোভাব, আঞ্চলিক বিরোধ ইত্যাদি।

পণ্য-উৎপাদন-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ জয়ের জন্য উদীয়মান পুঁজিপতিশ্রেণীর পক্ষে দেশের বাজারের উপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে চাই একই ভাষা-ভাষী জনগণের রাজ-নৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ বাসভূমি। তাই উদীয়মান পুঁজিপতিশ্রেণী জাতীয় ঐক্যের ধারক ও বাহকের ভূমিকা গ্রহণ করে এবং সেই ঐক্যকে রাষ্ট্রগত রূপ দেওয়ার কাজে অগ্রণী হয়। উদীয়মান পুঁজিপতিশ্রেণীর চিন্তা-নায়কেরা জনগণের মনে জাতীয় ঐক্যবোধ জাগ্রত করেন। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র গঠনের সংগ্রামে পুঁজিপতিশ্রেণী জনগণকে নিজেদের পক্ষে সমবেত করে। ইতিহাসের পুঁজিবাদের যুগই হলো জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের যুগ।

সাম্রাজ্যবাদের যুগে জাতি-সমস্যা

লেনিন জাতি-সমস্যায় দুটি পৃথক ঐতিহাসিক যুগের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হলো পুঁজিবাদের উদয়ের যুগ এবং অপরটি হলো পুঁজিবাদের পতনের পূর্বাহ্ন বা সাম্রাজ্যবাদের যুগ।

প্রথমটিতে অর্থাৎ পুঁজিবাদের উদয়ের যুগে জাতীয় প্রশ্নটি ছিল সামন্তযুগীয় সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের এবং বুর্জোয়া গণ-তান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্ন। এই প্রক্রিয়াটি ঘটেছিল পশ্চিম

ইয়োরোপে। সেখানে প্রধানত এক জাতির মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। তাই তখন জাতীয় প্রশ্নটি জাতি-সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি বা জাতীয় স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি সামনে আসেনি।

কিন্তু দ্বিতীয় যুগের অবস্থা অন্যরূপ। লেনিন পুঁজিবাদের বিকাশের দুইটি ঐতিহাসিক ঝোঁকের কথা বলেছেন। পুঁজিবাদের অগ্রগতির ফলে একদিকে যেমন জাতি-গঠন এবং জাতীয়তাবোধের জাগরণ হয়, তেমনি বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতার বদলে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমশ জাতিতে জাতিতে ব্যবধান দূর এবং জাতীয় গণ্ডীগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে থাকে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক যোগাযোগ এবং আদান-প্রদানের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। পুঁজিবাদের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতিকে আন্তর্জাতিক চরিত্র দান করা। ফলে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের পথ প্রশস্ত হয়। সমাজবিকাশের দিক থেকে এটি হলো অগ্রণী পদক্ষেপ।

কিন্তু পুঁজিবাদের অপর প্রবৃত্তি বা ঝোঁকটি হলো অন্যদেশের বাজারের উপর নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, পররাজ্য গ্রাস, অন্য জাতিকে গোলামে পরিণত করা। এই নীতিরই অঙ্গ হলো অনুন্নত জাতিগুলির বলপূর্বক একীকরণ, জাতিগত নিপীড়ন ও শোষণ। এই চরিত্রটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদের যুগে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনে ও শোষণে উপনিবেশের ও পরাধীন দেশের পদানত জাতিসত্তাগুলির বিকাশ সবদিক দিয়ে ব্যাহত হয়। কিন্তু ইতিহাসেরই অমোঘ নিয়মে এইসব দেশেও পুঁজিবাদের বিকাশ হতে থাকে, জাতীয় বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণী গড়ে ওঠে। জাতি-বিকাশের প্রক্রিয়া শত বাধা সত্ত্বেও এগিয়ে চলতে থাকে।

ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থায় যেমন সেখানকার সামন্তযুগীয় অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত লাগে, তেমনি অন্যদিকে বিদেশী শাসন ও শোষণের স্বার্থে সামন্তযুগীয় অবশেষগুলিকে কৃত্রিমভাবে জীইয়ে রাখা হয়। তাই সাম্রাজ্যবাদের যুগে পরাধীন নিপীড়িত দেশগুলিতে জাতি-সমস্যা একাধারে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের চরিত্র নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। জাতীয় ঐক্যের জাগরণ—জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য সংগ্রামের রূপে দেখা দেয়। জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নটি সামনে এসে যায়।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের দুই রূপ

লেনিন বলেছেন যে প্রভুজাতির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ এবং নিপীড়িত জাতির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করতে হবে। প্রথমটি হলো সম্পূর্ণভাবে প্রতিক্রিয়াশীল। আর দ্বিতীয়টির মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল দিকের সঙ্গে একটি প্রগতিশীল দিক আছে।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের মূল চরিত্র হলো বুর্জোয়াশ্রেণীকে সমগ্র জনগণের প্রতিনিধি এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থকে সমগ্র জনগণের স্বার্থ রূপে উপস্থিত করা। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সাহায্যে ঐ শ্রেণী মেহনতী জনগণকে বিশেষত শ্রমিকশ্রেণীকে শ্রেণীগত শোষণের কথা ভুলিয়ে সত্য সম্বন্ধে মোহগ্রস্ত করে রাখতে চায়। পুঁজিবাদের উদয়ের প্রথম যুগে যখন বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রগতিশীল ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে, তখনও সে এই নীতি অনুসরণ করে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসকশ্রেণী পররাজ্য গ্রাস, ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ, নিজেদের মুনাফার স্বার্থে অন্য দেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ ইত্যাদিতে জনগণকে কামানের খোরাক হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জাতি-বিদ্বেষ, জাতি-শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি ধারণা প্রচারের দ্বারা মনকে বিষাক্ত করে তোলে। এইসব জঘন্যতম প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের উৎস নিহিত রয়েছে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদে।

কিন্তু পরাধীন জাতির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদে যে-প্রগতিশীল দিকটি আছে তা হলো সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা। বিদেশী শাসন ও শোষণ পরাধীন জাতির বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ এবং জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষার পথে প্রকাণ্ড বাধা। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে স্বার্থসংঘাতের দরুণই তাকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার পথ নিতে এবং জনগণকে নিজ নেতৃত্বে সমবেত করায় উদ্যোগী হতে হয়। পুঁজিবাদের উদয়ের যুগে সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুর্জোয়া-শ্রেণী যে-ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তাও কিছু পরিমাণে পালন করতে হয়।

তবে যে-যুগে আন্তর্জাতিক পুঁজির সঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রমের সংঘাত চরম সীমায় পৌঁচেছে, সেই যুগে পরাধীন দেশেও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের এই প্রগতিশীল ভূমিকা হয় কুণ্ঠিত এবং সীমিত। তার ভূমিকায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে জড়িত থাকে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসমুখীনতা।

এই দ্বৈত-চরিত্রের এক-একটি দিক এক-একটি পরিস্থিতিতে বড় হয়ে ওঠে। যে-পরিমাণে ঔপনিবেশিক দেশে শ্রমিকশ্রেণী গড়ে ওঠে এবং স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বিকাশ লাভ করে ততই বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে দোদুল্যমানতা দেখা দেয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে স্বার্থের মৌলিক সংঘাতের দরুণ আপোষের ইচ্ছা সত্ত্বেও তাকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা নিয়ে চলতে হয়।

জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বৈত-চরিত্রের নেতিবাচক দিকটি প্রাধান্য লাভ করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী অধ্যায়ে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত তখনও থাকে কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দক্ষিণপন্থী উপাদানগুলির মধ্যে ক্রমশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ ও গাঁঠছড়া বাঁধার নীতি শক্তি সঞ্চয় করে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের নেতিবাচক চরিত্রের অপর দিকগুলি যথা জাতি-বিদ্বেষ, জাতি-শ্রেষ্ঠত্ব, জাতিগত সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতিও বড় হয়ে উঠতে থাকে এই অধ্যায়ে।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা

মার্কস-লেনিনবাদের শিক্ষা অনুসারে শ্রমিকশ্রেণী কখনই জাতি-সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না। শ্রমিকশ্রেণীর লক্ষ্য হলো জাতিগত শোষণ ও নিপীড়ন সহ সমস্ত রকমের শোষণের অবসান। অন্য জাতির জনগণকে পদানত করে রেখে কোনো দেশের শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সামাজিক মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়।

জাতি-সমস্যার ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণী তার বিশিষ্ট স্বাধীন ভূমিকা পালন করতে পারে আন্তর্জাতিকতার পতাকা হাতে নিয়ে। এই আন্তর্জাতিকতার দুটি দিক আছে। একটি হলো নিজ দেশে জাতীয় কর্তব্য পালন করা এবং অপরটি হলো সমস্ত দেশের শ্রমিক, শ্রমজীবী ও নিপীড়িত জনগণের মৈত্রীকে শক্তিশালী করা।

সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য হলো নিজ দেশের শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর করে তোলার সঙ্গে-সঙ্গে পরাধীন এবং ঔপনিবেশিক দেশের জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি সম্ভবপর সকল উপায়ে অকুণ্ঠ সমর্থন দান। প্রভুজাতির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সমস্ত রূপের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম পরিচালনা ঐ কর্তব্যের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ।

পরাধীন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য একদিকে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে অগ্রণী অংশ নেওয়া, জনগণের সমস্ত দেশপ্রেমিক অংশের বৃহত্তম ঐক্য গড়ে তোলায় উদ্যোগী হওয়া, মুক্তি-সংগ্রামের সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-বিরোধী চরিত্রকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা, অন্যদিকে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের আন্তর্জাতিক চরিত্র অর্থাৎ তা যে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামেরই অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ এই সত্যটিকে বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত করা। সেই সংগ্রামের প্রধান বাহিনীত্রয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঐক্য গড়ে তোলায় প্রচেষ্টায় উভয় ধরনের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের নেতিবাচক দিকগুলির বিরুদ্ধে আপোষহীন মনোভাব গ্রহণের মাধ্যমেই পরাধীন দেশের শ্রমিকশ্রেণী নিজ দেশের জনগণকে আন্তর্জাতিকতার শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হয়।

কিন্তু লেনিনের শিক্ষা অনুসরণ করে পরাধীন দেশের শ্রমিকশ্রেণী এইসব দেশের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে দ্বৈত-মনোভাব এবং কৌশল অবলম্বন করে। অর্থাৎ তার প্রগতিশীল দিকের প্রতি সমর্থন এবং প্রতিক্রিয়াশীল তথা নেতিবাচক দিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী যে-পরিমাণে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে সেই পরিমাণে শ্রমিকশ্রেণী তাকে সমর্থন করে এবং তার দোদুল্যমানতা ও আপোষমুখীনতার বিরুদ্ধে লড়াই চালায়। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতিবাচক দিকের প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থন নিঃশর্ত নয়।

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে লেনিনের শিক্ষার দুটি অঙ্গ আছে (১) সমস্ত পরাধীন জাতির পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ — অর্থাৎ সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের অধিকার স্বীকার করা (২) সমস্ত জাতির শ্রমিক ও মেহনতী জনগণের আন্তর্জাতিক ঐক্য ও কর্তব্যের দিকটি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা। শ্রমিকশ্রেণী বলপূর্বক একীকরণের বিরুদ্ধে কিন্তু সমস্ত জাতির স্বেচ্ছামূলক ঐক্যকে স্বাগত জানায়, সেজন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করে এবং জাতিগত বিচ্ছিন্নতা তথা সঙ্কীর্ণতার মনোভাবকে প্রশ্রয় দেয় না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার। লেনিন বলেছেন যে নীতিগতভাবে সমস্ত জাতির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার সহ আত্মনিয়ন্ত্রণের

অধিকারকে স্বীকৃতি জানাবার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবীকে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিচার করতে হবে মূর্তভাবে অর্থাৎ বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে। বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবী সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের পক্ষে সহায়ক হবে না, প্রতিক্রিয়ার শক্তি বৃদ্ধি করবে সেটাই হবে বিচারের মাপকাঠি।

আমাদের দেশে জাতি-সমস্যার ঐতিহাসিক পটভূমি

আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের চরিত্রের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। আগেই বলা হয়েছে যে ভারত হলো বহু জাতির দেশ। এখানে বিবিধের ঐক্যের অর্থ বহু-জাতিক তথা মহাজাতিক ঐক্য। দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক বিচার করলে এই বহু-জাতিক ঐক্যের দুটি দিক রয়েছে। একটি হলো বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত জাতি-সত্তার মিলিত সংগ্রাম এবং অপরটি হলো বিভিন্ন জাতি-সত্তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বিকাশ, বাজার ও স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী। উভয়ের মধ্যে সঠিক সম্বন্ধ স্থাপনের উপরেই নির্ভর করে জাতীয় সংহতির সমস্যার সঠিক সমাধান। প্রথম দিকটি বা প্রবৃত্তি থেকে জন্ম নিয়েছে সর্ব-ভারতীয় ঐক্যবোধ কিন্তু দ্বিতীয় প্রবৃত্তিটির মধ্যে রয়েছে বিরোধের উপাদান। সঠিক পথে পরিচালিত না হলে তা তীব্ররূপে দেখা দিতে বাধ্য। তার উপরে রয়েছে ঔপনিবেশিক অতীত এবং সামন্তযুগীয় সমাজ ব্যবস্থার অবশেষগুলি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রথম প্রবৃত্তিটিই ছিল প্রধান কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী যুগে দ্বিতীয় প্রবৃত্তিটি নানাভাবে তার অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে। উপরন্তু ঔপনিবেশিক অতীতের অবশেষগুলি সমস্যাকে জটিল করে তোলে। প্রাদেশিক, ভাষাগত এবং আঞ্চলিক বিরোধ হলো জাতি-সমস্যার অর্থাৎ বিভিন্ন জাতি-সত্তার বিকাশ তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার অভিব্যক্তি। সাম্প্রদায়িকতা এবং বর্ণগত বিরোধ হলো সামন্তযুগীয় অবশেষগুলিকে জীইয়ে রাখার পরিণাম। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কেননা জাতি বিকাশের প্রক্রিয়া যে-পরিমাণে বিলম্বিত ও ব্যাহত হয় সেই পরিমাণে সামন্তযুগীয় অবশেষগুলি প্রবল থাকে। অন্য দিকে উক্ত অবশেষগুলি জাতীয় ঐক্য চেতনার পথে প্রবল বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতি-সত্তার বিকাশ ঘটেছে অ-সমভাবে। কয়েকটি ক্ষেত্রে জাতি হিসাবে গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় বহুকাল আগে, কোনো কোনো বিদেশী মার্কসবাদী গবেষকের মতে চতুর্দশ শতাব্দী থেকে। অন্যান্য ক্ষেত্রে উক্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আধুনিক যুগে। আবার অপর কয়েকটি ক্ষেত্রে, যথা কয়েকটি উপজাতীয় জন-সমষ্টির জাতি হিসাবে বিকাশ শুরু হয়েছে একেবারে সাম্প্রতিক কালে। বিদেশী শাসকের অনুসৃত নীতি ঐ অ-সম বিকাশের প্রক্রিয়া ও বৈষম্যকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে।

এ-দেশে কয়েকটি অংশে ব্রিটিশ শাসনের অনেক আগে থেকেই সামন্তবাদের ভাঙন এবং দেশীয় পুঁজিবাদের উদ্ভবের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। অবশ্য তার গতি ছিল অনেক মন্থর। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের যুগে সামন্তযুগীয় অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত লাগে বটে কিন্তু সেই ভাঙনের ফলে পুঁজিবাদের বিকাশের তথা সামাজিক পরিবর্তনের প্রবাহ শক্তিশালী হয়ে ওঠার যে-সম্ভাবনা ছিল তাকে ব্রটিশ সাম্রাজ্যবাদ কৃত্রিমভাবে বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে। বিদেশী শাসক সামন্তযুগীয় অবশেষগুলিকে শুধু জীইয়েই রাখেনি, অনেক ক্ষেত্রে নতুনভাবে জীবন দান করেছে যথা জমিদারশ্রেণী এবং ব্রিটিশ রাজমুকুটের একান্ত বশম্বদ দেশীয় নৃপতিবৃন্দ। মোটের উপর ঐগুলি থেকেছে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের স্তম্ভ হয়ে।

অন্যদিকে এদেশের সুপ্রতিষ্ঠিত কুটির শিল্পকে বিদেশী শাসক সুপরিকল্পিত ভাবে ভেঙে চুরমার করে দেয়। ঔপনিবেশিক যুগে এ-দেশে আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্যের যেটুকু বিস্তার হয় তা ঘটেছিল প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অনুকূলে। চরিত্রের দিক থেকে সেগুলি ছিল বিদেশী শোষণের মুখাপেক্ষী। ভৌগোলিক দিক থেকে সেগুলির অবস্থান ছিল কয়েকটি অঞ্চলে, প্রধানত বন্দরগুলিকে কেন্দ্র করে সীমাবদ্ধ।

সামন্তযুগীয় অর্থনীতির ভাঙন, আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের সীমিত বিস্তার ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে দেশীয়দের উদ্যোগেও ক্রমে শিল্প গড়ে উঠতে থাকে। গড়ে ওঠে দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণী। কিন্তু তাদের উদ্যোগে, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত বিকাশের যতটুকু প্রচেষ্টা হয়েছে স্বভাবতই সে-দিন তা ছিল খুব সীমাবদ্ধ। তার সামাজিক পরিধি ছিল সঙ্কীর্ণ এবং ঐ বন্দরকেন্দ্রিক অঞ্চলগুলির মধ্যেই সীমিত। ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য দুই-দিক থেকে প্রবল হয়ে উঠেছে (১) বিভিন্ন জাতি-সত্তার বিকাশের মধ্যে

বৈষম্য (২) একই জাতি-সত্তার বাসভূমির বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নতির মধ্যে প্রকট তারতম্য।

সাম্রাজ্যবাদী শাসন শুধু যে দেশের বিকাশ ও সামাজিক পরিবর্তনের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে তাই নয়। বিদেশী শাসক নিজ শাসনকে সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে যে-সব উপায়ের সাহায্য নিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ছিল ভেদ-নীতি। তারা নানা কূটকৌশলের সাহায্যে নানা ভাষা-ভাষী এবং নানা ধর্মমতাবলম্বী জনগণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি এবং তাতে ইন্ধন যুগিয়েছে। কখনও প্রশাসনিক উপায়ে অনৈক্যকে কৃত্রিম উপায়ে বাড়িয়ে তুলেছে, যথা বহু ভাষা-ভাষী জনসমষ্টি নিয়ে প্রশাসনিক প্রদেশ গঠন, আবার একই ভাষা-ভাষী জনসমষ্টিকে বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত করা। প্রশাসনিক প্রদেশগুলিতে বিদেশী শাসক এক জাতি-সত্তার উপরের অংশকে কিছু-কিছু সুযোগ দিয়ে অন্য জাতি-সত্তার জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে।

তবু বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে ওঠায় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে জাতিগত বিচ্ছেদের অস্ত্রকে আশানুরূপভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সত্যকার জাতীয় ঐক্য বা প্রকৃত অর্থে বিভিন্ন জাতি-সত্তার ঐক্য রচনার ভিত্তি গড়ে ওঠে, বিভিন্ন জাতি-সত্তার জাগরণ প্রথম থেকেই পরিচালিত হয় সাধারণ শত্রু সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে। জাতীয় আন্দোলনের একেবারে গোড়ার দিক থেকেই তাকে সর্ব-ভারতীয় পটভূমিতে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা সকলেই বোধ করেন।

উপরোক্ত অবস্থায় সুচতুর বিদেশী শাসক প্রধান শক্তি কেন্দ্রীভূত করে সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্র ব্যবহারের উপরে। সামন্তযুগীয় অবশেষগুলির শক্তি এবং জাতীয় আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতৃত্বের কয়েকটি গুরুতর দুর্বলতার দরুণই সাম্রাজ্যবাদ এই অস্ত্র ব্যবহারে বহুল পরিমাণে সফল হয়। সে প্রসঙ্গের অবতারণা এখানে করতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। সংক্ষেপে শুধু একটি কথাই বলতে হয়, জাতীয় আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতৃত্ব মুক্তি-সংগ্রামের সামন্তবাদ-বিরোধী দিকটির উপর যথোচিত গুরুত্ব দিতে অবহেলার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী ভেদ-নীতির সুযোগ করে দিয়েছেন।

যাহোক, সাম্রাজ্যবাদের ভেদ-নীতি জাতীয় ঐক্যবোধের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করলেও তার গতিরোধে সমর্থ হয়নি। জাতীয় মুক্তি-

আন্দোলন গণভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার মধ্যে ভারতের নানা ভাষা-ভাষী জাতি-সত্তার ঐক্য মূর্ত হয়ে ওঠে। অবশ্য জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল যাদের হাতে, তাঁদের মনে ভারতীয় ঐক্যের ধারণা ছিল ভাবাশ্রয়ী। দ্বিতীয়ত তাঁরা এই ঐক্যকে বহু-জাতিক হওয়ার বদলে এক-জাতিক ঐক্য বলে ভাবতেন। সেদিন বিদেশী শাসক আমাদের স্বাধীনতার দাবী প্রত্যাখ্যানের অজুহাত হিসাবে যুক্তি দিত যে ভারতবর্ষ এক জাতি নয়, নানা জাতি, ভাষা, ধর্ম ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সুতরাং তার পক্ষে জাতীয় স্বাধীনতার দাবী অযৌক্তিক। এর জাতীয় আন্দোলনের নেতা ও চিন্তানায়কেরা তুলে ধরতে চাইতেন স্মরণাতীত কাল থেকে সারা ভারতের ভাবগত ঐক্যের কথা। ভারতের ঐক্যকে বহু জাতির ঐক্য বলে উপলব্ধি করাটা ছিল তাঁদের মননভঙ্গীর গণ্ডির বাইরে। উপরন্তু অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর গঠিত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে অভিজ্ঞতার আগে বহু-জাতিক ঐক্য এবং বিভিন্ন জাতির স্বেচ্ছামূলক বন্ধুত্বপূর্ণ মিলনের ভিত্তিতে গঠিত বহু-জাতিক রাষ্ট্রের কল্পনা ছিল আকাশ-কুসুমের মতো। সাম্রাজ্যবাদের পরিবেশে জাতিগত দ্বন্দ্বটাই ছিল নিদারুণ সত্য। তাই সে-দিন জাতীয় আন্দোলনের নেতা ও চিন্তানায়কেরা ভারতের এক-জাতীয়ত্ব প্রমাণের জন্যই সচেষ্ট ছিলেন।

কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমশ স্বাধীন ভারতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় কাঠামো কি হবে তা স্পষ্টীকরণের দাবী উঠতে থাকে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের দাবী ওঠে। জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সেই নীতি স্বীকৃত হয়। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন আর সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল) রূপ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা ছিল কার্যত বহু-জাতিক ঐক্যের পরোক্ষ স্বীকৃতি। সেদিন বিভিন্ন জাতি-সত্তার অন্তর্গত উদীয়মান ধনিকশ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী ওরই মধ্যে প্রতিফলিত হয়। অ-সম বিকাশের দরুণ বৈষম্য এবং পরস্পরের সঙ্গে স্বার্থ-সংঘাতের চেয়ে সেদিন বড় হয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মিলিত আন্দোলনের ঐক্যের চেতনা।

এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ভারতীয় ঐক্যের বহু-জাতিক চরিত্র এবং জাতি-সমস্যা সমাধানের সঠিক পরিপ্রেক্ষিত নির্দেশের চেষ্টা হয়। বলা হয় যে বিভিন্ন জাতির সম-মর্যাদা,

সমান অধিকারের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি এবং স্বেচ্ছামূলক মিলনের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে যথার্থ ঐক্যের সুদৃঢ় ভিত্তি। কিন্তু মার্কসবাদের শিক্ষাকে দেশের বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে প্রয়োগের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা এবং পরিপক্কতার অভাবে কয়েকটি গুরুতর ভুল করা হয়। তাদের মধ্যে একটি হলো সোভিয়েত রাশিয়ার অভিজ্ঞতাকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগের চেষ্টা। জার শাসিত রাশিয়াতে একটি জাতির প্রভুশ্রেণী অন্য সমস্ত অ-রুশীয় জাতিগুলিকে পদানত করে রেখেছিল। তাই সেখানে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকারের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের দেশে সমস্ত জাতি-সত্তা মিলিতভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছিল। সুতরাং এখানে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বদলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্যকে আরো শক্তিশালী করে এগিয়ে নেওয়াই ছিল সঠিক পথ। সেই সত্যটি উপলব্ধি না করে সোভিয়েত অভিজ্ঞতাকে যান্ত্রিকভাবে উপস্থাপনের চেষ্টার ফলে জাতি-সমস্যা সম্বন্ধে এদের সমাধান হয় অবাস্তব। দ্বিতীয়ত, তথাকথিত মুসলিম জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের তত্ত্ব প্রচারের দ্বারা সেদিন জাতি-সমস্যা সম্বন্ধে মার্কস-লেনিনবাদের শিক্ষাকে বিকৃত করা হয়। এইসব ভুলের ফলে কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে ভারতের জাতি-সমস্যার প্রকৃত চরিত্র তুলে ধরবার প্রয়াস সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনমানসে প্রভাব বিস্তার করা দূরে থাকুক, বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

স্বাধীনতার পরবর্তী অধ্যায়ে জাতি-সমস্যা

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে ভারতীয় ঐক্যকে এক-জাতিক ঐক্য হিসাবে দেখার প্রচেষ্টার নেতিবাচক দিকগুলি তেমন পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি কয়েকটি কারণে (১) তখন ভারতের যে ভাবগত ঐক্যের কথা প্রচার করা হতো তার প্রাণবস্তু ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্য। তাছাড়া সেই ঐক্য যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এবং বিবিধের মাঝে মহান মিলন এই সত্যটিকে ভাববাদী ধরনে হলেও স্বীকৃতি দেওয়া হতো (২) স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে প্রধানত অপেক্ষাকৃত উন্নত ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অধিকারী প্রায় বার-তেরটি জাতি-সত্তার অস্তিত্বই পরিস্ফুট ছিল। এই

কয়েকটি ভাষা-ভাষী জনসমষ্টির সংখ্যা হলো ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮৭.১৩ ভাগ। অন্যান্য ছোট-ছোট জাতি-সত্তা বিকাশের দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে পড়েছিল। (৩) বৃহত্তর জাতি-সত্তাগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা ও স্ব-শাসনের দাবী ভাষাভিত্তিক প্রদেশগুলি ও ভারতের ফেডারেল কাঠামোর মধ্যে সুরক্ষিত হবে বলে আশা করেছিল (৪) দেশীয় বৃহৎ বুর্জোয়া এবং বিভিন্ন জাতি-সত্তার অন্তর্গত বুর্জোয়াদের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত তখনও তেমন স্পষ্ট আকার ধারণ করেনি।

স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্য ও সংহতি বোধ গড়ে উঠেছিল তাহলো আমাদের দেশের জনগণের হাতে জাতীয় আন্দোলনের সবচেয়ে মূল্যবান উত্তরাধীকার। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ বিরোধী বিপ্লবের অসমাপ্ত কর্মসূচীকে সম্পূর্ণ করে অ-ধনতান্ত্রিক পথে সমাজতন্ত্রের দিকেও অগ্রসর হওয়ার জন্য সেই উত্তরাধিকারকে অক্ষুন্ন রেখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। বিশেষত এশিয়া-আফ্রিকার সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে নয়া উপনিবেশবাদী চক্রান্তের পটভূমিতে জাতীয় সংহতির প্রশ্ন নতুন গুরুত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতি যে-নীতি ও পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে অগ্রসর হলে তা করা যায় সে-নীতি বা পরিপ্রেক্ষিত কোনোটি গ্রহণ করাই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে সম্ভব নয়।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে জাতীয় সংহতির সেই সংগ্রামী চরিত্রের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন:

প্রথমত, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের ও সামন্তযুগীয় অবশেষগুলির মূলোৎপাটন এবং জনগণের স্বার্থে মৌলিক অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তর সাধনের জন্য এক বলিষ্ঠ বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণ।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন জাতি-সত্তা এবং ভাষা ও সংস্কৃতিগত জনসমষ্টির বিকাশের সমান অধিকারের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি এবং ভারতীয় ঐক্যের কাঠামোর মধ্যে প্রত্যেক জাতি-সত্তার নিজ-নিজ ক্ষেত্রে স্ব-শাসনের অধিকারের ন্যায্য দাবীকে বাস্তব রূপদানের উপযোগীভাবে রাষ্ট্রীয় কাঠামো তথা সংবিধান রচনা।

ঔপনিবেশিক যুগে ধনতন্ত্রের অ-সম বিকাশের জন্য যে-সব জাতি-সত্তা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ অবস্থায় রয়েছে তাদের দ্রুত বিকাশ

লাভের সুযোগ এবং যথোচিত সাহায্যদান। অনেকগুলি জাতি-সত্তা বিশেষত উপজাতীয় জাতি বিকাশের পথে অগ্রসর হয়েছে সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বা তার সামান্য কিছুদিন আগে। স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐক্যের চেতনা এদের মানসে নানা কারণে সঞ্চারিত হতে পারেনি। সুতরাং নতুন পরিস্থিতিতে এদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব অবলম্বনের দ্বারা তাদের মনে এই বিশ্বাস জাগ্রত করা যে তারাও স্বাধীন ভারতের জাতীয় জীবনে সমান মর্যাদা এবং অধিকার সম্পন্ন অংশীদার।

তৃতীয়ত, ঔপনিবেশিক শাসনে সৃষ্ট জাতিগত দ্বন্দ্ব এবং বৈষম্যের সমস্ত কারণগুলিকে দূর করার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ।

লেনিনের শিক্ষা থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে শ্রেণীগত শোষণই হলো জাতিগত দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস ও সংঘাতের উৎস। সুতরাং জাতি-সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান সম্ভব সমাজতন্ত্রের পরিবেশে। সেই সঙ্গে লেনিন এই শিক্ষাও দিয়েছেন যে সমাজতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির আগে এই সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান সম্ভব নয়, এই অজুহাতে শ্রমিকশ্রেণী কখনও হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। তিনি বলেছেন যে পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন জাতির মৈত্রী ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার অনুকূল পরিবেশ যতদূর সম্ভব ব্যাপকভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব একমাত্র সুসঙ্গত গণতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে। অর্থাৎ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করতে এবং গণতন্ত্র বিস্তারের পথের বাধাগুলিকে দূর করতে হবে। গণতান্ত্রিক অধিকারের উক্ত সম্প্রসারণের একটি প্রধান অঙ্গ হলো আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের নীতি প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন যে মার্কসবাদীরা ইতিহাসে অগ্রণী পদক্ষেপ হিসাবে বৃহৎ কেন্দ্রীভূত (centralised) রাষ্ট্রের পক্ষপাতী ঠিকই, তবে তারা চায় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ। দেশের যে-সব অঞ্চলের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশে অথবা জাতিগত গঠনে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলির জন্য স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থার মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের নীতি সার্থক হয়ে উঠতে পারে।

লেনিনের শিক্ষা অনুসারে জাতি-সমস্যার সঠিক সমাধানে পথ নির্দেশ করতে পারে একমাত্র আন্তর্জাতিকতার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত শ্রমিকশ্রেণী। কোনো ধরনের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের অর্থাৎ বৃহৎ জাতি বা ক্ষুদ্র জাতির বুর্জোয়া

জাতীয়তাবাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। ভারতে স্বাধীনতার পরবর্তীকালের পরিস্থিতির পর্যালোচনা এই সত্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে। ফলে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে যে-সব দুর্বলতা, স্ববিরোধিতা ও দ্বন্দ্ব ছিল তা বজায় রয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতার পর শাসকশ্রেণী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, জাতি-সমস্যার ক্ষেত্র সহ, ঔপনিবেশিক ও সামন্তযুগীয় অবশেষগুলির মূলোচ্ছেদের নীতি গ্রহণের বদলে সেগুলিকে কিছুটা সঙ্কুচিত ও সংস্কার সাধনের দ্বারা জীইয়ে রেখেছে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী অধ্যায়ে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতিবাচক দিকগুলি প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। আমাদের দেশেও তাই ঘটছে। বিশেষত ঐ শ্রেণীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ও সংগঠিত অংশ সর্ব-ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়াদের মধ্যে নেতিবাচক দিকগুলি অত্যন্ত প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে শক্তি সঞ্চয় করে এখন একচেটিয়া গোষ্ঠিতে পরিণত। এরা আবার নানা সূত্রে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সঙ্গে জড়িত। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এদের স্বার্থের সংঘাত বিলুপ্ত হয়নি ঠিকই, তবে সহযোগিতা ও আপোষের নীতিই প্রবল। জনগণের অন্যান্য অংশের সঙ্গে এদের দ্বন্দ্বও উঠেছে অত্যন্ত তীব্র হয়ে।

সর্বভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়াদের উদ্দেশ্য হলো সমগ্র ভারতের বাজার এবং প্রশাসন ব্যবস্থার উপরে নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। জাতীয় সংহতি সম্বন্ধে এদের দৃষ্টিভঙ্গী সেই উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রভাবিত। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে এক-জাতিক ঐক্যের ভাবাশ্রয়ী ধারণার মধ্যে বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দান ও তার সম্বন্ধে অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় কাঠামো, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির বিষয়ে উদার মনোভাব গ্রহণের যে-দিকটি ছিল তাকে বর্জন করে বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করে আনতেই এরা তৎপর হয়ে উঠেছে। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন, উপজাতীয়দের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, কেন্দ্র-বনাম-রাজ্য সম্পর্ক, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমস্ত প্রশ্নেই বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর একচ্ছত্র আধিপত্যের মনোভাবের প্রতিফলন সুস্পষ্ট।

বিভিন্ন জাতি-সত্তার অন্তর্গত অ-বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থের সংঘাত পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন, কেন্দ্র বনাম অঙ্গরাজ্যগুলির সম্পর্ক, আঞ্চলিক বিরোধ, কেন্দ্রের সরকারী ভাষা ইত্যাদি

প্রশ্ন। কিন্তু প্রথমোক্তেরা বৃহৎ বুর্জোয়াদের নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পতাকা হাতে নিয়ে। বিভিন্ন জাতি-সত্তার অন্তর্গত বুর্জোয়াদের মধ্যেও স্বার্থের সংঘাত আছে। সুতরাং তারা নিজ-নিজ জাতি-সত্তার জনগণকে নিজস্ব সঙ্কীর্ণ শ্রেণীগত স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। তারা চায় নিজেদের শোষণের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে। সেজন্যই তারা প্রাদেশিকতা, জাতিগত বিদ্বেষ প্রভৃতির মনোভাবে ইন্ধন যুগিয়ে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে।

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে যে-সব জাতি-সত্তার মধ্যে বিশেষত উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে বুর্জোয়াশ্রেণীর উপাদান গড়ে উঠেছে সেইসব ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট জনগণের স্বায়ত্তশাসনের দাবীর আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পতাকার তলে। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এদের ন্যায্য দাবীর প্রতি ক্রমাগত উপেক্ষা এবং অন্যদিকে ক্ষুদ্র জাতির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ দুইয়ে মিলে এইসব আন্দোলনে জাতিগত সঙ্কীর্ণতা, বিচ্ছিন্নতা এবং অন্য-জাতির জনগণের প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব মাথা তোলে।

জাতি-সমস্যার অঙ্গীভূত বিভিন্ন সমস্যা এইভাবে জটিল হয়ে উঠেছে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র উভয় ধরনের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সংঘাতে। এমনকি একই জাতি-সত্তার বাসভূমিতে অ-সম বিকাশের দরুণ যে বৈষম্য রয়ে গিয়েছে তাই নিয়ে স্বার্থের সংঘাত সংশ্লিষ্ট জাতি-সত্তার জনগণকে দুই বিবদমান শিবিরে ভাগ করে দেয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানার অন্দোলন।

জাতি-সমস্যার সঠিক বিকল্প সমাধানের পথ দেখতে যারা পারে সেই শ্রমিকশ্রেণী এবং তার অগ্রণী অংশ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ভারতের জাতি-সমস্যা এ-যাবৎ মোটের উপর উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্নে যথা ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন, উপজাতীয়দের আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন, ভাষা-সমস্যা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টি থেকে সমাধান নির্দেশের চেষ্টা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সমস্যাটির সামগ্রিক রূপ ও তার বিভিন্ন দিককে গভীরভাবে অধ্যয়নের কাজটি অবহেলিত হয়ে এসেছে। সমস্যাগুলির সঠিক সমাধান নির্দেশ করে তার ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতি-সত্তার জনগণকে আন্তর্জাতিকতার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য প্রয়োজন যে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা এবং প্রচার-অভিযান তার প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। ফল হয়েছে এই যে উভয়

ধরনের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বদলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্নে কোনো না কোনো ধরনের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের লেজুড়-বৃত্তি।

লেনিন বলেছেন, "To throw off all feudal oppression, all national oppression, all privileges enjoyed by one nation or language, is the bounden duty of the proletariat as a democratic force, and is certainly in the interest of proletarian class struggle, which is obscured and retarded by national bickering. But to help bourgeois nationalism beyond these strictly confined and definite historical limit means betraying the proletariat and taking the side of the bourgeoisie."

(Critical Remarks on the National Question, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1951 p., 36)

অর্থাৎ "সমস্ত রকমের সামন্তযুগীয় নিপীড়ন, সমস্ত জাতিগত নিপীড়ন, একটি জাতির বা একটি ভাষার সমস্ত বিশেষ সুবিধা — এইগুলির বিলোপ সাধন করা হলো গণতান্ত্রিক শক্তি হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর অবশ্য কর্তব্য। তা নিঃসন্দেহে শ্রমিকের শ্রেণী-সংগ্রামের অনুকূল, কেননা জাতিগত দ্বন্দ্ব ঐ সংগ্রামকে চাপা দেয় এবং ব্যাহত করে। কিন্তু এইসব সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সীমা রেখার বাইরে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে সাহায্য করার অর্থ হলো শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষ নেওয়া।" (ক্রিটিক্যাল রিমার্কস অন দি ন্যাশনাল কোশ্চেন, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস পাবলিশিং হাউস, মস্কো, ১৯৫১, ৩৬ পৃঃ)।

শ্রমিকশ্রেণী ও তার অগ্র-বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টিকে আন্তর্জাতিকতার শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ নিজস্ব স্বাধীন ভূমিকা নিয়ে জাতীয় সংহতির সমস্যার সমাধানে বিকল্প পথ প্রদর্শনে উদ্যোগী হতে হবে।

বিপ্লবের স্তর বিচারের প্রশ্নে লেনিন

নরহরি কবিরাজ

মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা বিপ্লবের স্তর বিচারের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। স্তর বিচারের প্রশ্নের সঙ্গে বিপ্লবের সাফল্যের প্রশ্নটি একান্তভাবে জড়িত। এইজন্যেই মার্কস-এঙ্গেলস লিখিত 'কমিউনিস্ট ইস্তেহারে' বিপ্লবের স্তর বিচারের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। বস্তুত, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সর্বহারা বিপ্লব—এই দুইয়ের পার্থক্য এবং সর্বহারা বিপ্লবের ঐতিহাসিক ভূমিকা — এই দুটির উপর ভর করেই 'কমিউনিস্ট ইস্তেহারের' কেন্দ্রীয় বক্তব্যটি গড়ে উঠেছে।

বিপ্লবের স্তর বিচারের প্রশ্নটি লেনিনীয় চিন্তারও একটি প্রধান অঙ্গ। লেনিনের শিক্ষার একটি প্রধান কথাই হলো — স্তর নিরপেক্ষ বিপ্লব বলে কোনো কিছু নেই। বিপ্লব বললেই বুঝতে হবে — কোনো একটি বিশেষ কালের এবং কোনো একটি বিশেষ দেশের বিপ্লব। স্থান ও কাল নিরপেক্ষ বিপ্লব মার্কসবাদী ধ্যানধারণার বিরোধী একটি পেটি-বুর্জোয়া কল্পনা-বিলাস মাত্র।

সেইজন্যেই লেনিন বার বার বলেছেন — কোনো একটি দেশের বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি বিচারের সময়ে দুটি দিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রথমত, আমরা যে-যুগে বাস করছি সেইযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি — কোন শ্রেণী এই যুগের নিয়ন্তা-শক্তি — এই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত, খেয়াল রাখতে হবে — আমরা যে-দেশের বিপ্লবের কথা বলছি সেই দেশ বিপ্লবের কোন স্তরে রয়েছে।

রুশ বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য

কাল-নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে সর্বহারা বিপ্লবের বিশেষত্বটিই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে। কেননা, সর্বহারা-বিপ্লবের পূর্বে পৃথিবীতে অসংখ্য বিপ্লব ঘটেছে। যেমন, দাসব্যবস্থা যখন প্রচলিত ছিল, তখন দাসব্যবস্থার বিরুদ্ধে বহুবার দাস-বিপ্লব ঘটেছিল। এই দাস-বিপ্লবের আঘাতে দাসব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। আবার দাসব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পরে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার

প্রভুত্বের যুগ আরম্ভ হয়। এই যুগে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সুরু হয় আবার আর এক ধরনের বিপ্লব। এই সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিপ্লবে নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিল বুর্জোয়াশ্রেণী। তাই এই যুগকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ বলা হয়। আবার এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগটিও চিরস্থায়ী হয়নি। যে-সব দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হলো সেখানে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং পরবর্তীকালে একচেটিয়া ধনতন্ত্রের উদ্ভব ঘটল। এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আরম্ভ হলো সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লব।

এই বিপ্লব আগের সমস্ত রকমের বিপ্লব থেকে পৃথক। কেননা, দাস-বিপ্লবের ফলে একটি শোষকশ্রেণীর (দাস-প্রভু) প্রভুত্বে ছেদ পড়লেও আর একটি শোষকশ্রেণীর (সামন্ত-প্রভু) প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে একটি শোষকশ্রেণীর (সামন্ত-প্রভু) প্রভুত্বের অবসান ঘটলেও আর একটি শোষকশ্রেণীর (বুর্জোয়া-শ্রেণী) প্রভুত্বের সূচনা হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভুত্বের অবসান ঘটার পরে সর্বহারাশ্রেণীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। অর্থাৎ সর্বহারা বিপ্লবের ফলে একটি শোষকশ্রেণীর ক্ষমতা লাভের প্রক্রিয়াটিতে পূর্ণ ছেদ পড়ে। শ্রেণীর দ্বারা শ্রেণীর শোষণ, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ বন্ধ হয়। এইটিই রুশ বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

কাজেই দেখা যায় ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের রূপেরও পরিবর্তন হয়ে যায়। কাজেই কাল-নিরপেক্ষ বিপ্লব বলে কিছু নেই। সারা পৃথিবীর ঐতিহাসিক বিকাশের প্রেক্ষাপট সামনে রেখে আরও বলা যায় — আমরা বর্তমানে যে-যুগে বাস করছি সেই যুগের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে সর্বহারাশ্রেণীর কর্মকাণ্ড যার প্রধান লক্ষ্যই হলো ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের দিকে পৃথিবীকে পরিচালিত করা।

বিপ্লব কাল-নিরপেক্ষ নয়, যুগ-নিরপেক্ষ নয়, এটা যেমন লেনিনবাদের একটি বড় শিক্ষা, তেমনি আবার মনে রাখা প্রয়োজন যে বিপ্লব স্থান বা দেশ নিরপেক্ষ নয়। একই কালে বা একই যুগে সমাজবিকাশের স্তর ভেদ অনুযায়ী দেশে-দেশে বিপ্লবের স্তরভেদ ঘটতে পারে। যেমন, ১৭৮৯ থেকে ১৮৭১ সালের অন্তর্বর্তীকালীন যুগকে পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলি (ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি) এবং আমেরিকার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যের যুগ বলা যেতে পারে। এই সময়ে আমেরিকায় ও পশ্চিম ইওরোপের

দেশগুলিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আঘাতে সামন্ততন্ত্রের অচলায়তন ভেঙে পড়ে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হতে থাকে। আবার, উনিশ শতকের শেষে এইসব দেশে একচেটিয়া ধনতন্ত্র গড়ে ওঠার পর থেকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারা নিঃশেষিত হয়ে যায়। তখন থেকে এইসব দেশে একচেটিয়া ধনতন্ত্রকে উৎখাত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব গড়ে তোলার কাজটি প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলিতে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন হয়েছিল এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরটি শেষ হবার পরে সেখানে বিপ্লবের পরবর্তী স্তরের উদ্বোধন ঘটেছিল—এই বৈশিষ্ট্যটির প্রতি লেনিন মার্কসবাদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (Lenin—A Caricature of Marxism)। কিন্তু পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলির বিপ্লবের বিকাশের এই প্রক্রিয়াটিকে একটি বাঁধা ছক হিসাবে গ্রহণ করার বিপদ সম্পর্কেও তিনি সহকর্মীদের সজাগ থাকতে উপদেশ দেন।

পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলির ছকে ফেলে একদল মার্কসবাদী রাশিয়াতে বিপ্লব সংগঠনের কথা ভাবতেন। মেনশেভিকদের ধারণা ছিল : পশ্চিম ইওরোপের ছক অনুযায়ী রাশিয়াতেও প্রথম স্তরে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করতে হবে এবং পরবর্তী স্তরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করতে হবে। মেনশেভিকরা জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপর জোর দিলেন এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে এই সংগ্রাম পরিচালনা অপরিহার্য বলে মনে করলেন।

রাশিয়াতে লেনিন মেনশেভিকদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা করে বললেন — রাশিয়ায় সমাজবিকাশের স্তর আলাদা এবং সেইহেতু বিপ্লবের স্তরও পৃথক। সমাজবিকাশের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করে তিনি দেখালেন — রাশিয়াতে ধনতন্ত্রের উদ্ভবের প্রশ্নটি ছোট করে দেখা এবং জারতন্ত্রের অস্তিত্বের প্রশ্নটিকে বড় করে দেখা ভুল। আবার রাশিয়া যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে খুবই পশ্চাৎপদ এবং এখানে জারতন্ত্র রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত এটিও ভুলে গেলে চলবে না।

রাশিয়ায় সমাজবিকাশের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে লেনিন লিখলেন — "Russia is a capitalist country. On the other hand, Russia is still very backward, as compared

with other capitalist countries, in her economic development."
(Lenin : Development of Capitalism in Russia)।

জারতন্ত্রের অবস্থানের ফলে রাশিয়াতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজগুলি অসম্পন্ন থেকে যায়। আবার রাশিয়াতে একটি ধনতান্ত্রিক দেশের পর্যায়ে উন্নতি হওয়ায় বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে, যারা এই ব্যবস্থায় ছিল শোষণের অংশভাগী — তাদের পক্ষে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে দ্বিধাহীন সংগ্রাম পরিচালনা সম্ভব ছিল না। ফলে, বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব নেবার সম্ভাবনাটি বাতিল হয়ে যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেনিন লিখলেন যে রাশিয়াতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজগুলিকে সম্পাদন করার ক্ষমতা নেই। এই কাজে এগিয়ে যেতে হবে শ্রমিক ও কৃষকদের। এই কাজে নেতৃত্ব দিতে হবে সর্বহারাশ্রেণীকে। সেইজন্যে তিনি ১৯০৫ সালে সমাজের স্তর সামনে রেখে রাশিয়াতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রের বদলে শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী একনায়কতন্ত্র গড়ে তোলার আহ্বান জানান। (Lenin : Two Tactics of Social Democracy in the Democratic Revolution)।

১৯০৫ সালে রাশিয়াতে এই বিপ্লব ব্যর্থ হয়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে রাশিয়াতে আবার বিপ্লবী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শেষপর্যন্ত ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাশিয়াতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়লাভ করে। জারতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং বুর্জোয়াশ্রেণী সেই সুযোগে ক্ষমতালাভ করে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই জয়লাভের পিছনে শ্রমিক ও কৃষকের অগ্রণী ভূমিকা ছিল — ফেব্রুয়ারীর গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লেনিন দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রমিক ও কৃষকের সোভিয়েত যা এই সময়ে জারতন্ত্রের পতনে অগ্রণী ভূমিকা নেয় তাকে তিনি ক্ষমতার আধার বলে চিহ্নিত করেন। এই সময়ে লেনিন সময়ক্ষেপণ না করে বুর্জোয়াশ্রেণীর হাত থেকে শ্রমিক ও কৃষকের সোভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানান। এই আহ্বানের ফলে ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রাশিয়াতে বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বের অবসান ঘটে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। এইভাবেই রাশিয়াতে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। (Lenin : April Thesis)।

সংক্ষেপে বলা চলে : রুশ বিপ্লব যে-পথটি গ্রহণ করে অগ্রসর হয়

হয় সেটি অনন্য। লক্ষণীয় যে পশ্চিম ইওরোপ ও আমেরিকার মতো রুশ দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বুর্জোয়াশ্রেণী নেতৃত্বের ভূমিকা নেয়নি। এই বিপ্লবে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল সর্বহারাশ্রেণী। রুশ দেশে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে এগিয়ে আসতে হয়েছিল শ্রমিক ও কৃষকদের। শ্রমিক ও কৃষকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অন্তর্বর্তীকালীন একটি স্তরের মধ্যে দিয়ে রুশ দেশকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথটি বেছে নিতে হয়েছিল। এইটি ছিল সমাজতন্ত্রে উত্তরণে রাশিয়ার নিজস্ব পথ।

উপনিবেশিক বিপ্লবের স্তর

রুশ-বিপ্লব মানবজাতির সামনে একটি নতুন আদর্শ স্থাপন করল — এই সত্যটি উদ্ঘাটিত করল যে, সমাজতন্ত্রে উত্তরণ মানবজাতির মুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ পথ।

কিন্তু রুশ-বিপ্লবের শিক্ষার অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা করে অনেকে বলতে থাকেন যে রুশ-বিপ্লবের এই ছক অনুযায়ী প্রতিটি দেশে এখন থেকে বিপ্লব হবে। লেনিন এই প্রবণতার বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়ে লিখলেন—

"All nations will arrive at socialism — this is inevitable, but all will do so in not exactly the same way, each will contribute something of its own to some form of democracy, to some variety of the dictatorship of the proletariat, to the varying rate of socialist transformation in the different aspects of social life."

উপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতেও লেনিনের শিক্ষার প্রতি অবহেলা করে একদল মার্কসবাদী বলতে থাকেন — রাশিয়াতে যেমন হয়েছে তেমনি এই সব দেশেও গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে দ্রুত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে পরিচালিত করা প্রয়োজন। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯২০) এম. এন. রায় বলেছিলেন — ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের (অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের) স্তর শেষ হয়েছে এবং সেখানে অবিলম্বে শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে পরবর্তী স্তরের আন্দোলন শুরু করা দরকার। এম. এন. রায় খেয়াল করেননি যে — উপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলি সমাজবিকাশের স্তরের দিক থেকে বিচার করলে শুধুই পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলি (ইংলণ্ড,

ফ্রান্স প্রভৃতি) থেকে স্বতন্ত্র ছিল তাই নয়, রাশিয়ার থেকেও ছিল স্বতন্ত্র। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ছিল উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ। রাশিয়া পশ্চাৎপদ হলেও ছিল ধনতান্ত্রিক। অথচ উপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে অল্পই, অথবা কোনো কোনো দেশে ধনতন্ত্রের উদ্ভবই ঘটেনি; কাজেই উপরোক্ত দুটি পর্যায়ের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির (অর্থাৎ পশ্চিম ইওরোপ বা রাশিয়া) কোনোটির সঙ্গেই পরাধীন দেশগুলির সমাজবিকাশের স্তরটি এক করে দেখা যায় না।

পরাধীন দেশের বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত বিচার করার সময়ে লেনিন সব সময়েই এই মূল সূত্র সামনে রেখে অগ্রসর হন।

এই দেশগুলির সমাজ-বিকাশের স্তর বিচার করতে গিয়ে লেনিন তাই লেখেন, ধনতন্ত্রের অ-সম বিকাশের ফলে বাস্তব অবস্থা হলো: অতি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পাশাপাশি অবস্থান করছে অর্থনৈতিকভাবে স্বল্প উন্নত অথবা সম্পূর্ণতই অনুন্নত কতকগুলি দেশ। এর ফলে পৃথিবী দুই ধরনের দেশে বিভক্ত হয়েছে—অতি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি: যেগুলি নির্যাতনকারী দেশ, ও অনুন্নত দেশগুলি: যেগুলি নির্যাতিত দেশ। (Lenin — Preliminary Draft Theses on the National and Colonial Questions)।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন—এই দুই ধরনের দেশের মধ্যে একমাত্র পশ্চিম ইওরোপ ও উত্তর আমেরিকার উন্নত দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের পক্ষে অবস্থা পরিপক্ক হয়েছে, কিন্তু অনুন্নত দেশগুলির অবস্থা আলাদা। এই নির্যাতিত দেশগুলি, ধনতন্ত্রের বিকাশের দিক থেকে বিচার করলে, অনুন্নত। কাজেই এই দেশগুলিতে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ বা সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্ন ওঠে না। এই দেশগুলির সামনে আশু কাজ হলো বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজগুলি সম্পাদন করা।

বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে এই নির্যাতিত দেশগুলির আন্দোলন যে জাতীয় (সাম্রাজ্যবাদবিরোধী) চরিত্র পরিগ্রহ করে—এই বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়ে লেনিন বলেছেন—জাতীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে এইসব দেশে ব্যাপক জনগণের প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং নির্যাতিত দেশের প্রতিরোধ সব সময়েই জাতীয় বিদ্রোহের রূপ নেবার দিকে অগ্রসর হয়।

লেনিন আরও লিখেছেন—যেহেতু এইসব দেশ জাতীয় আন্দোলনের স্তরে রয়েছে, সেইহেতু এই আন্দোলনে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর যোগদানের

প্রশ্নটিও গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা প্রয়োজন। তিনি জাতীয় আন্দোলনে বুর্জোয়া-শ্রেণীর যোগদানের প্রশ্নটি উত্থাপন করে বলেছেন—প্রত্যেকটি জাতীয় আন্দোলনে সূচনাতে বুর্জোয়াশ্রেণী স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকে। (Lenin—Right of Nations to Self-determination)। এর ফলে বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী ধারণার উদ্ভব হয়ে থাকে। নির্যাতিত দেশের বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদের মধ্যে থাকে একটি সাধারণ গণতান্ত্রিক উপাদান—যেটিকে মার্কসবাদীরা সমর্থন করবে।

অবশ্য, লেনিন সতর্ক করে দিয়েছেন—বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদের ভিতরকার গণতান্ত্রিক উপাদানকে সমর্থন করা এবং সমগ্রভাবে বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করা এক কথা নয়। তিনি আমাদের স্মরণ রাখতে বলেছেন যে মার্কসবাদ ও বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদ—দুটি পৃথক শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গী।

প্রত্যেকটি জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহাসিক মর্মবস্তুটি বিচার করে দেখতে হবে এবং তার মধ্যে যেটুকু প্রগতিশীল সেইটুকুই কেবল মার্কসবাদীরা সমর্থন করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত নির্যাতিত দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে—ততক্ষণ সব সময়েই প্রত্যেক ক্ষেত্রে, এবং অন্যের চেয়ে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে, মার্কসবাদীরা তার পক্ষে থাকবে, কিন্তু যে-ক্ষেত্রে নির্যাতিত দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের রাস্তা বেছে নেবে, সে-ক্ষেত্রে মার্কসবাদীরা তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে।

এইজন্যেই লেনিন হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন—নির্যাতিত দেশের সর্বহারা-শ্রেণী কোনোক্রমেই বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদের লেজুড়বৃত্তি করবে না। লেনিন লিখেছেন—সর্বহারা জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে একটি স্বাধীন সুস্থিরচিত্ত বিপ্লবী শক্তি হিসাবে কাজ করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সর্বহারাশ্রেণী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ভিতরে একটি বিকল্প কর্মসূচী তুলে ধরবে। এই কর্মসূচীর (পূর্ণ স্বাধীনতা ও কৃষকের স্বার্থে ভূমিসংস্কার এই কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার পাবে) ভিত্তিতে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে সর্বহারাশ্রেণী কতকগুলি বিপ্লবী উপাদান সংযোজন করবে।

জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে (অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে) বিপ্লবী উপাদান সংযোজন বলতে বোঝায়, উপরোক্ত কর্মসূচীর ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে এমনভাবে সুসম্পন্ন করা যাতে শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থ সুরক্ষিত হতে পারে। যাতে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে জাতীয়-বুর্জোয়াশ্রেণী

জনগণের ওপর ধনতন্ত্রের পথটি চাপিয়ে দিতে না পারে। যাঁরা মনে করতেন পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলির মতো উপনিবেশিক দেশগুলিতেও ধনতন্ত্রের পথে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে, তাঁদের উদ্দেশ্যে লেনিন বলেন যে এইসব দেশের পক্ষে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনের পরে ধনতন্ত্রের পথ গ্রহণ অপরিহার্য নয়। পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতিতে ধনতন্ত্রের পথটি এই-সব দেশের পক্ষে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব এবং তাই বাঞ্ছনীয়। কেননা, ধনতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতার যুগে বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে ভর করে এইসব দেশের বেশিদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, রুশ-বিপ্লবের সাফল্যের পরে ধনতন্ত্রের পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের অবস্থান ও শক্তিবৃদ্ধির ফলে এই দেশগুলির পক্ষে বিশ্ব-ধনতন্ত্রের উপর অসহায় নির্ভরশীলতাও আজ আর আগের মতো অপরিহার্য নয়। সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য ও সমর্থন পাবার ফলে এইসব দেশের পক্ষে ধনতন্ত্রের পথটি গ্রহণ না করে অ-ধনতান্ত্রিক পথটি বেছে নেওয়াই শ্রেয়। এইসব দেশের দ্রুত অগ্রগমনের পক্ষে এটিই একমাত্র নিশ্চিত পথ।

বলাই বাহুল্য, এই অ-ধনতন্ত্রের পথ ধনতন্ত্রের অবলুপ্তির পথ নয়। ধনতন্ত্রের অবলুপ্তি বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বাস্তব অবস্থাটি এখনও এইসব দেশে সৃষ্টি হয়নি। তাই লেনিন এইসব দেশকে পরামর্শ দিয়েছেন — আপাতত ধনতন্ত্রের সঙ্কোচনের পথটি বেছে নিতে। ধনতন্ত্রের সঙ্কোচন সমাজতন্ত্র গঠনের পূর্ব-শর্তগুলি সৃষ্টি করবে এবং ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কাজটিকে সুগম করবে।

সংক্ষেপে বলা চলে, লেনিনের শিক্ষার মূল কথা হলো : উপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলির পক্ষে এক লাফে সমাজতন্ত্রে পৌছানো সম্ভব নয়। এই দেশগুলিকে অ-ধনতান্ত্রিক পথে একটি বিপ্লবী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের অন্তর্বর্তীকালীন স্তরের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

ভারতে বিপ্লবের স্তর বিচারের সমস্যা

এই লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গী সামনে রেখে ভারতের বিপ্লবের মূল প্রকৃতি এবং তার দেশগত ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করা প্রয়োজন। লেনিনীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী ভারত ছিল একটি নির্যাতিত দেশ। সেই হিসাবে প্রকৃতির দিক থেকে ভারতের বিপ্লব ছিল নির্যাতিত দেশের বিপ্লব। স্তর হিসাবে

বিচার করলে ভারতের সংগ্রাম ছিল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে। কেননা সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ, সামন্ততন্ত্রের অবলুপ্তি—এগুলি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ ছাড়া আর কিছু নয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই লেনিন ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের সমস্যাবলী বিচার করেন।

১৯০৮ সালে ভারতের বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেনিন লক্ষ্য রেখেছিলেন যে ভারত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের স্তরে রয়েছে। লেনিন আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে এই সময়ে ভারতের জাতীয় অন্দোলনে বুর্জোয়াশ্রেণী নেতৃত্বে অবস্থান করছে এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলনে গণতান্ত্রিক উপাদান রয়েছে। সেইজন্যেই ১৯০৮ সালে তিলকের কারাদণ্ডের প্রতিবাদে যখন ভারতীয় শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে, তখন তিনি তিলককে গণতন্ত্রবাদী নেতা বলে আখ্যা দেন এবং এই গণতন্ত্রবাদী নেতার কারাদণ্ডের প্রতিবাদে শ্রমিকেরা যে-ধর্মঘট করেন —তাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। (Lenin—Inflammable Materials in World Politics)। ১৯২০ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বুর্জোয়ানেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে এম. এন. রায়-এর সঙ্গে তাঁর মতভেদ হয় এবং তিনি ভারতের আন্দোলনের প্রকৃতি যে জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃতি, গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রকৃতি—এই বিষয়ে রায়কে সজাগ করে দেন। বলাই বাহুল্য, লেনিন ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়া-শ্রেণীর কাছে আত্মসমর্পণের পরামর্শ দেননি। তিনি ১৯০৮ সালের বোম্বাই-এর শ্রমিক ধর্মঘটের মধ্যে ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশের চিহ্নটি দেখতে পান। ১৯২০ সালের উপনিবেশিক থিসিসের ভিত্তিতে জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার যে-পরিপ্রেক্ষিত তিনি তুলে ধরেন, তা-ই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পথ নির্দেশ করে। এই থিসিসটি ভারতের কমিউনিস্টদের বুঝতে সাহায্য করেছিল — জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ভিতরে থেকে একটি বিকল্প কর্মসূচীর সাহায্যে (পূর্ণ স্বাধীনতা ও কৃষকের স্বার্থে ভূমিসংস্কার যে-কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার লাভ করেছিল) কিভাবে এই আন্দোলনে বিপ্লবী উপাদান সংযোজন করা যায়। বস্তুত, এই লেনিনবাদী চিন্তার প্রভাবেই ভারতে জাতীয় আন্দোলনের ভিতরে বামপন্থী ধারাটি একটি সুনির্দিষ্ট বিপ্লবী বিকল্প পথের সন্ধান পেয়েছিল। এই বিকল্প

পথটি হলো ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ভিতরে লেনিনবাদের প্রধান অবদান।

কিন্তু লেনিনীয় পদ্ধতির প্রয়োগের অর্থ উপরোক্ত উপনিবেশিক থিসিসের মূল নীতি শুধু গ্রহণ করাই নয়। লেনিনীয় পদ্ধতির প্রয়োগের অর্থ: এই থিসিসের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে ভারতের ঐতিহাসিক বিকাশ ও দেশগত বৈশিষ্ট্যগুলির যথাযথ বিচার করা, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে ভারতে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের স্তর থেকে সমাজতন্ত্রের স্তরে উত্তরণের নিজস্ব পথটি স্থির করা। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের স্তর থেকে সমাজতন্ত্রের স্তরে উত্তরণের লেনিনীয় পদ্ধতিটি ঠিক এইভাবেই চীনে, কিউবা প্রভৃতি দেশে, প্রয়োগ করা হয়েছে। চীন বা কিউবা যান্ত্রিকভাবে লেনিনের উপনিবেশিক থিসিসটি প্রয়োগ করেনি, তারা এটি প্রয়োগ করেছে নিজ নিজ দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। সেইজন্যে চীন তার নিজস্ব পথে (যার নাম জনগণতন্ত্রের পথ) জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের স্তর অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের রাস্তাটি বেছে নিয়েছে। কিউবাও তার নিজস্ব পথে (জনগণতন্ত্রের অন্তর্বর্তীকালীন স্তর ছাড়াই) জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের স্তর থেকে সমাজতন্ত্রের স্তরে পৌঁছেচে। ভারতকেও ঠিক এমনভাবেই জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের স্তর থেকে সমাজতন্ত্রের স্তরে উত্তরণের নিজস্ব পথটি বেছে নিতে হবে।

এই প্রশ্নটি খুবই জরুরি এই কারণে যে ভারত নির্যাতিত দেশ, পরাধীন দেশ হলেও ইংরেজ আমলে ভারতের সমাজ-বিকাশে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল। ইংরেজ শাসনে থাকাকালীন অবস্থাতেই ভারতে ধনতন্ত্রের কিছুটা বিকাশ ঘটেছিল। ভারতের প্রধান বৈশিষ্ট্য, ভারত ধনতান্ত্রিক বিকাশে যথেষ্ট উন্নত উপনিবেশগুলির মধ্যে অন্যতম। এই বৈশিষ্ট্যটি সামনে রেখে বিচার না করলে ভারতে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের স্তর থেকে সমাজতন্ত্রের স্তরে উত্তরণের নিজস্ব পথটি আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। আবার, ভারত ধনতান্ত্রিক বিকাশে যথেষ্ট উন্নত উপনিবেশগুলির অন্যতম—এই কথাটির অতি-সরলীকৃত ব্যাখ্যা থেকে দু-রকমের ভুল করার সম্ভাবনাও থেকে যায়। একটি হলো: ভারতের ধনতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রাটি বেশি করে দেখার প্রবণতা। অপরটি: ধনতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রাকে ছোট করে দেখার প্রবণতা। এই দুটিই বিপজ্জনক।

একদল মার্কসবাদী আছেন যাঁরা ভারতের ধনতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রাটি বেশি করে দেখেন। তাঁদের মধ্যে রাশিয়ার বিপ্লবের পথের সঙ্গে ভারতের বিপ্লবের পথটিকে একাকার করে ফেলার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের ধারণা ১৯০৫ সালে রাশিয়াতে ভারতের তুলনায় ধনতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রাটি বেশি হলেও ভারতের মতোই রাশিয়াও ছিল পশ্চাৎপদ দেশ। কাজেই ১৯০৫ সালে রুশ-বিপ্লবের যে-প্রকৃতি ছিল, কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকলেও ভারতের বিপ্লবের অবস্থা তার সঙ্গে সাধারণভাবে তুলনীয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি'র কর্মসূচীতে মুখে স্বীকার না করলেও রুশ-বিপ্লবের (১৯০৫) ছকটিকে অনুসরণ করার একটি প্রচ্ছন্ন চেষ্টা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে — ভারত যেহেতু ধনতান্ত্রিক বিকাশে যথেষ্ট উন্নত উপনিবেশগুলির অন্যতম সেইহেতু এখানে অ-ধনতান্ত্রিক পথটি প্রযোজ্য নয়। ভারত উপনিবেশিক দেশ হলেও এখানে অ-ধনতান্ত্রিক পথ অচল — এই বক্তব্যটি নিশ্চয়ই 'মৌলিকত্বের' দাবি রাখে এবং নিঃসন্দেহে এই বক্তব্যটি লেনিনের উপনিবেশিক থিসিসের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। 'মার্কসবাদী'দের এই 'মৌলিকত্বের' পিছনে রয়েছে ভারতের উপনিবেশিক চরিত্রটি অগ্রাহ্য করে ভারতের বিপ্লবের ওপর রুশ-বিপ্লবের (১৯০৫) ছকটি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। রাশিয়াতে ১৯০৫ সালে অ-ধনতান্ত্রিক পথ প্রযোজ্য—এই কথা লেনিন বলেননি, সেইজন্যে 'মার্কসবাদী'রাও মনে করছেন ভারতেও অ-ধনতান্ত্রিক পথটি প্রযোজ্য নয়। ১৯০৫ সালে রাশিয়াতে লেনিন অবিলম্বে ধনতন্ত্রের অবসানের দাবি তোলেননি, 'মার্কসবাদী'রা তাই তাঁদের কর্মসূচীতে সেই দাবি উত্থাপন করেননি। রাশিয়াতে (১৯০৫) লেনিন বুর্জোয়াশ্রেণীকে বিপ্লবের শক্তি হিসাবে চিত্রিত করেননি, 'মার্কসবাদী'রাও তাই ভারতে বুর্জোয়াশ্রেণীকে বিপ্লবের শক্তি হিসাবে গ্রহণ করতে নারাজ। লক্ষ্য করুন, ১৯০৫ সালের রুশ-বিপ্লবের স্ট্রাটেজি ও 'মার্কসবাদী'দের কর্মসূচীতে বর্ণিত স্ট্রাটেজির মধ্যে মিল কত 'গভীর'।

মার্কসবাদীরা বিস্মৃত হয়েছেন যে ১৯০৫ সালে রুশ-বিপ্লবের স্তর এবং ভারতের বিপ্লবের স্তরের মধ্যে পার্থক্য পর্বতপ্রমাণ। রাশিয়া ছিল পিছিয়ে-পড়া হলেও একটি ধনতান্ত্রিক দেশ; আর ভারত ছিল উপনিবেশ। জারতন্ত্রের অবস্থান সত্ত্বেও রাশিয়া যে একটি ধনতান্ত্রিক দেশ—এই সত্যটিকে যাঁরা অগ্রাহ্য করতেন, তাঁদের ভুল ধারণার নিরসন করতে গিয়ে লেনিন লেখেন—

"It is interesting to note how far the main features of this general process in western Europe and in Russia are identical, not withstanding the tremendous peculiarities of the latter in both the economic and non-economic spheres." (Lenin — Development of Capitalism in Russia)।

যাঁরা রাশিয়া ও ভারতের স্তরকে একাকার করে দেখেন, লেনিনের এই উক্তিটি তাঁদের স্মরণ রাখা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, ভারত যদি রাশিয়ার মতো ধনতান্ত্রিক দেশ হতো তাহলে ভারতে রাশিয়ার মতোই অ-ধনতান্ত্রিক পথটি অচল বলে বিবেচনা করা চলত। কিন্তু গোড়াতেই গলদ। উপনিবেশিক দেশের বিপ্লব এবং ধনতান্ত্রিক দেশের বিপ্লব—এই দুইয়ের প্রকৃতিভেদ 'মার্কসবাদী'রা বিস্মৃত হয়েছেন। রাশিয়া ধনতান্ত্রিক দেশ হবার ফলে সেখানকার বুর্জোয়া-শ্রেণীর সঙ্গে জারতন্ত্রের বিরোধ ছিল ক্ষীণ। তাই রুশ-বিপ্লবে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজগুলি সম্পাদন করার সময়েও বুর্জোয়াশ্রেণী কখনও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেনি। কিন্তু ভারতে বিদেশী বুর্জোয়াশ্রেণীর আধিপত্য থাকায় দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে তাদের বিরোধ শক্তিশালী রূপ গ্রহণ করে এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে এই বুর্জোয়াশ্রেণী বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বস্তুত, রাশিয়ার মতোই ভারতে অ-ধনতান্ত্রিক পথ অচল, রাশিয়ার মতোই ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীল — ১৯০৫ সালের রুশ-বিপ্লবের নকলনবিশী থেকে 'মার্কসবাদী'দের এই ধারণাগুলির উৎপত্তি। এই কারণেই ভ্রান্ত ধারণা-কণ্টকিত 'মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি'র কর্মসূচীটি বাস্তবের আঘাতে ভেঙে খান-খান হয়ে যাচ্ছে।

ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রাটি বড় করে দেখলে যেমন বিপদ হতে পারে, তেমনি আবার ধনতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রাটি বাস্তব অবস্থা থেকে ছোট করে দেখলেও আর এক ধরনের বিচ্যুতি হবার সম্ভাবনা। যাঁরা ধনতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রাটি ছোট করে দেখেন তাঁরা ভাবেন ভারত যেহেতু চীনের মতোই একটি নির্যাতিত দেশ, সেইহেতু ঐতিহাসিক চীন-বিপ্লবের সঙ্গে ভারতের বিপ্লবের হুবহু মিল থাকবে। বর্তমানে আমাদের দেশে 'মাও সে তুঙ-চিন্তা'র যাঁরা অনুগামী, 'নকশালপন্থী' বলে যাঁরা সাধারণভাবে অভিহিত, তাঁরা ভাবেন ভারতের বিপ্লব হবে চীনের বিপ্লবের কার্বন কপি মাত্র। "চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান"—এই নকলনবিশীর এক স্থূল অভিব্যক্তি মাত্র! এঁরা

ভুলে যান ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রা বেশি থাকায় ভারতে একটি শক্তিশালী বুর্জোয়াশ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। চীনে ধনতন্ত্র অপেক্ষাকৃত দুর্বল থাকায় সেখানে বুর্জোয়াশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা ছিল তুলনায় অনেক বেশি নিস্তেজ। এই পার্থক্যটি মনে না রাখলে ভারতে বিপ্লবের পথ স্থির করা অসম্ভব।

রাশিয়া ও চীন উভয়েই ভারতের নিকট-প্রতিবেশী। তাছাড়া, এই দুটি দেশেই বিংশ শতাব্দীর দুটি ঐতিহাসিক বিপ্লবের আবির্ভাব ঘটেছে। ফলে, এই দুই বিপ্লবের কোনো একটির কার্বন কপি হিসাবে ভারতের বিপ্লবকে দেখার প্রবণতা ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে বার বার প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু বাস্তব জীবন বড়ই নিষ্ঠুর। রুশ-বিপ্লবের পদ্ধতিতে বা চীন-বিপ্লবের পদ্ধতিতে ভারতের বিপ্লবকে যাঁরাই সাজাবার চেষ্টা করেছেন তাঁরাই শেষ পর্যন্ত উপহাসের পাত্র হয়েছেন।

আসল কাজ হলো: রুশ-বিপ্লব এবং চীন-বিপ্লবের মহান শিক্ষা সামনে রেখে, ভারতের জাতিগত বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুধাবন করে, ভারতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের নিজস্ব পথটি আবিষ্কার করা। রুশ-বিপ্লবের প্রচ্ছন্ন নকলনবিশী বা চীন-বিপ্লবের স্থূল নকলনবিশী—এই দুটি পথের কোনোটিতেই যে ভারতের পক্ষে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব নয়, এই বিষয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সচেতন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে ভারতে নিজস্ব পথে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্তর্বর্তীকালীন স্তরের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটবে।

ভারতের বিপ্লব যে রুশ-বিপ্লব বা চীন-বিপ্লবের হুবহু নকল হবে না, এই বিপ্লব যে নিজস্ব পথে ঘটবে এবং এই নিজস্ব পথটি আবিষ্কার করাই যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে সবচেয়ে বড় কাজ—সমস্যার এই দিকটি সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সচেতন। এই সমস্যাটির গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং এই সমস্যাটির সমাধানের জন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়াই ভারতে লেনিনবাদীদের সামনে এই মুহূর্তের সব চেয়ে বড় কাজ।

লেনিনের আর এক নাম ভালোবাসা

সুকুমার মিত্র

এই ধূলির ধরণীকে ভালোবাসা, মাটির মানুষকে ভালোবাসা ছাড়া কমিউনিস্ট হওয়া যায় না। এই ভালোবাসাই লেনিনকে টেনে নিয়েছিল কমিউনিজমের পথে। পেট থেকে পড়েই তো কেউ কমিউনিস্ট হয় না, লেনিনও হননি। মানুষকে ভালোবেসেছিলেন বলেই রাষ্ট্র ও সমাজের অত্যাচার-অবিচার তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, তাই তিনি শুরু করেছিলেন পথ খুঁজতে। কোন পথে যাত্রা করলে শোষিত নিপীড়িত মানুষ তার সমস্ত শোষণ ও নিপীড়নের অবসান ঘটিয়ে নতুন পৃথিবী নতুন সমাজ গড়ে তুলতে পারবে তারই সন্ধানে বেরিয়েছিলেন লেনিন। শেষপর্যন্ত মার্কসবাদের পথ অনুসরণ ক'রেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কিন্তু, লেনিনের জন্মশতবার্ষিকীতে এই পরম সত্যটিকে ভুলে গেলে চলবে না যে, মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছাড়া বিপ্লবের দুর্গম ক্ষুরধার পথ লেনিন অনুসরণ করতে পারতেন না। ভালোবাসার এই আগুনই তাঁকে পথ দেখিয়েছিল, ভালোবাসার এই আগুনেই তাঁকে নিখাদ সোনা করে দিয়েছিল, ভালোবাসার এই আগুনই তাঁর ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তিজীবনকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করে দিয়েছিল।

একদিন লেনিনকে "নর-পিশাচ," "নর-খাদক," "রক্ত-পিপাসু দানব" রূপে চিত্রিত করতে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলির বাধেনি; "ভয়ঙ্কর এই অমানুষটি" রাশিয়ায় যে-ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটিয়েছে—তার রোমহর্ষক বিবরণ একদিন সাম্রাজ্যবাদী ও ধনিকশ্রেণীর মুখপত্রগুলিতে দিনের পর দিন সাড়ম্বরে প্রকাশিত হয়েছে। এই কলকাতায় সাম্রাজ্যবাদী ধনিকশ্রেণীর এক মুখপত্রে লেনিনের মৃত্যুর পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলা হয়েছিল "End of a notorious career" (একটি কুখ্যাত জীবনের অবসান)!

সমাজতন্ত্রের সাফল্য যখন সর্বজনস্বীকৃত, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া যখন পৃথিবীর নির্ধারক শক্তিরূপে পরিণত এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র যখন পৃথিবীর

অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি বলে পরিগণিত—তখন লেনিন সম্পর্কে উল্লিখিত মন্তব্য ও বিশেষণগুলি হয়তো হাসির উদ্রেক করবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, প্রতিক্রিয়ার তূণ এখনও শূন্য হয়নি। নানাভাবে নানাকৌশলে লেনিনকে হেয় করার চেষ্টা এখনও চলেছে। আজ তাই মানবপ্রেমিক লেনিনকে নতুন করে চেনা ও চিনিয়ে দেওয়া দরকার।

লেনিন এবং তাঁর ভাই-বোনদের উপর তাঁদের বাপ-মার প্রভাব অনেকখানি কাজ করেছে। তিন ভাই, তিন বোন, লেনিন (আসল নাম ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানোভ) সবার ছোট। সামন্ততন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের মুকুটমণি জারের শোষণ ও পীড়নে রাশিয়া তখন রুদ্ধশ্বাস। বুদ্ধিজীবী উলিয়ানোভ পরিবার এই শোষণ ও পীড়নকে মেনে নেয়নি। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে বিদ্রোহী কবি প্লেপচিয়েভ-এর নিষিদ্ধ গাথার সুরঝঙ্কারের মধ্যে দিয়ে :

"সহমর্মী, সহকর্মী দাঁড়াই পাশাপাশি,
ঝড়বাদলে ও সংগ্রামে শতবার,
লড়ব এবং ঘৃণা করে যাব মৃত্যু অবধি—
পীড়ন করে যে মাতৃভূমি আমার।"

[সিদ্ধেশ্বর সেন অনূদিত]

লেনিনের বাবা গাইতেন এই গান তাঁর প্রাণের সমস্ত আবেগ দিয়ে আর এই গানই উলিয়ানোভ পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মনে আগুনের পরশমণি ছুঁইয়ে দিয়েছিল।

বাবা ও মার দৃষ্টান্ত, বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সাহিত্যের প্রভাব এবং জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ লেনিনের তরুণ মনকে গড়ে তুলেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর বড় ভাই আলেকসান্দর-এর প্রভাব। দুর্জয় সাহস ও সঙ্কল্পের অধিকারী বিপ্লবী দাদার কাছেই লেনিন পেয়েছিলেন তাঁর বিপ্লবী জীবনের প্রথম দীক্ষা. মার্কসবাদী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ও ঘটেছিল দাদার কাছ থেকেই।

এই সময় থেকেই ভ্লাদিমির-এর পড়া ও ভাবনার শুরু। তিনি তাঁর চোখও রেখেছিলেন খোলা, যে-চোখে পড়ত নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের দরিদ্র ও লাঞ্ছিত জীবন, স্বৈরতন্ত্রের অত্যাচার এবং অশিক্ষা ও

কুসংস্কারের নিদারুণ পরিণতি। চুভাশ, মোরদভিনিয়ান, তাতার, উদমুর্ত প্রভৃতি সংখ্যালঘু জাতিগুলির নিরন্তর অবমানিত ও নির্যাতিত জীবন তাঁর মনে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে জাগিয়েছিল অসীম ঘৃণা।

এই বয়সেই লেনিন এন. ওখোতনিকোভ নামে একজন দরিদ্র চুভাশ শিক্ষককে ১৮ মাস বিনা পয়সায় পড়িয়ে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করতে সাহায্য করেন। মানুষের প্রতি লেনিনের ভালোবাসা এইভাবেই প্রথম বাস্তব রূপ পায়।

পড়াশুনা, দেখাশোনা এবং চিন্তাভাবনার মধ্যে দিয়ে লেনিন পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই দাদা আলেকসান্দর-এর যখন মৃত্যুদণ্ড হলো, তখন তিনি দাদার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েও স্থিরচিত্তে বলতে পেরেছিলেন "না, আমরা ওপথে (সন্ত্রাসবাদের পথ — লেখক) যাব না, ওপথ আমাদের জন্য নয়।"

দেশের মানুষকে, অবজ্ঞাত ও নিপীড়িত জনগণকে, ভালোবেসেছিলেন বলেই লেনিন ভয়হীন চিত্তে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন তাঁর নির্ধারিত পথে। এই পথে চলতে চলতে তিনি দেখেছেন অসংখ্য মানুষকে— যারা তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, লড়েছে জীবনপণ লড়াই। তাদের সকলের সঙ্গেই তাঁর জীবন ছিল এক সূত্রে গাঁথা। অসংখ্য কাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে এইসব মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসার অমর স্মৃতি।

বিপ্লবের অগ্নিপরীক্ষা, শিকার, খেলা, বৈঠক, অফিসের কাজ…সবকিছুর মধ্যেই লেনিনের ভালোবাসার ফুলগুলি চির-অম্লান হয়ে ফুটে রয়েছে।

১৯০৭ সনের কথা। প্রথম রুশ-বিপ্লব তখন ব্যর্থ হয়ে গেছে, রাশিয়ায় নেমে এসেছে নিদারুণ দমননীতির ভয়ঙ্কর কালো ছায়া। এই সময় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মধ্যে চলেছে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব। লেনিন গেছেন কাপ্রিতে (ইতালি)। ইতালিয়ান ভাষা না জেনেও তিনি কাপ্রির জেলেদের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছেন। শুধু সুতোয় বড়শী বেঁধে কি করে মাছ ধরতে হয় শিখিয়েছিল কাপ্রির মৎস্যজীবীরা। লেনিনকে তারা বলেছিল: "কোসি : দ্রিন দ্রিন, কাপিসি?" কি বুঝলেন লেনিনই জানেন। মাছ একটা ধরতে পারলেই শিশুর মতো আহ্লাদে ডগমগ হয়ে চেঁচিয়ে উঠতেন "আ! দ্রিন-দ্রিন!" জেলেদের মধ্যে উঠত হাসির হররা। ছেলে-মেয়েরা লেনিনের নাম দিল 'সিনর দ্রিন-দ্রিন'।

লেনিন কাপ্রি ছেড়ে চলে যাওয়ার বহুদিন পরেও তারা রুশ নাগরিকদের দেখলেই জিজ্ঞাসা করত "সিনর ব্রিন-ব্রিন কেমন আছেন? জার তাঁকে ধরতে পারবে না ঠিক জানেন?"

১৯১৯। সাম্রাজ্যবাদী দস্যুর দল হানা দিচ্ছে, সারা দেশে বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ। দেশের মানুষ খেতে পাচ্ছে না, কিন্তু লেনিনকে তারা তো ভুলতে পারে না। তাঁর কমরেডরা, চাষীরা, সৈন্তরা তাঁর জন্তে খাবার পাঠায়। লেনিন এসব খেতে পারেন না, পারা অসম্ভব। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করাও তো কঠিন, যারা পাঠিয়েছে তারা ভালোবেসে পাঠিয়েছে। তাদের মনে তো ব্যথা দেওয়া যায় না। বিব্রত লেনিন ভ্রুকুঞ্চিত করে ভাবেন। তারপর ময়দা, চিনি, মাখন ইত্যাদি পাঠিয়ে দেন যারা রুগ্ন, খাত্তাভাবে শীর্ণ তাদের জন্তে। নিজে খান নিকৃষ্ট রুটি আর চিনিহীন চা।

ভাবাবেগপ্রবণ মানুষ নন লেনিন, উচ্ছ্বাস করতে তিনি জানতেন না। হঠাৎ কখনও কখনও তাঁর আবেগ প্রকাশ পেত। গর্কীতে ছোটদের আদর করতে করতে তিনি বলেছিলেন:

"এরা আমাদের চেয়ে ভালোভাবে বাঁচবে। আমাদের জীবনে আমরা যা সব পেরিয়ে এলাম তার অনেক কিছুই এদের কাছে অজানা থাকবে। এদের জীবন কঠিন হবে না।"

হাড়ভাঙা শীত। লেনিন দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর পড়ার ঘরের জানলার ধারে। সারা দেশ গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত, কোথাও জ্বালানি নেই, ধোঁয়া উঠছে না একটি বাড়ি থেকেও। টাইফাস মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছে।

লেনিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। ডান হাতটা হঠাৎ পকেট থেকে বের করে ডেস্কের ধারে বসে পড়ে লিখতে শুরু করলেন:

"দেখবেন শিশুভবনগুলিতে জ্বালানি কাঠ সরবরাহ করা হয়েছে কিনা। না হয়ে থাকলে যাতে অবশ্যই সরবরাহ করা হয় তার ব্যবস্থা করবেন···ধাতুশিল্পের মজুরদের চিনি ও স্যাকারিনের রেশন বাড়িয়ে দিন।"···লিখছেন কামেনেভকে।

সেক্রেটারি দরজাটা ফাঁক করে ডাকলেন "ভ্লাদিমির ইলিচ।"

সাড়া নেই। আবার ডাকলেন। এবার সাড়া মিলল।

"কি চাই?" একটা কাগজ টেনে নিতে নিতে লেনিন প্রশ্ন করলেন।

"কমরেড কোরশুনোভ ১ এসেছেন।"

"বেশ, আসতে বলো।"

কোরশুনোভ ঘরে ঢুকলেন।

"আসুন, আসুন লিওনিদ আলেকসিয়েভিচ। বসুন" ইজিচেয়ারের দিকে আঙুল দেখিয়ে লেনিন বললেন।

কুশলবার্তা বিনিময়ের পর কোরশুনোভ আস্তে আস্তে আসল কথাটা পাড়লেন। ১৯০৮ সনের ৩০এ জুন সাইবেরিয়ার অরণ্যে একটা বিরাট উল্কা পড়েছে। তাঁরা কোথায় সেটা পড়েছে তা খুঁজে বের করতে চান। বিদেশে বিজ্ঞানীরা এ-ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন।

"এখন এই উল্কাটি···কিন্তু আপনি তো এ-সম্বন্ধে সবই জানেন।"

"অত নিশ্চিত হবেন না। কোথাও একটা উল্কা পড়েছে আমি জানি, কিন্তু ঐ পর্যন্ত···বলুন এখন···" বললেন লেনিন।

একটু হেসে "এটা কোন সাল তাই ভুলে গেছি।" কোরশুনোভও হাসলেন।

সব শুনে লেনিন তাঁদের অভিযানের জন্য কি কি লাগবে জানতে চাইলেন। তালিকা দেখার পর লেনিন উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, "হাজার হাজার মাইল গভীর অরণ্য, খরস্রোতা নদী, বুনো জানোয়ার, রাস্তাঘাট নেই। চারদিকে শত শত মাইলের মধ্যে একটি জনপ্রাণীও দেখতে পাবেন না। বুঝতে পারছেন ?"

বিজ্ঞানী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

"তাহলে আপনি যাবেনই ?" লেনিন বললেন।

"হ্যাঁ, আমি যাব।"

"আর কিছু চান না ?"

"না, আর কিছু না।"

"কিছুই না" লিওনিদ আলেকসিয়েভিচ আবার বললেন "কিচ্ছু না।"

লেনিন কাশলেন, টেবিলের নিচে তাকিয়ে কি যেন দেখলেন, একটু হাসলেন।

"আচ্ছা লিওনিদ আলেকসিয়েভিচ" লেনিন খুশি মনে বললেন "একবার জানলাটার দিকে যাবেন ?"

১। বিখ্যাত রুশবিজ্ঞানী

বিস্মিত বিজ্ঞানীর বার বার "কেন" প্রশ্নের জবাবে লেনিনের ঐ একটি কথা। অবশেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিজ্ঞানী গিয়ে দাঁড়ালেন জানলার ধারে।

লেনিনের দৃষ্টি বিজ্ঞানীর পায়ের জুতোর দিকে।

"এই দেখুন, ঠিক যা ভেবেছি তাই। বন্ধুবর, তাইগায় আপনি যাচ্ছেন কি করে? মস্কো থেকে পাঁচ মাইল যেতে না যেতেই তো জুতোজোড়া খসে পড়বে।"

"কেন যাব না?" অভিমানাহতস্বরে বললেন বিজ্ঞানী। "আমি দড়ি দিয়ে জুতোজোড়া বেঁধে রাখতে পারব। আমি আমার পায়ে খানিকটা কাপড় জড়িয়ে বেঁধে রাখতে পারব।"

"তা পারবেন" চিন্তাকুলভাবে বললেন লেনিন।

"বোধহয় আপনার এই একজোড়া জুতোই সম্বল।"

"আর একজোড়া কোথায় পাব?" জবাব দিলেন বিজ্ঞানী।

"তাহলে এই জুতোজোড়া পরেই আপনি যাবেন। মাপ করবেন, কিন্তু—" লেনিন আস্তে বিজ্ঞানীর কাঁধে হাত দিয়ে তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন।

"আশা করি আপনি রাগ করেননি।" বিজ্ঞানীর দিকে তাকিয়ে লেনিন বুঝলেন বিজ্ঞানী কিছু মনে করেননি। তখন শুরু হলো পায়চারি। লেনিন বলে চলেছেন:

"আমরা আশ্চর্য কিছু মানুষ পেয়েছি। জিওলকোভস্কির কথা ভেবে দেখুন। কল্পনা করুন একটা রুশ মফঃস্বল শহরকে। সেখানে রাজহাঁস আর শুয়োরের পালের বিনা বাধায় চরে বেড়ানো ঘাসে-ঢাকা রাস্তার ধারে একটা কাঠের বাড়িতে বাস করছেন একজন অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক। রুটি আর হেরিং মাছের রেশন তিনি পান আর ডুবে আছেন আন্তঃগ্রহ উড্ডয়নের সমস্যাগুলির মধ্যে। আর তাও বোধহয় এক ঠাণ্ডাঘরের মধ্যে। আর আপনি বুড়ো মানুষ একই পথে চলেছেন। আপনি সাইবেরিয়ায় তাইগার মধ্যে হাজার ভার্সট হেঁটে যেতে চাচ্ছেন একজোড়া ছেঁড়া বুট পরে।"

বিজ্ঞানী মনে মনে বললেন, "আর আপনি? আপনি এমন একটি দেশে সমাজতন্ত্র গড়ছেন যেখানে সকলে পড়তেও জানে না।"

মুহূর্তের মধ্যে দুটি মানুষ একেবারে কাছাকাছি এসে গেলেন — বিজ্ঞানী হাত ধরলেন বিপ্লবীর। দুজনেই স্বপ্ন দেখছেন, দুজনেই লড়ছেন সেই স্বপ্নকে সার্থক করতে।

অসুস্থ কমরেডদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লেনিনের। জুরুপা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, অথচ ছুটি নিচ্ছেন না। চিঠি পেলেন লেনিনের।

"কমরেড জুরুপা! আপনাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে। এখুনি আপনাকে দু-মাস বিশ্রাম গ্রহণ করতেই হবে। আপনি যদি সত্যিসত্যি বিশ্রাম গ্রহণের প্রতিশ্রুতি না দেন তাহলে আমি কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে নালিশ জানাব।"

১৯২১ সনের ফেব্রুয়ারি মাস। ইভান বেকুনোভ নামে একজন চাষী এসেছেন লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে। আলাপ চলতে চলতে লেনিন জানতে পারলেন যে বেকুনোভ-এর চশমাটি অতি নিকৃষ্ট ধরনের। পয়সা দিয়ে তাঁকে কিনতে হয়েছে চশমাটি, কিন্তু তাতে কাজ দিচ্ছে না। তখুনি চিঠি গেল স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ. শেমাস্কোর কাছে। চিঠিতে বলা হলো: "কমরেড ইভান আফানাসিয়েভিচ, বেকুনোভ খুব আশ্চর্য ধরনের মেহনতী চাষী। ইনি নিজের মতো করে কম্যিউনিজম প্রচার করে থাকেন। ইনি এখন আমার অফিসে।

"ইনি চশমা হারিয়ে বাজে এক জোড়ার জন্যে ১৫ হাজার রুবল দিয়েছেন। এঁকে ভালো একজোড়া চশমা দিতে পারেন কি? এঁকে যদি সাহায্য করেন আর সাহায্য করতে পারলেন কি না তা যদি আপনার সেক্রেটারিকে আমাকে জানাতে বলেন তো আমি কৃতার্থ হব।"

যখন জীবনের উপর মৃত্যুর যবনিকা ধীরে ধীরে নেমে এসেছে, তখনও তাঁর এই ভালোবাসা — মানুষের প্রতি ভালোবাসা, জীবনের প্রতি ভালোবাসা — অটুট থেকেছে।

মনে পড়েছে পুরানো সাথীদের। মারটভ—যিনি মেনশেভিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিপ্লব-বিরোধী হয়ে ওঠেন, অথচ যিনি সত্যিই একজন ভালো কর্মী ছিলেন—তাঁকে মনে পড়েছে লেনিনের। মারটভও তখন মৃত্যুশয্যায়। লেনিন বলেছেন, "মারটভও মরছে" ("Martov is also dying")। ভুল পথে গেছেন মারটভ, এর জন্যে তাঁর মনে গভীর বেদনা; কিন্তু তিনিও যে মরতে চলেছেন—এ-কথাও লেনিন ভুলতে পারেন না।

মৃত্যুর দু-দিন আগেও সাথী ও জীবনসঙ্গিনী ক্রুপসকাইয়া পড়ে শুনিয়েছেন জ্যাক লনডন-এর 'লাভ অব লাইফ' (জীবনানুরাগ) গল্পটি। মানুষ যেখানে কখনও পা দেয়নি, তেমনি একটি তুষারাচ্ছন্ন অঞ্চলে রুগ্ন ক্ষুধার্ত একটি মানুষ পায়ে

পায়ে হেঁটে চলেছে একটি বড় নদীর ধারে অবস্থিত বন্দরের সন্ধানে। থেকে থেকে পা হড়কে যাচ্ছে, শক্তি ক্রমেই কমে আসছে। পিছনে ধাওয়া করেছে ক্ষুধার্ত নেকড়ে। অবশেষে বাধল লড়াই মানুষ ও নেকড়ে বাঘের মধ্যে, শেষপর্যন্ত জয়ী হলো মানুষ। ক্ষত-বিক্ষত, অর্ধমৃত, পৌঁছুল তার গন্তব্য স্থলে।

লেনিনের বড় ভালো লেগেছিল গল্পটি। এমনি সব সংগ্রামী মানুষকেই ভালোবেসেছিলেন লেনিন তাঁর সমস্ত হৃদয় দিয়ে। তারাই তো চলেছে যুগ-যুগান্ত ধরে জীবনের জয়গান গেয়ে সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বিপর্যয়কে অগ্রাহ্য করে, তারাই তো জয়যুক্ত করেছে বিপ্লবকে, তারাই তো গড়ে তুলছে নতুন পৃথিবী নতুন সভ্যতা। এই নতুন পৃথিবীতে মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে, মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না।

শিক্ষা সম্পর্কে লেনিন

শ্যামল চক্রবর্তী

সমস্ত সমাজেই শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে তার সামগ্রিক সমাজব্যবস্থাকে খাড়া রাখা, চালু রাখা, এক কথায় তার প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে। আদিমতম মানুষ বাঁচবার লড়াইয়ে প্রকৃতির নিয়ম বোঝবার যা চেষ্টা করেছিল — তা হয়তো ছিল সমস্ত সমাজের মিলিত কর্মকাণ্ড, প্রকরণ-পদ্ধতি, Rituals। ক্রমে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল শাস্ত্রে অধিকার ব্রাহ্মণের, শাস্ত্রে অধিকার ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের শিল্পোৎপাদন ও ব্যবসায়ের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কুলধর্মচর্চা অনুমোদিত, কিন্তু শূদ্রের বেদে অধিকার নেই। ভাষান্তরে বলতে গেলে, সব দেশে যাজকরা জ্ঞানচর্চা করবে শাসকদের ছত্রচ্ছায়ায়; আর সাধারণ মানুষ পরিশ্রম করবে, উৎপাদন করবে, সেবা করবে যাজক ও অভিজাত শাসকদের। অর্থাৎ জ্ঞান শাসকদের কাজে লেগেছে এবং ধর্মবিশ্বাস ও বিশ্বদর্শন হিসাবে প্রচলিত সমাজব্যবস্থাটাকে মেনে নিতে শিখিয়েছে। সাধারণ মানুষকে জ্ঞানকেন্দ্র থেকে দূরে রাখা হয়েছে সযতনে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন এল, তখন তাকে পুরনো অবস্থাটিকে বেশ খানিকটা বদলিয়ে নিতে হয়েছিল। কারণ তার বর্ধিত উৎপাদন-ক্ষমতাকে কাজে লাগাবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল অনেক বেশি শিক্ষিত মানুষের। সুতরাং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন পুরনো শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণীপ্রাধান্য বদলেছে, তেমনি সৃষ্টি হয়েছে প্রসারিত শিক্ষাব্যবস্থা। আগেকার অধিকারভেদ রইল না, সৃষ্টি হলো নতুন অধিকারভেদ। এ-সমাজেও পুরনো বৈশিষ্ট্যদুটি চালু রইল। প্রথমত, দেশের খেটে-খাওয়া মানুষ অর্থাৎ ব্যাপকতম জনসমাজ হয় সম্পূর্ণ নিরক্ষর রইল, নয়তো তুলনায় অত্যন্ত নিম্নস্তরের শিক্ষার ছিটেফোঁটা নিয়ে খুশী থাকতে হলো তাদের। দ্বিতীয়ত, সামাজিক সম্পর্কের প্রকৃত রূপ অর্থাৎ শোষণ ও শাসনের আসল ছবিটির অস্তিত্ব অস্বীকার করা হলো, নয়তো নানাবিধ ধূম্রজালের মারফৎ তাকে গোপন রাখা হলো।

লেনিন কোনোদিনই শিক্ষার 'অরাজনৈতিকতা'র তত্ত্বে বিশ্বাস করেননি। লেনিন বলেছেন," 'অরাজনৈতিক' বা 'রাজনীতি-নিরপেক্ষ' শিক্ষা কথাটাই, বুর্জোয়া শঠতার নিদর্শন, জনতার সঙ্গে প্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়......সমস্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রেই রাজনৈতিক যন্ত্রের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক সুদৃঢ়। যদিও বুর্জোয়া সমাজ খোলাখুলি তা স্বীকার করতে পারে না।" ১ অন্যত্র বলেছেন : "জীবন-বিচ্ছিন্ন রাজনীতি-বিচ্ছিন্ন স্কুল মিথ্যা, ছলনা।" ২

রুশ-বিপ্লবের পর শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের সমস্যার সম্মুখীন হলো সোভিয়েত সরকার ও রুশ কমিউনিস্ট পার্টি, হলেন লেনিন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের ফলে শিক্ষকদের একটা বড় অংশ বলশেভিকী শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে নারাজ। অনেকেই আবার শিক্ষকতা কাজের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত-বিরোধী প্রচার চালাচ্ছে। স্কুলবাড়ি ভেঙে পড়েছে। সারাবার বা নতুন গড়বার সঙ্গতি নেই। সরঞ্জাম কিছুই নেই বললে হয়। বই, খাতা, কাগজ, কলম, কালি, চক, ডাসটার — সবকিছুরই অভাব। দ্রুত উৎপাদন করে অভাব পূরণ করা যাবে এমন ফ্যাক্টরি পর্যন্ত নেই। এ-অবস্থায় নতুন এক তত্ত্ব এসে হাজির হলো। হাজির করলেন জনৈক শুলগিন। শুলগিন বললেন : "বাচ্চাকে শেখাতে হবে ? কেন ? সে শিখবে রাস্তা থেকে ; শিখবে ওয়ার্কশপ থেকে ; শিখবে পার্টির কাছ থেকে। স্কুলের দরকার কি ?" পুরনো দিনের কেতাবী শিক্ষার বিরোধী বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী শুলগিন-এর কথায় টলেছিলেন।

লেনিন এ-কথা মানেননি। তিনি বললেন : "নিরক্ষর তো দাঁড়িয়ে থাকে রাজনীতির আওতার বাইরে, তাকে প্রথমে অ-আ-ক-খ শিখতেই হবে। এছাড়া রাজনীতি হতে পারে না ; ওছাড়া চলে গুজব, গালগল্প, রূপকথা আর কুসংস্কার — রাজনীতি নয়।" ৩

লেনিন বললেন : "রুশদেশের সংস্কৃতিগত নিম্নমানের ফলাফল সম্বন্ধে আমরা পুরোপুরি অবহিত আছি, জানি সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতায় এর প্রভাব কি পড়ছে। সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা নীতিগতভাবে হাজির করেছে ভীষণ রকমের উন্নততর শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্র, যা সারা পৃথিবীতে গণতন্ত্রের নিরিখ হিসেবে দাঁড়াতে পারে। অথচ এই সংস্কৃতির অভাব সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতার তাৎপর্য ক্ষুণ্ণ করছে এবং আমলাতন্ত্রকে আবার জিইয়ে তুলছে। সোভিয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের সহজে অধিগম্য — কথা ঠিক, কিন্তু আমরা সবাই জানি

যে কার্যত তা এখনও তার থেকে বহু দূরে পড়ে আছে। এমন নয় যে আইনে ঠেকাচ্ছে, বুর্জোয়া শাসনে যেমন ছিল। বরং আমাদের আইনে এ-বিষয়ে সাহায্যই করে। কিন্তু এ-বিষয়ে আইন তো যথেষ্ট নয়। বিশাল পরিমাণ কাজ বাকি পড়ে রয়েছে — শিক্ষার, সংগঠনের, সংস্কৃতির কাজ…।" ৪

অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে এসেছে ঠিকই। কিন্তু রাষ্ট্র চালানো মানে তো শুধু হুকুমজারি করা নয়, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে। উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক নতুন ভিত্তিতে চালু করতে হবে। যে-মানুষ শুধু ভোগ্যপণ্য ও আনন্দের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল তাই নয়, বঞ্চিত ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বপ্রকার সুযোগ থেকে — তাকে অধিগত করতে হবে আধুনিক বিজ্ঞান আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা, বার করতে হবে সামাজিক সম্পর্ক নির্ণয় করার কৌশল। আর এ-জ্ঞান, এ-শক্তি, এ-কৌশল তো আয়ত্ত করতে হবে সমস্ত মানুষকে, বিশেষ করে বঞ্চিত মানুষকে, শহরের আর গাঁয়ের সর্বহারাকে। নইলে রাষ্ট্র আর সমাজ আবার বিশেষজ্ঞদের ব্যুরোক্রেসির হাতের পুতুলে পরিণত হবে।

কিন্তু কি শিখবে? ফিউডালিস্ট আর বুর্জোয়ারা এতকাল যে-জ্ঞানবিজ্ঞান শিখিয়ে এসেছে, তা তো অসত্য বিকৃত শোষণব্যবস্থা পরিচালনার তত্ত্ব মাত্র. সুতরাং তা তো বর্জনীয় হওয়াই উচিত।

লেনিন বললেন: "যে-জ্ঞানস্রোতের পরিণতি হিসেবে কমিউনিজম এসেছে, তাকে না জেনে শুধুই কমিউনিস্ট স্লোগান কমিউনিস্ট বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি জেনে রাখা যথেষ্ট মনে করলে তা হবে নিতান্ত ভুল।

"সমস্ত মানবিক জ্ঞানের ভিতর থেকে সাম্যবাদ কিভাবে উঠেছে মার্কসবাদ তারই নিদর্শন।

"তোমরা পড়েছ শুনেছ যে কমিউনিস্ট তত্ত্ব, সাম্যবাদের বিজ্ঞান. প্রধানত মার্কসের সৃষ্টি; সেই মার্কসবাদের তত্ত্ব ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন সোশালিস্টের কৃতি মাত্র আর নেই, তা তিনি যতবড়ো প্রতিভাধরই হোন না কেন; তা আজ দুনিয়া জুড়ে কোটি কোটি সর্বহারার তত্ত্বে পরিণত হয়েছে। যে-তত্ত্ব তারা ব্যবহার করছে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে।

"আর যদি তোমরা জানতে চাও মার্কসের তত্ত্ব সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণীর কোটি কোটি মানুষের হৃদয় জয় করে নিল কেমন করে, তাহলে একটি জবাবই পাবে: এর কারণ হলো ধনতন্ত্রের শাসনে মানুষ যে-জ্ঞান লাভ

করেছে — তার দৃঢ় ভিত্তির ওপরেই মার্কস দাঁড়িয়েছিলেন। মানবসমাজের বিকাশের নিয়ম অনুধাবন করে মার্কস বুঝেছিলেন যে, ধনতন্ত্রের বিকাশ অনিবার্যভাবে এগিয়ে চলেছে সাম্যবাদের দিকে। ধনতন্ত্র সম্বন্ধে কঠিনতম শৃঙ্খলায় অধ্যয়ন, গভীরতম অনুশীলন ও বিস্তৃততম পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তিনি এর মূল বস্তু প্রমাণ করেছিলেন। আর এ-কাজ সম্ভব হয়েছিল এই জন্যেই যে পুরোযায়ী বিজ্ঞান যা-কিছু শিখিয়েছে তা সবই তিনি আত্মীকরণ করতে পেরেছিলেন।

"মানবসমাজ এর আগে যা কিছু করেছে তার একটি বিষয়ও উপেক্ষা না করে সবকিছুকেই সমালোচনা দিয়ে তিনি নতুন করে গড়েছিলেন। মানুষের চিন্তা যা-কিছু সৃষ্টি করেছে — তার সবকিছুকেই তিনি নতুন রূপ দিয়েছেন, সমালোচনা করেছেন, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের নিরিখে বিচার করেছেন, আর সেইসব সিদ্ধান্ত টানতে পেরেছেন যা বুর্জোয়া সীমায় আবদ্ধ বুর্জোয়া কুসংস্কারের পাকে জড়ানো লোকেরা টানতে পারেনি।

"এ-সব কথা মনে রাখতে হবে যখন, ধরো, আমরা সর্বহারার সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করি। মনুষ্যসমাজের সামগ্রিক বিকাশের পথে গড়ে ওঠা সমগ্র সংস্কৃতির সঠিক জ্ঞান এবং সেই সংস্কৃতির নবরূপায়ণেই সর্বহারার সংস্কৃতি গড়ে উঠবে — এ-কথা না বুঝলে এ-সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারব না।

"হঠাৎ কোথা থেকে এল কেউ জানে না — সর্বহারার সংস্কৃতি এমন নয়, স্বঘোষিত সর্বহারার সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞদের তৈরি মালও এ-নয়। ভাঁওতাবাজি কথা সব! ধনতান্ত্রিক সমাজ, জমিদারতান্ত্রিক সমাজ, আমলাতান্ত্রিক সমাজের শাসনের ভেতর দিয়ে মানুষ যে-জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে তুলেছে — তারই স্বাভাবিক বিকাশ হলো সর্বহারার সংস্কৃতি।" [৫]

আর সেইজন্যেই যুবসমাজকে সাধারণভাবে এবং যুব-কমিউনিস্ট লীগ ও অন্যান্য সংগঠনকে বিশেষ করে ডাক দিয়ে লেনিন বলেছিলেন যে, তাদের করণীয় কর্তব্যের নির্যাস একটি কথায় প্রকাশ করা যায়। তা হচ্ছে: "শেখো।" [৬]

আর সেইজন্যই তাঁর শেষ প্রবন্ধে লেনিন বলে গিয়েছেন: "আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র পুনর্গঠন করবার জন্যে যেমন করে পারি আমাদের শিখতে হবে, শিখতে হবে, আবারও শিখতে হবে [জোরালো ইংরাজি ভাষায় যা হলো: "first, to learn, second, to learn, and third, to learn"], তারপরে যা শিখেছি

তা কাজে লাগিয়ে পরখ করে দেখতে হবে যাতে তা না-বিলি-করা-চিঠির মতো শৌখিন বুলির মতো অব্যবহৃত থেকে না যায় (অস্বীকার করে লাভ নেই যে হামেশাই তা ঘটে থাকে), যাতে যা শিখেছি তা আমাদের সত্তার অঙ্গীভূত হয়, যাতে তা কার্যকরীভাবে পুরোপুরি আমাদের সমাজজীবনের অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হয়।" ৭

এ-পর্যন্ত লেনিনের চিন্তার অনুসরণ করে তিনটি সূত্র পাচ্ছি। প্রথমত, পুরোযায়ী সমস্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান শোষণমূলক সমাজের শাসকশ্রেণীর স্বার্থসৃষ্ট — এ-কথা বলে তাকে উপেক্ষা করা চলবে না; বিপ্লবীশ্রেণীকে সম্পূর্ণরূপে তা অধিগত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, এই জ্ঞানকে নতুন রূপ দিতে হবে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে। তাঁর ভাষায়: "পশ্চিম ইয়োরোপের বুর্জোয়ারা যা চায় সেই মতো দাবি রাখলে আমাদের চলবে না, যে-দেশ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে — তার উপযুক্ত চাহিদা হাজির করতে হবে।" ৮

তৃতীয়ত, এই নবরূপায়ণের পদ্ধতি হলো মার্কসবাদী সমালোচনা, বাস্তবে প্রয়োগের বিচার, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী অভিজ্ঞতা।

কি শিখব তা তো জানা গেল; এবার পরের প্রশ্ন হলো, কি করে শিখব।

এর জবাবে লেনিন বলেছেন — পুরনোর কাছ থেকে যে-জড় উপকরণ ও মানুষী উপাদান পাওয়া গেছে, তাকে কাজে লাগিয়েই তো সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে। তিনি বললেন: "আমরা স্বপ্নাশ্রয়ী নই যে, মনে করব সমাজ-তান্ত্রিক রাশিয়া গড়ে তুলতে হবে নতুন ধরনের মানুষ দিয়ে। পুরনো ধন-তান্ত্রিক দুনিয়া থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে-উপাদান মিলেছে, তাকেই ব্যবহার করতে হবে। পুরনো ধরনের লোককে আমরা নতুন পরিবেশে স্থাপিত করছি। যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ তাদের ওপর রাখছি, সর্বহারার সতর্ক প্রহরায় আমাদের প্রয়োজনীয় কাজ তাদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছি।" ৯

কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও লেনিনের সাবধানবাণী ছিল: "আমি আবার বলছি, কেবল শক্তির প্রয়োগ আমাদের কোথাও নিয়ে পৌঁছবে না। শক্তিপ্রয়োগ ছাড়াও, সফল শক্তিপ্রয়োগের পরে, আমাদের প্রয়োজন সংগঠন শৃঙ্খলা এবং বিজয়ী সর্বহারার নৈতিক শক্তি…নতুন গণপরিবেশ সৃষ্টি — যা বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের নিঃসন্দেহে বুঝিয়ে দেবে যে তাদের কোনো বিকল্প

পথ নেই, পুরনো সমাজে ফিরে যাবার রাস্তা নেই। একমাত্র কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাদের পাশে দাঁড়িয়েই কাজ করে যাওয়া সম্ভব···।" ১০

বস্তুত বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে লেনিন পথনির্দেশ রেখে গেছেন: "শ্রমিক-শ্রেণীর বিজয় আসবে না বুদ্ধিজীবীদের সহায়তার ওপর নির্ভর করে, বরং তা আসবে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও। হঠাতে হবে তাদের যারা অসংশোধনীয় রূপে বুর্জোয়া; যারা সংশয়দোলায় দোলায়মানচিত্ত। তাদের সংশোধিত করতে হবে, পুনর্শিক্ষিত করতে হবে; ক্রমে ব্যাপকতর অংশগুলিকে নিজ দলে জয় করে আনতে হবে।" ১১

লেনিন অন্যত্র বলেছেন: "আমাদের স্কুলশিক্ষকের মান এমন উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যা সে বুর্জোয়া সমাজে কখনও অর্জন করেনি বা করতে পারে না। এ স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এর প্রমাণ লাগে না। আমাদের এ-অবস্থা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে অবিচলিতভাবে, সুশৃঙ্খলরূপে; সনির্বন্ধ কাজ চালাতে হবে—উন্নততর সাংস্কৃতিক মানে শিক্ষককে উন্নীত করতে, তার মহৎ বৃত্তির উপযুক্ত শিক্ষায় তাকে শিক্ষিত করতে এবং মূলত, মুখ্যত, প্রধানত, তার বাস্তব অবস্থার উন্নতি সাধন করতে।

"স্কুলশিক্ষকদের সংগঠিত করবার প্রচেষ্টাকে আমাদের সুশৃঙ্খলভাবে বাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশে বুর্জোয়া ব্যবস্থার রক্ষাকবচের যে-ভূমিকা তারা বিনা ব্যতিক্রমে পালন করে চলেছে, তাকে বদলে সোভিয়েত ব্যবস্থার দুর্গবিশেষে তাদের পরিণত করতে পারি···।" ১২

একথা বলা ভুল হবে না যে লেনিনের নির্দেশ হচ্ছে বুর্জোয়াদের দ্বারা শিক্ষিত শিক্ষকদের দিয়েই শিক্ষাদানের কাজ শুরু করতে হবে; তাদের ওপর সুবিন্যস্ত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে; তাদের নতুন করে শিক্ষিত করে নিতে হবে, সমাজতন্ত্রই যে একমাত্র ভবিষ্যৎ সে-সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে; তাদের অবস্থার উন্নতি করতে হবে; তাদের সমাজতন্ত্রের সৈনিকে পরিণত করতে হবে। "করতে হবে" বলার অর্থ হলো, করা যায়। অর্থাৎ, এর বাস্তব পরিস্থিতি রয়েছে।

সাক্ষরীকরণ সম্পর্কে লেনিনের উদ্বেগের অন্ত ছিল না। ১৯২৩ সালে ঐ প্রসঙ্গেই তিনি লিখছেন: "সর্বহারার সংস্কৃতি এবং তার সঙ্গে বুর্জোয়া সংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়ে যখন আমরা ঢেঁকুর তুলছি, ঘটনা ও তথ্য তখন প্রমাণ করছে যে বুর্জোয়া সংস্কৃতির দিক থেকেও আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ। যেমন আশা

করা গিয়েছিল, ঠিক তেমনই দেখা যাচ্ছে যে সাধারণ অক্ষর-পরিচয়ের দিক থেকে আমরা এখনও খুবই পিছিয়ে রয়েছি, এমন কি জারের সময়ের তুলনায় (১৮৯৭) আমাদের অগ্রগতির হার নিতান্তই মন্থর। সর্বহারার সংস্কৃতির উত্তুঙ্গ স্বর্গে যাঁরা ভেসে বেড়াচ্ছেন তাঁদের কাছে এ-যেন কঠিন সাবধানবাণী ও নিন্দাস্বরূপ উপস্থিত হয়। এর থেকে বোঝা যায় পশ্চিম ইয়োরোপের সাধারণ একটা সভ্য রাষ্ট্রের মানে পৌঁছতে গেলেও আমাদের কতখানি গোড়ার কাজ করতে হবে। এ আরও দেখাচ্ছে যে সর্বহারা যতটুকু লাভ করেছে তার ভিত্তিতে প্রকৃত সাংস্কৃতিক মান অর্জন করতে গেলে আমাদের কি বিশাল কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে হবে।" [১৩]

ঐ প্রবন্ধেই অন্যত্র তিনি বলেছেন: "রাষ্ট্রের প্রথম চিন্তা হলো জনসাধারণকে পড়তে শেখানো, পড়ুয়া নাগরিকের সৃষ্টি করা...।" [১৪]

ক্লারা জেটকিন তাঁর 'লেনিনের স্মৃতি'তে লেনিনের কথা উদ্ধৃত করছেন: "ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের সময় পর্যন্ত নিরক্ষরতা সহ্য করা গেছে, তখন প্রয়োজন ছিল পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভাঙা। কিন্তু একি শুধু ভাঙার জন্যেই ভাঙা? আমরা তো ধ্বংস করছি মহত্তর সৃষ্টির জন্যে। নবনির্মাণের কাজের সঙ্গে নিরক্ষরতা অচল, তার অসঙ্গতি চূড়ান্ত। তাছাড়া, মার্কসের নির্দেশানুযায়ী শ্রমিকের তো সৃষ্টিরই কাজ এবং কৃষকেরও, যদি মুক্তির অভিলাষ তাদের থাকে।" [১৫]

উৎপাদনশীল শ্রমে অংশগ্রহণ যে শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ সে-কথা লেনিন ১৮৯৭ সালে তাঁর 'Gems of Narodniks' Hare-Brained Schemes' নামক প্রবন্ধে লিখে গেছেন। ক্রুপসকায়ার লেখায় এর উল্লেখ পাই। [১৬] আর এই নীতির থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নে 'পলিটেকনিকাইজেশন'-এর কার্যসূচী গৃহীত হয়েছে।

অবশ্য এ-বিষয়ে লেনিন অনুসরণ করেছেন মার্কস ও এঙ্গেলসকে। মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ডে স্পষ্ট বলেছেন: "রবার্ট আওয়েন খুঁটিয়ে দেখিয়েছেন যে ফ্যাক্টরি-ব্যবস্থাতেই ভবিষ্যতের শিক্ষাব্যবস্থার বীজ নিহিত রয়েছে। এ-শিক্ষাব্যবস্থায়, একটা বিশেষ বয়সের সমস্ত শিশুর ক্ষেত্রেই, মেশানো হবে উৎপাদনশীল শ্রম, শিক্ষণ ও ব্যায়াম। উৎপাদনব্যবস্থায় দক্ষতা বাড়ানোই এর উদ্দেশ্য নয়, এই হলো একমাত্র পদ্ধতি যাতে করে মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব হয়।" [১৭] এ-শিক্ষাকে সাধারণ প্রযুক্তিবিদ্যাশিক্ষা বলে

ভুল করার কারণ নেই। মার্কস নিজেই বলে গেছেন যে, এ-ব্যবস্থা একদিকে উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করবে এবং তারই সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার সবরকম শাখায় যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় ছাত্রদের তা ব্যবহার করতে শেখাবে। সমাজতন্ত্র গঠনে এ-পদ্ধতির গুরুত্ব সম্বন্ধে এঙ্গেলসও তাঁর 'Anti Duhring' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন।

লেনিন তাই পার্টি কার্যসূচী সংশোধন বিষয়ে ১৯১৭ সালে প্রস্তাব করলেন যে, একদিকে শিক্ষাব্যবস্থায় উৎপাদনশীল শ্রমের স্থান নির্ধারণ করা হোক, অন্যদিকে ১৬ বছরের কম ছেলেমেয়েদের চাকরি দেয়া নিষিদ্ধ এবং ১৬-১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের কাজের সময় চার ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ করা হোক।[১৮] আজ পর্যন্ত সোভিয়েত শিক্ষাব্যবস্থায় 'পলিটেকনিক্যাল' শিক্ষা স্বীয় গৌরবোজ্জ্বল আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছে।

লেনিন শিক্ষাবিষয়ক স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেননি, শিক্ষাব্যবস্থার সমস্ত স্তরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সম্পর্কে সুচিন্তিত সুগ্রথিত মতামত লিপিবদ্ধ করে যাননি। বিশেষত তাঁর চিন্তা নিবদ্ধ ছিল প্রধানত বিপ্লবোত্তর রুশদেশে সমাজতন্ত্র গঠনের কাজে শিক্ষার ভূমিকার উপর। আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা এখনও আসেনি। সমাজতন্ত্র এখনও অল্প-বিস্তর দূরে। এমনকি শিক্ষার ব্যাপারে আধুনিক অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির তুলনাতেও আমরা পেছিয়ে আছি অনেক। তাই শিক্ষা সম্বন্ধে লেনিনের চিন্তা স্মরণ করতে গিয়ে এ-প্রশ্নের জবাব দিতে হবে যে এর থেকে আজকের দিনে আমাদের দেশে কিছু পেলাম কি!

সেই জবাব গুছিয়ে পেশ করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে লেনিন যদিও সমাজতন্ত্র গড়বার পটভূমিকাতেই তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন এবং এ-দেশে সমাজতন্ত্র আসেনি, তবু সমাজতন্ত্র আনবার পথে ক্ষমতায় যাবার লড়াই তো শুরু হয়ে গেছে। আসল কথা তো লেনিন যে-কথাটি বলেছেন তার হুবহু উদ্ধৃতি দিয়ে বর্তমানের কার্যসূচী প্রণয়ন নয়! প্রয়োজন হলো, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাপদ্ধতিকে ব্যবহার করে আমাদের সমস্যার সমাধান বার করা।

তাই কোনো কোনো বিপ্লবীর মধ্যে বুর্জোয়া শাসনাধীনে পরিচালিত শিক্ষা পরিহার করা ও এই শিক্ষাব্যবস্থাকে উপেক্ষা করার যে-প্রবণতা দেখতে পাই সেটা লেনিনের চিন্তানুযায়ী নয়। কারণ লেনিনের এ-কথা শুধু একটি বিশেষ যুগেই সত্য নয় যে সৃষ্টিশীল রূপে মার্কসবাদকে ব্যবহার করতে গেলে প্রাক-

সমাজতান্ত্রিক ধনিকশ্রেণীর সৃষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞানকেও আয়ত্ত করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, সেই জ্ঞানকে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে বিপ্লবের প্রয়োজনে তীব্রতম সমালোচনার আগুনে পুড়িয়ে নবরূপায়ণ বা refashioning-এর দায়িত্ব রয়েছে। এটা করতে না পারলে লেনিনবাদী সৈনিক হওয়া সম্ভব হবে না, বুর্জোয়ার হুকুমবরদার হয়েই থাকতে হবে।

তৃতীয়ত বুর্জোয়া শাসনের কায়দা হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানকে শ্রমিক-কৃষকের আওতা থেকে বাইরে রাখাই নয়, সাধারণের জীবনের সংস্পর্শ থেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখা। এই পদ্ধতিতে উচ্চপর্যায়ে জ্ঞানচর্চা হলো বিমূর্ত সত্যের সাধনা। বিজ্ঞানের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার সংযোগ, সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক এ-ব্যবস্থা অস্বীকার করে। সুতরাং জ্ঞানযোগের ক্ষেত্রে সামাজিক দায়িত্বের স্বীকৃতি আদায়—এ-হলো আজকের দিনের লড়াই। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়কেই কারখানার মজুর ও মাঠের কৃষকের জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করতে হবে; তাদের কাজে, কিছুটা হলেও, হাত লাগাতে হবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে 'পলিটেকনিকাইজেশন' যদি অপরিহার্য হয়, তবে আমাদের দেশে Work Experience সত্য নিশ্চয়ই। বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী এ-ব্যবস্থা খুশি মনে চালু করবে না। তাই বলে মার্কসপন্থী-লেনিনপন্থীরা কি এ-ব্যবস্থা শুরু করার লড়াইটাও চালাবে না? এটা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার যে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের শিক্ষানীতিতে Work Fxperience-এর উল্লেখমাত্রও ছিল না এবং এ-যুক্তফ্রন্টে লেনিনবাদী দলগুলিরই সংখ্যাধিক্য ছিল।

চতুর্থত, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে, সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, সমাজতন্ত্রের সমর্থনে তাদের একটা অংশকে জয় করে নেবার লড়াই চালানো নিশ্চয়ই সম্ভব। সমাজতন্ত্রের পরে এটা হবেই, লেনিন বলেছেন। লেনিন তাঁর বক্তৃতায় আরও বলেছেন যে জার্মান স্পার্টাকিস্টরা এসে জানাচ্ছেন — তীব্র শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাবে এঞ্জিনিয়াররা ম্যানেজাররা এসে বলছে: "আমরা আছি তোমাদের সঙ্গে।"[১৯] বিপ্লবের পূর্বেই জার্মানিতে এটা সম্ভব হয়েছিল। তার থেকে আরও পঞ্চাশ বছর পরে, যখন বিশ্বময় সমাজতন্ত্রের বিজয় আজ অনিবার্যরূপে প্রতীয়মান, তখন বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় বৃহত্তর অংশকে জয় করে নেওয়া অনেক বেশি সহজসাধ্য।

পঞ্চমত, লেনিনের বক্তব্যের মূল কথা ছিল—রাজনীতিবিবর্জিত শিক্ষা

ভণ্ডামিমাত্র। সুতরাং লেনিনের মন্ত্রে দীক্ষিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির সংগ্রামের আবর্তের বাইরে থাকতে পারে না। তাদের নিজস্ব বাঁচবার লড়াইয়েও নিস্পৃহ থাকতে পারে না।

ষষ্ঠত, ক্লারা জেটকিন লেনিনকে বলেছিলেন যে, বিপ্লবের পক্ষে বরং নিরক্ষর লোক অনেক ভালো, কারণ লেখাপড়া শিখে অন্তত বুর্জোয়া কুসংস্কারে তারা মাথাভর্তি করেনি। লেনিন নাকি তার সীমাবদ্ধ সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।[২০] আসলে জেটকিন-এর কথায় যে-সত্যটা চাপা রইল তা হলো ফাঁকা মাথা কারুরই থাকে না। শিক্ষিতের কুসংস্কারে যদি তা ভর্তি না থাকে, তবে ভর্তি থাকে অশিক্ষিতের কুসংস্কারে। জীবন সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা-মূল্যবোধ সে সংগ্রহ করে বাপ-দাদার কাছ থেকে, বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে, যাজক-শোষকের কাছ থেকে, প্রাত্যহিক দিনযাপনের মধ্য দিয়ে, জীবনসংগ্রামের প্রক্রিয়ার মারফৎ। লেনিন স্বয়ং অন্যত্র ঘোষণা করেছেন, নিরক্ষরের মাথায় আছে "গুজব, গালগল্প, রূপকথা আর কুসংস্কার।" আসলে সেই বঞ্চিত নিরক্ষরকে বিপ্লবের পক্ষে টানার সহজসাধ্যতার কারণ তার নিরক্ষরতা নয়; শ্রেণীর মানুষ বলে শ্রেণীসংগ্রামের অভিজ্ঞতা তাকে সহজে বিপ্লবের দলে সাথী করে নেয়। উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর শ্রেণীস্বার্থ তাকে অধিকাংশ সময়েই টানে বিপরীত দিকে। একটা প্রশ্ন মনে জাগে: এটা কি সত্য যে আমাদের দেশে এ-বিষয়ে লেনিনের চেয়ে ক্লারা জেটকিন-এর প্রভাব বিপ্লবীদের ওপর বেশি? কারণ, নিরক্ষর মজুর-চাষীকে সাক্ষর করে তোলার ব্যাপারে বিপ্লবীরা খুব কাঁধ লাগাচ্ছেন বলে তো টের পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ এ-বিষয়ে লেনিনের ছিল গভীর উদ্বেগ, আর সে-আবেগ ও দুশ্চিন্তা তো নিতান্ত যুগাশ্রয়ী নয়।

নির্দেশিকা

১. Speech delivered at an All-Russia Conference of Political Education Workers of Gubernia and Uyezd Education Departments. Lenin: On Culture & Cultural Revolution. Progress Publishers, Moscow, 1966. Pp. 157-158.

২. Lenin: quoted by Beatrice King in Changing Man. Victor Gollanez Ltd., 1937. P. 25.

৩. Lenin : The New Economic Policy & The Tasks of The Political Education Department : On Scientific Communism. Progress Publishers, Moscow, 1967. P. 366.

৪. Lenin : Report on the Party Programme Delivered at the Eighth Congress of the R. C. P. (B.). March 19, 1919 : On Culture & Cultural Revolution. P. 76.

৫. Lenin : The Tasks of the Youth Leagues. October 2, 1920. Selected Works, Vol. II, F. L. P. H., 1947. Pp. 663-664.

৬. Ibid. P. 661.

৭. Lenin : Better Fewer, But Better. March 2, 1923. Selected Works, Vol. II, 1947. P. 845.

৮. Ibid. P. 845.

৯. Lenin : Report to Petrograd Soviet, March 12, 1919 : On Culture & Cultural Revolution. P. 63.

১০. Lenin : The Achievements & Difficulties of Soviet Government : On Culture & Cultural Revolution. P. 70.

১১. Lenin : A Great Beginning. June 28, 1919. On Culture & Cultural Revolution. P. 106.

১২. Lenin : Pages from a Diary. January 2, 1923. Selected Works, Vol. II, P. 828.

১৩. Ibid. P. 826.

১৪. Ibid. P. 827.

১৫. Clara Zetkin : My Recollections of Lenin : On Culture & Cultural Revolution. Pp. 239-240.

১৬. N. K. Krupskaya : On Education. F. L. P. H., Moscow, 1957. Pp. 164-165.

১৭. K. Marx : Capital, Vol. I, F. L. P. H., Moscow, 1954. Pp. 483-484.

১৮. N. K. Krupskaya : On Education. P. 165.

১৯. Lenin : Report on Party Programme. March 19, 1919. On Culture & Cultural Revolution. Pp. 76-77.

২০. Clara Zetkin : My Recollections of Lenin : On Culture & Cultural Revolution. P. 239.

বলশেভিজমের সূচনা ও বিপ্লবী রাজনীতির সামাজিকতা

অশোক সেন

ইওরোপের ইতিহাসে আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এক বিরাট পরিবর্তনের কাল শুরু হয়েছিল। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লব ও তৎপরবর্তী আর্থিক উন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিছু পরে হলেও ফরাসীদেশে ক্রমে ক্রমে নানা বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের মধ্যে বুর্জোয়া বিকাশের সম্ভাবনা পরিপূর্ণ হয়ে আসে। সেই বিবর্তনের পটভূমিতে রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সমাজচিন্তা ও রাজনীতির যুগান্তকারী ধ্যানধারণা সারা ইওরোপে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সামন্ততন্ত্রের অবলোপ, স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান এবং বুর্জোয়া ব্যবস্থায় শিল্পবিপ্লবের আরম্ভ ও দ্রুতগতি তখন ইওরোপের নানাদেশে দেখা দিয়েছিল। আবার উনিশ শতকের শেষার্ধে জার্মানির জাতীয় সংহতি গড়ে উঠল এবং সে-দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না ঘটলেও রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচারের কাঠামোতেই বিশিষ্ট ধনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ব্যবস্থা তৈরি হলো। এসব দৃষ্টান্তের পাশে উনিশ শতকের রুশদেশে পুরাতন ব্যবস্থার প্রতিবন্ধক ছিল অনেক বেশি কঠোর ও দুর্মর, তার রাষ্ট্রব্যবস্থায় জারতন্ত্রের প্রতাপ তখনো প্রবল এবং অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক সংঘাত ঘটলেও বহুলাংশে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পিছুটান সমানে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল।

অনুন্নত অবস্থার মধ্যে উনিশ শতকের রুশ মনন ও সমাজচিন্তায় পরিবর্তনের প্রয়োজন তীব্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক পরিবর্তনের পন্থানির্ণয়ে যে-ধরনের মতভেদ ও সমস্যাবলী প্রখর হয়ে উঠেছিল, তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত থেকে তৎকালীন রুশ সঙ্কটের স্বরূপ আমরা বুঝতে পারি। স্বৈরতন্ত্রের অবসান ও সামন্ততান্ত্রিক ভূমিদাস প্রথার বিলোপ যে নিতান্ত প্রয়োজন, সে-সম্পর্কে প্রগতিবাদী চিন্তাবিদদের মধ্যে মতৈক্য ছিল। আবার পশ্চিম ইওরোপে বুর্জোয়া বিবর্তনের কুফলগুলি সম্পর্কে অবহিতিও উনিশ

শতকের রুশ প্রগতিচিন্তায় বেশ প্রাধান্য পেয়েছিল। ফলে সামন্ততন্ত্রের বিলোপ ঘটবে, কিন্তু ধনতন্ত্রের পথে নয়। ধনতন্ত্রকে এড়িয়ে গিয়ে সরাসরি সাম্য ও স্বাধীনতার শোষণমুক্ত ন্যায়রাজ্যে পৌঁছবার স্বপ্ন তখন অনেক রুশ বিপ্লবী দেখতে শুরু করেছেন।

১৮২৫-এর ডিসেম্বরিস্ট বিদ্রোহ-প্রভাবান্বিত হারজেন ছিলেন রুশ বিপ্লব-চিন্তার এক মহান আদিপুরুষ। ১৯১২তে হারজেন-জন্মশতবার্ষিকীর শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে লেনিন তাই বলেছিলেন। পশ্চিম ইওরোপের বুর্জোয়া অভিজ্ঞতা' সম্পর্কে হারজেন মন্তব্য করেছিলেন যে রুশদেশের পক্ষে ঐ পথে না যাওয়ার সিদ্ধান্তই সমীচীন। ইতিহাসের পূর্বতন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আর সে-পথ মাড়াতে নেই, মানুষের সব অগ্রগতি এমনি এক "কালানুক্রমিক অকৃতজ্ঞতা"র কাহিনীতে জড়িয়ে আছে। আরো পরে আবার যেন হারজেন-এর প্রতিধ্বনিতেই চেরনিশেভস্কির সেই উক্তি : ইতিহাস যেন এক বুড়ি ঠাকুরমা, যাঁর ছোট নাতিদের ওপর দরদ বেশি। পরে যারা খেতে এল তাদের তিনি শুধু হাড় নয়, মজ্জার শাঁসটুকুও দেবেন, যখন আগে শাঁসের খোঁজে হাড় ভাঙবার চেষ্টায় পশ্চিম ইওরোপ তার আঙুলে বিশ্রী জখম করেছে।

এ-সব উক্তিতে ঝোঁক পড়েছিল সামন্ততন্ত্র থেকে সরাসরি এক সাম্যরাজ্যে উত্তরণের সম্ভাবনায়। অনুরূপ চিন্তাভাবনায় রুশ গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার বিশেষ রূপ এবং তার সম্পর্কে বেশ খানিকটা আদর্শবাদী কল্পনার যথেষ্ট অবদান ছিল। তৎকালীন রুশ গ্রামসমাজে চাষের জন্য জমির বিলিব্যবস্থায় সমবেত সিদ্ধান্তের জোর খাটত এবং ব্যক্তিগত সম্পদবৃদ্ধির যুক্তিতে নয়, কোনো পরিবারে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা অনুযায়ী জমি ব্যবহারের অধিকার ন্যস্ত হতো ; তার পুনর্বণ্টনও হতো সেই হিসাবে। ফলে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেও গ্রামসমাজে একটা আদিম সাম্যস্থিতির ব্যবস্থা ছিল। ১৮৬১র ভূমিদাসপ্রথা বিলোপ আইনেও গ্রামসমাজের ভূমিকা পুরোপুরি নাকচ করা হয়নি। এসবের ফলে কৃষকদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আগ্রহ ও যুক্তি অপরিণত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাকে নারোদনিক বিপ্লবীরা স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে স্বৈরতন্ত্র ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিলোপ ঘটিয়ে গ্রামসমাজের ভিত্তিতেই যুগপৎ অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমাজতান্ত্রিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা শুধু যে সম্ভব তাই নয়, সেটাই হলো রুশ ইতিহাসের বিশিষ্ট লক্ষ্য ও পথনির্দেশ। হারজেন-এর প্রাথমিক চিন্তাভাবনায় এবং পরে বৈপ্লবিক প্রচার ও প্রস্তুতির সাক্ষ্যবহ চেরনিশেভস্কির

অজস্র সক্ষম রচনাবলীতে নারোদনিক মতবাদের বিকাশ হয়েছিল। 'নারোদ-নাইআ ভোলিআ' (জনগণের ইচ্ছা) নামক সংগঠনে বহু তরুণ বিপ্লবী যোগদান করেছিলেন।

রুশ ইতিহাসে ধনতন্ত্রবর্জিত রূপান্তরের কথা মার্কসও পুরোপুরি অস্বীকার করেননি। মার্কসের আলোচনা, চিঠিপত্র থেকে জানা যায় 'ক্যাপিটাল' প্রথম খণ্ডে প্রাক-ধনতান্ত্রিক প্রাথমিক সঞ্চয় সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পশ্চিম ইওরোপ, বিশেষত ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসেই, সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে রূপান্তরের পশ্চিম ইওরোপীয় ধারা সবদেশেই ইতিহাসের একমাত্র পথ মনে করার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। গ্রামীণ সমাজে জমির দখল ও বিলিব্যবস্থায় যৌথ অধিকারের রীতিনীতি সম্পূর্ণ বিনষ্ট না হওয়ায় রুশ ইতিহাসে হয়তো ধনতান্ত্রিক পরিবর্তনের যন্ত্রণাদায়ক অধ্যায় বাদ দিয়ে সরাসরি সমাজতন্ত্রের বৈপ্লবিক সূচনা ঘটতে পারে। অবশ্য ১৮৬১ থেকে রুশ ইতিহাস ধনতান্ত্রিক পরিবর্তনের দিকে মোড় ঘুরছিল এবং তার ফলে মার্কসের মনে হয় যে শেষোক্ত ধারা স্থায়ী রূপ পেলে রুশদেশ ধনতান্ত্রিক পর্যায়ের সাংঘাতিক ফলাফল এড়িয়ে যাওয়ার 'প্রকৃষ্টতম সুযোগ' থেকে বঞ্চিত হবে।

ভেরা জাসুলিচকে লেখা (১৮৮১) চিঠিতে মার্কস আরো জোর দিয়ে বলেছিলেন গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা কতটা টিকে আছে তা সঠিক নির্ধারণ করা দরকার। সে-বৃত্তান্ত হাক্সথাউসেন-এর বই থেকে আবিষ্কার করে সমকালীন ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্দেশ করা যাবে না। ইতিমধ্যে ধনতন্ত্রের প্রসার যদি সেই ব্যবস্থার গোড়া কেটে দিয়ে থাকে তবে আর নিছক কোনো রোমাণ্টিক স্বপ্নপ্রয়াণে কিছু ফল হবে না। রুশ ইতিহাসের বিশেষ বিকাশে প্রথম যুগের নারোদনিক আদর্শের যে-সম্ভাবনা মার্কস উল্লেখ করেছিলেন, তা কার্যকরী হয়-নি। পরবর্তী ইতিহাস বরং মার্কস-নির্দিষ্ট অন্য সম্ভাবনার পথে রূপ নিল। রুশ ইতিহাসের 'প্রকৃষ্টতম সুযোগ' গ্রহণে নারোদনিকদের ঝোঁক যে ক্রমশ কালনিরূপণে প্রচণ্ড এক ভ্রমের চেহারা পেয়েছিল এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের পরিবর্তমান সত্য বুঝতে না পেরে তাঁরা যে প্রায় প্রতিক্রিয়ায় মিশে গিয়েছিলেন, লেনিনের 'রুশ ধনতন্ত্রের বিকাশ' গ্রন্থের পাতায় পাতায় প্রতিবাদে তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে।

ইতিহাসের ধারায় যে-ধনতন্ত্র রুশদেশে অনিবার্য হয়ে উঠল, তার চেহারা পশ্চিম ইওরোপীয় বিকাশ থেকে আলাদা। বৈষয়িক উন্নতির মাত্রা বিচারে

বর্তমান শতাব্দীর বছর পার হওয়ার পরেও রুশ পরিস্থিতি পশ্চিম ইওরোপ বা জার্মানির তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল। মার্কস-নির্দিষ্ট ধনতন্ত্রের দ্বিতীয় পন্থাই ছিল রুশ ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। তাই উৎপাদনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণে ধনতন্ত্রের ভূমিকা ছিল বিলম্বিত ও সীমাবদ্ধ। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে 'কুস্তার্নি' শিল্পসংগঠনের রকমফের মারফত ধনতন্ত্রের সূচনা ও বিকাশে বাণিজ্যতান্ত্রিক মূলধন ও আর্থিক লগ্নির ওপর থেকে চাপানো প্রখরতর শোষণব্যবস্থাতেই ছিল পরিবর্তনের মূল সূত্র। আবার ১৮৬১র তথাকথিত কৃষক মুক্তিতেও শ্রেণীবৈষম্যের দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে দেওয়া ভিন্ন খুব কিছু প্রগতির সম্ভাবনা ছিল না। শোষণের মাত্রা ও উৎপাদনের উপাদানগুলির বিকাশে যে-পরিপূরক সম্পর্কের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর পশ্চিমা ধনতন্ত্র সাময়িক, এলোমেলো ও নির্মম হলেও উৎপাদনশক্তির বিকাশে প্রগতিশীল ভূমিকা অর্জন করেছিল, রুশ ধনতন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ইতিহাসে তার ভিত্তি তৈরি হয়-নি। কিন্তু ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে মনোপলির সত্বর আবির্ভাব এবং ঐ একচেটিয়া বুর্জোয়া স্বার্থের সামাজ্যবাদী গতিপ্রকৃতির অভাব ছিল না।

গত শতাব্দীর শেষ দশকে দ্রুত ধনতান্ত্রিক বিকাশের পর্যায়ে সেই মনোপলি ব্যবস্থা, তার সঙ্গে রাষ্ট্রের সহযোগ, বিদেশী মূলধনের প্রতিপত্তি এবং সামরিক চাহিদার ওপর নির্ভরতার ব্যাপারগুলি প্রকট হয়ে ওঠে। আবার দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পরিপূরক কৃষিব্যবস্থা তখনো রুশ অর্থনীতিতে গড়ে ওঠেনি। ১৯০৫-এর পরে আর একবার রাষ্ট্রীয় জুলুমের জোরে কৃষি ও শিল্পে ধনতান্ত্রিক বিকাশের নির্মম গতিপথকে সকল বাধামুক্ত করবার প্রচেষ্টা হয়েছিল। ইতিমধ্যে কিন্তু সুদীর্ঘকাল স্বৈরতান্ত্রিক পর্যায়কে স্বাগত জানাবার অবস্থা ছিল না। সেই বিরোধের পরিবেশে ১৯১৭র বিপ্লবের প্রস্তুতি এগিয়ে চলেছিল।

অন্যপক্ষে আবার চরম সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয়ের মধ্যেও রুশ বুর্জোয়াসির বিলম্বিত আড়ষ্ট ভূমিকা কোনোদিন গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের যথেষ্ট সক্ষমতা অর্জন করেনি। উনিশ শতকের রুশ মননে এই সঙ্কটের চেহারা স্পষ্ট। পশ্চিম ইওরোপের দেশে দেশে বিরাট পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত আর আলোকপ্রাপ্ত চিন্তাধারার প্রভাব রুশ শিক্ষিত সমাজ এবং অভিজাত ও মধ্যশ্রেণীকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু জ্ঞান ও চিন্তার সেই যুগান্তরকে স্বদেশের প্রত্যক্ষ বাস্তবতায় কর্মে ও কীর্তিতে সৃষ্টিময় করে তুলবার প্রয়াস উনিশ শতকের রুশ সমাজে

বারবার দিশাহারা হয়ে পড়ে। সামন্ততন্ত্র তখন চরম অবক্ষয়গ্রস্ত ; উৎপাদন ও শোষণের ঐ রীতিতে যে কোনো নূতন সৃষ্টির শক্তি অবশিষ্ট নেই তা এক তর্কাতীত সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। কিন্তু রুশদেশে বুর্জোয়া বিকাশের ধারাতেও সৃষ্টিময় পরিবর্তনের দিগন্ত উন্মোচিত হয়নি। অনেকটা সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণের সহযোগী থেকে তা যেন কেমন পরগাছার মতো বাড়তে চাইছিল। আর ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সদাব্যাহত গতি-প্রকৃতিতে নির্বিত্ত শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক আবির্ভাবেরও কোনো অনিবার্য সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অর্থনৈতিক বিচারে তখনো খুবই অনুন্নত রুশ-দেশ। সামন্ততন্ত্র মরণাপন্ন, কিন্তু বিলুপ্ত নয়। আত্মপ্রতিষ্ঠার আবেগে প্রবল কোনো বুর্জোয়াশ্রেণীর আবির্ভাবও হয়নি। অথচ অভিজাত ও মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকেরা ইওরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন। সেই জ্ঞানের রাজ্য ক্রমে ক্রমে ফরাসী বিপ্লবের প্রগতিচিন্তা থেকে মার্কসবাদের যুগান্ত-নির্দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। জারের স্বৈরতন্ত্রে আড়ষ্ট প্রতিবাদে দুর্বল বুর্জোয়াসির রুশদেশে সেই জ্ঞানকে সামাজিক কর্মকাণ্ডে সার্থক করে তুলবার পথে বহু বাধা ছিল — কি রাজনীতিতে, কি অর্থনীতিতে। আরো আগে, আঠারো শতকের শেষ দিকে, সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন-এর সেই হাস্যকর প্রচেষ্টা থেকেই তো এই খাপছাড়া বিকাশের সূচনা — সেই যখন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনীতির কোনো পরিবর্তন না করে ক্যাথারিন উদারনীতির প্রবর্তনা ও সুপারিশের জন্য শুধু একটি কমিশন নিয়োগ করেছিলেন।

সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সৃষ্টিক্ষম সম্পর্কে সংযুক্ত কোনো শ্রেণীর নেতৃত্ব ব্যতীত সমাজকে ভেঙে গড়ার আদর্শ পূর্ণ হয় না। উনিশ শতকের রুশ সমাজের বিশেষ পরিস্থিতিতে তাই কৃষকের কল্পরাজ্যের স্বপ্ন, সামন্ততন্ত্র থেকে সরাসরি সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ওপর বেশি জোর পড়েছিল। হারজেন-এর স্বপ্নাতত্তিতে, চেরনিশেভস্কির বিপ্লব-চিন্তা ও কর্মে, বা টলস্টয়-এর ন্যায়বিশ্বে তাই বারবার মুঝিকের কর্মিষ্ঠতা, সারল্য ও অপাপবিদ্ধতার আদর্শ অত বড় হয়ে উঠেছে। দেশজোড়া অত্যাচার, অনাচার ও সৃষ্টিছাড়া শোষণের মধ্যে একমাত্র কৃষকের জীবন ও কর্মে তাঁরা উৎপাদনের যুক্তি, তথা সামাজিক মনুষ্যত্বের প্রাথমিক সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে ডিসেম্বরিস্টদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন আদর্শবাদী তাঁদের বিশ্বাস ছিল

কয়েকজন বীরপুরুষ মিলে জার-সম্রাটকে খতম করতে পারলেই মুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। সন্ত্রাসবাদের ঝোঁক চেরনিশেভস্কির আত্মত্যাগের আহ্বানেও নিহিত ছিল যাতে সেই ধারণা প্রবল হয়ে ওঠে যে বাছাই-করা কিছু ব্যক্তি নিজেদের চৈতন্যের ভাবমূর্তি অনুযায়ী দুনিয়া পুনর্গঠন করে দিতে পারেন। চেরনিশেভস্কির ধ্যান-ধারণায় কৃষক জনগণের মধ্যে বিদ্রোহী সত্তার সাযুজ্য অন্বেষণের প্রতিও জোর পড়েছিল। ক্রমে ক্রমে নারোদনিকদের চিন্তায় কৃষক-বিদ্রোহের প্রয়োজন অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। কৃষকের সঙ্গে আত্মীয়তায় নিজেদের সব অসম্পূর্ণতা ও গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে — এই বিশ্বাস উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বারবার বিদ্রোহী রুশ-মনকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

র‍্যাডিকাল চিন্তাভাবনায় আপ্লুত রুশ বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের জীবন পরিস্থিতি সামাজিক অবস্থা ও ভাবাদর্শের বিরোধে পর্যুদস্ত হচ্ছিলেন। বুর্জোয়া বিকাশের আড়ষ্টতা, অসম্পূর্ণতার দরুন সেই শ্রেণীর স্বরূপে কোনো বিপ্লবী আত্মপরিচয়ের অবলম্বন ছিল না। তখন মনে হয়েছিল সমাজবাদ ছাড়া ভবিষ্যৎ নেই এবং সেই সমাজবাদের ভিৎ কৃষকের জীবন ও মনে গ্রথিত আছে। তাই কৃষকের মধ্যে সেই জীবনদায়িনী শক্তির সন্ধান মিলবে যা রুশ বুদ্ধিজীবীকে, তার মননকর্মকে, বিচ্ছিন্ন সৃষ্টিছাড়া অস্তিত্বের গৌণতা ও গ্লানি থেকে মুক্তি দেবে।

ইতিহাসের যুক্তি ছিল আরো জটিল। কৃষকদের সম্পর্কে পল্লীসমাজ সম্পর্কে যেসব রোমান্টিক বা আদর্শসর্বস্ব ধারণা নিয়ে তরুণরা গ্রামের দিকে যেতেন, অনেক ক্ষেত্রেই তা বাস্তবের রূঢ় অভিজ্ঞতার সঙ্গে আদৌ মিলত না। কৃষকদের সরল জীবন ও বৃত্তির সাধারণ্যে হয়তো সমাজতন্ত্রের প্রাকৃত সম্ভাবনা অনেক বেশি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষকের সঙ্গে বৈপ্লবিক মৈত্রীর কর্তব্য ঠিক জড়-প্রকৃতিকে আপন কল্পনার তোড়ে উপমা-উৎপ্রেক্ষায় সাজিয়ে দেওয়ার ব্যাপার নয়। প্রাকৃত জীবনচর্চার বহু ঐশ্বর্য নিয়েও কৃষকের জীবন ও সত্তা শেষ পর্যন্ত নিছক কোনো প্রাকৃতিক ব্যাপার নয়, মানুষের ইতিহাসে সংলগ্ন হিসাব-নিকাশ সে-ক্ষেত্রে কাজ করবেই করবে। নারোদ-নিকদের ভাবাদর্শে কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব ও কার্যক্রম, তার অনুকূল গণসংগঠনের প্রয়োজন, কোনোদিন স্পষ্ট হয়নি। তাই গত শতাব্দীর দশকে দশকে রুশ তরুণদের মননে অনুভবে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা তীব্র থেকে তীব্রতর

হয়ে উঠেছে, স্নায়ুর আহুতিতে সমানে জ্বলেছে তাদের অন্তরের আগুন, কিন্তু সেই অগ্নিপূজা কোনো যুগান্তকারী কৃষক বিপ্লবে গোটা সমাজকে ভেঙে গড়ার সার্থকতা অর্জন করেনি। কৃষক তো আর বিদ্রোহী তরুণদের স্নায়ুযন্ত্রণা মোচনের দায়ে বিপ্লব করবে না।

অনেক সময়েই আবার তৎকালীন রুশ-চিন্তায় সমাজতন্ত্রের উৎসাহ উৎপাদনের যুক্তিতে মিলতে পারেনি। শিল্পসমৃদ্ধ ইওরোপ থেকে সমাজতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিত গ্রহণ করবার পরে লেনিন-পূর্ব রুশ-বিপ্লবচিন্তায় বারবার এক কৃষিভিত্তিক কল্পরাজ্যের স্বপ্ন প্রশ্রয় পেয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয়ের পরে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের অনেকগুলি ধাপ সম্পর্কে অবহিতি স্পষ্ট হয়নি। তার আগেই সম-বণ্টনের আদর্শ নিয়ে আগ্রহাতিশয্য দেখা দিয়েছিল। পশ্চিম ইওরোপীয় ধনতন্ত্রের সামাজিক মানবিক ব্যর্থতা নিয়ে সমালোচনার অন্ত ছিল না, কিন্তু রুশদেশে শিল্প-বিপ্লবের কোনো বিকল্প যুক্তি-গ্রাহ্য প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়নি। তাই বেলিনস্কির মতো বিচক্ষণ ব্যক্তি যদিবা বুর্জোয়াসির ভূমিকা নির্ণয়ে ইতিহাস-চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন, তবু তিনিই আবার ব্যবহারিক জ্ঞানের বিভাগ ও বৃত্তিমূলক ব্যুৎপত্তির প্রতি প্রচণ্ড অনীহায় যেন শিল্প-বিপ্লবের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি ব্যাপারকেই চরম উপেক্ষা করেছিলেন। রসায়ন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ বহু রুশ তরুণ নিহিলিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে গোপনে বোমা তৈরির কাজে মেতেছিলেন। পর্যাপ্ত শিল্পোন্নয়নের অবস্থায় হয়তো এইসব তরুণরাই অন্যবিধ কর্তব্যে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠা খুঁজতেন। আর একজন মনস্বী রুশ সমালোচক টলস্টয়-এর 'রেজারেকশন' উপন্যাসের নায়ক সম্পর্কে যে-মন্তব্য করেছিলেন, তাতে তৎকালীন রুশ-মননের সঙ্কট বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে — নেখলুডভ-এর গোলমাল হয়ে গেছে এই যে তিনি নিজে কোনো কর্মময় বৃত্তি গ্রহণ না করে চাষীদের সাহায্য করতে চান।

২

রুশ সমাজ ও বিপ্লবচিন্তায় পূর্বোক্ত নানাবিধ কাল্পনিকতা, অপচয় ও অসম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লেনিন বলশেভিক মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নির্বিত্ত শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা নির্ণয়ে তাঁর মার্কসীয় সিদ্ধান্ত সামাজিক রূপান্তরের ইচ্ছা ও আগ্রহকে সম্যক

আত্মপরিচয় ও সদর্থক বৈপ্লবিক শক্তিতে গ্রথিত করেছিল। নারোদনিকিজম, আইন বাঁচিয়ে মার্কসবাদ, অর্থনীতিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লেনিনের প্রচণ্ড প্রতিবাদ রুশ-মনন ও সমাজচিন্তার শতাব্দীব্যাপী সীমা-সন্ধান এবং সঙ্কটের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছিল। রুশ সমাজচিন্তা ও বৈপ্লবিক ধারণার পূর্বতন বহু বিভ্রান্তি ও বিহ্বলতা পেরিয়ে মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক পথনির্দেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে জার্মানির প্রসঙ্গে মার্কস লিখেছিলেন যে সেখানে সামন্ততন্ত্রের কাঠামো অনেকটা বজায় থাকলেও বুর্জোয়াব্যবস্থা ও নির্বিত্তশ্রেণীর বিশেষ বিকাশ ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া বিপ্লব হয়তো নির্বিত্তশ্রেণীর বিপ্লবেরই আশু প্রস্তাবনা হয়ে দাঁড়াবে। ১৮৫০-এ কমিউনিস্ট লীগের বক্তৃতাবলীতেও মার্কস জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক দ্বৈত ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছিলেন। গত শতাব্দীর শেষ দিকে রুশদেশেও ফিউডাল অবক্ষয় ও স্বৈরতন্ত্রের পরিস্থিতির মধ্যে বুর্জোয়া পরিবর্তনের গতি বাড়ছিল। সেখানেও নিছক বুর্জোয়া নেতৃত্বের জোরে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা হয়ে পড়ছিল সুদূরপরাহত। একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবকৌশল এবং তার অনিবার প্রয়োগে স্বৈরতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটতে পারে এবং বুর্জোয়াসির রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে নির্বিত্তশ্রেণীর সংগ্রাম আরম্ভ হবে। গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এই পারম্পর্য সাধনের কর্তব্যেই মার্কস শ্রমিকশ্রেণীর দ্বৈত ভূমিকা নির্দেশ করেছিলেন। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে তার রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচার অবলোপের জন্য বুর্জোয়াসির সংগ্রাম আড়ষ্ট অসম্পূর্ণ হয়ে পড়লে, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকা ছাড়া ইতিহাসের সেই দায় উদ্ধার সম্ভব নয়।

রুশদেশের আইনসম্মত মার্কসবাদী (legal marxists) বা নারোদ-নিকদের তত্ত্ব ও কর্মে ঐ বিশিষ্ট অবহিতির কোনো পরিচয় ছিল না। জারের রাজত্বেও আইনসম্মত মার্কসবাদীদের বই ও কাগজ-পত্র প্রকাশের সুযোগ ছিল বেশি, নিষেধাজ্ঞার বাধা তাঁদের ওপর কমই চাপত। তাঁদের কাজ ও মতের প্রায় কোনো বিরোধী রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল না। ধনতান্ত্রিক বিকাশ সম্পূর্ণ হওয়ার আগে শ্রমিকশ্রেণীর কোনো রাজনৈতিক ভূমিকা নেই, কেবল ট্রেড ইউনিয়ন মারফত অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া আদায়

এবং উদারনীতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে গেলেই চলবে, এই ছিল তাঁদের চিন্তা-ভাবনার মূল কথা।

নারোদনিকদের সঙ্কট ১৮৮০ থেকে খুব জটিল অবস্থায় পৌছেছিল। কৃষকের কাছে যাওয়ার কর্মসূচী ও কৃষক-বিপ্লবের প্রস্তাব সফল হয়নি। বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সন্ত্রাসবাদী হঠকারিতায় নষ্ট হয়ে যায়। জার-সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যার পরে 'নারোদনাইআ ভোলিআ' দলের ওপর প্রচণ্ড দমননীতির আঘাত এসে পড়ে। অথচ সেই চ্যালেঞ্জের সঙ্গে মোকাবিলায় সক্ষম কোনো গণআন্দোলনের প্রস্তুতি সন্ত্রাসবাদী কর্মপন্থায় সম্ভব ছিল না। বারম্বার ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায় একধরনের সুবিধাবাদ নারোদনিক আন্দোলনের এক অংশে সংক্রামিত হয়। এঁরা বিপ্লবের চিন্তা ও কাজ বাদ দিয়ে মুঝিকের কর্মিষ্ঠতার রূপকে শান্তিপূর্ণ বুর্জোয়া পরিবর্তনের যুক্তি খুঁজতে শুরু করেন। অন্যপক্ষে অবশ্য লেনিন-পূর্ব রুশ-বিপ্লবমানসের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার তখনো নারোদনিক আন্দোলনের বিপ্লবী অংশের মধ্যে কার্যকরী ছিল। সামাজিক বিপ্লবী (Social Revolutionaries) দলের ভূমিসংস্কার সম্পর্কিত কর্মসূচীকে গ্রহণ করে পরে লেনিন বিপ্লবী নারোদনিক ও বলশেভিকদের, কৃষক-শ্রমিকদের, যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলেছিলেন। নারোদনিকদের আর এক অংশ আবার স্বদেশ থেকে নির্বাসিত অবস্থায় মার্কসবাদ ও পশ্চিম ইওরোপের শ্রমিক আন্দোলন থেকে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ১৮৮৩তে প্রথম রুশ শ্রমিকশ্রেণীর আলাদা পার্টি স্থাপিত হলো। এই প্রসঙ্গে প্লেখানভ-এর নাম সর্বাগ্রগণ্য।

প্লেখানভ ও তাঁর সহকর্মীদের উদ্যোগে যে-বৈপ্লবিক ভাবনার সূত্রপাত, গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে লেনিনের চিন্তা ও কর্মের অনিবার প্রতিভায় তা ইতিহাসের প্রচণ্ড তাৎপর্য ও গতিবেগ অর্জন করল। ১৯০৩এ বলশেভিক পার্টির প্রতিষ্ঠায় লেনিনের বিপ্লবী জীবনের আদি পর্যায় আর এক সার্থক সূচনায় পৌছল। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পুরো জোর রুশ বুর্জোয়াসির না থাকলেও, রুশ অর্থনীতি তখন আদৌ ধনতন্ত্রমুক্ত নয় — কি শিল্পে, কি কৃষিতে। এই অবস্থায় ধনতন্ত্রকে এড়িয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ইতিহাসের আয়ত্তাতীত হয়ে পড়েছিল। আবার অক্ষম আড়ষ্ট বুর্জোয়াসির চেষ্টাতেই গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হবে ভেবে নেওয়ার কোনো যুক্তি ছিল না। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা ও উদ্যোগের বিস্তৃতি ব্যতীত গণতান্ত্রিক

বিপ্লবের সাফল্যও অনায়ত্ত থেকে যাবে। অনুরূপ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের সমগ্রতাতে লেনিন প্রথম বলশেভিক পার্টি ও মতবাদের প্রয়োজন ও ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন।

প্রায় পুরো উনিশ শতক ধরে রুশ বিপ্লবী মননের সঙ্কটমুক্তির জন্য শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা নির্ণয়ের প্রশ্নটি ছিল বিশেষ জরুরি। নির্বিত্তশ্রেণীস্বরূপের সঙ্গে সংলগ্নতাতেই রুশদেশের প্রগতিচিন্তার পক্ষে একটা বাস্তব অবলম্বনের জোর পাওয়া সম্ভব ছিল। শতাব্দীর প্রারম্ভে রাডিশেভ-এর করুণ আত্মহত্যার সময়ে, পরে হারজেন ও চেরনিশেভস্কির মানব-স্বপ্নে — তার আয়ত্তির জন্য মরিয়া আবেগে, ডোব্রলুবভ-এর বৈপ্লবিক প্রত্যয় ও সাম্যের আদর্শে, বা অন্যপক্ষে পিসারেভ-এর শিক্ষাবিস্তারের মারফত বিপ্লব-রসায়নের ধারণায় একটা ঐতিহাসিক সীমাসন্ধানের দুর্দম আগ্রহ এবং তার অসম্পূর্ণ উৎক্রান্তির পরিচয় বারবার ধরা পড়েছিল। চিন্তার স্বাবলম্বনে, আদর্শের ঐশ্বর্যে, নির্ভীক ব্যক্তিচরিত্রের মহিমায় তাঁরা অনেকে আজীবন সমাজ-বিপ্লবের সাধনায় নিজেদের নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন রুশ সমাজের বিশেষ পটভূমিতে অবক্ষয়াক্রান্ত সমাজব্যবস্থা ও স্বৈরাচারী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে গড়ার বিপ্লবে আগাগোড়া সামিল হওয়ার মতো আত্মপ্রত্যয় কোনো শ্রেণীতে চারিয়ে যায়নি। ফলে শ্রেণীগত তাদাত্ম্য ও একনিষ্ঠ উদ্যমের ঘাটতি বিপ্লবের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, কেবল বিদগ্ধ মননের উপপ্লব ও পরিবর্তন-অভীপ্সা সমাজব্যাপী প্রতিকূলতা অতিক্রমনের উপায় পুরোপুরি খুঁজে পায়নি।

বিপ্লবের শ্রেণীগত ভিত্তি তথা সামাজিক আসনের এই শূন্যস্থান লেনিন শ্রমিকশ্রেণীর মার্কসীয় ধারণা দিয়ে পূর্ণ করলেন। শ্রমিকশ্রেণীর যুগান্তকারী ঐতিহাসিক তাৎপর্য, যে-সচেতন ভূমিকায় তার বিরাট গুরুত্ব, সমাজের গতি-প্রকৃতিতে যা ক্রমাগত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনায় রূপ নিচ্ছে — নির্বিত্ত শ্রমিক জনগণের পক্ষে তার অবহিতি কোনো স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার নয়। বিপ্লবের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে শ্রমিকশ্রেণী যাতে এগিয়ে আসতে পারে, তার উপযুক্ত চৈতন্যের প্রস্তুতি ও সংগঠন গড়ে তোলাই পার্টির কাজ। ইতিহাসের যে-বাস্তব সম্ভাবনা শ্রমিকশ্রেণীর পরিস্থিতিতে নিহিত আছে, অনবরত তার জ্ঞান ও নিয়মের বোঝাপড়ায় শ্রমিকশ্রেণী আপন পরাক্রম ও ভূমিকা সম্পর্কে আত্মসচেতন হয়ে উঠতে পারে। সেই আত্মসচেতনতার জোরে শ্রমিকশ্রেণী স্বীয় পরিস্থিতির সঙ্গে সমাজের স্তরে স্তরে নানা বিরোধ, শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও

বিধি-ব্যবস্থার যোগাযোগ খুঁজে পাবে এবং প্রতিবাদে বিপ্লবে সমাজকে ভেঙে গড়ার শুধু আন্তরিক প্রেরণা নয়, বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের নিশ্চয়তা অর্জন করবে।

গত শতাব্দীর শেষ দশকে রুশদেশে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক আন্দোলন এক বিশেষ পরিস্থিতিতে পৌঁচেছিল, অথচ সেই পরিস্থিতির বিপুল সম্ভাবনাকে কার্যে পরিণত করবার উপযুক্ত তত্ত্ব ও নেতৃত্ব তখনো কোনো পার্টিতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নির্বিত্তশ্রেণীর সংগ্রাম তখন শ্রমিকজীবনের নূতন নূতন স্তরে বিস্তার লাভ করছে। ১৮৯০এর পরে দ্রুত ধনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলস্বরূপ নির্বিত্তশ্রেণীর আয়তনও বেড়ে যাচ্ছিল। ছাত্র ও জনসাধারণের অন্যান্য বিবিধ অংশের মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য লড়াইয়ের প্রেরণা ছড়িয়ে পড়ছিল। নারোদনাইআ ভোলিআর সঙ্কটের পরে রুশ তরুণ ও বুদ্ধিজীবীদের যে-বিপ্লবপ্রেরণা স্তিমিত হয়েছিল, তাই যেন আবার শতাব্দীর শেষ দশকে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক আন্দোলনের মধ্যে নূতন নেতৃত্বের প্রত্যাশায় আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। আর সবকিছুর পটভূমিতে রুশ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিরোধজর্জর অভিজ্ঞতার কোনো অন্ত ছিল না। সমগ্র সামাজিক পরিস্থিতিতে নিহিত বৈপ্লবিক সম্ভাবনাই আবার নারোদনিকদের, আইন বাঁচানো মার্কসবাদের, অর্থনীতিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বহুবিধ বিভ্রান্তিতে বিপর্যস্ত হয়েছিল।

সমগ্র সামাজিক জীবন ও তার অন্তর্নিহিত বিরোধের স্তরগুলি সম্পর্কে চৈতন্যের সম্প্রসারণই বৈপ্লবিক রাজনীতির গোড়ার কথা। সেই চৈতন্যের জোরে শত্রু-মিত্রের চেনাশোনা, সংগ্রামের পন্থা ও লক্ষ্য শ্রমিকশ্রেণী নির্ধারণ করতে পারে। নির্বিত্তের শ্রেণীস্বার্থের ধারণা নিছক কিছু ব্যক্তিস্বার্থের যোগফল মাত্র নয়। শোষিতশ্রেণীর চেতনায় নিজের প্রয়োজনের সঙ্গে সামাজিক যুগান্তরের যোগাযোগ স্পষ্ট হয়ে উঠলে বিপ্লবের পথনির্দেশ অনিবার্য হতে পারে। সেখানেই শোষিত মানুষের ইমানের উৎস এবং তার প্রচণ্ড জোর প্রকাশ পায়। শ্রেণীশোষণের দুঃসহ সর্বহারা অবস্থাতেও সে কারও বদান্যতার অপেক্ষায় নেই, বিপ্লবের জটিল কার্যক্রমকে কোনো সমাজবিরুদ্ধ সন্ত্রাসে সংক্ষিপ্ত করবার অলীক কল্পনাও তার নেই, কোনো ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত লোভের প্রতিযোগিতায় সে ভেড়ে না। সে দৃঢ়ভাবে জানে কোথায় তার শক্তির উৎস, কোন সামাজিক সংগ্রামে তার অধিকারের

প্রতিষ্ঠা অনিবার্য ও সুনিশ্চিত। নির্বিত্ত শ্রমিকশ্রেণীকে তার এই বিরাট ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে তুলবার ভাবাদর্শই লেনিন 'ইসক্রা'র পাতায় দিনের পর দিন প্রচার করেছিলেন। ১৯০২এর 'কি করতে হবে' বা 'What is to be done' বইটিতে সেই ভাবাদর্শের সুসংহত পরিচয় আমাদের বিশেষ দ্রষ্টব্য। তার ভিত্তিতে ১৯০৩এ বলশেভিক পার্টির প্রতিষ্ঠা হলো।

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিকে গোটা সমাজের জন্য একটা বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজন তীব্র ও স্পষ্ট করে তুলতে হবে এই ছিল লেনিনিস্ট রাজনীতির গোড়াকার কথা। সমাজকে পালটাবার লড়াইতে শ্রমিকের ভূমিকা হবে অগ্রগণ্য, কিন্তু পালটাবার পুরো প্রস্তাব ও বিপ্লবী প্রচেষ্টায় শুধু শ্রমিকের আর্থিক অবস্থায় উন্নতির ব্যাপরটাই সব নয়। শোষণমূলক অর্থনীতি ও স্বৈরতন্ত্র সমাজবর্তী লোকজীবনের নানা স্তরকে, নানা শ্রেণীতে ছড়ানো জনগণকে, বহুবিধ বিষয়ে কোনো কোনো আকারে বিপর্যস্ত করছে। শ্রেণীশোষণ ও তার সঙ্গে জড়িত সামাজিক অব্যবস্থা অনাচারের সর্ববিধ প্রকাশকে অনিবার আন্দোলন ও প্রচারের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত করাই পার্টির কর্তব্য। এইভাবে গণজীবন ও মনের সকল স্তরে একটা বিকল্প ব্যবস্থার জন্য আগ্রহ ও সংগ্রামের প্রস্তুতি সুদৃঢ় হতে পারে। না হলে শুধু বিচ্ছিন্নভাবে আর্থিক দাবি-দাওয়ার আন্দোলন বা গোপনে কয়েকটি শ্রেণীশত্রুকে খতম করে দেওয়ার সন্ত্রাসবাদ কিছুতেই বিপ্লবের সামাজিক শক্তি ও তাৎপর্য অর্জন করতে পারবে না।

লেনিনের চিন্তা ও আদর্শে রাজনীতি ও অর্থনীতির নিবিড় যোগসূত্র সত্ত্বেও তাদের মধ্যে স্তরভেদের সত্যটি কখনো উপেক্ষিত হয়নি। অর্থনীতিবাদ বা শুধু রুজি-রোজগারের লড়াইতে শ্রমিক-আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখবার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ 'কি করতে হবে' বইটির প্রধান বক্তব্য। তাই লেনিনের সেই উক্তি, "এক কথায় বলতে গেলে প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মালিক ও সরকারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রাম চালান বা চালাতে সাহায্য করেন। বেশ জোর দিয়ে বলতে চাই যে এটা ঠিক এখনো সোশ্যাল ডেমোক্রেসি হয়ে উঠছে না। কেবল ট্রেড ইউনিয়নের সেক্রেটারি হওয়া সোশ্যাল ডেমোক্রাটের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়, তাঁর হওয়া দরকার সর্বপ্রকারে জনগণের রক্ষক ও সমর্থক যিনি স্বৈরতন্ত্র ও অত্যাচারের যে-কোনো প্রকাশে রুখে দাঁড়াবেন তা যেখানেই প্রকাশ পাক

না কেন কিংবা যে-কোনো স্তর বা শ্রেণীর মানুষকে আঘাত করুক না কেন, যিনি ওরকম যাবতীয় ঘটনা থেকে পুলিশী জুলুম ও ধনতান্ত্রিক শোষণের একটি অখণ্ড চিত্র গড়ে তুলবেন, যিনি প্রতিটি ঘটনাকে — তা সে যত নগণ্যই হোক— তাঁর সমাজবাদী প্রত্যয় ও গণতান্ত্রিক দাবির উপস্থাপনায় ব্যবহার করতে পারবেন যাতে জনসাধারণের কাছে নির্বিত্তের মুক্তি-সংগ্রামের সর্বব্যাপী ঐতিহাসিক তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে" (Collected works, vol. 5, Moscow, পৃষ্ঠা ৪২৩)।

লেনিনের দৃঢ় মত ও পথনির্দেশ ছিল যে, শ্রমিকের রাজনৈতিক ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য শুধু জীবিকা-সংক্রান্ত দাবি-দাওয়ার ওপর নির্ভর করে থাকা আদৌ যথেষ্ট নয়। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের কর্মকাণ্ডের আদর্শনীয়তা সম্পর্কে লেনিন মন্তব্য করেছিলেন, "তা প্রতি ক্ষেত্রে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করে।" তাঁদের সেই কাজের কিছু কিছু দৃষ্টান্তও লেনিন দিয়েছিলেন। তার মধ্যে আছে "একজন প্রগতিকামী বুর্জোয়ার পৌরপ্রধানের পদে নির্বাচনে উইলহেলম-এর অনুমোদন না পাওয়ার ব্যাপার (আমাদের অর্থনীতিবাদীরা এখনো জার্মানদের বুঝিয়ে উঠতে পারেননি যে এমন ব্যাপারে প্রতিবাদ জানালে নাকি উদার-নীতির সঙ্গে সমঝোতা ঘটে); 'অশ্লীল' পুস্তক ও চিত্রের প্রকাশ-সংক্রান্ত আইনের ব্যাপার; অধ্যাপকদের নিয়োগে সরকারি প্রভাবের ব্যাপার প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই দেখা যায় সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা পুরোভাগে স্থান নিয়ে সকল শ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক অসন্তোষ জাগিয়ে তুলছেন, জাগিয়ে তুলছেন অলসদের, পিছিয়ে পড়াদের প্রেরণা দিচ্ছেন এবং নির্বিত্তশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা ও কর্মের যাতে বিকাশ ঘটে সেই উদ্দেশ্যে প্রচুর তথ্যসম্ভার যোগাতে পারছেন" (ঐ, পৃষ্ঠা ৪৩৯)। এ-সম্পর্কে লেনিনের আরও স্পষ্ট বক্তব্যও আমাদের স্মরণীয়, "রাজনৈতিক নিপীড়ন যতদূর পর্যন্ত সমাজের সব শ্রেণীকেই আঘাত করে, যতদূর পর্যন্ত তা জীবন ও কর্মের নানা ক্ষেত্রে প্রকট — শিল্পোৎপাদন, নাগরিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ধর্মগত, বিজ্ঞানকর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্র তার অন্তর্ভুক্ত —তদনুযায়ী স্বৈরতন্ত্রের নানাবিধ চেহারা প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য সাংগঠনিক দায়িত্ব না নিলে আমরা যে রাজনৈতিক চেতনা বিস্তারের কর্তব্য পুরোপুরি পালন করব না তা কি স্পষ্ট নয়?"

পার্টির কাজকে শুধু শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবার সঙ্কীর্ণতামূলক

ভ্রান্তির বিরুদ্ধে লেনিন কঠোর মন্তব্য করেছিলেন, "সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কাজের কি কোনো ভিত্তি আছে? এ-ব্যাপারে কারো সন্দেহ থাকলে তার চেতনায় স্বতঃস্ফূর্ত জনজাগরণের ধারণার দরুন ঘাটতি ঘটেছে। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন কোনো অংশে অসন্তোষ জাগিয়েছে, কোনো অংশে বিরোধীদের প্রতি সমর্থনের আশাও জেগেছে, এবং আরও অন্যদের মধ্যে এই বোধও জাগিয়েছে যে স্বৈরতন্ত্র অসহনীয় এবং তার পতন অবশ্যম্ভাবী। অসন্তোষের প্রতিটি প্রকাশকে, যে-কোনো প্রতিবাদকে — তা যত নগণ্যই হোক না কেন — সম্যক ব্যবহার করতে না পারলে আমরা শুধু নামেই 'রাজনীতিক' ও সোশ্যাল ডেমোক্রাট থেকে যাব (বাস্তবে যা প্রায়ই ঘটছে)। লক্ষ লক্ষ মেহনতী কৃষক, কারিগর যে কোনো যোগ্য সোশ্যাল ডেমোক্রাটের বক্তৃতা শুনবেন তার থেকে এটা আলাদা ব্যাপার। সত্যিই কি এমন কোনো সামাজিক শ্রেণী আছে যার কোনো-না-কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠী বা চক্র অধিকারের অভাব এবং স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে অসন্তুষ্ট নন এবং তাই তাঁরা গণতান্ত্রিক দাবির প্রবক্তা সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের প্রচারেরও অগম্য নন?" (ঐ, পৃষ্ঠা ৪১০)

লোকসমাজে ঘনিষ্ঠ সংলগ্নতার জোরে যে-বিপ্লবী চেতনার আবির্ভাব ঘটতে পারে তার দায়িত্বে ফাঁকি দেওয়ার ফলস্বরূপ একদিকে অর্থনীতিবাদের আত্মতৃপ্তি ও অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টিছাড়া উত্তেজনার মধ্যে একটি মৌল সাদৃশ্যের প্রতি লেনিন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর মতে, "সন্ত্রাসের ডাক বা কেবল অর্থনৈতিক সংগ্রামকে রাজনৈতিক চরিত্র দেওয়ার আহ্বান রুশ বিপ্লবীদের পক্ষে আজকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে গাফিলতির দুটি ধরন মাত্র। সেই দায়িত্ব হলো ব্যাপক রাজনৈতিক প্রচার ও গণআন্দোলনের সংগঠন। * * * এতে প্রমাণ হয় যে সন্ত্রাসবাদী ও অর্থনীতিবাদীরা উভয়েই জনগণের বিপ্লবকর্মকে কম মূল্য দেন * * * এবং একদল যেমন কৃত্রিম উত্তেজকের খোঁজ করেন, অন্যটি আবার শুধু 'সাফ সাফ' দাবির কথা তোলেন। কিন্তু উভয়েই রাজনৈতিক প্রচার ও উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে নিজেদের কাজের বিকাশের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেন না। আর বর্তমানে বা অন্য কখনোই তো আর কিছু দিয়ে এই কর্তব্যের দায় নির্বাহ করা যায় না।" (ঐ, পৃষ্ঠা ৪২০-২১)

৩

'কি করতে হবে' বা 'what is to be done' বইটিতে লেনিনের সুবিন্যস্ত তত্ত্বকে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের পক্ষে সামগ্রিক সমাজচেতনা ও সঙ্কীর্ণতামুক্ত গণভিত্তির প্রয়োজন সম্পর্কে লেনিনের সুস্পষ্ট নির্দেশকে বলা যায় বলশেভিক ভাবাদর্শের প্রাথমিক দলিল। কিন্তু আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে, আজ লেনিন শতবার্ষিকীর বছরে সেই প্রাথমিক নির্দেশগুলি দেশের রাজনীতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। ব্র্যাকেটে মার্কসের দোহাই দিয়ে যে-অন্ধ দলবাজি বা উৎকট ক্ষমতালিপ্সার কাণ্ড-কারখানা সমানে চলেছে, তার সঙ্গে মার্কস-লেনিনের চিন্তা ও বিপ্লব-তত্ত্বের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে নিঃবিত্ত শ্রেণীর একাধিপত্যের তত্ত্ব দিয়ে এই দল বাড়াবার উন্মাদনাকে সমর্থন করবার চেষ্টা নিছক সুবিধাবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। বাঙলাদেশে দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্টের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি কোনো নির্বিত্ত বিপ্লবোত্তর অভিজ্ঞতার সমতুল্য ছিল না। রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের যে-পর্যায় ও কাঠামোর স্বীকৃতি যুক্তফ্রণ্টের ভিত্তি, যুক্তফ্রণ্টের জোরে ক্ষমতা হাতে পেয়ে কোনো পার্টি যদি সেই ভিতটাকেই ভাঙতে চায় তো সেই অপচেষ্টাকে রাজনৈতিক রাহাজানি ভিন্ন আর কোনো আখ্যা নিশ্চয়ই দেওয়া চলে না। ফলে আবার মেহনতী মানুষের শক্তি ও চৈতন্যের যে-অগ্রগামী প্রেরণা যুক্তফ্রণ্টের প্রাণ, তার ওপরে আজ মারাত্মক অনৈক্য ও উন্মত্ত দলবাজির বিভীষিকা নেমে এসেছে। প্রতিক্রিয়ার শক্তি যে এর পুরো সুযোগ নিতে তৎপর হবে তা সহজেই অনুমেয়।

আর লেনিন তো কোনোদিন নির্বিত্তের নেতৃত্বের ব্যাপারটাকে অর্থনীতি-বাদের কর্মসূচীতে মিলিয়ে দেননি। এখানে ব্রাকেটে মার্কসবাদীদের কর্ম-ধারায় কিন্তু অর্থনীতিবাদ থেকে উত্থিত দাবিদাওয়াই প্রায় সর্বত্র জুড়ে রয়েছে। একদিকে কথায় কথায় বিপ্লবের তত্ত্ব, অন্যদিকে শুধু অর্থনীতিবাদের কর্মসূচী, এর প্রতিক্রিয়াতে হয়তো খানিকটা নবীন মনের ধৈর্যহীনতার ঝোঁকেই নকশালবাড়ির ভাবাদর্শের সূচনা ও প্রসার ঘটতে পেরেছে। সে-ক্ষেত্রে চরম অব্যবস্থা সমানে চলবে। বেকার সমস্যা প্রচণ্ড হয়ে উঠবে। সারা সমাজে অন্তহীন অনাচারে মনুষ্যত্বের চিহ্ন থাকবে না, অথচ 'বিপ্লবী' পার্টি 'বিপ্লবী' গণপ্রতিষ্ঠান তরুণদের সামনে কোনো সদর্থক পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ উপস্থাপিত না করে কেবল বিপ্লবের বুলি বা অন্য কোনো অসার নীতিকথার ভণ্ডামি সমানে চালিয়ে যাবে — পনেরো-ষোল থেকে বিশ-বাইশের শরীর-মন তার প্রতিবাদে

ক্ষেপে উঠেছে — এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। আর গত বিশ বছরের বাঙলার ইতিহাসে এই প্রতিবাদের, অস্থিরতার কারণগুলি কি পরিমাণে জমে উঠেছে তা বুঝবার জন্য খুব দুরূহ কোনো গবেষণার দরকার করে না। অবশ্য সেই মরিয়া প্রতিবাদেরও কোনো উপযুক্ত নেতৃত্ব নেই, কোনো বিজ্ঞান নেই, তা কেবল সন্ত্রাসের কাণ্ড-কারখানায় বীভৎস থেকে বীভৎসতর চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছে। শিগগিরই হয়তো এদের দমনের জন্য পুলিশ বা এমন কি সামরিক শক্তির দ্বিধাহীন প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু কেন এই বিদ্রোহী তরুণ মন গণমানসের, গণআন্দোলনের ব্যাপ্তিতে নিজেকে সংলগ্ন করতে পারল না ? কেন তা শুধু এক ইতিহাস-ভূগোল-বিচ্ছিন্ন কেরার কৃষক বিপ্লবের কল্পনা ছাড়া সমাজদেহে আর কোনো অবলম্বন খুঁজে পেল না ? তার উত্তরে তথাকথিত (মার্কসবাদী) রাজনীতির একটি মূল বিকৃতির কথা বিস্মৃত হওয়া অনুচিত। সেই স্বীকৃতির পরেই আমরা নূতন করে লেনিনের পথনির্দেশ বুঝবার চেষ্টা করতে পারি। নির্বিত্তশ্রেণীর রাজনীতিকে ঐ (মার্কসবাদী) নেতৃত্ব অর্থনীতিবাদের গণ্ডি ছাড়িয়ে একটা বৃহত্তর সামাজিক তথা জাতীয় তাৎপর্যে অধিষ্ঠিত করেননি। গান্ধীজী যে বুর্জোয়াসির নেতা ছিলেন তা তো মার্কসবাদী মহলে সুবিদিত। এটা বেশি বুঝে ফেলায় অন্য একটি প্রয়োজন কোনোদিনই ভারতবর্ষের মার্কসবাদীদের কাছে বড় হয়ে উঠল না। নিজের ভাবাদর্শ অনুযায়ী গান্ধীজী ভারতের সাধারণ দরিদ্র মানুষের ইমানকে দেশের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। আমাদের মার্কসবাদ কি এখনও তা পেরেছে ? তাই ক্রোধের নেতিত্বে আজ নকশালপন্থী তরুণেরা 'বুর্জোয়া' গান্ধীর ছবি পোড়াচ্ছে, কিন্তু সার্থক মার্কসবাদী লেনিনবাদী নেতৃত্বের সন্ধান পায়নি, সন্ত্রাসের অনাসৃষ্টিকে বিপ্লবের পরাকাষ্ঠা মনে করছে।

বলশেভিজমের সূচনায় লেনিন রাজনীতির যে-সামাজিক ব্যাপ্তির কথা অত জোর দিয়ে বলেছিলেন তা বাদ দিয়ে ক্ষমতার লড়াই নির্বিত্তের রাজনীতিকেও পেটিবুর্জোয়া বিকৃতিতে ডুবিয়ে দেয়। মেহনতী মানুষের ইমানের জোরকে, সমাজকে ভেঙে গড়ার ব্যাপারে তার সর্বব্যাপী ভূমিকাকে, গণআন্দোলন প্রচার ও শিক্ষায় সুস্পষ্ট করে তুলবার দায়িত্ব সর্বাগ্রগণ্য। তা না করে নির্বিত্তকে কেবল মজুরির পাওনাদার বানিয়ে ফেললে লেনিনের রাজনীতি আয়ত্তাতীত থেকে যায়। আর পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্টের

পতনের অভিজ্ঞতায় তো সেই পেটিবুর্জোয়া বিকৃতিতে ভরাডুবি প্রকট হয়ে উঠল। রাজনৈতিক শিক্ষাবিহীন, শৃঙ্খলাহীন জনতার যথেচ্ছাচারকেই মার্কসবাদের স্বরূপ বলে প্রচারের সুযোগ (মার্কসবাদী) নেতৃত্বই করে দিলেন।

'কি করতে হবে' বা 'What is to be done'-এর পটভূমির সঙ্গে আমাদের একটি সাদৃশ্যের ব্যাপার আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। অর্থনীতিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের গোলোকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে আমাদের বামপন্থী নেতৃত্বের বিরাট অংশ প্রচণ্ড এক সত্তা-সঙ্কটের চাপে বিপথচারী হয়ে পড়েছেন। অনুন্নত অর্থনীতি ও প্রচণ্ড দারিদ্র্যের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা আমাদের এক নিদারুণ সত্য। গণতন্ত্র ও শিল্পোন্নয়নের কয়েকটি প্রাথমিক দায়িত্ব এ-দেশে বুর্জোয়াসি নিজের নেতৃত্বে সমাধা করতে পারেনি। সেই ঐতিহাসিক ব্যর্থতার পরিচয় দিনের পর দিন প্রকট হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্ব ও তার পুরো সামাজিক ভূমিকা বিপুল ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করে, যে-গুরুত্বের চেতনা 'What is to be done'-এর যুগান্তকারী তত্ত্বে গ্রথিত হয়ে আছে।

অন্যপক্ষে গণতন্ত্রের যে-সুযোগ এ-দেশে এখনও পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি তাকে ক্রমাগত শুধু সঙ্কীর্ণ দলীয়তা ও অর্থনীতিবাদের পেটিবুর্জোয়া কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় ডুবিয়ে দিলে স্বৈরতন্ত্র ও চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়ার সর্বময় প্রতিপত্তি খুব দূরের ব্যাপার হয়ে থাকবে না। বিশ্ব-প্রতিক্রিয়ার পালের গোদা আমেরিকাও এসব ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট দর্শক নয়। সেই সর্বনাশের সম্ভাবনা রুখবার জন্যই আজ আমাদের লেনিনের তত্ত্ব ও কর্মের সঠিক পথনির্দেশ অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। দারিদ্র্যের দুঃখীদশার মধ্যেও নির্বিত্ত মানুষ কোনো প্রলোভন বা অনুশাসনে নিজের ঐতিহাসিক শক্তির ক্লীবত্ব স্বীকার করবে না এবং ইতিহাস-চেতনায় সমৃদ্ধ নেতৃত্বের শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রেরণায় তার মধ্যে বৈপ্লবিক আত্মপ্রকাশের ঐশ্বর্য ভাস্বর হয়ে উঠবে। তাই হলো মার্কসবাদী রাজনীতির সার কথা। বৈপ্লবিক আত্মপ্রকাশের মানে আড়ালে-আবডালে সন্ত্রাসের হুমকি দেওয়া নয়, গোটা সমাজে গণজীবন ও মনের স্তরে স্তরে প্রতিবাদী চেতনা ও সংগ্রামের প্রসারেই তার বিপুল কর্মধারা গড়ে ওঠে। শ্রেণীসংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে একটা কালোচিত প্রাগ্রসর সামাজিকতার প্রতিবাদী প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে

চলার সামর্থ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। লোক-সমাজের দিনানুদৈনিক প্রতিটি ব্যাপারের সঙ্গে সেই প্রস্তাব ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট, তা কখনোই শুধু টাকার সঙ্গে পয়সা জুড়বার (লেনিন যাকে "adding kopeks to rouble" বলে বারবার কঠোর সমালোচনা করতেন) ব্যক্তিগত শ্রেণীগত বা দলগত আন্দোলন নয়।

নির্বিত্ত মানুষকে তার ইমানের উপকর্ষ থেকে বিচ্যুত করে, তার সামাজিক ভূমিকা থেকে উৎসাদিত করে, অথচ সেই মানুষের দারিদ্র্য-জনিত বিক্ষোভকে ক্ষমতাবিস্তারের কাজে লাগাবার রাজনীতি ফ্যাসিস্ত প্রতিবিপ্লবের মতাদর্শে মিলে যায়। তার সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। একটা তুলনা দিয়ে এই বক্তব্য শেষ করতে চাই। বের্টোল্ট ব্রেখট-এর 'থ্রি পেনি অপেরা'য় সেই পিচাম নামে লোকটি ভিক্ষুকাশ্রমের ব্যবসায়ে প্রচুর বৈভব ও প্রতিপত্তি লুটেছিল। নাটকের প্রথমে একটি বক্তৃতায় সে মানুষের নিঃসহায় দারিদ্র্যকে নিজের কাজে লাগাবার ফন্দি আঁটছে। আজকের বাঙলাদেশে ব্রেখট হয়তো পিচামকে একটা আলগা টুপিও পরিয়ে দিতেন যাতে ব্র্যাকেটে মার্কস-এর নাম লেখা থাকত, কারণ ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, আমাদের তথাকথিত (মার্কসবাদী) নেতৃত্বের দলীয় স্বার্থবুদ্ধির বিকৃতি কোথায় যেন পিচাম-এর সমাজবিরোধী কদর্যতাতেই মিলে যাচ্ছে। আর ব্রেখটীয় আয়রনির অভিজ্ঞতার মতো কঠোর ও নির্মোহ এক আবিষ্কার সম্পূর্ণ না করলে আজ আর আমরা মার্কস-লেনিনের সঠিক পথনির্দেশ ও বিপ্লবী মনুষ্যত্বের রাজনীতিতে উত্তীর্ণ হতে পারব না।

লেনিন ও বিজ্ঞানচিন্তা

জয়ন্ত বসু

রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ভি. আই. লেনিনের অসামান্য অবদান সুবিদিত। কিন্তু তাঁর আশ্চর্য প্রতিভা বিজ্ঞানচিন্তার* ক্ষেত্রেও যে ভাস্বর হয়ে দেখা দিয়েছিল, তা আমরা অনেকেই সম্যক উপলব্ধি করি না। লেনিনের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির থিসিসে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে, "লেনিন তাঁর শতাব্দীর সেই প্রথম চিন্তানায়ক, যিনি তাঁর সমসাময়িক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কৃতিত্বের মধ্যে বিজ্ঞানের বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আভাস দেখতে পেয়েছিলেন, যিনি মহান বিজ্ঞানসাধকদের মৌলিক আবিষ্কারের বৈপ্লবিক তাৎপর্য উদ্ঘাটন ও দার্শনিক দিক থেকে তার সাধারণীকরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অগ্রসর ক্ষেত্রগুলিতে প্রচণ্ডভাবে 'নীতি লঙ্ঘন'-এর যুগে বৈজ্ঞানিক তথ্যের চমকপ্রদ ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন।" লেনিন কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি, কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের যে-নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে—যার সন্ধান দিয়েছিলেন কার্ল মার্কস ও বিশেষভাবে ফ্রেড্‌রিক এঙ্গেলস—নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার পুনর্মূল্যায়ন করে লেনিন তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বিজ্ঞান থেকে দর্শনের ক্ষেত্রে কি শিক্ষা লাভ করা যায় এবং দার্শনিক মতবাদ আবার কি করে বিজ্ঞানচিন্তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তাঁর 'Materialism and Empirio-criticism,' 'Philosophical Note Books' ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে আমরা তার নির্দেশ পেতে পারি।

বিজ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্রেও লেনিন নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তক। বিজ্ঞান

*বিজ্ঞান বলতে সাধারণত আমরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে বোঝাই, সামাজিক বিজ্ঞানকে এর অন্তর্ভূক্ত হিসাবে ধরি না। এই প্রবন্ধেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কথাই কেবল আলোচনা করা হবে।

ও কারিগরীবিদ্যাকে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাঠামোয় যথাযথভাবে স্থাপন করার যে-রীতি তিনি প্রবর্তন করেন, তা পরবর্তী যুগে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের অর্থনীতিকেই বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও বিজ্ঞান

দর্শনের মূল ধারা দুটি — বস্তুবাদ ও ভাববাদ। লেনিন এটা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, দর্শনের যে-কোনো সামগ্রিক মতবাদকে যে-নামেই অভিহিত করা হোক-না-কেন, তা মূলত ঐ-দুটি ধারার একটির অন্তর্ভুক্ত হবে। এখন দেখা যাক ঐ ধারা দুটির প্রধান বক্তব্য কি।

যদি বলা যায় যে, বিশ্বজগতের বাস্তব অস্তিত্ব আছে এবং আমাদের ধারণা বা চিন্তা-নিরপেক্ষভাবেই তা বর্তমান, তবে তা হবে বস্তুবাদ। সেক্ষেত্রে আমাদের অনুভূতি, ধারণা ইত্যাদি হলো আমাদের মনের মুকুরে বহির্জগতের একরকম প্রতিফলন। আর যদি আমরা বলি যে, আমাদের ধারণাই হচ্ছে প্রাথমিক বিষয় এবং বহির্জগতের প্রতিটি বস্তুই প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ধারণার সমষ্টি, তবে তা হবে ভাববাদ; এই মতবাদ অনুযায়ী আমাদের ধারণায় যা নেই, তার কোনো বাস্তব অস্তিত্বও নেই।

বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিশ্লেষণ করে লেনিন দেখিয়েছেন যে, বিজ্ঞান বস্তুবাদকেই সমর্থন করে। এই প্রসঙ্গে দু-একটি উদাহরণের উল্লেখ করা যেতে পারে। বিজ্ঞান বলে যে, এই পৃথিবীতে মানুষের জন্ম হয়েছে কয়েক লক্ষ বছর আগে কিন্তু পৃথিবীর জন্ম হয়েছে কয়েকশো কোটি বছর আগে। অর্থাৎ মানুষের (ও সেইসঙ্গে তার মনের) জন্মের অনেক আগেই পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল। সুতরাং মানুষের মনের বাইরে বস্তুজগতের অস্তিত্ব বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। এটা হলো সম্পূর্ণভাবে বস্তুবাদ সম্মত। লেনিন তাঁর 'Materialism and Empirio-criticism' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি দ্বিধাহীন বক্তব্য হলো এই — পৃথিবী একসময় এমন একটি অবস্থায় ছিল যে, কোনো মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব তখন সেখানে ছিল না বা থাকতেও পারত না। জৈব পদার্থ হচ্ছে একটি পরবর্তী ঘটনা — দীর্ঘকালব্যাপী বিবর্তনের ফলস্বরূপ।...পদার্থই হলো প্রাথমিক এবং

চিন্তা, ধারণা ও অনুভূতির উৎপত্তি হয়েছে বিবর্তনের একটি অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ে। জ্ঞানের বস্তুবাদসম্মত তত্ত্ব হলো এইরকম এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান স্বাভাবিকভাবেই এটা স্বীকার করে।"

বর্তমানে আমরা জানি, পরমাণুর গঠন অনেকটা সৌরজগতের মতো—এর মাঝখানে রয়েছে একটি নিউক্লিয়াস ও তাকে প্রদক্ষিণ করছে এক বা একাধিক ইলেকট্রন। একশো বছর আগে কিন্তু মানুষের ধারণা ছিল যে, পরমাণু অবিভাজ্য ও এটাই পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা। সুতরাং ভাববাদ অনুযায়ী একশো বছর আগেকার পরমাণুতে নিউক্লিয়াস বা ইলেকট্রন ছিল বলে মনে করবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু বিজ্ঞান বলে যে, পরমাণুর মধ্যে বরাবরই নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রন আছে — এইটাই প্রাথমিক ঘটনা। একশো বছর আগেকার মানুষের মনে সেই ঘটনাটি ঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি। পরবর্তী যুগে মানুষ সেই ঘটনা জানতে পেরেছে — এই জানতে পারাটা একটি পরবর্তী ঘটনা। এখানেও বিজ্ঞানের বক্তব্য বস্তুবাদকে সমর্থন করে।

বস্তুবাদকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায় — যান্ত্রিক বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। যান্ত্রিক বস্তুবাদ অনুসারে কয়েকটি অমোঘ নিয়ম দ্বারা বস্তুজগৎ যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐ নিয়মগুলি মানুষ জানতে পারলে বিশ্বজগতের গতি-প্রকৃতি একেবারে নির্দিষ্টভাবে সে নির্ধারণ করতে পারবে। এ-পর্যন্ত মানুষ যেসব নিয়ম জেনেছে, তাদের আর কোনো ব্যতিক্রম সম্ভব নয়। অপর পক্ষে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুযায়ী বিশ্বজগৎ ক্রমাগতই পরিবর্তিত হচ্ছে। যে-কোনো ব্যবস্থার মধ্যে মূলত দুটি বিপরীত ধারার সমন্বয় রয়েছে ; এর ফলে প্রতিটি ব্যবস্থার ভিতর যে-অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকে, তাই হলো পরিবর্তনের মূল কারণ। পরিমাণগত পরিবর্তনের একটি বিশেষ ধাপে গুণগত পরিবর্তন ঘটে থাকে। প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো চরম সত্য বা চরম নিয়ম মানুষের জানা নেই, তবে তার জ্ঞান ক্রমশই নিম্নতর থেকে উন্নততর সত্যে উন্নীত হচ্ছে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্বের যে অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়, এঙ্গেলস তাঁর 'Anti-Duhring' ও 'Dielectics of Nature' নামক দুটি গ্রন্থে তা ব্যাখ্যা করেছেন। এঙ্গেলস লিখেছেন, "দ্বন্দ্ববাদই হলো বর্তমান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে চিন্তার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ধরন কারণ প্রকৃতিতে

বিবর্তনের যে-প্রক্রিয়াদি ঘটছে, সাধারণভাবে যেসব পারম্পরিক সম্পর্ক রয়েছে এবং অনুসন্ধানের এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে যেসব উত্তরণ হচ্ছে, সেইগুলির ব্যাখ্যার পদ্ধতি কেবলমাত্র দ্বন্দ্ববাদ থেকেই পাওয়া যেতে পারে।"

যা হোক, ঊনবিংশ শতাব্দীতে নিউটনীয় গতিসূত্র ইত্যাদি নিয়মাবলীতে বিজ্ঞানীদের এমন আস্থা জন্মে গিয়েছিল যে, তাঁরা ঐগুলিকে অলঙ্ঘ্য বলে মনে করতেন; তাঁদের এই মনোভাব যান্ত্রিক বস্তুবাদকে সমর্থন করত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজ্ঞানে এমন অনেক নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় যে, ঐসব নিয়মের অলঙ্ঘনীয়তা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মত পাল্টাতে হলো। ফলে যান্ত্রিক বস্তুবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁরা অনেকেই ভাববাদের দিকে আকৃষ্ট হলেন। চিন্তাজগতের সেই সন্ধিক্ষণে লেনিন নতুন করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অবতারণা করলেন। বিজ্ঞানের নবলব্ধ জ্ঞানের বিশ্লেষণ করে তিনি দেখালেন যে, বিজ্ঞানচিন্তার জগতে যে-সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সমাধান ভাববাদের মধ্যে নেই, তবে যান্ত্রিক বস্তুবাদের মধ্যেও নেই, আছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মধ্যে।

১৯০৮ সালে লেনিন 'Materialism and Empirio-Criticism' গ্রন্থটি রচনা করেন। ঐ সময়টা ছিল আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার গোড়ার যুগ। এটা উল্লেখযোগ্য যে, সনাতনী পদার্থবিদ্যায় বিশ্বাসীদের সঙ্গে লেনিন একমত হননি, তিনি সমর্থন করেছিলেন বিজ্ঞানের নতুন প্রবক্তাদের।

পদার্থের যেসব ধর্ম আগে স্বীকৃত ছিল, ঐ সময় দেখা গেল তাদের অনেকগুলি সঠিক নয় — দেখা গেল পদার্থকণা পরমাণু অবিভাজ্য নয়, গতিশীল বস্তুর ভর অপরিবর্তনীয় থাকে না, ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে লেনিন তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "দার্শনিক বস্তুবাদ পদার্থের যে একটিমাত্র 'ধর্মের' স্বীকৃতির সঙ্গে জড়িত, তা হলো এর বাস্তব সত্য হওয়ার ধর্ম, আমাদের মনের বাইরে এর অস্তিত্বের ধর্ম।···অপরিবর্তনীয় উপাদান, 'দ্রব্যের অপরিবর্তনীয় সারবস্তু' ইত্যাদির স্বীকৃতি বস্তুবাদ নয় — এটা হলো আধ্যাত্মিক অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক-এর বিপরীত বস্তুবাদ।" ডিয়েৎজেন যে বলেছিলেন, "বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অপরিসীম," কেবল অসীম বিশ্বেই নয়, "ক্ষুদ্রতম পরমাণুর" ভিতরেও অশেষ রহস্য রয়েছে, লেনিন সেই বক্তব্যকে সমর্থন করে লেখেন যে, কেবল পরমাণুই নয়, ইলেকট্রন সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়েরও অন্ত নেই। পরমাণু-বিজ্ঞানের ক্রমোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থিত হচ্ছে। পরমাণু-কেন্দ্রকের

মধ্যে প্রোটন, নিউট্রন, মেসন ও নিউট্রিনোর অস্তিত্ব, ঐ কেন্দ্রকের বিভাজন বা সংযোজন প্রক্রিয়া, ইত্যাদি বিভিন্ন আবিষ্কার পরমাণুর অন্তহীন রহস্যেরই ইঙ্গিত দেয়। ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি কণার মৌলিকত্বেও বিজ্ঞানীরা এখন সন্দিহান হয়েছেন — কোয়ার্ক তত্ত্বে 'আরও মৌলিক' কণার অবতারণা করা হচ্ছে।

লেনিন লিখেছেন, "পদার্থের গঠন ও ধর্মবিষয়ক প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই যে আপেক্ষিক ও একেবারে নিখুঁত নয়, এই কথাটি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ জোর দিয়ে বলে ; প্রকৃতিতে চরম সীমা বলে যে কিছু নেই, আমাদের কাছে আপাতদৃষ্টিতে সামঞ্জস্যহীন মনে হলেও গতিশীল পদার্থ যে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে, ইত্যাদি বিষয়গুলিও ঐ বস্তুবাদ জোর দিয়ে বলে থাকে।" গত কয়েক দশকে বিজ্ঞানের যে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে, তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে লেনিনের অভিমতের যথার্থ্যই প্রমাণিত হয়। কারণ এটা স্পষ্টই বোধগম্য হচ্ছে যে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ক্রমশ উন্নত হলেও তাঁর মধ্যে কিছু-না-কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যাচ্ছে। লেনিন তাঁর পুস্তকে তদানীন্তন ধারণা অনুযায়ী ইথারের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। নির্গুণ স্থানে সর্বত্রব্যাপী যে-ইথার-এর ধারণা, পরবর্তী যুগে বিজ্ঞানে তা বর্জিত হয়েছে, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব অনুসারে স্থান-কাল ব্যবস্থার জ্যামিতিক ও ভৌত ধর্ম স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু কয়েকটি ঘটনায় ঐ তত্ত্বের আশ্চর্য সাফল্য পরিলক্ষিত হলেও স্থান ও কালের কাঠামোয় বিদ্যুচ্চুম্বকত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। এই থেকে বোঝা যায় যে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অত্যন্ত উন্নত হলেও তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকছেই।

সাম্প্রতিক কালে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে-অগ্রগতি হয়েছে, তা থেকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। আণবিক জীববিদ্যায় গবেষণার ফলে এটা ক্রমশ জানতে পারা যাচ্ছে যে, প্রাণের উদ্ভবের পিছনে কোনো অলৌকিক শক্তি নেই, বহুসংখ্যক অণুর বিশেষ ধরনের সমন্বয়ের ফলেই প্রাণের উৎপত্তি হয় — পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরের এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জে. ডি. বার্নালের 'Science in History' নামক গ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের যে-আলোচনা করা হয়েছে, তাই থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সামঞ্জস্য উপলব্ধি করা যায়।

বিজ্ঞানের প্রয়োগ

আমাদের দেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে আমরা এখন সুপরিচিত। বর্তমান বছর চতুর্থ পরিকল্পনার দ্বিতীয় বছর। অনেকে অবশ্য একে 'পরী-কল্পনা' বলে মনে করেন। তা সে যাইহোক, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গোড়াপত্তন হয় ১৯২৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে। এই ধরনের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো, দেশের সামগ্রিক শক্তিকে সুসংবদ্ধ করে এবং বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার সুষ্ঠু প্রয়োগে কৃষি, শিল্প ও সাধারণভাবে জীবিকার মানের দ্রুততম উন্নতি সাধন। এই যে সময়-সীমিত সামগ্রিক পরিকল্পনা, এর ধারণার সূত্রপাত করেন লেনিন ১৯১৮ সালে।

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উৎপাদনের জন্যে বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে অক্টোবর বিপ্লবের মাত্র পাঁচ মাস পরেই লেনিন 'গোয়েলরো পরিকল্পনা' উপস্থাপিত করেন; এর উদ্দেশ্য ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে বৈদ্যুতিকরণ করা। সাম্রাজ্যবাদীক আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধের ফলে এই পরিকল্পনার রূপায়ণ শুরু হতে দু-বছর দেরি হয়ে যায়। পরিকল্পনা রূপায়ণের সময় বিজ্ঞানের সবথেকে আধুনিক প্রয়োগ-পদ্ধতি ব্যবহার করার জন্য লেনিন সুপারিশ করেন।

গোয়েলরো পরিকল্পনা সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বহু বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ার এটিকে সপ্রশংস অভিনন্দন জানান। আমেরিকার খ্যাতনামা ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ার চার্লস স্টেইনমেজ এর ভূয়সী প্রশংসা করে লেনিনকে একটি চিঠিতে লেখেন যে, ঐ পরিকল্পনার রূপায়ণে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।

তবে অনেকের ঐ সময় ধারণা ছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো অনগ্রসর দেশে ব্যাপক বৈদ্যুতিকরণের প্রকল্প সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। ১৯২০ সালে রাশিয়া সফরের পর এইচ. জি. ওয়েলস গোয়েলরো পরিকল্পনাকে 'ইলেক্‌ট্রিসিয়ানদের কল্পনাবিলাস' বলে বর্ণনা করেন। এর উত্তরে লেনিন বলেছিলেন, "দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ায় আমরা কি করেছি, আবার এসে দেখে যাবেন।" সমাজব্যবস্থা উপযুক্ত হলে বিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগে প্রায় অসম্ভবকেও যে সম্ভব করে তোলা যায়, লেনিন তা ভালভাবেই জানতেন।

প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা ও লেনিন

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

লেনিনের সঙ্গে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সংযোগ কবে প্রথম স্থাপিত হয় তা এখনও আমাদের স্পষ্টভাবে জানা নেই, যদিও তা নিয়ে ভারতবর্ষে, রাশিয়ায় ও অন্যত্রও ইতিহাস-গবেষকরা তন্ন-তন্ন করে খোঁজ করে চলেছেন। তবে ১৯০৭-এ স্টুটগার্ট-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব-সমাজতন্ত্রী মহাসম্মেলনের আগে যে লেনিনের সঙ্গে কোনোও ভারতীয় বিপ্লবীর প্রত্যক্ষ সংযোগ হয়নি, তা একরকম সুনিশ্চিত। স্টুটগার্ট-এর মহাসম্মেলনে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে লেনিন ও গর্কি উপস্থিত ছিলেন। আর, ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলনের তরফ থেকেও এই সর্বপ্রথম একটি প্রতিনিধি দলও স্টুটগার্ট-এ গিয়েছিলেন, যার নেতা ছিলেন প্রসিদ্ধ পার্শী দেশনেত্রী রুস্তমজী কামা এবং সদস্য ছিলেন সর্দার সিং রাণা ও সম্ভবত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। মাদাম কামার সঙ্গে নিশ্চিত গর্কির এবং সম্ভবত লেনিনের দেখা হয় এই মহাসম্মেলনে।

বহুকাল পরে, ঐযুগের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

"লেনিন (স্টুটগার্ট) কংগ্রেসে প্রদত্ত তাঁর প্রথম রিপোর্টে কোনোও নামের উল্লেখ না করে, ভারতীয় প্রতিনিধিদলের উপস্থিতির কথার প্রসঙ্গটি বলেন। আর রুস্তমজী কামাও লেনিন ও রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কথা আমাদের বলেন। বিশেষত তিনি জোর দেন জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নে লেনিন যে-মনোভাব দেখিয়েছিলেন, তার উপর···।" ১

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আরও লিখেছেন : "আমি প্রথম লেনিনের নাম শুনি ১৯১০-এর গ্রীষ্মকালে···। কিন্তু ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিতে লেনিন যে-ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবেন, তা আমরা কেউই কখনও বুঝতে পারিনি।" ২

মাদাম কামা ও 'চট্টো' উভয়েই ১৯১০-এ সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছেন। মাদাম কামা তো ফরাসী সমাজতন্ত্রী দলে যোগদানই করেছেন এবং তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের বামপন্থী শাখার ও 'লুম্যানি'তে পত্রিকা-গোষ্ঠীর সঙ্গেই। আর একজন প্রসিদ্ধ প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী লালা হরদয়াল ও ১৯১১-১২তে সমাজতন্ত্রের দিকে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় তাঁর লেখা কার্ল মার্কস-এর জীবনী প্রকাশিত হয় এই সময়ই। ১৯১১তে হরদয়াল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান ও 'ইনডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স অফ দি ওয়ার্ল্ড' নামে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনের অনুরোধে তাদেরই সংগঠক হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্লাভ-শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের সপক্ষে বক্তৃতা করে ঘুরতে থাকেন। সানফ্রান্সিসকোর আদিতম মার্কসবাদী পাঠচক্রে একজন বাঙালি ছাত্রের নামও পাওয়া যাচ্ছে ১৯১১তে — গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইনি কে, কোনোও পলাতক বিপ্লবীর ছদ্মনাম কিনা — এ সব তথ্য অবশ্য এখনও আমরা জানি না। গণতান্ত্রিক জার্মানির খ্যাতনামা গবেষক ডঃ হর্স্ট ক্রুগার এ-বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অনুসন্ধান চালাচ্ছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় বিপ্লবীরা বার্লিনকে সদর-ঘাঁটি করে মুক্তি-প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তখন তাঁরা যে-চুক্তি জার্মান সরকারের সঙ্গে করেন (বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়েরই নেতৃত্বে), তার ১০ নং ধারায় লেখা হয় :

"আমাদের বিপ্লব সফল হইলে ভারতে সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্র শাসন প্রবর্তন করা আমাদের অভিপ্রেত হইবে··· ।" ৩

১৯১৭তে ভারতীয় বিপ্লবীরা সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে তাঁদের সদর-ঘাঁটি সরিয়ে আনলেন। সুইডেনে তখন যিনি ইংরেজ সরকারের রাষ্ট্রদূত ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ লণ্ডনে গোপন তার পাঠিয়ে জানালেন :

"বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে একদল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বার্লিন থেকে এসে পৌঁছেছেন। এক সাক্ষাৎকারে চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে, শান্তির সপক্ষে প্রচার করতে তিনি আসেননি। তিনি ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত স্বাধীন ভারত গড়বার কাজেই এসেছেন। আমার খবর হচ্ছে যে... এদের মূল উদ্দেশ্য হলো লেনিন ও অন্যান্য ইংরেজ-বিরোধী চরমপন্থী রুশ বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করবার জন্য সচেষ্ট হওয়া।" ৪

বহুযুগ পরে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায়ও লিখছেন :

"১৯১৭ সালের গোড়ায় আমি যখন স্টকহোমে এলাম, তখন···লেনিন তখনও স্টকহোমে আছেন কিনা আমি তা জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি শুনে হতাশ হলাম যে লেনিন সুইডেন ছেড়ে রাশিয়ার দিকে রওনা হয়েছেন।" ৫

১৯১৭র সেপ্টেম্বর মাসে 'চট্টো' পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতের মেনশেভিক নেতৃত্বের কাছে একটি বার্তা পাঠান। তাতে তিনি লেখেন যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, পদানত জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে, মেনশেভিকদের মনোভাব গভীর হতাশা-ব্যঞ্জক। তার জায়গায় বলশেভিকদের মতামত খুবই ইতিবাচক এবং আশাপ্রদ। ১৯১৮র গোড়ায় বলশেভিক সরকার 'চট্টো'কে সোভিয়েতে আমন্ত্রণ করে।

ইতিমধ্যে ১৯১৭র নভেম্বর মাসেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবী সঙ্ঘ গদর পার্টির সভাপতি, লেনিন ও সোভিয়েত রুশকে অভিবাদন জানিয়ে এক তার পাঠান। অনুরূপ অভিবাদন জানান কাবুলে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবী সরকারের প্রধানেরা — মৌলানা বরকতুল্লাহ, রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপ ও মৌলানা ওবেইদুল্লাহ সিন্ধী। মেক্সিকো থেকে রুশ-বিপ্লব ও লেনিনকে অভিবাদন জানিয়ে, সমাজতন্ত্রী দলের একাংশ-এর নেতৃত্ব করে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেন, পলাতক ভারতীয় বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য — যিনি মানবেন্দ্রনাথ রায় নামেই সমধিক পরিচিত। ফিজি দ্বীপে বাগিচা শ্রমিকদের ভারতীয় নেতা ডাঃ মণিলালও এই সময়ই নিজেকে লেনিনের সমর্থক বলে ঘোষণা করেন। প্রবাসী শিখ-বিপ্লবীদের অনেকে এবং বহু প্রবাসী বাঙালী ছাত্রও এই সময়ে (১৯১৯-২১) গভীরভাবে রুশ-বিপ্লবের দিকে প্রভাবিত হন, লেনিনের বিপ্লবী চিন্তাধারার মাধ্যমেই।

১৯১৯-এর প্রথমার্ধে বরকতুল্লাহ, মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রভৃতির সঙ্গে লেনিনের সাক্ষাৎ হয়। তার অল্পদিনের মধ্যেই তাসখন্দ থেকে বরকতুল্লাহ উর্দু ভাষায় একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, যাতে তিনি লেখেন :

"রুশ-দিগন্তে আজ স্বাধীনতার যুগ আরম্ভ হয়েছে, আর সারা পৃথিবীর মানুষকে মহিমামণ্ডিত, অপূর্ব সৌভাগ্যের আস্বাদন দিয়ে, সূর্যের মতো আলো বিকীরণ করেছেন লেনিন।" ৬

১৯২০তে রুশদেশে পৌঁছলেন আরও কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবী — মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখোপাধ্যায়, নলিনী গুপ্ত, তিরুমল আচারিয়া, মহম্মদ শেফিক, মহম্মদ আলি, মহম্মদ রফিক প্রভৃতি। ১৯২০-রই ১৭ই

অক্টোবর এঁদের কয়েকজন মিলে তাসখন্দ-এ একত্রিত হয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি" — প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলেন মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর স্ত্রী এভেলীন, অবনী মুখোপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রী রোজা, মহম্মদ আলি, মহম্মদ শফিক ও তিরুমল আচারিয়া। শফিক নির্বাচিত হলেন পার্টির সম্পাদক।" ৭

ইতিমধ্যে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরেন দাশগুপ্ত প্রভৃতি বার্লিনস্থ ভারতীয় বিপ্লবীরাও সরাসরি যোগাযোগ করেছেন লেনিনের সঙ্গে। 'চট্টো' প্রস্তাব করলেন যে জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্ট সহ সমস্ত প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের একত্র করে একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সঙ্ঘ গড়ে তোলা হোক, যার নেতৃত্ব অবশ্যই থাকবে কমিউনিস্টদেরই হাতে। এই সংগঠনের কার্যসূচীতে জোর দেওয়া হবে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস সাধনের উপর এবং ভিত্তি হবে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য। লেনিন সোৎসাহে 'চট্টো'র এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানালেন এবং চট্টোকে সদলবলে মস্কো আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

মস্কো থেকে ফিরে চট্টো ও ডাঃ দত্ত ভারতে বিপ্লবীদের কাছে এই নবযুগের বার্তা পাঠাতে চাইলেন। ১৯২২-এ বাঙলাদেশের এক বামপন্থী বিপ্লবী সাপ্তাহিকে "লক্ষ্য কি?" শিরোনামা দিয়ে ডাঃ দত্তের একটি খোলা চিঠি বের হলো। তাতে তিনি লিখলেন:

"গণবৃন্দের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তিই আমাদের আদর্শ হইবে··· তবেই তাহারা আমাদের সহায় ও সম্পদ হইবে। দেশের মুক্তিকামীদের এখন কার্ল মার্কস ও ম্যাস মুভমেন্টের চর্চ্চা করিতে হইবে।" ৮

১৯২১-এ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দূত হিসেবে নলিনী গুপ্ত এবং ১৯২২-এ বার্লিন-গোষ্ঠীর দূত হিসেবে অবনী মুখোপাধ্যায় ভারতে আসেন — অবশ্যই আত্মগোপন করে। ১৯২১-এ আহমেদাবাদে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে, মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখোপাধ্যায়-এর যুক্ত স্বাক্ষর বহন করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম রাজনৈতিক কর্মসূচী প্রকাশিত হয় — পূর্ণ স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র ও কৃষকের হাতে জমি চাই। প্রতিটি ছত্রে-ছত্রেই লেনিন-চিন্তাধারার উজ্জ্বল ছাপ।

এই ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে লেনিন ব্যবহার করেছিলেন স্নেহশীল অগ্রজের মতো। অবনী মুখোপাধ্যায় মালাবারে মোপলা কৃষকবিদ্রোহের

উপর একটা চটি বই লিখে লেনিনকে পড়তে দিয়েছিলেন। গৃহযুদ্ধের প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যেও লেনিন যত্নসহ বইটি পড়ে, পাশে মন্তব্য লিখে রেখেছিলেন "মন্দ নয়।" ৯ সমান আগ্রহের সঙ্গেই লেনিন ঐ যুগেই পড়েছিলেন চট্টো-দত্ত গোষ্ঠীর থীসিস। আর মানবেন্দ্রনাথ রায় লেনিনের সঙ্গে তাঁর বিতর্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছেন :

"সেটা সম্ভবত আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা। একজন মহান নেতা আমাকে তাঁর সমকক্ষ ধরে নিয়ে ব্যবহার করলেন এবং এই কাজের দ্বারা তাঁর নিজের মহত্বের প্রমাণ দিলেন। লেনিন অনায়াসেই বলতে পারতেন যে একজন অখ্যাত ছোকরার সঙ্গে তর্ক করে তাঁর মূল্যবান সময় তিনি নষ্ট করতে পারবেন না আর তাহলে ঐ আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে আমার বক্তব্য পেশ করার কোনোও সুযোগই আমি পেতাম না।" ১০

আর এক প্রবাসী ভারতবাসী দেশপ্রেমিক, নেহ্‌রু পরিবারের বন্ধু, সৈয়দ হুসেন, লেনিনের মৃত্যুতে যে-শ্রদ্ধাতর্পণ করেছিলেন তা দিয়েই এই প্রবন্ধ শেষ করছি। তিনি লিখেছিলেন : "লেনিন ছিলেন পৃথিবীতে নবযুগের মহত্তম নায়ক — দাউর জাদিদ্ কা এক কায়দে আজম।" ১১ ভারতবর্ষেই হোক আর প্রবাসেই হোক, এমনিভাবেই লেনিন, প্রথম দিন থেকেই ভারতীয় মুক্তি-যোদ্ধাদের কাছে ছিলেন "নবযুগের মহত্তম নায়ক"।

পাদটীকা

১। এ. ভল্‌স্কি : বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর স্মৃতিকথা, লেনিনগ্রাদ, ১৯৬৯

২। ঐ

৩। ভট্টাচার্য, অবিনাশচন্দ্র : "ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা", কলকাতা ১৩৬৫

৪। গোপন তার নং ১৯৯৫, ২৪ মে ১৯১৭, ভারতীয় মহাফেজখানা, নয়া দিল্লী

৫। এ. ভল্‌স্কি : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা

৬। বরকতুল্লাহ্ : বলশেভিজম — ভারত সরকারের বাজেয়াপ্ত গোপন দলিল নং ২২৯৫, ২৮।১০।১৯১৯

৭। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভার লিপিবদ্ধ বিবরণী, তুর্কিস্থান ব্যুরো, সোবিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ফাইল নং ৬৩৮, ২০।১২।১৯২০, তাসখন্দ

৮। "শঙ্খ" কলকাতা, ৩০ অক্টোবর, ১৯২২

৯। সেহানবীশ, চিন্মোহন : "লেনিন ও ভারতবর্ষ" মনীষা, কলকাতা. ১৯৬৯

১০। রায়, মানবেন্দ্রনাথ : "মেমোয়ার্স" কলকাতা, ১৯৬৪

১১। "ইয়াদে ওয়াতান" (উর্দু পত্রিকা) নিউ ইয়র্ক, ১লা জুন, ১৯২৪

বাঙলা সাহিত্যে লেনিন

গোপাল হালদার

লেনিনের জন্মের শতবার্ষিকীতে সহজভাবেই একটা প্রশ্ন মনে জাগে — বাঙলা সাহিত্যে লেনিনকে আমরা কবে থেকে জানলাম, আর সে সাহিত্যে তাঁর কী রূপ দেখতে পাই। অর্থাৎ আজকালকার চলতি কাগুজে ভাষায় তাঁর 'ইমেজ' বাঙালি পাঠকের কাছে কী। কথাটা বিশেষভাবে মনে পড়েছে সম্প্রতি সুহৃদবর চিন্মোহন সেহানবীশের 'লেনিন ও ভারতবর্ষ' নামক অতুলনীয় গবেষণা পুস্তিকাটি পাঠ করে। তাতে দেখছি ১৯০০ সনের ডিসেম্বরে 'ইসক্রা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই লেনিন ভারতবর্ষের মানুষের বিদ্রোহ-চেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য, তার অনেক আগেই তাহলে তিনি সে সম্বন্ধে সচেতনও ছিলেন।

সাধারণ রুশের কাছে পূর্বকাল থেকে ভারতবর্ষের 'ইমেজ' কী ছিল ? — তাদের চোখে ভারতবর্ষ ছিল আশ্চর্য যাদুর দেশ ; এমনকি, তুর্গেনেফ-এরও ক্ষুদ্র একটি শেষ লেখায় আমরা সেভাবেই ভারতের উল্লেখ পাই ('পরিচয়,' ডিসেম্বর ১৯৬৮ দ্রষ্টব্য)। তবে তলস্তোয়ের কাছে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী, বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধীর মতো ভারতের ধর্মবুদ্ধি (এথিক্সে প্রবণতাযুক্ত) মানুষেরা অনেক বেশি পরিচিত ছিলেন। রুশ উদারনীতিকরা অবশ্য তারও আগে সিপাহী যুদ্ধের সময় থেকেই ভারতের ব্রিটিশ উৎপীড়িত জনগণের অসন্তোষের কথাও জানতেন। লেনিনের নিকটে কিন্তু প্রথম থেকেই ভারতের একটি 'ইমেজ'ই পরিষ্কার। তা এই — ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদ-পীড়িত বহু কোটি মানুষের দেশ, যেখানে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিদ্রোহের চেতনায় মানুষ জেগে উঠছে, জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের সূত্রে আধুনিক সমাজ-জীবনের ক্ষেত্রে উন্নীত হতে যাচ্ছে ; এবং তাদের স্বাধীনতা বিশ্ব-শ্রমিকশ্রেণীর বিশেষ কাম্য, কারণ বিশ্ব-বিপ্লবেরই দিকে তা হবে এক অনিবার্য পদক্ষেপ। লেনিনের মনে এই ছিল ভারতবর্ষের চিত্র, প্রথম থেকেই। এজন্যই আরও বিশেষ করে

আমাদের মনে এই প্রশ্নটা জেগে ওঠে ভারতবর্ষের মানসপটে লেনিনের মূর্তি কবে কীভাবে উদিত হয়, ক্রমশ কীভাবে তা রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

বলা বাহুল্য, লেনিনের রূপ ভারতবাসীর মনে প্রকাশিত হয়েছে প্রথমত ও প্রধানত রাজনৈতিক সংবাদপত্রাদির মধ্য দিয়ে; ইংরেজি ভাষার ও বাঙলা-ভাষার সংবাদপত্রসমূহ তাঁর কথা শাদা-কালো সরল-বক্র রেখায় প্রথম পরিবেশন করেছিল। সেই সংবাদ-তথ্যকে রঙ-রস জুগিয়ে তারপরে অবিলম্বেই প্রাণ দিয়েছেন বাঙলা সাহিত্যিকরাও। নিছক সাংবাদিকতায় পরিবেশিত লেনিন আমার এ-প্রসঙ্গে আমাদের জিজ্ঞাস্য নয়। অন্তরের রঙে-রসে রূপায়িত 'বাঙলা সাহিত্যে লেনিন'ই আমার এ-প্রসঙ্গে প্রধান আলোচ্য। অবশ্য সাহিত্যধর্মী সাংবাদিক লেখাও থাকে। সাহিত্যের সহায়ক সেরূপ সাংবাদিক লেখার স্থান স্বীকার্য।

পটভূমি

তবে এই প্রসঙ্গেরও গোড়াতে কয়েকটা জানা কথা বোধহয় আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন — ভারতবাসী লেনিন সম্বন্ধীয় ধারণার তা গোড়ার কথা। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কী পটভূমি ছিল আমাদের মনে, যেখানে লেনিনের চিত্র আভাসিত হয়ে, রূপায়িত হয়ে ফুটে উঠল?

আমরা ছিলাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পদানত। স্বাধীন সাংবাদিকতার আমাদের তখন অবকাশ ছিলনা, স্বাধীনভাবে সংবাদ সংগ্রহেরও না। ইংরেজের হাতে-তোলা খবরই ছিল আমাদের বৈদেশিক রাজনৈতিক চিন্তার ও আন্তর্জাতিক চিন্তার খোরাক। প্রধানত কুখ্যাত 'রয়টার' ছিল বাহক, আর গৌণত 'টাইমস' প্রভৃতির দুহাত-ফেরতা সংবাদ সেই 'রয়টারে'র সংবাদে রসান জোগাত। এই একদিক। কাজেই বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪) ও অক্টোবর বিপ্লবের (১৯১৭) পূর্বে সাধারণত ভারতবাসীর লেনিনের নাম জানবার কারণ নেই; যদিও স্টাটগার্ট সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে (১৯০৭) লেনিনের সঙ্গে মাদাম কামা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি নির্বাসিত বিপ্লবীদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, পরিচয়ও হয়ে থাকবে। উল্টোদিকে, অন্তত বুয়র যুদ্ধের (বা ১৯০০ সালের) সময় থেকেই ভারতের সাধারণ সংবাদপত্র-পাঠকই ধরে নিত, ইংরেজদের দেওয়া খবর অবিশ্বাস্য, ইংরেজের স্বপক্ষে হলে তা বিশ্বাস মোটেই কোরো না। এমনকি বাঙালি পাঠকরা সেসব সংবাদেরও ব্রিটিশ স্বার্থের বিরোধী ভাষ্যই

করতেন ; সাংবাদিকরাও প্রকারান্তরে সেরূপ প্ররোচনা দিতেন। তৃতীয় দিক, রুশিয়া সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তখন কী ছিল? ধারণা এই ছিল যে, রুশিয়া ইংরেজের (ভারত-বিষয়ক ব্যাপারে) বিরোধী পক্ষ। তার প্রতি আমাদের তাই বিরাগ ছিল না। কিন্তু জারতন্ত্র হচ্ছে ঘৃণিত স্বৈরতন্ত্র, সেই হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের তাই সগোত্র, সকল দেশের গণতন্ত্রের ও স্বাধীনতার শত্রু। জারতন্ত্রের বিলোপ ঘটিয়ে রুশ বিদ্রোহীরা জয়ী হোক, এও ছিল আমাদের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু রুশ বিদ্রোহী বলতে আমরা জানতাম কেবল 'নিহিলিস্টদের'। বাঙালি সুশিক্ষিতরা কেউ কেউ জানতেন — ইংরেজি কাগজের প্রসাদে — রুশদের মধ্যে আছে জারবিরোধী উদার গণতন্ত্রীরাও ('ক্যাডেট'দল)। ১৮৭৫-এর দিকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম আন্তর্জাতিকের কথা ভালোই জানতেন, তিনিও মার্কস-এর নাম জানতেন না। বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথও সমাজতন্ত্রের উল্লেখ করেছেন — ১৯০০ এর পূর্বে। কিন্তু এদেশে তখনো রুশ সমাজতন্ত্রীদের খবর বিশেষ জানা যেত না। সে তুলনায় বরং নৈরাজ্যবাদীদের কথাই কিছু কিছু জানা যেত। তার কারণ, তলস্তোয়, বাকুনিন, ক্রোপোটকিনই ছিলেন মনস্বী হিসাবে ভারতে সুপরিচিত, প্লেখানভ-লেনিন প্রভৃতির নাম ১৯০৫-এও ছিল অজ্ঞাত।

এই ছিল বাঙালিরও সাধারণ মানসিক পটভূমি। এর উপর এল ১৯১৭তে প্রথম জারতন্ত্রের পতনের বার্তা, বাঙালির ও ভারতবাসীর তাতে উৎসাহের অন্ত ছিলনা। তার কিছু পরেই এল অক্টোবর বিপ্লবের বার্তা, তাও অধিক থেকে অধিকতর উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে বিদ্রোহকামী বাঙালির মনে। সেসব সংবাদ বাঙলা ও ইংরেজিতে লিখিত গবেষণা পুস্তিকাসমূহে ১৯৬৭ সনে আমাদের নিকট পুনরুদ্ধার করে দিয়েছেন আমাদের গবেষকরা (দ্রঃ ইসকাস প্রকাশিত পুস্তিকাদি ও সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীঅবিনাশ দাশগুপ্তের 'লেনিন রুশ-মহাবিপ্লব ও বাঙলা সংবাদ সাহিত্য')। তা বিশদ করা এখন নিষ্প্রয়োজন।

সাহিত্যের দাবি

সাহিত্য-প্রসঙ্গে আরেকটি গোড়ার কথাও মনে রাখা দরকার : সমসাময়িক ঘটনা বা রাজনৈতিক-সামাজিক সংবাদ কেমন করে সাহিত্যভাত হয়ে ওঠে, এবং সাহিত্যের কোন বিশেষ বিভাগে এরূপ বিষয়ের সাহিত্যিক রূপায়ণ সুসাধ্য, কোথায় দুঃসাধ্য, তা মনে রাখলে বুঝতে পারব আমাদের সাহিত্যেও

লেনিনের সাহিত্যরূপ কোথায় অনুসন্ধেয়, আর কী সম্ভাব্য বিশেষ ধরনে তা লভ্য।

এই দিকে প্রথম কথা, লেনিন আমাদের নিকট অক্টোবর বিপ্লবের নায়করূপেই প্রথম উপস্থিত হন। তার আগে ভারতবর্ষে বা বাঙলায় সম্ভবত কেউ তাঁর নামও জানতেন না; কেন, তা এর ঠিক পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। বিশেষ বুঝবার কথা এই — 'অক্টোবর বিপ্লব', 'রুশ বিপ্লব', 'বলশেভিক দল', 'বলশেভিজম', 'সাম্যবাদী বিপ্লব', 'সাম্যবাদ', 'সমাজতন্ত্রী বিপ্লব-সমাজতন্ত্র', 'সোভিয়েত-সোভিয়েত নীতি' (ধনসাম্য, শ্রমিকরাষ্ট্র বিশেষ করে সর্বজাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার, ও বিশ্বমানবের মৈত্রী ঐক্য, মানুষের মুক্তি) — এসব ধারণাগুলি লেনিনের নামের সঙ্গে প্রায় প্রথম থেকেই অচ্ছেদ্যরূপে আমাদের মনে গেঁথে যায়, এখনো আছে। অনেকস্থলে 'লেনিনের' নাম উল্লেখ স্পষ্ট করে করা হয় না, কিন্তু তাঁর কীর্তি দিয়েই তাঁকে চিহ্নিত বা আভাসিত করা হয়। বিশেষত সাহিত্যের অনেক বিভাগে 'ইঙ্গিত,' 'প্রতীক' ও ব্যঞ্জনা দিয়েই ব্যক্তি ও বিশেষ বিষয় আভাসিত হয়। আবার দেখা যাবে যাঁরা লেনিনের স্বধর্মী বলে তখন পরিচিত ছিলেন, (যেমন, ট্রট্স্কি) কিম্বা, উত্তরসাধক বলে পরিচিত ছিলেন (যেমন, স্তালিন), তাঁদের নামও লেনিনের সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। সেখানেও লেনিনই মূল উদ্দিষ্ট, অন্য সব নাম নিয়ে সংশয়গ্রস্ত হওয়ার কারণ নেই। যেখানে সোভিয়েতের সাফল্য, অক্টোবর বিপ্লবের বা ওরূপ লেনিনীয় কীর্তির কথা কীর্তিত হচ্ছে, বোঝা সহজ পরোক্ষে সেখানেও লেনিনই উদ্দিষ্ট, লেনিনই কীর্তিত। এক অর্থে তাই সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রণোদিত আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সকল লেখাই লেনিনের প্রশস্তি।

দ্বিতীয় কথা, সাহিত্যের নিজস্ব নিয়মনীতি আছে, কতকগুলি নিয়ম — রসবোধের দাবি সকল বিভাগেই খাটে। এ দাবি না মানলে তা সাহিত্য নয়। আবার, সাহিত্যের অন্তর্গত বিশেষ বিভাগের কয়েকটা বিশেষ রীতিনিয়মও আছে। যেমন, কবিতায় কোনো বিষয় বলতে হলে কবিতার নিয়মে তা বলতে হয়। আবার, যা গদ্যে সহজভাবে বলা যায়, নানা সূক্ষ্ম তর্ক শুদ্ধ, তা হয়তো কবিতায়, বিশেষ করে খণ্ড কবিতায়, বলা যায় না, ইত্যাদি। এরও পরে আরও একটা কথা আছে, লেনিনের কথা, বাঙলার মতো, এত দূরেকার, সম্পূর্ণ ভিন্ন ঐতিহ্যের একটি ভাষা ও সাহিত্যে, বলতে হলে

পথে অনেকগুলি ঐতিহ্য ও বাঁধা-নিয়মকে এড়িয়ে ও ছাড়িয়ে, — না-মেনে, ও মেনে, সাহিত্যভাত হবে। এবং যতটা জ্ঞানপ্রদ সাহিত্যে (লিটারেচার অব ইনফরমেশন এ্যাণ্ড নলেজ্) তা বলা সহজ ততটা প্রবর্তনাপ্রদ সাহিত্যে (লিটারেচার অব পাওয়ারে) তা বলা সহজ নয়। অতএব, প্রবন্ধ সাহিত্যে তথ্যপ্রধান ও আলোচনামূলক লেখায় (এমন কি, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতিতেও) লেনিনের কথা বলা সহজ। কিন্তু আমাদের গল্পে, উপন্যাসে তা উল্লেখ করা যায় প্রধানত দৃষ্টান্ত ও প্রেরণা হিসাবে। লেনিনের বিষয়ে নাটকে-যাত্রায় বলাও সম্ভব, কিন্তু সেজন্য আসর, অর্থাৎ দর্শকসমাজ প্রস্তুত হয়ে না উঠলে নাটক-যাত্রাতে ওরূপ দূর সমাজের চিত্র বা অজ্ঞাত চরিত্র রূপায়ণ স্বাভাবিক নয়। কাব্যে একদিকে বলা খুবই কঠিন, তা সাহিত্য-ধর্ম হারিয়ে বাগ্মিতা বা আবেগ-আকুলতা হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আরেকদিকে সাহিত্যধর্ম মেনেও তা প্রশস্তিসূচক কবিতায় বলা মোটেই অসাধ্য নয়। মায়কোভ্স্কি, ইয়েসেনিন তার দৃষ্টান্ত। এমন কি শুধু বাহ্য প্রশস্তি নয়, তার অপেক্ষা গভীরতর জীবনবোধের সঙ্গে, অধ্যাত্মবোধের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে লেনিন-চেতনা উচ্চাঙ্গের কবিতা হতে পারে। অন্য ভাষার কথা জোর করে বলতে পারব না, তবে সগৌরবে বলতে পারি, লেনিনের সম্বন্ধে এমন কবিতাও বাঙলায় আমরা পেয়েছি। লেনিন, লেনিনীয় কীর্তি, লেনিনীয় জীবনদৃষ্টি বাঙলায় উৎকৃষ্ট কবিতায় রূপায়িত হয়েছে।

তৃতীয়ত, লেনিনের লেখার বা লেনিন বিষয়ক লেখার, যেসব সরাসরি অনুবাদ বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, তাও এ-প্রসঙ্গে গণনীয়। কিন্তু ইদানীং এ-অনুবাদ-প্রধান ধারা বিপুল। তাই এ-প্রবন্ধে আমরা বাঙলা সাহিত্যের এ-দিকটার কথা গণ্য করছি না, তবে স্মরণ করছি।

পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, সাময়িক পত্রের পাতায়, সংবাদ হিসাবে ছাড়াও, সম্পাদকীয় মন্তব্যে অক্টোবর বিপ্লবের ও লেনিনের যে উল্লেখ আছে তা মাঝে মাঝে সাহিত্য-ধর্মী, কিন্তু এ-প্রবন্ধে তাও বিশেষ গণনীয় হলো না। অথচ প্রবন্ধ সাহিত্য হিসাবে তার মূল্য যথেষ্ট। শুধু পুস্তকাকারে বাঙলা সাহিত্যে লেনিনের যেখানে স্পষ্ট ছায়াপাত হয়েছে, এবার আমরা তার হিসাব নিই।

জীবনী ও প্রবন্ধ সাহিত্য

প্রথমেই মনে পড়ে লেনিন জীবনী সমূহের কথা, বা, প্রথম দিককার লেনিন-বিষয়ক জীবনীমূলক নিবন্ধাদির (বায়োগ্রাফিক্যাল স্কেচ, প্রভৃতির) ও রাজনৈতিক আলোচনার কথা। ১৯১৭ থেকে লেনিনের মৃত্যু পর্যন্ত (১৯২৩) কালটাকে এদিকে প্রথম পর্ব বলে ধরে নিতে পারি। তখনো সুস্পষ্ট তথ্য ও ধারণা লাভ সহজ ছিল না।

বিপিনচন্দ্র পাল, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনস্বীরা বলশেভিক বিপ্লব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা জাগিয়েছিলেন। ১৯২১-এর শেষভাগ থেকেই মুজফ্‌ফর আহমদ ও অন্যান্যরা বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার চেষ্টা করছিলেন। ওদিকে 'সৎসঙ্গী', বৈশাখ, ১৩২৮ (এপ্রিল, ১৯২১ সন) সালে কে ধারাবাহিক লেনিন জীবনী লিখছিলেন তা জানা যায় নি। বলা বাহুল্য 'সৎসঙ্গী' ধর্মের পত্রিকা। কিন্তু এ-লেখক কতটা ধর্মজিজ্ঞাসু ও 'সৎসঙ্গী'-ধারার মানুষ, লেখা থেকে তা বোঝা যায় না; কিন্তু দেখা যায় তিনি লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, এবং লেনিন বিরোধী প্রচারে তিনি কিছুমাত্র প্রভাবিত হতে, বা পাঠকদের প্রভাবিত করতে অস্বীকৃত। তিনি লিখছিলেন, "এই কয় বছরে তিনি (লেনিন) বিশ-পঁচিশবার গুলির দ্বারা আহত হয়ে এবং কয়েকবার মরে গিয়ে এখনো বেঁচে রয়েছেন। প্রথম-প্রথম আমরা জানতাম তাঁর মতো রক্তলোলুপ বা নর-পিশাচ ইতিপূর্বে কুত্রাপি জন্মগ্রহণ করেনি। কাইজারের কাছ থেকে বিপুল টাকা পেয়ে এবং জারের সঞ্চিত বিপুল ধনরত্ন হস্তগত করে তিনি বিলাসব্যসনে একেবারে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। এ-সময়ের একটা সংবাদ এই যে, প্রত্যহ তিনি দুই হাজার রুবল মূল্যের ফল আহার করে থাকেন।" সেই ১৯১৭-১৯২১-এর কালেও লেনিনের সম্বন্ধে বিরূপ সংবাদ রটছিল। আর এসব অপপ্রচার বাঙালি শিক্ষিতরা কী অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতেন, তা বুঝবার জন্যই এই উদ্ধৃতি।

১৯২১ থেকে ভারতবর্ষে গান্ধী আন্দোলনের যুগ, সক্রিয় আন্দোলনের যুগ। তাতে নানা রাজনৈতিক গোষ্ঠীতেই রুশ-বিপ্লবের সম্বন্ধে চেতনা জেগেছিল। লেনিন সম্বন্ধেও সকলেই জিজ্ঞাসু হন। 'সৎসঙ্গী'র মতো ধর্মীয় পত্রেও তার ছাপ তাই না পড়ে পারেনি। এই লেখা পুস্তকাকারে বোধহয় প্রকাশিত হয়নি।

ফণীভূষণ ঘোষ মহাশয়ের লেখা 'লেনিন'ই বাঙলায় লেনিনের প্রথম জীবনী-গ্রন্থ। কলিকাতা কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের 'ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব' কর্তৃক ১৩২৮

সালের ১০ ভাদ্র (২৫ আগস্ট, ১৯২১) তা প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ প্রমুখ ঐতিহ্যের দ্বারাই সে-লেখক চালিত, সেভাবেই লেনিনকেও তাঁদের সগোত্র করতে সচেষ্ট। সদুদ্দেশ্যমূলক হলেও তা ভ্রান্ত চেষ্টা. জীবনী-সাহিত্য হিসাবেও এ-বই-এর মূল্য বেশি নয়, যদিও তিনি ডাঙ্গের ইংরেজী বই 'গান্ধী বনাম লেনিন' পড়েছিলেন। অর্থাৎ বই পাওয়া না গেলেও লেনিন তখন এ-দেশে পরিচিত ব্যক্তি, আদর্শের প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

এ-পুস্তকের সমালোচনা সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে প্রকাশিত হয়েছিল ১২ ডিসেম্বর, ১৯২১-এ। প্রকৃতপক্ষে দেখি 'বিজলী', 'আত্মশক্তি', 'সংহতি', 'শঙ্খ', 'ধূমকেতু' (নজরুলের) ও নোয়াখালির 'দেশের বাণী' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে সোভিয়েত বিপ্লব ও লেনিনের সম্বন্ধে (লেনিনের জীবিতকালে ও পরে) বরাবর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হচ্ছিল। এর পরে আসে 'লাঙ্গল' ও 'গণবাণী'র দিন। বস্তুত ১৯২৩ সালে দেখি বিনয়কুমার সরকার 'নবীন রুশিয়ার জীবন প্রভাত' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখছিলেন; হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 'লেনিন' সম্বন্ধে 'আত্মশক্তিতে' জীবনী-প্রবন্ধ লিখেছেন; হেমন্তকুমার সরকার সেই নীতিতে আকৃষ্টও হয়েছিলেন। এমনকি ট্রটস্কির লেখা '১৯০৫ সালের রুশ-বিপ্লব'ও বাঙলায় তখন অনূদিত হয়েছে।

বাঙালি বিপ্লবীরা কী করছিলেন? কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ ও কাজী নজরুলের নামই বিপ্লব প্রসঙ্গে প্রথম উল্লেখযোগ্য। ১৯২১-এর মার্চ থেকে 'শঙ্খ' পত্রিকায় প্রসিদ্ধ জাতীয় বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যাল 'লেনিন ও সম-সাময়িক রাশিয়া' বিষয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখছিলেন, তাও বিশেষ গণনীয়। শুধু জাতীয়তা নয়, সাম্যবাদী ভাবধারাতেই উদ্বুদ্ধ। কিন্তু পুস্তকাকারে তাঁর সে-বই প্রকাশিত হয়নি। (মুজফ্‌ফর আহমদের লেখাও তখনো পাওয়া যায় না।)

বিপ্লবী অমূল্যচরণ অধিকারী ('অনুশীলন' দলের) মহাশয়ের 'আত্মশক্তির' পাতায় (১৯২৩-এর এপ্রিল-মের) প্রবন্ধাবলী; লেনিন সম্বন্ধে লেখা স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টির আবেগসমৃদ্ধ প্রবন্ধ। 'যুগান্তরে'র প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর 'লেনিন ও সোভিয়েত'এ (১৯২৪) ততটা সুস্থির চেতনা নেই। তিনি আইরিশ বিপ্লবের দ্বারাও আকৃষ্ট ছিলেন।

সরাসরি লেনিনকে নিয়ে না হলেও বিপ্লবী রাশিয়া নিয়ে বাঙলায় যে বিপ্লবীরা, অবশ্য আরও পরে, আলোচনা গ্রন্থ লিখেছিলেন তাঁদের দু-তিনজন

বিশেষ স্মরণীয়। 'তরুণ রুশ'-এর (১৯২৫) লেখক রেবতী বর্মন, এবং 'নব্য রুশিয়া'র লেখক সরোজ আচার্য। আর ওরূপ লেখাই 'বাঙলার বাণী'তে লিখেছেন সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার।

শিবরাম চক্রবর্তীর 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী' আরও আগেকার লেখা, তা বিস্মৃত হবার মতো বস্তু নয়।

ঠিক সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল 'বিজলী', 'আত্মশক্তি', ধূমকেতু', 'লাঙল' প্রভৃতির কোনো কোনো লেখা (বারীন ঘোষ, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাও তাতে আছে, নজরুল-মুজফ্ফর আহমদের লেখাও)। আর কতকাংশে এই শেষ তিন-চারখানি বইও প্রবন্ধ-সাহিত্যরূপে গণ্য।

পরে দেখব — প্রাথমিক পর্বেই, এই আলোচনা-সাহিত্য ছাড়া ক্ষীণভাবে হলেও কলাকুশল-সাহিত্যেও লেনিনের ছায়াপাত হয়েছিল।

অবশ্য দ্বিতীয় পর্বে (লেনিনের মৃত্যুর পরে) লেনিন সম্বন্ধে ও সোভিয়েত ও সোভিয়েত-বিপ্লব সম্বন্ধে নানা বিদেশী বই এ-দেশে আসে। তাতে শিক্ষিতরা অনেকে উদ্‌বুদ্ধ হন, এবং কতকটা সাম্যবাদের অনুকূল ধারণাও তাঁদের মনে গড়ে উঠতে থাকে। কতদূর যে তা গড়ে উঠেছিল কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পিতৃস্মৃতি'র (পৃঃ ২১৫-২১৭) একটি আখ্যান তার অভ্রান্ত প্রমাণ। সমস্ত ব্যাপারটাই উদ্ধৃত করার মতো — স্থানাভাবে তা সম্ভব হলো না। কিন্তু কুতূহলী পাঠকমাত্রই তা পড়ে নেবেন। অনুমান করা হয়েছে তা ১৯২৪-২৫-এর পূর্বের ঘটনা, তা হলে নিশ্চয়ই আশ্চর্যজনক কথা। পতিসরে রথীন্দ্রনাথ পৈতৃক জমিদারিতে গিয়েছিলেন, প্রজাদের এক আসরে বসে কথা শুনছেন, মনে হচ্ছিল 'মধ্যযুগে ফিরে গিয়েছি'। তারপর "পাকা দাড়িওয়ালা এক গ্রাম্য-বৃদ্ধ হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, বাবুমশায়, এসব ব্যাপারে কথা বেশি বলা মানেই বাজে কথা বলা। স্বদেশী ছোঁড়ারা দেশের উন্নতি নিয়ে লম্বা চওড়া বক্তৃতা দেয় শুধু। আসল কাজের বেলায় কারো টিকিটুকু দেখবার জো নেই। হাঁ, লেনিনের মতো একজন লোক দেশে জন্মাত, দেখতেন সব ঠিক হয়ে যেত।" রথীন্দ্রনাথ বলেছেন, "রূঢ় বাস্তবের মধ্যে আচমকা যেন ফিরে এলাম।"

এই রূঢ় বাস্তব লেনিনকে তখন চিনে নিচ্ছে, সেই ১৯২৪-২৫এ। তারপর থেকে প্রবন্ধ-সাহিত্যে লেনিন ও তাঁর কীর্তিকথা, তাঁর বিচার আলোচনা ক্রমশই বেড়ে গিয়েছে। ১৯৩০-এর সময় থেকে তা আরও প্রবল হয়।

তখন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাল — তৃতীয় পর্ব তাকে বলতে পারি। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' বাঙলা সাহিত্যে লেনিনীয় অনুরাগের দুয়ার তখন মুক্ত করে দিল। তারপর থেকে জীবনী ও প্রবন্ধ-সাহিত্যে লেনিনীয় প্রভাবের হিসাব নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। চতুর্থ পর্বে, অর্থাৎ দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে, রাশিয়ার ভ্রমণকথা বাঙলা সাহিত্যের অনেক খ্যাতনামা লেখকরাই লিখেছেন। মূল লেখায় ও অনুবাদে তখন লেনিন-প্রভাব সুপরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছে।

সাহিত্যে জ্ঞানপ্রদ সাহিত্যের যে-শাখা, তাকে আশ্রয় করে এসব লেখার মধ্যে দিয়ে লেনিনের একটা স্পষ্ট রূপ এই চার পর্বে বাঙলা দেশে গড়ে উঠেছে। লেনিনের মূল বই-এর অনুবাদও এখন অনেক প্রকাশিত হয়েছে। ক্লারা ৎসেৎকিন (জেটকিন) লিখিত 'স্মৃতিকথা,' গর্কীর 'লেনিন স্মৃতি' প্রভৃতিও (অনুবাদে হলেও) বাঙলা সাহিত্যেরও এখন সম্পদ। তবু বিস্মৃত হবার কথা নয় যে, এদিকে যাঁদের সহায়তা সর্বাপেক্ষা কার্যদায়ক হয়েছে তাঁরা অনেকেই (যথা, কম মুজফ্‌ফর আহমেদ, ধরণী গোস্বামী প্রমুখ) ছিলেন কমিউনিস্ট, আরও অনেকে কমিউনিস্টদের সহযাত্রী (যেমন, কাজী নজরুল ইসলাম, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ) এবং আরও কেউ কেউ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্র প্রভৃতির মতো লেখকরা — অগ্রগণ্য সাংবাদিক, এবং অধিকাংশেই রাজনীতি সচেতন। অপরদিকে লক্ষণীয়, বাঙলা সাহিত্যে লেনিনের কুৎসামূলক সাহিত্য নেই।

রস-সাহিত্য

আশ্চর্য হবার কিছু নেই — কথা-সাহিত্যে লেনিন বা অক্টোবর-বিপ্লব সরাসরি বিষয় হয়ে ওঠেনি। কেন, তা পূর্বেই বলেছি। সুপরিচিত জীবনযাত্রার পটভূমিতেই এরূপ সাহিত্য লেখা যায়। গল্পে উপন্যাসের আমাদের জন্মক্ষেত্র বাঙালি বা ভারতীয়। তার মধ্যে শ্রমিক-কৃষকের জীবনচিত্র থাকলে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখ:ত হবে তাতে লেনিনের প্রভাবের চিহ্ন আছে কিনা। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠি' থেকে একটা নতুন ধারার বাঙলা কথা-সাহিত্যের সূচনা হয়। তাতে লেনিন অপেক্ষা গর্কিরই প্রভাব বেশি বলে স্বীকার্য। দিলীপ রায় প্রভৃতি দু-একজন বিশের পরবর্তী দশকের ইউরোপীয় নরনারীদের বাঙলা কথা-সাহিত্যের চরিত্ররূপে গ্রহণ

করেছেন, কদাচিৎ দেখি তাঁদের কেউ কেউ কমিউনিজমেও অনুরক্ত। মণীন্দ্রলাল বসুর একখানি উপন্যাসেও তেমন বাঙালি চরিত্র পাই। কিন্তু কথা-সাহিত্যে এ-দেশ থেকে প্রকাশিত ও মস্কো থেকে প্রকাশিত রুশ-সাহিত্যের অনুবাদই এখনো প্রধানত লেনিনীয় প্রেরণার বাহন। রুশ-জীবন সম্বন্ধে আকর্ষণ স্পষ্ট — মূল বাঙলা উপন্যাস বোধহয় নেই। একেবারে গোড়ায় (১৯২০-এর) নজরুলের 'ব্যথার দানে' লাল ফৌজে ["এর চেয়ে ভালো কাজ আর দুনিয়ায় খুঁজে পেলুম না। তাই এ-দলে এসেছি"] দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য হলেও, লেনিনীয় প্রভাব তাতে আবিষ্কার করা সহজ নয়। আসলে, বাঙলা-সাহিত্যের যে-বিভাগে লেনিন ও লেনিনীয় কীর্তি সগৌরবে প্রকাশলাভ করেছে সে হচ্ছে বাঙলা কাব্য-সাহিত্য আর, সাধারণভাবে কবিতা বাঙলা সাহিত্যেরও প্রধান সম্পদ।

বাঙলা কবিতায় লেনিন

বাঙলা কবিতায় লেনিনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চিহ্ন এত প্রচুর যে শুধু তার সঙ্কলনেও একাধিক খণ্ডের বড় বই হয়ে যাবে। আর, সাহিত্যদৃষ্টিতে ঝাড়াই-বাছাই করে তা চয়ন করলে তার পরিমাণ ও উৎকর্ষও সকলকেই চমৎকৃত করবে। উদ্ধৃতি না দিলে এ-কথা সকলের উপলব্ধি হবে না। কিন্তু এ-প্রবন্ধ তা হলে আরও চারগুণ হয়েও শেষ হবে না। প্রবন্ধের এই অসম্পূর্ণতা মেনে এখানে শুধু আমরা প্রধানতম কয়েকজন লেখকের কথাই স্মরণ করছি — তাঁদের লেখার নাম করাও সম্ভব হবে না।

'লেনিন' ঠিক এই নামেই বাঙলায় প্রথম কবিতা লিখেছিলেন বোধহয় কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয়, ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার অধিবাসী, এখনো কলকাতায় তিনি জীবিত আছেন (কবি পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্যের পিতা। পূর্ণেন্দুবাবুরও এ-ধারার কবিতা আছে)। যতীন্দ্রবাবু বলেছেন, তিনি লেনিনের মতবাদ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। জানতেন, লেনিন অক্টোবর বিপ্লবের মহানায়ক, সাধারণভাবে তাই সকল গণজাগরণের পথ-নির্দেশক, স্বাধীনতাকামীর পূজনীয়। সে-উচ্ছ্বাসেই তাঁর দীর্ঘ কবিতাটি লেখা। তখনকার দিনে (১৯২০-২১-এর দিকে) এজন্য তাঁকে পুলিশের হাতে নিগৃহীত হতে হয়, দুঃখ প্রকাশও করতে হয়। লেনিন বিষয়ে যতীন্দ্রবাবুর চিন্তা আসলে কোন ধারায় প্রবাহিত ছিল, নিচের উদ্ধৃতিই তার প্রমাণ :

"লেনিনেরে লক্ষ্য করি'
তারই পন্থা অনুসরি'
ক্ষুধার্ত শার্দূল সম নির্যাতিত অন্য সব জাতি,
আজি ওই উঠিয়াছে মাতি ;
প্রতিষ্ঠিবে আজি তারা দেশে দেশে প্রেমের শাসন।
...　　...　　..
জীবন্মৃত জাতি-চিত্তে জ্বালাইবে দীপ্ত হুতাশন।"

কালানুক্রমে না হলেও, বলা বাহুল্য সে-পর্বের (১৯২০-৩০) লেনিনীয় প্রভাবে উদ্বুদ্ধ প্রধান কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর 'ব্যথার দানে'র কথা পূর্বেই বলেছি। বোধহয় স্বদেশী-বিদেশী এ-ধারার কোনো কবির তুলনাতেই তাঁকে তুচ্ছ মনে করা যাবে না। মায়াকোভ্স্কি, য়েসেনিন প্রমুখ তৎকালীন জগৎ-বিখ্যাত রুশ-কবিদের কথা মনে রেখেও একথা বলা যায়। নিশ্চয়ই নজরুলও তাত্ত্বিক 'সাম্যবাদী' ততটা নন যতটা 'বিদ্রোহী,' মানবীয় মুক্তির হোতা। কত পৃষ্ঠা উদ্ধৃতি দিলে এই সর্বহারা কবি নজরুলের কবিতার প্রতি সুবিচার করা হয়? বাঙালি পাঠকের পক্ষে অবশ্য উদ্ধৃতির তত প্রয়োজন নেই। অন্য ভাষার মধ্যে রুশে তাঁর কবিতার কিছু অনুবাদ হয়েছে। জানি না, রুশ অনুবাদে তাঁর কাব্যোৎকর্ষ রক্ষিত হয়েছে কিনা।

একটা কথা, ১৯২৪-৩০-এর 'কল্লোল' 'কালি-কলম' গোষ্ঠীর কবিরা একটা নৈরাজ্যের ভাবে কিছুটা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের কোনো লেখায় কিন্তু লেনিন বা লেনিনীয় কীর্তি বা চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ দেখা যায়নি। তবে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। এবং তাঁরা লেনিন-প্রভাব অপেক্ষা হুইটম্যান-প্রভাবেই বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন মনে হয়!

নজরুলের পরে বাঙলা কবিতায় লেনিনীয় ভাবনা যাঁদের মধ্যে দেখা দিয়েছে তাঁদের মধ্যে কালানুক্রমিক নাম করলে বোধহয় কবি সমর সেনের নামই প্রথম করতে হয়। কবিতায় বিষ্ণু দে-এর আবির্ভাব তারও পূর্বে। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'প্রতিবিপ্লব দুর্ভিক্ষ, সংগঠন' নামের ('রুশতী পঞ্চশতী'র) কবিতাটি ১৯২২-২৩-এর লেখা — আনাতোল ফ্রাঁসের বিবৃতি ও নোবেল পুরস্কারের টাকাটা সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠানোর খবর পড়ে তা লেখা — তাহলে এটিও হয়ত বাঙলায় প্রথম পর্বের লেনিনীয় প্রভাবের কবিতা।

সুন্দর কবিতা। তবে বিষ্ণু দে-র এ-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ কবিরূপের নিশ্চিত প্রকাশ দেখা যায় বোধহয় তৃতীয় পর্বের শেষেই, কিছু পরে। কবি বিমল ঘোষও সে হিসাবে ১৯৪০-এর সময় থেকেই লেনিনীয় ধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সম্ভবত অরুণ মিত্রই ত্রিশের পরে তৃতীয় পর্বের সুস্থির লেনিনিস্ট কবি। মোটামুটি ত্রিশের বছরগুলিতে কাব্যক্ষেত্রে যাঁরা উদিত হলেন তাঁদের মধ্যে এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য এঁরাই — সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তীরাও গণ্য, কিন্তু লেনিন-প্রভাব তাঁদের মধ্যে দুর্নিরীক্ষ্য। সমর সেন কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন, আর বিষ্ণু দে-এর কবিকৃতি এখনো নবায়মান। এবং এ-মুহূর্তে মনে হয় (১৯৬৯) লেনিনীয় চেতনাকে বাঙলা-সাহিত্যে যাঁরা পূর্ণতম কাব্যশ্রী দান করতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত।

বিষ্ণু দে বিদগ্ধ কবি, আধুনিক কবি এবং আধুনিক মানুষও। ব্যক্তি-সত্তার যে-জিজ্ঞাসা ও বেদনা লিরিক কবিতায় অনেক সময়েই প্রাণ বা আত্মা, বিষ্ণু দে-এর কবিতার উৎস তাই। সে-উৎস থেকে নিঃসৃত হয়ে সে-জিজ্ঞাসা জন-জীবনের সাগরে গিয়ে মিশে, নিঃসঙ্গ কবি-সত্তাকে মহৎ সংযুক্তিতে পূর্ণতা দান করে। প্রেমে ও সংগ্রামে, স্বদেশে ও বিশ্বে দ্বন্দ্ব-মিলনে বিধৃত হয়। বিষ্ণু দে-এর এই কবি-জীবনকে প্রত্যুদ্গমন করে যা এগিয়ে দিয়েছে তার মধ্যে লেনিন ও লেনিনীয় সাধনাই প্রধান বস্তু। একথা সকলেই জানেন বিষ্ণু দে-এর কবি-রুচি ও কবি-চেতনা অতিকর্ষিত সূক্ষ্ম শিল্পরীতিতে নিয়মিত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কত সুনিপুণ কলাকৌশলে, অথচ নির্ভয়ে, তিনি আপনার কবিতার মধ্যে একদিকে 'লেনিন' 'চেলিউশকিন,' 'যুগাশভিলি' প্রভৃতি নামও (ব্যঙ্গচ্ছলে নয়) অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময় করে উল্লেখ করতে পারেন, কিছুতেই সঙ্কুচিত নন, এবং সর্বত্রই সফলকাম। সত্যই 'প্রাণের কবি। অতীতের সিঁড়ি ভাঙে আর গায় ভাবীর ভাষা,' — তাঁর সম্বন্ধে সত্য 'স্তালিনগ্রাদে বাঙলা দেশের প্রান্ত মিলায়,' এ তাঁর কবিতা সম্বন্ধেও সত্য।

> "লেনিনের মনপ্রাণ
> আকাশ বিহারী করে দিল যৌবন।...
> তাই সব শুনি সে নক্ষত্র-গান
> গঙ্গায় পাই ভলগার প্রতিমান।"

'বাইশে জুন' যেমন, তেমনি 'সন্দীপের চর' তাঁর কাছে একই লেনিনীয় চেতনায় মিলেছে। 'প্রাজ্ঞ' লেনিনই শুনিয়েছেন 'স্বাধীন জীবন-জলে জীবনের ঢেউ'। 'গমের ধানের ক্ষেতে প্রাণের আশ্বিন আসে স্তেপে ও তুন্দ্রায়'।

১৯৬৭ সনে প্রকাশিত 'রুশতী পঞ্চশতী'তে অক্টোবর-বিপ্লব-এর পঞ্চাশতম বার্ষিকীতে বিষ্ণু দে-এর এ-ধারার পঞ্চাশটি কবিতা একত্র প্রকাশিত হয়েছে। সম্ভবত লেনিনীয় দর্শনের, কীর্তির ও প্রেরণার এমন উৎকৃষ্ট কবিতা (রুশভাষা ভিন্ন ?) কোনো ভাষার কবির কাব্যে একত্র গ্রথিত হয়নি।

সে-বৎসরই (১৯৬৭) বিমলচন্দ্র ঘোষ-এর 'উত্তর আকাশের তারা'ও প্রকাশিত হয়েছে। বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রেরণার সুপরিচিত কবি। তাঁর কবিতা নজরুলের কবিতার মতোই অনেকটা সিভিক পোয়েট্রি বা জনবেদ্য ভাবের কবি। বাগবিভূতিতে, রচনা-কৌশলে, সত্তাজাত দুরন্ত আবেগে ও ঐশ্বর্যে তাঁর 'লেনিন' প্রভৃতি কবিতা সকলকেই চমৎকৃত করে, সার্থকভাবেই তিনি এ গ্রন্থের জন্য নেহরু পুরস্কার লাভ করেছেন (১৯৬৮)। এই সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও।

ইচ্ছা করেই কিন্তু আরেক গোষ্ঠী কবিদের নাম করিনি, তাঁরা কমিউনিস্ট কবি। এঁদের পক্ষে লেনিন স্বভাবতই যুগগুরু ও পথিকৃৎ। কিন্তু কথা শুধু তা নয়, কথা এই যে, যে-বাঙলা দেশ কবিতার দেশ, সে-দেশের কবিতায় এই লেনিনবাদী কবিরাও অনেকে অগ্রগণ্য। শুধু অগ্রগণ্য নয়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো কেউ কেউ সরকারী প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতির পারিতোষিকও লাভ করেছেন। সুভাষের কাব্য রসে, সারল্যে, শিল্পোৎকর্ষে যে-কোনো ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করত। যাঁরা তাঁর মতো সম্মান পাননি, তাঁরাও অনেকেই রসজ্ঞ সমাজে বহুকাল স্বীকৃত। যেমন, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। কেউ কেউ আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকল বাঙালির দ্বারা অভিনন্দিত, যেমন, কবি-কিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্য। লেনিনের সঙ্গে আত্মিক যোগ ঘোষণা করে ২১ বৎসরের এই কবি ঘোষণা করে গিয়েছেন সে প্রেরণায় 'মনে হয় আমিই লেনিন'। 'লেনিন' সম্বন্ধীয় কবিতার মধ্যে বোধহয় এটি সাধারণ্যে সর্বাধিক আবৃত্তি-ধন্য বাঙলা কবিতা। সমস্ত ভাষার পাঠকই ঐ কবির অকালমৃত্যুর জন্য চোখের জল ফেলেন। এই সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য, প্রায় অনুরূপ আবৃত্ত 'ইলা মিত্র' কবিতার কবি গোলাম কুদ্দুস। কিম্বা মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু।

অনেকেরই নাম উল্লেখ সম্ভব হলো না। তবু এঁদেরও পরে এই ভাবনার নতুন এক কবিগোষ্ঠী বাঙলা-সাহিত্যে পদার্পণ করেছেন — সিদ্ধেশ্বর সেন, তরুণ সান্যাল প্রভৃতি কবিরা বাঙলা-সাহিত্যে লেনিনীয় সুপ্রতিষ্ঠিত কবি। 'পরিচয়' বা ওরূপ প্রগতিশীল ধারার পত্র-পত্রিকা তাঁদের সার্থক সাক্ষ্য প্রতিদিন বহন করছে। নামোল্লেখও অসম্ভব — সংখ্যায় তাঁরা নগণ্য নন। আর কৃতিত্বের দিক থেকে বলা যায়, বাঙলা কবিতার সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁরা সগৌরবেই স্বীকৃতি লাভ করেছেন। সেই সঙ্গে লেনিনের এই রূপও বাঙলা-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট — (১) লেনিন শুধু রুশিয়ার নন, বিশ্বমানুষের। বিশেষ করে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির মহানায়করূপেই তিনি সকল ভাষার সাহিত্যেরও প্রেরণার উৎস। (২) ব্যক্তি-সত্তার দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ পরিণত সাযুজ্যের মন্ত্রদ্রষ্টা, এবং (৩) নতুন মানব-সাধনার স্রষ্টারূপে লেনিন মানুষের সর্বকালের অধ্যাত্মসম্পদ। শুধু এ-শতাব্দীতে নয়, আগামী বহু শতাব্দীতেও এই যুগ-পুরুষের প্রেরণায় শিল্প-সাহিত্য সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

বাঙলা সাহিত্যে দেখি — লেনিনের এই রূপ।

নয়াবাম মানসিকতার একদিক

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

'নয়াবাম', — আজকের দিনের ছাত্র-তরুণদের এক অংশের স্ব-আরোপিত অভিধা।

নয়াবাম-মানসিকতা, নয়াবাম প্রবনতা, সমাজতাত্ত্বিক-মনস্তাত্ত্বিকদের বিশেষ আগ্রহ ও কৌতূহল উদ্রেক করেছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নয়াবাম-মনস্তত্ত্ব নিয়ে অনেক সমীক্ষা চলেছে, সমীক্ষকদের রিপোর্ট নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, রিপোর্টের উপর তর্ক-বিতর্কের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ সমীক্ষাই বুর্জোয়া-সমাজতত্ত্বের ফ্রেমে-বাঁধা অথবা ফ্রয়েডীয় ও নিও-ফ্রয়েডীয় প্রত্যয়ভিত্তিক। তা সত্ত্বেও সমীক্ষাগুলি তথ্যবহুল, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমীক্ষকদের সিদ্ধান্ত পূর্ব-পরিকল্পিত না হওয়ায় বিষয়মুখতা মোটামুটি অক্ষুন্ন। বুর্জোয়া সংবাদপত্র নয়াবামদের সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী। সংবাদপত্রের কৃপায় কয়েকবছর আগেকার নয়াবাম আন্দোলনের নেতারা আজ বিশ্ববিখ্যাত ; তাদের সমাজবিমুখ পশ্চাদবর্তিতা এ-দেশের এবং অন্যান্য দেশের তরুণদের মধ্যে এখনও বিদ্যমান। শিল্প-সাহিত্যের বাজারে হিপী-বিটিদের প্রভাব অটুট, যদিও আজকের নয়াবামদের জঙ্গী মনোভাবের ফলে কিছুটা ম্লান। ষাটের দশকে নয়াবাম আন্দোলনে 'এ্যাকটিভিষ্ট'দের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে, 'রিসেসিভ'রা আরো পিছু হটে আন্দোলনের বৃত্ত থেকে প্রায় নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। ছাত্র-তরুণরা কয়েক বছর আগে যখন দক্ষিণ-কোরিয়া, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়ায় বাম বা দক্ষিণ-রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তখন আমেরিকা ইউরোপের নয়াবাম আন্দোলনে এ্যাকটিভিষ্টদের প্রভাব এত স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। আজ নয়াবাম নেতৃত্বের দাবি অনুসারে প্রায় সর্বত্র নয়াবাম আন্দোলন শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত। দু-বছর আগেকার মে মাসে ফরাসী দেশের ঘটনা (নয়াবাম শিবিরের মতে বিদ্রোহ, যা কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধাচরণের ফলে অসমাপ্ত রয়ে গেছে) থেকে আজকের বন, ম্যানিলা প্রভৃতি শহরে যুদ্ধবাজ

শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিবাদ, সারা আমেরিকা জুড়ে নিক্সন-এর যুদ্ধ নীতির প্রতিকূলতায় ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ-মিছিল, যার ফলে এই সেদিন কেণ্ট স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন তরুণ-তরুণী জাতীয় প্রহরী-বাহিনীর গুলিতে নিহত হলেন ; — এ-সবই বর্তমান নয়াবাম আন্দোলনে জঙ্গী ভাবাপন্ন এ্যাকটিভিষ্টদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তির নির্দেশক। সাম্প্রতিক কালের নয়াবাম আন্দোলনের এই যুদ্ধ ও আগ্রাসন-নীতির বিরোধিতা-ইস্রায়েলে গোল্ডামেয়ার-মোশে দায়ান-এর সরকারের বিরুদ্ধেও সোচ্চার। আমেরিকা ও ইস্রায়েলে ছাত্র-তরুণদের এই মনোভাব সরকারী নীতির আশু পরিবর্তন ঘটাতে না পারলেও, সরকারকে অসুবিধায় ফেলেছে নিশ্চয়ই। এই নয়াবাম আন্দোলনের গুরুত্ব ঐ সব দেশের সরকারী অনুগ্রহপুষ্ট সংবাদ-পত্র ও তথ্য সরবরাহকারীরাও অস্বীকার করতে পারছেন না।

নয়াবাম মানসিকতা এ:দের আন্দোলনের রূপ, রীতি ও উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণ করছে, আবার এদের আন্দোলনের রূপ-রীতি দ্বারা অনেকাংশে এদের মানসিকতা প্রভাবিত হচ্ছে। আন্দোলনের রূপ দেশ-কাল ভেদে বিভিন্ন। কখনও স্তিমিত, কখনও তীব্র ; কোথাও সীমিত, কোথাও ব্যাপক, এই মুহূর্তে অন্তঃসলিলা ফল্গু, পরমুহূর্তে প্রমত্তা পদ্মা। নয়াবামদের মতে এই অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা তাদের আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য।

লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'নিউ লেফট রিভিউ' পত্রিকার (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৬৮) সম্পাদকীয় স্তম্ভে [১] বলা হয়েছে, — ফ্রান্সের মে-বিপ্লবের সম্ভাবনা আগে থেকে কেউ বুঝতে পারেননি। কোনোভাবে সতর্ক না করে বিপ্লব পৃথিবীর ওপর ফেটে পড়েছিল। পূর্ব-কল্পিত কোনো প্যাটার্নের সঙ্গে এর মিল ছিল না। ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব-ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, শ্রমিকরা মালিক-শ্রেণীর স্বার্থের তাঁবেদার, তাদের কোনো অভিযোগ নেই, অসন্তোষ নেই ; বুর্জোয়া সমাজতাত্ত্বিকদের সমীক্ষার ফলে এই রকমই মনে হয়েছিল। দেখা গেল বিপ্লবের স্রোত শুকিয়ে যায়নি, সহসা সিসমোগ্রাফে কোনো সঙ্কেত না

১। The May Revolution in France was foreseen by nobody. It burst upon the world without warning — Editorial Introduction; New Left Review, Nov-Dec 1968 Pp 1.

দিয়েই ভূকম্পন শুরু হয়ে গেল ২। প্রশ্ন করেছেন সম্পাদক — কিভাবে এই চৈতন্যের বিস্ফোরণের ব্যাখ্যা করা যায়? ঘুমন্ত; মৃতপ্রায় বলে যাদের মনে হয়েছিল, তারা নয়াবাম আন্দোলনের মৃতসঞ্জীবনী স্রোতের স্পর্শে সহসা চোখ মেলে, মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে তুলে আবার বিপ্লবের শপথ নিল। মানসিকতার পরিবর্তন আকস্মিকভাবেই ঘটে। আজ যারা সন্তুষ্ট ও বুর্জোয়া-অনুগামী শান্তশিষ্ট শ্রমিক, কালই তারা অননুগামী বিদ্রোহী হয়ে যেতে পারে। চৈতন্যের অভি-ব্যক্তি সম্পর্কে এ-যাবত যে-ক্রমবিকাশ তত্ত্ব প্রচার করা হয়েছে, সে-তত্ত্বের অসারত্ব যে-বিপ্লব দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। নয়াবাম মানসিকতায় বিপ্লবের আকস্মিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার চিত্র বিশেষভাবে পরিস্ফুট ৩।

ড্যানিয়েল কোন বেণ্ডিটকে নয়াবামদের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করে নিলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা আজ নিঃশেষিত; রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক পরিবর্তনে পুরনো ধাঁচের আন্দোলনের আজ আর কোনো মূল্য নেই। তাই নয়াবামরা শুধু পার্টিবিরোধী নয়, সর্বপ্রকার সংগঠন বিরোধী। কমিউনিস্ট পার্টি, ট্রেড-ইউনিয়ন বা ঐ জাতীয় গণসংগঠনের প্রতি এদের ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা অতি তীব্র।৪

২। The whole apparatus of sociology — polls, tests and questionaires — was brought to bear, not only by bourgeois scholars but also by socialists, in order to show that the working class had lost its impulse to challenge the status quo. ···We know now that all this speculation is utterly discredited. Advanced capitalist society does not reduce all its citizens into helpless automata, incapable of exercising free and independent action. The well-spring of revolt has not dried up [Ibid Pp 2].

৩। How do we explain this sudden switch of consciousness, this abrupt reversal from acceptance to rebellion, from obedience to mutiny? ···We need a theory of dual consciousness, a theory that can take account of abrupt and unexpected alternations and switches. Just as history shows uneven and confined development, so too does consciousness.

বেণ্ডিট ভ্রাতৃদ্বয়-এর লিখিত, পুস্তকটিতে [অবসলিট কমিউনিজম : দি লেফট উইং অল্টারনেটিভ] বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম, সংগঠন, পরিচালনা ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা আছে। তীব্রতর ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে কমিউনিস্ট ও ট্রেড-ইউনিয়ন নেতাদের প্রতি। ধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিফলিত। বিশ্ববিদ্যালয় একদিকে শিল্পপতিদের অর্ডার মাফিক তাদের মুনাফা অর্জনের সাহায্যকারী হিসেবে তরুণ ছাত্রদের ভেঙে চুরে আমলাতান্ত্রিক ছাঁচে ফেলে যন্ত্রের দোসর এই সমাজব্যবস্থার পরিপোষক ইঞ্জিনীয়ার, মেকানিক, ম্যানেজার, মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, কেরানী দক্ষ শ্রমিক তৈরি করছে; আবার অন্যদিকে একই সঙ্গে এইসব তরুণ-মানসে মানবতাবাদী দর্শন, মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ শিল্প-সাহিত্য ও অনুসন্ধানকারী বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ গড়ে তোলবার চেষ্টাও করছে। এভাবে শোষণ ব্যবস্থার মূল চরিত্র ঢেকে রাখা সম্ভব নয়। শোষণ যন্ত্রের অঙ্গ বিশেষে পরিণত হতে এসে ছাত্রদের অগ্রগামী অংশ শোষণের স্বরূপ বুঝতে পারছে, দুর্নীতি ও বিবেকহীনতার কারণগুলো জানছে। যে-বিশ্ববিদ্যালয় তাকে যন্ত্রাঙ্গ অটোমেটনে পরিণত করতে চাইছে, সেই আবার নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে মুক্তিপ্রয়াসী বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করছে। শোষণযন্ত্র তথা সর্বপ্রকার আমলাতান্ত্রিক সংগঠন ধ্বংস করবার প্রেরণা যোগাচ্ছে। এ-ছাড়া এই নয়াবাম নেতার বক্তব্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম, সংগঠন ও পরিচালনা ব্যবস্থা — কোনোটাই দ্রুত পরিবর্তনশীল দুনিয়ার সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে না। অচলায়তন হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অচল অবস্থার সৃষ্টি করছে। তাই তারা, সংগ্রামী বামরা, শিক্ষা-যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে, বিশ্ববিদ্যালয় দখল করবে।[৫] তাই তারা কারখানার প্রশাসক পদের জন্য নিজেদের তৈরি রাখবে। কিন্তু কিভাবে? স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেদিন হঠাৎ রোষের প্রকাশ ঘটবে, সেইদিনে আকস্মিকভাবে ক্ষমতা দখল কি সম্ভব? এই বামরোষ কিন্তু (যাই বলুন না কেন নিউ লেফট রিভিউ-এর সম্পাদক) আকস্মিক নয়, একে স্বতঃস্ফূর্ত বলা তো চলেই না। ১৯৬৩ সালে

৪। Obsolete communism: The Left Wing alternative, Daniel Cohn Bendit and Gabriel Cohn Bendit.

৫। মানবমন : এপ্রিল জুন ১৯৬৯, পৃষ্ঠা ১৩৪-৩৬।

প্রকাশিত একটি সার্ভে রিপোর্ট ৬ থেকে আমরা জানতে পারি যে, সাত-আট বছর আগেও গ্রেট ব্রিটেনের মতো সংরক্ষণশীল দেশের ছাত্রদের এক অংশের মনে রোষবহ্নি ধূমায়িত হচ্ছে। তারও কয়েক বছর আগে থেকেই শিল্পে সাহিত্যে নাটকে রাগী যুবকদের প্রাধান্য দেখা গেছে। আমাদের দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা ব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ছাত্রদের ক্রোধ প্রকাশ ও বিশৃঙ্খল আচরণ এক দশকেরও বেশি পুরনো। রোষ স্ফুলিঙ্গ আকারে দেখা দিয়েছে বহুপূর্বে, রোষ সঞ্চিত হচ্ছে বহুদিন ধরে। বিশেষ রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবেশে হয়ত দাবানল জ্বলে উঠছে। শুধু ছাত্র নয়, শুধু তরুণ নয়, বয়স-ধর্ম-পেশা নির্বিশেষে সকলেই আজ রুষ্ট। রোষপ্রকাশের সুযোগ-সুবিধা ছাত্রদের বেশি, তাই দল বেঁধে তারা পুরনো সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করছে, সব কিছু ভেঙে ফেলতে চাইছে। এই ধরনের কথা আমরা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির

৬। The second group, forming a minority of a quarter, responded positively to my question : 'Are you angry about something'? but the anger was rather concocted and lukewarm. The answers run as follows :

"I am angry about the way Britain is run"

"I am angry about nothing getting done, about our stagnant society"

"I am angry about the commercialism and materialism of our older generation"...

"I am angry about our educational system"

"I am angry about the H. Bomb"

"I am angry about the present society, it is all wrong"

"There is a lot of good in rebellion of youth"

"I am angry at being treated as a child"

"I am angry against these who are telling me what to do".

(Ferdy and Zweig: The student in the Age of Anxiety—A Survey of Oxford and Manchester Students : (1963)—Pp 129).

মুখে শুনতে পাচ্ছি। কিছু সত্য এই বক্তব্যের মধ্যে আছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু ছাত্ররোষের ব্যাপকতা ও গভীরতার ব্যাখ্যা এই বক্তব্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। সমাজ-বাস্তবের যে-ছবি এঁদের বক্তব্য থেকে ফুটে ওঠে, তা থেকে অনুমিত হয় যে, আমরা এক পরিবৃতিকালীন সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছি। সেই সঙ্কটকালীন অস্থিরতা শুধু ছাত্র-তরুণ নয়, কম-বেশি সব মানুষকেই প্রভাবিত করেছে, এবং ফলে বিশেষ এক মানসিকতার উদ্ভব হয়েছে। "সাধারণ অদীক্ষিত মানুষের মনে এই অবস্থায় সবকিছু তালগোল পাকাইয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। পরিবর্তন এত দ্রুত ঘটিতে থাকে যে মানুষ দিশাহারা হইয়া পড়ে।...যুক্তি-বুদ্ধি ভাব-প্রবণতার মধ্যে লড়াই বাধে। যে-জগতকে চিনিতাম, বুঝিতাম, তাহার রূপরেখা অস্পষ্ট হইতেছে, রঙ মুছিয়া যাইতেছে, অন্য এক জগত নূতন রঙে, নূতন রূপে, নূতন রেখায় ফুটিয়া উঠিতেছে; কিন্তু তাহাকে জানি না, চিনি না, বুঝি না। কোনটি আমার নিজস্ব? পরিবৃত্তিকালীন মনোবৃত্তি অনেকটা জীবন-মৃত্যু সন্ধিক্ষণে রণাঙ্গনে সৈনিকের মনোবৃত্তির সমান"৭ 'নিউ লেফট রিভিউ'-এর সম্পাদক বা বেণ্ডিট ভ্রাতৃদ্বয়কে জানাতে চাই যে এই মানসিকতা দ্বারা তাঁরাও আচ্ছন্ন। প্যারীতে মে মাসের অভ্যুত্থান (?) কোনো বিচ্ছিন্ন, স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা নয়। ধনতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান সঙ্কটের অভিব্যক্তি এই ঘটনা। তাঁরা যে-সব বিপ্লবী তত্ত্ব পরিবেশন করতে চেয়েছেন, সেগুলো ভাববাদী দার্শনিকদের কথা। মার্কসবাদকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে এই ধরনের কার্য-কারণ-সম্পর্ক রহিত অনিশ্চয়তাবাদ, স্বতঃস্ফূর্ততা, আকস্মিকতাতত্ত্ব বহুবার বহুভাবে প্রচারিত হয়েছে,৮ এবং মার্কসবাদীদের দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল

৭। মানবমন, এপ্রিল-জুন ১৯৬৯ পৃষ্ঠা ১৪৫

৮। সম্পাদক (নিউ লেফট রিভিউ) বলছেন :—"This means that we must reject those traditional theories of strategy and tactics which have postulated and emphasised the gradual growth of consciousness. ...It envisages the gradual growth of a mass party, directed phase by phase and step by step by an enlightened vanguard until eventually a moment of crisis is reached and the process culminates in revolution" (New Left Review : op cit : Pp 2-3).

তত্ত্বকথা যথাযথভাবে খণ্ডিত হয়েছে। বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে গিয়ে আমরা যদি অবৈজ্ঞানিক মার্কসবাদ-বিরোধী তত্ত্বকথার উপর আস্থা স্থাপন করে বসি, বিপ্লবের পরিবর্তে প্রতিবিপ্লব ত্বরান্বিত হবে। মার্কসবাদীরা দ্বান্দ্বিক বিচারের সাহায্যে পূর্বাভাষ প্রদানে সক্ষম। পূর্বাভাষ সব সময়ে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে, এমন কথা নয়। তা বলে,ইতিহাসের ধারাবাহিকতা নেই, সবকিছু ঘটছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, চৈতন্যের ক্রমবিকাশ নয় আকস্মিক বিকাশ-তত্ত্বই একমাত্র সত্য ; এই ধরনের একপেশে তত্ত্বকথা সত্য হয়ে উঠবে না। উইলিয়াম এ্যাশ ৯ মার্কসবাদ-বিরোধীদের লক্ষ্য করে যে-কথাগুলো লিখে ছিলেন, সে-কথাগুলো এঁদেরও শোনানো যেতে পারে। যদিও এঁরা, এই নয়াবাম প্রবক্তারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমান করতে সরাসরি নিষেধ করছেন না, বা মার্কসবাদকে প্রত্যক্ষভাবে নস্যাৎ করছেন না, তবুও তাঁদের বক্তব্য মার্কসবাদ-বিরোধিতারই সামিল। সমাজ-ইতিহাসের মার্কসবাদী বিশ্লেষণ থেকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো আভাষ পাওয়া যায় না বলা আর মার্কস-এর ইতিহাস ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করা একই কথা। বিপ্লবের সঠিক দিন-ক্ষণ নির্ণয় করা দুরূহ বটে, কিন্তু বৈপ্লবিক পরিস্থিতি অনুমান করে পার্টির 'স্ট্র্যাটেজী ট্যাকটিকস' ঠিক করা মার্কসবাদীদের পক্ষে সম্ভব। রুশিয়া, চীন, কিউবার ইতিহাস

৯। An empiricism of observation alone, divorced from experimental practice can prove nothing about the future of anything and ascribe its own disability to history's inscrutable nature. Far from being a method for securing tentative social advances, neo-empiricism has become a check on any change at all ; and it betrays its non-materialist character by the utterly sterile and scholastic quality of its formulations by arguing that no prediction can be absolutely correct in every detail and therefore that no major social changes should ever be envisaged, this so called empiricism shows itself to be as static an idealism as the philosophical foundations of Plato's frozen Republic. William Ash : Marxism and Moral Concepts : Pp 116-117)

নয়াবাম-তত্ত্বকে সপ্রমাণ করে না। রুশিয়া, চীনে কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের পরিস্থিতি সঠিক অনুমান করেছিলেন, এবং সুশৃঙ্খলায়িত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন। কিউবাতে কাস্ত্রো এবং তাঁর অনুগামীরা বিপ্লবের পূর্বাভাষ বুঝেছিলেন এবং তাই বিপ্লবকে সংগঠিত করতে পেরেছিলেন। রুশিয়ায়, চীনে, কিম্বা কিউবায় কোথাও পার্টি বা বিপ্লবী দল স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব-তরঙ্গের শীর্ষে আরোহণ করে বিপ্লব সফল করার বাহাদুরি নিতে চাননি। নয়াবামরা যাকে স্বতঃস্ফূর্ত বলে মনে করেছেন আসলে তা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলমান শ্রেণীসংগ্রামের একটা বিশেষ রূপ; মাত্রাগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনে উত্তরণের রূপ। চৈতন্যের বিস্ফোরণ বা আকস্মিক আবির্ভাব ঐ একই কথা। নয়াবামরা যান্ত্রিক এবং ভাববাদী ধারণায় আবিষ্ট। চেতনার আদিরূপেরও ধারাবাহিকতা ও ক্রমবিকাশ আছে। সংবেদন হঠাৎ একদিন আকস্মিকভাবে বস্তুর মধ্যে আবির্ভূত হয়নি। বাইরে থেকেও আরোপিত হয়নি। বস্তুর লক্ষ লক্ষ বছরের অভিব্যক্তি (ইভোলিউশন) ও ক্রমবিকাশের ফলে চেতনার প্রথম পর্যায় সেনসেশন বা সংবেদন ক্ষমতা লাভ করেছে। অজৈব থেকে জৈব পদার্থে উন্নীত হয়েছে। এককোষ প্রাণী ক্রমবিবর্তনের ফলে ক্রমশ মানুষ হয়েছে। নয়াবামরা এই ক্রমবিকাশ, এই নিরবচ্ছিন্নতা, এই ধারাবাহিকতা স্বীকার করতে চান না। এই স্বীকার করতে না চাওয়ার মধ্যে বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। বাইরের সমাজ-বাস্তবের উদ্দীপনা মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করার ফলে ধীরে ধীরে চেতনার সঞ্চার, বিস্তার ও বিকাশ ঘটে— এই কথা স্বীকার করলে অভিজ্ঞতাকে মূল্য দিতে হয়, অগ্রগামীকে শ্রদ্ধা করতে হয়। যুক্তি-বুদ্ধির আধিপত্যকে স্বীকার করলে হঠকারিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না, 'পারমেনাণ্ট রেভোলিউ-শন'কে স্বাগত জানানো যায় না। নয়াবামরা অগ্রগামীদের উপর নানাকারণে শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। মার্কসবাদকে অস্বীকার করতে চাইছেন, কেননা অগ্রগামীরা মার্কসবাদকে বিপ্লবের হাতিয়ার মনে করে এসেছেন ও এখনও মনে করছেন। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্ম-প্রচেষ্টা ও চেতনাশ্রিত উদ্দেশ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন মার্কস। সজ্ঞানে উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনার, এবং পরিকল্পিত কর্ম সম্পাদনের বিধিনিয়মের কাছে নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিতে উপদেশ দিয়েছেন। নয়াবামদের আকস্মিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা তত্ত্বের মধ্যে আমেরিকার ব্যবহারবাদীদের প্রভাব সুস্পষ্ট।[১০] যুক্তিবুদ্ধির পরিবর্তে যান্ত্রিকতার জয়গান অথবা বলা চলে, একেবারে বিপরীত

মেরুতে অবস্থিত গেস্টাল্ট মনস্তত্ত্বের প্রচার বিভাগের ভার নিয়েছেন, এই নবীন বিপ্লবীরা। মার্কসবাদের 'কগনিশান তত্ত্বকে' একসময় এই গেস্টাল্ট তত্ত্ব ভাববাদী দর্শনের তরফ থেকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। বিজ্ঞানী পাভলভ এই 'হঠাৎ জ্ঞানোদয়' বা গেস্টাল্ট তত্ত্বকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা খণ্ডন করেছেন। মার্কসবাদ এর দ্বারা বিশেষভাবে লাভবান হয়েছে।১১

১০। Nominally behaviourism implies the study of the behaviour of animals under the influence of external stimuli. The behaviour of animals and of men too, is said to be the sum total of the body's responses to external stimuli, under whose influence the animal organism engages in purely mechanical exercise. Hence rejection of the conscious activity of animals and men, which is dissolved in the mechanical responses of the organism. There is no indication whatsoever of any activity of the consciousness, or of man's reason. This behaviourist view of psychical activity of animals and men is purely mechanical, oversimple and vulgar (Kursanov G.—Fundametals of Dialectical Materialism : Pp 108—109)

১১। গেস্টাল্টবাদীদের বক্তব্য কি? তাঁরা অখণ্ডতারূপ মতবাদের প্রতিনিধি ও প্রবক্তা। তাঁদের মত হলো, সমগ্র সংশ্লেষিত রূপই হলো বিবেচ্য বিষয়, কোনো বিচ্ছিন্ন প্রকাশ নয়। গেস্টাল্ট শব্দটির অর্থ হলো নক্সা, বিশিষ্ট নমুনা বা প্রতিমূর্তি।···গেস্টাল্টবাদের বিদ্রোহ হলো মনস্তত্ত্বের মৌল সমস্যারূপে বিশ্লেষণ ক্রিয়াকে স্বীকৃতি দেবার বিরুদ্ধে। এই দৃষ্টিভঙ্গীটি ভারী অদ্ভুত, কারণ বিজ্ঞানের সব বাস্তব ও আধুনিক শাখাই বিশ্লেষণ ক্রিয়াকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে থাকে এবং প্রারম্ভিক কাজের সূত্রপাত করে এই বিশ্লেষণকে অবলম্বন করেই। উণ্ডের বিরুদ্ধে অর্থাৎ অনুষঙ্গবাদের বিরুদ্ধ মতবাদ হিসেবেই এই গেস্টাল্টবাদের আত্মপ্রকাশ। সরল পরাবর্ত ও সংবেদন — এ দুটিকেই মেনে নিতে অস্বীকার করছে [মানবমন, জুলাই ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ১২১]। উপরের উদ্ধৃতি আই. পি. পাভলভের "বুধবাসরীয় আলোচনাচক্রের' ১৯৩৪ সালের ২৮শে নভেম্বরের আলোচনা থেকে নেওয়া। পাঠকদের মনে রাখা দরকার সংবেদন ও বিশ্লেষণকে অস্বীকার করার অর্থ বস্তুবাদী মনস্তত্ত্বকে অস্বীকার করা। হঠাৎ চৈতন্যোদয় তত্ত্ব মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী —" লেখক।

মার্কসবাদীরা মনে করেন চৈতন্য-বিকাশ সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। চৈতন্য-বিকাশ অবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে। [১২]

নয়াবামদের বক্তব্য ও কর্মপন্থার বিশ্লেষণে আমি কি একটু বেশিমাত্রায় মার্কসীয় দর্শন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ফেলেছি? তাঁরা কি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে আখ্যাত হতে চান? তাঁদের কাছে এইসব উদ্ধৃতির মূল্য আছে কি? আমার মনে হয়, আছে। নয়াবামদের মধ্যে নানা ধরনের মতবাদের প্রভাব আছে। মার্কস, ট্রটস্কি, মাও, কাস্ত্রো, চে, মারকিউস, — এইসব ব্যক্তিত্ব দ্বারা তারা প্রভাবিত বলে শুনতে পাই। এর মধ্যে এক মারকিউস ছাড়া আর সকলেই মার্কসবাদী বলেই পরিচিত। আমাদের দেশে তো নয়াবামদের এক বৃহৎ গ্রুপ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে নিজেদের প্রচার করেন। সুতরাং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌল এবং সর্বজনস্বীকৃত প্রত্যয়-গুলিকে তাঁরা অগ্রাহ্য করতে পারেন না। সময়োপযোগী করে রণকৌশল, 'স্ট্র্যাটেজি-ট্যাকটিকস' নির্ধারণ করতে পারেন কিন্তু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে নস্যাৎ করতে পারেন না। তাঁরা যদি ঘোষণা করেন যে মার্কসবাদ মৃত বা বর্তমান পরিস্থিতিতে অচল, তাহলে অবশ্য আমার আর বলার কিছু থাকবে না। আমার মনে হয়, পুরনো মার্কসবাদী পার্টিগুলোকে আক্রমণ করার ঝোঁকে, তাঁরা মার্কসবাদকেও আক্রমণ করে চলেছেন। এর দ্বারা প্রতিক্রিয়ার শক্তিই বাড়ছে। নয়াবাম আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করা, শুধু অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা নয়। তাঁরা নিশ্চয়ই গত শতাব্দীর বাকুনিন ও ব্ল্যাংকুই-এর মতো নৈরাজ্যবাদী রোমান্টিসিজমে ও ইউটোপিয়ান কমিউনিজমে বিশ্বাসী নন। কেবলমাত্র চাষী ও লুমপেন প্রলেতারীয় বিপ্লব আনয়নে সক্ষম, আর কেউ নয়, — এই অবাস্তব

১২। Human consciousness develops continuously on the basis of the whole of human social development. It rises gradually to the level of abstract theoretical activity when it takes for its object not only the immediately perceived things, but also their relations. By reflecting the real relations and ties between objects, man identifies himself in the objective world and unlike the animal, comprehends his relation to it (Kursanov G : Fundamentals of Dialectical Materealism. Pp 106).

ধারণা নয়াবামদের সকলে পোষণ করেন না নিশ্চয়ই। মারকুইস দ্বারা এদের সকলেই প্রভাবিত, আমি তা মনে করি না। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক শক্তি নিঃশেষিত, — ১৯৬৮ সালের মে মাসের পর তারা নিশ্চয়ই এরকমটি আর ভাবছেন না। তাঁদের ভুল করে কেউ পেটি-বুর্জোয়া সুলভ রোমান্টিক বা হঠকারী বলুক — এ তাঁরা নিশ্চয়ই চান না। আমেরিকান সরকার, ইস্রায়েল সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভের আন্তরিকতায় কেউই সন্দিহান নয়। নবীনের ধর্ম, তারুণ্যের উচ্ছ্বাসকে আমরা অভিনন্দন জানাতেই চাই, কিন্তু অতি-উৎসাহের ঝোঁকে বিপ্লবের সর্বাত্মক এবং একমাত্র সত্য দর্শনায়ুধকে, মার্কসবাদকে, তাঁরা যদি বিকৃতির প্রলেপে অকেজো করে তোলেন, তবে প্রতিবিপ্লবকে শক্তিশালী করে মৃতপ্রায় ধনতন্ত্রকে তাঁরা আরো বেশ কিছুদিনের জন্য জীইয়ে রাখতে সাহায্য করবেন। তাই তাঁদের মানসিকতা আমরা ভালভাবে বুঝতে চাই, আমাদের মন তাঁদের কাছে মেলে ধরতে চাই। আন্তরিকভাবে পরস্পর পরস্পরকে বুঝতে চেষ্টা করি যদি, নিশ্চয়ই আমরা অনেকখানি কাছাকাছি আসতে সক্ষম হব। "জেনারেশন গ্যাপের" বাধা দুরতিক্রম্য নয়।

এতক্ষণ নয়াবামদের রাজনীতি ও রণকৌশলের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল। এইবার তাঁদের রোষের, মৌলিক কারণগুলো বুঝতে চেষ্টা করব। নয়াবাম মানসিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য পুরনো সব কিছুর প্রতি ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধা। এই রোষ, ঘৃণা, অশ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ কখনও প্রতিবাদ-মিছিলে, কখনও বিক্ষোভ-সভায়, কখনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে, কখনও বা প্রধান-শিক্ষক বা উপাচার্যের কক্ষে। রোষ-বহ্নি হঠাৎ জলে উঠছে, অনেক কিছু ভস্মসাৎ হচ্ছে। কোনো সময় এদের দাবি অযৌক্তিক, কোনো সময় দাবি-দাওয়ার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। দাবি-দাওয়ার যৌক্তিকতা নির্ধারণের চেষ্টা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা শুধু আমাদের দেশের ছাত্রদের মানসিক পরিমণ্ডলে প্রবেশের চেষ্টা করব, সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করব, তাঁদের রোষ ও ঘৃণার সামাজিক-আর্থনীতিক ও পারিবারিক কারণগুলো বিশ্লেষণের চেষ্টা করব। বলা বাহুল্য, এই স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধে বিস্তারিত বিচার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। লেখকের সামর্থ্যও অত্যন্ত সীমিত। এই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে যেসব আঞ্চলিক নিরীক্ষার রিপোর্ট বেরিয়েছে, তার সাহায্য প্রয়োজন মতো আমরা গ্রহণ করব। দুঃখের বিষয়, বস্তুবাদী মনস্তত্ত্বসম্মত আলোচনা

এযাবত আমাদের নজরে পড়েনি, তাই আমরা ক্ষমতার স্বল্পতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ থাকা সত্ত্বেও, এই দুরূহ কাজে এগিয়ে এসেছি। গবেষক-নিরীক্ষকদের কাছে এযাবত অবহেলিত একটি দিক অতি সংক্ষেপে তুলে ধরবার চেষ্টা করব।

ছাত্র-তরুণরা ঐতিহ্যবিরোধী, সবরকম 'অথরিটি, কনফরমিটি'কে আঘাত করতে চায়, সবরকম প্রতিষ্ঠান ভেঙে ফেলতে চায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় গুরুদ্রোহিতা ও অননুগামিতাই এঁদের মানসিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য, এঁদের বিদ্রোহের চালিকাশক্তি। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে এর বিপরীত মনোভাবও এঁদের মধ্যে বিদ্যমান। এঁরা গুরুজনকে অনেক ক্ষেত্রে অনুকরণ করছেন, তাঁদের মতোই আচরণ করে তাঁদের প্রতি আনুগত্য, অনুগামিতার পরিচয় দিচ্ছেন। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে কর্পোরেশন, বিধানসভা, লোকসভায় ছাত্র-তরুণদের পিতৃ-পিতৃব্যরা যে-ব্যবহার, যে-আচরণের নজির দেখিয়েছেন ও দেখাচ্ছেন, সেই বিশৃঙ্খলা, সেই নিয়ম-অননুবর্তিতাই তাঁরা তাঁদের রাজ্যে প্রদর্শন করছেন। পিতৃ-পিতৃব্যকে যেসব কাজের জন্য তাঁরা শ্রদ্ধা করতে পারছেন না, সেইসব কাজ, সেইরকম ব্যবহার করেই তাঁরা তাঁদের রোষ ও ঘৃণা প্রকাশ করতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। গত কয়েক বছরের শিক্ষকদের আন্দোলন, ব্যবহার ও আচরণে কি 'ডিসিপ্লিন' প্রদর্শিত হয়েছে? এই অবস্থায় শিক্ষক অভিভাবকরা ছাত্রদের কাছে নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য আশা করতে পারেন কি? উত্তরে তাঁরা বলবেন, শাসক ও শোষক সম্প্রদায়ের অনমনীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে নিজেদের নিম্নতম দাবি-দাওয়ার জন্য তাঁদের লড়াই করতে হচ্ছে এবং হবেই। এর জন্যে যদি পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা না হয়, নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়, দায়ী সংশ্লিষ্ট অথরিটি। প্রতিবাদ করব না, করবারও কারণ দেখি না। রোষ প্রকাশ করে, বিশৃঙ্খল আচরণ করে তাঁরা আংশিক ভাবে তাঁদের দাবি-দাওয়া আদায় করেছেন। ছাত্ররাও ঠিক সেই পথই বেছে নিয়েছে[১৩] কর্তৃপক্ষ মাত্র একটি ভাষাই বোঝেন,— রোষের এবং

১৩। ......As students have been succeeding in most of their indisciplined adventures, it has been proved to them that their methods are right. This is heady wine indeed and they are intoxicated by their power against confused and vacillating authorities (Cormach Margarett : She who rides a Peacock ; Indian Students & Social Change — a research analysis, Asia Publishing, 1961-Pp 210).

ঘৃণার ভাষা; সেই ভাষাতেই বিবদমান পক্ষগুলির মধ্যে সংলাপ চলেছে। কর্তৃপক্ষ মাত্র এক ধরনের আচরণের কাছেই নতি স্বীকার করেন, কাজেই বিধানসভা, লোকসভায় বিরোধী দল সেই আচরণে অভ্যস্ত হয়েছেন; ছাত্ররাও অনমুগামিতার পরিচয় দিচ্ছেন। অনুগামিতা, অননুগামিতা, গুরুবশ্যতা, গুরুদ্রোহিতা একই সঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছে ছাত্রদের মনে। এই দ্বৈত মনোভাবের নিদর্শন দেখতে পাই শিক্ষায়তনের সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট কার্যকলাপেও। একদিকে মাও, মার্কিউস, অথবা গুয়েভারার বাণী নির্দেশের প্রতি নির্বিচার আনুগত্য ও বশ্যতা, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠিত পার্টি, দেশীয় সরকার, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্রোহ-মগ্নতা। সমাজবাস্তবে এই দ্বৈত-মানসিকতার কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। মার্কসবাদী নিরীক্ষক ছাড়া অন্য কারো পক্ষে বোধহয় সঠিক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

সমীক্ষক-নিরীক্ষকরা আমাদের দেশের ছাত্র-বিশৃঙ্খলার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে শিক্ষা ও পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি এবং পাঠ্যক্রমের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সে-গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। আমরা অন্য একটি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। একটি তথ্যসমৃদ্ধ নিরীক্ষা [ফিল্ড স্টাডিজ ইন দি সোসিওলজি অফ এডুকেশন — ১৯৬৫-৬৬] থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে শিক্ষকদের কাছে ছাত্রদের প্রত্যাশা পরিপূরিত হচ্ছে না।[১৪]

আর একজন সমীক্ষক আরো স্পষ্ট ভাষায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ক্রমাবনতির কথা বলেছেন।[১৫] এই ক্রমাবনতি ছাত্র-মানসে অসহায়ত্বের

১৪। According to majority of the students, teachers should behave as second parent. However, it can be easily assumed that this expectation of the students is not to be fulfilled as the system goes at present. So this image of the students regarding their teachers is bound to fall to pieces [Field studies in the sociology of studies: R. Mukherjee, S. Bandopadhyaya and K. Chattopadhyaya: Pp 165]

১৫। Indian education has always rested on rote-learning (we have found few instructors who even question this method), but it also had the "guru"—the master-teacher who

ভাব আনয়ন করে। সে নিরাপত্তার অভাব অনুভব করে। উৎকণ্ঠা উদ্বেগ তাকে হয় বিমর্ষ কিম্বা অস্থির করে তোলে। শিক্ষায়তনের গুরুর উপর স্বাভাবিক নির্ভরতা ভেঙে পড়ার ফলে অতি সহজেই অন্য ক্ষেত্রে অন্য গুরুর উপর নির্ভর করে নিরাপত্তার অভাব দূর করতে চায়। সে-গুরুও হয়ত বেশিদিন তার আদর্শের প্রতিমূর্তি হয়ে থাকতে পারেন না। গুরুর ইমেজ ক্রমশ মন থেকে লোপ পায়। গুরুদ্রোহিতা এবং ঐতিহ্যের প্রতিমা ভাঙার প্রবণতা তাকে পেয়ে বসে। কর্তৃপক্ষ, এমনকি মাতা-পিতাও অনেক সময় তার এই মানসিক দ্বন্দ্ব-বিরোধের খবর রাখেন না। তাঁরা তার আচরণে বিশৃঙ্খলা-বিক্ষোভের প্রকাশ দেখে নিজেরা রুষ্ট ও শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। উপদেশামৃত বর্ষণে ফল না পেয়ে তাঁরা হয়ত জোর করে ডিসিপ্লিন আনতে চেষ্টা করেন। ছাত্রের জেদ ও রোষ বাড়তে থাকে। তারপর একদিন ঘটে ট্রায়াল অফ স্ট্রেংথ। পিতা-মাতা-শিক্ষক কর্তৃপক্ষ সমস্বরে যুগ-প্রবণতা ও রাজনৈতিক পার্টিগুলোর প্রতি দোষারোপ করতে থাকেন; সন্তানরা-ছাত্ররা আরো জোরগলায় সবকিছু ভেঙে চুরে 'জমানা' বদলে দেবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত, অনেক টালবাহানার পর বিশৃঙ্খল আচরণ ও শক্তিমত্ততার কাছে কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকার করেন। ছাত্র-তরুণ শক্তি-মদে আরো মত্ত হয়ে ওঠে। তাদের কাছে বন্দুকের নল এখন একমাত্র নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তাদায়ী। ট্রাংকুইলাইজার হয়ে ওঠে এবং জমানা বদলাবার একটি মাত্র

was a personal mentor and "father" to a small number of students. A student identified with his guru, with his chosen master, in all life values.

The system of higher education in India is basically a "lecture-examination" system,···has discarded the tutorial system inherent in both the English and the ancient Hindu system. What is now termed "tutorial" in some institutions is mere token of the principle······

Any system that is "impersonal," rather than "personal" tends to become mechanized. Few human beings enjoy being units in a sea of anonymity···It is difficult to move from the intimate warmth of the family to a large and cold institution···[Cormach Margarett: She who rides a peacock, Pp 194.]

পন্থার উপর তাদের আস্থা আরো বৃদ্ধি পায়।[১৬] মার্গারেট করম্যাক, অন্যান্য সমীক্ষকদের মতো ট্রানজিশনাল বা পরিবৃত্তিকালীন সঙ্কটের কথা তুলেছেন। কিন্তু তিনি সঙ্কটকে ঐতিহ্যিক সমাজ থেকে আধুনিক শিল্প-সমাজে উত্তরণের সমস্যা বলে শুধু মনে করেছেন।[১৭] যৌথ পরিবারের মধ্যে যে-নিরাপত্তাবোধ ও উষ্ণতার স্পর্শ ছিল, তার অভাবে আজকের ছাত্র-মানস বিশেষভাবে পীড়িত। তাদের পারিবারিক আনুগত্য ভেঙে গেছে, আবার গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ ও গণতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব তাদের মধ্যে বিকশিত হবার অবকাশ পায়নি। তাই তারা দোদুল্যমান, অস্থির, অশান্ত। আনুগত্য ও বিদ্রোহের সংঘাতে বিচ্ছিন্ন এবং খণ্ডিত। দায়িত্ববোধ, দায়িত্বপালন, ব্যক্তি স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা, সব বিষয়েই তারা, পিতৃ-পিতৃব্য-শিক্ষক-কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য ও অজ্ঞতার দরুণ, অনভিজ্ঞ রয়ে গেছেন। জ্যেষ্ঠরা তাদের বিশ্বাস করেননি, করছেন না, কাজেই তারাও জ্যেষ্ঠদের উপর বিশ্বাস হারিয়েছে।[১৮] এই প্রসঙ্গে সমীক্ষক "ঈদিপাস কমপ্লেক্সের" কথা টেনে এনে অযথা ব্যাপারটাকে ঘোলাটে করে তুলেছেন। সমাজ-বাস্তবের কথা ভুলে গিয়ে মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তর্জাত জৈব-প্রবৃত্তির প্রভাবের উল্লেখ করেছেন। ষোলো থেকে উনিশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের কিশোর আপনা থেকেই নাকি পিতৃবিদ্রোহী হয়ে ওঠে।[১৯] কিশোরের অপরিণত মন এই বয়সে পরিণত হয়, তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত হয়। ভারতীয়

১৬। It seems clear that the current older generation is not helping youth with their problems of entering a new age. In fact the older generation is baffled by youth, and as their voices grow shriller the eruptions of indiscipline become more serious (Ibid Pp 211).

১৭। The psychology of youth should be considered in any analyses of changes from traditional to modern life (Ibid)

১৮। Modes of obedience and loyalty to superiors, functional to a vertical hierarchical society, are not acceptable to those moving into a competitive and more horizontal society. But modes of "responsibility" and "trust" necessary to the latter type of society, are as yet neither operation nor understood (Ibid Pp 210).

১৯। ...Some small pieces of research in India indicate the Oedipus complex in boys of the age of 12 or 13, the adolescent "declaration of independence" or "anti-authority" period at 16-19. These periods are both manifestations of early concept of self (Ibid Pp 206)

কিশোর আগেকার চেয়ে অনেক অল্প বয়সে মানস-পরিণতি লাভ করে —এই পর্যবেক্ষিত তথ্যকে তিনি 'ঈদিপাস' ইত্যাদি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। সঙ্কট-কালীন বিশেষ অবস্থার জন্যই যে-কিশোর বাস্তবমুখীন হয়ে উঠেছে, এই সহজ সত্যটি তিনি ধরতে পারেননি। কারণ, পরিবৃত্তিকালীন সঙ্কট সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব অপরিণত ও অস্পষ্ট ধারণা। ঐতিহ্যিক থেকে আধুনিক শিল্প-সমাজে উত্তরণের সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি, শুধু এইভাবে দেখলে ভারতীয় ছাত্রের মানসিকতা ও ব্যবহারের সম্যক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। আরো বহুতর সমস্যাজর্জরিত সমাজ-মানস ব্যক্তি-মানসকে প্রভাবিত করছে। সরকারী পরিকল্পনার আংশিক ব্যর্থতা, তদ্দরুণ বেকারী, অন্যান্য আর্থিক সমস্যা, উন্নয়নের সমস্যা, আন্তর্জাতিক সমস্যা — যথা তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধ-ভীতি, যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম-কাম্বোডিয়ায় আগ্রাসন নীতি, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট শিবিরে বিভেদ-বিরোধ — ইত্যাদি নানারকম সমস্যাভারে ছাত্র-মানস পীড়িত ও ক্ষুব্ধ।

অভীপ্সা ও অভীষ্ট-সিদ্ধির মধ্যে যে-দুস্তর ব্যবধান দেখা দিয়েছে, সেই ব্যবধানকে ছাত্র-তরুণ কিছুতেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। আজ মানুষ চাঁদের পিঠে পদার্পণ করেছে, কাজেই বিষম সমাজ-ব্যবস্থার দরুণ বিড়ম্বিত প্রত্যাশার বেদনায় সে অধীর হয়ে উঠেছে। এ-পরাজয় সে সহ্য করবে না। তরুণ মানস জেট প্লেনের গতিতে এগিয়ে যেতে চাইছে, আর পার্টি-প্রতিষ্ঠান শম্বুকগতি-পরিকল্পনার পাণ্ডুর আলেখ্য তার সামনে তুলে ধরছে। আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার, স্থবিরত্ব, দীর্ঘসূত্রতা এবং সর্বোপরি বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে সে জ্যেষ্ঠদের অভিযুক্ত করতে চাইছে এবং ক্রোধে ফেটে পড়ছে। তার রোষ অনেক স্থলে হয়তো যুক্তিহীন কিন্তু তরুণ মানসে যুক্তির থেকে আবেগের প্রভাব অনেক বেশি এ-কথা ভুললে চলবে না।

ইয়োরোপ-আমেরিকা দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের সম্মুখীন। সমাজতান্ত্রিক ভারতও সেই শিল্প-বিপ্লবের শরিক হতে পারে। প্রতিক্রিয়া-চক্রান্ত পৃথিবীর অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে, শিল্প-বিপ্লব ঘটতে দিচ্ছে না। এই শিল্প-বিপ্লব দুনিয়ার চেহারা পালটে দেবে, প্রাচুর্যের পৃথিবী নিয়ে আসবে। কিভাবে সাম্রাজ্যবাদের অক্টোপাশী আলিঙ্গন থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করে নতুন সভ্যতার ভিতপত্তন করা যায় — এইসব নানা সমস্যায় আজকের ছাত্র-মানস ভারাক্রান্ত। এইসব মিলে আজকের সঙ্কট। এই সঙ্কটে ছাত্র-তরুণ দিশেহারা। কে দেবে সেই সোনার কাঠির বা পরশ পাথরের সন্ধান, যার ছোঁয়া লেগে সব সোনা হয়ে যাবে? কে দেবে সব থেকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথের সন্ধান? কার কাছে আছে সেই চাবি যা দিয়ে নতুন সভ্যতার নতুন সমাজের সিংহ-দরোজা একবার চেষ্টা করতেই খুলে যাবে? ছাত্র-মানস এই সব চিন্তাতে অস্থির, কম্পমান। কিশোর মনে অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা। তাই তাকে প্রলুব্ধ করা সোজা, তাকে বিভ্রান্ত করা কঠিন নয়।

ভারতের কৃষি-সম্পর্ক বিশ্লেষণে লেনিন-নির্দেশিত পথ

ভবানী সেন

মার্কসবাদের তত্ত্ব-ভাণ্ডারে লেনিনের অবদান পশ্চাৎপদ উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলির কৃষক-আন্দোলনের পথকে আলোকিত করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লেনিন যখন মার্কস-এঙ্গেলস প্রদর্শিত পথে ঐ বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করছিলেন তখন ভারতবর্ষের কৃষক ও গ্রামীণ গরীবেরা বৃটিশ শাসনে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। প্রথম দিকে ডিগবী ও গণেশ দেউসকর অমানুষিক বৃটিশ শোষণের মূল অর্থনৈতিক তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। আর, রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রামীণ মানুষের শোচনীয় অবস্থার কথা তাঁর দুই খণ্ডে রচিত 'Economic Histoiy of British India'তে বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছিলেন।

'শ্রেণী' সম্পর্কে ধারণা এবং সমাজ-ইতিহাসের ধাপগুলি তখনও ঠিকমতো উপলব্ধি করা হতো না; গ্রামীণ গরীব ও কৃষক সম্প্রদায়কে সাধারণভাবে গ্রামীণ 'জনগণ' হিসাবে চিহ্নিত করাই তখনকার রীতি ছিল। ভারতের গ্রামীণ-সমাজ, জমিদারী প্রথা ও রায়তওয়ারী ব্যবস্থা সম্পর্কে মার্কস-এর ধ্যান-ধারণা এ-দেশে তখনো পর্যন্ত অজানা ছিল। নীল-বিদ্রোহ এবং সাঁওতাল-বিদ্রোহ পর্যুদস্ত হবার পর সাধারণভাবে কৃষক জনগণকে 'লক্ষ লক্ষ মূক' জনগণ রূপেই দেখা হতো।

এমনকি, গান্ধীর নেতৃত্বে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হলো তখনো নতুন কংগ্রেস কৃষিজীবী শ্রেণীগুলির বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক অর্থনীতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো না। অথচ ঠিক সেই সময়েই প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে, লেনিন ও বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রুশদেশে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মানব-ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। সেই থেকে কৃষক সমস্যাবলী ও গ্রামীণ গরীবদের ভূমিকা সম্পর্কে লেনিনের অমর চিন্তাধারা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় চিন্তায় প্রভাববিস্তার করতে শুরু করল। এর ফলে, গতিশীল নতুন শক্তিগুলির

পথ খুলে দিয়ে নতুন কৃষক-আন্দোলনের সূত্রপাত হলো। বিশের দশকের মধ্যভাগে ভারতের শ্রমিক-কৃষক পার্টির জন্মে এবং ঐ একই সময়ে বিপ্লবী কৃষক-আন্দোলনের সূচনায় এই সমস্যাবলীর উপর লেনিনের অমর চিন্তাধারার প্রথম স্বাক্ষর মুদ্রিত ছিল। রাশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে ও দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন পর্যবেক্ষণ করে লেনিন কৃষক-আন্দোলন, কৃষি-বিকাশের স্তর ও সমাজতন্ত্রের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে সাধারণীকৃত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

২

লেনিনের মতাদর্শ ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামীদের নিকটে পৌঁছবার আগে শুধুমাত্র বৃটিশ শাসন ও তার শোষণের সাধারণ চিত্রই অস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল। অবশ্য জমিদারদের অত্যাচার একেবারে তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কৃষকদের স্বাধীনতার অভাব, অসম্মান ও দুর্ভাগ্য, বিশেষভাবে তফসিলী সম্প্রদায়-গুলির প্রতি সামাজিক অসাম্য এবং বর্বরোচিত অবিচার, যা এখনো চলেছে, তা ঐতিহাসিকভাবে বাতিল হয়ে যাওয়া সমাজ-কাঠামোর বৈশিষ্ট্যরূপে অনুমিত হয়নি। সাম্রাজ্যবাদীরা সেইগুলিকেই তাদের শাসনের ভিত্তি হিসাবে স্থিতিশীল রাখতে সচেষ্ট ছিল। কেবলমাত্র মার্কস-এঙ্গেলস-এর চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করে লেনিনের মতাদর্শ জানার ও ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে তা বিচার-বিশ্লেষণ করার পরই একটি সমাজ-শ্রেণী এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সহযোগীরূপে ভূস্বামীরা চিহ্নিত হয়েছিল।

"ভূমি সম্পর্কে সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষ" এই কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। সরকারীভাবে এটা স্বীকৃত যে, স্বাধীন ভারত বৃটিশ শাসন থেকেই "সামন্ত-তন্ত্রের ভগ্নাবশেষ" উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছে, যা বিভিন্ন কৃষি-সংস্কারের পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে নিশ্চিহ্ন করার ব্যর্থ চেষ্টা হচ্ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রূপে সামন্ততন্ত্র ছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সংস্কারের আগে রাশিয়ার ভূমিদাসপ্রথা সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন :

"ভূমিদাস প্রথায় ভূস্বামীদের অনুমতি ব্যতীত কৃষকেরা বিবাহ করতে পারত না...।" "ভূস্বামীদের নায়েব-গোমস্তা (বেলিফ) কর্তৃক নির্ধারিত দিনে কৃষককে তার মালিকের জন্য কাজ করতে হতো।" "ভূস্বামীর অনুমতি ব্যতীত কৃষক তার গ্রামের বাহিরে যেতে পারত না...।" (গ্রামীণ গরীবদের প্রতি—লেনিন)

১৮৬১ সালের সংস্কারের পরও যে এই ভূমিদাসপ্রথার অবশেষ রাশিয়াতে ছিল তা নির্দেশ করে সংস্কার-পরবর্তী রাশিয়ায় সামন্ততন্ত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন :

"ইউরোপীয় রাশিয়ায় এক কোটি পাঁচ লক্ষ কৃষক-পরিবারের আওতায় ছিল সর্বমোট ৭৫,০০০,০০০ ডেসিয়াটিন জমি। প্রধানত অভিজাত সম্প্রদায়, অংশত হঠাৎ গজানো ভুঁইফোড়, ত্রিশ হাজার ভূস্বামীর প্রত্যেকের ৫০০ ডেসিয়াটিনের উর্ধে জমির মালিকানা ছিল, সাকুল্যে তাদের ছিল ৭০,০০০,০০০ ডেসিয়াটিন জমি। রাশিয়ার কৃষিব্যবস্থায় সামন্ত-ভূস্বামীদের প্রাধান্যের এগুলিই প্রধান কারণ। এরই ফলে সাধারণভাবে রাশিয়ার রাষ্ট্র এবং সমগ্র সমাজ-জীবনে এদের প্রাধান্য ঘটেছিল। লাতিফানদিয়ার মালিকেরা অর্থনৈতিক ধারণার দিক থেকে সামন্ত জমিদার। তাদের ভূমি-মালিকানার ভিত্তি সৃষ্টি হয়েছিল ভূমিদাসপ্রথার ইতিহাস থেকেই, শতাব্দীকাল ধরে অভিজাত সম্প্রদায় কর্তৃক ভূমি-গ্রাসের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে। তাদের বর্তমান চাষাবাদ পদ্ধতির ভিত্তি ছিল শ্রম-খাজনা ব্যবস্থা, অর্থাৎ ভূমিদাস-শ্রমকে সরাসরি জীইয়ে রাখা। এর তাৎপর্য হচ্ছে, ছোট ছোট কৃষকদের যন্ত্রপাতি দিয়েই অজস্র কায়দায় জমি চাষ করা, যেমন : শীতকালে ভাড়া-ভিত্তিতে কাজে লাগানো, বার্ষিক লীজ, শতকরা ৫০ ভাগের ভিত্তিতে ভাগচাষ, শ্রম-খাজনা, ঋণের জন্য বাঁধা পড়ে থাকা, সরেস জমির জন্য দাসত্ব-বন্ধন, অরণ্য ব্যবহারের জন্য, গোচারণ ভূমির জন্য, জলের জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি অন্তহীন নানা বন্ধন। ('প্রথম রুশ বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্রাসীর কৃষি-কর্মসূচী'। Alliance of the working class and peasantry পৃষ্ঠা ১৬৬ দ্রষ্টব্য।)

লেনিনের এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি প্রদানের কারণ হলো "জমির ব্যক্তিগত মালি-কানার সুযোগে অ-অর্থনৈতিক বাধ্য-বাধকতার দ্বারা শোষণ" এই রকম সরলী-কৃত সংজ্ঞার দ্বারা সামন্ত-সম্পত্তির সম্পর্ক ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের কৌশল সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য করে তোলা যায় না। উপরোক্ত বর্ণনায় লেনিন রাশিয়াতে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের কত অসংখ্য নির্দিষ্ট প্রকরণ-পদ্ধতি ছিল কিংবা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অতীতে ছিল অথবা এখনো আছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন।

এই বর্ণনা এ-দেশে বৃটিশ শাসনে অনুরূপ অবস্থার কথা এবং যা দেশের বিভিন্ন অংশে কৃষিজীবী জনসাধারণের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এখনও বর্তমান তার

কথা পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেবে। প্রকৃত চাষীর জমিতে কোনোও স্বত্ব ছিল না। খাজনার কোনোও অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল না। কেবলমাত্র তা জমির একচেটিয়া মালিকানার সুযোগে নিংড়ে নেওয়া হতো। বৃটিশ শাসনে ভাগচাষ, বেগার প্রথা (যথা, বিনা-মজুরীতে শ্রম, বাধ্যতামূলক শ্রম) ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, যদিও বিভিন্ন সময়ে কৃষক-আন্দোলন বা কৃষক-বিক্ষোভের ফলে প্রজাস্বত্ব আইনের দ্বারা তার কিছু কিছু সংশোধনও ঘটতো। ১৯৪৭ সালে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন, ১৯৫০ সালের প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা এবং ১৯৫৫ সালের কৃষি-সংস্কারের সূত্রপাতের পরেও কিন্তু মধ্যযুগীয় শোষণের দিন শেষ হয়ে যায় নি; তার ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত জাতি-উপজাতিরা এখনও অস্পৃশ্যতা, ঋণ-দাসত্ব, বাধ্যতামূলক মজুরী-খাটা ইত্যাদি নানা প্রথায় নাগরিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। এক সময়ে গ্রামীণ গরীব সম্প্রদায়ের সমস্ত অংশই এই সব অসম্মানের অংশভাগী ছিল, কিন্তু বৃটিশ রাজত্বেও ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে এর কিছু ক্রমপরিবর্তন ঘটেছে। তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত জাতি ও উপজাতির মধ্যে তা আজও রয়ে গেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্বরতম পন্থায় অস্পৃশ্যতা আজও বিরাজমান। অনেক সময় তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির মানুষদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যাও করা হয়। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য সৃষ্ট আইন অকেজো হয়ে আছে। এই তফসিলীভুক্ত জাতির বেশির ভাগ মানুষই ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক, এমনকি এদের নিজস্ব বাস্তুভিটাও নেই। তারা অ-তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষি শ্রমিকদের চেয়েও বেশি নির্যাতিত।

উপজাতীয় জনগণের অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। উপজাতিদের মালিকনাধীন জমি সংরক্ষণের জন্য সৃষ্ট আইন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, বিশেষত অন্ধ্র, বিহার, ত্রিপুরা এবং উড়িষ্যায় প্রয়োগ করা হয়নি। উপজাতি জনগণের অর্থনীতিতে অর্থগৃধ্নু মহাজনদেরই প্রাধান্য; এরা ঋণ-জর্জর উপজাতিদের অসহায়তার সুযোগে তাদের জমি গ্রাস করে থাকে।

সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-পদ্ধতির ভগ্নাবশেষ অব্যাহত আছে, কারণ, গ্রামীণ গরীব সম্প্রদায় প্রচণ্ড বেকারীতে জর্জরিত। এবং তার সঙ্গে এক নতুন ধরনের বেকারীর মধ্যে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের সম্প্রসারণও প্রতিফলিত হচ্ছে। দেশের মোট বেকারের সংখ্যা প্রতিবৎসর বেশ কয়েক লক্ষ করে বেড়ে চলেছে। খসড়া চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের বাড়তি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা

আছে ; অথচ এই পরিকল্পনাকালে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ২ কোটি ১০ লক্ষ ; উপরন্তু এই পরিকল্পনা শুরু হবার সময়ে ২ কোটি ৭০ লক্ষ বেকার ইতিমধ্যেই রয়ে গেছে। সুতরাং যদি চতুর্থ পরিকল্পনা তার লক্ষ্যে পৌঁছেও যায় তবুও পরিকল্পনা শেষে বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ। ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী দেশের মোট কর্মী জনসংখ্যার শতকরা ৬৯.৫ ভাগই কৃষিশ্রেণীভুক্ত (কৃষি-শ্রমিক সহ) এবং তার মধ্যে শতকরা ২০ ভাগই 'প্রচ্ছন্ন' বেকার। এর দ্বারা উপরোক্ত ৩ কোটি ৩০ লক্ষ বেকারের সঙ্গে আরও ২ কোটি ৬০ লক্ষ প্রচ্ছন্ন বেকার যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-সম্পর্ক অব্যাহত রাখার শক্তির উৎস এই বিপুল সংখ্যক বেকারী, একই সঙ্গে, শ্রম-বাজারের সম্প্রসারণের দ্বারা ধনতান্ত্রিক বিকাশেরও এটা ভিত্তিভূমি। সুতরাং সামন্তবাদের ভগ্নাবশেষ ও উৎপাদনের ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশ পরস্পর অন্তর্গ্রথিত হয়ে গ্রামীণ গরীব জনগণের জন্য তা একই দুর্ভোগ সৃষ্টি করছে।

৩

জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পর কংগ্রেস শাসনে সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষ বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল। সরকারের ঘোষিত নীতি ছিল :

১। রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে জমিদারী ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপসাধন।

২। (ক) খাজনা স্থিরীকরণ

(খ) জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্টকরণ

(গ) জমির সর্বোচ্চ মালিকানা বেঁধে দেওয়ার ফলে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ

(ঘ) জোতের একত্রীকরণ এবং সেবা সমবায় প্রতিষ্ঠা সহ প্রজাস্বত্ব প্রথার সংস্কার।

প্রচুর ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাসহ মধ্যস্বত্ব লোপ আইন প্রবর্তিত হয়েছে এবং এর দ্বারা দুই কোটি প্রজাকে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় আওতায় আনা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে ১৯৬১ সালে ২.৭৫ শতাংশেরও কম মালিক ও ভোগদখলকার পরিবার অ-রায়তওয়ারী (মধ্যস্বত্বভোগী) স্বত্বভিত্তিক ছিল।

১৭, ১৮০,০০০ হেক্টর চাষযোগ্য পতিত জমির ভিতর ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে বিতরিত হয়েছিল মাত্র এককোটি একর জমি।

উত্তর প্রদেশে দৈহিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি ব্যতীত মালিক স্বত্ব ফিরে পাবে না, সমস্ত প্রজাস্বত্বের ক্ষেত্রে এই আইনগত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রজা ও বর্গাদারদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা আছে, যদিও বাস্তবে তা অ-ব্যবহৃত। অন্যান্য রাজ্যেও স্বত্বের পুনঃগ্রহণ কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মঞ্জুর করা হয়েছে। কেবলমাত্র কেরোলাতেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে চাষে নিযুক্ত প্রজাদের স্ব-স্ব অধিকারের কর্ষণযোগ্য জোতে একতরফাভাবে মালিকানা ঘোষিত হয়েছে।

সকল রাজ্যেই আইনের দ্বারা খাজনা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। আইনের দ্বারা গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, দিল্লী, গোয়া, দাদরা এবং নগর-হাবেলীতে উৎপাদনের এক-ষষ্ঠাংশ খাজনা বিধিবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। আসাম, বিহার, কেরালা, মহীশূর, উড়িষ্যা, অন্ধ্র-প্রদেশের তেলেঙ্গানা অঞ্চল, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং কোনো কোনো কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে এটা উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ। অন্ধ্র-প্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর, তামিলনাড়ু, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, হিমাচল-প্রদেশ এবং পশ্চিমবাঙলায় বিধিবদ্ধ (statutory) খাজনা কিছুটা বেশি। দিল্লী, মণিপুর এবং ত্রিপুরায় প্রজাদের খাজনা মালিক কর্তৃক দেয় ভূমি-রাজস্বের চারগুণের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

খাজনা তিন প্রকারের, যথা: শ্রম-খাজনা, উৎপাদন-খাজনা ও টাকায়-খাজনা। মার্কস ও লেনিনের মতে শেষোক্তটি হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক খাজনার নিঃশেষপ্রায় (dissolving) রূপ। সংস্কারের পরও ভারতবর্ষে টাকায় প্রদত্ত খাজনাকে এখনও সার্বজনীন করা হয়নি; অথচ কোনো কোনো অঞ্চলে কোনো কোনো ভূমি কর্ষণকারীদের মধ্যে ইজারা প্রদত্ত জমির খাজনা রূপে শ্রম খাজনা (বেগার), অর্থাৎ মালিকের বিশেষ জমিতে অবৈতনিক শ্রম আজও চালু আছে। ভাগচাষীরা যা দেয় তা উৎপাদন-খাজনা। এটা বিশুদ্ধ সামন্ত' খাজনাও বটে। সংরক্ষিত প্রজারা আইনের দ্বারা নির্ধারিত টাকায় খাজনা দিয়ে থাকে, এর মধ্যে ধনতান্ত্রিক ভূমি-খাজনার (ground rent) উপাদান কিছুটা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। আইনে এখন জমির মালিকরা প্রাপ্ত খাজনার জন্য রসিদ দিতে বাধ্য। এটা নিম্নতম ধাপের প্রজাদের ক্ষেত্রে এর আগে প্রযোজ্য ছিল না।

ভূমিহীনদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিলির এবং প্রজাদের ভূমির স্বত্বাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে প্রায় ৩০ লক্ষ প্রজা ও ভাগচাষীর জন্য মালিকানার ব্যবস্থা করা

হয়েছে ও ২০ লক্ষ একরের বেশি উদ্বৃত্ত জমি হস্তগত করে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলি তার প্রায় অর্ধেক ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। কিন্তু ভূমির স্বত্বাধিকারী অধিকাংশ কৃষক কোনও ভূস্বামীর পরিবর্তে রাষ্ট্রকেই ভূমিরাজস্ব দিয়ে থাকে।

কয়েকটি রাজ্যে জোত-জমি একত্রীকরণের ব্যাপারে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। তিন কোটি একর জোতের একত্রীকরণ হয়েছে এবং চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ একর জোত।

সামন্ততান্ত্রিক অবশেষ-এর স্থানে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ প্রস্তুত করার কয়েকটি উপায় হলো মধ্যস্বত্বের বিলোপসাধন, জোত জোটবদ্ধকরণ, খাজনার হ্রাস, ভোগদখল স্বত্ব স্থিরীকরণ ইত্যাদি। কংগ্রেস কর্তৃক অনুসৃত আপোষের পথে ইতিহাসের বর্তমান সন্ধিক্ষণে ধনতন্ত্রবাদের দেউলিয়াপনাই প্রতিফলিত, এই পথ আধা-সামন্ততান্ত্রিক গলাটিপে ধরা ভূমি-সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখার মরীয়া প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণভাবে দূর করতে সক্ষম হয়নি, যদিও তা খর্বিত ও শিথিল হয়েছে।

জমির ইজারা দুই ভাবে দেওয়া হয়। প্রথমত, গরীব চাষীরা বিত্তবান চাষীদের ইজারা দেয়, এরা ভাড়াকরা শ্রমিক নিয়োগ করে চাষ করে; দ্বিতীয়ত, ধনী জমির মালিকগণ গরীব চাষীদের অস্বাভাবিক বেশি খাজনায় জমি ইজারা দেয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কেরই ভগ্নাবশেষ। ঐ ধরনের প্রজাদের (প্রজাস্বত্ব প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য হতে পারে) শতকরা ৮২ ভাগই স্বত্বের ব্যাপারে কোনোও নিরাপত্তা ভোগ করে না, বাস্তব ঘটনার দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়। অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, তামিলনাড়ু, বিহার, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিমবাঙলায় এটা খুবই প্রচলিত।

কংগ্রেস সরকারের নতুন কৃষি-সম্পর্কিত ব্যবস্থাদির সঙ্গী হয়েছে ব্যাপক কৃষক উচ্ছেদ এবং তা কৃষকদের বিপুল সংখ্যায় উচ্ছেদও করেছে। এটা তিন প্রকারে ঘটেছে: (১) আইনের ছিদ্রপথে উচ্ছেদ। আইনে জমির মালিককে 'ব্যক্তিগত চাষের' জন্য যে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তার সংজ্ঞা এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যে এর দ্বারা আধা-সামন্ততান্ত্রিকভাবে অন্য ব্যক্তিকে জমি ভাড়া দেওয়া রোধ করা অর্থহীন হয়ে পড়েছে। (২) আইন ফাঁকি দিয়ে বলপূর্বক উচ্ছেদ। (৩) জমির সর্বোচ্চ সীমাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য জমির হস্তান্তর এবং এর দ্বারা ভাগচাষী ইত্যাদির উচ্ছেদ।

জনৈক প্রখ্যাত অধ্যাপক আইনে বিধিবদ্ধ 'ব্যক্তিগত চাষ' সম্পর্কে সঠিকভাবেই নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন:

"কায়িক শ্রম বা জমির সন্নিকটে বসবাস করা কোনোটারই দরকার ছিল না"; জমির মালিকদের প্রয়োজনীয় তদারকি কাজ-কারবার চালাবার জন্যেও কোনো স্পষ্ট শর্ত আরোপ করা হয়নি। প্রায় সমস্ত রাজ্যেই 'ব্যক্তিগত চাষের জমি' এইভাবে ভাগচাষীদের দ্বারা চাষ করা অব্যাহত রইল। প্রয়োজন হলে কৃষি-শ্রমিকের ছদ্মবেশেও ভাগচাষীদের দিয়ে এই কাজ করানো হতো। এটা তাই কোনো আশ্চর্যের কথা নয় যে, ভূমি-সংক্রান্ত বিল প্রস্তুত ও পাশ—প্রজাদের উচ্ছেদ ও 'ব্যক্তিগত চাষের' জন্য জমি পুনর্দখলের ঢেউ নিয়ে এসেছিল।"

অনেক রাজ্যে 'স্বেচ্ছা'-সমর্পণের' নামে ব্যাপকভাবে প্রজাদের ও ভাগচাষীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। এই উচ্ছেদ এক জটিল ও মিশ্র সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি করেছে। আংশিকভাবে এটা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিকে সম্প্রসারিত করেছে। লেনিন দেখিয়েছেন যে, শ্রম-মজুর নিয়োগের দ্বারা চাষ এবং যেখানে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মূলধনী সম্পদ মালিক কর্তৃক সরবরাহ করা হয়, এবং যা বাজারে বিক্রীর জন্য উৎপাদিত হয় তা হচ্ছে এই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিরই মুখ্য বৈশিষ্ট্য। এই সমস্ত উচ্ছেদ আংশিকভাবে প্রচ্ছন্ন-পন্থায় সামন্ততান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতিকে (ভাগচাষ ইত্যাদি) পুনরুজ্জীবনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

আইন ফাঁকি দিয়ে কেমন করে বহু জোতদার কৃষি-আইনে যেটুকু লক্ষ্য নির্ধারিত ছিল তা ব্যর্থ করেছে, অধ্যাপক গানার মায়ারডেল তা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "১৯৫১ সালের হায়দরাবাদ আইনের ওপর একটি রিপোর্টে দেখা গেছে যে. ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সংরক্ষিত প্রজাদের মধ্যে ন্যূনপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশকে আইনসম্মত কিংবা বেআইনীভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে, এবং আইনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে মাত্র বারো শতাংশই মালিক কৃষকে পরিণত হতে পেরেছে। বোম্বাই প্রজাস্বত্ব আইনের রিপোর্ট আরও জঘন্য। কারণ ১৯৪৮তে এটা প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত বোম্বাই রাজ্য সাধারণত সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজাস্বত্ব আইনের অধিকারী বলে স্বীকৃত হতো। রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫২-৫৩ পর্যন্ত পাঁচ বছরে মোট প্রজার মধ্যে সংরক্ষিত প্রজার অনুপাত শতকরা ৬০ ভাগের বেশি থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ৪০ ভাগের কিছু বেশিতে এসে দাঁড়িয়েছিল।" (এশিয়ান ড্রামা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩০৭-১৩০৮)। গ্রামাঞ্চলে ঋণের বোঝা বেড়েই চলেছে। কারণ, অধিকাংশ কৃষক-পরিবারই অ-অর্থনৈতিক জোতের অধিকারী, ফলে লগ্নীযোগ্য উদ্বৃত্তের অভাব ঘটে। এই অবস্থার জন্য ঋণ পাবার সুযোগের স্বল্পতাই প্রধানত দায়ী। ব্যাঙ্ক ও সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষদের

কাছে ঋণের সুযোগ সম্প্রসারিত করা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র জোতের অধিকারী বিরাট সংখ্যক দরিদ্র চাষী এখনও উপেক্ষিত। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর সরকারী মহলে জমির পরিবর্তে শ্রমকেই ঋণ পাবার যোগ্যতার মাপকাঠি রূপে সূত্রায়িত করার প্রচেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীবিন্যাস এমনই যে, সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া নতুন কোনোও নীতিকে কার্যকর করা অসম্ভব। অবশ্য, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু উন্নতি নিশ্চয়ই ঘটতে প রে।

মাঝারী ও গরীব চাষীরা কেনা-বেচার বাজারে প্রতারিত হচ্ছে, কারণ পাইকারী ব্যবসা বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজির কুক্ষিগত। বাজারের জন্য উৎপাদিত পণ্য কৃষকেরা নায্য দামের চেয়ে কম দামে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়, অথচ শিল্প-পণ্যের জন্য তাদের দিতে হয় অনেক বেশি মূল্য। সমস্ত জিনিসের মূল্য-স্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি শেষ পর্যন্ত মাঝারী চাষী ও গ্রামীণ গরীবকে সকলের চেয়ে বেশি আঘাত করে। একচেটিয়া পুঁজির বাজারের ওপর কব্জা এত বেশি যে ১৯৬৯ সালে শিল্প-পণ্যের উৎপাদন ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও পাইকারী মূল্য-সূচী শতকরা ১১.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চূড়ান্ত বিচারে বলা যায়, ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র জোতের দেশ হিসাবেই রয়ে গেছে। সেইজন্য এ-দেশে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র কৃষি-অর্থনীতির প্রাধান্য এবং ক্ষুদ্রায়তনের চাষবাস কৃষি-উন্নতির পরিপন্থী।

জাতীয় নমুনা-সমীক্ষার অষ্টম ও সপ্তদশ পর্যায়ে সমীক্ষার সময়-সীমার (অর্থাৎ ১৯৫৩-৫৪ এবং ১৯৫৯-৬১) মধ্যে ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত জোতের পরিবর্তনের হার খুবই কম। ১৯৫২-৫৩ সালে জোতের শতকরা ৬০ ভাগ ও কর্ষিত জমির শতকরা ২৫.৪৪ ভাগ ছিল ৫ একরের নীচে। ১৯৫৯-৬১ সালে ঐ হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৬১.৬৯ ও শতকরা ১৯.১৮ ভাগ। দশ একরের নীচের জোত-জমির-হার শতকরা ৭৯.৭৩ থেকে বর্ধিত হয় শতকরা ৮১.৪৯ ভাগে এবং কর্ষিত এলাকার ক্ষেত্রে শতকরা ৩৪ ভাগ থেকে ৫৯.৮৮ ভাগে দাঁড়িয়েছে।

উপরোক্ত সংখ্যাগুলি অবশ্য কিছু 'জোত-জমির একত্রীকরণে'র দ্যোতক (অবশ্যই দরিদ্র চাষীদের বিনিময়ে) তবুও এ-পরিবর্তন এতই স্বল্প যে কৃষি-অর্থনীতিতে ছোট কৃষি-চরিত্র প্রায় অক্ষুণ্ণই থেকে যায়।

নিম্নোক্ত সারণী ১৯৫৩-৫৪ এবং ১৯৫৯-৬১ সালের মধ্যে তুলনামূলক হিসাব তুলে ধরেছে :

কৃষি-জোত (শতকরা হিসাব)

জোতের আকৃতি (একরে)	অষ্টম সমীক্ষা (১৯৫৩-৫৪)		সপ্তদশ সমীক্ষা (১৯৫৯-৬১)	
	সংখ্যা	আয়তন	সংখ্যা	আয়তন
০.৫০-এর নীচে	১১.৭১	০.৩০	৮.৫৫	০ ৩৮
১.০০-এর নীচে	১৯.৭২	১.০৭	১৭.১৩	১.২৭
২ ৫০-এর নীচে	৩৯.১৪	৫.৪৩	৩৯.০৭	৬.৮৬
৫ ০০-এর নীচে	৬০.০০	২৫.৪৪	৬১.৬৯	১৯.১৮
৭.৫০-এর নীচে	৭২.১৭	২৫.৩৪	৭৪.৫৩	৩০ ৯১
১০.০০-এর নীচে	৭৯.৭৩	৩৪ ০০	৮১.৪৯	৩৯ ৮৮
২০.০০-এর নীচে	৯১.৮১	৫৬.৫৩	৯৩.১৯	৬৩.৬৬
৩০ ০০-এর নীচে	৯৫.৭৩	৬৯.১৯	৯৬.৭৯	৭৬ ৩৫
সম্পূর্ণ পরিমাণ	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০ ০০

এই সমীক্ষায় দেখা যায় যে, এই সময়ে কৃষি-জোতের (হোল্ডিংস) মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা কিছুটা পরিমাণে জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়ার ফল। এটা আরও তুলে ধরে যে বৃহদয়াতন ধনতান্ত্রিক চাষ-আবাদের সূচনা ঘটেনি, কিন্তু বৃহৎ সামন্ত-সম্পত্তি কিছু খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছে। মোটের ওপর, জোত-জমির খণ্ড-বিখণ্ডীকরণ ও বিভাজন থেকে উদ্ভূত যে-সমস্যা সে সমস্যার সমাধান হয়নি।

৪

ভারতের কৃষি-সম্পর্ক, চাষীদের অবস্থা, গ্রামীণ গরীবদের শ্রেণীচরিত্র ইত্যাদি অতি জটিল সমস্যাগুলি অনুধাবন করে দেখতে হবে। সামন্ততন্ত্র অক্ষুণ্ণই আছে, অথবা যা ঘটছে তা সামন্ততন্ত্রের দিকেই পশ্চাদগতি কিংবা ভারতের কৃষিতে ধনতন্ত্রের প্রাধান্যই বর্তমান—এ-ধরনের চরম সংজ্ঞায়িত দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। বিশের দশকের প্রারম্ভে এম. এন. রায়ও এই জাতীয় সিদ্ধান্ত স-প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এ-সমস্ত হলো নিঃসন্দেহে সামগ্রিক ভূমি-সম্পর্কের বিভিন্ন দিকের অখণ্ড অনুশীলন না-করে কয়েকটিমাত্র বিষয়ের খণ্ডিত অনুশীলনের ভিত্তিতে অগভীর সামান্যীকরণ মাত্র।

এই পরিপ্রেক্ষিতে 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ' সম্পর্কে লেনিনের বইখানি চমৎকার দিকনির্দেশক। 'ক্যাপিটাল'-এর ৩য় খণ্ডে মার্কস কর্তৃক ব্যাখ্যাত একই সমস্যা, লেনিন ১৮৯৯ সালে প্রথম প্রকাশিত এই পুস্তকে রাশিয়ার বাস্তব পরিস্থিতিতে অপূর্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। যে-সমাজে শ্রম-খাজনা বা বাধ্যতামূলক শ্রম প্রবলভাবে উপস্থিত ছিল, সামন্ত ভূস্বামীদের অধিকাংশ জমির ওপর একচেটিয়া অধিকার ছিল এবং ভিত্তিমূলে পুরনো গ্রাম'ণ সম্প্রদায়ের (মির) অবশেষ ছিল সুদৃঢ়, সেখানে লেনিন-এর এই বিশ্লেষণ কৃষি-সম্পর্ক অনুধাবনের পক্ষে এক মূল্যবান পথ-প্রদর্শক। সংগৃহীত তথ্য থেকে নারোদনিকরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, রাশিয়ার কৃষিতে ধনতন্ত্র বিকশিত হয়নি এবং হবেও না। গ্রামীণ কমিউনগুলি সরাসরিভাবে কৃষিতে সাম্যবাদে রূপান্তরিত হবে।

এই পুস্তকে লেনিন সামন্ততন্ত্র এবং গ্রামীণ কমিউনগুলি বহাল থাকা সত্ত্বেও রাশিয়ার কৃষিতে ধনতন্ত্র বিকাশের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে এই মতবাদ খণ্ডন করলেন। লেনিনের সংজ্ঞা অনুযায়ী কৃষি-ধনতন্ত্র হলো: "ধনতান্ত্রিক খামার-পদ্ধতি হচ্ছে ভাড়ায় শ্রমিক নিয়োগ (বার্ষিক, মরশুমী, দৈনিক ইত্যাদি), যারা মালিকদের যন্ত্রপাতির সাহায্যে জমি চাষ করে।" (সংগৃহীত রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৯৫)।

এই বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা কোনো কোনো ভারতীয় আর্থনীতিবিদ উপেক্ষা করেন। তাঁরা প্রমাণ করতে চান যে, 'খামার সংশ্লিষ্ট ভৃত্যকুল,' 'শ্রমিকের মরশুমী চরিত্র,' 'মজুরীর অত্যধিক স্বল্পতা,' 'গ্রামীণ বেকারী' ইত্যাদি ধনতন্ত্র নয়, আধা-সামন্ততন্ত্রের পরিচায়ক। নারোদনিকদেরও এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। লেনিন মার্কস-এর মূল দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শুরু করে দেখালেন: "শেষ পর্যন্ত এটা দেখা কর্তব্য যে, কখনও কখনও শ্রম-সেবা ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং তার সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যে তাদের মধ্যে পার্থক্য টানা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, একজন কৃষক নির্দিষ্ট দিনের কাজের বিনিময়ে একখণ্ড জমি খাজনায় নিল (যা আমরা ব্যাপকভাবে প্রচলিত বলে জানি, পরবর্তী অধ্যায়ের উদাহরণ দ্রষ্টব্য)। এই ধরনের কৃষক' ও পশ্চিম ইউরোপের কিংবা 'ওস্কসি খামার শ্রমিক' যারা নির্দিষ্ট কয়েক দিনের কাজের বিনিময়ে এক খণ্ড জমি গ্রহণ করে তাদের মধ্যে আমরা কেমন করে পার্থক্য টানি? জীবন নানা আঙ্গিক-প্রকরণ রচনা করে, যা উল্লেখযোগ্য ক্রমানুসরণেযে অর্থনৈতিক

ব্যবস্থাগুলির মূল বৈশিষ্ট্য বিপরীত ধর্মী সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত রাখে। কোথায় 'শ্রম-সেবার' অবসান ঘটে এবং কোথায় 'ধনতন্ত্রের' সূত্রপাত হয়, তা বলা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।" (সংগৃহীত রচনাবলী, ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১৯৭)।

কখনও কখনও দুইটির মধ্যে পার্থক্য টানা কঠিন হয়ে পড়লেও আশ্চর্য প্রাঞ্জলভাবে লেনিন ভূমিদাস-প্রথা থেকে কৃষি-ধনতন্ত্র বিকাশের জটিল পদ্ধতি চিত্রিত করেছেন। এই জটিলতা সম্পর্কে অজ্ঞতাই অনেক বিশেষজ্ঞকে ভারতীয় কৃষিতে যে ধনতন্ত্রের উদ্ভব ঘটছে তা অস্বীকারের পথে পরিচালিত করেছে।

রাশিয়ার ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কিত পুস্তকে লেনিন কৃষিতে প্রাক-ধনতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির পার্থক্য এইভাবে তুলে ধরছেন :

প্রাক-ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি :

"...প্রাক-ধনতান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতির বর্ণনায় মার্কস অর্থনৈতিক সম্পর্কের সমস্ত রূপ বিশ্লেষণ করেছেন ... এবং ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা এবং শ্রম-খাজনা, সামগ্রীর মাধ্যমে খাজনা ও টাকায় প্রদত্ত খাজনা উভয় ক্ষেত্রেই চাষী ও জমির মধ্যে বন্ধনের ওপর স্পষ্টভাবে জোর দিয়েছেন।" "উৎপাদকএবং উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে এই বন্ধন হলো মধ্যযুগীয় শোষণের উৎস এবং শর্ত। এটাই কৃৎকৌশল এবং সামাজিক নিশ্চলতার ভিত্তি রচনা করে এবং 'অর্থ নৈতিক চাপ ব্যতীত'অন্য সমস্ত রকম চাপকে সঙ্গতভাবে প্রয়োজনীয় করে তোলে।" (সংগৃহীত রচনাবলী, ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ২১১)।

সংক্ষেপে, জমি ও চাষীর বন্ধন, ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন এবং ভূস্বামী কর্তৃক খাজনার হার সম্পর্কে অ-অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি, এই তিনটি হচ্ছে প্রাক-ধনতান্ত্রিক ভূমি-সম্পর্কের মূল বৈশিষ্ট্য।

ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি :

"কৃষি-ধনতন্ত্রের প্রধান প্রকাশিত রূপ — ভাড়াকরা শ্রমিক নিয়োগ, আমরা এখন আলোচনা করব।" (সংগৃহীত রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৭)। এবং এ-ছাড়া : "ধনতান্ত্রিক খামার-পদ্ধতি হচ্ছে ভাড়ায় শ্রমিক নিয়োগ (বার্ষিক, মরশুমী,

দৈনিক ইত্যাদি), যারা মালিকের যন্ত্রপাতির সাহায্যে জমি চাষ করে।" (ঐ পৃষ্ঠা ১২৫)। লেনিনের মতে অবশ্য প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে. এরি সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বাজারের জন্য উৎপাদন, যা সরাসরি ভোগের জন্য উৎপাদনের বিপরীতধর্মী এবং সর্বশেষে উন্নততর উৎপাদনকৌশল প্রয়োগ। পণ্য-অর্থনীতি প্রাক-ধনতান্ত্রিক সম্পর্ককে ম্লান করে এবং ধনতন্ত্রকে বিকশিত করে।

লেনিনের এই বিচার-পদ্ধতি (লেনিন মার্কস-এর বিশ্লেষণ-প্রণালী অনুসরণ করেছিলেন) প্রয়োগ করে আমরা ভারতের কৃষি-সম্পর্ক—স্বাধীনতা অর্জনের সময় থেকে, বিশেষভাবে কংগ্রেস সরকার কর্তৃক কিছু কৃষি-সংক্রান্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর, যেভাবে বিকশিত হয়েছে তার বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারি।

১৯৬১ সালের আদমসুমারী দেখিয়েছে যে, গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা ৩৬.৯৬ অংশ শ্রমিক এবং তাদের মধ্যে ৩০.৬১ ভাগই কৃষি-শ্রমিক (ক্ষেত-মজুর)। আদমসুমারীর প্রতিবেদনের এই নির্দিষ্ট পঞ্জীভুক্ততে ভাগচাষীদেরও এক বিরাট অংশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রামীণ শ্রমিকদের মধ্যে মজুরীর দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করে এমন কৃষি-শ্রমিক (ক্ষেত-মজুর) অন্ততঃপক্ষে শতকরা ২০ ভাগের কম নয়। সেন্সাসের সংজ্ঞা অনুযায়ী কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৫১ সালে ছিল ২ কোটি ৭৫ লক্ষ, ১৯৬১ সালে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৩ কোটি ১৫ লক্ষ। এই ঘটনা দেখায় যে, বৃটিশ-শাসনে কৃষিতে শ্রম-মজুরীর বিকাশ শুরু হয়েছিল এবং স্বাধীনতার পূর্বে ও কংগ্রেস সরকার কর্তৃক কয়েকটি কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে কৃষি-ধনতন্ত্রের স্বদেশী বাজার বিদ্যমান ছিল, কংগ্রেস সরকার কৃষিতে কোনো বিপ্লবই আনতে পারেনি। কিন্তু কংগ্রেস সরকারের কৃষি-ব্যবস্থা শিল্প-সম্প্রসারণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, অর্থাৎ সাধারণভাবে ধনতান্ত্রিক বিকাশ, কৃষি-ধনতন্ত্রকেও উদ্দীপনা জুগিয়েছে।

কৃষি-শ্রমিক ও স্বেচ্ছাধীন প্রজা tenant-at-will (ভাগচাষী সহ) এর মধ্যে ভূমি-সম্পর্কের দিক দিয়ে মূল পার্থক্য হচ্ছে প্রথমোক্তরা মালিকের (জমির মালিক বা লীজধারী প্রজা) যন্ত্রপাতির দ্বারা জমি চাষ করে ও স্বেচ্ছাধীন প্রজারা তাদের নিজস্ব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। প্রথমোক্তদের ক্ষেত্রে কাজের সময়ের ভিত্তিতে শ্রমিকদের মজুরী বেশি বা কমনির্ধারিত হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভূ-স্বামীর অংশ (অর্থাৎ খাজনা) নির্দিষ্ট থাকে কিংবা তার খেয়ালের দ্বারা নির্ধারিত হয়। ভাগচাষী বা স্বেচ্ছাধীন প্রজা আইন সম্মতভাবে জমির সঙ্গে আবদ্ধ নয়; কিন্তু যেহেতু জমিতে একচেটিয়া ব্যক্তিগত মালিকানা বর্তমান এবং অন্য কোথাও

কাজ পায় না সেইহেতু সে প্রকৃতপক্ষে জমি ছেড়ে যেতে পারে না। জনমজুর যে কোনোও জায়গায় স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে কিংবা যৌথভাবে শিল্প-শ্রমিকের ন্যায় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারে। কিন্তু ভূমির অসম্ভব স্বল্পতা এবং বিপুল সংখ্যক কৃষি-শ্রমিকের উপস্থিতিতে তার প্রতিযোগিতার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। অতীতে অসংখ্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভাগচাষীরা স্বাধীনতার বহু পূর্বেই জমির বন্ধন ও অ-অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে নিজেদের অনেকটা মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।

এ থেকে বোঝা যায় যে প্রাক-ধনতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক দিকগুলির পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশের জন্য বহুলাংশে পরিবর্তমান (Transitional character) চরিত্র নিয়েই ভারতের কৃষিভূমিসম্পর্কগুলি সুচিহ্নিত। তা সত্ত্বেও তিন ধরনের খামারের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য টানা যায়।

(১) ভাগচাষী ও অন্যান্য স্বেচ্ছাধীন প্রজাদের মধ্যে লীজ দেওয়া জমি, যারা নিজেদের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণাদি দিয়ে সেই জমি চাষ করে;

(২) ভূস্বামী বা কৃষকদের খামার যা প্রধানত ভাড়াকরা শ্রমিকের দ্বারা কর্ষিত হয়, এবং

(৩) ছোট কৃষকের খামার, যা তাদের নিজেদের শ্রম ও যন্ত্রপাতির দ্বারা কর্ষিত হয়, কিছু পরিমাণে যা আবার ভাড়াকরা শ্রমিক দ্বারাও সাহায্য প্রাপ্ত।

উপরোক্ত ধরন-ধারণগুলির বিশেষ চরিত্র পরীক্ষা করে দেখার পূর্বে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, অতীতের তুলনায় গত দুই দশকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাজারের জন্য কৃষি-উৎপাদন (অর্থাৎ পণ্য-অর্থনীতি) বিস্তারলাভ করেছে। মুদ্রা-অর্থনীতি সুদূরতম গ্রামাঞ্চলে এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে যে, প্রাক-ধনতান্ত্রিক ভূমি-সম্পর্ক তাতে অবসান হতে বাধ্য। আজকাল ছোটখাটো চাষী, যে নিজের সামান্য জোতজমিতে সম্বৎসরের খোরাকের জন্য খাদ্য-শস্যও ফলাতে পারে না, সেও বছরের প্রথম দিকে বেশ কিছু অংশ বাজারে বিক্রয়ের জন্য খাদ্য-শস্য উৎপাদন করছে এবং বছরের মধ্যভাগে আবার নিজের খাবারের জন্য সেই খাদ্য-শস্য বাজার থেকে কিনতে বাধ্য হচ্ছে। এইভাবে ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ বাজার পূর্বের তুলনায় বিস্তৃততর হয়েছে। ধনতন্ত্রের মূলভিত্তি, পণ্য-অর্থনীতি এত দ্রুত প্রসারলাভ করছে যে, বাজারের জন্য উৎপাদন সমস্ত ধরনের চাষীর পক্ষে প্রায় সাধারণ নীতিতে পর্যবসিত হচ্ছে। বাণিজ্যিক ফসলের

ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উৎপাদনই বাজারের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত হয়। এখন পূর্বোক্ত পর্যায়-ভুক্তির অর্থনৈতিক চরিত্রগুলি পর্যালোচনা করা যাক।

১নং পর্যায়ভুক্ত: ১৯৫১ সালে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ জমি খাজনায় জমা দেওয়া হয়েছিল (বড় বড় ভূস্বামী কর্তৃক প্রধানত ছোট চাষীদের কাছে লীজ প্রদত্ত হয়েছিল) এবং ১৯৬০ সালে এই লীজ কমে দাঁড়াল শতকরা ১৪ ভাগে, যার একটা অংশ ধনী ভূস্বামীরা গরীব চাষীদের নিকট থেকে লীজ হিসাবে গ্রহণ করেছিল। (জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ১৬ দফা পর্যায়)। ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী প্রজাবিলি জোত-জমির পরিমাণ ছিল চাষে নিযুক্ত মোট জমির শতকরা ২২ ভাগ। এর থেকে এটাই উদ্‌ঘাটিত হয় যে, সামন্ত-সুলভ ভূমি-সম্পর্কের সঙ্কোচন ঘটেছে। কিন্তু এই সঙ্কোচনের পরিমাণ সংখ্যা-তথ্যে প্রদর্শিত আয়তনের তুলনায় কম ছিল, কারণ, 'প্রচ্ছন্ন প্রজাস্বত্ব' এতে দেখানো হয়নি। তাছাড়া শতকরা ২২ ভাগ প্রজা-জমির কিছু অংশ আবার গরীব চাষী কর্তৃক বড় ভূ-স্বামীদের লীজে প্রদান করা হয়েছিল।

যাই হোক, স্বাধীনতার পর আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-সম্পর্ক সমস্ত চাষযোগ্য জমির শতকরা ৪০ ভাগ থেকে কমে অন্তত ২৫ ভাগে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য অনুসন্ধানের দ্বারাই এই অনুমাণ প্রমাণসিদ্ধ করতে হবে।

২নং পর্যায়ভুক্ত: বর্তমানে মোট চাষযোগ্য জমির শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে ভাড়াকরা শ্রমিকের সাহায্যে চাষ করা হয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে বিশেষজ্ঞদের মতে শতকরা ১০ ভাগ জমি সম্পূর্ণভাবে কিংবা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভাড়াকরা শ্রমিকের দ্বারা চাষ করা হতো এবং এখন এর হার নিশ্চয় আরো বেড়েছে। মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশের পশ্চিমভাগ, অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল-বর্তী জেলাগুলিতে শতকরা হার অনেক বেশি। এর থেকে এটাই বোঝা যায় যে, ধনতান্ত্রিক চাষ-পদ্ধতি এবং ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কোনো কোনো অঞ্চলে কৃষিতে এরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৩নং পর্যায়ভুক্ত: পূর্বোক্ত হিসাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৬০ থেকে ৬৫ ভাগ চাষযোগ্য জমি ছোট মালিক-চাষীরা প্রধানত নিজস্ব শ্রমে এবং নিজেদের যন্ত্রপাতির দ্বারাই চাষ করে। তারা সামন্ত ভূস্বামীর পরিবর্তে সরাসরি সরকারী-কর্তৃত্বাধীন। তাদের তিনটি আঘাত সহ্য করতে হয়: (১) মূলধনের স্বল্পতা; (২) মহাজনী সুদে ঋণ গ্রহণ; এবং (৩) দামের যাঁতাকল (Price Scissors).

উপরোক্ত তিন পর্যায়ভুক্ত কৃষকদেরই সাধারণভাবে নিম্নোক্ত প্রাক-ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির যা এখনও টিকে আছে তাতে ভুগতে হয়। এছাড়া একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বাজারের কারসাজির ফলও তাদের ভোগ করতে হয়।

(১) **সুদে মহাজনী ঋণ:** কৃষকের মোট ঋণের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই হচ্ছে বৃহৎ ভূস্বামী ও পেশাদার মহাজনের কাছে। অধুনা পেশাদার মহাজনী কারবারের অনুপাতের সঙ্কোচন ঘটেছে ও ধনী চাষীরা এই ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করেছে।

(২) পাইকারী ব্যবসায়ী সহ বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিপতিরা উৎপাদিত দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য থেকে চাষীদের বঞ্চিত করে। ধনী কৃষকেরা এই ধরনের শোষণ থেকে কিছুটা মুক্ত হলেও ছোট জোতের গরীব চাষীরা এসব থেকে বেশি নির্যাতিত হয়। কিন্তু শিল্প-পণ্যের অত্যধিক মূল্য মারফৎ একচেটিয়া ব্যবসায়ীর দ্বারা সমগ্র কৃষক-সমাজ শোষিত হচ্ছে।

(৩) কৃষির উন্নতির জন্য কারিগরী সম্পদের অভাবই কৃষকদের বহুলাংশে আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য করে। সেচ-ব্যবস্থা ও সার সরবরাহে কিছুটা উন্নতি ঘটলেও উপরোক্ত অবস্থা সমগ্র কৃষক সমাজের দুর্ভোগের এক উৎস।

সামন্ত-অবশেষ থেকে উদ্ভূত স্বল্প-সংখ্যক, এবং ধনতান্ত্রিক খামার ব্যবস্থাতেও যা অব্যাহত, পরিবারের হাতে জমির একচেটিয়া মালিকানাই শতকরা ৮০ ভাগ কৃষক-পরিবার এবং ক্ষেত-মজুরের মধ্যে তীব্র জমির ক্ষুধা সৃষ্টি করেছে। এমনকি, ১৯৬১ সালেও ২০ একর বা তার বেশি জোতের শতকরা ৭ ভাগ ছিল কর্ষিত জমির শতকরা ৩৬ ভাগ। আবার অন্যদিকে, ৫ একর বা তার নীচের জোতের শতকরা ৬১.৬৯ ভাগ ছিল কর্ষিত জমির মাত্র ১৯.১৮ ভাগ। এটা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে জমির একচেটিয়া মালিকানা প্রমাণ করে। একদিকে গ্রামীণ জন-সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ লোক শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি জমির মালিক। অন্যদিকে রয়েছে ভূমিহীন কিংবা অতি নগণ্য জমির অধিকারী গ্রামীণ জন-সংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগের তীব্র জমির ক্ষুধা। এটা জোতের সাংঘাতিক খণ্ড-বিখণ্ডীকরণকেও তুলে ধরে; এই খণ্ড-বিখণ্ডীকরণই আমাদের কৃষির কারিগরী পশ্চাৎপদতা এবং নিশ্চলতার জন্য দায়ী। ভূমি-বণ্টন কাঠামোটিই আমাদের

গ্রামীণ অর্থনীতি এবং কৃষক-জনতার পক্ষে সবচেয়ে জরুরী সমস্যা। তাই ডাক উঠেছে জোত-জমির সর্বোচ্চ সীমা সংশোধনের এবং ভূমিহীন ও গরীব চাষীদের মধ্যে উদ্‌বৃত্তজমি বণ্টনের জন্য। সমবায়গুলিকে বিশেষ সরকারী সাহায্যে উৎসাহিত করে বৃহৎ আকারে কৃষি-সমবায় বিকাশের জন্যও ডাক এসেছে। সরকারী পতিত জমিসহ জমির নির্দিষ্ট উচ্চসীমা প্রবর্তনের দ্বারা উদ্‌বৃত্ত জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করাই হলো প্রাথমিক উৎসাহব্যঞ্জক কাজ। কিন্তু ঋণ, সার ও সেচ-এর সুযোগ এবং ন্যায্য মূল্যের প্রশ্নটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত ব্যবস্থাগ্রহণ শুধুমাত্র সামন্ত-বিরোধী ব্যবস্থাগ্রহণই নয়, কারণ বড় জোত-জমিগুলি বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাড়াকরা শ্রমিক নিয়োগ করে চাষ করা হয়। এই ব্যবস্থাবলম্বনই অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করতে পারে।

সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষ মুছে ফেলতে, ধনতান্ত্রিক একচেটিয়াপতিদের শোষণ খর্ব করতে এবং তার মধ্য দিয়ে কৃষির উন্নতি এবং কৃষকদের সমৃদ্ধিশালী জীবনের পথ প্রশস্ত করার জন্য দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার এইগুলি কয়েকটি ধাপ মাত্র।

ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আমাদের কৃষিতে আধা-সামন্ত ভূমি-সম্পর্কের ভগ্নাবশেষে কৃষির ধনতান্ত্রিক বিকাশই অবশ্যম্ভাবী বিকল্প নয়।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বলা যায়, এমনকি তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লব'-এর দ্বারা ধনতান্ত্রিক চাষাবাদ পদ্ধতির উন্নতিতে শুধুমাত্র বিত্তবান কৃষকেরাই লাভবান হয়েছে। মাঝারী চাষীরা কম লাভবান হয়েছে এবং বিরাট সংখ্যক গরীব চাষী ও ক্ষেত-মজুরেরা কোনো লাভের মুখই দেখতে পায়নি।

সামগ্রিক কৃষিউৎপাদন-সূচক ১৯৪৯-৫০ সালের ১০০ থেকে ১৯৬৮-৬৯-এ ১৬৩ পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছে, এবং উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ১০ কোটি টন।

তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লবের' 'নতুন রণনীতি'টি (নিবিড় কৃষি-উন্নয়ন কর্মসূচী) ১৯৬৫ সালে ভারত সরকার কর্তৃক রচিত হয়েছিল। এই কর্মসূচী উচ্চ ফলনশীল বীজ, সার ও সেচের জল সরবরাহের মাধ্যমে ১১৪টি জেলায় প্রয়োগ করা হয়েছিল। USAID সংস্থার উদ্যোগে ফ্রান্সিন ফ্রাঙ্কেল কৃষকদের সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপর এর প্রভাব অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর রিপোর্টের উপসংহারপর্ব ২৯ শে নভেম্বর, ১৯৬৯ তারিখে 'মেইন স্ট্রিম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এতে নিম্নলিখিত তথ্য পরিবেশিত হয়:

"যে সমস্ত ক্ষেত্রে ছোট চাষী, যারা অংশত লীজ নেওয়া জোত-জমিতে চাষ করে, অথবা নির্ভেজাল প্রজামাত্র, সেই সমস্ত মালিক-প্রজা-চাষী শ্রেণীর অর্থ-নৈতিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটেছে। কারণ (জমির মূল্য প্রচণ্ডবেগে বৃদ্ধি পাওয়ায়) সাম্প্রতিককালে খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি এবং / অথবা ভূস্বামীদের মধ্যে নিজ চাষের জন্য জমি পুনঃগ্রহণের প্রবণতা (লাভজনক কলা-কৌশল প্রবর্তনের দ্বারা) প্রকৃতপক্ষে তাদের এই দুর্দশার দিকে ঠেলে দিয়েছে।"

ফ্রাঙ্কেল তারপর বলেন: "পাঁচ থেকে দশ একর জোত-জমির মালিকানায় কৃষকেরা অপেক্ষাকৃত ভাল করেছে"···"কিন্তু এটা দেখা যায় যে, দশ একর বা তার বেশি জোত-জমির অধিকারী চাষীদের ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুরাই শুধু জমির উন্নতিতে লগ্নি করার জন্যে উদ্বৃত্ত মূলধন সংগ্রহ করতে পেরেছে, বিশেষভাবে ছোটখাটো সেচের জন্য—যা কিনা আধুনিক উৎপাদন-উপাদান (in-put) যথোপযুক্ত প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় পূর্ব শর্ত।"

ফ্রাঙ্কেল-এর তথ্যানুসন্ধান দুটি বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রথমত, সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষ সম্পূর্ণভাবে মুছে না ফেলে ব্যাপক কৃষি-সংস্কার মারফৎ ধনতান্ত্রিক বিকাশে কৃষির উন্নয়ন সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। দ্বিতীয়ত, এমনকি ধনতান্ত্রিক বিকাশের গণ্ডীর মধ্যেও বিরাট সংখ্যক দরিদ্র চাষীরা সুযোগ-সুবিধা লাভে বঞ্চিত হয়। এই অবস্থায়, সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষ অবলুপ্তির পরে অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশই কৃষি-উৎপাদনে জোয়ার সৃষ্টির একমাত্র পথ।

রাশিয়ার অবস্থা বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেনিন ধনতান্ত্রিক বিকাশের দুটি পথের কথা বলেছিলেন—বৃহদায়তন বেদরকারী ভূস্বামী-পুঁজিপতির খামার গঠনের প্রুশীয় পথ এবং ভূস্বামীদের সমস্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে বাজেয়াপ্ত করে ও দ্রুত ধনতান্ত্রিক বিকাশের জন্য জমি জাতীয়করণের বিপ্লবী পথ। কিন্তু ১৯৭০-এর ভারত ১৯০০-এর রাশিয়া থেকে পৃথক। ভারতের কৃষিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশ সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাবশেষ সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না করেই, এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীর রাশিয়ার মতো বৃহৎ ভূস্বামী-ধনতান্ত্রিক খামার গঠন না করেই ঘটছে। চরম দক্ষিণ পন্থীরা এই ধরনের বিকাশের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত-জমির প্রাধান্য থাকায় তা বাস্তবায়িত করতে পারে না। কারণ, ঐ ধরনের বিকাশের জন্য যে বিরাট সংখ্যায় কৃষক-উচ্ছেদ প্রয়োজন, তা সম্ভব নয়। ধনতান্ত্রিক বিকাশের ইতিহাস-সম্মত বিপ্লবী পথও নিম্নলিখিত কারণে অবাস্তব:

(১) ক্ষুদ্র চাষীরা জমির জাতীয়করণ চায় না, যা ছাড়া এই ধরনের বিকাশ

অচিন্ত্যনীয়। তারা এই সমাধান মেনে নেয় না, কারণ জমির ব্যক্তিগত মালিকানা কৃষকদের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত। সুতরাং ধনতান্ত্রিক বিকাশের একমাত্র পথ থমকে দাঁড়াতে বাধ্য ; এর কারিগরী দিক দুর্বল থাকতে এবং বিরাট সংখ্যক ক্ষেত-মজুরেরা জনসংখ্যার অন্যান্য অংশের তুলনায় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুস্থতর হতে বাধ্য।

(২) ভারতের ধনতন্ত্রবাদ ইতিমধ্যে তার ক্ষয়িষ্ণু স্তরে পৌঁছে গেছে। শিল্পের ক্ষেত্রে তার প্রগতি খুবই ব্যাহত এবং উৎপাদনের তুলনায় সংবহনে (in circulation) বেশি মূলধন আটকা পড়েছে। কালোবাজার 'আর্থিক মূলধনকে' 'উৎপাদনী মূলধনে' রূপান্তরিত হতে বাধা দিচ্ছে। স্বভাবতই শিল্প-ধনতন্ত্রের তুলনায় কৃষি-ধনতন্ত্র আরও ধীরগতি হতে বাধ্য। যেহেতু ভারতবর্ষ নানাভাবে ধনতান্ত্রিক পথের সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে সেইহেতু জনগণের জন্য ‥কৃষি-ধনতন্ত্রের মধ্যে কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

(৩) বিদেশী পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতায় ভারতের জাতীয় অর্থনীতিতে একচেটিয়া পুঁজির আবির্ভাব. উৎপাদন শক্তির বিকাশকে ব্যাহত করে, বিশেষ করে তাদের শোষণ কৃষি-বুর্জোয়াদের বিকাশ সীমিত করে।

(৪) অর্থনৈতিক অবস্থার একটি লক্ষণীয় দিক হচ্ছে কৃষিতে পুঁজি সৃষ্টির অভাব। সর্বভারতীয় গ্রামীণ-ঋণ-পর্যালোচনা কমিটির মতে, "গ্রামাঞ্চলে সঞ্চয় এবং আয়ের অনুপাত ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬২-৬৩ পর্যন্ত শতকরা ২.৩-এ প্রায় অপরিবর্তিত ছিল, যদিও গ্রামীণ আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। অথচ শহরের পরিবার প্রতি এই অনুপাত একই সময়ে ৭.৩ ভাগ বেড়ে শতকরা ১৭ ভাগে দাঁড়িয়েছে।…সমগ্র অর্থনীতিতে সঞ্চয়ের তুলনায় এই সময়ে গ্রামীণ সঞ্চয় শতকরা ২৯.৩ ভাগ থেকে প্রায় দেড়গুণ কমে শতকরা ১৫.২ ভাগে পৌঁছায়। অথচ, তুলনামূলকভাবে এই কালটাই হলো ভারতে ধনতন্ত্র-বিকাশের দ্রুত বৃদ্ধির সময়।

(৫) কৃষি-ধনতন্ত্রের দেউলিয়াপনা ক্ষেত-মজুরের অবস্থার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীর তুলনায় তাদের অবস্থা নিকৃষ্টতর। ন্যূনতম মজুরী আইন কোনো কাজেই আসেনি। কৃষি-শ্রমিকের গড়-পড়তা বার্ষিক আয় শিল্প-শ্রমিকের সর্বনিম্ন আয়ের চেয়েও অনেক কম। কৃষি-শ্রমিক পরিবারের শতকরা ১৫ ভাগ বেকার অথচ অন্যান্যদের মধ্যে এই হারের পরিমাণ শতকরা ৩ ভাগ। সামাজিক বৈষম্যের ব্যাপারেও ক্ষেত-মজুরেরা সব থেকে বেশি নির্যাতিত। থাকবার

জন্ত তার কোনো বাসস্থান নেই, কাজের স্থায়িত্ব বা নিরাপত্তাও নেই; মহার্ঘ-ভাতা তার কাছে এক অকল্পনীয় স্বপ্ন।

(৬) পরিশেষে এবং প্রাথমিকভাবে, আধুনিক যুগে, বিংশ শতকের সূচনায় রুশদেশের মতো ভারতীয় কৃষিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশ ঐতিহাসিক দিক দিয়ে অপরিহার্য নয়। মহান অক্টোবর বিপ্লবের পর, বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এর সম্প্রসারণ ঘটায় এবং অধিকাংশ উপনিবেশ ও আধাউপনিবেশের মুক্তির পর, এযাবৎ পশ্চাৎপদ দেশগুলিতেও অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়েছে। বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তুলনায় বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব ধনতান্ত্রিক পথের ভাগ্যকে রুদ্ধ করে দিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে, ভারতের প্রকৃত বিকল্প—ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ—দুটি নয়। সেই পথ হলো অন্য "দুটি পথ", যথা—সীমাবদ্ধ ধনতান্ত্রিক পথ এবং বিপ্লবী অ-ধনতান্ত্রিক পথ। ভারতীয় কৃষক ও ভারতীয় কৃষির জন্য দ্বিতীয় পথটির অনুসরণ ঐতিহাসিকভাবেই নির্দেশিত। এই ক্ষেত্রে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শের ক্রম-প্রাধান্য ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার অগ্রণী ভূমিকা, মানসিক ক্ষেত্রেও ভারতীয় কৃষিতে "বিকল্প ধনতান্ত্রিক পথ"—এই মতাদকেই নাকচ করে দেয়। (ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০)

অনুবাদ: ধনঞ্জয় দাশ। সমীর চট্টোপাধ্যায়

লেনিনের রাষ্ট্র

জ্যোতি দাশগুপ্ত

লেনিনের জন্মশতবর্ষে নিশ্চিতই লেনিনবাদী নন এমন অনেক মানুষ এবং বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক মতাবলম্বীরা ভারতে এবং সারা পৃথিবী জুড়েই লেনিন-এর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। কলকাতায় লেনিন উৎসবে রাজ্যপাল শান্তিস্বরূপ ধাওয়ান যখন লেনিনের ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তি উন্মোচন করছিলেন তখনই তার মাত্র পাঁচশো গজ দূরে শহীদ মিনারের পাদদেশে এক পৃথক সভায় 'মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির' পলিটব্যুরোর সদস্য ও নেতা শ্রী বি. টি. রণদিভে বিদ্রূপভরে রাজ্যপালের সভার উদ্যোক্তা ও সঙ্গীদের উল্লেখ করে বলেন যে, লেনিনের "জাত-শত্রুদের নিয়ে যাঁরা লেনিন-উৎসব উদযাপন করছেন, তাঁরা লেনিনের অপমান করছেন।" পৃথিবীতে লেনিনবাদের ব্যাখ্যাকারের কোনও অভাব নেই, তবু লেনিনবাদের অমন অপব্যাখ্যা করার জুড়ি বাস্তবিকই বিরল। সঙ্কীর্ণতা-বাদ মগজকে ছাড়িয়ে হাড়-মজ্জায় প্রবেশ করেছে বলেই কোনো বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ শিশুসুলভ ভাষ্যদান সম্ভব।

লেনিনকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করা এবং লেনিনবাদী হওয়া অবশ্যই কঠিন কাজ। সেজন্য শ্রমিক-বিপ্লবকে শুধু গ্রহণ করা নয়, তারি জন্যে সর্বস্ব পণের বিপ্লবী হতে হয়। কিন্তু লেনিনকে পুরোপুরিভাবে বর্জন করা আরও কঠিন। সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার বুক চিরে লেনিন প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনক। সাম্রাজ্যবাদের পাল্টা মানবশক্তির মধ্যেই লেনিনের বিকাশ ও বিস্তার এবং সেজন্যই লেনিনবাদীদেরও ছাড়িয়ে লেনিন মানবতার মধ্যে বিরাজমান।

লেনিনকে পরিহার করতে চাইলে সেই গর্ত এমন ভয়ঙ্কর যে, সে-নরকমূর্তির নাম ফ্যাসিজম। বুর্জোয়া রাজনৈতিক ধুরন্ধর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল লেনিনবাদের অবশ্যই একজন জাতশত্রু। কিন্তু ফ্যাসিবিরোধী মহাযুদ্ধে লেনিন-এর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৈত্রী ছাড়া বৃটেনের স্বাধীনতাকে বাঁচানো যায় না, এই বাস্তব রাজনীতিক জ্ঞানে আপৎকালে চার্চিল খুবই টনটনে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বারুদ-গন্ধ না মিলাতেই চার্চিল সোভিয়েত-মিত্রতাকে বরবাদ করে পুনরায় সোভিয়েত-বিরোধী শিবিরের নেতা হন। কিন্তু তার জন্যেও বৃটেনকে যে-হীনমন্যতার মাশুল গুনতে হচ্ছে, বেশিদিন বৃটেনের মানুষ সেই বোঝা কাঁধে নিয়ে চলতে পারে না। বিশ্বখ্যাত কামউনিস্ট ইতিহাসবেত্তা শ্রীরজনীপাম দত্ত তাঁর 'সমসাময়িক ইতিহাসের সমস্যা' পুস্তকে তারই এক নাটকীয় বর্ণনায় দেখিয়েছেন যে "আর একটি হতবুদ্ধিকর চিত্র হলো, অবস্থা আজ এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত সীমানার মধ্যে স্বষ্ট মরীয়া জংলী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রাক্তন প্রভু সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির স্বাধীনতাকেই বিসর্জন দিতে হচ্ছে। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ সেনাবাহিনী ভারত ছাড়ে। ১৯৪৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী বৃটেনে প্রবেশ করে। বৃটেনে এখন আমেরিকার যুদ্ধঘাটি রয়েছে, শুধু তাই নয়, বৃটেনকে এমনকি জার্মান সৈন্যের মহড়ার জন্য বুকেও স্থান করে দিতে হচ্ছে।"

চার্চিল লেনিনকে ধরেন ও ছাড়েন। কিন্তু লেনিনকে দৃঢ়ভাবে ধরা ছাড়া বৃটেনের মুক্তি নেই।

বৃটেনের এই উল্টাপাল্টা রাজনীতি বহুদিনের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেও বিচিত্র ও বিভিন্নমুখীন গতিতে বৃটেনের রাজনীতি প্রসিদ্ধ। চেম্বারলেন হিটলার ও ফ্যাসিবাদকে দুধকলা দিয়ে পুষেছিলেন এবং যুদ্ধের প্রথম বলি চেকোস্লোভাকিয়াকে নিজ হাতেই হিটলারকে দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সোভিয়েতের জাতশত্রু চার্চিল প্রধান মন্ত্রী হবার পর ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে সোভিয়েতের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা ছাড়া গত্যন্তর দেখেননি। "কাজের সময় কাজী কাজ ফুরালেই পাজি" এই বর্বরতায় চার্চিল হিটলার-এরই মন্ত্রশিষ্য, কারণ হিটলারও যুদ্ধের প্রথম অঙ্কে সোভিয়েতের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করে প্রয়োজনীয় কার্যসিদ্ধির পর সোভিয়েতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেরি করেনি। কিন্তু এক্ষেত্রে চার্চিল কিংবা হিটলার প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো এখানে যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ আপৎকালে লেনিন-এর রাষ্ট্রের মহিমাকে বোঝে এবং এমনকি সেই পথ ধরেও বৃটেনের মানুষ এবং জার্মানির মানুষও লেনিনকে বোঝে। হিটলারের বার্লিনে আজ জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত, লেনিন-এর পতাকা উড়ছে এবং কুখ্যাত হিটলার একটি কালো দাগ ছাড়া ইতিহাসে আর কোনও স্থান পাবে না। অনুরূপ ইতিহাস চার্চিল-এর বৃটেনেও যে ঘটবে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সেই সাফল্যসাপেক্ষে বৃটেনের এই করুণ অবস্থা, একদিন যে-বৃটেন ফৌজ দিয়ে আমেরিকার স্বাধীনতাকে বিনাশ

করতে চেয়েছিল ; আজ উল্টে মার্কিন ফৌজ বৃটেনে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে এবং বৃটেনের সার্বভৌমত্ব শিকেয় উঠেছে।

বৃটেনের শ্রমিকশ্রেণী এবং স্বাতন্ত্র্যকামী মানুষ জাতীয় এই অবমাননায় সহজে যে বিচলিত হয় না তার কারণ আর ইতিহাসও বিচিত্র। পররাজ্যলুণ্ঠনের বখরা দিয়ে বৃটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিকদের একাংশকেও কলুষিত করেছে এবং ক্ষুদ্র আত্মসুখে মগ্ন জাতি স্বাধীনতার মর্যাদা চিরদিনই হারিয়ে ফেলে। বৃটেনের এই দুর্ভাগ্যের কথা বহুবর্ষ আগেই কার্ল মার্কস বর্ণনা করেছিলেন। এঙ্গেলস-এর কাছে এক পত্রে কার্ল-মার্কস লিখেছিলেন :

"বৃটেনের শ্রমিকেরা স্পষ্টতই বুর্জোয়াদের ছোঁয়াচজনিত রোগ থেকে কতদিনে মুক্তি পাবে তা অপেক্ষা করে জানতে হবে···ঐরূপ বিশাল আকারের পরিবর্তনের জন্য বিশ বছর একদিনের সমান—যদিও ভবিষ্যতে আবার এমন সময় আসতে পারে যখন একটি দিনের মধ্যে বিশ বছর ঠাসা হয়ে থাকবে।" (৯ এপ্রিল ১৮৬৩)

পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা রক্ষায় লেনিন-এর অবদান ফ্রান্সের রাষ্ট্রনায়ক দ্য গলকেও অম্লানবদনে স্বীকার করতে হবে।

দ্য গল ব্যক্তিগতভাবেই তার প্রধান সাক্ষ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে দ্য গল লণ্ডনের এক কামরায় ফ্রান্সের স্বাধীন সরকারের দীপ জ্বেলে বসেছিলেন। যুদ্ধের পর শান্তি প্রতিষ্ঠার এবং বিশ্বের নিরাপত্তা রক্ষার নিমিত্ত জাতি-সঙ্ঘের গঠন ও ভবিষ্যৎ কার্যসূচী সম্পর্কে স্তালিন, রুজভেল্ট ও চার্চিল যখন বৈঠক করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন দ্য গল মস্কোতে আমন্ত্রিত হলেন। সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়কেরাই এই প্রস্তাব উপস্থিত করলেন যে, জাতি সঙ্ঘের মাথায় যে-কয়েকটি রাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্ব বর্তাবে, তার মধ্যে ফ্রান্স হবে অন্যতম। দ্য গল বীর হলেও তখন তিনি বৃটেনের অনুগৃহীত। বৃটেনের মতলব দ্য গল-এর কাছেও অস্পষ্ট ছিল না। বৃটেনের সমকক্ষরূপে ফ্রান্স ইয়োরোপের বুকে বিরাজ করুক তা কখনো কোনো পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের ইচ্ছা হতে পারে না। সোভিয়েত প্রস্তাবে দ্য গল বস্তুতই বিপন্ন বোধ করলেন। দ্য গল-এর দুশ্চিন্তা পাছে গাছের পাখি ধরতে গিয়ে খাঁচার পাখি হারিয়ে যায়। তিনদিন ধরে আলোচনা নিষ্ফল। অবশেষে মস্কো থেকে দ্য গলকে ফেরৎ যাবার গাড়িতে তুলে দেওয়া হলো। কিন্তু গাড়ি যখন ছাড়িছাড়ি করছে তখনই দ্য গল বিবেকদংশনে জর্জরিত হয়ে আবার বৈঠকের প্রস্তাব করলেন। আর তার ফলশ্রুতিতেই নিষ্পন্ন সোভিয়েত-ফ্রান্স

চুক্তিতে স্থির করা হলো যে, ফ্রান্স জাতিসঙ্ঘে বৃহৎ পাঁচশক্তির একজন হবে। সাম্রাজ্যবাদের পদানত দেশগুলির মুক্তির জন্য লেনিন, মাত্র ততটুকু নয়, সাম্রাজ্যবাদী প্রভু দেশগুলির মুক্তির জন্যও লেনিন ও লেনিন-এর সৃষ্ট সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া প্রকৃত কোনো সহায় নেই।

দ্য গল লেনিনবাদী নন। তিনি কিছুতেই লেনিনবাদী হতে পারেন না। ফ্রান্সের গোটা জাতিটাও লেনিনবাদী হয়ে ওঠেনি। কিন্তু জাতি হিসেবেই ফ্রান্স যদি লেনিন-এর প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়, তবে সেই কৃতঘ্নতার অবধি থাকে না। ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধে সোভিয়েতকে অস্বীকার করে ইয়োরোপের মুক্তির কোনও উপায় ছিল না। ফলে গোটা ইয়োরোপই লেনিন-এর কাছে ঋণী।

এভাবেই পূর্ব-ইয়োরোপের ওয়ারস-বুদাপেস্ত-বুখারেস্ট থেকে শুরু করে মধ্য-ইয়োরোপের প্রাগ-বার্লিন-প্যারী ছাড়িয়ে পশ্চিম সীমানায় লণ্ডন পর্যন্ত সর্বত্র লেনিন-এর প্রতি অকপট শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য লেনিনবাদীরা ছাড়াও সমগ্র মানবতার প্রতিনিধিরা মিলিত হতে পারেন। সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের কুচক্রীরা ছাড়া মানুষ মাত্রই লেনিনকে ভালোবাসতে পারেন।

দীর্ঘদিনের পরাধীনতার পর সদ্য-স্বাধীন ভারতের মতো দেশগুলির কথা আরও স্বতন্ত্র। সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনে পুঁজির শূন্যতায় কৃশ এবং কুৎকুশলতায় দু-শতাব্দীর অবজ্ঞায় পশ্চাৎপদ এইসব দেশ সাম্রাজ্যবাদের সর্বশেষ মরীয়া আক্রমণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে লেনিন-এর রাষ্ট্রের সহায়তা দ্বারাই পুনর্জীবনের রসদ পায়। সম্প্রতি সোভিয়েত ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কর্তৃক সহায়তার দ্বারা ভারতে ভারী-শিল্প স্থাপনের এক হিসেবে বলা হয়েছে যে হিটলার-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবার সময় সোভিয়েতে যে-পরিমাণ ভারী-শিল্পের কারখানা ছিল, আজ শুধু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহায়তায় ভারতে তদনুরূপ ভারী-শিল্প গড়ে উঠেছে। সর্বাধুনিক ইস্পাতের কারখানা ভিলাই ও বোকারো, ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা রাঁচি, কয়লাখনির যন্ত্রপাতি তৈরি করার দুর্গাপুর, ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রস্তুত করার হরিদ্বার, তেল উত্তোলনের সর্ববিধ সাহায্যের শক্তিতে 'ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন'-এর প্রতিষ্ঠা ও বৃদ্ধি, তাপ ও জল-বিদ্যুতের বিশাল বিশাল প্রকল্প, কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রীকরণের সুরতগড় খামার এবং দেশরক্ষা শিল্পে 'মিগ' বিমানের কারখানা প্রভৃতি সবদিকে এবং সব বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদের শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্য সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সাহায্য করেছে। সাম্রাজ্যবাদের পাল্টা রাষ্ট্র হিসেবে সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিকে সহায়তা দান করা

যেমন লেনিন-এর রাষ্ট্রের অপরিহার্য ধর্ম, তেমনই সাম্রাজ্যবাদের অক্টোপাস থেকে মুক্তির জন্য সভমুক্ত রাষ্ট্রগুলির পক্ষেও সোভিয়েতের সাহায্য নেওয়া তাদের অবস্থানেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি।

লেনিন ও লেনিন-এর রাষ্ট্রের সাহায্য গ্রহণের সঙ্গে লেনিনবাদ গ্রহণের কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। লেনিন ও লেনিন-এর রাষ্ট্রকে গ্রহণ না করে বর্জন করতে চাইলে বিভিন্ন জাতির আপন স্বাতন্ত্র্যই বিপন্ন হয় এবং সেকারণেই লেনিন-এর রাষ্ট্রের বিরোধিতার পথ সোজা ফ্যাসিবাদ ও নরকের দিকে প্রসারিত। এমন এক রাষ্ট্রের সৃষ্টিতেই লেনিন ঐতিহাসিক পুরুষ হয়েছেন, শুধু তাই নয়, তিনি ইতিহাসের নিয়ন্তা হয়েছেন।

এভাবেই দেখা যায় শুধু নিজ দেশের স্বাতন্ত্র্যের ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের মধ্যেই লেনিনবাদ সীমিত নয়। লেনিনবাদী হওয়ার অর্থ লেনিন-এর শিক্ষায় স্বদেশেও অনুরূপ আন্তর্জাতিকতায় পুষ্ট শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তত্ত্ব ও কর্মে বিপ্লবী হওয়া। বিপ্লবী বলশেভিক সৈনিক কখনো ঝাঁকে ঝাঁকে তৈরি হয় না। মেনশেভিকদের সংগঠনী চিন্তাকে বাতিল করে দিয়ে লেনিন বলশেভিক পার্টি গড়ার সময় বিপ্লবী পার্টির সদস্যের যে-সংজ্ঞা স্থির করেছিলেন, আজও পৃথিবীর সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কাছে সেটাই অনুজ্ঞা। শ্রমিক-শ্রেণীর অগ্রণী নেতাদের নিয়ে একটি নেতৃত্ব দানের পার্টি গঠন করতে হবে, কমিউনিস্ট পার্টি কখনোই বৃটিশ লেবর পার্টির মতো শ্রমিকদের একটি দলমাত্র নয়, কিংবা সকল শ্রমিকের সম্মিলিত ট্রেড ইউনিয়নের মতো একটি সংস্থার সংস্করণও নয়। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ও বিপ্লবী তত্ত্বে বিশ্বাসী আন্তর্জাতিকতা-বাদী হওয়া ছাড়া কোনো ব্যক্তি কমিউনিস্ট হবার যোগ্য হতে পারে না। শ্রমিক-শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো শক্তিশালী বিপ্লবী রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের স্বার্থে লেনিন-এর আপন সৃষ্টি রুশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে নিঃস্বার্থভাবে বিপন্ন করতেও লেনিন কিরূপ প্রস্তুত ছিলেন তার এক বর্ণনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বলশেভিক পার্টিরই 'মস্কো রিজিওনাল ব্যুরো' ১৯১৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি জার্মানির সঙ্গে ব্রেস্ট শান্তি-চুক্তির বিরোধিতা করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। ঐ প্রস্তাবের মধ্যে বলা হয়েছিল যে, "বিশ্ব বিপ্লবের স্বার্থে আমরা সোভিয়েত ক্ষমতা হারাবার সম্ভাবনা মেনে নেওয়াকেও যথার্থ বলে বিবেচনা করি।"

লেনিন ঐ প্রস্তাবের জবাব দিতে গিয়ে বললেন :

"ঐ প্রস্তাবের রচয়িতারা হয়তো এইরূপ ধারণা করেছেন যে জার্মানিতে ইতোমধ্যেই বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে এবং একটি প্রকাশ্য দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধের পর্যায়ে জার্মানি পৌঁচেছে; সেজন্যই আমাদের কাজ হলো জার্মানির শ্রমিকশ্রেণীকে সাহায্যের জন্য নিজেদের শক্তিকে নিয়োজিত করা। যে-জার্মান বিপ্লব চূড়ান্ত লড়াইয়ের পর্যায়ে পৌঁছে বিপুল বাধার সম্মুখীন হয়েছে, তাকে বাঁচাবার জন্যই কি আমাদের ধ্বংস হওয়া ("সোভিয়েত ক্ষমতা হারানো") প্রয়োজন? ঐ তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে আমরা নিজেরা ধ্বংস হলেও জার্মান প্রতিবিপ্লবী ফৌজের একটি অংশকে আমাদের দিকে টেনে রেখে জার্মানির বিপ্লবকে আমরা সাহায্য দিতে পারি।

"একথা অনস্বীকার্য যে, ঐ প্রতিপাদ্যগুলি যদি সঠিক হতো তবে আমাদের পক্ষে পরাজয়ের সম্ভাবনাকে ও সোভিয়েত ক্ষমতা হারানোর বিপদকে স্বীকার করে নেওয়া 'যথার্থ কাজ' হতো। শুধু তাই নয়, তা হতো আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু ঐ প্রতিপাদ্যগুলি বাস্তবে অনুপস্থিত। জার্মানিতে বিপ্লব পরিপক্ক হচ্ছে; তবে সেই বিপ্লব জার্মানিতে বিস্ফোরণের স্তরে পৌঁছয়নি, গৃহযুদ্ধের স্তরে ওঠেনি। 'সোভিয়েত ক্ষমতাকে হারাবার সম্ভাবনাকে মেনে নিয়ে আমরা জার্মানির বিপ্লবকে পরিপক্ক হয়ে উঠতে সাহায্য করব না, বরং তার পথের বিঘ্নই বাড়াব।" (সিলেকটেড ওয়ার্কস, ২৭ খণ্ড, পৃঃ ৭২)

রুশ দেশে লেনিন প্রথম যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করে তার প্রধান হয়েছেন, জার্মানিতে একটি বলিষ্ঠতর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের বাস্তবতা সৃষ্টি হলে তার স্বার্থে রুশ রাষ্ট্রটিকে বিপন্ন ও বিলুপ্ত হতে দিতেও লেনিন প্রস্তুত। এরই নাম শ্রমিকশ্রেণীর লেনিনীয় আন্তর্জাতিকতা।

স্বদেশে আন্তর্জাতিকতাবাদী ঐরূপ একটি শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সাধন ও কর্মে লিপ্ত বিপ্লবীরাই কমিউনিস্ট, বলশেভিক এবং লেনিনবাদী। আদর্শে এবং বীরত্বে সুশিক্ষিত এবং সুনিপুণ নেতাদের নিয়ে গঠিত ঐরূপ একটি পার্টির পক্ষেই অধিকাংশ শ্রমিককে এবং অ-শ্রমিক মেহনতী জনতারও বিপুল অংশকে অনুপ্রাণিত করে শ্রমিকবিপ্লব এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদীদের হিংস্র প্রতিযোগিতার জংগী অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে আপন দেশ ও আপন স্বাতন্ত্র্যের নিমিত্ত লেনিনকে গ্রহণের তালিকায় চার্চিল আছেন, দ্য গল আছেন, এবং অনুন্নত সদ্যস্বাধীন দেশসমূহের রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে নেহরুজী ইন্দিরাজী প্রমুখ বিস্তরই রয়েছেন, কিন্তু তার

মানে কখনো এই নয় যে, নিজ নিজ রাষ্ট্রকেও লেনিনবাদী রাষ্ট্র করার নিমিত্ত তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী নেতা বনে গেছেন। তবু লেনিনবাদীরা এবং কোনো লেনিনবাদী রাষ্ট্র যাবতীয় উৎপীড়িত জাতি এবং যে কোনো জাতির পীড়ায় লেনিনের মতোই অকাতর সাহায্য দিতে যেমন কুণ্ঠা বোধ করছেন না, তেমনই সাহায্যপ্রাপ্তরা লেনিনের জয়গান করলে কিংবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তার ফলে "লেনিনের অপমান" হলো, এমন উদ্ভট চিন্তাও পোষণ করবে না।

লেনিন বিশ্বে প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনক। আজ আরো তেরটি দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে এবং পুঁজিবাদের সঙ্গে সর্বদার জন্য সরাসরিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ একটি বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এই অবস্থায় পুঁজিবাদের দেশগুলিতেও যেমন সমাজতন্ত্র একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি, তেমনই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও পুঁজিবাদ তার সমাজ-দর্শন ও প্রতিযোগিতার যাবতীয় শক্তি নিয়ে নাক গলাবার মরীয়া প্রচেষ্টা চালায়। বিশ্বজোড়া এই সংঘাতের মধ্যে অবিরাম লেনিনীয় হবার সাধনা ব্যতিরেকে কোনো একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষেও সর্বদা মাথা ঠিক রাখা সহজ হয়ে ওঠে না। ফলে অর্থনীতি এবং সমাজক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরও নানা জাতীয়তাবাদী চিন্তা এবং বুর্জোয়া রোগ রাষ্ট্রযন্ত্রে গজায়—অর্থাৎ ঐসব দেশ স্পষ্টতই সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী ভাবধারার খপ্পরে পড়ে। লেনিনের রাষ্ট্র নিশ্চিতই তাদের সমাজতন্ত্র স্থাপন, নির্মাণ ও গঠনে সাহায্য করেছে, তার স্বীকৃতি দেওয়া সহজ; কিন্তু নিজেদের রাষ্ট্রকেও লেনিনবাদে উত্তীর্ণ করার সাধনায় ঘাটতি পড়া তখনো অসম্ভব নয়। তার প্রমাণ হামেশাই দেখা যায়। মাও-সেতুং-এর মতবাদ লেনিনবাদের পথ থেকে সেই বিচ্যুতিরই প্রতিমূর্তি।

আন্তর্জাতিকতা সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত ধর্ম। স্বদেশে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র-বিরোধী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা দ্বারাই শুধু নয়, বিশ্ব-প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা না করে জাতীয় প্রলেতারীয় রাষ্ট্র এবং সমাজব্যবস্থাকে রক্ষা করা যায় না। অথচ চীন-এর নেতারা এমন কথাও বলতে শুরু করেছেন যে, আজ আর কোনো সমাজতান্ত্রিক শিবির নেই এবং তাকে রক্ষা করারও কোনো প্রয়োজন নেই। আর এই তাত্ত্বিক প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বন-জার্মানির সঙ্গে চুটিয়ে শুধু লেন-দেন-এর বাণিজ্য নয়, সমাজতান্ত্রিক জগতের বিরুদ্ধে তীব্র

প্রতিহিংসাপরায়ণ ঐ বন-এর সহযোগিতায় পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণেও চীন-এর নেতারা কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করছেন না। অথচ পৃথিবীর বুর্জোয়া শিবিরের কার্যকলাপকে লক্ষ্য করলেই পাল্টা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের কর্তব্যগুলি বেরিয়ে আসে। স্বদেশের কি বিপুল প্রতিবাদ, এমন কি স্বদেশের দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতাকে পর্যন্ত উপেক্ষা করে বৃটিশ বুর্জোয়া শাসকেরা কিভাবে ইংলণ্ডে ইংয়াকি ও জার্মান ফৌজকে ঘাঁটি বানাতে দেয় এবং সম্পূর্ণ অকারণ ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করে তার মধ্যেই বুর্জোয়া শিবিরের বিশ্ব-ঐক্য প্রতিফলিত। কি নিদারুণ অসঙ্গতি নিয়ে ফ্রান্সের শাসকেরা জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে আজও কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে চলে, তার মধ্যেও দেখা যায় যে, সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ব-পুঁজিবাদের সংহতি আজও কত শক্ত। কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজতান্ত্রিক সংহতি যদিও লেনিনবাদের আত্মা, তবু সেই আন্তর্জাতিক দায়িত্বকে অস্বীকার করে পৃথিবীতে নানা রঙ-বেরঙএর পাতিবুর্জোয়া সমাজতন্ত্র সৃষ্টি হয়েছে, শুধু তাই নয়, তাঁরা আবার লেনিনবাদের নামে শপথ ঘোষণাও করেন।

লেনিনের জীবনই লেনিনবাদীদের শিক্ষণীয়। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার মধ্যে পাতিবুর্জোয়া ভাবধারা চুঁইয়ে আসে, একেবারেই কোনো আনকোরা কথা নয়। এবং তার চেহারা দেখে ভীত কিংবা আতংকিত হওয়াও লেনিনবাদ নয়। স্বয়ং লেনিন — কাউটস্কি প্লেখানভ বুখারিন থেকে শুরু করে ট্রটস্কি পর্যন্ত বিশ্বখ্যাত দিক্‌পালদের সঙ্গে লড়াই ক'রে লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। আজ বিশ্ব-পুঁজিবাদের চূড়ান্ত ধস ও ভাঙনের দিনে অযুত অযুত নতুন পাতি-বুর্জোয়া স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক আসরে উপস্থিত হচ্ছেন। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্বদর্শনও আজ এমনই শক্তিশালী যে, লেনিনের ইস্পাত-দৃঢ়তা নিয়ে লেনিনবাদীরা অবশ্যই পৃথিবীকে জয় করবেন।

ডায়ালেকটিক এবং লেনিনের রাজনীতি

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

এক

বুর্জোয়া ইতিহাসবিদ্‌দের কেউ কেউ লেনিনকে কেবল 'man of action' এবং 'brilliant opportunist and tactician' বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু লেনিনের রচনাবলীর সঙ্গে যাঁদের সামান্য পরিচয়ও আছে তাঁরা জানেন এই ধরণের চরিত্র-চিত্রণ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। লেনিনবাদের ছাত্রমাত্রই জানেন যে তত্ত্বের ক্ষেত্রেও লেনিনের অবদান অপরিসীম। রাশিয়ার মতো অনগ্রসর দেশে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ; আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক সংগ্রামের পরস্পর সম্পর্ক; সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র; কৃষি-সংক্রান্ত তত্ত্ব; রাষ্ট্র ও বিপ্লব; রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল ও সমাজবাদী সমাজগঠনে পার্টির অপরিহার্যতা; বুর্জোয়া দর্শনের নতুন চিন্তাধারার বস্তুবাদী বিচার; ডায়ালেকটিকাল পদ্ধতি এবং জ্ঞানের তত্ত্ব ইত্যাদি নানাপ্রশ্নে লেনিনের রচনাবলী মার্কসবাদের ভাণ্ডারকে অপরিমেয় ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করেছে। লক্ষণীয় এই যে লেনিনের এই তাত্ত্বিক অবদান একজন 'বিশুদ্ধ' তত্ত্ববিদের মস্তিষ্ক-চর্চার পরিণতি নয়। মার্কস বা এঙ্গেলস তাঁদের জীবদ্দশায় যা-যা দেখে যেতে পারেননি বা যে-সব বিশ্লেষণ তাঁদের রচনায় পূর্ণাঙ্গ আকার লাভ করে নি সেই সমস্ত শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য লেনিন অ্যাকাডেমিশিয়নের ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবীকর্মে প্রস্তুত করার জন্য, পার্টিকে বিপ্লবসম্পাদনের যোগ্য হাতিয়ারে পরিণত করার জন্য তিনি মার্কসবাদী তত্ত্বকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছিলেন।

লেনিনের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে যে সংস্কারবাদী প্রবণতা দেখা দেয় তার বিরুদ্ধে তীব্র আদর্শনৈতিক সংগ্রামকে পরিচালনাকালে তিনি হেগেল সম্পর্কে সুগভীর অধ্যয়ন করেন (১৯১৪-১৬)।[১] সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে

ভাবাদর্শগত সংগ্রামের কাজে হেগেলের The Science of Logic পাঠ ছিল লেনিনের কাছে একান্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য। কেন তাঁর কাছে এমন মনে হয়েছিল? তার কারণ, সোশ্যালিষ্ট আন্তর্জাতিকের মধ্যে যে-সব ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল তার বিরুদ্ধে ক্ষুরধার সংগ্রাম পরিচালনা করতে গেলে এবং সেই সব সর্বহারাবিপ্লব-বিরোধী ধারণাকে শ্রমিকশ্রেণীর মন থেকে নির্মূল করতে গেলে মার্কসবাদের যা মর্মবস্তু—অর্থাৎ তত্ত্ব ও ব্যবহারের ডায়ালেকটিকাল ঐক্য-সম্পর্ক[২]—তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা একান্তভাবেই অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত এবং ব্যবহারিক কর্মজীবনের এই সম্পর্ককে 'সাধারণভাবে' এবং 'একবারের মতো এবং শেষবারের মতো' বোঝা যায় না; কারণ মার্কসবাদ একটা দার্শনিক সূত্রসমষ্টি নয়—মার্কসবাদ হলো সমাজের বিপ্লবী রূপান্তরের দিগ্‌দর্শক। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাসমূহকে পরাস্ত করার সংগ্রামের প্রক্রমই মার্কসীয় পদ্ধতিকে সমৃদ্ধ করে। কোন্ কোন্ গ্রন্থপাঠ একান্ত প্রয়োজন এবং সেইসব রচনার প্রকৃত তাৎপর্য কিসে সম্পর্কে মার্কস-বাদীকে সঠিক পথের নিশানা দেয়। এই পরিবেশে মার্কসবাদীরা একটি বিপ্লবী পার্টিতে সংগঠিত হয়ে, তত্ত্বকে অধিগত করে, তাকে সমৃদ্ধ করে এবং তত্ত্বের আলোকে বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে সামাজিক রূপান্তরের কাজ ত্বরান্বিত করে।

এটা হঠাৎ কোনও ঘটে যাওয়া ব্যাপার নয় যে লেনিন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে —যখন পুঁজিতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ বিরোধ প্রকট হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং বৈপ্লবিক সংকট একটা পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল—দর্শন এবং বিশেষ-ভাবে মার্কসীয় ডায়ালেকটিক সম্পর্কে সুগভীর অধ্যয়নের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। লেনিনের মনে এ বিষয়ে কোন দ্বিধা ছিল না যে, একমাত্র বস্তুবাদী ডায়ালেকটিক-এর যুক্তিসূত্র অনুধাবন করেই সাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের মার্কসীয় বিশ্লেষণ, প্রথম মহাযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র উদ্‌ঘাটন, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বের সুবিধাবাদী রাজনীতির মুখোশ-উন্মোচন এবং সর্বহারা শ্রেণীর শোষণমুক্তি-সংগ্রামের রণনীতি এবং কৌশল নির্ধারণ সম্ভবপর। এই আমলের লেনিনের বিভিন্ন রচনা (যথা 'ইম্পিরিয়ালিজম অ্যাজ দি হাই-য়েস্ট স্টেজ অব ক্যাপিটালিজম', 'সোশ্যালিজম অ্যাণ্ড ওঅর', 'দি ইউনাইটেড স্টেটস্ অব ইউরোপ স্লোগান', 'দি জুনিয়াস প্যাম্ফলেট', 'সোশ্যালিস্ট রেভো-

ল্যূশন অ্যাণ্ড দি রাইট অব্ নেশনস টু সেল্ফ ডিটারমিনেশন' যা মার্কসবাদী ক্লাসিকস্-এর মর্যাদা লাভ করেছে 'ফিলজফিক্যাল নোট বুকস' থেকে অবিচ্ছেদ্য।

ডায়ালেকটিক-এর ভূয়িষ্ট পর্যালোচনার ফলে লেনিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে দর্শনের মৌলিক প্রশ্নে এবং ডায়ালেকটিকের পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ক্রুপস্কায়া তাঁর 'লেনিনের স্মৃতি' গ্রন্থে বলছেন যে Encyclopaedia Granat-এর জন্যে Essay on Marxism লেখার জন্যে লেনিন হেগেল সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন শুরু করেন। এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে দেখা যায় লেনিন দার্শনিক প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ক্রুপস্কায়ার মন্তব্য: "This was not the usual way of presenting Marx's teaching" কথাটি সত্য। লেনিনের আগে মার্কসীয় অর্থনীতির উপর অনেক 'সরলীকৃত ভাষ্য' প্রকাশিত হয়েছিল। মার্কস-এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর লেনিনের Essay প্রথম রচনা যেখানে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী যথোচিত গুরুত্বসহকারে উপস্থাপিত হয়েছে। ডায়ালেকটিককে এইভাবে অধিগত করার ফলেই তাঁর পক্ষে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের রণনীতি ও কৌশল সংক্রান্ত সমস্যাদি অনুধাবন করা সম্ভবপর হয়েছিল। ডায়ালেকটিক তাঁর সম্পূর্ণ অধিগত ছিল বলেই তিনি কোন বাঁধাধরা ফরমুলা বা সূত্রসমষ্টি সৃষ্টি করে যাননি। তিনি প্রায়শই বলতেন: 'সত্য সব সময়েই বাস্তব' ('দি ট্রুথ ইজ অলওয়েজ কনক্রিট')। ১৯১৭ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে 'পুরনো বলশেভিকরা' পরিস্থিতির নিরপেক্ষ বিচারে ১৯০৫-৬এর স্লোগানের ('প্রোলেতারিয়েত ও কৃষকদের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব'-এর স্লোগানের) পুনরাবৃত্তি করেন। উদ্দেশ্য: অস্থায়ী সরকারের প্রতি সর্তসাপেক্ষ সমর্থন জানানো (অর্থাৎ অস্থায়ী সরকার যে পরিমাণে শান্তি চুক্তি প্রভৃতি গণতান্ত্রিক কর্তব্য সম্পাদন করেন তার সেই সব ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানানো)। ১৯১৭ সালে রুশ দেশের এই পরিস্থিতিতে বলশেভিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, নতুন পরিস্থিতিতে পুরনো স্লোগান কাজে লাগানোর চেষ্টা করো না। বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হও।

লেনিনের বৈশিষ্ট্য ছিল তোতাপাখির মতো পুরনো স্লোগানের পুনরাবৃত্তি নয় —নতুন পরিস্থিতির বিশ্লেষণ এবং সেই বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিকর্তব্য নির্ধারণ। তাই যখন তিনি দেখলেন যে এই 'গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব' বর্তমান এবং তা একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে তখন নতুন বাস্তব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে —শ্রেণীবিন্যাসও পরিবর্তিত হয়েছে। 'গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব'-এর স্লোগানের

বিচারবিহীন পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পেটি-বুর্জোয়া শক্তিসমূহ অস্থায়ী সরকারকে সমর্থন করে বুর্জোয়া শ্রেণীশাসনকে সংহত করতে চেয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজবাদী বিপ্লবের বিকাশমান পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থানুকূল এই ধরণের রাজনীতিক সিদ্ধান্ত লেনিনের মতে ছিল শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ও বিপ্লব প্রচেষ্টার পথে বিঘ্নস্বরূপ।

নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে পার্টির সঠিক নীতি নির্ধারণে লেনিনের 'এপ্রিল থিসিস-'এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদ করে মেহনতী জনতার রাষ্ট্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক কর্তব্যের তাত্ত্বিক বনিয়াদ লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে অত্যন্ত দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'-এর উপ-শিরোনামা 'মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব ও বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণীর কর্তব্য'। উপ-শিরোনামাটি অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত এবং উপ-শিরোনামাটির অর্থেই আমরা সাধারণত (এবং সঙ্গত কারণেই) 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' কে গ্রহণ করে থাকি। কিন্তু ডায়ালেকটিক পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকেও এই গ্রন্থটি গভীরতর আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

একটা বৈজ্ঞানিক থিয়োরি হিসেবে, কর্মের পথপ্রদর্শক তত্ত্ব হিসেবে মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে লেনিন কেবল কতকগুলো শাশ্বত অনবচ্ছিন্ন নীতির তালিকা পেশ করেন নি। পরন্তু লেনিন দেখিয়েছেন যে মার্কসের রাষ্ট্রতত্ত্বের বিকাশে সংগ্রামরত শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা ও অভিজ্ঞতা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। **'Marxism is the conscious reflection of an unconscious process'** রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণায় স্বাভাবিকভাবেই শ্রেণীর অভিজ্ঞতা বিধৃত হয়। এবং সেই কারণেই লেনিন দেখান যে কিভাবে মার্কস-এঙ্গেলস ১৮৪৭-৪৮ সালে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে এই সত্যে উপনীত হন যে রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণীগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যন্ত্র, এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীর উপর নির্যাতন চালাবার যন্ত্র। ইতিহাসের বস্তুবাদী বিশ্লেষণের ফলে মার্কস-এঙ্গেলস দেখান যে রাষ্ট্রের যে-সব বৈশিষ্ট্যকে 'স্বাভাবিক' এবং অপরিহার্য বলে ধরে নেওয়া হয় সেগুলো আসলে সমাজের শ্রেণীবিভাগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

১৮৪৭-৪৮-এর যুগে শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদী রাজনীতিক নেতা ও চিন্তাবিদের দল মার্কস-এঙ্গেলসের এই বৈজ্ঞানিক মতের বিরোধিতা করেন। লেনিন বলেন যে মার্কসের পর প্রত্যেক দেশে মূলধনী-পুঁজি ও একচেটিয়া পুঁজি

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মারফত পৃথিবীর বাজার দখল করার কাজে এগিয়ে এসেছে, শ্রেণীশোষণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই কারণে রাষ্ট্রের নির্যাতন-মূলক এবং জঙ্গী চরিত্র আরো বেশি সংহত হয়েছে। (সমকালীন পৃথিবীতে রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় পদ্ধতিতে আলোচনা করলে, ·যে-আলোচনার অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে, দেখা যায় লেনিনের বিশ্লেষণ কত বৈজ্ঞানিক। লেনিন-বর্ণিত শ্রেণীশোষণ কিভাবে বেড়ে চলেছে তার তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণও জানা যাবে এই ধরনের আলোচনায়।) এর পাশাপাশি লেনিন দেখাচ্ছেন কিভাবে শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদী এবং মধ্যবিত্ত-সুলভ প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠেছে, মার্কসের রাষ্ট্রতত্ত্ব থেকে তা কতটা সরে এসেছে, যার পরিণতি দেখা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অন্য দেশের বিরুদ্ধে "পিতৃভূমিকে রক্ষা' করার নামে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সংস্কারবাদী নেতৃত্বের আত্মসমর্পণের নীতির মধ্যে। সেই কারণেই লেনিনের মতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চূড়ান্ত সংগ্রামকে সার্থক করতে গেলে এবং সুবিধাবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে গেলে রাষ্ট্র সম্পর্কে ডায়ালেকটিকাল দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের প্রশ্ন অত্যন্ত জরুরি প্রশ্ন হিসাবে দেখা দেয়। সেই কারণেই প্রয়োজন হলো :

(১) ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলসের বক্তব্যের বিশ্লেষণ।

(২) বিপ্লবী সংগ্রামে, বিশেষত ১৮৪৮-এর অভ্যুত্থান, ১৮৭১-এর পারী কমিউন এবং ১৯০৫ এবং ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ এবং মার্কসবাদে যে এই সব গণসংগ্রামের অভিজ্ঞতা বিবৃত ও তার ফলে এই মতবাদ যে সমৃদ্ধ হয়েছে তা প্রতিষ্ঠা করা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলতে পারে, ১৮৭১-এর পরেই মার্ক'স-এঙ্গেলসের পক্ষে তাঁদের ধ্যান-ধারণাকে মূর্তায়িত করা সম্ভব হয়েছিল :

[ক] পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ করতে হয়, তাকে অবিকৃত রেখে বা তার সংস্কার সাধন করে তাকে ব্যবহার করা চলে না, বা শ্রমিকশ্রেণী আগের তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্র কেবল করায়ত্ত করেই তার নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চালনা করতে পারে না, এবং

[খ] নতুন শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা হবে 'কমিউন'-এর মতো, যেখানে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী প্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকবে এবং যা ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের ক্রমাবলুপ্তির দিকে অগ্রসর হবে : অর্থাৎ ১৮৪৭ সালে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে ধ্বংসপ্রাপ্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের কী দিয়ে পূরণ

হবে মার্কস-এঙ্গেলস এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন সম্পূর্ণ বিমূর্তভাবে। পারী কমিউনের অভিজ্ঞতার আলোকে সেই বিমূর্ত ধারণা মূর্ত অবয়ব লাভ করে। এটা সম্ভব হয় শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ব্যবহারিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতার আলোকে।

(৩) মার্কসবাদ যে অচল অনড় মতসমষ্টি নয়, তার যে বিকাশ ঘটে এবং শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের দিগ্‌দর্শক হিসেবে এই মতবাদ যে আরো বিকশিত হতে পারে, শ্রমিক আন্দোলনে ভ্রান্ত ধারণা ও বিরোধী শ্রেণীর মানসিক প্রবণতাজাত বিচ্যুতির বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামের মধ্যেই যে একমাত্র এই বিকাশলাভ সম্ভব, এই সত্য প্রতিষ্ঠা করা। বিরোধের মাধ্যমেই থিয়োরিরও বিকাশলাভ ঘটে—ডায়ালেকটিকের মূলসূত্র এইভাবেই কার্যকর হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একদিকে সুবিধাবাদী ও অন্যদিকে নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র আদর্শনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার মাধ্যমেই মার্কসের নিজের ধারণা স্বচ্ছতর হয়। লেনিন এইসব বিরোধের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁর সমসময়কার শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেন। এইভাবেই তিনি হেগেল অধ্যয়ন করে যে ডায়ালেকটিকাল পদ্ধতিকে আয়ত্ত করেন তাকে বাস্তবে রূপ দেন। শ্রমিক আন্দোলনে ভাবাদর্শ এবং থিয়োরির ব্যবহারিক প্রয়োগমূল্য আছে সেই কারণে থিয়োরিকে অধিগত করার জন্য সর্বদা নিজেদের প্রস্তুত রাখতে হয়, থিয়োরিকে শাণিত করতে হয়; কঠোর তত্ত্বগত প্রস্তুতির মাধ্যমে শ্রেণীর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে জানতে হয়। যদি এই অভিজ্ঞতাকে নেহাতই রুটিনের পর্যায়ে ফেলা যায় তাহলে শ্রমিকশ্রেণী ধনিকশ্রেণীর ধ্যান-ধারণার আধিপত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। সুবিধাবাদী 'থিয়োরি'র ভূমিকা হলো যাতে এই ধরনের ঘটনা ঘটে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। এই বোধ থেকেই লেনিন সংস্কারবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কারণ সংশোধনবাদীদের মুখ্য কাজই ছিল শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে সংস্কারবাদের আয়তির মধ্যে বা জাতীয় গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা।

বর্তমান প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই; প্রয়োজনীয়তাও বিশেষ নেই। মার্কসবাদের প্রতিটি ছাত্রকেই 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' পাঠ করে (এবং বার বার পাঠ করে) দেখতে হবে লেনিন কিভাবে মার্কসবাদের বিকৃতিকারীদের বিপ্লব বিরোধী স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়েছিলেন। সুবিধাবাদী

হিসাবে এই সংস্কারপন্থীরা স্বাভাবিকভাবেই ডায়ালেকটিকাল পদ্ধতি থেকে সরে যান; তাঁরা তাঁদের সুবিধাবাদী রাজনীতির গরজ-ঘেঁষা যুক্তিবাদ হিসেবে মার্কসের রচনাবলী থেকে (বিশেষত আগেকার রচনাবলী থেকে) বিক্ষিপ্ত অংশ উদ্ধৃত করে নিজেদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার অপপ্রয়াস পান। অনুরূপভাবে, কাউটস্কি এবং তাঁর অনুবর্তীরা গভীরভাবে রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ বা মার্কসের রাষ্ট্রতত্ত্ব অনুধাবন করেননি। নিজেদের সুবিধেমতো মার্কস-এঙ্গেলসের রচনা থেকে ইতিহাস-পারম্পর্য বিচ্ছিন্ন কিছু বাক্যবন্ধ উদ্ধৃত করতেই তাঁদের আগ্রহ ছিল বেশি। এই প্রবণতাকে আমাদের বিচার করতে হবে ১৯১৪ সালের পর সোস্যালিজমের প্রতি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পটভূমিকায়। বিশ্বাসঘাতক নেতৃত্বের সঙ্গে লেনিনের সম্পর্কচ্ছেদ ও 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত। তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত এবং ব্যবহারিক কর্মজীবনের ঐক্যই যে মার্কসীয় দর্শনের অন্যতম মূলসূত্র তা লেনিন প্রতিষ্ঠিত করলেন এইভাবে। সুবিধাবাদীদের ব্যবহারিক কর্মপ্রচেষ্টার সমর্থনে এক বিশেষ ধরনের থিয়োরির (বা থিয়োরির অস্বীকৃতির) দরকার পড়ে।

তাদের ধ্যান-ধারণাকে শ্রমিকশ্রেণীর উপর শ্রমিক-আমলারা জোর করে চাপিয়ে দেয়। এবং শ্রমিক-আমলাদের স্বার্থ শ্রেণীশত্রুর স্বার্থের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত। (যথা ধনিক জাতীয় রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, যে-রাষ্ট্রের মধ্যে তারা তাদের আর্থনীতিক এবং রাজনীতিক [পার্লামেণ্টারি] বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভে সমর্থ হয়।) শ্রমিক-আমলাদের ধ্যান-ধারণার অবস্থান ডায়ালেকটিকের মূল সূত্রের বিপরীত বিন্দুতে। ডায়ালেকটিকের থিয়োরিই একমাত্র থিয়োরি যা শ্রমিকশ্রেণীকে বিভিন্ন ফ্রন্টে আদর্শনৈতিক, রাজনীতিক, আর্থনীতিকও বিভিন্ন দেশে পরিচালিত সংগ্রামের মধ্যে যে-আন্তর-সম্পর্ক বর্তমান সে-সম্পর্কে সচেতন ও বৈজ্ঞানিক চেতনায় প্রবুদ্ধ করে। রাষ্ট্রের ডায়ালেকটিকাল থিয়োরিকে অধিগত করার ফলেই লেনিনের পক্ষে ১৯১৭ সালে বলশেভিক পার্টি ও রুশ দেশের শ্রমিক-শ্রেণীকে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করা সম্ভব হয়েছিল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ডায়ালেকটিকের বহুপার্শ্বতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার মানেই তাঁর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও শাণিত। হেগেলের ডায়ালেকটিকের মূলসূত্র আয়ত্ত করে তিনি বুঝেছিলেন যে ব্যবহারের মধ্য দিয়েই চিন্তা এবং ধ্যান-ধারণার বিকাশ ঘটে। সেই বোধের ফলেই ১৯১৭ সালে তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে তাঁর সাফল্য [illegible] হয়। [illegible] ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর প্রথম

কয়েকমাস 'পুরনো বলশেভিক'রা দোদুল্যমানতা ও দ্বিধাগ্রস্ততায় পীড়িত হন। ডায়ালেকটিকাল দৃষ্টিকোণের অভাবের ফলেই সেদিন 'পুরনো বলশেভিক'দের বক্তব্যে মেনশেভিক ও সোস্যাল-রেভোল্যুশনারী রাজনীতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

দুই

লেনিন জানতেন, জনগণের স্বতঃস্ফূর্তির উপর নির্ভর করে বসে থাকলে বিপ্লব সম্পাদন করা যায় না, শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ না হলে বিপ্লব হয় না। শ্রমিকশ্রেণী সমাজের শোষিত অংশ…অতএব তারা বিপ্লবের পথে এগিয়ে আসবেই, এ-ধারণা অবৈজ্ঞানিক। 'বাইরে থেকে' শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হয়। তাই প্রয়োজন হয় শ্রমিকশ্রেণীর দর্শনে বিশ্বাসী সচেতন উদ্যোগে অভিজ্ঞ কর্মীবাহিনীর—'পেশাদার বিপ্লবী'দের। রাজনীতির ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক শক্তির আবির্ভাব হয়, এই ছিল লেনিনের বিশ্বাস। লেনিনীয় পাটি-ধারণা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার কোনো অবকাশ বর্তমানে নেই। শুধু এইটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে লেনিনীয় পার্টি-ধারণা মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ করেছে এবং তাকে জীবন্ত মতবাদে পরিণত হতে সাহায্য করেছে। কোনো বিপ্লবী পার্টি ছাড়া যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা যায় না, এ-বিষয়ে লেনিনের মনে কোনো দ্বিধা ছিল না।

বুর্জোয়া পাণ্ডিত্যাভিমানীর দল ও সংস্কারবাদী গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা প্রায়শই অভিযোগ উত্থাপন করে থাকেন যে লেনিন ছিলেন "উপদলীয় চক্রান্তকারী" "শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্য বিভাজনকারী" ইত্যাদি। কিন্তু আমরা যদি লেনিনের সময়কার রুশ দেশের সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিবর্তন ও সেই দলের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ধ্যানধারণার তাৎপর্য অনুধাবন করতে চেষ্টা করি এবং লেনিন কিভাবে সেইসব বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন, কিভাবে মার্কসবাদী মতে স্থির-প্রত্যয়, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির ভিত্তিতে দৃঢ়ভিত্তিক, বিপ্লব সম্পাদনের যোগ্যতাসম্পন্ন পার্টি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন—সেই ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হই, তাহলেই এইসব বক্তব্যের অভিসন্ধিমূলক তাৎপর্য বোঝা সহজ হবে।

১৯১৮ সালে পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটে এক বক্তৃতায় জিনোভিয়েভ বলেন যে মেনশেভিক অ্যাকসেলরড একথা বলে বেড়াচ্ছেন যে লেনিনের প্লেখানভ-

বিরোধিতার মূল কারণ ব্যক্তিগত ক্ষমতালিপ্সা। বলা বাহুল্য, ক্ষমতালিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য নয়, বিপ্লবী নীতিতে অবিচল থাকার জন্যই রাজনীতিক প্রশ্নে সংস্কার-পন্থার বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগঠননীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই লেনিনকে সংস্কারবাদী 'অগ্রজ'দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়েছিল।

একথা সুবিদিত যে ১৯০৩ সালে অনুষ্ঠিত রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে পার্টি-নিয়মাবলীর আলোচনায় প্রবল মতভেদ দেখা দেয়। লেনিন চেয়েছিলেন সংগ্রামী চেতনায় ও কর্মে প্রবুদ্ধ একটি ঐক্যবদ্ধ পার্টি গড়তে, যার প্রত্যেকটি সভ্যই বিপ্লবী সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করবে এবং পার্টি শৃঙ্খলা মেনে চলবে। সেই জন্য তাঁর মত ছিল যে পার্টি সভ্য সেই হতে পারবে যে পার্টি-কর্মসূচী মানে, সভ্য চাঁদা দেয় এবং **কোনো একটি পার্টি-সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে** তার কাজে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু মার্তভের প্রস্তাব ছিল যে পার্টির কর্মসূচীর প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি ও পার্টিকে বৈষয়িক সাহায্যদানই সভ্যদের পক্ষে যথেষ্ট; পার্টি-সংগঠনে অংশগ্রহণ ও পার্টিশৃঙ্খলা বাধ্যতামূলক করার দরকার নেই।

লেনিনের সূত্রে পার্টিতে অ-প্রোলেতারীয়, অদৃঢ় লোকদের প্রবেশ কঠিন হয়; সম্ভবপর হয় সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল পার্টি গঠন। অপর পক্ষে, মার্তভের সূত্র অনুযায়ী পার্টি হয়ে দাঁড়াত নিরাকার; অদৃঢ় প্রকৃতির লোকদের প্রবেশের জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত হতো। এই ধরনের পার্টি নিয়ে ধনবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও শ্রেণীশত্রু-দের উপর বিজয়অর্জন শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে কখনও সম্ভবপর হতো না। আপাত দৃষ্টিতে গৌণ এই মতপার্থক্য সূচনা করে দুই রাজনীতির—বিপ্লবী রাজনীতি বনাম আপসকারী সুবিধাবাদী রাজনীতি। সংগ্রাম শুরু হয় বিপ্লবী বলশেভিকবাদ বনাম সংস্কারবাদী মেনশেভিকবাদের।

রাজনৈতিক কারণেই, কেবল সাংগঠনিক কারণে নয়, সেদিন লেনিনকে পার্টিকে বিভক্ত করতে হয়েছিল। ১৮৯৫ সাল থেকে লেনিন ও মার্তভ একসঙ্গে কাজ করে এসেছেন, দুজনের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বও ছিল সুগভীর। কিন্তু লেনিন সেদিন ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের উর্ধ্বে বিপ্লবের স্বার্থকে স্থান দিয়েছিলেন।

ক্রুপস্কায়ার স্মৃতিকথা থেকে আমরা জানতে পারি, পার্টির এই বিভাজন ও মার্তভের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার পর লেনিন তীব্র মানসিক আঘাত পান। কিন্তু কোনো সময়ের জন্যই তিনি বিপ্লবের পথ থেকে সরে এসে সুবিধাবাদিতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার কথা চিন্তা করেননি।

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি গঠনে সংগঠন-সংক্রান্ত মূলনীতির প্রশ্নে লেনিনের অনমনীয় মনোভাব সম্পর্কে ট্রটস্কি সেই সময় লেনিনকে সমর্থন করেননি। পরবর্তীকালে নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে তিনি 'আমার জীবন'-এ লিখছেন :

"Revolutionary centralism is a harsh, imperative and exacting principle. It often takes the guise of absolute ruthlessness in its relations to individual members, to whole groups of former associates. It is not without significance that the words 'irreconcilable' and 'relentless' are among Lenin's favorites. It is only the most impassioned revolutionary striving for a definite end—a striving that is utterly free from anything base or personal—that can justify such a personal ruthlessness. In 1903, the whole point at issue was nothing more than Lenin's desire to get Axelrod and Zasulitch off the editorial board. My attitude toward them was full of respect, and thought highly of them for what they had done in the past. But he believed that they were becoming an impediment for the future. This led him to conclude that they must be removed from their position of leadership. I could not agree. My whole being seemed to protest against this merciless cutting off of the older ones when they were at last on the threshold of an organised party. It was my indignation at his attitude that really led to my parting with him at the Second Congress. His behavior seemed unpardonable to me, both horrible and outrageous. And yet, politically it was right and necessary, from the point of view of organization. The break with the older ones, who remained in the preparatory stages, was inevitable in any case. Lenin understood this before any one else did." ৩

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু এই উদ্ধৃতির মধ্যে ধরা পড়বে যে লেনিনের কাছে মার্কসীয় থিয়োরি এবং বিপ্লবী সংগঠনের নীতি ছিল অচ্ছেদ্যভাবে একসূত্রে গ্রথিত। প্রথমাবধি, নারদনিক, 'বৈধ মার্কসিস্ট' এবং 'ইকনমিস্ট'দের সঙ্গে বিতর্কে লেনিন এ-কথাটাই বিশেষ জোর দিয়ে বলতে চেয়েছিলেন যে বিপ্লবী পার্টির কাছে বিপ্লবী থিয়োরিই হলো তার প্রাণ। পুনরুক্তি হলেও এ-কথাটা বলা দরকার যে

লেনিন ব্যাখ্যাত এই নীতির অর্থ হলো যে পার্টির ইতিহাসে ধ্যান-ধারণার প্রতিটি বহিঃপ্রকাশকেই ভালোভাবে অনুধাবন করতে হয়। পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনে বিভিন্ন রাজনীতিক প্রবণতা, শ্রেণী ও পার্টির বিকাশের ধারায় এইসব প্রবণতার প্রতিক্রিয়া—সব কিছুই বুঝতে হয় শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটিকে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। ১৯১৩ সালে মেনশেভিকদের একটি অংশের পক্ষ থেকে বলশেভিকদের সঙ্গে 'ঐক্য স্থাপনের অভিযান' শুরু হয়। এঁদের বক্তব্য ছিল, ট্রটস্কিও এই সময়ে অগস্ট ব্লকে তাঁদের সমর্থন করেন, তাৎকালিক রাজনীতিক সমস্যাসমূহের চাপ দুই পার্টির মিলনের প্রশ্নটিকে অত্যন্ত জরুরি প্রশ্ন হিসেবে উপস্থাপিত করেছে। এঁরা আরও মনে করতেন তাৎকালিক রাজনীতিক প্রশ্নের অনেক ক্ষেত্রেই দুই অংশের মধ্যে ঐকমত্য খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে কোনো অসুবিধে নেই। মেনশেভিকদের-'ঐক্যকামী' অংশের মৌলিক ত্রুটি ছিল এই যে তাঁরা থিয়োরি ও রাজনীতিক কর্মসূচীর সম্পর্ক বিষয়ে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রসর হননি। তাৎকালিক জরুরি রাজনীতিক প্রশ্নের আপাত দৃশ্যমান 'ঘটনা' দেখে নয়, যে-শ্রেণীসংগ্রামের প্রক্রমের অন্তর্ভুক্ত এই সব জরুরি প্রশ্ন—তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে হয়—এই হলো মার্কসীয় পদ্ধতির শিক্ষা। তাই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পরিহার করে ও নীতিগত পার্থক্যকে দূরে সরিয়ে রেখে রাজনীতিক প্রশ্নের আশু সমাধানের উদ্দেশ্যে 'ঐক্য' স্থাপন করতে গেলে জন্ম নেয় সুবিধাবাদ। লেনিন এই ধরনের সুবিধাবাদকে প্রশ্রয় দিতে পারেন নি। আলোচনা দীর্ঘ না করে বরং পরবর্তীকালে ট্রটস্কি এ-বিষয়ে যা বলেছিলেন তা দেখা যাক। ট্রটস্কি তাঁর এককালের শিষ্য শাখটমানের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক তুলনা দিয়ে ১৯৪০ সালে লিখছেন :

"Most of the documents were written by me and through avoiding principled differences had as their aim the creation of a semblance of unanimity upon 'concrete political questions'. Not a word about the past! Lenin subjected the August bloc to merciless criticism and the hardest blows fell to my lot Lenin proved that in as much as I did not agree politically either with the Mensheviks or the Vperyodists my policy was adventurism. This was severe but was true." ৪

তত্ত্ব ও ব্যবহারের ডায়ালেকটিকাল সম্পর্ক যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারার

ফলেই লেনিন সেদিন সুবিধাবাদীদের সঙ্গে ঐক্য প্রস্তাবে রাজী হতে পারেন নি। ট্রটস্কির ভ্রান্তির কারণও ছিল তাঁর সেদিনকার ডায়ালেকটিক সম্পর্কে বোধের ন্যূনতা।

তিন

১৯০৮ সালের এপ্রিলে লিখিত 'মার্কসবাদ ও সংশোধনবাদ' শীর্ষক রচনায় ৫ লেনিন এটা পরিষ্কার ভাবে দেখান যে বুর্জোয়াশ্রেণী ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে যত বেশি পরিমাণে দেউলিয়া হয়ে পড়ছে সেই পরিমাণে তারা মার্কসবাদের সংশোধনকারী ও দলত্যাগীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে যাতে করে শ্রমিকশ্রেণীকে বিভ্রান্ত করা যায়, সর্বহারাশ্রেণী যাতে করে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে না পারে। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও তাই। দলত্যাগী প্রাক্তন-কমিউনিস্ট এবং বিভিন্ন দলের প্রাক্তন-মার্কসবাদীদের আজ প্রধান কাজই হলো মার্কসবাদ সম্পর্কে জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। একাজ চলেছে অত্যন্ত সুচতুর ও সংগঠিত ভাবে। বিরাট বিরাট গবেষণাকেন্দ্র ও প্রকাশন-সংস্থা স্থাপিত হয়েছে, কমিউনিজমের 'এক্সপার্ট'দের মোটা অঙ্কের টাকায় নিয়োগ করা হচ্ছে কমিউনিজম সম্পর্কে 'ভেতরের অভিজ্ঞতা' বর্ণনা করার জন্য; 'প্রাক্তন কমিউনিস্টদের বিবেক' আজকের ধনিকশাসিত সমাজে বিক্রয়ের পণ্যে পরিণত। আক্ষেপের কথা, শোষিত মানুষের মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এমন কয়েকজন র‍্যাডিকাল বুদ্ধিজীবী ছিলেন এবং আছেন যাঁরা সমাজ রূপান্তরে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকাকে স্বীকৃতি জানাতে প্রস্তুত নন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুজন শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁরা হলেন জঁা পল সার্ত্র ও সি. রাইট মিলস। নন-কনফরমিস্ট সমাজতত্ত্ববিদ্ রাইট মিলস তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের চেতনাকে উন্নততর স্তরে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন ঠিকই কিন্তু ইতিহাসের ডায়ালেকটিককে মেনে না নেওয়ার ফলে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকাকে স্বীকৃতি জানান না। (তাঁর মতে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হলো 'labour metaphysic.') সার্ত্র এবং মিলস উভয়েই ডায়ালেকটিকাল পদ্ধতিকে নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছেন। সার্ত্র ডায়ালেকটিকাল বস্তুবাদ সম্পর্কে একটি সমালোচনা গ্রন্থ[৬] প্রকাশ করেছেন। মিলসের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত

গ্রন্থে ডায়ালেকটিক সম্পর্কে তাঁর বিরূপতা অত্যন্ত স্পষ্ট। মার্কস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলছেন: "His method is a signal and lasting contribution to the best sociological ways of reflection and inquiry available." কিন্তু ঐ বাক্যবন্ধের সঙ্গে তারকা চিহ্ন দিয়ে তিনি পাদটীকায় বলছেন: "I do *not* refer to the mysterious 'laws of dialectics' which Marx never explains clearly but which his disciples claim to use."

ডায়ালেকটিকের প্রতিটি 'law'কে সমালোচনা করার পর তিনি 'সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে: "As a guide to thinking, 'dialectics' can be more burdensome than helpful, for if everything is connected, dialectically. with everything else, then you must know 'everything' in order to know anything, and causal sequences become difficult to trace."[৭]

ডায়ালেকটিককে অর্থাৎ মার্কসীয় যুক্তিবিকাশের মূলসূত্রকে অস্বীকার করার ফলেই মিলসের মতো সমাজ-সমালোচককেও প্রয়োগবাদের আবর্তের মধ্যে বিচরণ করতে হয়েছিল। আলোচনা দীর্ঘ না করেও একথা নিশ্চয়ই বলা চলতে পারে যে কেবল র‍্যাডিকাল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই নয়, শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে আজকের দিনেও নানা সুবিধাবাদী প্রবণতা সক্রিয় আছে। সমাজবাদী আন্দোলনে সুবিধাবাদ এবং তাত্ত্বিক অগ্রগতির সহ-অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়। সুবিধাবাদীরা শ্রমিকশ্রেণীর বিশেষ কোনো অংশের জন্য (শ্রমিক-আমলা) বিশেষ এবং আংশিকভাবে সমস্যার 'সমাধান'-এর জন্য সচেষ্ট হয় এবং শ্রমিক-শ্রেণীকে সেই পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করে। সুবিধাবাদের রাজনীতির বক্তব্য হলো: শ্রেণীসমাজ-উদ্ভূত সমস্যার সমাধান বিশেষ ক্ষেত্রে এবং আংশিক-ভাবে সম্পাদিত হতে পারে। আর ডায়ালেকটিকসের শিক্ষা অনুযায়ী প্রতিটি সমস্যাকে প্রতিটি সংগ্রামকে সামগ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে যে-মৌলিক সংগ্রাম চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হয়।

মার্কসীয় থিয়োরি যদি সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করতে না পারে তবে তা সুবিধাবাদী রাজনীতির যুক্তিবাদে পরিণত হয়। কথাটা আর একটু বিশদ করে বলা দরকার।

থিয়োরি যেমন আমাদের কাজের পথ দেখাবে, কাজের ভেতর দিয়ে হাতে

কলমে থিয়োরিকে, তাত্ত্বিক বিচারের সিদ্ধান্তকে তেমনি আবার পদে পদে যাচাই করে নিতে হবে। যদি হাতে-কলমে সে সিদ্ধান্ত ভুল বা অকার্যকর বলে প্রতিপন্ন হয়, তাহলে থিয়োরি পালটাতে হবে, সিদ্ধান্ত বদলিয়ে কাজে লাগাবার মতো থিয়োরি গড়ে নিতে হবে। সাধারণভাবে মার্কসের বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকের সূত্রকে এইভাবেই বোঝা এবং ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই ব্যাখ্যার ত্রুটি হচ্ছে যে এতে ব্যবহারিক উপযোগিতা বা প্রয়োগমূল্যকে বেশি বড় করে ধরা হয় এবং তাতে ব্যবহারিক সুবিধাবাদের পথ উন্মুক্ত হয়। ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের বৈপ্লবিক ব্যবহারবাদকে অনুধাবন করতে গেলে মার্কস এ-সম্পর্কে যা বলেছিলেন তার পারম্পর্য অনুধাবন করা প্রয়োজন।

মার্কসের প্রথম বক্তব্য, বাস্তব পরিবেশকে বদলাতে গেলে, তাকে আয়ত্ত করতে হলে, পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাকে রূপান্তরিত করতে হলে, প্রথম দরকার পরিবেশকে জানার। দরকার পরিবেশের গতি-প্রকৃতি, তার গতি নিয়ম, তার বিবর্তনের এবং রূপান্তরের নিজস্ব নিয়ম কি—সেটা অনুধাবন করার। কারণ সেই নিয়ম না জেনে, না বুঝে বা না অনুধাবন করে পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করা যায় না।

মার্কসের দ্বিতীয় বক্তব্য, কোন্ পথে পরিবেশের রূপান্তর ঘটানো যাবে সেকথা চিন্তা করার সময় মনে রাখতে হবে বাস্তব পরিবেশ তার নিজের নিয়মে, আমাদের জানা-না-জানা বা ভালো-লাগার মন্দ-লাগার অপেক্ষা না রেখে অবিরাম বদলে চলেছে। পরিবেশকে বদলে নূতন করে ঢেলে সাজতে চাইলে তার নিজস্ব বিবর্তন বা রূপান্তরের বাস্তব নিয়ম কি, কোন্ ধরনের পরিবর্তনের সম্ভবপর বা সাধ্য, কোন্ ধরনের পরিবর্তন তার নিজস্ব গতির নিয়মে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে বা উঠছে, তা জানতে হবে।

মার্কসের তৃতীয় বক্তব্য, পরিবেশের বাস্তব নিয়মকে লঙ্ঘন করা বা তার গতিরোধ করা যদিও সম্ভব নয়, মানুষের সমাজ এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে (যেহেতু, মানুষের সমষ্টিগত ব্যবহারিক জীবন, তার কাজ, তার ইচ্ছা অনিচ্ছা ছাড়া সামাজিক রূপান্তর বা অগ্রগতি সম্ভবপর নয়) পরিবেশের নিজস্ব নিয়মে যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে, যে-ধরনের সামাজিক রূপান্তর অপরিহার্য হয়ে দেখা দিচ্ছে বা দেখে দেবেই, আমরা তাকে সুপরিকল্পিতভাবে আসন্ন এবং অপরিহার্য জেনে ত্বরান্বিত করতে পারি, আসন্ন সমাজ-বিপ্লবকে দ্রুততর করতে পারি—আর সেটাই হলো বিপ্লবী মানুষের এবং বিপ্লবী দলের

কাজ। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে যদি আমরা সচেতন, সচেষ্ট বা সক্রিয় না হই তা হলে সামাজিক রূপান্তরের কাজ দুরূহ হয়ে উঠতে পারে, সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে যেতে পারে। ভ্রান্ত বিশ্লেষণের ফলে দোদুল্যমানতা, দ্বিধাগ্রস্ততা, সুবিধাবাদ এবং অপকৌশল এসে সমাজ-বিপ্লবের অগ্রগতি বেশ কিছু কালের জন্য ব্যাহত ও বিপর্যস্ত করে দিতে পারে।

'Unity of theory and practice'-এর সূত্রকে যদি নিছক প্রয়োগবাদী সুবিধাবাদে পরিণত হতে না দিতে হয় তা হলে ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের উপরে বর্ণিত মূলসূত্রটি মনে রাখতে হবে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রিক রূপান্তরের কাজে দলীয় কর্তব্য নির্ধারণের সময় unity of theory and practice-কে মার্কসের সামগ্রিক বক্তব্যের পারম্পর্যে বুঝতে হবে। ফয়েরবাখ সম্পর্কে মার্কসের তৃতীয় নিবন্ধের কথা যাঁদের স্মরণ আছে, তাঁদের নিশ্চয়ই মার্কসীয় দর্শনে বিপ্লবী কর্মের সংজ্ঞা কি তা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না।

"যে বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিপাদ্য এই যে মানুষ তার পরিবেশ এবং লালন-পদ্ধতি বা শিক্ষার সৃষ্ট জীব মাত্র সে দর্শন একথা ভুলে যায় যে মানুষই তো তার পরিবেশকে রূপান্তরিত করে নেয়, আর লালয়িতা বা শিক্ষক যিনি হবেন তাঁরও তো শিক্ষার দরকার। ফলে এই ধরনের বস্তুবাদী দর্শন সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করে দেখে, যার এক ভাগ সমাজের ওপরে।"

মনে রাখা দরকার, "যখন মানুষের সচেতন কর্ম পরিবেশের রূপান্তরের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখনই মানুষের কাজ বৈপ্লবিক কর্ম হিসেবে দেখা দেয়। পরিবেশের স্বকীয় রূপান্তর এবং মানুষের কর্মের সংযোগ বা একাভিমুখিতাই হচ্ছে বিপ্লবী কর্ম।" রূপান্তরশীল পরিবেশ এবং মানুষের চেতন কর্মজীবনের এই সংযোগকে একমাত্র বিপ্লবী ক্রিয়া হিসেবেই ধারণা করা যায় বা যুক্তিযুক্তভাবে বোঝা যায়। ("The coincidence of changing of circumstances and of human activity can be conceived and rationally understood only as revolutionary practice.")

মার্কসের মতে, পরিবেশের রূপান্তরের নিজস্ব প্রাকৃতিক নিয়ম বুঝে যখন মানুষ নিজে সচেতনভাবে তার কাজকে সেই রূপান্তরের গতিমুখে পরিচালিত করে, তাকে দ্রুততর করার চেষ্টা করে বা তার ঐতিহাসিক পরিণতিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে আনে, তখনই আমরা বিপ্লবী কর্মের পরিচয় পাই। নইলে যে-কোন সময় কেবল আমাদের ব্যক্তিগত দলগত বা সমষ্টিগত কাজের সুবিধে অসুবিধের গরজের দিকে তাকিয়ে আমাদের কাজের নীতি বা সংগ্রাম কৌশলকে নির্ধারণ করলেই তা বৈপ্লবিক কর্ম হবে না; বা মার্কস যে-অর্থে unity of theory and practice-এর কথা বলেছিলেন তার বৈপ্লবিক তাৎপর্য বোঝা যাবে না। মাপকাঠি দুটো: প্রথম পরিবেশের স্বরূপ এবং তার রূপান্তরের গতি কোন্ দিকে বাস্তবভাবে (আমাদের সাময়িক স্বার্থে কোনটা [illegible] কোনটা মন্দ সে

বিচার স্থগিত রেখে) সেটা বুঝতে হবে; দ্বিতীয়, সেই রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করার জন্ত আমাদের কাজ করতে হবে। তবেই আমাদের কাজ বিপ্লবী কর্মের মর্যাদা পাবে, নইলে নয়। আমাদের থিয়োরি এখন আমরা যা করছি, কেবল যদি সেই কাজের লেজুড় ধরে চলে বা সেই কাজের ওকালতি হিসেবে দেখা দেয় তাহলে তাকে বিপ্লবী মতবাদ বলে গণ্য করা যায় না। unity of theory and practice-এক অর্থে এখানেও আছে। তাই বলে এখন যা করছি, বা যেটুকু করছি সেটাই ভালো, তার বেশি আর কিছু করা যায় না—এই ধরনের ওকালতির পথ পরিষ্কার করার জন্ত মার্কস তাঁর unity of theory and practice-এর সূত্র দিয়ে যান নি। ইতিহাস এবং পরিবেশ নির্ভর সামাজিক রূপান্তরের ধারণা প্রথমে বৈজ্ঞানিক বিচারের সাহায্যে যাচাই করে নিয়ে, সম্ভাব্য রূপান্তরের স্বরূপ এবং গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে পরিকল্পনা করে নিয়ে সেই রূপান্তরকে বাস্তবে সম্ভবপর করে তোলার কাজই বিপ্লবী দায়িত্ব। সমসাময়িক ক্রান্তিকালের বিচারেও তাই সম্ভাব্য বা আসন্ন রূপান্তরের স্বরূপ বিচার এবং তার প্রকৃতি নির্ধারণ করাই প্রথম কথা এবং বড় কথা। কারণ তার মাপকাঠিতে কাজের যাচাই হবে; 'practice'—'revolutionising practice' কিনা বোঝা যাবে।

লেনিন তত্ত্ব ও ব্যবহারের ঐক্যের এই ডায়ালেকটিকাল নীতি অধিগত করতে পেরেছিলেন বলেই সুবিধাবাদিতার 'বিপ্লবী' আবরণ উন্মোচিত করতে পেরেছিলেন। এই কারণেই বলা যায়, ডায়ালেকটিক পদ্ধতির রাজনীতিক তাৎপর্যও বর্তমান।

নির্দেশিকা

১ মস্কোর প্রোগ্রেস পাব্লিশার্স প্রকাশিত Lenin, Collected Works vol. 38 (Philosophical Notebooks) দ্রষ্টব্য।

২ এ প্রসঙ্গে মার্কসের Theses on Feurbach-এর তৃতীয় নিবন্ধ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

৩ Leon Trotsky. My Life, Grosset & Dunlap, New York 1960, pp. 161-2.

৪ Leon Trotsky, In Defense of Marxism, Merit Publishers, New York, 1965, p 141.

৫ Reprinted in V. I. Lenin's Marx Engels Marxism Progress Publishers, Moscow, 1968, Collected Works, Moscow, vol, 15, pp 29-39.

৬ Jean Paul Sartre, Critique of Dialectical Reason.

৭ C. Wright Mills, The Marxists, Pelican Books, 1963, pp. 129-30.

পরিচয়
বর্ষ ৩৯ । সংখ্যা ১২
আষাঢ় । ১৩৭৭

সূচিপত্র

কৃষক-সংগ্রাম সংখ্যা ১৩৭৭

প্রবন্ধ

সিপাহীবিদ্রোহের আর্থনীতিক পটভূমি । ভবানী সেন ১১৪১
বঙ্গদেশের কৃষক । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১১৫৬
নীলদর্পণ প্রসঙ্গে । ক্ষেত্র গুপ্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিনোদিনী দাসী ১১৬২
বাঙলাদেশের সাঁওতাল বিদ্রোহ । গৌতম চট্টোপাধ্যায় ১১৯৫
পাবনার বিদ্রোহীদের সপক্ষে । রমেশচন্দ্র দত্ত ১২৪৫
হাজং আন্দোলনের এক অধ্যায় । আশু দত্ত ১২৬৩
বাঙলাদেশে কৃষক আন্দোলনের গোড়ার যুগ । সঞ্জয় গুপ্ত ১২৭৩
পাবনার কৃষক বিদ্রোহ । মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় ১২৯৯

রিপোর্টাজ ও গল্প

লাখে না মিলয়ে এক । গোলাম কুদ্দুস ১১৭১
সামনে লড়াই । অসিত ঘোষ ১২৫৩
শহীদ কম্পরাম সিং । সত্যেন সেন ১২৮৩

কবিতা

মাটি । তরুণ সান্যাল ১২০৩
ধানের আশ্চর্য গন্ধ । কৃষ্ণ ধর ১২৭৮
এখন গোধূলিলগ্ন, এখন বিবাহ । অমিতাভ দাশগুপ্ত ১২৭৯

নাটক

জমীদার দর্পণ । মীর মশার্‌রাফ হোসেন ১২০৫

বিয়োগপঞ্জী

ত্রৈলক্য মহারাজ স্মরণে । শান্তিময় রায় ১৩১১
ই. এম. ফর্স্টার । হিরণকুমার সান্যাল ১৩১৫
ডক্টর সাধন ভট্টাচার্যের স্মৃতির উদ্দেশে । দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১৭

প্রচ্ছদ : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য । হিরণকুমার সান্যাল । সুশোভন সরকার ।
অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র । গোপাল হালদার । বিষ্ণু দে । চিন্মোহন সেহানবীশ ।
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় । সুভাষ মুখোপাধ্যায় । গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণ সান্যাল

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত ।

পরিচয়
বর্ষ ৩৯ : সংখ্যা ১২
আষাঢ় । ১৩৭৭

সিপাহীবিদ্রোহের আর্থনীতিক পটভূমি

ভবানী সেন

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের আর্থিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস লিখতে বসে এখনো অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক গদগদভাবে ইংরেজের অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে থাকেন। হয়তো কতকটা সেই কারণেই ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে জাতীয় অভ্যুত্থান বলে মেনে নিতে তাঁদের অসুবিধা হয়। ১৮৫৭ সালের আগেকার ভারতে একশো বছর ধরে ইংরেজ ভূস্বামী ও বণিকদের যে-বর্বর শোষণ চলেছিল তা তাঁদের অজ্ঞাত নেই, কিন্তু সেই লুণ্ঠন-অভিযানের ভিতর তাঁরা শুধু এক মধ্যযুগীয় বাদশাহীর অবসান ও এক আধুনিক সমাজের জন্ম-যন্ত্রণাই দেখে থাকেন। তাই ১৮৫৭ সালের ভিতর তাঁদের নজরে পড়ে শুধু বাদশাহীর পুনরুত্থান, ধর্মগত কুসংস্কারের অভিযান এবং উন্মত্ত সিপাহীদের হিংস্র বর্বরতা।

সুখের বিষয় নবীন ভারতের ঐতিহাসিক উল্লিখিত বন্ধ্যা-দৃষ্টিকোণের জবাব দিতে আরম্ভ করেছেন। ইতিহাসের আলোচনা ছাড়াও আর্থনীতিক ঘটনা-বলীর বিশ্লেষণ দ্বারাও এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে পৌছুতে হবে যে ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল এই একশত বৎসরে ভারতের প্রতিটি শ্রেণীই উৎপীড়িত ও সর্বস্বান্ত হয়েছে, ভেঙেচুরে গেছে ভারতের স্বাধীন সামাজিক বিকাশের স্বতন্ত্র শক্তি এবং তারই ধূমায়িত অসন্তোষ ১৮৫৭ সালের আর্থনীতিক পটভূমিকা

রচনা করেছে। সুতরাং ১৮৫৭ সালের সিপাহীদের সশস্ত্র ভূমিকার পিছনে যে সমগ্র ভারতের সর্ব-শ্রেণী ও সর্ব-ধর্মের সমস্ত মানুষের এক নতুন চেতনা ছিল তা অস্বীকার করলে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হয়। আর এইটুকু সত্য যদি একবার মেনে নেওয়া যায় তাহলে তার পরবর্তী মহৎ সত্যটি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সে-সত্যটি হলো এই যে, ১৮৫৭ সালে ঘটেছিল একটি স্বতঃস্ফূর্ত জাতীয়তার অভিযান, যদিও তার মূল প্রেরণা ও মূল শক্তি ছিল অস্পষ্ট, বিভক্ত ও অপরিণত।

ইংরেজ আগমনের সমসাময়িক ভারত

রবার্ট ক্লাইভ ১৭৫৭ সালে মুর্শিদাবাদ শহরে প্রবেশ করার পর এক চিঠিতে লিখেছিলেন — "এই শহরটি লণ্ডনের মতোই বৃহৎ, জনবহুল এবং সমৃদ্ধিশালী। লণ্ডনের সঙ্গে তার পার্থক্য এই যে লণ্ডনের তুলনায় মুর্শিদাবাদে অনেক বেশি সম্পত্তিশালী ধনী আছেন।" ক্লাইভের এই বৃত্তান্তের ভিতর এটা বেশ বুঝতে পারা যায় সমৃদ্ধির দিক থেকে তৎকালীন বাঙলা ইংলণ্ডের চেয়ে খাটো ছিল না।

সম্রাট আকবরের সময় থেকে আওরঙজেবের সময় পর্যন্ত যদি ভারতীয় সমাজব্যবস্থার একটা যুগ ধরা যায়, তাহলে সে-যুগের সামাজিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য দাঁড়িয়েছিল এইরূপ — সবার উপরে রাষ্ট্রশক্তির অধিনায়ক ছিল একটি অভিজাত শ্রেণী এবং সবার নিচে ছিল একধরনের গোলাম ও ভূমিদাস। এই দুটো শ্রেণীর মাঝামাঝি ছিল জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ এবং তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বণিক এবং কারিগরশ্রেণী। তৎকালীন ভারতীয় কারিগরদের কর্মদক্ষতা ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ, কিন্তু এই কারিগরশ্রেণী যে সমগ্র-ভাবেই সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠছিল তা নয়। তাদের মেহনতের সম্পদ নিয়ে সবার উপরে অভিজাত শাসকশ্রেণী এবং তারপর এক নতুন বণিকশ্রেণী সমৃদ্ধিশালী হচ্ছিল। ক্রমশ অভিজাতশ্রেণীর ক্ষমতা হ্রাস হতে থাকে আর মধ্যবিত্ত বণিকশ্রেণী বেড়ে উঠতে থাকে নতুন প্রভাবশালী সামাজিক শক্তি হিসেবে।

মানরিক নামক জনৈক বিদেশীর বিবরণে দেখা যায় যে ১৬২৯-১৬৪৩ সালে

পাটনা শহরে ৬০০ জন ধনী ব্যাপারি ছিল এবং তারা ছিল বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী। ১৬১৯-১৬৭০ সালের মধ্যে বিরজী ভোরা নামক একজন গুজরাটি বণিকের একচেটিয়া কারবার ছিল মালাবার উপকূল থেকে সুরাট পর্যন্ত। (ইকনমিক হিসট্রি অব ইণ্ডিয়া (১৬০০-১৮০০), রাধাকমল মুখার্জি)

ইংরেজরা যখন এদেশে বাণিজ্যবিস্তার শুরু করে তখন তাদের প্রধান সংঘাত বেধেছিল এই নব-অভ্যুদিত বণিকশ্রেণীর সঙ্গে এবং তাদের পক্ষ নিয়ে যেসব প্রাদেশিক শাসন-কর্তারা দাঁড়াতেন তাঁদের সঙ্গে। মোগল সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রশক্তির কর্ণধারশ্রেণী তখন ক্ষীয়মাণ। তখন তাদের স্থান গ্রহণ করছে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা। কিন্তু এই শাসনকর্তাদের পিছনে ছিল নতুন বণিক শক্তির স্বার্থ। ভারতের অনেক খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডাঃ মোরল্যাণ্ডের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে লিখেছেন :

"ভারতীয় বণিক এবং দালালদের সঙ্গে পেরে ওঠা তাদের (ইংরেজদের) পক্ষে বেশ কষ্টকর হয়েছিল, কারণ ওরা ছিল সাধারণত ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশি চালাক-চতুর। তাছাড়া একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও তাদের পাল্লা দিতে হয়েছে খুব কষ্টে। তাদের পথে প্রধান বাধা ছিল উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হস্তক্ষেপ। উদাহরণস্বরূপ, ১৬৫৯ সালে লিখিত জনৈক ইংরেজের একখানি চিঠি থেকে জানা যায় যে মীর জুমলা কাশিম-বাজারে ইংরেজদের কারখানা বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং ইংরেজদের সঙ্গে বাণিজ্য করার বিরুদ্ধে এক নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন — যতক্ষণ না তারা তাঁর সঙ্গে দেখা করছে, ততক্ষণ তাদের সঙ্গে কোনো কারবার চলবে না। তাদের সঙ্গে মিটমাট ছাড়া এদেশে টিকে থাকা সম্ভব নয় বলে ইউরোপীয় বণিকেরা তাদের নানাভাবে খুশি করার চেষ্টা করত — কখনও বা সফল হতো কখনও বা ব্যর্থ হতো।" (অ্যান এডভান্সড হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া, আর. সি. মজুমদার প্রভৃতি)

এই বিবরণের ভিতর দিয়ে এই কথাটাই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে শুরু থেকেই ইউরোপীয় আগমনকারীরা এদেশের বণিক ও স্থানীয় শাসনকর্তাদের কাছে প্রতিপদে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী অতিথি হিসেবে তারা জনগণের অভ্যর্থনা পায়নি কখনও।

কিন্তু তারা চট করে বুঝে নিয়েছিল যে আসছে যুগটা টাকার যুগ — টাকার শক্তিই এ-যুগের প্রকৃত সামাজিক শক্তি। তাই তারা দু-হাতে তখন টাকা,

লুঠবার দিকে মনোযোগ দিল। এ-বিষয়ে তারা ছিল যেমন কুশলতাপূর্ণ, তেমনি গভীর অনিশ্চিতভাবে প্রতি নির্ভর।

প্রত্যক্ষ লুণ্ঠন

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর থেকে নবাব-তৈরির কারবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বেশ একটা লাভের ব্যবসা হয়ে দাঁড়ায়। মীরজাফরকে নবাবের গদীতে বসাবার মূল্যস্বরূপ কোম্পানির কর্মচারীরা ১,২৩৮,৫৭৫ পাউণ্ড আদায় করে। এর ভিতর ক্লাইভ নিজেই নেয় ৩১,৫০০ পাউণ্ড। ১৭৬০ সালে মীরজাফরকে সরিয়ে মীর কাশেমকে তারা নবাবীর পদে বসায় এবং সেজন্য তারা মীর কাশেমের কাছ থেকে আদায় করে ২০০,২৬৯ পাউণ্ড। এর ভিতর ভান্সিটার্ট নিজেই নেয় ৫৮,৩৩৩ পাউণ্ড। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তারা মীর কাশেমকে সরিয়ে মীরজাফরকে দ্বিতীয় বারের জন্য নবাবের মসনদে বসায়, এবার সেজন্য আদায় করে ৫০০,১৬৫ পাউণ্ড। তারপর নাজিমুদ্দৌলাকে নবাবী দেবার সময় আদায় করে ২৩০,৩৫৬ পাউণ্ড। এমনিভাবে ৮ বৎসরে তারা নবাব-সৃষ্টির দালালি স্বরূপ আদায় করেছিল মোট ২,১৬৯,৬৬৫ পাউণ্ড। (ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস, রমেশচন্দ্র দত্ত)

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রত্যক্ষ লুঠ কেবল এইভাবেই চলেনি, চলেছে বহু বিচিত্রভাবে। ছল এবং বল উভয় দ্বারা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি পদ লাভের পরই তারা এই গোটা অঞ্চলটিকে তাদের একটি জমিদারি সম্পত্তিতে পরিণত করে ফেলেছিল। রাজস্ব আদায়ের ইজারাদারি নিয়ে তারা উদ্বৃত্ত রাজস্ব সরাসরি ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিত। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৮০ সাল পর্যন্ত এইভাবে তারা ৩৮,০০০,০০০ পাউণ্ড আত্মসাৎ করেছিল। তারা ১৭৬৫ থেকে ১৮২০ এই ৫৫ বছরে ভারত থেকে লুঠে নেয় ১১০ কোটি টাকা। ঐ লুণ্ঠিত অর্থই আবার পরবর্তীকালে ভারতে এসে ইংরেজ ধনিকদের মূলধন আকারে খাটানো হয়, ভারতের ব্রিটিশ পুঁজির এই হলো জন্মবৃত্তান্ত।

রাজস্ব আদায়ের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে-পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল তাতে সমগ্র কৃষক-সমাজ হলো সর্বস্বান্ত। কৃষকের, জমিদারের বা গ্রাম-পঞ্চায়েতের, সবারই সমস্ত প্রচলিত অধিকার পদদলিত করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীগণ খুশিমতো জমি বিক্রি করা যায় এবং বেপরোয়াভাবে জমি বিক্রি দ্বারাই তারা উসুল করে রাজস্বের অধিকাংশ। জমির উপর কৃষকের

চিরাচরিত অধিকার এমনিভাবে পদদলিত হওয়ায় তারা একেবারেই ভূমিস্বত্ব-হীন হয়ে পড়ে। মোগল সাম্রাজ্যে কৃষকদের ঘরে ঘরে নিশ্চয়ই মধুবৃষ্টি হতো না, বরং জায়গীরদারদের অধীনে তাদের অবস্থা কতকটা ভূমিদাসের মতোই হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তবু জমির সঙ্গে কৃষক ছিল অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং রাষ্ট্রের নিকট বা ভূস্বামীর নিকট তার দেনা-পাওনারও একটা নিরিখ ছিল প্রচলিত প্রথা দ্বারা মোটামুটি বাঁধা।

এবার তারা জমির বন্ধন থেকে মুক্ত হলো বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তারা হয়ে পড়ল জমির জন্য নিত্য নূতন ভূস্বামীর অর্ধদাস; ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে কৃষকের শুধু দেনাই ছিল, পাওনা ছিল না কিছু। ভূমি-ব্যবস্থার এই অরাজকতাই সৃষ্টি করে ইতিহাস-বিখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। এমনিভাবে জমি বেচা-কেনার ফলে যে-নতুন জমিদারশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, তাদেরই সঙ্গে ১৭৯৩ সালে করা হলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এই বন্দোবস্ত অনুসারে কোম্পানির কাছে জমিদারদের দেনাটা চিরকালের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল, কিন্তু কৃষক হয়ে রইল জমিদারদের স্বেচ্ছাচারের খোরাক।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠা করায় কোম্পানির রাজস্বের পরিমাণও প্রথমটা বৎসরের পর বৎসর বেড়ে যেতে থাকে। ভারতীয় রাজস্বব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট প্রশ্নোত্তরের সময় রাজা রামমোহন রায় বিপুল তথ্য দ্বারা প্রমাণ করেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ইংলণ্ড কর্তৃক ভারত-লুণ্ঠন আগের চেয়েও বেড়ে গেছে। যদিও তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিল করার পক্ষপাতি ছিলেন না, তবু তিনি দেখান যে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত এই ২৫ বছরের রাজস্বের পরিমাণ বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছিল, এবং এই রাজস্ব ভারত থেকে ইংলণ্ডে স্থানান্তরিত হয়ে ভারতকেই নিঃস্ব করেছে এবং ইংলণ্ডকে করেছে সমৃদ্ধিশালী।

ভূমিব্যবস্থার রূপান্তর

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্তের প্রতিষ্ঠা একেবারে আকাশ থেকে পড়েনি — কোনো রাজশক্তিই এমন কোনো সামাজিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারে না যার শিকড় সমাজের মাটিতে একেবারেই গজায়নি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেই মোগল সম্রাটগণ কর্তৃক জায়গীরদারি প্রথার মারফত ভূমিরাজস্বের ইজারা দেওয়ার রেওয়াজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইজারাদারদের

দায়িত্ব ছিল জমিচাষের ও কৃষিবিস্তারের উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করার জন্ত কূপ খনন, জল-নিকাশী-খাল কাটা, সেচের উপযুক্ত জলের ব্যবস্থা করা এবং চাষীদের সুবিধার জন্ত সরাইখানা খোলা। তাছাড়াও তাদের দায়িত্ব ছিল আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং যুদ্ধের সময় সৈন্য জোগান দেওয়া। এই সমস্ত দায়িত্বের বিনিময়ে ভূমিরাজস্বের একটা অংশ তারা পেত — যদিও প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা ছিল তারাই — তবু প্রথা দ্বারা খাজনা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ হতো। কেননা, সমাজে তখনও টাকার প্রভাব তত বেশি হয়ে ওঠেনি।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই ইজারাদারদের কাছ থেকে তাদের স্বত্ব কেড়ে নিয়ে নতুন লোকদের কাছে সালানা, পাঁচশালা ও দশশালা বন্দোবস্ত করার সময় কৃষিক্ষেত্রে কোনোরকম দায়িত্ব পালনের শর্ত আর রাখল না। তাদের টাকার খ ই — টাকা পেলেই হলো — সুতরাং টাকা দিয়েই জমির মালিকানা নির্ধারিত হতে থাকল।

কিন্তু ক্রমশ এই নতুন জমিদারশ্রেণী কৃষকদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত অর্থে বড় হয়ে উঠতে লাগল — কৃষির উপর কোনোরকম কর্তব্য পালন না করেই। অবশ্যই তাতে ভূমিরাজস্বের পরিমাণও অনবরত স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাড়তে পারে না।

সুতরাং কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে তখন তুমুল বাগবিতণ্ডা শুরু হলো জমিদারদের সঙ্গে জমি বন্দোবস্তের মূলসূত্র নিয়ে।

ভারতে জমির মালিক রাষ্ট্র না ব্যক্তি এই বিষয়টি ছিল সেই বাগবিতণ্ডার মূল কথা। শেষ পর্যন্ত জমিদারিপ্রথার সমর্থকরা হেরে গেল, অথবা টাকার তাগিদে রায়তওয়ারী প্রথাই সরকারীভাবে গৃহীত হওয়ায় জমিদারিপ্রথার সমর্থকরা নীরব হয়ে গিয়েছিল।

বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার জমিদারি বন্দোবস্ত সরকারী রাজস্ব আর তেমন বাড়াতে সক্ষম নয় বলেই অন্যান্ত প্রদেশে সরকারের সঙ্গে কৃষকদের হলো প্রত্যক্ষ বন্দোবস্ত এবং তার মানে দাঁড়াল ভারতের সর্বত্র কৃষক-সমাজের ভেতর দুর্ভাগ্যের সমবণ্টন। সরকারী রাজস্বের খাই মেটাতে সারা ভারতের সমস্ত কৃষক হলো নাজেহাল। তাই উনবিংশ শতাব্দীতে মাঝে মাঝে ফেটে পড়েছে কৃষক-বিদ্রোহ — যা ছড়িয়ে পড়ত এক জেলা থেকে অন্ত জেলায়, এক প্রদেশ থেকে অন্ত প্রদেশে।

জনগণের জীবনধারণ

কৃষকদের ওপর শোষণের চাপ যখন এমনিভাবে বেড়ে চলেছে তখন সর্ব-সাধারণের জীবনধারণের মানদণ্ডের উপর আঘাত এল ক্রমাগত দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধিরূপে।

১৭৩০ সাল থেকে বাঙলাদেশে মূল্যবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। ১৭৩৮ সালে চাউল বিক্রি হতো টাকায় আড়াই মণ থেকে তিন মণ; আজকের তুলনায় এই দর বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে যতই লোভনীয় হোক, সেদিনকার এ-দরটা ছিল তার আগের তুলনায় ডবল। মূল্যমানের এই ঊর্ধ্বগতি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৬১-৭০ সালে দেখা গেল মূল্যস্তর তার আগেকার দশ বৎসরের তুলনায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেশি। অথচ মজুরি সে অনুপাতে বাড়ল না — গ্রাম্য মেহনতকারীদের প্রকৃত মজুরি গেল কমে। (ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া, রাধাকমল মুখার্জি, পৃষ্ঠা ৪৪)

কৃষিজাত পণ্যের এই মূল্যবৃদ্ধি দ্বারা কৃষকেরা লাভবান হতে পারেনি, কারণ পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সময় তাদের উপর চাপানো হচ্ছিল উত্তরোত্তর বর্ধিত হারে খাজনা। সমাজব্যবস্থায় সে-সময় যত পরিবর্তন ঘটছিল, সে-সবই ছিল এই মূল্যবৃদ্ধির অনুকূল, কিন্তু জনগণের জীবনে তাতে কষ্টের মাত্রাই বেড়ে চলল। বুকাননের এক তদন্ত উদ্ধৃত করে রাধাকমল মুখার্জি দেখিয়েছেন যে তখন উত্তর বিহার ও বাঙলার লোক রোজ একবার ভাত খেতে পারছে না। অধিকাংশই সুজি কিংবা চীনা কাঞ্জি খেয়ে জীবনধারণ করছে; অনেকেরই রোজ কিঞ্চিৎ তেল আর নুন জোটানোও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে জনগণের জীবনধারণের মানদণ্ড কতটা অবনত হয়ে পড়েছিল তা এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে তখন কাপড়, কম্বল, মাখন, তেল, নুন এবং চিনির ব্যবহার প্রায় উঠে যেতে বসেছে। (ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া, রাধাকমল মুখার্জি, পৃষ্ঠা ৫৫)

মূল্যবৃদ্ধির জন্য সর্বসাধারণের জীবনধারণের ব্যয় বেড়ে চলল, কিন্তু কৃষকেরা এর জন্য যে লাভবান হলো না একটুও তার একটা প্রধান কারণ প্রচলিত দাদন-প্রথা। ইংরেজ বণিকেরা এই দাদনপ্রথাটা এ-দেশের লোকদের কাছেই শিখেছিল এবং তারপর অতি নৃশংসভাবে তাকে ফাঁপিয়ে তুলেছিল। দাদন দিয়ে বলপূর্বক নীলচাষ করানোর ফলে খাদ্যশস্যের চাষও মারাত্মকভাবে

ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দাদন থাকার ফলে কোম্পানির বণিকদের কাছে নামমাত্র মূল্যে ক্ষেতের ফসল সব বেচে দিতে হতো এবং ফসলের পরিমাণও নির্ধারিত হতো দাদনদারদের মর্জিমাফিক। নীলচাষের জন্য নীলকর সাহেবের অত্যাচার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, আর সেই সঙ্গে অমর হয়ে আছে নীলবিদ্রোহের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ভারত দখলের আগেও যে জনগণের জীবনধারণের মান বিশেষ লোভনীয় ছিল তা মনে করলে ভুল হবে। একথা সত্য যে বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারত তখন ধন-ধান্যে ফেঁপে উঠছে, কিন্তু সে-ধনরত্নে দেশের অভিজাত এবং বণিকশ্রেণীই সম্পদশালী হচ্ছিল। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং জাহাজ চলাচলের দিক থেকেও ভারত তখন পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত। কিন্তু বণিকদের দাদনপ্রথার কল্যাণে এই উন্নতির যৎসামান্যই কৃষক-সমাজ বা কারিগরশ্রেণীর ভাগে জুটত।

কিন্তু তবু দুটো কারণে কোম্পানির রাজত্বের তুলনায় জনগণের জীবনধারণের মান উন্নত ছিল। প্রথমত, সমাজে তখনও টাকার প্রাদুর্ভাব কম, সুতরাং পণ্যের বাজার-দর যাই হোক না কেন, অবশিষ্ট স্বয়ংস্বচ্ছন্দ সামাজিক ব্যবস্থায় জনগণের দিন চলে যেত কোনোক্রমে, রুজির বড় একটা অভাব ঘটত না। দ্বিতীয়ত, দেশের ভিতরকার সমৃদ্ধিশালী শ্রেণী কৃষি এবং শিল্পের উন্নতির জন্য যা কিছু ব্যয় করত তা কোনোরকমে গ্রামবাসীদের বাঁচিয়ে রাখত। তা ছাড়া, সমাজের নতুন শোষণকারী — দাদনদার বণিক — ছিল এদেশেরই লোক; তাদেরই অর্থব্যয় ঘুরে-ফিরে গ্রাম্য কারিগরদের রুজিরোজগারের একটা হিল্লে করে দিত।

কোম্পানির রাজত্বে টাকার প্রাদুর্ভাব সামাজিক অগ্রগতির সূচনা স্বরূপ কৃষি এবং শিল্পের বাজার তৈরি করল বটে, কিন্তু সে-বাজারের মালিক হলো বিদেশী লুণ্ঠনপ্রিয় বণিকশ্রেণী। সুতরাং জনগণের জীবনে আগেকার নিরাপত্তাটুকু ভেঙে গেল, অথচ নতুন কোনো নিরাপত্তা সৃষ্টি হলো না। পণ্য থেকে আরম্ভ করে জমি পর্যন্ত সব কিছুরই মূল্য টাকায় নির্ধারিত হচ্ছে, অথচ টাকা চলে যাচ্ছে রাজস্ব ও মুনাফা আকারে বিদেশী বণিকের মালখানায়। ভারতের জনগণের দেনাই বাড়তে থাকল, পাওনা বাড়ল না কিছুই। যা ছিল তাও গেল, অথচ নতুন কিছু জুটল না।

স্বাধীন বাণিজ্যের বিলুপ্তি

মোগল সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। তবু স্বাধীন বাণিজ্যে ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারত না বলে তারা কাপড়, নুন, সুপারি এবং তামাকের ব্যবসায়ে একচেটিয়া দখল বসাবার জন্য রীতিমতো জবরদস্তি আরম্ভ করে দেয়। তবু বাঙালি, আর্মেনিয়ান এবং উত্তর ভারতীয় ব্যাপারীদের হঠাতে তাদের প্রায় এক শো বছর লেগেছিল।

কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগতভাবে যেসব ব্যবসায় চালাত তাতেও কোম্পানির পাওয়া দস্তকের অপব্যবহার দ্বারা তারা কোনো ট্যাক্স দিত না। অথচ দেশীয় বণিকরা ট্যাক্স দিতে বাধ্য ছিল, কিন্তু কোম্পানির বণিকেরা নিজেদের ট্যাক্সমুক্ত করে ফেলল। নবাব মীরকাশেম এই অবস্থার প্রতি-কারের জন্য দেশীয় বণিকদের কাছ থেকেও ট্যাক্স আদায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার ফলে তাঁকে নবাবী থেকে কোম্পানির ষড়যন্ত্রে অপসারিত হতে হয়।

ভারতের নানাস্থানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কারখানা গড়ে তোলে সপ্তদশ শতাব্দীতে। এই কারখানাগুলিতে তারা দেশী কারিগরদের কাজ করতে বাধ্য করত এবং এই কারখানার মাল তারা দেশী বণিকদের ঘাড়ে গছিয়ে দিত জবরদস্তির সঙ্গে। তখন ব্যবসায়ের একটি অভিনব প্রথাই গড়ে উঠেছিল, যার নাম ছিল গছানো প্রথা। এই প্রথা অনুসারে ইউরোপীয় কারখানার মালিকরা দেশী বণিকদের ঘাড়ে মাল জবরদস্তি গছিয়ে দিত এবং নিজেদের মর্জিমাফিক হারে তার বদলে অন্য জিনিস আদায় করে নিত।

তাছাড়া সকল রকম অভ্যন্তরীণ কর থেকে মুক্ত ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ভারতীয় বণিকদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তার উপর আবার ভারতীয় জাহাজের পক্ষে সমুদ্রযাত্রা হয়ে পড়ল বিপজ্জনক। ইউ-রোপীয়রা রীতিমতো দস্যুবৃত্তি দ্বারা ভারতীয় জাহাজের নিরাপত্তা একেবারে বিনষ্ট করে দিয়েছিল, ভারতে তখন এমন কোনো রাষ্ট্রশক্তি নেই যার কাছে সমুদ্রগামী ভারতীয় বণিকেরা প্রতিকার চাইতে পারে।

এর পর ১৮১৪ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক এক আইনে ঘোষিত হলো যে এমন কোনো জাহাজ লণ্ডনে ভিড়তে পারবে না যার তিন-চতুর্থাংশ নাবিক

ইংরেজ নয়। সর্বশেষে, ১৮১: সাল থেকে ৮১৩ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ছাড়া অন্যান্য জাহাজে আমদানির উপর এমন আমদানি-শুল্ক বসল যার পর ভারতীয় নৌ-বাণিজ্যের পক্ষে আর টিকে থাকা সম্ভব ছিল না।

এমনিভাবেই অন্তর্হিত হলো একটা বৃহৎ দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত বৃহৎ বাণিজ্য - তথাকথিত স্বাধীন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নয় তা পরাস্ত হলো এক অসম সংগ্রামে, এক ক্ষমতাশালী বিদেশী রাজশক্তির আক্রমণে।

ভারতের ব্যবসায় একচেটিয়া করে ফেলার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে-পন্থা অবলম্বন করেছিল তার দু-একটা নজির দেখানো দরকার।

১৭৬৫ সালের ১০ই আগস্ট গভর্নর-কাউন্সিলের সিলেক্ট কমিটি ঘোষণা করল যে নুন, সুপারি এবং তামাকের ব্যবসায় কোম্পানির একচেটিয়া হবে। নুনের কারবার একচেটিয়া করার জন্য জমিদারদের কাছ থেকে একরকম মুচলেকা আদায় করা হতো। মুচলেকার একটি নমুনা হলো এইরূপ:

"বাঙলা ১১৭৩ সালে যে-নুন তৈরি হবে আমি তা আর কোনো ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করব না — এক দানা নুনও আমি কোম্পানির বিনা হুকুমে কোথাও সরাব না। আমার জমিদারিতে যে-নুন তৈরি হয়, আমি বিশ্বস্তভাবে তার সমস্তটা লিখিত চুক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট দরে কোম্পানির হাতে তুলে দেব। কোম্পানির বিনা হুকুমে একদানা নুনও যদি আমার জমিদারি থেকে অন্য কাউকে বিক্রি করা হয়, তাহলে প্রতি মণে ৫ টাকা হারে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকব।" (ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া, রাধাকমল মুখার্জি, পৃষ্ঠা ১০৮)

মুচলেকার এই নমুনাটি একটি বিরাট দেশের উপর হিংস্রভাবে বাণিজ্য-প্রভাব বিস্তারের এক ঐতিহাসিক দলিল।

বোল্টস তাঁর 'কনসিডারেশন অন ইণ্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স' নামক পুস্তকে এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করেছেন যার উদ্ধৃতি এ-ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ঘটনাটি হলো এই:

"মলুঙ্গী নামক নুন উৎপাদনকারীদের একটি দল দরখাস্ত নিয়ে কলকাতায় এসে হাজির হয়েছিল। তাদের দাবি ছিল জোয়ারের আগে নুন স্থানান্তরিত করবার অধিকার। রাস্তার উপর ২০০ মলুঙ্গী গভর্নরের পাল্কি ঘেরাও করে শুয়ে পড়ে। তাদের তখন বলা হলো দেওয়ানের সঙ্গে দেখা করতে — অথচ এই দেওয়ানের বিরুদ্ধেই ছিল তাদের অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত কোনো প্রতিকার করার আগেই জোয়ারের জলে সমস্ত নুন ভেসে গিয়েছিল।"

ভারতের আর্থনীতিক ইতিহাসের পুরো একটি শতাব্দী ঠিক এমনিধারা অবরদস্তিমূলক ধ্বংসের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। ভারতের শক্তিশালী বাণিজ্য-শক্তিকে পরাভূত করবার জন্য একটি ইংরেজ কোম্পানি কোনো পদ্ধতিই বাকি রাখেনি এবং আর্থনীতিক শক্তিকে সরাসরি করবার জন্য দস্যু-শক্তিকে পুরোপুরিভাবেই ব্যবহার করেছিল।

শিল্পের বিলুপ্তি

ভারতের কৃষি এবং বাণিজ্য যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সম্পূর্ণ করতলগত, তখন ইংলণ্ডে ধীরে ধীরে শুরু হলো শিল্প-বিপ্লবের অভ্যুদয়। ভারত থেকে লুণ্ঠিত অর্থে তৈরি হলো তাদের নতুন ধনতান্ত্রিক শিল্পের প্রথম মূলধন। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াতেই ইংলণ্ডে ভারত থেকে আমদানি করা বস্ত্রের উপর শুল্ক বসানো হলো। কিন্তু ইংলণ্ডের তৈরি মাল ভারতে প্রবেশ করত বিনাশুল্কে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতীয় বস্ত্রে ইংলণ্ডের বাজার ছেয়ে গিয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরম্ভ হলো ইংলণ্ডের অভিযান ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলবার জন্য। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত রীতিমতো ইংলণ্ডের তৈরি মাল বেচবার বাজার হয়ে দাঁড়াল। মোরল্যাণ্ডের হিসাব অনুসারে সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারত থেকে সমুদ্রপথে ৫ কোটি বর্গগজ বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হয়েছিল এবং ৩ কোটি ২০ লক্ষ বর্গগজ গিয়েছিল ইউরোপে। কিন্তু ১৮১৪ সাল থেকে ১৮৩০ সালের ভিতর ভারতে ইংলণ্ডের বস্ত্র আমদানি বেড়ে গেল শতকরা ৬২ ভাগ।

১৮৩৪ সালে স্যার চার্লস ট্রিভেলিয়ান লেখেন যে, প্রতিবৎসর প্রায় ১ কোটি টাকা মূল্যের বাঙলার বস্ত্র বিদেশের বাজার থেকে অন্তর্হিত হচ্ছে এবং দেশের ভিতর থেকে বিলুপ্ত হচ্ছে প্রতি বৎসর প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার কারবার। (রুইন অব ইণ্ডিয়ান ইনডাস্ট্রিজ, বি. ডি. বসু, ৬৫ পৃষ্ঠা)

১৭৬৫ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানি পদ দখল করে এবং ১৭৬৭ সালে ইংলণ্ডে হারগ্রীভস কর্তৃক নতুন সুতাকাটার কল আবিষ্কৃত হয়। প্রথম ঘটনা থেকে ইংলণ্ডে মূলধনের আমদানি বেড়ে যায় এবং দ্বিতীয় ঘটনায় উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধি সূচিত হয়। তখনও পর্যন্ত ইংলণ্ডে পুরোদমে বৃহৎ শিল্পের বিস্তার শুরু হয়নি — এই বিস্তারক্ষেত্র

প্রসারিত করবার জন্য একদিকে ইংলণ্ডে ভারতে তৈরি মাল আমদানির বিরুদ্ধে রক্ষণ-শুল্ক চাপানো হয় এবং অন্যদিকে ভারতীয় কারিগরদের উপর আরম্ভ হয় কঠোর নিয়ন্ত্রণ।

১৭০১ সালে ইংলণ্ডে ভারতীয় রেশমী বস্ত্র আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়, কিন্তু তাতেও ভারতীয় আমদানি তেমন কমল না দেখে ১৭২০ সালে ইংলণ্ডে ভারতীয় রেশমী বস্ত্রের ব্যবহারও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। তাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধির পূর্ণ সম্ভাবনা না দেখে ১৭৬৯ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত নিম্নলিখিত হুকুমনামা ভারতে আসে — "বাঙলা দেশে রেশম সুতোর উৎপাদনে উৎসাহ দাও, কিন্তু রেশম বস্ত্রের উৎপাদনে নিরুৎসাহ সৃষ্টি করো। রেশমী সুতো উৎপাদনকারীদের বাধ্য করো কোম্পানির কারখানায় কাজ করতে এবং তাদের নিজ বাড়িতে কাজ করা নিষিদ্ধ করে দাও।" (ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া, রাধাকমল মুখার্জি)

ভারতীয় অর্থনীতিতে এর ফলাফল কি হয়েছিল তা ইংলণ্ডে হাউস অব লর্ডসের সিলেক্ট কমিটি নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করেন :

"ইংলণ্ডের তৈরি মাল দ্বারা ভারতীয় প্রধান প্রধান কারিগরদের কেবল মাত্র ইংলণ্ডের বাজারে নয় ভারতীয় বাজারেও ব্যবসাচ্যুত করার ফলে ভারতে কৃষির উৎপাদনের দিকে গভীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে।"

অর্থাৎ এই সময় থেকে কারিগরেরা শিল্পচ্যুত হয়ে কৃষির উপর নির্ভরশীল হতে থাকে, এবং শিল্পপ্রধান ভারত কৃষিপ্রধান ভারতে পরিণত হয়। এই সময় থেকেই জমির উপর লোকের চাপ বাড়তে থাকে।

ভারতের উপর ইংলণ্ডের এই নতুন হামলা বিনা প্রতিরোধে অগ্রসর হয়নি। ১৮৩১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ১১৭ জন ভারতবাসীর স্বাক্ষরযুক্ত এক স্মারকলিপি প্রিভি কাউন্সিলের নিকট পাঠানো হয় — যদিও তাতে ফল হয়নি কিছুই। (রুইন অব ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিজ, বি. ডি. বসু, পৃষ্ঠা-৫০)

এই স্মারকলিপি থেকে জানা যায় যে ইংলণ্ডের কাপড় তখন ভারতের বাজারে বিনাশুল্কে প্রবেশ করছে। কিন্তু ভারতীয় সুতীবস্ত্র শতকরা ১০ টাকা এবং রেশমী বস্ত্র শতকরা ২০ টাকা হারে ট্যাক্স দিয়ে তবে ইংলণ্ডের বাজারে প্রবেশ করতে পারছে। তবু ভারতীয় বস্ত্র তখনো ইংলণ্ডে যাচ্ছে, ভারতীয় কারিগরী ব্যবসায় প্রতি মূহূর্তে ক্ষীয়মাণ হওয়া সত্ত্বেও ইংলণ্ড তাকে সহজে ধ্বংস করতে পারেনি।

১৮৪৬ সাল নাগাদ ঘটনাচক্র সম্পূর্ণ উল্টে গেল। এই বৎসর ভারত থেকে একগজ কাপড়ও বিদেশে রপ্তানি হয়নি, কিন্তু ইংলণ্ড থেকে ২১৩,৮৪০,০০০ গজ কাপড ভারতে আমদানি হয়েছিল। ১৮১৪ সালে ভারতের বাজারে ইংলণ্ডের কাপড় আমদানি হয়েছিল মাত্র ৮ লক্ষ গজ (ইকনমিক হিস্ট্রি, মুখার্জি)

১৭৫ -১৮৫৭ সালের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতিতে এমনিভাবে ইংলণ্ডের সামগ্রিক প্রভুত্ব সম্পূর্ণ হয় এবং সেই সঙ্গেই ফেটে পড়ে সারাভারতের তীব্র অসন্তোষ। সর্বস্বান্ত হবার পথে ভারতের সর্বশ্রেণী ও সব-সম্প্রদায় এক নতুন একতার চেতনা লাভ করে — এই একতার চেতনাই ভারতের নবীন জাতীয়তা গঠনের প্রথম ধাপ।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অবলোপ

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নতুন ভূমিব্যবস্থা এবং বিশেষত শিল্পে ও বাণিজ্যে তাদের জবরদস্তি অনুপ্রবেশ ভারতের প্রাচীন গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রথমে বিলুপ্ত করে নতুন অর্থনীতির সূত্রপাত করে। গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রথার সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয় স্বয়ংস্বচ্ছন্দ গ্রাম্য অর্থনীতি।

কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে অর্থনীতির এই পরিবর্তন ভারতে ইংরেজ শাসনেরই অবদান। গ্রাম-পঞ্চায়েত ও স্বয়ংস্বচ্ছন্দ অর্থ-নীতির অবসান পদ্ধতি ভারতীয় সমাজে ইংরেজ শাসনের আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

সম্রাট আওরঙজেবের সামরিক অভিযান, এই অভিযানের জন্য বিভিন্ন এলাকায় সামরিক অধিনায়কদের জায়গীর সৃষ্টি এবং প্রাদেশিক শাসন-কর্তাদের বিদ্রোহ — ভারতীয় প্রাচীন গ্রাম্য অর্থনীতিতে যে ভাঙন সৃষ্টি করেছিল, ঐতিহাসিকেরা তা অস্বীকার করতে পারেন না। মোগল সম্রাটদের সামরিক অভিযান গ্রাম-অঞ্চলে যে-অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে তার বিবরণ পাওয়া যায় মার্টিন কর্তৃক লিখিত 'ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে। মার্টিন দেখিয়েছেন যে সামরিক অনিশ্চয়তার জন্য যখন খাজনা কমে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন সৈন্যদের ছাঁটাই করে খরচ কমাবার ব্যবস্থা হয়; ছাঁটাই সৈন্যরা জীবনধারণের তাগিদে

গ্রামের জমিজমা দখল করে নিত, পুরাতন কৃষকেরা পালিয়ে যেত গ্রাম ছেড়ে। এমনিভাবে ভারতীয় প্রাচীন পঞ্চায়েত প্রথা উঠে যেতে আরম্ভ করে এবং তার স্থান গ্রহণ করতে থাকে জায়গীরদারি প্রথা।

বহির্বাণিজ্যের বিস্তার এবং ভারতের একটি বণিকশ্রেণীর আবির্ভাব গ্রাম্য কারিগরদের তৈরি মাল পণ্যে পরিণত করছিল এবং বিধ্বস্ত গ্রাম-পঞ্চায়েতের মধ্যে প্রবেশ করছিল টাকার প্রভাব। গ্রাম্য অর্থনীতিতে টাকার প্রভাব থেকে শুরু হয় গোলাম কেনা-বেচার রেওয়াজ।

বুকানন তাঁর সার্ভেতে দেখান যে বিহার এবং বাঙলায় গোলাম দ্বারা চাষের রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছিল — তাদের মনিবেরা ছোট ছোট সম্পত্তি খাজনার বিনিময়ে ভোগদখল করত। গ্রাম্য অর্থনীতিতে টাকার প্রাদুর্ভাবের ফলে টাকা দিয়ে গোলাম কেনা-বেচাও শুরু হয়েছিল।

বুকানন দেখিয়েছেন যে একটা নাবালক গোলামের দর ছিল ১৫ টাকা থেকে ২০ টাকা, ১৬ বছরের বালক বিক্রি হতো ১২ টাকা থেকে ২০ টাকায়, আট-দশ বছরের বালিকা বিক্রি হতো ৫ থেকে ১৫ টাকার মধ্যে।

১৮৪১ সালের গোলামি সংক্রান্ত রিপোর্টে দেখা যায় যে মোটামুটি ভাবে বাঙলায় এবং মাদ্রাজে তখনও গোলামিপ্রথা বেশ চলছে, কোনো কোনো মালিকের ২০০০ পর্যন্ত গোলাম ছিল। গোলামিপ্রথার এই প্রাদুর্ভাব গ্রামের স্বয়ংস্বচ্ছন্দ অর্থনীতিতেই ভাঙনের সূচনা।

তাছাড়া বণিকশ্রেণীর উদ্ভবে পণ্য বিনিময়ের যে বিস্তৃতি হয়, তাতেও সর্বত্র একটা আধা-বণিক আধা-কুসীদজীবী মধ্যবিত্তের আবির্ভাব হয়। মুর্শিদাবাদের শেঠরা ছিল এইরকম এক মধ্যবিত্তশ্রেণী, রাষ্ট্রশক্তির ভাঙনে গড়নে তাদের যে ক্ষমতা জন্মেছিল তারও পরিচয় আমরা পাই নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রে। এই শেঠরা যখন ইংরেজের হাতের ক্রীড়নকস্বরূপ খেলছিল তখন তারা ভাবছিল যে রাষ্ট্রশক্তি সৃষ্টির কাজে নিজেরাই দাবার চাল চালছে। যদিও শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তারা দাবার গুটিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তবু এই ঐতিহাসিক সত্য অস্বীকার করা কঠিন যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙলায় তথা ভারতে একটি নবজাগ্রত মধ্যবিত্তশ্রেণীর ক্ষমতার সম্মুখীন হয়েছিল — তাকেই ওদের নিশ্চিহ্ন করতে হয়েছে ছলে বলে কৌশলে।

মোগল সাম্রাজ্যের নৌবহর এই মধ্যবিত্তকে দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল, মোগল সৈন্যবাহিনীর ক্ষমতা, তাদের দিয়েছিল নিরাপত্তা। তৎকালীন সামন্ত-সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে মোগল সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি যখন অস্তমান তখনও এই নতুন মধ্যবিত্ত সম্পূর্ণ আত্মসম্বিৎ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। এমন সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আধা-বণিক আধা-দস্যুবাহিনী এসে ধূমকেতুর মতো ভারতীয় সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। ইংলণ্ডের উদীয়মান সামরিক শক্তির সাহায্যে এবং ভারতের দুর্বল রাষ্ট্রশক্তির দেউলিয়াপনায় আক্রমণকারীরা ভারতীয় অর্থনীতির নতুন স্বাধীন ধারাকে বিনষ্ট করতে সক্ষম হয়। তারা ভারতে একেবারে নতুন একটা অর্থনীতির দূত হিসেবে আসেনি। ভারতে যে-নতুন অর্থনীতি ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছিল তারই গায়ে কচি একটা চারার গায়ে কলমকাটা ডালের মতো জুড়ে বসে। ভারত থেকে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল একটি বিষয়ে—তারা জাতিগত একতার চেতনায় ও শক্তিতে শক্তিমান। কিন্তু ভারতে তখনও জাতিগত একতা গড়ে ওঠেনি। এই শ্রেষ্ঠত্বের জন্যই তারা ভারতীয় অর্থনীতিকে আত্মসাৎ করে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠায় সাফল্য লাভ করেছিল। ভারতের নবজাগ্রত মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটি অংশ কেন্দ্রীয় রাজশক্তি স্থাপনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিল, কিন্তু ইংলণ্ডের সহায়তায়। তাই তারা একতাবদ্ধভাবে ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের সমর্থনে দাঁড়ায়নি। ইংলণ্ডের কাছে ভারতের আর্থনীতিক পরাজয় সমান সমান আর্থনীতিক শক্তির দ্বন্দ্বে ঘটেনি। এ-পরাজয় হলো একটি শ্রেষ্ঠ ও কেন্দ্রীভূত সামরিক শক্তির কাছে একটি উদীয়মান আর্থনীতিক শক্তির পরাজয়। বিজেতারা এই নতুন আর্থনীতিক শক্তিটিকে করায়ত্ত করে নতুন অর্থনীতিকে নিজেদের মতো করে চালাই করে নিতে সক্ষম হয়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে প্রাচীনতার প্রতিনিধিগত অবস্থান যতই থাক — মূলত এ-বিদ্রোহের অন্তরাত্মা ছিল ভারতীয় স্বাধীন আর্থনীতিক আত্মশক্তির প্রতিরোধ। কিন্তু অভিযানটি ঘটল অনেক বিলম্বে, নতুন অর্থনীতিতে তখন ইংলণ্ড ভারতকে বেঁধে ফেলেছে।

বঙ্গদেশের কৃষক

জমীদার

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জীবের শত্রু জীব ; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য ; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে : রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে ; জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃতপক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয়শোণিত পান করা দয়ার কাজ। কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুর্দশা হউক না কেন, এই সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী বসুমতী কর্ষণ করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না হইতে পারিত, এমত নহে। কিন্তু তাহা হয় না ; কৃষকে পেটে খাইলে জমীদার টাকার রাশির উপর টাকার রাশি ঢালিতে পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন না।....

বাঙ্গালী কৃষক যাহা ভূমি হইতে উৎপন্ন করে, তাহা কিছু অধিক নহে। তাহা হইতে প্রথমতঃ চাষের খরচ কুলাইতে হয়। তাহা অল্প নহে। বীজের মূল্য পোষাইতে হইবে, কৃষাণের বেতন দিতে হইবে, গরুর খোরাক আছে ; এ প্রকার অন্যান্য খরচও আছে। তাহা বাদে যাহা থাকে, তাহা প্রথমে মহাজন আটক করে। বর্ষাকালে ধার করিয়া খাইয়াছে, মহাজনকে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। কেবল পরিশোধ নহে, দেড়ী সুদ দিতে হইবে। শ্রাবণ মাসে দুই বিশ ধান লইয়াছে বলিয়া, পৌষ মাসে তিন বিশ দিতে হইবে। যাহা রহিল তাহা অল্প। তাহা হইতে জমিদারকে খাজনা দিতে হইবে। তাহা দিল। পরে যাহা বাকী রহিল — অল্পাবশিষ্ট, অল্প খুদের খুদ, চর্ব্বিত ইক্ষুর রস, শুষ্ক পল্বলের মৃত্তিকাগত বারি — তাহাতে অতি কষ্টে দিনপাত হইতে পারে, অথবা দিনপাত হইতে পারে না। তাহাই কি কৃষকের ঘরে যায়? পাঠক মহাশয় দেখুন।—

পৌষ মাসে ধান কাটিয়াই কৃষকে পৌষের কিস্তি খাজানা দিল। কেহ কিস্তি পরিশোধ করিল — কাহারও বাকী রহিল। ধান পালা দিয়া, আছড়াইয়া

গোলায় তুলিয়া সময়মতে হাটে লইয়া গিয়া, বিক্রয় করিয়া, কৃষক সংবৎসরের খাজানা পরিশোধ করিতে চৈত্রমাসে জমীদারের কাছারিতে আসিল। পরাণ মণ্ডলের পৌষের কিস্তি পাঁচ টাকা; চারি টাকা দিয়াছে, এক টাকা বাকী আছে। আর চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা। মোটে চারি টাকা সে দিতে আসিয়াছে। গোমস্তা হিসাব করিতে বসিলেন। হিসাব করিয়া বলিলেন, "তোমার পৌষের কিস্তির তিন টাকা বাকি আছে।" পরাণ মণ্ডল অনেক চীৎকার করিল, দোহাই পাড়িল—হয় ত দাখিলা দেখাইতে পারিল, নয় ত না। হয় ত গোমস্তা দাখিলা দেয় নাই, নয় ত চারি টাকা লইয়া, দাখিলায় দুই টাকা লিখিয়া দিয়াছে। যাহা হউক, তিন টাকা বাকি স্বীকার না করিলে সে আখিরি কবচ পায় না হয়ত, তাহা না দিলে গোমস্তা সেই তিন টাকাকে তের টাকা করিয়া নালিশ করিবে। সুতরাং পরাণ মণ্ডল তিন টাকা বাকি স্বীকার করিল। মনে কর, তিন টাকাই তাহার যথার্থ দেনা। তখন গোমস্তা সুদ কষিল। জমীদারী নিরিখ টাকায় চারি আনা। তিন বৎসরেও চারি আনা, এক মাসেও চারি আনা। তিন টাকা বাকির সুদ ৸০ আনা। পরাণ তিন টাকা বার আনা দিল। পরে চৈত্র কিস্তি তিন টাকা দিল। তাহার পর গোমস্তার হিসাবানা। তাহা টাকায় দুই পয়সা। পরাণ মণ্ডল ৩২ টাকার জমা রাখে। তাহাকে হিসাবানা এক টাকা দিতে হইল। তাহার পর পার্ব্বণী। নায়েব, গোমস্তা, তহশীলদার, মুহুরি, পাইক সকলেই পার্ব্বণীর হকদার। মোটের উপর পাঁচতো গ্রাম হইতে এত টাকা আদায় হইল। সকলে ভাগ করিয়া লইলেন। পরাণ মণ্ডলকে তজ্জন্য আর দুই টাকা দিতে হইল।...

তাহার পর আষাঢ় মাসে নববর্ষের শুভ পুণ্যাহ উপস্থিত। পরাণ পুণ্যাহের কিস্তিতে দুই টাকা খাজানা দিয়া থাকে। তাহা ত সে দিল, কিন্তু সে কেবল খাজানা। শুভ পুণ্যাহের দিনে জমীদারকে কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। হয় ত জমীদারেরা অনেক শরিক, প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ নজর দিতে হয়। তাহাও দিল! তাহার পর নাএব মহাশয় আছেন—তাঁহাকেও কিছু নজর দিতে হইবে। তাহাও দিল। পরে গোমস্তা মহাশয়েরা, তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা তাঁহারা পাইলেন। যে প্রজার অর্থ নজর দিতে দিতে ফুরাইয়া গেল—তাহার কাছে বাকি রহিল। সময়ান্তরে আদায় হইবে।

পরাণ মণ্ডল সব দিয়া থুইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, আর আহারের উপায় নাই। এদিকে চাষের সময় উপস্থিত। তাহার খরচ আছে কিন্তু ইহাতে পরাণ

ভীত নহে। এ ত প্রতি বৎসরই ঘটিয়া থাকে। ভরসা, মহাজন। পরাণ মহাজনের কাছে গেল। দেড়ী সুদে ধান লইয়া আসিল, আবার আগামী বৎসর তাহা সুদ সমেত শুধিয়া নিঃস্ব হইবে। চাষা চিরকাল ধার করিয়া খায়, চিরকাল দেড়ী সুদ দেয়। ইহাতে রাজার নিঃস্ব হইবার সম্ভাবনা, চাষা কোন্ ছার। হয় ত জমীদার নিজেই মহাজন। গ্রামের মধ্যে তাঁহার ধানের গোলা ও গোলাবাড়ী আছে। পরাণ সেইখান হইতে ধান লইয়া আসিল। এরূপ জমীদারের ব্যবসায় মন্দ নহে। স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করিয়া, তাহাকে নিঃস্ব করিয়া, পরিশেষে কর্জ্জ দিয়া তাহার কাছে দেড়ী সুদ ভোগ করেন। এমত অবস্থায় যত শীঘ্র প্রজার অর্থ অপহৃত করিতে পারেন, ততই তাঁহার লাভ।

সকল বৎসর সমান নহে। কোন বৎসর উত্তম ফসল জন্মে, কোন বৎসর জন্মে না। অতিবৃষ্টি আছে, অনাবৃষ্টি আছে, অকালবৃষ্টি আছে, বন্যা আছে, পঙ্গপালের দৌরাত্ম আছে, অন্য কীটের দৌরাত্ম্যও আছে। যদি ফসলের সুলক্ষণ দেখে, তবেই মহাজন কর্জ্জ দেয়; নচেৎ দেয় না। কেন না, মহাজন বিলক্ষণ জানে যে, ফসল না হইলে কৃষক ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। তখন কৃষক নিরুপায়। অন্নাভাবে সপরিবারে প্রাণে মারা যায়। কখন ভরসার মধ্যে বন্য অখাদ্য ফলমুল, কখন ভরসা "রিলিফ," কখন ভিক্ষা, কখন ভরসা কেবল জগদীশ্বর। অল্পসংখ্যক মহাত্মা ভিন্ন কোন জমীদারই এমন দুঃসময়ে প্রজার ভরসার স্থল নহে। মনে কর, সেবার সুবৎসর। পরাণ মণ্ডল কর্জ্জ পাইয়া দিনপাত করিতে লাগিল।

পরে ভাদ্রের কিস্তি আসিল। পরাণের কিছু নাই, দিতে পারিল না। পাইক, পিয়াদা, নগদী, হালশাহানা, কোটাল, বা তদ্রূপ কোন নামধারী মহাত্মা তাগাদায় আসিলেন। হয় ত কিছু করিতে না পারিয়া, ভাল মানুষের মত ফিরিয়া গেলেন। নয় ত পরাণ কর্জ্জ করিয়া টাকা দিল। নয় ত পরাণের দুর্বুদ্ধি ঘটিল—সে পিয়াদার সঙ্গে বচসা করিল। পিয়াদা ফিরিয়া গিয়া গোমস্তাকে বলিল, "পরাণ মণ্ডল আপনাকে শালা বলিয়াছে।" তখন পরাণকে ধরিতে তিনজন পিয়াদা ছুটিল। তাহারা পরাণকে মাটী ছাড়া করিয়া লইয়া আসিল। কাছারিতে আসিয়াই পরাণ কিছু সুসভ্য গালিগালাজ শুনিল— শরীরেও কিছু উত্তম মধ্যম ধারণ করিল। গোমস্তা তাহার পাঁচ গুণ জরিমানা করিলেন। তাহার উপর পিয়াদার রোজ। পিয়াদাদিগের প্রতি হুকুম হইল, উহাকে বসাইয়া রাখিয়া আদায় কর। যদি পরাণের কেহ হিতৈষী থাকে,

তবে টাকা দিয়া খালাস করিয়া আনিল। নচেৎ পরাণ একদিন, দুই দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন, কাছারিতে রহিল। হয় ত, পরাণের মা কিম্বা ভাই, থানায় গিয়া এজাহার করিল। সব্ ইন্স্পেক্টর মহাশয় কয়েদ খালাসের জন্য কন্ষ্টেবল পাঠাইলেন। কন্ষ্টেবল সাহেব—দিন দুনিয়ার মালিক—কাছারিতেআসিয়া জাঁকিয়া বসিলেন। পরাণ তাঁহার কাছেই বসিয়া—একটু কাঁদা-কাটা আরম্ভ করিল। কন্ষ্টেবল সাহেব একটু ধূমধাম করিতে লাগিলেন—কিন্তু "কয়েদ খালাসের" কোন কথা নাই। তিনিও জমীদারের বেতনভুক্—বৎসরে দুই তিন বার পার্ব্বণী পান, বড় উড়িবার বল নাই। সে দিনও সর্ব্বসুখময় পরম পবিত্রমূর্ত্তি রৌপচক্রের দর্শন পাইলেন। এই আশ্চর্য্য চক্র দৃষ্টিমাত্রেই মনুষ্যের হৃদয়ে আনন্দরসের সঞ্চার হয়—ভক্তি-প্রীতির উদয় হয়। তিনি গোমস্তার প্রতি প্রীত হইয়া থানায় গিয়া প্রকাশ করিলেন, "কেহ কয়েদ ছিল না। পরাণ মণ্ডল ফেরেব্বাজ লোক—সে পুকুর-ধারে তালতলায় লুকাইয়া ছিল—আমি ডাক দিবামাত্র সেইখান হইতে আসিয়া আমাকে দেখা দিল।" মোকদ্দমা ফাঁসিয়া গেল।

প্রজা ধরিয়া লইয়া গিয়া, কাছারিতে আটক রাখা, মারপিট করা, জরিমানা করা, কেবল খাজানা বাকির জন্য হয়, এমত নহে। যে সে কারণে হয়। আজি গোপাল মণ্ডল গোমস্তা মহাশয়কে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া নালিশ করিয়াছে যে, "পরাণ আমাকে লইয়া খায় না,"—তখনই পরাণ ধৃত হইয়া আসিল। আজি নেপাল মণ্ডল ঐরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া নালিশ করিল যে, "পরাণ আমার ভগিনীর সঙ্গে প্রসক্তি করিয়াছে,"—অমনি পরাণ গ্রেপ্তার হইয়া আবদ্ধ হইল। আজি সংবাদ আসিল, পরাণের বিধবা ভ্রাতৃবধূ গর্ভবতী হইয়াছে,—অমনি পরাণকে ধরিতে ছুটিল। আজ পরাণ জমীদারের হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নারাজ, অমনি তাহাকে ধরিতে লোক ছুটিল।

গোমস্তা মহাশয়, পরাণের কাছে টাকা আদায় করিয়াই হউক বা জামিন লইয়াই হউক, বা কিস্তিবন্দী করিয়াই হউক, বা সময়ান্তরে বিহিত করিবার আশায়ই হউক, পুনর্ব্বার পুলিস আসার আশঙ্কায়ই হউক, বা বহুকাল আবদ্ধ রাখায় কোন ফল নাই বলিয়াই হউক, পরাণ মণ্ডলকে ছাড়িয়া দিলেন। পরাণ ঘরে গিয়া চাষ আবাদে প্রবৃত্ত হইল। উত্তম ফসল জন্মিল। অগ্রহায়ণ মাসে জমীদারের দৌহিত্রীর বিবাহ [বা ভ্রাতুষ্পুত্রের অন্নপ্রাশন। বরাদ্দ দুই হাজার টাকা মহালে মাঙ্গন চড়িল। সকল প্রজা টাকার উপর ।০ আনা দিবে।

তাহাতে পাঁচ হাজার টাকা উঠিবে। দুই হাজার অন্নপ্রাশনের খরচ লাগিবে—তিন হাজার জমীদারের সিন্দুকে উঠিবে।

যে প্রজা পারিল, সে দিল—পরাণ আর কিছুই নাই—সে দিতে পারিল না। জমীদারী হইতে পুরা পাঁচ হাজার টাকা আদায় হইল না। শুনিয়া জমীদার স্থির করিলেন, একবার স্বয়ং মহালে পদার্পণ করিবেন। তাঁহার আগমন হইল—গ্রাম পবিত্র হইল।

তখন বড় বড় কালো কালো পাঁটা আনিয়া মণ্ডলেরা কাছারির দ্বারে বাঁধিয়া যাইতে লাগিল। বড় জীবন্ত রুই, কাতলা, মৃগাল, উঠানে পড়িয়া ল্যাজ আছড়াইতে লাগিল। বড় বড় কালো কালো বার্ত্তাকু, গোল আলু, কপি, কলাইসুঁটিতে মহাল পুরিয়া যাইতে লাগিল। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত নবনীতের কথা নাই। প্রজাদিগের ভক্তি অচলা, কিন্তু বাবুর উদর তেমন নহে। বাবুর কথা দূরে থাকুক, পাইক, পিয়াদার পর্য্যন্ত উদরাময়ের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল।

কিন্তু সে সকল ত বাজে কথা। আসল কথা, জমীদারকে "আগমনী," "নজর" বা "সেলামি" দিতে হইবে। আবার টাকার অঙ্কে ৵০ বসিল। কিন্তু সকলে এত পারে না। যে পারিল, সে দিল। যে পারিল না, সে কাছারিতে কয়েদ হইল, অথবা তাহার দেনা বাকির সামিল হইল।

পরাণ মণ্ডল দিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ক্ষেত্রে উত্তম ফসল হইয়াছে। তাহাতে গোমস্তার চোখ পড়িল। তিনি আট আনার ষ্টাম্প খরচ করিয়া উপযুক্ত আদালতে "ক্রোক সহায়তার" প্রার্থনায় দরখাস্ত করিলেন। দরখাস্তের তাৎপর্য্য এই, "পরাণ মণ্ডলের নিকট খাজানা বাকি, আমরা তাহার ধান্য ক্রোক করিব। কিন্তু পরাণ বড় দাঙ্গাবাজ লোক, ক্রোক করিলে দাঙ্গা হাঙ্গামা খুন-জখম করিবে বলিয়া লোক জমায়েত করিয়াছেন। অতএব আদালত হইতে পিয়াদা মোকরর হউক।" গোমস্তা নিরীহ ভাল মানুষ, কেবল পরাণ মণ্ডলেরই গত অত্যাচার। সুতরাং আদালত হইতে পিয়াদা নিযুক্ত হইল। পিয়াদা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই মায়াময় রৌপ্যচক্রের মায়ায় অভিভূত হইল। দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরাণের ধানগুলিন কাটাইয়া জমীদারের কাছারিতে পাঠাইয়া দিল। ইহার নাম "ক্রোক সহায়তা।"

পরাণ দেখিল, সর্ব্বস্ব গেল। মহাজনের ঋণও পরিশোধ করিতে পারিব না, জমীদারের খাজানাও দিতে পারিব না, পেটেও খাইতে পাইব না। এতদিন পরাণ সহিয়াছিল—কুমীরের সঙ্গে বাদ করিয়া জলে বাস করা চলে না।

পরাণ মণ্ডল শুনিল যে, ইহার জন্য নালিশ চলে। পরাণ নালিশ করিয়া দেখিবে। কিন্তু সে ত সোজা কথা নহে। আদালত এবং বারাঙ্গনার মন্দির তুল্য; অর্থ নহিলে প্রবেশের উপায় নাই। ষ্টাম্পের মূল্য চাই; উকীলের ফিস্ চাই; আসামী সাক্ষীর তলবানা চাই; সাক্ষীর খোরাকি চাই; সাক্ষীদের পারিতোষিক আছে; হয় ত আমীনখরচা লাগিবে; এবং আদালতের পিয়াদা ও আমলাবর্গ কিছু কিছুর প্রত্যাশা রাখেন। পরাণ নিঃস্ব।— তথাপি হাল বলদ ঘটি বাটি বেচিয়া আদালতে নালিশ করিল। ইহা অপেক্ষা তাহার গলায় দড়ি দিয়া মরা ভাল ছিল।

অমনি জমীদারের পক্ষ হইতে পাল্টা নালিশ হইল যে, পরাণ মণ্ডল ক্রোক অদুল করিয়া সকল ধান কাটিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়াছে। সাক্ষীরা সকল জমীদারের প্রজা — সুতরাং জমীদারের বশীভূত — স্নেহে নহে — ভয়ে বশীভূত। সুতরাং তাহার পক্ষেই সাক্ষ্য দিল। পিয়াদা মহাশয় রৌপ্যমন্ত্রে সেই পথবর্ত্তী। সকলেই বলিল, পরাণ ক্রোক অদুল করিয়া ধান কাটিয়া বেচিয়াছে। জমীদারের নালিশ ডিক্রী হইল, পরাণের নালিশ ডিস্‌মিস্ হইল। ইহাতে পরাণের লাভ প্রথমতঃ, জমীদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইল, দ্বিতীয়তঃ, দুই মোকদ্দমাতেই জমীদারের খরচা দিতে হইল, তৃতীয়তঃ, দুই মোকদ্দমাতেই নিজের খরচা ঘর হইতে গেল।

পরাণের আর এক পয়সা নাই, কোথা হইতে এত টাকা দিবে? যদি জমা বেচিয়া দিতে পারিল, তবে দিল, নচেৎ জেলে গেল, অথবা দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

আমরা এমত বলি না যে, এই অত্যাচারগুলিন সকলই একজন প্রজার প্রতি এক বৎসরমধ্যে হইয়া থাকে বা সকল জমীদারই এরূপ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে দেশ রক্ষা হইত না। পরাণ মণ্ডল কল্পিত ব্যক্তি — একটি কল্পিত প্রজাকে উপলক্ষ করিয়া প্রজার উপর সচরাচর অত্যাচারপরায়ণ জমীদারেরা যত প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন তাহা বিবৃত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আজি এক জনের উপর একরূপ, কাল অন্য প্রজার উপর অন্যরূপ পীড়ন হইয়া থাকে।

জমীদারদিগের সকল প্রকার দৌরাত্ম্যের কথা যে বলিয়া উঠিতে পারিয়াছি, এমত নহে। জমীদারবিশেষে, প্রদেশবিশেষে, সময়বিশেষে যে কতরকমে টাকা আদায় করা হয়, তাহার তালিকা করিয়া সমাপ্ত করা যায় না। সর্ব্বত্র এক নিয়ম নহে; এক স্থানে সকলের এক নিয়ম নহে; অনেকের কোন নিয়মই নাই, যখন যাহা পায়েন, আদায় করেন।.... (ঈষৎ সংক্ষেপিত)

নীলদর্পণ প্রসঙ্গে

এক

"রঞ্জন দ্রব্য হিসেবে নীলের ব্যবহার ছিল পৃথিবীব্যাপী। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে নীলের কারবার করত। ১৭৭৯ সালে কোম্পানি ব্যাক্তিগত-ভাবে সকলকে নীলচাষের অনুমতি দেয়। অত্যন্ত লাভজনক, এই ব্যবসায়ে দলে দলে শ্বেতাঙ্গ বণিক যোগ দেয় এবং নির্বিচার দোহন শুরু করে। নীলচাষ লাভজনক কিন্তু তা শ্বেতাঙ্গ মালিকের পক্ষে, চাষির দিক থেকে নয়। নীলকর সাহেবেরা জোর করে চাষিদের চুক্তিতে সই করিয়ে নিত। চুক্তিগুলিতে ষোল আনা লাভই সাহেবদের দিকে থাকত। নীলকুঠির দালালেরা ভালো ভালো জমি নীলচাষের জন্য চিহ্নিত করে দিত। সে-সব জমিতে শুধু নীলের চাষ (অন্য কোনো ফসলের নয়) ছিল বাধ্যতামূলক। কখনো কখনো অগ্রিম হিসেবে কিছু টাকা (পরিমাণে যৎসামান্য) চাষির অনিচ্ছুক হাতে গুঁজে দেওয়া হত। ফলে নীলকরদের আদেশ মানা ছাড়া তার অন্য গতি থাকত না। কৃষকদের নিজের শ্রম, লাঙ্গল, বলদ দিয়ে নীল চাষ করতে হত। নীলের ফসল তুলে দিতে হত কুঠির গুদামে। এই সব কিছুর জন্য তার প্রাপ্য টাকার সামান্য অংশও বছরের পর বছর জমা হতে থাকতো। যে জমিটুকুতে চিহ্ন দেওয়া হয়নি তাতেও লাঙ্গল বলদ শ্রমের অভাবে ফসল ফলানো যেত না। নীলচাষ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুতর আঘাত করেছিল। এ বিষয়ে, অধ্যাপক চাকলাদার তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন,

> "The object of the planters was to secure the maximum profit at the minimum or no cost ; he wanted the indigo plant without paying nearly the cost of its production to the raiyat and at a nominal price which, even if fully paid, would be ruinously unprofitable. But the deductions from the nominal price were so heavy, the unfairness of weighing so great, the extortions of the factory amlas (officials) so excessive that the nominal price dwindled

to little or nothing, so that if they realised from the whole produce of their indigoland, in cash, what paid the rent of the land, they were lucky ; wherefore they lost the whole value of that land to themselves besides all the costs of cultivating it for the planters."

এই প্রবল অর্থনৈতিক শোষণকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল অমানবিক অত্যাচার। 'মানুষের রক্তে কলঙ্কিত না হয়ে এক প্যাকেট নীলও ইংলণ্ডে গিয়ে পৌঁছয় না'—সেকালের জনৈক নাকি একথা বলেছিলেন। রায়তদের কয়েদ করা, কয়েদখানায় ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল পর্যন্ত সরবরাহ না-করা, বেত্রাঘাতে অজ্ঞান করে ফেলা, ভাড়াটে লাঠিয়াল নিয়ে দাঙ্গা, মিথ্যা মামলা করে হয়রানি, মেয়েদের ধরে নিয়ে সতীত্ব নাশ — অত্যাচারে অভিধানের সব ব্যবস্থাই এখানে পুরোদমে প্রযুক্ত হত।

এর কোনো বিচার ছিল না। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের রায় নীলকরদের পক্ষেই যেত। কোথাও কোথাও নীলকর সাহেবদের সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছিল। নীলকরদের সাহায্যের জন্য আইনও প্রণীত হয়েছিল। ঐ আইন অনুযায়ী কেহ নীলকরদের চুক্তি ভঙ্গ করলে ম্যাজিস্ট্রেটেরা তার সরাসরি বিচার করত এবং দণ্ডদান করলে তার বিরুদ্ধে আপিল হত না।

গোটা অবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করে স্যার গড্‌ফ্রে লাসিংটন লিখেছিলেন,

"Here many econmists observe a struggle between capital and labour waged on Indian soil, not unlike to that which is now agitating our English markets ; here traders may reflect how far India offer a promising field for the investment of British wealth ; here lawyers may witness a state trial conducted undei a defective law of libel, the freedom of press curtailed, and the jury system mis-carrying under popular ferment ; religious societies, and, indeed all men may sympathise with the victimisation of an honest missionary. Indian politicians may find a striking example of the unsatisfactory relation of natives towards Europeans, and of the standing jealousy between

civilians and non-civilians ; the public may deplore the stifling of weak native voice the first time that its spontaneous expression had a chance of making itself among the dominant race, while to the statesman will be presented the phenomenon of a community agitated by a factious grievance, and of a supreme governor first letting go by the opportunity of allaying public excitement and then when it had culminated, visiting the consequences of his own default upon the subaltern who by a venial mistake, had in the first instance been the cause of popular misconception."

এই পরিস্থিতিতে নীলদর্পণ লেখা হল। পাদরি লঙ্‌ মধুসূদনকে দিয়ে এই নাটকের অনুবাদ করালেন। ইংরেজি Nil Durpan, Or The Indigo-planting Mirror প্রকাশিত হলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশক লঙ্‌ সাহেবের নামে মামলা করেন ১৮৬১ সালে। কালীপ্রসন্ন সিংহ জরিমানার টাকা দিয়ে দেন। দেশি সংবাদপত্রে এবং নগরের বুদ্ধিজীবী মহলে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন,

> "নাটকখানি বঙ্গসমাজে কি মহা উদ্দীপনার অবির্ভাব করিয়াছিল তাহা আমরা কখনও ভুলিব না, আবালবৃদ্ধবনিতা আমরা সকলেই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিলাম। ঘরে ঘরে সেই কথা, বাসাতে বাসাতে তাহার অভিনয়। ভূমিকম্পের ন্যায় বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল।"

কবিওয়ালারা এই বিষয় নিয়ে অনেক গান বাঁধল। গ্রাম অঞ্চলে তা ব্যাপক তরঙ্গ তুলল। সংবাদপত্রগুলিও দেশবাসীর মনকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে এ কাহিনী পৌঁছুবার সুযোগ পেল।

নিরুপায় চাষিরা শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ করল। নদীয়া জেলার চৌগাছিয়ায় বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস এবং দিগম্বর বিশ্বাসের নেতৃত্বে হাজার হাজার চাষি দলবদ্ধ হয়ে

[১] মধুসূদনকৃত নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদ সঙ্কলিত হয়েছে ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত 'মধুসূদন রচনাবলী' গ্রন্থে।

প্রতিজ্ঞা করল, "আর নীলচাষ নয় ." নদীয়া যশোহর মালদহ — এইসব জেলায় আন্দোলন বিস্তার লাভ করল। তখন বাধ্য হয়ে বাংলার গভর্ণর গ্র্যান্ট ১৮৮০ সালে একটি কমিশন বসালেন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন সিটন কার্ নামক বিচারপতি। সদস্যরা হলেন, — সরকার পক্ষের সিটন কার, রিচার্ড টেম্পল ; খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারক হিসেবে পাদ্রী সেল ; জমিদারদের পক্ষে — চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, নীলকরদের প্রতিনিধি রইল ফার্গুসন। নানাশ্রেণীর বহু লোকের সাক্ষ্য নেওয়া হল। কমিশন নীলচাষের বিপক্ষে রায় দিল।

এরপরে নীলচাষ ধীরে ধীরে উঠে গেল। কিছু কিছু আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক কারণও ছিল।

নীলদর্পণ ও নীলচাষ প্রসঙ্গে কবিগান। কবিওয়ালারা নীলদর্পণের যুগান্তকারী প্রভাব মাথা পেতে নিলেন। তাঁদের লেখা গানে সমকালীন উত্তেজনার ছাপ পড়েছে। নীলদর্পণের কোনো কোনো সংস্করণে এই গানগুলি মুদ্রিত হয়েছিল নাট্যকারের জীবনকালেই। গানগুলি এখানে উদ্ধৃত হল।

। এক । বিদ্যাভূণীর লেখা। রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল তিওট।

হে নিরদয় নীলকরগণ।

আর সহে না প্রাণে এ নীল দহন॥
কৃষকের ধনেপ্রাণে. দহিলে নীল আগুনে,
পুণরাশি কি কুদিনে, কল্লে হেথা পদার্পণ।
দাদনের সুকৌশলে, শ্বেতসমাজের বলে,
লুঠেছ সকল তো হে, কি আর আছে এখন॥
দীন জনে দুঃখ দিতে, কাহার না লাগে চিত্তে,
কেবল নীলের হেরি পাষাণ সমান মন॥
তরিলে জলধিজল, পোড়াতে স্বর্ণভবন।
বৃটন স্বভাবে শেষে কালি দিলে বঙ্গে এসে,....

। দুই । বিদ্যাভূণী কৃত । কবির সুর।

নীল বানরে সোনার বাংলা কল্লে এবার ছারেখার।
অসময়ে হরিশ মলো লংয়ের হলো কারাগার।
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।

রাম সীতার কারণে, সুগ্রীবে মিতালি করে বধে রাবণে,
যত সওদাগরেরা সহায় এদের····ছুটো এডিটার।
এখন স্পষ্ট লেখা ঘুচে গ্যালো, জজ সাহেব এক অবতার॥
মত····রাজত্ব হলো সাধুর পক্ষে গঙ্গাপার॥

। তিন । ধীরাজকৃত। রাগ সুরট মল্লার — তাল আড়াঠেকা।
নীলদর্পণে লং সাহেব যথার্থ যা তাই লিখেছে।
নীলে নীলে সব নিলে প্রজার বল ভাই কি রেখেছে॥ ১
কারো···· কার তাদের উপর অত্যাচার,
তাই নিয়ে বারবার, লিখে লিখে হরিশ মরেছে॥ ২
ঈডন্, গ্রাণ্ট মহামতি, ন্যায়বান্ উভয়ে অতি,
করিতে প্রজার গতি, কত চেষ্টা পাইতেছে॥ ৩
ইণ্ডিগো রিপোর্ট প'ড়ে কে না অন্তরে পোড়ে,
তবু নীলিরা ন'ড়ে চ'ড়ে, পোড়ার মুখ দেখাতেছে॥ ৪
বলতে দুখে বুক বিদরে, ওয়েল্‌স অবিচার ক'রে
নির্দোষী লংকে ধরে একটি মাস ম্যাদ দিয়েছে॥ ৫
ওয়েলস্, পিকক, জাকসনে, বসিয়া বিচারাসনে,
····হাজার টাকা ফাইন করেছে॥ ৬
নিদারুণ সেন্‌টেন্‌স শুনে সিংহবাবু দয়া গুণে,
হাজার টাকা দিলেন গুণে, ওয়ালটার ব্রেট তাই তাক হয়েছে॥ ৭
ইংলণ্ডেশ্বরী শুন, পিউনির সকল গুণ,
আইনে যে সুনিপুণ, এবার তা বেরিয়ে পড়েছে॥ ৮
যে অবধি কলিকাতা, পাইয়াছে এ বিধাতা,
সেই অবধি দেখি মাতা, রেস হেট্রেড খুব চেগেছে॥ ৯
বেঞ্চে বাতুলের মত লম্ফ ঝম্ফ করে কত,
আবার বলে 'আমার মত, কেবা জজ হেথা এসেছে॥' ১০
কিন্তু পীল, সীটন আদি, এক এক বুদ্ধির কাঁদি,
তাদের লাগি আজো কাঁদি, হায় কি বিচার করে গেছে॥ ১১
মহারাণী তোমা প্রতি এই ক্ষণে এই মিনতি,
ওয়েলস্ পাপে দেও মুকতি, ধীরাজ এই বালতেছে॥ ১২

নীলদর্পণ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র : বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়ে আরও কিছু নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে নীলদর্পণ বিষয়েও অনেক কথা বলেছেন চরিত্র নিয়ে, সংলাপ নিয়ে।....নীলদর্পণ প্রসঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে কিছু মন্তব্য তিনি করেছেন।

"দীনবন্ধুর এই অলৌকিক সমাজজ্ঞতা এবং তীব্র সহানুভূতির ফলেই তাঁহার প্রথম নাটক প্রণয়ন। যে-সকল প্রদেশে নীল প্রস্তুত হইত, সেই সকল প্রদেশে তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নীলকরের তৎকালীক প্রজাপীড়ন সবিস্তারে স্বক্ষেত্রে অবগত হইয়াছিলেন। এই প্রজাপীড়ন তিনি যেমন জানিয়াছিলেন এমন আর কেহই জানিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনীমুখে নিঃসৃত করিতে হইল। নীলদর্পণ বাঙ্গালার Uncle Tom's Cabin 'টম কাকার কুটীর' আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে, নীলদর্পণ নীলদাসদিগের দাসত্বমোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে।"....

দীনবন্ধু মিত্র : সাহিত্য-সাধনা
ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত দীনবন্ধু রচনাবলী : সাহিত্য সংসদ
সংস্করণ থেকে সঙ্কলিত, পৃষ্ঠা ২৪-২৭

"....১৮৬০ সালের আশ্বিন মাসে দীনবন্ধু মিত্রের সুবিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত হইল। এই আর এক ঘটনা যাহাতে বঙ্গসমাজে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিল। কোন গ্রন্থ বিশেষে যে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে তাহা অগ্রে আমরা জানিতাম না। "নীলদর্পণ" কে লিখিল, তাহা জানিতে পারা গেল না ; কিন্তু বাসাতে বাসাতে "ময়রাণী লো সই নীল গেঁছেছ কই" ? ইত্যাদি দৃশ্যের অভিনয় চলিল। যতদূর স্মরণ হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। পাদরী জেম্স লং সাহেব তাহা নিজের নামে প্রকাশ করিলেন। ইংলণ্ডেও আন্দোলন উপস্থিত হইল। নীলকরগণ আসল গ্রন্থকারকে না পাইয়া ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদককে মুখপাত্র করিয়া

১৮৬১ সালের ১৯শে জুলাই লং-এর নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।

এরূপ মোকদ্দমা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। লং বিধিমতে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে তিনি বিদ্বেষবুদ্ধিতে কোনও কার্য্য করেন নাই। তিনি বহুবর্ষ হইতে দেশীয় সংবাদপত্রের ও ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির ভাব গভর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া আসিতেছিলেন। নীলদর্পণের অনুবাদ সেই কার্য্যেরই অঙ্গস্বরূপ। কিন্তু তদানীন্তন ইংরাজ-পক্ষপাতী জজ সার মডাণ্ট ওয়েল্‌স্‌ সে কথার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার বিচারে লং-এর এক মাস কারাবাস ও এক হাজার টাকা জরিমানা হইল। তখন নীলকর বিদ্বেষ এদেশীয়দিগের মনে এমন প্রবল যে জরিমানার হুকুম হইবামাত্র, মহাভারতের অনুবাদক সুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়, জরিমানার হাজার টাকা গুণিয়া দিলেন। এরূপ শুনিয়াছি যে আরও অনেক দেশীয় ভদ্রলোক আদালতে জরিমানার টাকা দিবার জন্য টাকা লইয়া উপস্থিত ছিলেন।

— রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃষ্ঠা ২২৪

"....আমাদের মন যখন অল্পাধিক পরিমাণে উত্তেজিত, তখন ১৮৬০ সালের শেষভাগে "নীলদর্পণ" নাটক প্রকাশিত হইল। হঠাৎ যেন বঙ্গসমাজ ক্ষেত্রে উল্কাপাত হইল; এ নাটক কোথা হইতে কে প্রকাশ করিল, কিছুই জানা গেল না। এ নাটক প্রাচীন নাটকের চিরাবলম্বিত রীতি রক্ষা করিল কি না, সে বিচার করিবার সময় রহিল না; ঘটনা সকল সত্য কি না অনুসন্ধান করিবার সময় পাওয়া গেল না; নীলদর্পণ আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল; তোরাপ আমাদের ভালবাসা কাড়িয়া লইল; ক্ষেত্রমণির দুঃখে আমাদের রক্ত গরম হইয়া গেল; মনে হইতে লাগিল রোগ সাহেবকে যদি একবার পাই অন্য অস্ত্র না পাইলে যেন দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারি।

— রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃষ্ঠা ২৫০-২৫১

তিন

"....স্থির করা হ'ল 'নীলদর্পণ' অভিনয় করতে হবে। তখন এই নাটক-খানির অভিনয় সব চেয়ে সুন্দর হ'ত, সব চেয়ে জমত। সে নাটকখানি অভিনয় করবার সময় সকলের কি আগ্রহ, কি উত্তেজনা।

নীলমাধববাবু কর্ত্তা সাজতেন, নবীনমাধব সাজতেন মহেন্দ্রবাবু, বিন্দুমাধব ভোলানাথ বলে একজন নতুন লোক, উড সাহেব অর্দ্ধেন্দুবাবু, তোরাব মতিলাল সুর, আর রোগ সাহেব সাজতেন অবিনাশ কর। অবিনাশবাবু দেখতে অতি সুন্দর ছিলেন, তার ওপর তাঁর স্বভাবটা ছিল একটু কাট্‌কাট্‌ মারমার গোঁয়ার-গোবিন্দ গোছের, তাই নীলকুঠির সেই নির্দ্দয় স্বেচ্ছাচারী সাহেব সাজলে তাঁকে ভারি সুন্দর মানাত, দেখলেই মনে হ'ত হ্যাঁ সত্যিকারেরই রোগ সাহেব। আর মানাত উড সাহেবের ভূমিকায় মুস্তাফি সাহেবকে — আড়ে-বহরে লম্বায় চওড়ায় দশাসই চেহারা। তারপর মতিলাল সুরের তোরাব, সে তোরাব আর হ'ল না। যেমন তাঁকে মানাত, অভিনয়ও করতেন তিনি তেমনই সুন্দর। বিন্দুমাধবটি ভালমানুষ, কর্ত্তাও নিরীহ গোছের লোক।

ফিমেল পার্টে — ক্ষেতুদিদি সাবিত্রী, কাদম্বিনী সৈরিন্ধ্রী, আমি সরলা, লক্ষ্মী ক্ষেত্রমণি, আর সেই দাসীটি সাজতেন নারায়ণী।

পশ্চিমে আরও ক'জায়গায় নীলদর্পণের অভিনয় হয়েছিল, কিন্তু লক্ষ্ণৌয়ের এই ঘেরা বাড়ীতে যেমন জমেছিল, এমনটি আর কোথাও জমে নাই।

সেদিন বাড়ী একেবারে লোকে ভরে গিয়েছিল। বড় বড় সাহেব মেম অনেক এসেছিলেন, তাঁদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী, সামনে তাকালেই খালি লাল মুখ। মুসলমান অনেক ছিলেন, তবে বাঙ্গালী খুব কম।

অভিনয় ত আরম্ভ হ'ল। হ্যাঁ ভাল কথা, সেদিনকার প্রোগ্রাম ছাপা হয়েছিল ইংরাজীতে, এবং তার সঙ্গে দু'চার কথায় মোটামুটি গল্পটা লিখে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের সেদিন যেন কেমন ভয় ভয় করছিল, — কিন্তু অভিনয় যতই এগিয়ে যেতে লাগল, আমাদের সে ভয়ও ক্রমে ভেঙ্গে গেল। আমরা খুব উৎসাহ ক'রে অভিনয় করতে লাগলাম।

ক্রমে সেই দৃশ্যটা এল, রোগসাহেব ক্ষেত্রমণিকে ধরে পীড়ন করছে, আর ক্ষেত্রমণি নিজের ধর্ম্মরক্ষার জন্যে কাতর প্রাণে চীৎকার করে বলছে, "ও সাহেব তুমি আমার বাবা, মুই তোর মেয়ে, ছেড়ে দে, আমায় ছেড়ে দে।" তারপর তোরাব এসে রোগ সাহেবের গলা টিপে ধরে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে কিল মারতে আরম্ভ হয়েছে, অমনই সাহেব দর্শকদের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। সব সাহেবেরা উঠে দাঁড়াল, পেছন থেকে সব লোক ছুটে এসে ফুট-লাইটের কাছে জমা হতে লাগল — সে একটা কি কাণ্ড! কতকগুলো লালমুখো গোরা তরওয়াল না খুলে ষ্টেজের ওপর লাফিয়ে পড়তে এল। আর পাঁচজনে তাদের

ধরে রাখতে পারে না। সে কি হুড়োহুড়ি, কি ছুটোছুটি! ড্রপ ত তখনই ফেলে দেওয়া হ'ল, — আর আমাদের সে কি কাঁপুনি, আর কান্না! ভাবলাম, আর রক্ষে নেই, এইবার ঠিক আমাদের কেটে ফেলবে!

যাক, কতক সাহেব চলে গেল, যারা তখনও ক্ষেপে ষ্টেজের ওপর উঠে এল, তাদের আর পাঁচজনে ঠেকাতে লাগল। ম্যাজিষ্ট্রেট তখনই কেল্লায় লোক পাঠিয়ে এক দল সৈন্য নিয়ে এলেন,—সে যে কি ব্যাপার তা আর কি বলব। সৈন্য আসতে তখন গোলমাল কতটা ঠাণ্ডা হ'ল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখনই অভিনয় বন্ধ করে দিলেন এবং ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালেন। কোথায় ধর্ম্মদাস-বাবু চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। তাঁকে আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। খোঁজাখুঁজির পর দেখতে পাওয়া গেল, পেছন দিকে ষ্টেজের নীচে তিনি চুপ করে বসে আছেন। কার্ত্তিক পাল ত তাঁকে ধরে টানাটানি করতে লাগলেন;— তিনি কিছুতেই উঠবেন না। তিনি যখন কিছুতেই গর্ত্ত ছেড়ে বেরুলেন না, তখন সহকারী ম্যানেজার অবিনাশবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সামনে গিয়ে হাজির হলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলে দিলেন, "এখানে আর অভিনয় করে কাজ নেই, পুলিশ সঙ্গে দিচ্ছি, এখনই তাদের সঙ্গে নিয়ে ফিমেলদের বাসায় পৌঁছে দিন। আজ রাত্রে সেখানে পুলিশ পাহারা দেবে। সাহেবেরা ভারি উত্তেজিত হয়েছে, এখানে আপনাদের থেকেই কাজ নেই।"

বিনোদিনী দাসী, আমার কথা ও অন্যান্য রচনা, পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯

লাখে না মিলয়ে এক

গোলাম কুদ্দুস

লাখে না মিলয় এক। আমি যাট লাখে পেয়েছিলাম তোমাকে।

ভিখু কত বছর আগে কৃষকদের মধ্যে এসেছিল সেই আলোড়ন, যাকে বলা হয় তেভাগা আন্দোলন? আর তাতে কি যাট লাখ কৃষক অংশ নিয়েছিল? মাথা গুনতি করে কি এই সংখ্যা পাওয়া গিয়েছিল? তবু এটাই চলে আসছে। এর সত্যিমিথ্যে আমি জানি নে। তবে বাঙলাদেশের এক অতি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আন্দোলন যে ছড়িয়ে পড়েছিল, সে আমি নিজের চোখেই দেখেছি। এর খবরাখবর জোগাড়ের জন্য আমাকে তখন বহু জায়গায় ঘুরতে হয়েছিল। আজ এতকাল পরে অবাক হয়ে ভাবছি, এত লোকের মধ্যে শুধু তোমার কথাই কেন এমন করে মনে আসছে?

অথচ তুমি বারো বছরের কৃষক-বালক বই-তো নও। কোনো বৃহৎ কাণ্ডও তুমি ঘটাও নি, আর আমার সঙ্গে তোমার পরিচয়ও মাত্র কয়েক ঘণ্টার, তবু এমনটা কি করে হলো?

তোমার নামটা ভাই আমি বেমালুম হারিয়ে ফেলেছি। তোমাকে যে নামে ডাকছি, ওটা আমার ছেলেবেলার এক বন্ধুর নাম। তাকে বহুকাল হারিয়েছি, কিন্তু নামটা স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় হয়ে আছে। সেই নামের লেবেলটা আজ আমি তোমার গায়ে সেঁটে দিলাম।

কিন্তু ভিখু, কানু ছাড়াও গীত আছে! ভাবতে বসলে ক্রমে ক্রমে আরো অনেক মুখ এবং ঘটনার কথা মনে পড়ে। কি করে ভুলি হেমন্তদাকে। কৃষক সমিতিতে যোগ দেওয়ার আগে সে নাকি ডাকাত ছিল। পৌষমাসের রাত্রিতে টর্চ জেলে গ্রামের পথে চলেছি, সামনে খানিকটা জল জমে আছে, থমকে দাঁড়িয়ে জুতো খুলতে যাচ্ছি অমনি আমাদের নব-বাল্মীকি আমাকে পাঁজা-কোলে করে শূন্যে তুলে ধরল!—আহা, কর কি! ছাড়ো! ছাড়ো!···কে শোনে কার কথা। যতই বলি, আমিও গ্রামের ছেলে, ততই হেমন্তদা বলে, আহা আপনারা হলেন কলকাতার লোক, আপনাদের কি জলকাদা সহ্য হয়?···হেমন্তদা হিমশীতল জলটা পার করে আমার বপুটাকে হাল্কা সোলার মতো ডাঙায় নামিয়ে দিল।

পরে সেই হেমন্তদাকে আর একবার দেখেছি, তিনি তখন চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। সেই লোহার মতো শক্ত শরীরটা একেবারে ভেঙে পড়েছে। দেখলে মানুষটা চেনাই যায় না।

সব আন্দোলনে যুবকেরাই থাকে সকলের পুরোভাগে। কৃষক আন্দোলনেও সেদিন তার ব্যতিক্রম হয়নি। 'এক ভাই, এক টাকা, এক লাঠি'—আওয়াজটা তাদেরই সব থেকে আকৃষ্ট করেছিল। তারাই দলে দলে ভলাণ্টিয়ার হয়েছে, তারাই গাথা বেঁধে ধান কেটেছে, তারাই লাঠির ডগায় নিশান বেঁধে মিছিল করেছে আর তারাই রাত জেগে পুলিশের হামলা ঠেকাতে পাহারা দিয়েছে। কিন্তু কৃষক-মেয়েরা তাদেরও হার মানিয়ে দিয়েছিল। আমি এখনো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি রানী-শংকাইনের মেয়েদের। তারা পুলিশের হাত থেকে চারটে বন্দুক 'কেড়ে এনেছে। পুরুষদের মধ্যে হুলুস্থুল কাণ্ড! কি করে বন্দুক ফেরত দেওয়া যায়, সেই এক ভাবনা। আর এই সময়ই মেয়েদের মারধোর করার সনাতন রীতিটা হঠাৎ যুক্তিবহির্ভূত বলে মনে হতে লাগল। তখন এ নিয়ে অনেক গল্প ছড়িয়ে পড়েছিল। কৃষক সমিতির কাছে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে অভিযোগ করার দৃশ্য আমিও দু-একটা দেখেছি। ভাবলে অবাক লাগে তখন কত বড় বড় ঘটনা কত সহজে ঘটত। তোমার সে-সব বোঝার মতো তখন বয়সও হয় নি, সুযোগও ছিল না। তুমি যেখানে জন্মেছ, সেখানেই বড় হয়েছ। তুমি কোনো স্কুলে পড়নি, বাঙলাদেশকে জানা তো দূরের কথা, তার একখানা মানচিত্রও দেখনি। তুমি কি করে জানবে মস্ত অবিভক্ত বাঙলাদেশে কি তোলপাড় কাণ্ড চলছিল। তোমার গ্রাম থেকে আট-দশ মাইল দূরে কি কি ঘটেছিল, তার খবরই কি তুমি জানতে ?

তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার মাস তিনেক আগে আমি সেইরকম একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। রূপনারায়ণ রায়ের নামটা হয়ত শুনে থাকবে। তোমাদের এলাকার এম, এল, এ। আমি তাঁর ঘরের দাওয়ায় বসে কেরোসিনের ডিবের আলোয় খবর লিখতাম, আর মাঝে মাঝে কান পেতে শুনতাম গ্রামের রাস্তায় পাহারারত ভলাণ্টিয়ারদের মাতোয়ারা কণ্ঠের আওয়াজ — 'জান দেবো তবু ধান দেবো না।' দাওয়ার আর এক পাশ থেকে উঠত কয়েকটা ছাগল, আর তাদের ডেকে পাশে শায়িতা বাড়ির বুড়ো-মা বিড় বিড় করে কি যেন বলত। সামনে লাউ-কুমড়োর নিচু মাচাটার মধ্যে জ্বলত জোনাকী। মাটির সানকিতে ডাল-ভাত খেয়ে আমি ওভারকোট গায়ে জড়িয়ে গরম খড়ের বিছানায় শুয়ে

শীতে কাঁপতাম, আর পাহারারত ভলান্টিয়ারদের নৈশ-বিচরণের জামাকাপড়ের অবস্থার কথা ভেবে লজ্জা পেতাম। সকালে তারা অনেকে এসে আমাকে ঘিরে বসত, আর শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমার ওভারকোটের ওপর সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে বলত — কমরেট্ এটা গায়ে দিলে শীত লাগে না, না?

মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়া কি সোজা কথা? এই জামাকাপড়ের প্রাচীর একটা ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। তাই বলে একে তো হঠাৎ বাদ দেওয়াও যায় না। ওদের যে-বস্ত্রে যে-শীত সহ্য হয়, আমি সে-রকম করতে গেলে নিউমোনিয়ায় ভুগব। ওরাও তা আশা করে না। কলকাতা থেকে ভদ্রলোক 'কমরেট' এসেছে, এতেই ওরা খুশি। আর আন্দোলনের উৎসাহের জোয়ার আপাতত সব ব্যবধান ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

অথচ এই হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো আন্দোলন বুঝতে হলেও তার পিছনের কথাটা বুঝতে হবে। কারণ এই আলোড়ন আকাশ থেকে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো নিশ্চয়ই ঝরে পড়েনি। এ-রকম আকস্মিকভাবে তো সংসারে কিছু হয় না। ১৯৪৩ সনের মারাত্মক দুর্ভিক্ষের সঙ্গে এই আন্দোলনের একেবারে নাড়ির যোগ। সে-কথা কৃষকেরা সবাই জানে, বোঝে এবং বারবার করুণ সুরে আমাকে স্মরণ করিয়েও দিয়েছে। কত গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তারা আমাকে কবরের সারি দেখিয়ে দিয়েছে। শ্মশানে যারা পুড়েছে তারা তো স্মৃতি রেখে যায়নি। তবে সেদিন সবাইকে তো শ্মশানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। গ্রামের লোক বাধ্য হয়ে গ্রামান্তরে কোনো জঙ্গল বা আমবাগান বা মাঠেই তাদের ফেলে দিয়ে গেছে। কৃষকেরা আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে — ঐ যে ঐখানে। তিনবছর পরেও গাদা গাদা ভাঙা হাঁড়ি কলসী মালা তার সাক্ষী হয়ে আছে।

দুর্ভিক্ষের সময় আমি ছিলাম শহরে, গ্রামের কান্না আমি কি করে বুঝব। শুধু সেটা যখন করুণ মিনতির মতো শহরের ফুটপাতে এসে মাথা কুটে মরেছে, তখন চোখের জল ফেলেছি। ক্রমে ক্রমে তাও শুকিয়ে গেল। তবু তখনকার একটা ঘটনা কি করে তোমাকে আমার নিকটবর্তী করেছে, সে-কথাই আজ অকপটে সব বলব।

একদিন রাত বারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরছি। সিঁড়ির কাছটা রীতিমতো অন্ধকার, সেখানে প্রায়ই একটা কুকুর শুয়ে থাকে। সারমেয়-প্রীতি আমার নেই, আমি কতবার যে ওটাকে লাথি মেরেছি, তবু আপদটাকে দূর করতে

পারিনি। সেদিনও কুকুর মনে করে কুণ্ডলী পাকানো একটা বস্তুর উপর পদাঘাত করলাম। অমনি মানুষ-কণ্ঠের দুর্বল আর্তনাদে চমকে উঠলাম।

—কে? কে ওখানে শুয়ে?

কোনো সাড়াশব্দ নেই।

আবার প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করার পর একটি বালক কণ্ঠের উত্তর এল— আমি।

—আমি কে?

—আমি।

উপরের ফ্ল্যাট থেকে এক ভদ্রলোক টর্চহাতে নামছিলেন, সেটা ফোকাস করতেই নামহীন গোত্রহীন 'আমি'কে দেখা গেল।

একটি বছর নয়েকের শীর্ণ কঙ্কালসার উলঙ্গ বালক, আর একটি বছর চারেকের অনুরূপ শীর্ণ এবং উলঙ্গ বালককে কোলে জড়িয়ে শুয়ে আছে।

—তোরা কোত্থেকে এসেছিস?

কোনো উত্তর এল না।

–তোর বাবা নেই?

—মরে গেছে।

—তোর মা নেই?

—মরে গেছে।

—ওটা কে?

—আমার ছোট ভাই।

ভিখু, তোমার কাছে সত্যি কথাই বলব। টর্চধারী নেমে গিয়ে মোটরে উঠল, আর আমি হঠাৎ এমন ক্লান্তবোধ করলাম যে সে তোমাকে বোঝাতে পারব না। ভিতরটা যেন অসাড় হয়ে এসেছে। গত দু-সপ্তাহ ধরে শহরে মৃত্যুর মহোৎসব দেখছি। কি করতে পারি, কি করতে পেরেছি? কিন্তু মৃত্যু দেখতে দেখতে মনটা যে কেমন করে পাথর হয়ে উঠেছিল, সেদিন রাত্রেই তা টের পেলাম। অথবা আদৌ টেরই পেলাম না! তাই নির্বিবাদে ছেলে দুটোকে ফেলে আমি টলতে টলতে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। তখন শীত পড়তে শুরু করেছে। একবার মনে হলো, উলঙ্গ বড়ভাইটা শুধুমাত্র নিজের কঙ্কালসার দেহটার উত্তাপ দিয়ে জ্বরোত্তপ্ত ছোট ভাইটিকে রক্ষার কী করুণ চেষ্টাই না করছে! একথা এমন স্পষ্ট করে যে তখন ভেবেছি, তাও নয়, তবু

একবার মনে হলো চাদরটা দিয়ে ওদের ঢাকা দিয়ে এলে হতো। কিন্তু তখনি অবসাদের সুরে মন বলল, সব মরছে, ওরাও মরবে, মরতে দাও।

সকালে উঠে দেখলাম, হ্যাংটো ছেলেটার দুই বাহুর মধ্যে তার ছোটভাইটি মরে রয়েছে।

জানো ভিখু, আজও চোখ বুজলে তাদের দেখতে পাই। নিজের চেহারাটা নিজে যখন দেখি, তখন শিউরে উঠি। অথচ নিজেকে এতকাল কত উঁচুদরের জীব বলে মনে করে এসেছি। বিশ্বসংসারে দুর্ভিক্ষের প্রলয়ে যখন ঘরবাড়ি বাপ-মা সবই ভেসে গেল, তখনো ঐ ক্ষুদ্র বালকটি তার ক্ষুদ্রতর ভাইটিকে ছাড়ে নি, দুই হাতে বুকে আঁকড়ে ধরে বাঁচাতে চেয়েছে। আর আমি? সভ্যতার খোলসপরা আমি মৃত্যুর মহোৎসব দেখতে দেখতে অবশ হয়ে ঘরে গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে পেরেছি তো।

সে-সময় তোমার বয়সও হবে ওরি মতো—বছর নয়।

তুমিই বা দুর্ভিক্ষের কি বুঝবে? তোমার তো তখনো বোঝার মতো বয়স হয়নি। গ্রামের সেই ভয়ানক দিনগুলির মধ্যে যে না থেকেছে, সে কি করে বুঝবে কৃষক-মেয়েদের মনের ভাব, যখন তারা ধানের আঁটির ওপর হাত বুলিয়ে বলে, মা লক্ষ্মী ঘরে এয়েচে? তোমাকে আমি ছাড়ব না।—'জান দেবো তো ধান দেবো না'র রহস্য এই।

কিন্তু কৃষকদের সঙ্গে অনেকটা মিশে গিয়েছিল তোমাদের অঞ্চলের কৃষক-নেতা কালী সরকার। তার ফলও সে ভোগ করেছিল। তাঁর জ্যাঠামশায় জোতদার এবং ধনবান। আন্দোলনের শুরুতেই বাড়ির মাঝখানে পাঁচিল তুলে দিলেন। বাড়ির একমাত্র ইঁদারার জল বন্ধ করলেন ভ্রাতুষ্পুত্রের পরিবারে। গ্রামের কৃষকরা অবশ্য তার জবাব দিয়েছিল। কোনো লোক তাঁর বাড়িতে খাটেনি, তাঁর ধান মাঠে পড়েছিল। তাঁর আলুর ক্ষেত চষা হয়নি। তাঁর গোয়াল-ভরা গরুর মুখে ঘাস-বিচালি যোগাবার রাখাল পর্যন্ত জোটেনি। কালী সরকার আমাকে গম্ভীর মুখেই জানিয়েছিলেন, ব্যাপারটা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, দুই পক্ষের কেউই কাউকে ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।

কৃষকদের মনের ভাব একটু একটু বুঝতে পারছি বৈকি। কি করে তারা ছাড়বে? দুর্ভিক্ষের পরের বছর সব জায়গায় ভালো ফসল হয়নি। তার পরের বছর বকেয়া বাকি ঋণের নামে কৃষকদের সর্বস্বান্ত করে শুষে নিয়ে গেছে। এই তৃতীয় বছরে সোনার ধান মাঠে মাঠে আশার বাণীর মতো হাতছানি দিচ্ছে।

আর আমার মনের ভাব শুনবে? আমি এসেছি সেই কলকাতা শহর থেকে, যেখানে কিছুকাল আগে মানুষ পশুর মতো আচরণ করেছে। তখন সেই দাঙ্গার দিনগুলিতে কতবার ভেবেছি — এবং পরস্পরকে বলেওছি—এর চেয়ে মানুষের জন্য কিছু একটা করতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরাও ভালো। সেই কিছু একটা, আজ আমার চোখের সামনে, মানুষ আর শস্যের যুগ-যুগান্তরের নিবিড় সম্পর্কের রূপ নিয়ে উপস্থিত। মহানগরের অন্ধকূপ থেকে হঠাৎ আমি ছাড়া পেয়েছি গ্রাম-গ্রামান্তরের দিগন্তবিস্তারী খোলা মাঠের মধ্যে। আমার মাথার ওপরে রৌদ্রদীপ্ত ঘননীল উজ্জ্বল অনন্ত আকাশ, আর চারপাশে আশাদীপ্ত নক্ষত্রের মতো অজস্র মানুষের মুখ। এই সব আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ুক সর্বত্র, রোদে-পোড়া কালো মানুষের অঙ্গার স্তূপে।

বুঝতেই পারছ এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ মনোভাব কৃষকজীবনের কঠোর বাস্তবতার বিশ্লেষণের অন্তরায় ছিল। তবু মনে করো না একেবারেই চোখ বুজে ছিলাম।

নড়াইলে একজন কৃষক ভাতের থালা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল — এটা তেভাগার ধানের ভাত।....তাকে খুশি করার জন্য আমি সজ্ঞানেই এমন মুখভঙ্গি করেছিলাম যাতে তেভাগার ধানের ভাতের বিশেষ মিষ্টত্ব এবং রসাস্বাদনের প্রয়াস বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

দিনাজপুরে এসে ফুলবাড়ির মাঠে প্রথম তেভাগার ধানকাটা দেখলাম।

একটা লাল নিশান পুঁতে রেললাইনের ধারে ধানকাটা হচ্ছিল। মাঝে মাঝে গানও গাওয়া হচ্ছে। একজন তামাক সাজছে সারাক্ষণ। কয়েকজন লোক ভাত-রাঁধার আয়োজন করছে। আজ মাঠেই বনভোজনের ব্যবস্থা। আমার পক্ষে খুশি এবং উত্তেজনা চেপে রাখা মুশকিল। আমি কয়েকজন সাঁওতাল কৃষকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম।

এই সময় দার্জিলিং মেল পাস করে। হঠাৎ সেই দুরন্ত গাড়িটা মাঠের মধ্যে আমাদের কাছাকাছি এসে থেমে গেল। ড্রাইভার এবং ফায়ারম্যানেরা হাসছে, আর হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বলছে। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বলতে বলতে কাস্তে হাতে একদল কৃষক ইঞ্জিনের দিকে দৌড়ে গেল। ওদিকে ওরাও গাড়ি থেকে পাল্টা ধ্বনি দিচ্ছে। গাড়ির যাত্রীরা হতবাক হয়ে এই কাণ্ড দেখছে। হঠাৎ শুনলাম ধ্বনির ভাষাটা বদলে দিয়ে কে যেন বলে উঠল — কৃষক মজুর এক হও।....ওদিকে গাড়ির পিছন থেকে গার্ড ক্রমাগত তার ফ্লাগ নেড়ে আর বাঁশি বাজিয়ে ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করছে। কিন্তু গাড়িটার

নড়ার লক্ষণ নেই। কারণ তখন কৃষকদের হাত থেকে একটা লাল নিশান নিয়ে ইঞ্জিনের মাথায় বাঁধা হচ্ছিল। তখন মনে হচ্ছিল দার্জিলিং মেলের মতোই আন্দোলন বাঁধা লাইন দিয়ে দ্রুত সম্মুখে ধাবিত হবে।

কদিন পরে জেলা শহরে গিয়ে দেখি, সেখানে খুব উত্তেজনা। কোর্ট-কাছারিতে ঐ একমাত্র আলোচ্য বস্তু। আর ট্রেনে যেতে যেতে তেভাগা আন্দোলনের নেতাদের সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ধারণা ব্যক্ত হতে শুনলাম। কেউ তাদের রাক্ষসের মতো নৃশংস, কেউ বা তাদের অতি-মানব বলে বর্ণনা করছে।

ভিখু, সংস্কৃতি কি তা জানো? ঐ রকম শব্দ কখনো তুমি নিশ্চয়ই শোনোনি। তবু শোনো, শহরের এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এক সভার আয়োজন করল, তারা নাকি আমার কাছ থেকে আন্দোলনের কথা শুনতে চায়। আমি এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। তবু যেতে হলো। কি যে বলেছিলাম আজ আমার বিন্দুমাত্র মনে নেই, শুধু মনে আছে সভাশেষে বেরিয়ে আসতেই কে একজন বলল — চিরির বন্দরে গুলি চলেছে।....ঐটাই তেভাগা আন্দোলনের প্রথম গুলির খবর।

চিরির বন্দর জায়গাটা দিনাজপুর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। ট্রেনে গিয়ে আবার কিছুটা হাঁটতে হয়। দল বল বেঁধে সেখানে যাওয়া গেল।

যে-জায়গাটায় গুলি চলেছে সেটা বিরাট এক মাঠের মাঝখানে। চারদিকে পাকা ধানের সমুদ্রে যেন ঢেউ খেলছে। একটা জায়গায় শুধু কিছু ধানের শিষ মাটি ছুঁয়েছে—সেটা বন্দুকের গুলিতে আহতদের শেষ নিশ্বাস ত্যাগের আগেকার ধড়ফড়ানির ফল। নোয়ানো ধানের গুচ্ছ তুলে দেখলাম তার নিচের মাটি রক্তে তামাটে হয়ে গেছে। কেউ কেউ সেই মাটি হাতে তুলে নিল। কৃষকরা আমার হাতে কয়েকটি বুলেট উপহার দিল। পুলিশ কৃষকদের তাড়া করে গ্রামের প্রান্তে নিয়ে গিয়ে গুলি চালিয়েছিল, তার কতকগুলো ঘরের মাটির দেওয়ালে ঢোকে। কৃষকেরা তা খুঁড়ে খুঁড়ে বের করেছে। এদের সবাই মুসলমান। তাদের ইচ্ছা আমি এগুলি কলকাতায় সোহরাওয়ার্দির হাতে তুলে দিই। তিনি তখন লীগ-মন্ত্রিসভার কর্ণধার।

বেলা বাড়ছে। একখানা মাঠ পার হয়ে আমরা এক সম্পন্ন কৃষকের বাড়ি এসে উঠলাম। এখানেই আমাদের আহারের আয়োজন হয়েছে। অনেক লোক জমেছে, তারা শুনতে চায় অতঃপর কি করণীয়।

চিরির বন্দরে কৃষকরা সেদিন কি চেয়েছিল জানো ? বন্দুক। এ অতি সত্য কথা। তাদের কাছে 'এক লাঠি, এক টাকা, এক ভাই' চাওয়া হয়েছিল, তারা তা দিয়েছিল। এখন তারা নিজের চোখে দেখেছে হাজার হাজার লাঠি দিয়েও কয়েকটা বন্দুককে ঠেকানো গেল না। তাহলে এখন কি করবে তারা ? আমার কাছে এটা নতুন অভিজ্ঞতা। আমি গ্রামেই বড় হয়েছি, কৃষকদের চিনি, একটা চরের লড়াইতেও তাদের দেখেছি, কিন্তু সেখানেও কয়েকজন লাঠিয়ালই প্রধান ব্যক্তি। কৃষকেরা শান্তিতে থাকতেই ভালোবাসে। এখন বুঝতে পারি মানুষ কখন চরমপন্থার কথা চিন্তা করে। চরম নির্যাতনই হচ্ছে চরমপন্থার পরিপোষক।

ভিখু, তোমাকে আমি তত্ত্বকথা শোনাতে বসিনি, তেভাগার ইতিহাসও ব্যাখ্যা করছি না। এ-কাহিনী আসলে তোমাকে নিয়েই রচিত। তবু যে কতকগুলো আনুষঙ্গিক ঘটনা এসে পড়ছে তার কারণ, এগুলি না বললে তুমি আমার মনে কেন স্থান নিয়েছ, তা বোঝা এবং বোঝানো যাবে না। এখন তোমার বয়স উনত্রিশ হওয়ার কথা। তুমি অনেক কথাই এখন বুঝবে।

এইবার অদ্ভুত এক কাহিনী শোনাব তোমাকে। অথচ এক হিসাবে সেটা নিতান্তই মামুলি ঘটনা। শুধু দৃষ্টির হেরফেরের জন্য অদ্ভুতকে মামুলি, আর মামুলিকে অদ্ভুত বলে মনে হয়।

চিরির বন্দরে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন ভালোই হয়েছিল। কৃষকেরা উঠোনে, আমরা ভদ্রলোকের ঘরের বারান্দায় খেতে বসেছি। হঠাৎ নজরে পড়ল একজন অতি শীর্ণ মলিনবস্ত্র পরিহিতা নারী একা একা খেতে বসেছে। তার খাওয়ার স্থান কোথায় জানো ? পাশাপাশি দুখানি খড়ের ঘরের চালা থেকে বৃষ্টির জল পড়ে যে জায়গাটা ঢালু গর্তের মতো হয়েছে, সেইখানে গর্তের মধ্যে কলাপাতা ভাঁজ করে সে বসেছে।

আমি নিতান্ত মামুলিভাবেই প্রশ্ন করেছিলাম — মেয়েটাকে সাঁওতাল বলে মনে হচ্ছে।

কে যেন স্বাভাবিক স্বরেই জবাব দিল — হ্যাঁ, শিবরামের বৌ।

—মানে! যে শিবরাম শহীদ হয়েছে ?

—হ্যাঁ, তারই বৌ।

আমি হাতের ভাতের দলা নিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর ভাত আমাকে গিলতে হলো।

ভিখু, তুমি হয়ত জানো না, চিরির বন্দরে সেদিন শিবরাম আর সমীরুদ্দীন মারা যায়। সেই শহীদদের হত্যার প্রতিবাদেই আমাদের চিরির বন্দরে আগমন। অথচ একজন শহীদের বৌ আজ সব থেকে নিকৃষ্ট জায়গায় কুকুর-বিড়ালের মতো খেতে বসেছে কলাপাতা বিছিয়ে। আর সেটা ঘটেছে সকলের চোখের সামনে এবং কারোরই তাতে কিছু মনে হচ্ছে না। এর নামই বোধহয় একাত্মবোধ।

অথচ মজা এই যে শিবরাম এবং সমীরুদ্দীন মরেছে, তাদের এই আন্দোলনে নিজেদের কোনো লাভই ছিল না। তারা ক্ষেতমজুর। তবু তারাই প্রাণ দিল। আর এ-নিয়ে অনেক গবেষণাও শোনা গেছে— ক্ষেতমজুরেরা কেন এত ক্ষেপল !....কিন্তু সব সত্ত্বেও তলার মানুষ তো ওপরে উঠতে পারল না ? তার উত্থান কে চায় ? আমরা যে সম্পন্ন কৃষকের বাড়িতে খেতে বসেছি তাদের কাছে শিবরামের বৌ তো দুঃখী-কাঙাল বই কিছু নয়। কিন্তু অন্যেরা তা সহ্য করলে কি করে ? অন্তত আজকের দিনটা ঐ শহীদের বৌকে কি ঘরের দাওয়ায় এনে বসানো যেত না ?

না যেত না, সে তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।

এরপর সমীরুদ্দীনের বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা আমার লোপ পেয়েছিল। তবু যেতে হলো। সেখানে শিবরামের বৌয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ ম্লানমুখে বসে আছে। শুধু তফাৎ এই, তার চারপাশে চার-পাঁচটি ন্যাংটো ছেলেমেয়ে। খোলা উঠোনে চুলোয় একটা হাঁড়িতে কি যেন ফুটছে। ওপাশে একটা দাওয়ায় একটা ঢেঁকি শোভা পাচ্ছে। তার ওপরের খড়ের চালা অনেক আগেই লুপ্ত হয়েছে। বৃষ্টির জলে দাওয়াটাও ক্ষয়ে গেছে। আর একখানি মাত্র ঘর। তার অর্ধেকটা ভেঙে পড়েছে।—এই হলো আর এক শহীদের ডেরা। সমীরুদ্দীনের বৌ লোক দেখে মাথায় কাপড় দিতে গিয়েছিল, কিন্তু অতদূর ওঠানোর মতো কাপড় কোথায় ? যা আছে তার ছিন্ন অংশের ফাঁকে দেহ অসংবৃত। কাজেই সে এবং আমরা আড়ষ্ট হয়ে রইলাম। তারপর ফিরে এলাম।

কৃষকের সঙ্গে একাত্মবোধ ? অত সোজা নয়।

তারপর কত জায়গায় গেলাম, কত কি দেখলাম। কত কি ঘটল, সে সব থাক। আমি শুধু একটা ঘটনা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব। কারণ আমি তার মধ্যে নিজেই জড়িয়ে পড়েছিলাম। তা সত্ত্বেও সেখানকার কেউ আমার মনের গভীরে কেন স্থান পায়নি ?

ডিমলার নাম শুনেছ ? একবার এলাকাটা নাকি অসহযোগ আন্দোলন-কালে ছমাসের জন্য স্বাধীন হয়েছিল। মনে করো না সেটার পিছনে খুব বেশি বীরত্ব ছিল। জায়গাটা এত সভ্য জগতের বাইরে, এবং বর্ষাকালটায় এমন ডুবে থাকে যে ইংরেজরা ওর স্বাধীনতাকে গ্রাহ্যই করেনি। রাস্তাঘাট শুকিয়ে খটখটে হলে তারা ওখানে একজন দারোগা পাঠিয়েছিল, কেউ বাধা দেয়নি।

শুনে আমার ভারি হাসি পেয়েছিল। বক্তা রাগ করে বললেন — এতে হাসির কিছু নেই। আর এবার তো বাবুদের আন্দোলন নয়, এবার চাষা ক্ষেপেছে, কাজেই অবস্থা সঙ্গীন হতে পারে।

জায়গাটায় পৌঁছে দেখলাম, কই তেমন তো কিছু নয়। শুধু কনকনে শীতে ঘুমনো দায়। যেখানে আস্তানা পড়েছে, সেখানে দুজন নেতার সাক্ষাৎ পেলাম। মাচার ওপর আমরা তিনজন, তার নীচে কটি ছাগল।

ধান কাটা শেষ হয়েছে, কৃষকেরা নিজের খামারেই সব তুলেছে, এখন জোতদারেরা পুলিশ এনে তা ছিনিয়ে নিতে চাইছে। কাল হাটবার, পরশু মিটিং ডাকা হয়েছে। কাজেই আপাতত আগামী কাল ছুটি।

সকালবেলা তামাকের ক্ষেতে জল দেওয়া দেখছি, এমন সময় পাশের গ্রামের এক সম্পন্ন কৃষকের বাড়ি থেকে একটি ছোকরা এসে বলল — বিকালে চা-খাওয়ার নেমন্তন্ন।

ঘটনাটা এতই নাটকীয় এবং আনন্দদায়ক যে তোমাকে তা বর্ণনা করে বোঝাতে পারব না। তুমি কি করে বুঝবে এক সপ্তাহ কারো পেটে চা না পড়লে বিশ্ব কেমন অন্ধকার দেখায় ? কদিন আগে দীনেশ লাহিড়ী নামে এক কৃষকনেতাকে ঠাট্টা করেছিলাম, কারণ তিনি আমাদের ফেলে দশ মাইল পায়ে হেঁটে রুইমাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে এসেছিলেন। বলা বাহুল্য, ফিরতেও তাঁকে দশ মাইল হাঁটতে হয়েছিল। লাহিড়ীমশাই জমিদার বংশের ছেলে, বহুকাল জেল খেটে প্রৌঢ় বয়সে কৃষক-আন্দোলনে যোগ দেন। উত্তরবঙ্গের কৃষকদের ভাষা তাঁর মতো কেউ আয়ত্ত করেনি ; অন্তত তাঁর মতো কাউকে জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে খাঁটি কৃষকসুলভ গালাগালির ভাষা প্রয়োগ করতে শুনিনি। তাঁর পায়ে জুতো নেই, গায়ে একটা গরম জামা নেই, রুগ্ন শীর্ণ শরীর। কোমরে ব্যথা, আর গত দেড় মাস তেভাগা শুরু হওয়ার পর কৃষকদের বাড়িতে জলের মতো ডাল আর পাটশাকের বেশি আহার্য জোটেনি।

কিন্তু ভিমলায় এসে আমরা যে তাঁকেও ছাড়িয়ে গেলাম। রুইমাছের ঝোলের চেয়ে চা আমাদের কাছে আরো আকর্ষণীয় মনে হলো।

যাঁর বাড়িতে আমরা হাজির হলাম তিনি একজন সম্পন্ন কৃষক, কিন্তু ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে জোতদারের চেয়ে কম নন। গোয়াল-ভরা গরু, খামার-ভরা ধান, বিরাট বিরাট আটচালা ঘর। এরকম পরিবার কৃষক সমিতির সঙ্গে আছে দেখে আনন্দ হলো। এবং তা আরো বেড়ে গেল, যখন শুনলাম, আমাদের জন্যে খাঁটি গাওয়া ঘি দিয়ে চিঁড়ে ভাজা হচ্ছে।

এমন সময় দেখা গেল মাঠের মধ্য দিয়ে একটা লোক প্রাণপণ বেগে ছুটে আসছে।

—গুলি চলেছে।

—কোথায় ?

—উই, হোথায় !

—কেউ মরেছে ?

তা সে বলতে পারে না। খবর শুনেই সে ছুটেছে। রইল আমাদের চা আর চিঁড়ে-ভাজা। তার পিছন পিছন ছুটছি আমরা তিনজন। তখন লাল হয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ধান-কাটা মাঠে নাম-না-জানা একরকম ছোট ছোট লাল ফুল দুপায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছি। আশ্চর্যের ব্যাপার, কতবার ভেবেছি এই ফুলের নাম কাউকে জিজ্ঞাসা করি কিন্তু জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রশ্ন করতে সাহস পাইনি। ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পৌঁছাতে পৌঁছাতে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। দেখা গেল, গুলির যথার্থ ফলাফল কেউই জানে না। যতই এগুচ্ছি, ততই লোকের মধ্যে বেশি আতঙ্কের ভাব দেখছি। কেউ বলছে, দশজন মরেছে — কেউ বিশ, কেউ পঞ্চাশ। কেউ বলছে একশ বন্দুকধারী পুলিশ, কেউ তার সংখ্যা বাড়িয়ে বলছে পাঁচশ।

আমার সঙ্গী নেতাদ্বয়ের যিনি সিনিয়ার, তিনি তাঁর টর্চলাইটটা আমার হাতে দিয়ে বললেন — আপনি রিপোর্টার মানুষ, আপনি গিয়ে দেখুন।

আমি তাঁর এই ব্যবহারে বিস্মিত ও লজ্জিত হলাম। পরক্ষণেই মনে হলো, আচরণটা হয়ত কারণ-সঙ্গত। কেননা পুলিশ তাঁদের দেখলে গ্রেপ্তার করতে পারে। তবুও এই বিদেশ বিভুঁইয়ের সব কিছুই আমার অজানা অচেনা। আমি এখানে কি বলব, কি করব ?

ছায়ার মতো দুজন কৃষক আমার অনুগামী হলো। তাদের না পেলে আমি যে কি করতাম জানি নে।

ঘটনাস্থলে গিয়েও প্রথমটা কিছু বুঝতে পারলাম না। নির্জন অন্ধকার মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে খড়ের আগুন জ্বলছে, আর তার পাশে কয়েকজন আহত কৃষক মাটিতে পড়ে আছে। হঠাৎ মনে হলো যেন এক প্রাগৈতিহাসিক যুগে এসে পড়েছি এবং যেখানে কোনো বন্যপশুর ভয়ে মানুষ আগুন জ্বেলে নিজেকে রক্ষা করছে।

আসলে মৃতের সংখ্যা এক, গুরুতর আহতের সংখ্যাও এক। কিন্তু গুলিবিদ্ধ লোকের সংখ্যা বহু। তার কারণ পুলিশ বুলেট ব্যবহার করেনি, পাখিমারা কার্তুজ দিয়ে মানুষ মেরেছে। মানুষও তাই ছররাবিদ্ধ হয়ে পাখির মতো দূর দূরান্তরে ছুটতে ছুটতে গিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তাদের কতকগুলি পড়ে আছে এই মাঠে, আর কতকগুলি গ্রামে গিয়ে ঢুকতে পেরেছে।

মারা যে গেছে তার নাম তৎনারাযণ। তার ঘরের মধ্যে ঢুকে ডোল থেকে জোতদাররা ধান ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। তখন তার চিৎকারে রাস্তা থেকে বহু হাটুরে লোক সেখানে ছুটে যায়।

আমি গিয়ে দেখলাম তৎনারায়ণের মৃতদেহের অর্ধেকটা মাচার ওপর, বাকি অর্ধেক শূন্যে ঝুলছে। মাথার খুলি ফেটে গেছে। পাশের বারান্দা থেকে মাঝে মাঝে কাদের ক্লান্ত কান্নার স্বর ভেসে আসছে।

পুলিশ উঠোনে আর একটা লোককে এনে শুইয়ে রেখেছে, তার বা-চোখের মধ্য দিয়ে গুলি পাশ কেটে বেরিয়ে গেছে, তবু লোকটা মরেনি। লোকটির নাম গুলমহম্মদ। তাকে হাসপাতালে পাঠালে হয়ত বেঁচে যেতেও পারে। কিন্তু হাসপাতাল এখান থেকে কতদূর ?

পুলিশ বলল, সকালের আগে গরুর গাড়ি যোগাড় করা যাবে না। রাত্রে আপাতত কিছু করণীয় নেই। পাশের গ্রামে আস্তানায় ফিরে গেলাম। রাত তখন দুটো। ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে বরফ। একদলা ভাত খেয়ে নেতাদ্বয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাত ভোর হয়ে গেল। কি করতে হবে ? সেই মামুলি মিটিং ডাকার কথা, গ্রামে গ্রামে খবর পাঠানোর কথা, লোকের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয় লক্ষ্য করার কথা। কিন্তু আপাতত আমাকে গিয়ে দেখতে হবে যাতে পুলিশ গ্রামের লোকের এজাহার ঠিক ঠিক লিখে নেয়।

গেলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই চক্ষুস্থির। লোককে খবর পাঠাতে

হয়নি। তারা নিজেরাই কাতারে কাতারে আসছে। নেতাদ্বয়ের কিছু হিসেবের ভুল হয়েছে। কিন্তু এদের হাতেই বা ওগুলো কি বস্তু? খুব কম লোকের হাতেই লাঠি, বেশির ভাগের হাতে সড়কি, বল্লম, খাঁড়া, রামদা, মেয়েদের হাতে বঁটি, খোন্তা। কারো কারো হাতে লাঙলের ফাল, কোদাল এবং কুড়ুল। আটটা নটার মধ্যে সমস্ত মাঠ ছেয়ে গেছে। মাথা গুনতি করলে হয়ত হাজার দশেকের বেশি হবে না, তবে চর্মচক্ষে জনসমুদ্র বলেই বোধ হচ্ছিল।

মাত্র চারজন বন্দুকধারী পুলিশ, আর একজন দারোগা। তাদের মুখ ভয়ে শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে।

দারোগাবাবু বললেন — আমি নিজে গরুর গাড়ি করে এক্ষুনি গুলমহম্মদকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি শুধু দয়া করে দেখবেন untoward কিছু না ঘটে।

—তাহলে আপনার বন্দুকধারীদের একটু পিছিয়ে রাখুন।

—ঠিক আছে।

কাল যে দুজন কৃষক ছায়ার মতো আমার সঙ্গে এসেছিল তারা জিজ্ঞাসা করল — লোকেরা কি করবে?

—আমি তার কি জানি?

—ওরা আপনার হুকুম চাইছে?

—আমার!

—হ্যাঁ আপনার।

মুহূর্তকাল ভেবে যে-সত্য আবিষ্কার করলাম, তা আমার পক্ষে আদৌ সুখদায়ক ঠেকল না। এখানকার নেতাদ্বয় আত্মগোপন করার ফলে প্রচার হয়ে গেছে আমিই তাঁদের প্রতিনিধি। ফলে এই দশ হাজার ক্রুদ্ধ বর্শা-বল্লমধারী লোক আমার নির্দেশের অপেক্ষা করছে।

আমি ছায়াসঙ্গীদের প্রশ্ন করলাম, ওরা কি চায়?

উত্তর এল, ঐ যে সামনে জোতদারদের গ্রাম, ওটাকে আক্রমণ করতে চায়?

—তারপর?

—ওরা সব জোতদারদের মাথা কেটে আনবে।

—আর?

—ওদের মেয়েদের পুড়িয়ে মারবে।

—কি করে?

—সারা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে।

—আর এ-সব যদি আমি না করতে বলি?

ছায়াসঙ্গীরা নিশ্চুপ। একজন বলল, তাহলে কি হয় বলা যায় না। তাহলে হয়ত এই পুলিশদের ওরা ছেড়ে দেবে না।

আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, এত লোকের হাতে ধারালো অস্ত্রশস্ত্র আমি কখনো দেখিনি। আর এতে আমার মনে পুলক সঞ্চার হচ্ছিল না। শুধু বোধহয় মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমাকে ধরে এনে আমার ঘাড়ে একশ মণ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। আমি কি করি এখন? কি করে এদের থামাব? অথচ আমার মুখের একটা কথায় আজ এরা প্রলয়কাণ্ড ঘটাতে পারে। এতবড় শক্তি এবং সম্মান যে আমার ভাগ্যে জুটতে পারে, তা ভাবতে পারিনি! আমি যেন হঠাৎ সম্রাট হয়ে গেছি। একবার যদি চেঁচিয়ে বলি, তাহলেই ঐ যে সম্মুখে সবুজ ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম, সেখানে জ্বলে উঠবে দাউ দাউ করে আগুন। মুহূর্তের মধ্যে ফুৎকারে উড়ে যাবে মানুষের কাঁচা মাথাগুলো। অথচ এত বড় যে শাহানশাহ সম্রাট, সে কেন দুশ্চিন্তার ভারে এমন নুয়ে পড়েছে!

ছায়াসঙ্গীদের একজনকে পাঠালাম নেতৃদ্বয়ের কাছে নির্দেশের জন্য। সে লোকটা আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে বলল, উপস্থিত যা ভালো বুঝি, তাই যেন করি।

আমি এ-কথা গোপন করতে চাই নে যে, আমার ভারি রাগ হলো এঁদের দায়িত্বজ্ঞান দেখে। আর যতই রাগ বাড়তে লাগল ততই আমার মুষড়ে-পড়া ভাবটা কেটে গেল। আমি যেন একটু আলো দেখতে পেলাম। এটা বুঝতে পারছি, ঐ খুনখারাপির দায়িত্ব হঠাৎ আমি নিজের কাঁধে নিতে পারব না। কিন্তু এদের থামাব কি করে? আওয়াজ মাঝেমাঝেই সমুদ্রগর্জনের মতো উঠছে, আর সেই সঙ্গে এদের মধ্য থেকেই বেপরোয়া বক্তারও অভাব ঘুচে যাচ্ছে। কেউ কেউ উত্তেজিত লোকদের আরো উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে।

কিন্তু উত্তেজনার চেয়ে পেটের ক্ষিদে যে বড়, সেটা আমার মাথায় ছিল। সুতরাং কৌশল হবে কালক্ষয় করা। এইভাবে বারোটা একটা নাগাদ ঠেকিয়ে রাখতে পারলেই সামলে দেওয়া যাবে। অতএব—

অতএব আমি বক্তৃতা করতে লাগলাম। কে একজন একটা চোঙ আমার হাতে দিল। তাতে মুখ লাগিয়ে যেসব আপাত সত্যকথা বললাম, তার যে ষোল-আনাই মিথ্যে, তা আমি হলপ করে বলতে পারি। এই আমি প্রথম বুঝতে পারলাম সুবিধাবাদী নেতারা কিভাবে অনর্গল বানানো মিথ্যা পরম সত্যের মতো জোর দিয়ে বলে যেতে পারে এবং কিভাবে তারা 'ম্যানেজ' করে। গ্লানি এবং ধিক্কারে আমার মন ভরে গেল। ভিখু, তুমি যদি সেখানে থাকতে, দেখতে পেতে মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সাধনা প্রহসনে পরিণত হওয়া কত মর্মান্তিক।

যা ভেবেছিলাম তাই। দুপুরবেলা তিনভাগ লোক চলে গেল। বাকি যারা রয়ে গেল তারা অধিকাংশ আশপাশের গ্রামের লোক। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, কিন্তু এমন সময়ে মূর্তিমান আর এক দুর্ভোগ এসে দেখা দিল।

উত্তরবঙ্গের এক বিখ্যাত ব্যক্তি এসে হাজির। তাঁর নামধাম করতে চাই নে, কারণ যে-কাণ্ড তিনি করেছেন তা যে-কোনো ব্যক্তির পক্ষে অতি লজ্জাকর। কলকাতায় লোকটিকে দেখেছি, অল্পবিস্তর পরিচয়ও ছিল, খাঁটি লীগের লোক। এখানে এসেই শুনেছিলাম লোকটি সপ্তাহ দুই আগে এই এলাকায় প্রচণ্ড এক দাঙ্গা বাধাবার উপক্রম করেছিলেন। হিন্দু মুসলিম কৃষক সম্পূর্ণ ভাগ হয়ে গিয়েছিল। সেদিন দুই ক্রুদ্ধ জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন আজিকার আত্মগোপনকারী নেতৃদ্বয়। তারপর তেভাগা শুরু হতেই কৃষকদের মধ্যেকার ফাটল যখন জোড়া লেগে গেল, তখন উল্টো দিকে হিন্দু মুসলমান জোতদাররাও মিশে গেল ঝাঁকের পাখির মতো। আজ যিনি এসে উপস্থিত, তাঁকেও জোতদাররাই পাঠিয়েছে কৃষকদের ঠাণ্ডা করতে।

কিন্তু অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতো কৃষকদের স্তিমিত ক্রোধ তাঁকে দেখে আবার বেড়ে উঠল। আর কৃষকরা এতক্ষণ পর একটা কিছু নাগালের মধ্যে পেয়েছে। সবাই তাঁকে ঘিরে ধরল। কি করে তিনি গুলির খবর পেলেন? তিনি তো থাকেন দূরে শহরে। তাহলে গুলি চালানোর আগেই জোতদাররা নিশ্চয় তাঁকে খবর দিয়ে আনিয়েছিল। লীগনেতা কৃষকদের এতগুলো প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলেন না। আর তাঁর পিঠের উপর কৃষকরা তখন সড়কি আর বল্লম উঁচিয়ে ধরেছে।

—দিই ব্যাটাকে শেষ করে। আপনি হুকুম দেন।

আমি জবাব দিলাম — এই যদি তোমরা কর, আমি এক্ষুনি চলে যাব।

হঠাৎ সেই লীগনেতা কেঁদে ফেললেন, আর সেইসঙ্গে মাটিতে বসে পড়ে আমার হাঁটু জড়িয়ে ধরলেন — আপনি বাঁচান আমাকে।

আমি কি স্বপ্ন দেখেছি। এর নামই কি শ্রেণীসংগ্রাম? কিন্তু আমি যে-কাণ্ড করলাম তা নিতান্তই মোলায়েম। আমি তাঁকে হাত ধরে তুলে ধরে বললাম, আপনি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যান।

তিনি তক্ষুনি সানন্দে জোতদারদের গ্রামের দিকে রওয়ানা দিলেন। তাঁর অপস্রিয়মান মূর্তিটির দিকে চেয়ে আমার মনে হলো, কেন কঠিন হতে পারলাম না। এদের মতো লোকেরাই তো দুর্ভিক্ষে মানুষ মেরেছে, আর এখন লোক একটা আন্দোলনের পথে এগুতে চাইছে বলে তাদের গুলি চালিয়ে মারছে। লোকটা যেদিকেই তাকাচ্ছে সেদিকেই তো মৃত্যু। তবুও লোকটাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেওয়া কেন? আর আমি ছেড়ে দিতে চেয়েছি বলেই যে কৃষকরাও ছেড়ে দিয়েছে, তাও তো ঠিক নয়। এত যে রাগ, তবু তারা মানুষের গায়ে সহসা হাত দিতে চায় না। আজ জোতদারদের গ্রাম জ্বলেনি, মানুষ মরেনি, তাতে তো তাদের একটুও নিরানন্দ দেখছি না, বরং তারা শেষ পর্যন্ত কি ব্যাপারটা এড়াতে পেরে খুশিই হয়নি? হিংস্রতা তো তাদের সহজাত প্রবৃত্তি নয়। মাটির বুকে সন্তানের মতোই যত্নে তারা ফসল ফলায়। তবু আমি জানি ক-দিনের মধ্যেই আসবে আরো বন্দুক, আরো পুলিশ, জোতদারদের আরো গুণ্ডার দল। কিন্তু তার চেয়েও যে আরো কিছু ভয়ঙ্কর ঘটতে পারে, তখন তা কি ভেবেছিলাম?

বাঙলাদেশে কৃষকদের জয় না হলে জাতি দুই টুকরো হয়ে যেতে বাধ্য। অথচ দাঙ্গার কলকাতা থেকে বেরিয়ে তো স্পষ্টই দেখলাম, ভাঙা কি করে সহজে জোড়াও লাগে। আমার কেবলি মনে হচ্ছিল, বাঙলাদেশের সাহিত্যিক নাট্যকার যাঁরা এত করে সাম্প্রদায়িক মিলন চেয়ে এসেছেন, তাঁরা হয়ত আসল জায়গায় হাত দিতে পারেননি। কিন্তু আজ আর তা নিয়ে আক্ষেপ নেই। কারণ কৃষকের জয় নামক বস্তুটার সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেক কিছু জড়িত। সেদিন নিকট দূরের বহু শক্তি তাকে পিষে মারার জন্য তৈরি ছিল। তবু এর আর একটা দিকও ভাবতে ইচ্ছে করে। সময়টা ভারতের স্বাধীনতা লাভের আগের বছর। কিন্তু স্বাধীনতার ছায়াটুকু যে কতদূরে তা কেউ জানত না। ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত একটা অনির্দেশ উত্তেজনার ঢেউ বইছে। অন্তত কল্পনা করতে দোষ নেই যে, সেদিন ষাট লক্ষ কৃষক অন্যান্য বহুলক্ষ

মানুষের সঙ্গে মিলে দৃঢ়পণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে বাংলাদেশের অন্য চেহারা হতো — এসব এখন ভেবে লাভ কি? তখন সব [illegible] ছিল অস্পষ্ট। শুধু তখন মাঠে মাঠে ঘুরতে ঘুরতে মনে হয়েছে, এসব কথা বড় বড় শহরের মাথাওয়ালা নেতারা কি আর ভাবছেন না! তাঁদের উপরই ভার দিয়ে বসেছিলাম।

সরল বিশ্বাসের এই এক দোষ। কিন্তু ভিখু, তুমি কি এই সব বকুনির বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছ? পারলে সরল বিশ্বাস নামক দ্রব্যটা ত্যাগ করো! ওতে শুধু ভগবানই মেলে, আর কিছু না। তোমার আজ বয়স হয়েছে, ঘাড়ের উপরের মাথাটা দিয়ে কি কিছু ভাববে না?

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা ডিমলা ত্যাগ করলাম। পথে কয়েকজন কৃষকের বাড়িতে বসতে হলো। তাদের আমি চিনি না, কিন্তু তারা আমাকে একদিনের মধ্যেই চিনেছে। তাদের মুখ আমার আজ মনে নেই, কিন্তু সেদিন বিদায় নেওয়ার সময় তাদের প্রত্যেকের চোখেই জল দেখেছিলাম। এমন কি সুকৃতি আমি করেছি, যাতে এতটা আশা করতে পারি? কিন্তু মানুষ মানুষের বন্ধু হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে। আমার চোখে জল আসেনি, এরা আমাকে দেখলেও এদের তো আমি ব্যক্তি হিসাবে দেখিনি। এরা সারাদিন আমার চোখে সমষ্টির মধ্যেই মিশে ছিল! আমার বরং এদের জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল —কারণ জানি, দুদিন পরেই এদের উপর আসবে শত্রুপক্ষের প্রবল আক্রমণ।

ভিখু, এরপর আমি কলকাতায় ফিরে এলাম। বেশ কয়েকদিন নিশ্চিন্ত কাটানো গেল। একদিন সকালে চা খেতে খেতে কাগজের প্রথম পাতায় চোখ পড়তেই দেখি, খাঁপুরে পুলিশের গুলিতে আঠারো জন নিহত। আর অনেকে আহত হয়েছে।

কলকাতা থেকে ডাক্তার সহ কয়েক ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের জন্য পাঠানো হলো। তাঁরা দুদিন পরে ফিরে এলেন। পুলিশ তাঁদের ঐ এলাকায় ঢুকতে দেয়নি।

তখন আমার কাছে প্রস্তাব এল, আমি ঐ এলাকায় অন্য কোনো পথে ঢুকতে পারি কিনা। আমি সহজেই রাজী হয়ে গেলাম। আমার কাছে ছবিটা স্পষ্ট ছিল। বালুরঘাট স্টেশনে নেমে খাঁপুর যেতে হয় — মাত্র কয়েক মাইলের পথ। এই পথটাই পুলিশ আটকে রেখেছে। কিন্তু বালুরঘাট ছাড়িয়ে যদি ফুলবাড়ি স্টেশনে যাওয়া যায় তাহলে মাইল দশেক হেঁটে হয়ত পিছন দিক দিয়ে

খাঁপুরে ঢোকা যেতে পারে! এতেও পুলিশের হাতে পড়ার সম্ভাবনা, কিন্তু এছাড়া অন্য পথ নেই। তবু ভাগ্যিস আমি রাজী হয়েছিলাম, নইলে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হতো না।

আমি আবার সেই স্টেশনে নামলাম যার কাছে একদিন দার্জিলিং মেল থেমেছিল। আমি আবার সেই মাঠ দিয়ে হাঁটলাম যেখানে একদিন নিশান উড়িয়ে ধান কাটা হয়েছিল। আমি আবার সেই গ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলাম যেখানে এক সময় দিবারাত্র উৎসবের বন্যা বয়ে গেছে। কিন্তু এবার কেমন যেন সব নিঝুম। দুই একটা আধা পরিচিত মুখ চোখে পড়ল, তারা পাশ কাটিয়ে গেল। ক্যাঁচর ক্যাঁচর করে ছইওয়ালা একটা গরুর গাড়ি আসছে। গাড়ি কাছে এসে থামতেই দেখলাম বসে আছেন কালী সরকার। তাঁর মুখচোখ শুকনো। আমাকে দেখে বললেন — আপনি! ও বুঝেছি।

কালী সরকারের শ্বশুরবাড়ি খাঁপুরে। গুলি চলার সময় তাঁর স্ত্রী ছিলেন বাপের বাড়ি। তারপর তাঁরা সেখান থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেন কিছু দূরের একটা গ্রামে। এখন সেখান থেকেই স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে আসছেন আমাদের কালী সরকার। তাঁর কথা শুনে মনে হলো না খাঁপুরে ঢোকা যাবে!

মাইল সাতেক হেঁটে সন্ধ্যার মুখে যে-গ্রামে আশ্রয় পেলাম, সেখানে খাঁপুরের আরো কয়েকজনকে দেখলাম। তারা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে স্থান পেয়েছে। পরিচয় হলো প্রৌঢ় নীলকণ্ঠ বর্মনের সঙ্গে। ভিখু, তুমি তাঁকে নিশ্চয়ই চেন। এঁর স্ত্রী যশোদা বর্মন খাঁপুরে মারা গেছেন। পরদিন সকালবেলা এই শোকাচ্ছন্ন প্রৌঢ় মানুষটি আমাকে খানিক দূরে এগিয়ে দিলেন। তারপর আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন, ঐ যে গ্রাম দেখছেন, ওর পাশে আড়াআড়ি যে মাঠটা সেটা পেরুলেই খাঁপুর। আমার আর এগুতে সাহস হচ্ছে না, আমি যাই।

নীলকণ্ঠ বয়সের ভারে একটু নুয়ে পড়েছেন। তাঁকে কে যেন একজোড়া নতুন চটিজুতা কিনে দিয়েছে। সেটা পায়ে দিয়ে মাথা নিচু করে নীলকণ্ঠ ফিরে যাচ্ছেন, আর আমি একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। নীলকণ্ঠ সহজে এলাকা ছাড়েননি। গুলি চলার পরেও কয়েকদিন আশেপাশেই ছিলেন, আর প্রত্যহ শেষরাত্রিতে তাঁকে শীত অগ্রাহ্য করে মাঠের মধ্যে এসে সটান শুয়ে পড়তে হতো। কারণ পুলিশ হানা দেয় শেষরাত্রেই।

আমি চলেছি একা। আশেপাশে অনবরত দৃষ্টি ফেলছি। আশ্চর্য, চোখে

একটা লোক পড়ল না। মাঠ জনশূন্য, কেউ কোথাও কোনো ব আসেনি ক্রোশখানেক এগিয়ে যে-গ্রামে ঢুকলাম, সেখানেও সব নিস্তব্ধ। একটা সম্পন্ন কৃষকের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যখন ডাক দিতে যাব — কেউ আছেন? এমন সময় তুমি কোত্থেকে এসে আমাকে দেখে বললে, আপনি কে? তোমার কাছ থেকেই শুনলাম ঐ গ্রামেরও পুরুষ মানুষ সব পালিয়েছে।

এইখানে বলে রাখি এতকাল পরে তোমাদের রাজবংশী কৃষকের ভাষা বেমালুম ভুলে গেছি। যাই হোক আমার সব কথা শুনে তুমি বললে, খাঁপুরে যদি ঢুকতে চান, এই তার সময়।

—বলো কি? এই দিনদুপুরে? খোলা মাঠ দিয়ে গ্রামে ঢুকতে হবে না?

—আমি তো দুপুরবেলাতেই গিয়েছিলাম সেদিন। এই সময়টা কেউ সন্দেহ করে না।

—কেন বলো তো?

—এই সময় কেউ আসতে পারে, পুলিশ ভাবতেই পারে না।

—কিন্তু পাহারা তো দেয়?

—না, কোনো পাহারা থাকে না। সব্বাই তেল মেখে পুকুরে স্নান করতে যায়।

—তুমি ঠিক জানো?

—হ্যাঁ।

—তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

—হ্যাঁ।

—তোমার ভয় করবে না?

—আমার ভয় কিছু করে না, তবু মা শুধু বকে।

—তাহলে তোমায় যেতে হবে না। আমি একাই যাব।

—না, আপনি সব চিনতে পারবেন না। ওরা টের পেয়ে যাবে।

আমি হেসে বললাম — পেলেই বা।

—ওরা ধরতে পারলে খুব মারে।

—আমাকে মারবে না

তুমি তবু আস্তে আস্তে বললে — আমি যাব আপনার সঙ্গে, আপনি কতদূর থেকে আসছেন।

তুমি আমার হাত ধরে টানতে লাগলে, চলুন নইলে মা টের পাবে, আমাকে যেতে দেবে না।

আমি তোমার সঙ্গে মাঠে নামলাম। হাটছি আর মনে হচ্ছে আমরা দুজনে যেন চক্রান্তকারী। আমরা পুলিশকে জানান দিয়ে যাচ্ছি না, আমরা যাচ্ছি লুকিয়ে। এক নিষিদ্ধ স্থানে ঢুকতে যাচ্ছি পিছনের দরজা দিয়ে।

এই সর্বপ্রথম আমার মনে হলো, আমি যেন কৃষকদেরই একজন। আগে আমি আন্দোলন দেখেছি একজন দর্শক হিসাবে। তাদের প্রতি আমার অগাধ সহানুভূতি আছে কিন্তু আমি তার থেকে আলাদা। এমন কি ডিমলায় যখন হাজার হাজার কৃষক আমার ওপর অমন করে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তখনও এই দূরত্ব ঘোচেনি। তখন শুধু মনে হয়েছে আমার ঘাড়ের উপর কে যেন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ আমি স্বেচ্ছায় লুকিয়ে লুকিয়ে এক অবরুদ্ধ গ্রামে ঢুকতে যাচ্ছি।

আমি এখন বুঝতে পারছি, কেন সব ছাড়িয়ে তোমার স্মৃতি আমার কাছে এমন উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমাদের এই খাপুর যাত্রার সময় সব আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে এসেছে। এখন আর সেই সভা শোভাযাত্রা নেই। লাল নিশানের ক্ষীণতম ইশারাও লুপ্ত। চারদিকে সব চাঞ্চল্য থেমে গেছে। সব আওয়াজ বন্ধ হয়েছে। শুধু একটা বীভৎস ভয় বিরাজ করছে গ্রাম-গ্রামান্তরে। হাজার হাজার মানুষের উৎসাহে আর উত্তেজনার মধ্যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। তোমার সঙ্গে যখন দেখা হলো তখন শস্যশূন্য মাঠ, ভাষাশূন্য গ্রাম। যেন এক বিরাট রঙ্গমঞ্চে আলো নিভে গেছে, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বিদায় নিয়েছে, পিছনের সাজঘরও নীরব, দর্শকের আসনগুলিও ফাঁকা। এই অবস্থায় একজন নির্ভীক বালক এবং একজন তরুণ সাংবাদিক মুখোমুখি হয়ে পরস্পরকে দেখছিল। পিছনে মৃত্যু, সামনে নিষ্পেষণের যন্ত্র, আর মাথার উপর মধ্যাহ্নের সূর্য। তখন আচমকা মনে পড়ে গেল, তেভাগা আন্দোলনের প্রথম দিকে একজন আমায় কোলে করে শীতল জলের ছোঁয়া থেকে আমার পদযুগলকে রক্ষা করেছিল, আর আজ খাঁপুরে এগিয়ে দেবার জন্য একজন বয়স্কলোক খুঁজে পাওয়া গেল না।

মাঠের ওপার থেকে গান ভেসে এল। তুমি আমার বিস্ময় লক্ষ্য করে বললে, পুলিশরা রেকর্ড বাজাচ্ছে।

মাইল দুই দূরে লাউড স্পীকারের ধ্বনিতরঙ্গ এমনভাবে এসে কানে ধাক্কা

দিতে পারে আমার ধারণাই ছিল না। আমি প্রশ্ন করলাম, ওরা কি রোজই বাজায়?

—হ্যাঁ, প্রায় সব সময়। খাসি মেরে মেরে খায়, আর রেকর্ড বাজায়, আর তাস খেলে।

—খাসি পায় কোথায়?

—সব গ্রাম থেকে ধরে ধরে নিয়ে যায়। আর জেলে এনে পুকুর থেকে সব মাছ ধরে।

গ্রামের কাছে এসে দেখি দু-পাশটা কাটাতার দিয়ে ঘিরেছে। বহু কষ্টে সেটা পার হয়ে তুমি আর আমি হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগলাম।

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি। বেশ গরম বাতাস দিচ্ছে। গ্রামের মধ্যে টুঁ শব্দ শোনা যায় না, কেবল ঝরা পাতা মাঝে মাঝে এক একটা দমকা হাওয়ায় সরসর করে মাটির উপর উড়ে বেড়াচ্ছে। বাতাস থেমে গেলে সব নীরব। একটা মস্ত গোয়ালঘরের পাশে যেতেই পরিচিত একটা শব্দ কানে এল— গরুগুলো শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। কিন্তু জাবর কাটার এই ধরনের কোরাস কখনো আমি শুনিনি। কৌতূহলবশে গোয়ালঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। গোটাবারেক গরু চোখ বুজে মুখ নাড়ছিল, আমাদের পায়ের শব্দে নির্বোধের মতো চোখ মেলে চেয়ে রইল। আমি ফিসফিস করে প্রশ্ন করলাম, কারা এদের ঘাস জল দেয়?

—পুলিশ কটা রাখালকে ধরে এনেছে।

আমি বললাম, চল ভিতরে ঢুকি।

বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। তকতকে ঝকঝকে নিকানো উঠোন এবং ঘরগুলি। কোথাও একটু মালিন্য নেই। শুধু কিছু শুকনো ঝরা পাতা পড়ে আছে।

এইভাবে অনেকগুলি বাড়ির ভিতর ঢোকা গেল, বেশিরভাগ বাড়িতেই লোকজন নেই। শুধু দু-একটা বাড়িতে বন্ধ ঘরের মধ্য থেকে স্ত্রীকণ্ঠে ভয়ার্ত আওয়াজ শুনলাম —কে? কে?

তুমি আমার হাত টিপে দিলে, অর্থাৎ যেন শব্দ না করি। আমার ভয় হচ্ছিল, হঠাৎ কোত্থেকে একটা কুকুর ডেকে উঠবে, কিন্তু সারা গ্রামে কেন একটা কুকুর দেখলাম না। অবশেষে তুমি আমাকে একটা বাড়ির উঠানে এনে দাঁড় করিয়ে চাটাইয়ের দরজা ঠেলে ভিতরে গেলে। খানিক পরে তোমার সঙ্গে এক বুড়ি বেরিয়ে এল। বুঝলাম এই বুড়ির সঙ্গে তোমার প্রায়ই সাক্ষাৎ হয়।

বুড়ি হাত নেড়ে আমাকে কাছে ডাকল। কাছে যেতেই ফিসফিস করে বলল, তুমি কার ঘরের ছেলে বাবা! কেন এই রাক্ষসপুরীতে এসেছ, পালাও শিগগির! নইলে এরা মেরে ফেলবে।

এতক্ষণে আমার পা শিউরে উঠল। বাল্যকালের কোনো রূপকথা শুনতে শুনতে যেন এই রকম এক বুড়ির কল্পনা করেছিলাম, আর তার মুখের ভাষাও যেন এইরকমই ছিল। আজ বাস্তবে তার নমুনা দেখে ভয়ে বিস্ময়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বুড়ির দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ মনে হলো রূপকথার গল্পকারেরাও বোধহয় এমনি করে অবরুদ্ধ জনপদের অভিজ্ঞতাই কল্পনার রঙ চড়িয়ে প্রকাশ করেছিল। তাতে থাকত রাজকন্যা রাজকুমার তেপান্তরের মাঠ জীয়নকাঠি মরণ কাঠি। বুড়ি উঁচু দাওয়ার উপর বসে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, আমাদের তুমি দেখতে এসেছ! আহা মায়ের বুকে ফিরে যাও বাবা, নইলে এরা তোমাকে খুন করবে বাবা।

বুড়ি ফিসফিস করে আরো কত কি বলতে লাগল আর মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি করে বলল — পালাও।

আমি বললাম, এই ভিখু তো প্রায়ই আসে, তাকে বারণ কর না কেন?

— ও কিছুতেই শোনে না, একদিন ছোঁড়া মরবে।

তুমি আমাকে বললে — ওদের স্নান বোধহয় হয়ে গেল, এবার জলদি চলুন!

আমি ভেবে পেলাম না এই গ্রাম থেকে আর কি খবর সংগ্রহ করার আছে; আরো কিছু শূন্য বাড়ি আর ঝরাপাতা দেখব শুধু। এর জন্যই এত পথ আসা।

তবু এঁকেবেঁকে পা টিপেটিপে গ্রাম পার হতে হলো। আগের মতোই কাঁটাতারের বেড়া পার হলাম। হঠাৎ পিছনে একটা গুলির শব্দ। আমরা প্রাণপণে ছুটলাম খোলা মাঠের উপর দিয়ে। খানিক পরে পিছনে তাকিয়ে দেখলাম। কই, কেউ তো তেড়ে আসছে না। গুলিটা আমাদের উদ্দেশ্যে ছোঁড়া হয়েছিল অথবা ঘুঘু জাতীয় পাখি মারাই তার লক্ষ্য ছিল, তা আমি আজও জানিনে। যে গুলি করেছে সে কি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল, আর ওটা যদি ফাঁকা আওয়াজ হয়ে থাকে, সে কী আমাদের ভয় দেখাবার জন্য? মাঠের মাঝখানে এসে দুজনে থামলাম। তখন বিনা কারণেই বোধহয় আমাদের দুজনের চোখেমুখে দিগ্বিজয়ের আনন্দ ছিল। তুমি হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, ব্যাটাদের ফাঁকি দেওয়া গেল।

আমি বললাম, ভালোই। কিন্তু পিঠে গুলি লাগলে লোকে কি আমাদের বীর বলত?

তুমি সেকথায় কানই দিলে না। তুমি নাম ধরে ধরে কত লোক সম্পর্কে কত কথা বলতে লাগলে। কে কোন গ্রামে পালিয়ে আছে, কার পরিবারে কে মরেছে, প্রথম দিন কী হয়েছিল — এমনি অজস্র কথা। এক সময় তোমাদের গ্রামের কাছে এসে পড়লাম। তোমাকে বললাম, এবার তুমি বাড়ি যাও, আমি চলি।

তুমি বললে, ঐ বাবলাগাছ পর্যন্ত আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

তারপর সে গাছটা ছাড়িয়েও যখন তুমি আমার সঙ্গে আসতে থাকলে তখন আমি বললাম, আর এসো না, এবার যাও।

হঠাৎ তুমি বললে, আপনার তেষ্টা পায়নি?

—পেয়েছে। সামনের গ্রামে গিয়ে জল খাব।

—না, আপনি একটু দাঁড়ান। আমি দৌড়ে জল নিয়ে আসছি।

পাশেই একটা মরিচের ক্ষেত। চারপাশে উঁচু মাটির বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেখানে কয়েকটি বাবলা গাছ যেন আমার জন্যই এতকাল অপেক্ষা করছিল। তাদের ছায়ায় গিয়ে বসলাম। বসে বসে তোমার ক্ষুদ্র মূর্তিটি ক্ষুদ্রতর হতে হতে হঠাৎ আমার মনে হলো, এইরকম এক একটি বালকই কি প্রাচীন কবিদের বচনে ধ্রুব, কখনো একলব্য কখনো বা প্রহ্লাদ চরিত্র সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে? তখন মনে পড়ল একলব্য এইরকম কোনো গ্রাম থেকেই দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

একটু পরে গ্রাম থেকে বেরিয়ে আবার তেমনি করে দৌড়ে আমার দিকে এলে, তোমার গা দিয়ে দর দর করে ঘাম ঝরছে।

তেষ্টা পাওয়ার কথা কেন জিজ্ঞাসা করেছিলে এবার বুঝলাম। মায়ের ভয়ে তোমাদের বাড়িতে ভাত খাওয়ানোর কথা বলতে পারনি। মুড়ি-মুড়কি আনা যাবে কিনা, তাতেও হয়তো তোমার সন্দেহ ছিল। এখন তুমি কোঁচড়ভর্তি মুড়ি আর আখের গুড় এনেছ। হাতে পিতলের ঝকঝকে মাজা বদনায় শীতল জল। খেতে খেতে এবার তোমাদের সংসার এবং গ্রামের অনেক খবর শোনা গেল।

বিদায় নিতে গিয়ে আমি বললাম, আচ্ছা এবার যাই, কেমন?

তুমি বললে, আবার আসবেন।

—আসব।

বাঙলাদেশের সাঁওতাল বিদ্রোহ

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

১৮৫৫তে তৎকালীন বাঙলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে — বীরভূম, বাকুড়া, মুরশিদাবাদ ও সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক এবং তীব্র আকারে সাঁওতাল বিদ্রোহ ফেটে পড়ে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী প্রভু এবং শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোক উভয়েরই কাছে এই বিদ্রোহ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো মনে হয়। তদানীন্তন একটি প্রধান ইংরেজি পত্রিকার মন্তব্য থেকেই অবস্থাটা স্পষ্ট হবে। তাঁরা লিখছেন :

"বাঙলাদেশের প্রাণকেন্দ্রে একটি ব্যাপক এবং হিংস্র সশস্ত্র বিদ্রোহ ফেটে পড়েছে এবং তারই জন্য তাড়াহুড়ো করে দ্রুতগামী ট্রেনের পর ট্রেন বোঝাই ফৌজ চলেছে। রাজমহলের পার্বত্য অঞ্চল থেকে হাজার উপজাতি মানুষ হঠাৎ প্রান্তরে নেমে এসেছে। তারা চারদিকে আগুন জ্বালাচ্ছে। কুঠার, বিষমাখা তীর এবং গাদা-বন্দুক নিয়ে হাজারে হাজারে সাঁওতাল পাহাড় থেকে নেমে প্রান্তরে এসে রণধ্বনি তুলেছে : প্রতিটি সাহেবের উপর প্রতিশোধ নেব। তাদের সংখ্যা। কেউ বলছে ৩০, কেউ বলছে ৫০ হাজার। চার-পাঁচটি স্বতন্ত্র দলে স্বতন্ত্র নেতার পরিচালনায় তারা অভিযান চালাচ্ছে।"[১]

হঠাৎ কোনও সাময়িক কারণে এত বড় গণবিদ্রোহ ফেটে পড়ে না, সাঁওতাল বিদ্রোহের পিছনেও গভীর এবং দীর্ঘমেয়াদী কারণ ছিল। সাঁওতালরা ছোটনাগপুর ও আশেপাশের পার্বত্য অঞ্চল থেকে সমতল ভূমিতে এসেছিল কাজের সন্ধানে। তারা সরল কঠোর পরিশ্রমী, ফলে সমতলের ভারতীয় জমিদারশ্রেণী ও মহাজনেরা দরিদ্র সাঁওতালদের সারল্যের সুযোগ নিয়ে বহু বছর ধরেই তাদের উপর নিষ্ঠুর শোষণ ও নিপীড়ন চালাচ্ছিল। আর ইংরেজ প্রভুরাও দরিদ্র সাঁওতাল ক্ষেতমজুরের জীবনযাত্রা কোনো নরককুণ্ডে পরিণত হলো কি না-হলো সে-সম্বন্ধে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। ফলে সভ্য, শিক্ষিত শাসকশ্রেণীর কোনো অংশের কাছেই দরিদ্র সাঁওতালদের ন্যায়বিচার পাবার বিশেষ কোনও আশা রইল না।

লক্ষ লক্ষ কর্মঠ কিন্তু দরিদ্র সাঁওতালদের হাল কি হলো, তার চমৎকার বর্ণনা খানিকটা তুলে দিচ্ছি :

"সাঁওতালেরা ছিল সরল ও অজ্ঞ, হিন্দু মহাজনেরা দুর্নীতিপরায়ণ ও ধূর্ত।...জঙ্গল কেটে সাঁওতালরা যে-বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে চাষের ও বসবাসের যোগ্য করে তুলত, মহাজনেরা সহজেই তা হস্তগত করত। সাঁওতালরা কয়েক টাকার চাল কিনত মহাজনের কাছ থেকে....আর সেই মুহূর্ত থেকেই সেই সাঁওতাল, তার সন্তান-সন্ততিসহ পরিণত হতো ঐ চাল ব্যবসায়ীর ভূমিদাসে।.... তারপর বছরের পর বছর সাঁওতাল মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ঐ শোষকের জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে যেত। যদি সাঁওতাল জঙ্গলে পালিয়ে যাবার মতলব করত, তাহলে মহাজন কোর্ট থেকে ডিক্রি নিয়ে সামান্য মাত্র সতর্ক হবার সুযোগ না দিয়ে সাঁওতাল চাষীর ভিটেমাটি, গরু-মোষ, হাঁড়ি-কুঁড়ি, এমন কি মেয়েদের গায়ের শস্তা লোহার গয়না পর্যন্ত দেনার দায়ে ক্রোক করে দিত। প্রতিকারের কোনো প্রশ্নই ছিল না। কোর্ট-কাছারি বসত একশো মাইল দূরে কোনও শহরে। সেখানকার ইংরেজ বিচারক ব্যস্ত থাকতেন ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ করার কাজে। জনসাধারণের দারিদ্র্যজনিত "ক্ষুদ্র" অভিযোগ শোনবার মতন তাঁর সময়ই থাকত না। দেশী অধঃস্তন কর্মচারীরা সবাই শোষকের কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছে, পুলিশও পেত লুটের বখরা। হতভাগ্য সাঁওতাল বলত: "ঈশ্বর মহান, কিন্তু তিনি বড়ই দূরে থাকেন।" দরিদ্র মানুষেরা চোখের জলই ফেলত, তাদের পাশে দাঁড়াবার কেউ ছিল না।"[২]

১৮৫০এর পর ইংরেজরা রেলপথ তৈরি করতে শুরু করল। তাতে প্রয়োজন হলো হাজার হাজার মজুরের। ফলে একদিকে রেলমজুরের ও কুলির চাকরি পেয়ে খানিকটা স্বাধীনতা ও স্বচ্ছলতা এল সাঁওতালদের জীবনে। অন্যদিকে সাহেব কর্মচারীদের অত্যাচারও নতুন চেহারা নিল। সে-যুগের বাঙলাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকা এ-সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছিল:

"সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ রাজমহলে সরকারী রেলকর্মচারীদের হাতে সাঁওতালদের নিগ্রহ। সাঁওতাল কুলিমজুরদের ঠিকমতো মাইনে দেওয়া হতো না। তাদের কাছ থেকে ডিম মুরগী ইত্যাদি যা কেনা হতো, তার দাম ঠিকমতো দেওয়া হতো না। আর ব্যাপারটা চরমে উঠল যখন কয়েকজন সাঁওতাল তরুণীকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হলো। মেয়েদের এই বর্বর অপমানে সমগ্র সাঁওতাল জাতি ক্ষেপে উঠল এবং নিজেদের দেবতাকে সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করল: প্রত্যেকটি ফিরিঙ্গিকে মেরে তবে এই অপমানের প্রতিশোধ নেব।"[৩]

এতদিনের অত্যাচার যে সাঁওতালরা আর মুখ বুজে সইবে না, তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। একজন প্রামাণ্য ইতিহাসবিদের ভাষায়: "১৮৫৪-৫৫র শীতকালে সাঁওতালরা কেমন যেন একটা অস্থির অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল।....আসল কথাটা এই যে সাঁওতালরা আর মহাজনদের হাতের পুতুল হয়ে থাকবে না। গরিব সাঁওতাল চাষী আর মানছে না ভূমিদাসত্বকে। দিনমজুর চাইছে সমস্ত রকম দাসত্বের শৃঙ্খলকে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে।"[৪]

আর একটি দৈনিক পত্রেও লেখা হলো:

"রেলকর্মচারীদের হাতে তারা যেভাবে নিগৃহীত হয়েছে এবং সরকারী খাস মহলেও খাজনা বৃদ্ধি — এই দুইয়ে মিলে সাঁওতালদের ঠেলে দিয়েছে প্রকাশ্য বিদ্রোহের পথে।"[৫]

দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক শোষণ ও দারিদ্র্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একটা অস্পষ্ট জাতীয় চেতনা — সাঁওতালদের জন্য একটা আলাদা স্বাধীন রাজত্ব চাই। তদানীন্তন বহু সংবাদপত্র ও সরকারী গোপন রিপোর্টে এই মর্মে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল। যেমন এই ধরনের খবর:

"সাঁওতাল বিদ্রোহটা খণ্ড, বিচ্ছিন্ন নয়, দেশব্যাপী।....তারা দাবি করছে যে এখন থেকে বাঙলাদেশের সমতল ভূমির তারাই শাসক..।"[৬]

এই বিদ্রোহের নেতৃত্বও দিয়েছিল সাঁওতালরা নিজেই, বাইরের কোনও শক্তি নয়। বীরভূম ও দুমকা অঞ্চলের সাঁওতালদের উপজাতীয় সর্দার দুইভাই সিধু ও কানুই ছিলেন সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রধান সংগঠক। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের অন্য দুই ভাই চাঁদ ও ভৈরব। তাঁদের প্রেরিত দূতেরা সমস্ত সাঁওতাল গ্রামে গ্রামে গিয়ে আসন্ন বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতির আহ্বান জানাল। সাঁওতাল অঞ্চলে একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেল। তাকেই হাণ্টার বলেছেন "অদ্ভুত অশান্ত মেজাজ।" তা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ সমস্ত পদ্ধতিতে বিক্ষোভের মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন সিধু-কানুরা... সে-কথা খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন হাণ্টার:

"বিদ্রোহের নেতারা প্রত্যাশা করেছিলেন যে ইংরেজ লাট-বাহাদুর তাঁদের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করবেন এবং প্রতিকারের চেষ্টা করবেন। কিন্তু ইংরেজ লাট-বাহাদুরের এদিকে নজর দেবার কোনও সময়ই হলো না। তখন বিদ্রোহের নেতারা চিঠি পাঠালেন ইংরেজ জেলাশাসকের কাছে এবং তাতে হুঁশিয়ারি দিলেন যে সাঁওতালদের দেবতা তাঁদের আর অপেক্ষা করতে বারণ করেছেন।

জেলাশাসক অবজ্ঞার সঙ্গে তাঁদের চিঠি ফেলে দিলেন ও যথারীতি রাজস্ব আদায়ে ব্যস্ত রইলেন। বিদ্রোহীরা শেষ চেষ্টা করে চিঠি লিখলেন বিভাগীয় কমিশনারের কাছে। তাতে তাঁরা স্পষ্ট লিখলেন যে তিনি প্রতিকার না করলে সাঁওতালরা নিজেরাই প্রতিকারের পথ খুঁজে নেবে। কমিশনার এই হুমকিকে উপেক্ষা করলেন। সাঁওতালরা হতাশ হয়ে বলাবলি করল — ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, কিন্তু তিনি বড্ড দূরে থাকেন। এখন তাদের সামনে একটাই পথ খোলা রইল। পাহাড়ে, সমতলে প্রত্যেক গ্রামে বলে গেল সাঁওতাল দূত— হাতে নিয়ে তাদের জাতীয় প্রতীক, একটা শাল গাছের ডাল। তাতে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল হাজার হাজার সাঁওতাল। জমায়েৎ হলো বিভিন্ন নির্দিষ্ট কেন্দ্রে, হাতে তীর ধনুক।" ৭

১৮৫৫র জুন মাসে ভাগনাডিহির মাঠে জড় হলো ৩০ থেকে ৫০ হাজার সশস্ত্র সাঁওতাল। সেখানে তারা শপথ নিল যে ফিরিঙ্গিদের রাজত্বের তারা অবসান ঘটাবে, মহাজনদেব ধ্বংস করবে এবং প্রতিষ্ঠা বরবে স্বাধীন সাঁওতালী রাজত্ব। ৩০এ জুন তারা অভিযান শুরু করল কলকাতার দিকে—তীর-ধনুক, সড়কী, টাঙ্গি, কুঠার প্রভৃতি অস্ত্রসজ্জিত হযে। চাবটি বড় বড় দলে বিদ্রোহীদের অভিযান চলল এবং তা প্রসারিত হলো ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, দুমকা, বীবভূম, বাঁকুড়া ও মুরশিদাবাদ জুড়ে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। বিদ্রোহের বর্ণনা দিতে গিয়ে কলকাতার একটি প্রসিদ্ধ দৈনিক লিখল :

"সাঁওতালদের এই বিদ্রোহ সর্বব্যাপী। বাকুড়া, বীরভূম, ছোটনাগপুর ও হাজাবিবাগ অঞ্চলের সমস্ত সাঁওতাল চাষীবা কাতারে কাতারে জড হযেছে রাজমহল পাহাড়ের কাছে। তাদের নেতারা বলছেন যে দেবতাদের আদেশে এখন তাঁরাই বাঙলাদেশের শাসক। তাঁরা বলছেন যে দেবতা তাদের অলৌকিক শক্তি দিয়েছেন, যার জোরে সাহেবদের বন্দুকের গুলি তাঁদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না… ।" ৮

আর একটি বিখ্যাত সংবাদপত্র লিখল :

"বিদ্রোহ ক্রমেই নতুন নতুন অঞ্চলে ছড়িযে পড়ছে এবং অত্যন্ত গুরুতর
·প করছে ।....দেশীয় প্রজাদের চোখে এই বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ
সাঁওতাল জাতি
ভূপত্তি অত্যন্ত কমে গিয়েছে। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ
করল : প্রত্যেকটি
নও এত দুর্বল মনে হয়নি।"৯

বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এক আতঙ্কিত গোপন বিবৃতিতে কলকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাচ্ছেন :

"গত পনরদিনে ৩০টা গ্রাম বিদ্রোহীদের হাতে চলে গেছে। বীরভূম থেকে দেওঘরের কাছ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের হাতে। ডাকব্যবস্থা বন্ধ।....বিদ্রোহীরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে সিউড়ী ও ভাগলপুরের দিকে এগোচ্ছে। যতদূর খবর পেয়েছি, বিদ্রোহীদের ঐ দুদলের মোট সংখ্যা এখন ১২ থেকে ১৫ হাজার এবং তারা সর্বত্র গণসমর্থন পাচ্ছে।"[১০]

এই গণসমর্থন মানে শুধু সাঁওতালদের সমর্থনই নয় — গরিব বাঙালি গ্রামবাসীদেরও সমর্থন। "বিদ্রোহী সাঁওতালদের তীরের ফলা বানিয়ে দিচ্ছে, কুঠারে শান দিচ্ছে গ্রামের কামারেরা; বিদ্রোহীদের দূত ও গুপ্তচরের খোঁজ করছে গরিব বাঙালিরা—তেলি, মুচি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি।"[১১]

মাস দুই পরে দেখা যাচ্ছে (নভেম্বর) যে বিদ্রোহ এত ব্যাপক যে বীরভূমের জেলাশাসক জেলা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন, আশ্রয় নিয়েছেন হুগলীতে।[১২] সেখান থেকে তিনি লিখছেন : "সমস্ত বিক্ষুব্ধ জেলাগুলিতেই এখন সামরিক আইন চালু হয়েছে এবং আমাদের কাজকর্ম সব বন্ধ।"[১৩]

মিশনারীদের পরিচালিত একটি খ্যাতনামা সংবাদপত্রেও সভয়ে লেখা হচ্ছে : "(বিদ্রোহের সাফল্যে) বাঙলাদেশে এই শতাব্দীতে প্রথম আমাদের সমস্ত প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির ভিত্তিই নড়ে গেছে।"[১৪]

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সমগ্র কূটনীতির কোনো অস্ত্রই প্রয়োগ করতে বাকি রাখেনি। বিদ্রোহীদের মধ্যে ভাঙন আনার জন্য তারা প্রকাশ্য ঘোষণা করল (১৮৫৫র আগস্ট মাসে) যে ১০ দিনের মধ্যে যেসব সাঁওতাল বিদ্রোহীরা অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করবে, তাদের কোনও শাস্তি দেওয়া হবে না। আর যারা তারপরও লড়াই চালিয়ে যাবে, তাদের মৃত্যুদণ্ডসহ কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হবে।[১৫] কিন্তু তাতে একজনও বিদ্রোহী সাঁওতাল সাড়া দেয়নি — জীবনপণ করে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল।

বিদ্রোহী সাঁওতালদের মৃত্যুভয়হীন সংগ্রামের কথা তাদের শত্রু ইংরাজরাও স্বীকার না করে পারেনি। সাঁওতালদের অস্ত্র ছিল তীর-ধনুক, কুঠার। আর ইংরেজরা গিয়েছিল কামান-বন্দুক নিয়ে। ট্রেনে করে হাজার হাজার ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্য বিদ্রোহ দমন করতে গেল। তাদের টাকা জোগাল চা-কর ও নীলকর সাহেবরা এবং মুর্শিদাবাদের নবাবের মতো বড় বড় জমিদাররা।[১৬]

যে-কোনো পদ্ধতিতে, যে-কোনো অত্যাচার করেও বিদ্রোহ দমনের ক্ষমতা দেওয়া হলো, সামরিক কর্তৃপক্ষকে।[১৭] তবু সহজে হার মানল না বিদ্রোহীরা।

বিদ্রোহের এক দশক পরে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একজন ইংরেজ সেনাপতি বলছেন :

"আমরা যা করেছিলাম, তার নাম যুদ্ধ নয়, গণহত্যা। দূর থেকে ধোঁয়া দেখলেই ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গে নিয়ে আমরা গ্রাম ঘিরে ফেলতাম। এইরকম একটা গ্রামে (বীরভূমে) একটা মাটির বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে লড়ছিল জনা ৪৫ সাঁওতাল।....আমরা ঘরে গর্ত করে সাঁওতালদের বললাম, আত্মসমর্পণ করো, নইলে গর্ত দিয়ে গুলি চালাব। উত্তরে দরজা ফাঁক করে সাঁওতালরা একঝাঁক তীর ছুঁড়ল। আমার সিপাহীরা একদল এগিয়ে গিয়ে গর্তের মধ্যে দিয়ে গুলি চালাল। বাকিরা যখন বন্দুকের টোটা ভরছে, তখন আমি আবার চেঁচিয়ে বললাম, আত্মসমর্পণ করো। জবাবে আবার দরজাটা একটু ফাঁক হলো এবং আর এক ঝাঁক তীর বেরিয়ে এল। কয়েকজন সিপাহী আহত হলো। সারা গ্রামে আমরা আগুন লাগিয়ে দিলাম। খানিক পরে তীর ছোঁড়া বন্ধ হলো। আমরা দৌড়ে ভিতরে ঢুকলাম। দেখলাম রক্তগঙ্গার মধ্যে মরে পড়ে আছে সমস্ত সাঁওতালেরা। শুধু কুঠার হাতে দাঁড়িয়ে আছে রুধিরাক্ত এক বৃদ্ধ। একজন সিপাহী তাকে আত্মসমর্পণ করতে বলল। উত্তরে সেই বুড়ো সাঁওতাল কুঠারের এক কোপে সিপাহীর মাথা কেটে ফেলল।"[১৮]

ঐ একই ইংরেজ সেনাপতি আর একজায়গায় বলছেন :

"আত্মসমর্পণ করা কাকে বলে তা সাঁওতালরা জানত না। যতক্ষণ তাদের মাদল বাজত, ততক্ষণ লড়ে যেত বিদ্রোহীরা।....এই বীর বিদ্রোহীদের মারতে লজ্জা বোধ করত আমার সমস্ত সিপাহীরা।....এই বিদ্রোহীদের চেয়ে সাহসী ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ আমি দেখিনি। আমার একজন অধীনস্থ সেনাপতি একবার ৭৫ জন সাঁওতালকে মেরে ফেলে, কিন্তু মাদল যে বাজাচ্ছিল সে পড়ে না যাওয়া অবধি সাঁওতালেরা তীর ছুঁড়ে যায়।"[১৯]

সবাই অবশ্য এত ভালো কথা বলেননি। কলকাতার সাম্রাজ্যবাদী সাহেবরা ও তাদের ভারতীয় তাঁবেদাররা আতঙ্কে জড়সড় হয়ে, পরে হুঙ্কার ছাড়লেন : "বিদ্রোহী সাঁওতালদের সবাইকে ফাঁসীকাঠে লটকে দাও .... হিংস্র বাঘকে জঙ্গল থেকে এনে শহরে ছেড়ে দিলে সে যা করবে, বর্বর সাঁওতালরাও সভ্য মানুষদের সঙ্গে সেই ব্যবহার করেছে... ।"[২০]

বিদ্রোহী সাঁওতালরা কিন্তু বন্দী অবস্থাতেও হার মানেনি, মনুষ্যত্বের কোনো অবমাননা হতে দেয়নি। বীরভূম জেলে বিদ্রোহের একজন নেতা ইংরেজ কারাধ্যক্ষকে বলেন :

"তোমরা আমাদের বিদ্রোহ করতে বাধ্য করেছ। আমরা তোমাদের দাবি করেছিলাম, যা একান্তই ন্যায্য — কিন্তু তোমরা তার কোনও উত্তরই দাওনি। যখন আমরা সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছি, তখন তোমরা, জঙ্গলে যেভাবে চিতাবাঘ মারো, সেইভাবে আমাদের গুলি করে মেরেছ।"[২১]

এই প্রবন্ধের সীমাবদ্ধ পরিসরে ভারতের সকল উপজাতীয় বিদ্রোহের আলোচনা সম্ভব নয়। কিন্তু উনিশ শতকের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত একটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়তে বাধ্য। এই সমস্ত বিদ্রোহই শুধু ইংরেজ বা কেন্দ্রীয় সরকারের অত্যাচারে সংঘটিত হয়নি, স্থানীয় ভারতীয় অধিবাসীদের উৎপীড়নও তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে। জমির ক্ষুধা এবং অঙ্কুরিত জাতীয়তাবোধই থেকেছে এই সমস্ত বিদ্রোহের প্রেরণা। অত্যন্ত দ্রুত একজোট হতে পেরেছে এই সমস্ত উপজাতি এবং তাদের সংগ্রাম হয়েছে আপসহীন ও বেপরোয়া। একথা যেমন প্রযোজ্য উনিশ শতকের মধ্যভাগের সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্বন্ধে, তেমনি তা প্রযোজ্য তার পূর্বসূরী জঙ্গলমহলের হো-বিদ্রোহ ও পরবর্তী দশকের মুণ্ডা-বিদ্রোহ সম্পর্কে। ১৮৩৬এর সিংভূম অঞ্চলের হো-মুণ্ডা বিদ্রোহের কথা লিখতে গিয়ে হাণ্টার যে বর্ণনা দিয়েছেন যে কয়েক শত বিদ্রোহীকে হত্যা করে তবে ইংরেজ গোলন্দাজ বাহিনী বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হয়, তা দুই দশক পরের সাঁওতাল বিদ্রোহের বর্ণনার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়।[২২]

বাঙালি জমিদার ও মহাজন সেদিন সাঁওতাল বিদ্রোহের বিরুদ্ধে, ইংরেজের সপক্ষেই দাঁড়িয়েছিল। কোনও কোনও বাঙালি জমিদার নিজের পাইক-বরকন্দাজদের বন্দুকচালনা শিক্ষা দিয়ে ইংরেজদের সাহায্যেও পাঠিয়েছিলেন।[২৩] এটা আমাদের লজ্জা ও কলঙ্কের দিক। আবার পূর্বেই উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো হয়েছে যে গ্রামের কামার তেলি মুচি ডোম প্রভৃতি গরিবেরা সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিল সাঁওতাল বিদ্রোহকে। সেটা আমাদের গৌরবের দিক। আর বাঙালি ভদ্রলোকদের বেশির ভাগ বিদ্রোহ দেখে ঘাবড়ে গেলেও, শিক্ষিত বাঙালি কুলতিলক যিনি, তিনি কিন্তু ছিলেন বিদ্রোহী সাঁওতালদেরই বন্ধু। তাঁর কথা দিয়েই শেষ করছি :

"তোমার মতো ভদ্র বেশধারী আর্যসন্তান অপেক্ষা আমার অসভ্য সাঁওতাল অনেক ভালো।"[২৪]

পাদটীকা

১। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' : শ্রীরামপুর, ১৯এ জুলাই, ১৮৫৫
২। সার উইলিয়াম হাণ্টার : 'অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল,' সপ্তম সংস্করণ, লণ্ডন, ১৮৯৭, পৃষ্ঠা ১৩০
৩। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া,' ১৯এ জুলাই, ১৮৫৫
৪। হাণ্টার : 'অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল,' পৃষ্ঠা ২৩৬
৫। 'বেঙ্গল হরকরা,' কলকাতা, ১৮ই জুলাই, ১৮৫৫
৬। 'বেঙ্গল হরকরা' ২৪এ জুলাই, ১৮৫৫
৭। হাণ্টার : 'অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল,' পৃষ্ঠা ২৩৭-৩৮
৮। 'বেঙ্গল হরকরা,' ২০এ জুলাই, ১৮৫৫
৯। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া,' ২৬এ জুলাই, ১৮৫৫
১০। বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের কাছে, বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি, ২৪এ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫
১১। বীরভূম জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিবরণী থেকে, ঐ
১২। বীরভূম জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট, ১৩ই নভেম্বর, ১৮৫৫
১৩। ঐ
১৪। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া,' ২রা আগস্ট, ১৮৫৫
১৫। সরকারী ক্ষমা-ঘোষণাপত্র, ৫ই আগস্ট, ১৮৫৫
১৬। বীরভূমের অস্থায়ী জেলা শাসকের কাছে প্রেরিত বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের চিঠি : ২৭এ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৫
১৭। সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের জন্য নিযুক্ত স্পেশ্যাল কমিশনারের চিঠি : ক্যাপ্টেন ম্যাকডোনাল্ডের কাছে : ২১এ আগস্ট, ১৮৫৫
১৮। হাণ্টার : 'অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল,' মেজর জার্ভিস-এর রোজনামচা থেকে, পৃষ্ঠা ২৪০-৪৮
১৯। ঐ, পৃষ্ঠা ২৪৮-৪৯
২০। 'ক্যালকাটা রিভিউ,' কলকাতা, মার্চ, ১৮৫৬
২১। হাণ্টার : 'অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল,' পৃষ্ঠা ২৫০
২২। হাণ্টার 'এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউণ্ট অফ বেঙ্গল,' সপ্তদশ খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৭৭, পৃষ্ঠা ১১১-১২
২৩। হাণ্টার : 'অ্যানলস অফ রুরাল বেঙ্গল,' সরকারকে বীরভূমের জমিদার বিপাচরণ চক্রবর্তীর কৃতজ্ঞতা-পত্র, ২রা অক্টোবর, ১৮৫৫
২৪। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বিদ্যাসাগর,' তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০৯, পৃষ্ঠা ৫২০

মাটি

তরুণ সান্যাল

প্রত্যাশায় বৃষ্টি হয়? মাঠ রুক্ষ ফাটা হাত অঞ্জলি সাজালে বৃষ্টি আসে?

এবড়ো-খেবড়ো জমি, ধুলো ওলোটপালট কোন দক্ষিণের হাওয়ায় উদোম
এবং নয়ানজুলি বেয়ে নেমে গেছে ঘাস, দাম,
হলদে কচুরিপানায় পরিণাম
দিনক্ষণ চলে যায় অশ্লেষামঘায় বারবেলায়
রবিবার বহে যায় অন্য এক শনিবারে
জলের চলক নোনা গাঙে
নামগুলি বহে যায় পিতামহ থেকে পৌত্রে
এমনি করে ঢেউ ওঠে ভাঙে
শালতির উপরে কার পায়ে সোনা জ্বলে ওঠে আউসে আমনে
বাঙলা দেশ
নদীর ছলছল জলে অবিরাম বংশ ধারা
নৈবেদ্যর ফল, ছাই, কাঠকয়লার টুকরো, কাঠ
খেয়া পারাপারে নৌকা
এ জীবনও ঈশ্বরী পাটনীর

বৃষ্টিতে কেশর শিউরে ওঠে, হাঁটা আলপথে
স্যাঁৎস্যাঁতে কদমের স্বপ্ন দেখা
স্বয়ং রাখালরাজা ধবলী-পাটলী-লালী গোচারণে নেন ব্রজরজে
নীল শাড়ি কখন নিঙারি যায় শীতের গঙ্গায়, ইছামতী
কেবলি দক্ষিণে যায়, নিরবধি কেবলি দক্ষিণে ইছামতী
গোরুর গাড়ির সারি নিক ধরে চলে যায়
দূর গঞ্জে, হ্যারিকেন লণ্ঠনের টুপটাপ আলোয় মাঠ
গোরুর পায়ের কাছে চোনার নোনায় ভিজে ওঠে
রাত্রি দুলতে দুলতে হাঁটে আলোয় আঁধার ঝলকে
আঁধারে আলোয় ছলকে
আস্তীর্ণ নিশীথ চূর্ণজলে ছেয়ে থাকে দূর আকাশে
নক্ষত্র নীহারিকা

নির্মম মাটির পিণ্ড চষা মাঠে গুঁড়ো করি
মুখহীন অবয়বহীন অনাদিকে
গুঁড়ো হয়ে, চূর্ণ সাদা রেণুগুলি উড়ে যায়
দক্ষিণের আবুক দমকায়

আ রে পূর্বপুরুষের দেহাস্থি, করোটি, মাংস
ঋতুচক্রে বয়সের মতো ফুল ফুটে ওঠা
ফুটে ঝরে যাওয়া
আ রে বুকে খামচে ধরা গলায় আটক শব্দহীন অশ্রুপাত
ঘোমটা খসে পড়া ছুইয়ে কিশোরী-না বালিকাবধূর চোখে
ভিন দেশ, অচেনা নদী
ফাল্গুনে নহরে শান্ত দেহ ডোবা গোলুয়ে জাগানো নাক ডিঙিনৌকা
জলে ঝাঁপ মাছরাঙা বা ভেসে ওঠা পানকৌড়ি
সবুজ বনানী উড়ে যাওয়া টি-টি টিয়া
আ আমার উত্তর পুরুষ, আমি, বীজ, প্রজনন,
ক্ষুধা, যৌনতা, প্রণয়,
হিংসা অশ্বক্ষুর হ্রেষা দ্রিমি দ্রিমি
হৃদপিণ্ডে মাদল

তরাইয়ের অন্ধবনে হাতীর পেছনে ও কে একপিণ্ড মাটি
নদীর মধ্যাহ্নে হাল শক্ত হাতে কে ধরেছে একপিণ্ড মাটি
মাঠ যাকে দূরে ঠেলে
লাঙলের শক্ত ফালে কে তাকে শোয়ায়
জাপটে ধরে একপিণ্ড মাটি
ধীরে খুলে ধরে শাড়ি রহস্যের, বিদ্যুতের, বাষ্পের অগ্নির একপিণ্ড মাটি
যন্ত্রের উরুতে হাত, হাতের পেছনে স্থির মন কার একপিণ্ড মাটি
যে মাটি তিলক রেখা ললাটে আহ্লাদ
যে মাটি কবর হয়, চিতায় নিঃশেষ ভস্মে শেষ
মাটি মাটি মাটি

প্রার্থনায় বৃষ্টি হয় ?
হয় না তাই সেচখালে মানুষের আবর্তে কোদাল
মাটি শুধু মাটি হতে চায়
সজীব, বীজান্ধ, রুক্ষ, শ্যামল কোমলে
নামগুলি মুছে দিই মাটিতে জলের বাঁকা রেখা
শুষে নেয় হাওয়ার দমকায় দীর্ঘশ্বাস
অতীত প্রশ্নের সিঁড়ি উঠে যায়
নামহীন মানুষের বিশাল মিছিলে
অনামা মাটির সিংহদ্বারে

মাটি মাটি মাটি
হে শ্রম হে বিশ্রাম আরাম ॥

জমীদার দর্পণ।

নাটক।

শ্রীমীর মশার্‌রাফ হোসেন কর্ত্তৃক
প্রণীত

*

কলিকাতা।

সিমুলীয়া ২০১ নং করন্‌ওয়ালিশ ষ্ট্রীট
মধ্যস্থ-যন্ত্রে

শ্রীরামসর্ব্বস্ব চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

১২৭৯ বঙ্গাব্দা।

উপহার।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মীব মাহাম্মদ আলী সাহেব পূজ্যপাদেষু।

আর্য্য।

আপনি আমাদের বংশের উজ্জ্বল মণি বিশেষ। আমাকে বাল্যকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেছেন। সামান্য উপহার স্বরূপ, আজ্ঞাবহ কিঙ্করের ন্যায় জমীদার দর্পণ সম্মুখে ধারণ করিতেছি। একবার কটাক্ষপাত করিয়া যত্নে রক্ষা করিবেন, এই আমার প্রার্থনা। অনেক শত্রু দর্পণ খানি ভগ্ন করিতে প্রস্তুত হইতেছে।

আজ্ঞাবহ

শ্রী মীর মশার্‌রাফ হোসেন।

পাঠকগণ সমীপে নিবেদন।

নিরপেক্ষ ভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভাল মন্দ বিচার করা যায়, পরের মুখে তত ভাল হয় না। জমীদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয় স্বজন সকলেই জমীদার, সুতরাং জমীদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না। আপন মুখ আপনি দেখিলেই হইতে পারে। সেই বিবেচনায় "জমীদার দর্পণ" সম্মুখে ধারণ করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয় মুখ দেখিয়া ভাল মন্দ বিচার করিবেন।

অনুগত

শ্রী মীর মশার্‌রাফ হোসেন।

কুষ্টিয়া, লাহিনী পাড়া

সন ১২৭৯ সাল, চৈত্র।

নাটকোক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

হায়ওয়ান আলী	জমীদার।
সিরাজ আলী	জমীদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
আবু মোল্লা	অধীনস্থ প্রজা।
জামাল প্রভৃতি	জমীদারের চাকরগণ।
জিতু মোল্লা হরিদাস	সাক্ষীদ্বয়।
আরজান বেপারী	জুরি।

নট, সূত্রধর, মোসাহেব চারিজন, জজ, মাজিষ্টার, বারিষ্টার, ডাক্তার সাহেব, ইন্‌স্পেক্টর, কোর্ট-সব্‌ ইন্‌স্পেক্টর, উকীল, মোক্তার, পেস্কার, কনষ্টেবল, চাষা, আরদালী, দর্শকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

নুরন্নেহার	আবু মোল্লার স্ত্রী।
আমিরণ	আবু মোল্লার ভগ্নী।
কৃষ্ণমণি	বৈষ্ণবী।
নটী।	

জমীদার দর্পণ

নাটক

প্রস্তাবনা

(সূত্রধারের প্রবেশ ।)

সূত্র । (পাদ চারণ করিতে করিতে)

হা ধর্ম্ম ! তোমার ধর্ম্ম লুকাল ভারতে ,
জমীদার অত্যাচারে ডুবিলে কলঙ্কে !
পাতকীর কর্ম্ম দোষে হলে পাপভাগী,
পাপীরা ধনের মদে না মানে তোমায়—
না মানে যেমন বাঁধ স্রোতস্বতী নদী,
দ্রুত বেগে চলে যায়, ভাঙ্গিয়া দু কূল ।
রাজ-প্রতিনিধি রূপী মধ্যবর্ত্তী সম,
জমীদার ! রাজ-রূপে পালক প্রজার,
সর্ব্ব নর ধন প্রাণ মান রক্ষাকারী ।
সেই হেতু রাজবিধি দিয়াছে পদবী ।
রবি যথা নিজ রশ্মি বিতরি শশীরে
কারনে শীতল করে ভুবন শীতল ।
সে পদবীহীন পদে শোষিছে মেদিনী,
শোষে যথা চৈত্রমাসে খর প্রভাকর,
নদ নদী জলাশয় খরতর করে ।
কি কুদিনে আজি আমি প্রবেশি এদেশে,
স্মরিয়ে বিদরে বুক নিকলে নিশ্বাসে—
ঘন শ্বাসে দহে প্রাণ জ্বলন্ত আগুন,
তুষানলে জ্বলে যথা ঢাকা হুতাশন—
ধিক্ ধিক্ গুমে গুমে না হয় প্রকাশ—
সেইরূপ দহিতেছে আমার অন্তর ।

(নটের প্রবেশ)

নট। একা একা পাগলের মত কি ব'ল্‌ছেন ?

সূত্র। কেন ? অন্যায কি ব'লেছি, সত্য ব'ল্‌তে ভয কি ?

নট। আমি সত্য অসত্যব কথা ব'ল্‌ছিনে, ভযেব কথাও ব'ল্‌ছিনে। বলি কথাটা কি ?

সূত্র। কথা এমন কিছু নয। কলিকালে প্রজাবা মহা সুখে আছে। কলিবাজও প্রজার সুখ-চিন্তায সর্ব্বদা ব্যস্ত, কিসে প্রজার হিত হবে, কিসে সুখে থাকবে, এরি সন্ধান ক'চ্ছে'ন। কিন্তু চক্ষের আড়ালে দুর্ব্বলের প্রতি সবলেরা যে কত অত্যাচার, কত দৌরাত্ম্য ক'চ্ছে' তাব খোঁজ খবব নেই।

নট। কেন এ আপনার নিতান্তই ভুল। রাজাব নিকট সবল দুর্ব্বল, ছোট বড, ধনী নির্ধনী, সুখী দুঃখী, সকলি সমান। সকলি সম স্নেহের পাত্র। সকলেব প্রতি সমান দযা। আজ কাল্‌ আবার দীন দুঃখীদের প্রতিই বেশী টান্‌।

সূত্র। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধে) আচ্ছা মফস্বলে এক রকম জানওয়ার আছে জানেন ? তাবা কেউ কেউ সহরেও বাস কবে, সহরে কুকুর কিন্তু মফস্বলে ঠাকুব। সহবে তাদেব কেউ চেনে না, মফস্বলে দোহাই ফেবে। সহবে কেউ কেউ জানে যে এ জানওযার বড শান্ত—বড ধীব, বড নম্র, হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফস্বলে শৃগাল, কুকুর, শূকব, গরু পর্য্যন্ত পার পায় না। ব'ল্‌ব কি, জানওযারেবা আপন আপন বনে গিযে একেবারে বাঘ হযে বসে।

নট। কি কথাই ব'ল্লেন, বাঘ বুঝি আব জানওযার নয ?

সূত্র। আপনি বুঝ্‌তে পাবেন নাই। এ জানওযারদের চারখানা পাও নাই—লেজও নাই। এবা খাসা পোসাক পবে, দিব্বি সরু চেলের ভাত খায়। সাডে তিনহাত পুরু গদীতে বসে, খোসামোদে কুকুরেবাও গদীর আশে পাশে ল্যাজ গুডিয়ে ঘিরে বসে থাকে। কিছুরই অভাব নাই, যা মনে হ'চ্ছে তাই ক'চ্ছে'। বিনা পরিশ্রমে সচ্ছন্দে মনের সুখে কাল কাটাচ্ছে। জানওযারেরা অপমান ভযে নিজে কোন কার্য্যই করে না। ভগবান তাদের হাত পা দিয়েছেন বটে, কিন্তু

সে সকলি অকেজো। দিব্বি পা আছে অথচ হাঁটবার শক্তি নাই। দেখ্‌তে খাসা হাত, কিন্তু খাদ্য সামগ্রী হাতে ক'রে মুখে তুলতেও কষ্ট হয়। কি-করে? আহারের সামগ্রী প্রায় চাকরেই চিবিয়ে দেয়! এরা আবার দুই দল।

নট। দল আবার কেমন?

সূত্র। যেমন হিন্দু আর মুসলমান।

নট। ঠিক বলেছ। ঐ দলের এক জানওয়ার যে কি কুকাণ্ড করেছিল, সে কথা মনে হলে এখনও পিলে চ'ম্‌কে যায়—এখনও চক্ষে জল এসে পড়ে। উঃ কি ভয়ানক!!

সূত্র। এখন পথে এস। আমিও তাই বল্‌ছি।

নট। থাক্‌ ও সকল কথা আর ব'লে কাজ নাই, কি জানি।—

সূত্র। কেন বল'ব না? আপনিতো বলেছিলেন যদি কোনো দিন ভগবান দিন দেন, তবে মনের কথা ব'ল্‌বো। আজ্‌ আমাদের সেই শুভ দিন হয়েছে।

নট। কি ক'রে?

সূত্র। একবার ওদিকে চেয়ে দেখুন না?

নট। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া) তবে আমাদের আজ্‌ পরম ভাগ্য।

সূত্র। আর বিলম্বে কাজ নাই। আমাদের চির-মনোসাধ আজ পূর্ণ ক'র্‌বো। যত কথা মনে আছে সকলি ব'ল্‌বো। এমন দিন আর হবে না। কপালে যা থাকে জানওয়ারদের এক দলের নক্‌সা এই রঙ্গ-ভূমিতে উপস্থিত ক'র্ত্তেই হবে।

নট। তাই তো ভাব্‌ছি, কোন্‌ নক্‌সা অবিকল কে তুলেছে সেইটি ভাল ক'রে বেছে নিতে হবে?

সূত্র। আপনি শুনেন নাই "জমীদার দর্পণ নাটকে" যে নক্‌সাটি এঁকেছে, তার কিছুই সাজানো নয়, অবিকল ছবি তুলেছে!

নট। তবে আর কথা নাই, আসুন তারই যোগাড় করা যাক্‌।

[উভয়ের প্রস্থান]

(পুষ্পাঞ্চলে করিয়া নটীর প্রবেশ।)

নটী। বেস, ইনি তো মন্দ নন্‌। আমায় ডেকে আবার কোথায় গেলেন? পুরুষের মন পাওয়া ভার। নারী জাত্‌কে ঠকাতে পাল্লে আর কসুর

নেই। তা যাক্ আমি আর খুঁজে বেড়াতে পারিনে। এই অবসরে মালাটা গেঁথে নেই।

(উপবেশন এবং মালা গাঁথিতে গাঁথিতে সঙ্গীত)

রাগিণী মল্লার—তাল আড়া।

পাষাণ সমান প্রাণ পুরুষ নিদয় অতি।
মনে এক মুখে আর—ভিন্ন-ভাব অন্তমতি ॥
কত কথার কত ছলে, রমণীরে কত ছলে,
হাসি হাসি কত বোল বলে, মজায় অবলা জাতি ॥
নিত্য নব রসে মন, বসে মন আকিঞ্চন,
দ্বিপদ ষট্‌পদ গুণ, কি হবে এদের গতি ॥

এই মালা নিয়ে আজ্ আমোদ ক'র্‌বো।

(নটের প্রবেশ)

নট। প্রিয়ে! সকলই তো বলেছি, আর ওদিকেও সকল যোগাড় করে এলুম। এখন আর বিলম্ব কি; আর কথাই বা কি?

নটী। না, আমার আর কোনো কথা নাই, আপনি যা মানস করেছেন, আমি কি আর তাতে কোন বাধা দেই? দেখুন আমি মনের সাধে এই মালা ছড়াটী গেঁথেছি, এই হাতে ঐ গলে পরাব ব'লে বড় ইচ্ছা হচ্ছে।

নট। (সহাস্যে) একবার তো পরিয়েছ, আবার কেন?

নটী। (মৃদুহাস্যে) এও এক সুখ!

নট। প্রিয়ে! মালা তো পরালে এখন একটি গান গাও।

নটী। আর কি গান গাইব? মনের কথাই বলি, কিন্তু আপনি না ব'ল্লে আমি ব'ল্‌বো না।

নট। তাতে আর ক্ষতি কি?

উভয়ের সঙ্গীত

লক্ষৌয়ের সুর—তাল কাওয়ালি।

মরি দুর্ব্বল প্রজার পরে অত্যাচার।
কত জনে করে করে জমীদার ॥
তারা জানে মনে, জমীদার বিনে,
নাহি অন্য কেহ দুঃখ শুনিবার।

প্রজা কত সহে, কিছু নাহি কহে,
মনে ভাবে এব নাহি উপায় আর ॥
জমীদার ধরে, জরিমানা করে,
মনো সাধ পুরে, নাশিছে প্রজার।
শুন সভ্যজন, করিয়ে মনন,
দেখাইব আজি অভিনয় তার ॥

(উভয়ের প্রস্থান।)

পটক্ষেপণ।

(নেপথ্যে সঙ্গীত।)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

ওরে প্রাণ মিলন সলিল কর দান।
যায় যায় যায় প্রাণ, ওষ্ঠাগত হলো প্রাণ,
বিনে প্রেম-বারি পান।
মন প্রাণ সব সঁপেছি হেরে ও বয়ান,
তবে কেন হেন জনে হান প্রিয়ে বিষ বাণ

জমীদার-দর্পণ

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কোশলপুর।

হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা।

(হায়ওয়ান আলী ও প্রথম মোসাহেব আসীন।)

হায়। দেখেছো ?

প্র, মো : হুজুর দেখেছি।

হায়। কেমন্ ?

প্র, মো। সে কি আর ব'ল্‌তে হয়, অমন্ আর দুটী নাই !

হায়। কিন্তু ভারি চালাক্, কিছুতেই প'ড়্‌ছে না।

প্র, মো। (সহাস্যে) সে কি ? সামান্য স্ত্রী লোক কিছুতেই পড়েনা !

হায়। তোমরা বোধ কর সামান্য ; কিন্তু যতদূর আমি বেড়িয়ে চেড়িয়ে দেখিছি, স্বভাব চরিত্র যতদূর জেনেছি, তাতে বোধ হয় সেটী অসামান্য।

প্র, মো। অন্য লোভ কিছু দেখিয়েছেন ?

হায়। টাকার লোভ দেখিয়েছি, কত গওনার লোভ দেখিযেছি, কিছুতেই ভোলে না।

প্র, মো। ওর স্বামীও তো এমন্ সুশ্রী পুরুষ নয়, যে, তাতেই ভুলে রয়েছে।

হায়। না, তাই বা কি ক'রে ? আবু মোল্লা নব কার্ত্তিক! বিধির নির্ব্বন্ধ দেখ, চাষার হাতে গোলাপ্ ফুল, একি প্রাণে সয় ?

"হায় বিধি! পাকা আম দাঁড় কাকে খায় !"

প্র, মো। (ক্রোধে) কি আর ব'ল্‌বো! যদি আমার হাতে প'ড়্‌তো তবে দেখ্‌তে পেতেন কি কৌশলে হাত কর্ত্তুম্। সুদু টাকাতেও হয়

না, কথাতেও হয় না, পায়ে ধ'রেও হয় না, হওয়ার আরও উপায় আছে, এক দিন—

হায়। আমি যে না বুঝি তা নয়। যে কাজ তাতো জান্তেই পাচ্ছো। তায় যদি আবার বলপূর্ব্বক করা হয়, সে আরও অন্যায়। অর্থের লোভ দেখিয়ে কি অন্য কোনো কৌশলে হ'লে সকল দিগেই বজায় থাকে। আমি আজ্ মনে মনে যে কারিকুরি এঁচেছি, সেটা পরক্ ক'রে দেখে যদি না হয়, শেষে অন্য উপায়—

প্র, মো। কি এঁচেছেন হুজুর ?

হায়। একটা ভাণ ক'রে মোল্লাকে ধ'রে আনা যাক্। এদিকে একটু নরম্ গরম্ আরম্ভ ক'রে ওদিকে কৃষ্ণমণিকে পাঠিয়ে দিই। সে গিয়ে বলুক্ যে তুমি যদি আজ্ সন্ধ্যার পর একবার বৈঠকখানায় গে দেখা কর, সব গোল চুকে যায়।

প্র, মো। বেস যুক্তি হয়েছে হুজুর, বেস্ যুক্তি হয়েছে! এখনই চা'র্ পাঁচ্ জন সর্দ্দার পাঠিয়ে মোল্লাকে ধ'রে আনা যাক্, তা হ'লে আজ্ রাত্রেই—

হায়। আজ্ রাত্রেই ?

প্র, মো। রাত্রেই—এখনি—

হায়। যে দিন্ তারে দেখিছি, সেই দিন্ হ'তেই সেই জ্ঞান, সেই ধ্যান, —যেন উন্মত্ত! (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) ওরে জামাল!

[সর্দ্দার বেশ, জামালের প্রবেশ]

জামা। (সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান) হুজুর—

হায়। আর সকলে কোথায় ?

জামা। (যোড়হস্ত) সকলেই দেউড়িতে হুজুর!

হায়। পাঁচ আদ্মি যাও, আবুকো পাকড়্ লাও, আবি লাও।

জামা। যো হুকুম। [সেলাম করিয়া প্রস্থান।]

হায়। দেখা যাক্, ফাঁদ তো পাৎলেম! এখন কি হয়; যদি এতেও বিফল হয়, তবে যা মনে আছে তাই! (মৃদুস্বরে) সাবেক আমল হ'লে কোন্ দিন কাজ শেষ ক'রে দিতুম। তা কি ব'ল্‌বো, এখনকার আইন খারাপ; মনের দুঃখ মনেই রয়ে গেল; তা দেখি যদি এতেও না হয়, তবে—

প্র, মো। বোধ হয় এই বারেই হবে, আর অন্য চেষ্টা ক'র্ত্তে হবে না, এই বারেই হবে।

হায়। কৈ তা হয়? ক মাস হলো কত চেষ্টা করিছি, কত হাঁটা হাঁটি করিছি, কৈ কিছুই তো হয় না! (দীর্ঘনিশ্বাস)

প্র, মো। অধঃপাতে গেছেন! আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষের মতন তেজ থাকলে এত দিন কবে হয়ে যেত!

হায়। ওহে আমাদের তেজ না আছে এমন নয়, আমরা যে কিছু না ক'র্ত্তে পারি তাও নয়, তবে সে এককাল ছিল, এখন ইংরেজী আইন, বিষ-দাঁত ভাঙ্গা।

প্র, মো। সে রোজাও এদেশে নাই।

হায়। এক রকম সত্য বটে, আগে আগে আমরা মপস্বলে কত কি করিছি, কার সাধ্য যে মাথা তুলে একটা কথা বলে? এখন পায় পায় জেলা—পায় পায় মহুকুমা, কোণের বউ পর্য্যন্ত আইন আদালতের খবর রাখে, হাইকোটের চাপরাসীরাও ইকুইটী, আর কমান্ লর মার্ প্যাঁচ্ বোঝে!

প্র, মো। হুজুর যে ফন্দি এঁচেছেন, এতেই সব কাজ সিদ্ধ হবে এখন—

[নেপথ্যে আজান্ দান নমাজ পড়িবার পূর্ব্বে কর্ণকুহরে অঙ্গুলী দিয়া উচ্চৈস্বরে]

"আল্লা হো আক্‌বার, আল্লা হো আক্‌বার, আল্লা হো আক্‌বার, আল্লা হো আক্‌বার। আস্‌হাদো আন্‌লা এলাহা এল্‌লেল্লা, আস্‌হাদো আন্‌লা এলাহা এল্‌লেল্লা। আসহাদ আন্না, মহামন্দার রছুলল্লা, আসহাদ আন্না মহামন্দার রছুলল্লা। হাইয়ে আলাস্ সলা, হাইয়ে আলাস্ সলা। হাইয়ে আলাল ফলা, হাইয়ে আলাল ফলা।

আল্লা হো আক্‌বার, আল্লা হো আক্‌বার। লা এলা হা এল্‌লেল্‌লা।"

হায়। নমাজের সময় হয়েছে, চল নামাজ্ প'ড়ে আসি। ততক্ষণ হারামজাদাকে ধ'রে আনুক। (গাত্রোত্থান)

[উভয়ের প্রস্থান]

(পটক্ষেপণ।)

(নেপথ্যে গান)

রাগিণী সিন্ধু—তাল জৎ।

কুবাসনা যার মনে, তার উপাসনা কি ?
মনে এক, মুখে সুধু হরি ব'লে ফল কি ?
মধু মাখা-বোল মুখে, গরল রয়েছে বুকে,
হেন ছদ্ম-বেশী তার অধর্ম্মেতে ভয় কি ?
সতীর সতীত্ব ধন, হরিবারে করে পণ,
মুখে বিভু-পদে মন, এদের, অন্তঃকালে হবি কি ?

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আবু মোল্লার বাহির বাটীর ঘর।

(সর্দ্দারগণ-বেষ্টিত দণ্ডায়মান আবু মোল্লা।)

আবু। (কাতরস্বরে পাট জড়াইতে জড়াইতে) আপনারা বসুন্, চাদর খানা নিয়ে আসি, মনিব ডেকেছেন, না গিয়ে বাঁচ্‌তে পারি ?

জামা। নেওয়াতী রাখ্, রাখ্ তোর নেওয়াতী রাখ্, মান রাখ্‌তে পারিস একটু দাঁড়াই। নৈলে চল্ (গলাধাক্কা)

আবু। (সক্রন্দনে) দোহাই আপনাদের, চাদর খানা আনি। আমি কোমর খোলাই দিচ্ছি, অপমান ক'রোনা।

জামা। রাখ্ তোর চাদর, দিবি তো দে আগে দে।

আবু। কিঞ্চিৎ কোমর খোলাই দিচ্ছি।

জামা। দিচ্ছি কি ? ক টাকা দিবি ? আগে টাকা আন্, তবে ব'স্‌বো, তোর কথায় ব'স্‌বো ? তেরা বাৎ সে বায়ঠেগা ? চল্। (গলাধাক্কা)

আবু। দিচ্ছি, এখনই দিচ্ছি।

জামা। আন্ পাঁচ জনার কোমর খোলাই পাঁচ টাকা আন্, ব'স্‌ছি। তা না দিস্, ঘাড়ে হাত দিয়ে কান্ ম'ল্‌তে ম'ল্‌তে কাছারি মুখো ক'র্‌বো। (ঘাড় ধারণ)

আবু। দোহাই খাঁ সাহেবের, আমায় বে ইজ্জত ক'র্বেন না, আমি কোমর খোলাই টাকা দিচ্ছি।

জামা। টাকা দিচ্ছি দিচ্ছি তো কত বারই ব'ল্লি, টাকা আন্ না।

আবু। আমি নিতান্ত গরিব (কোঁচার মুড়া হইতে এক টাকা, এবং কাছার মুড়া হইতে এক টাকা, এই দুই টাকা লইয়া) আপনাদের পান্ খাবার জন্য এই দুটী টাকা।

জামা। (মোল্লার হাতে সজোরে আঘাত করিয়া টাকা ভূমিতে নিক্ষেপ) বেটা কি টাকা দেনে আলা ! আমরা ভিক্ষা ক'র্ত্তে এইছি ? দুটো টাকা নেব ? (চল্ ঘাড়ে হাত দিয়ে পাক দেওন এবং পৃষ্ঠে চারি পাঁচটা মুষ্টি প্রহার)

আবু। দোহাই প্যায়দা সাহেব, আমি তাই দিচ্ছি, তাই দিচ্ছি !
(নেপথ্যে— (অন্তরাল হইতে স্ত্রীলোকের হস্তে তিন টাকা) ন্যাও আর কি কর্ব্বে, যা কপালে ছিল তাই হলো।)

আবু। (হাত বাড়াইয়া ক্ষণকাল পরে) নেন এই পাঁচ টাকাই নেন।

জামা। (টাকা হাতে করিয়া উপবেশন এবং সঙ্গীগণ প্রতি) ব'সো হে ব'সো।
(তামাক্ সাজিতে সাজিতে) আমিতো কোন অপরাধ করিনি, তবে এত জুলুম কেন ? (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) সকলই আমার নসীবের দোষ, আমি কোন কথার মধ্যে যাইনে, কোন হের ফের বুঝিনে, (টিকায় ফুঁ দেওন) কেউ চড়া কথা ব'ল্লে কি দু ঘা মা'ল্লেও পীঠে সই। দোষ ক'ল্লেই সাজা হয়, তবে যখন সাচ্চা আছি—তখন—সকলি নসিবের—(ডাবাহুঁকায় কলিকা চড়াইয়া দান) একালে যে যত সোজা হয়ে থাকে তার পাছে কাটি দিতে কেউ রেয়াত করে না। আমি ভাল জানিনে, মন্দ জানিনে, আমার ওপর পাঁচজন প্যায়দা ! বাবা ! কাকের ওপর কামানের আওয়াজ ! (গাত্রোত্থান এবং যোড়করে পশ্চিমদিকে ফিরিয়া) এ আল্লা তুই জানিস ! আমি কার মন্দ করিনি, হাকিমেরই বা কি করেছি যে হকনাহক মাচ্ছেন ? মাটীর হাকিমের কু-নজরে প'লে কি আর বাঁচা যায় ? কথায় বলে "রাজা বাদী, উত্তর না দি" আপনারা বসুন আমি চাদর খানা নিয়ে আসি।

জামা। না, তা কখনই হবে না—এই ভাবেই কাছারি নেযাব। যেমন আছ তেমনিই চল, হুকুম মত কাজ ক'র্ত্তে হয়, এতো তোম্যার আমার ঘরাও কথা নয়, হুজুরের যে রাগ, তাতে যে কি হবে তিনিই জানেন আর খোদা জানেন।

আবু। এমন ঘা'টু আমি কি করেছি? আপনারা কিছু শুনেছেন?

জামা। আমরা তার কি শুন্‌বো? গেলেই শুন্‌বে? চল। (সকলের গাত্রোত্থান)

আবু। তবে চল কপালে যা থাকে তাই হবে।

(সকলের প্রস্থান)

পটক্ষেপণ

(নেপথ্যে গান)

রাগিণী ঝিঁঝট থাম্বাজ—তাল আডাঠেকা।

স্থখী বলে কোন্ জন?
অধীনতা পাশে বাঁধা যাদেরি চরণ॥
ক্ষমতা হলোনা আর, করি পদ অগ্রসর,
দেখে আসি একবার, প্রেয়সী বদন॥
দুজন দুহাত ধ'রে, লয়ে যায় জোর ক'রে,
কেহ মিছে রোষ ভরে, মারে অকারণ।
দেখিলে চক্ষেরি পরে, কেমন প্রভুত্ব করে,
আনিতে দিলনা মোরে আমারি বসন॥

প্রথম অঙ্ক

ীয় গর্ভাঙ্ক।

হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা।

(হায়ওয়ান আলীর মোসাহেবদিগেব সহিত তাস ক্রীড়া। হায়ওয়ান আলী ও প্রথম মোসাহেব এক দিকে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মোসাহেব অপর দিকে।)

হায়। (তাস দেখিতে দেখিতে) বিস্তি পাই?

দ্বি, মো। কি বড়?

হায়। বিবী বড়।

দ্বি, মো। প্রত্যেক হাতেই যে বিবী বড়? আপনার নিকটে বিবীর বড় বাড়াবাড়ি দেখ্‌তে পাচ্ছি! বিবী যে আর ছাড়ে না!

হায়। বিবী ছাড়ে বৈ কি, সাএবই ছাড়ে না! খেলনা। দেখুন দেখি সেই বিবীর জন্যে কত খানা হয়ে যাচ্ছে, কৈ একবারও সাএবের পানে ফিরেও তাকায় না। রঙের দশ আমার।

দ্বি, মো। আপনি তাকে যথার্থ ভাল বেসে থাকেন, সেও ভাল বাস্‌বে, এতো চিরকালই আছে। মনে মনে যে যাকে ভাল বাসে সেও তাকে ভাল বাসে।

হায়। সে যথার্থ, কিন্তু আমার ভাই কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। যার জন্যে একবারে আহার নিদ্রা ত্যাগ, পূর্ব্বে যে বড় ভাল-বাসার ছিল, তাকেও আর দেখ্‌তে ইচ্ছে করে না। ব'ল্‌বো কি, জিয়ন্তে মরার যাতনা ভোগ ক'চ্ছি। অদৃষ্টের এমন দোষ যে সে আমার নামও শুন্তে পারেনা! কাবার বিস্তি।

দ্বি, মো। (তৃতীয় মোসাহেবের প্রতি) দেখে খেল হে দেখে খেল। গোচ বড় ভাল নয়।

প্র, মো। কাবার ইস্তক।

দ্বি, মো। তবে ঠ'ক্‌লেম।

তৃ, মো। কাজেই, ওঁদের পড়্‌তা পড়েছে, পড়্‌তা প'লে এই হয়। (গান) "পড়্‌তা ছিল ভাল যখন, ফি হতে হন্দর তখন, মেরে তাস করিতাম হত লো!" এই টেক্কা, হাতের পাঁচ আমার।

হায়। হাতের পাঁচ নিলে কি হবে, ওদিগে যে চা'র্‌কুড়ি সাত দেখাতে হবে। আর এই বারেই পঞ্জা (প্রথম মোসাহেবের প্রতি) ওহে এক খান কাগজ ধর। (তাস একত্র করিয়া সম্মুখে ধারণ) কাটুন দেখি।

দ্বি, মো। (হস্ত বাড়াইয়া) এই নিন গোলাম কেটেছি, আর পাল্লেম না, গোলামেই সব হবে।

হায়। কি হবে? এত ভয় কেন?

দ্বি, মো। আবার ভয় কেন?—সব হবে—গোলামেই সব হবে।

হায়। ওহে! আমরা সাধে জিৎছি, আমাদের যাত্রা ভাল, ওদিগের খবর শুনেছ তো?

দ্বি, মো। কতক কতক! কৈ এতক্ষণও যে আন্‌ছে না? বোধ হয় পালিয়েছে।

হায়। পালাবে কোথায় ? একটু ব'সোনা, এখনই দেখ্‌তে পাবে।

তৃ. মো। দেখ্‌বে, এই দেখ (তাস নিক্ষেপ) হুন্দর হয়েছে !

হায়। এমন সময় এমন কাজ ক'ল্লে ? হাতে না তুল্‌তেই হুন্দর—

প্র. মো। (দূরে সর্দ্দারগণকে দেখিয়া) ঐ আবুকে আন্‌ছে।

হায়। (তাস বাঁটিতে বাঁটিতে) চুপ কর। ওদিকে তাকিও না—এই বারে খেলাটা হয়ে যাক্‌।

(সর্দ্দারগণ-বেষ্টিত আবুর প্রবেশ)

আবু। (সেলাম করিয়া দাণ্ডায়মান)

জামা। হুজুর ! —আবু হাজির।

হায়। কাঁহা হ্যায় ? পঞ্চাশ। (হেঁট মুখে সক্রোধে) আরে আবু ! তুই জানিস্‌, আমি তোর সব ক'র্ত্তে পারি ? তোর ভিটেয় ঘু ঘু চরাতে পারি ?

আবু। (ভয় কাতর স্বরে) হুজুর ! আপনি সব ক'র্ত্তে পারেন ; আপনি রাজা, —জান্‌ জাহানের মালিক, ম'ল্লে মার্ত্তে পারেন, রাখ্‌লেও রাখ্‌তে পারেন !

হায়। তোর এত দূর আস্পর্দ্ধা ? আমার সঙ্গে অকৌশল ? তুই ভেবেছিস কি ? আমি তোকে সোজা ক'র্ব্বোই ক'র্ব্বো ! কাবার পঞ্চাশ— জামাল ! হারামজাদ্‌সে পচাশ রোপেয়া, জ'রবানা আদা কর্‌।

জামা। যো হুকুম।

আবু। (যোড়করে) হুজুর ! আমি খা'ট করেছি ?

হায়। চোপ্‌রাও হারামজাদ্‌ ! আব্‌তাক্‌ হাম্‌রা সাম্‌নে মুখোলকে বাৎ কাহতাহায় ! আভি লেজাও, লেজাও, (ক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে) ঘণ্টেকাদার মিয়ান রোপেয়া আদা কর্‌।

জামা। (মোল্লার হাত ধরিয়া টান) চল্‌ !

আবু। খোদাবন্দ আমায় মাপ করুন।

হায়। মাপ ক্যা, এহাঁ মাপ হায় নাই। জামাল ! ওকে চোদ্দ পোয়া ক'রে মাথায় ইট চাপিয়ে দে, তা না হলে ও ন্যাকা কখনও টাকা দেবেনা।

জামা। (চোদ্দ পোয়া করণ)

আবু। খাঁ সাহেব আমার মাথায় ইঁটই দেন, আর আমায় কবরেই দেন, আমায় দিয়ে এত টাকা হবে না, বাড়ী ঘর ছেড়ে দিলুম, বেচে নিন্‌।

হায়　হারামজাদ্! আমি তোর ঘর বেচ্‌বো! তুই যেখান থেকে পারিস্ টাকা এনে দে (সর্দ্দারগণের প্রতি) আরে তোরা এখনও ওর মাথায় ইট দিলিনে! (একজন সর্দ্দারের প্রস্থান)

আবু। হুজুর! আমি বড় গরিব, কুপুষ্যি গলায়, বিষয় আশয় হুজুরের অজানা কি? এত টাকা কোত্থেকে মেটাই? দোহাই খোদাবন্দ্! মাপ্ করুন!

প্র, মো। কেন? তোমার কুপুষ্যি এমন কে?

দ্বি, মো। আরে জাননা, ছোটলোকের ঘরে যার একটু সুন্দরী বিবী তার এক পুষ্যিতেই একশ! নিত্যি নতুন ফরমাস্—নিত্যি নতুন আব্দার!

প্র, মো। ওর বিবী বুঝি খুব খুপসুরৎ?

দ্বি, মো। উরির মধ্যে!

হায়। তবে অবিশ্যি টাকা দিতে পার্ব্বে! তার গয়নাই থাক্, নগদই থাক্, আর যার কাছ্ থেকেই হক্, টাকার আব অভাব কি? (ইট লইয়া সর্দ্দারের প্রবেশ) দে ওর মাথায় চাপিয়ে দে! (সর্দ্দার কর্ত্তৃক আবুর মাথায় ইট দেওন)

আবু। দোহাই সাহেব! আর সয়না, আমায় ছেড়ে দিন্, আমি বাড়ী গে ঘটী বাটী যা থাকে বেচে এনে দিচ্ছি। হুজুর! কপালে যা ছিল, তাই হ'লো! আমার কোনো পুরুষেও এমন অপমান হইনি! এর চেয়ে মরণই ভাল!

হায়। চোপ্‌রাও, চোপ্‌রাও (মোসাহেবগণ প্রতি) কি বল আর খেল্‌বে? না আর কাজ নাই। (চ, মোসাহেবের প্রতি) আপনি একটা কথা শুনে যা'ন্।

চ, মো। (নিকটে গিয়া) বলুন?

হায়। (কানে কানে প্রকাশ) এখনই যা'ন্, আর বিলম্ব ক'র্ব্বেন না, গিয়েই পাঠিয়ে দিবেন!

চ, মো। যাচ্ছি।

হায়। যদি সু-খবর আন্তে পারেন, তবে গাল ভ'রে চিনি দেব!

আবু। (চতুর্থ মোসাহেবের প্রতি চুপে চুপে) কর্ত্তা! আমার জন্যে একটু—আমি আপনারে (পাঁচ অঙ্গুলি প্রদর্শন) দেব।

চ, মো। (হায়ওয়ান আলীর নিকট যাইয়া চুপে চুপে) আবু কি ততক্ষণ এই অবস্থায় থাক্‌বে? ও অবস্থায় রাখা আমার বিবেচনা হয় না।

হায়। (মৃদুস্বরে) আচ্ছা, আপনি ওর জন্যে উপকার করুন; আপনার আসা পর্য্যন্ত বসিয়ে রাখতে হুকুম দিচ্ছি।

চ, মো। (প্রকাশ্যে) দেখুন, হুজুর ! আবু আপনারই প্রজা, ওর ক্ষমতা কি যে আপনার অবাধ্য হয় ? এখানে ওকে এ প্রকার কষ্ট দিলে তো টাকা আদায় হবে না. জামিন নিয়ে ছেড়ে দিন, টাকার যোগাড় ক'রে নিয়ে আসুক।

হায়। তা হবে না; আমি ওকে ছেড়ে দিতে পারি না; তবে আপনি ব'লছেন, এ অবস্থায় না রেখে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল দেউড়িতে কয়েদ থাকুক, সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা মনে আছে তাই ক'র্ব্বো, তখন আর কারো উপরোধ শুন্‌বো না !

চ, মো। আপনি সব ক'র্ত্তে পারেন। আমার কথায় যে এই ক'ল্লেন, ইতেই কৃতার্থ হ'লেম। (প্রস্থান)

হায়। জামাল ! আবুকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়ে রাখ্।—সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা ক'র্ত্তে হয় ক'র্ব্বো ! এখন দেউড়িতে নে যা ! (জামাল, আবু মোল্লা এবং সর্দ্দারগণের প্রস্থান)

দ্বি, মো। আমি এ ঠার ঠোর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। "সীতা নাড়ে অঙ্গুলি, বানরে নাড়ে মাথা। / বুঝিতে না পারি নর বানরের কথা !"

হায়। বুঝ্‌বে কি, আজও যে গাল টিপ্‌লে দুধ পড়ে।

দ্বি, মো। দুধ পড়ুক তাতে ক্ষতি নাই, হুজুর কিন্তু বুঝে চ'ল্‌বেন, শেষে চক্ষের জল না পড়ে ! তখন আর ঠারে ঠোরে বলা চ'ল্‌বে না !

"ঠারে ঠোরে উনিশ বিষ দাদার কড়ী—

প্যাঁচ খাটাতে সকলে পারে, কিন্তু ম্যাও ধর্‌বার সময় কেউ নাই।

হায়। (মুখের ওপর হাত নাড়া দিয়া) অধিকারী মহাশয় চুপ করুন, আপনার আর ছড়া কাটতে হবে না !

দ্বি, মো। চুপ ক'ল্লেম বটে, কিন্তু আমার ভাল বোধ হ'চ্ছে না। যাই করুন, আগে পাছে বিবেচনা ক'রে ক'র্‌বেন।

হায়। সে জন্যে আপনাদের বড ভাব্‌তে হবে না। আমি আপনার চেয়ে ভাল বুঝি—চল আড্ডায় যাওয়া যাক্।

দ্বি, মো। গুলীতে যে হাড় কালী হয়ে চল্লো !

হায়। চুপ্ কর হে চুপ্ কর, বেশী ব'কোনা, মাথা ঘুর্‌বে।

(সকলের প্রস্থান)

(পটক্ষেপণ।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আবু মোল্লার অন্দর বাড়ী।

(নুরন্নেহার ও আমিরণ আসীনা।)

আমি। (কাঁথা সেলাই করিতে করিতে) আর কাঁ'দলে কি হবে, জমীদারের হাত কখনও এড়াতে পা'র্ব্বে না, টাকা দিতেই হবে।

নুর। পঞ্চাশ টাকা কোথা পাব? আজ যে ক'রে প্যায়দার কোমর খোলাই পাঁচ টাকা দিয়েছি, তা আর কি ব'ল্‌বো। আর একটা পয়সারও ফিকির নাই, জিনিস পত্র ঘর কয়েকখানা বেচ্‌লে কিছু টাকা হতে পারে, তা এ অবস্থায় কেই বা কিন্তে সাহস করে? টাকা না দিলেও তো রক্ষা নাই। আমি কি ক'র্‌বো? এত টাকা কোথা পাব? তিনি কাছারিতে আটক রৈলেন, আমি মেয়ে লোক কোথা থেকে এত টাকা দেব? গরিব ব'লেও কি তাঁর দয়া হ'লো না? পঞ্চাশ টাকা একসাতে তো আমরা কখনও চক্ষেও দেখি নাই। আজ্ আর কোথা হতে দেব?

আমি। না দিয়ে কি আর বাঁচ্‌বে? জরিমানা না দিয়ে যে অন্য কোন হাকিমের মাটীতে পালাবে, মনের কোণেও সে কথা ঠাঁই দিওনা।

নুর। পালাব! সেতো পরের কথা, রাত্রে যে তাঁকে কত কষ্ট দেবে, কত মা'রই মার্ব্বে, কত বারই যে খাড়া ক'র্ব্বে, আমার সেই কথাই মনে প'ড়্‌ছে! তাঁর হাতে একটী পয়সাও নেই (রোদন) টাকার জন্যে তাঁকে মেরে মেরে একেবারে খুন ক'রে ফেল্‌বে।

আমি। মাটীর হাকিমে মেরে ফেল্লে তুমি কি ক'র্ব্বে? তার নামে তো আর সাএবদের কাছ নালীস ক'র্ত্তে পা'র্ব্বেনা? নালীস ক'ল্লে এই হবে, এক দিনে তোমার ভিটেয় পুকুর ক'রে দেবে! জমীদারের সঙ্গে কার কথা? সে কি না ক'র্ত্তে পারে?

নুর। পারেন ব'লেই কি একেবারে মেরে ফেল্‌বেন? এই কি জমীদারের বিচের? জমীদার বাপের সমান, কোথায় প্রজার ধন প্রাণ মান রক্ষে ক'র্ব্বেন। ওমা! তা গেল মাটী চাপা! উল্টে দিনে ডাকাতী!

আমি। চুপ্ কর চুপ্ কর, ঐ কেষ্টমণি আস্‌ছে, যদি কিছু ওর কানে গে থাকে, তবে এখনই ব'লে দেবে। মাগো, ও তো সামান্যি মেয়ে নয়!

নুর। তাই তো ও আবার আস্‌ছে কেন? ওকে দেখ্‌লেই যে আমার প্রাণ উড়ে যায়!

(ঝোলা কক্ষে, ঘটী হস্তে কৃষ্ণমণির প্রবেশ)

কৃষ্ণ। "জয় রাধে কৃষ্ণ বল মন!" মা ভিক্ষে দেও গো! ওমা তোমায় আজ

এমন দেখ্‌ছি কেন গা ? কেঁদে কেঁদে দুটো চ'ক যে একেবারে রাঙা ক'রেছ, ওমা একি গো ?

আমি। ও ম'রে গেছে, ওকি আর আছে ! মোল্লাকে যে কাচারি ধ'রে নে গেছে, তুমি শোন নি ?

কৃষ্ণ। তুই চ'কের মাথা খাই মা, আমি কিছুই শুনিনি ! ধ'রে নিয়ে গেছে ? সে কি ? কেন আবু তো দোষ কর্‌বার লোক নয় !

আমি। সুদু ধ'রে নিয়ে গেছে ! ধ'বে নিয়ে পঞ্চাশ টাকা জরিবানা হেকেছে, আরও কত অপমান ক'র্চ্ছে, টাকার জন্যে মাথায় ইট দিয়ে খাড়া ক'রে নাকি রেখেছে ! এদেব তো ঘর কুড়ুলে পাঁচটা পয়সা বেরোয়না, অত টাকা কোথায় পাবে ? এই কি হাকিমের বিচের ?

কৃষ্ণ। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আহা হা, এত করেছে ! হা কৃষ্ণ ! কি ক'র্‌বে বাছা, জমীদার দণ্ড ক'ল্লে আব বাঁচ্‌বাব উপায় নেই। টাকা দিতেই হবে—জমীদার টাকা নেবার জন্যে ধ'ল্লে আর এড়ান নেই। তবে তাকে ভয়ও ক'র্ত্তে হয়, তার কথাও শুন্তে হয়, জমীদার আস্ত বাঘ !

সুর। দুর্জ্জনকে সকলেই ভয় করে ! এই কি তাঁব বিবেচনা ? আমাদের দিন চলাই দায়, কোন কোন দিন উপোস ক'বেও কাটাতে হয়, এতে যে, বিনি দোষে এত টাকা জরিবানা ক'ল্লেন, কোত্থেকে দেব ? ঘর দোর ঘটী বাটী বেচ্‌লেও তো পঞ্চাশ টাকার অর্দ্ধেক হয় না। দেখ দেখি বাছা এ তাঁর কেমন বিচের ? হাকিমে এমন ক'রে অবিচারে মা'ল্লে আর কার কাছে দাঁড়াব ? এর পর যদি হাকিমের পর হাকিম থাক্‌তো তবে এর বিচের হতো।

কৃষ্ণ। ওমা ! হাকিম থাক্‌লে ক'র্ত্তে কি ? জমীদারের হাত ক দিন এড়াবে ? হাকিম তো আর সকল সময় কাছে ব'সে থাক্‌বেন্ না ! জমীদার যখন মনে ক'র্ব্বে তখনই ধ'রে নিয়ে জরিবানার টাকা আদায় ক'র্ব্বে। মা ! বেলা গেল আর থাক্‌তে পারিনে, একমুটো ভিক্ষে দেও যাই, আর কি ক'র্ব্বে মা ! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

সুর। (ভিক্ষা আনিতে গমন)

কৃষ্ণ। (পশ্চাৎ যাইয়া দ্বার দেশে দণ্ডায়মান)

সুর। (ভিক্ষা আনিয়া ভিকারিণীর ঘটীতে দান)

কৃষ্ণ। (ভিক্ষা লইতে লইতে) চুপে চুপে শুন মা ! জমীদারের হাত কখনও এড়াতে পা'র্ব্বেনা, আমি শুনিছি তোমার জন্যে একেবারে পাগল। দেখ মা এক মাস হ'লো তোমার পাছেই নেগে আছে। তুমি মনে ক'ল্লে সব মিটে যায় !

সুর। (সক্রন্দনে) আমি আবার কি মনে ক'র্বো ?

কৃষ্ণ। আর এমন কিছু নয়, আজ্ রাত্রে যদি তাঁর বৈটকখানায় যেতে পার, তা হ'লে যত রাগ দেখ্ছো একেবারে জল হয়ে যাবে! তুমি উল্টে আবার তার ডবল টাকা ঘরে আস্তে পা'র্বে।

সুর। আমি বৈঠকখানায় যাব মাসি ? (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) এত কাল পরে তুমি আমায় এই কথা বল্লে ? তাঁর কি এমন কর্ম্ম করা উচিত ? অধীনে আছি ব'লেই কি এমন অধর্ম্মের কাজ ক'র্বেন ? এই কি তাঁর ধর্ম্ম ?—এ বড় দারুণ কথা, আমা হতে এমন কর্ম্ম হবেনা! তিনি যা করুন, তা করুন, প্রাণ থাক্তে আমা হতে এমন কুকাজ হবে না—আমি বৈঠকখানায় কখন যেতে পা'র্বো না। যদি বড় পেড়াপীড়ি হয় তবে এই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্বো।

কৃষ্ণ। (জিব কাটিয়া) সেওতো ভদ্র সন্তান, তায় আবার জমীদার, একথা কে শুন্বে ? কেউ জাস্তে পা'র্বে না! জান্লেও কার দুটো মাথা এ কথা মুখে আনে মা! তুমি রাজার রাজ-রাণীর মত সুখে থাক্বে। দেখ জমীদার, সে কি না ক'র্ত্তে পারে ? তোমায় ধ'রে নিয়ে যেতেও তো তার ক্ষ্যামতা আছে! জবরাণ্ ক'ল্লেও তো ক'র্ত্তে পারে! সে যখন পণ ক'রেছে, তখন ছাড়্বে না, কখনই তোমায় ছাড়্বে না! তবে কেন অপমানে কুল্ মজাবে ? মান্ থাক্তে আগেই গিয়ে তাঁর কাছে কাতর হয়ে পড়, আদর পাবে! তিনি যা বলেন তাইতে রাজি হওগে মা! তুমিই যে একা একাজ ক'চ্ছো তা তো নয়; জমীদারের নজরে পড়ে অনেক কোণের বউ পজ্জন্ত এ কাজ করেছে; চৌধুরীদের কথা শোননি ? ওমা! তারা আস্ত ডাকাৎ! পাড়া পড়সী জ্ঞাত্ কুটুম পের্জার ঘর কাউকেও ছাড়ে নি। যার ওপর নজর করেছে তারির মাথা খেয়েছে ? কৈ কে তার কি করেছে ? যে তার অবাধ্য হয়েছে, তার ভিটে মাটী একেবারে উল্কুড় উটিয়ে দিয়েছে! মা আমি তোমার ভালর জন্যেই ব'ল্ছি, মানে মানে থাকাই ভাল, শেষে মানও যাবে আর জাস্তেই পাচ্ছো—বুঝেছ—

সুর। বুঝেছি সব, কিন্তু সে কাজ আমি পার্ব্বোনা, জান্ থাক্তে তো নয়! আগে আমায় খুন্ করুন তার পর যা ইচ্ছে তাই ক'র্বেন! (ঘৃণা ও বৈরক্তির দৃষ্টিতে শশব্যস্তে গমনোদ্যত)

কৃষ্ণ। দাঁড়াও না শু—

সুর। আমি শুনবো না (আমিরণের নিকটে গমন)

কৃষ্ণ। শুন্লেনা, শুন্লেনা, আচ্ছা যাই আগে, খাঁ সাহেবের কাছে এই

সতীপনার যা শোনাতে হয়, তা হবে অকন! শেষে জান্তে পার্ব্বে আমি কেমন "কৃষ্ণমণি"! (সক্রোধে প্রস্থান)

আমি। কৃষ্ণমণি হাত মুখ নেড়ে কি ব'ল্‌ছিল বউ?

সুর। তোমার আর শুনে কাজ নেই। সে কথা আর মুখে আন্‌বো না, ছি ছি বড় মান্‌ষের এই আচরণ!

আমি। কি কথা, বল্‌না শুনি?

সুর। তবে শোন। (কানে কানে প্রকাশ)

আমি। (গালে হাত দিয়া) এমন! তা হবেই তো; ওরা ছাগলের জাত্!—পর্য্যন্ত পার পায় না, তুমি আমি তো ছার কথা! ব'ল্‌তেও নজ্জা করে ব'ন্, শুন্‌তেও নজ্জা! ওদের মেয়ে মানুষ দেখ্‌লেই চ'ক টাটায়, জমীদার হলেই প্রায় এক খুরে মাথা মুড়নো! কেউ চিরকাল বাইরে কাটাচ্চেন, ঘরের খবর চাকরেরাই জানে! যেখানে যান সেই খানেই মরেন, এক দিনের জন্তেও ছেড়ে থাক্‌তে পারেন না। বাই! বাই! বাই! বাই বই দুনিয়াতে তাঁদের যেন আর কেউ নাই! এঁরাই আবার বড় লোক! সাএবদের কাছে ব'স্‌তে পান্, কত খাতির হয়, তাতেই আরও ন্যাজ ফুলে ফুলে ওঠে! সৎকাজের বেলা এক পয়সার মা বাপ! কিন্তু ওদিকে কল্পতরু! চুল পেকেছে, দাঁত প'ড়েছে, মুখের চামড়া ঢিল হয়েছে, কিন্তু সক্ এম্‌নি দাঁত পড়া বাঘের মতন এখনও জিব্ লক্ লক্ করে। সেই বাজা'রে মেয়ে গুনো এসে কত নাঞ্ছনা দিয়ে যায়, তবু নজ্জা নেই! কিছু দিন খাবার পর্‌বার্ নোভে থেকে বেশ দশটাকা হাত ক'রে মুখে চূণ কালী দিয়ে চ'লে যায়, আবার বেদিনী, যুগিনী, চাঁড়াল্‌নী, কলুনী চা'র জেতের চা'র জনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড় বয়েসে রঙ্গ ক'চ্ছেন; কেউ ঘরের বাইরে রঙ্গিণী নে উন্মত্ত; কেউ ঘরের দিব্বি স্ত্রী ফেলে পাড়াতেই কাল্ কাটাচ্ছেন। তা ব'ন্ এদেশের জমীদারদের অনেকের দশাই তো এই! তা ব'লে আর কি ক'র্ব্বে বল? যে গতিকে পারে; তোমার মাথা খাবেই খাবে! তা এখন চল ওদিকে—

সুর। ওদিকে আর তুমি কি বল্‌বে ভাই! (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমি আজ্ বুঝিছি। আজ মাসাবধি লোকের দ্বারায় কত রকমের কথার ঠারে কত লোভ দেখাচ্ছে। খাঁসাহেবও বিকেলে সন্ধ্যার পর মিছি মিছি শীকারের ছুতো ক'রে বাড়ীর আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি আজ্ সকলি বুঝিছি। আমি যা যা বলিছি, বোধ হয় কৃষ্ণমণি তার দ্বিগুণ বাড়িয়ে ব'ল্‌বে, আমার কি হবে? আমি কোথা পালাব? এখনই যদি আমাকে ধ'রে নিয়ে

যায়, তবে আমার কি দশা হবে? কার কাছে গে এ বিপদ থেকে রক্ষা পাব? এমন কি কেউ নেই?

(পটক্ষেপণ)

(নেপথ্যে গান)

রাগিণী বাগশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

আর, কে আছে আমার?
এ দুঃখ পাথারে কেবা হবে কর্ণধার?
যে তারিবে এ দুস্তারে, নিজে সে ভাসে পাথারে,
না হেরি সে প্রাণেশ্বরে, ঝুরি অনিবার।
আমরি আমারি লাগি, প্রাণকান্ত দুঃখ ভাগী,
বিপক্ষ হলো বিরাগী, না দেখি নিস্তার!
শুনেছি ভারতেশ্বরী, দুষ্ট জন দণ্ডকারী,
তবে, মাগো কেন হেরি, হেন অবিচার?

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গুলির আড্ডা

(হায়ওয়ানআলী, মোসাহেব চারিজন এবং একজন গুলিখোর আসীন।)

হায়। ওহে ব'সো ব'সো, কেবলই টা'ন্‌ছো, দু একটা গল্প চলুক।

তৃ, মো। হুজুর! গৌরী নদীর পুল বেঁধেছে—

প্র, মো। বেঁধেছে বটে, তার ওপরে কলের গাড়িও চ'ল্‌ছে বটে, কিন্তু—

তৃ, মো। (সক্রোধে) কিন্তু আবার কি?

প্র, মো। (মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) সে পুল টেক্‌বেনা। দুমাস পরেই হ'ক্, আর ছমাস পরেই হ'ক্, ভেঙে প'ড়্‌বেই প'ড়্‌বে। যত বেটারা গাড়ীর মধ্যে থেকে উঁকি মেরে হাত নাড়া দিয়ে চ'লে যায়, তারা গৌরির জল খাবেই খাবে! গৌরি তাদের খাবেনই খাবেন!

হায়। নাহে না, ভাংবে না। শুনিছি ভারি ভারি লোহার থাম পুতেছে।

প্র, মো। হুজুর থাম পুৎলে কি হবে? ওদিকে যে, গোড়া নড়্‌ব'ড়ে—

হায়। নড়্‌ব'ড়ে কি রকম?

প্র, মো। শুনিছি পদ্মার কাছে গৌরী গিয়ে নালিস করেছিল যে পুলের ভার আর সৈতে পারিনে, তাতে পদ্মা বলেছেন যে লেস্‌লী সাহেব পুল বেঁদে বেলাত মুখো হ'ন, আমি এক দিনে ভেঙে চূরে একবারে কুমারখালী গিয়ে ধ'র্ব্বো।

হায়। এতো শুন্‌লেম। জোৎদার বেটারা খৃষ্টান হবে বলে পাদ্‌রি সাএবের কাছে গিয়ে প'ড়েছিল, তার কি হয়েছে ?

প্র, মো। হুজুর খৃষ্টান হওয়া মিছে মিছি। খৃষ্টান হওয়া ওদের কাজ নয়। তবে যে গিয়ে ছিল, সে কোন কাজ পাবার লোভে। ওদের দলের যিনি কর্ত্তা, তাঁর কোন মতেই বিশ্বাস নাই। আসলে যদি ধরেন, তবে তারা সেই এক রকমের লোক। ভাল মানুষ হলে স্বভাব চরিত্র ওরকম হতোনা। দেখ্‌তে সেই লাঙল ঘাড়ে চাচাদের মত দেখায় ! মুসলমানের আবার আচার ব্যাভার ? ধর্ম্ম কিছুই নাই—ব'ল্‌তে কি, তারা কোরাণ কেতাব কিছুই মানে না, কোন বিদ্যার ধার ধারে না, কেবল বড়াই ক'রে বাড়ির ভেতরে মেয়েদের সাম্‌নে অপরের নিন্দে ক'র্ত্তে মজ্‌বুদ।

হায়। আমি জানি ওদের দলের যিনি কর্ত্তা তিনি সকল বিষয়েরই কর্ত্তা !

প্র, মো। হুজুর ! কুঠীর কর্ত্তা সাহেব একবার কর্ত্তার বড় কর্ত্তামী বা'র ক'রে ছিলেন। মাথায় ইট চাপানো পর্য্যন্ত বাকি ছিল না। ওরা—

"যখন দেখে আঁটা আঁটি,
তখন কেঁদে কেটে ভেজায় মাটী !"

তারপর অম্‌নি চ'ক উল্টে ব'লে ফেলে, তো তো তো তোমি কেডা হে ?

হায়। সে কথা থাক্, আন্দ বিশ্বাসের মকদ্দমার কি হলো ?

প্র, মো। সে কথা আর কি ব'ল্‌বো ? কলিকালে সকলই গেল। রমজানের চাঁদে রোজা রেখে মস্ত মস্ত কাঁচা পাকা দাড়ি ওয়ালা সাত্রবরা তস্‌বি টিপ্‌তে টিপ্‌তে হলফ প'ড়ে হাকিমের সাম্‌নে মিছে কথা কৈলেন, শুনে অবাক্ হয়েছি, যে এ বাপজিদের অসাধ্যি কিছুই নাই !

হায়। তা তো কৈলেন, তার পর ?

প্র, মো। (ঈষদ্ধাস্য করিয়া) এখন যেমন আইন, তেমনি আদালত, টাকার জোরে কি না হয় ? ডিস্‌মিস্ হয়েছে।

হায়। বেস হয়েছে ! ভদ্র লোকের জাত্ বাঁচ্‌লো। শুনছিলেম, এ মকদ্দমায় বড় জোগাড় হয়েছিল।

প্র, মো। জোগাড় ক'ল্লে কি হবে ? অমন বিচক্ষণ হাকিম্‌কে কি কেউ ঠকাতে পারে ? হুজুর আর এক কথা শুনেছেন ? হিঁদুদের নিকে হ'চ্ছে !

হায়। শুনিছি। আমাদের সঙ্গে কি হিঁদুর মেয়ের নিকে হতে পারে না? না বাবা? তায় কাজ নাই, পাবনায় সে দিন রাঁড়্‌ ক'নে আর তার বরকে বাসর ঘরেই পাড়ার হিঁদুরা জুটে পুড়িয়ে ফেল্‌ছিল; ভাগ্‌গিস হরিশ ডাক্তার ছিল তাই রক্ষে হলো! তবেই তো বাবা! একেবারে আগুনে পুড়িয়ে ফেল্‌বে!

প্র, মো। সে কথা যাক্‌, এদিগের কি হলো?

হায়। আজ্‌ যে জোগাড় করেছি, তাতো শুনিইছ?

প্র, মো। হুজুর আমি শুনিছি, সে নাকি গর্ভবতী আছে।

হায়। নাহে না, সে কোনো কাজের কথা নয় ওকথা শুন্‌লেম না, আমি কা'ল্‌ও দেখিছি, ওসব ভো কথা! আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে মিছি মিছি একটা রটনা ক'চ্ছে, আমি তাইতেই প্রায় ভুলে গেলেম আর কি! এ কি ছেলের হাতের পিঠে।

প্র, মো। (হেঁটমুখে) আপনি দেখেছেন, তাতে কোন কথাই নেই, কিন্তু আমি যেন শুনেছিলেম, যে সত্য সত্যই গর্ভবতী!

হায়। হ'ক্‌ তায় ক্ষতি কি?

(চতুর্থ মোসাহেবের প্রবেশ)

হায়। চালাকদাস! খবর কি? গাল ভ'রে চিনি দেব, না জুটো ছিটে টান্‌বে?

চ, মো। (কুঁজ হইয়া অঙ্গুলি নাড়িয়া) ছিটে ফোটার কাজ নয়, (নিশ্বাস ত্যাগ) সব দফা রফা—

হায়। সে কি? একেবারেই যে শেষ ক'ল্লে? ব্যাপার খানা কি?

চ, মো। কোন মতেই না! সে হাত্‌মুখ নেড়ে কত কি ব'ল্লে, এদের উপর হাকিম থাক্তো, তা হলে এর শোধ নিতেম। কি আশ্চর্য্য! মেয়ে মানুষের এমন কথা! কৃষ্ণমণি আরও অনেক ব'ল্লে, সে কথা এখন ব'ল্‌বো না, আর এক সময় শুন্তে পাবেন!

হায়। কি? তার স্বামীকে এনে কানমলা, নাকমলা দিচ্ছি, খাড়া ক'রে রেখেছি, আর তার এত বড় আস্পর্দ্ধা! মেয়ে মানষের এত হেম্মত! হাকিম দেখায়! আমাকে! তবে এর প্রতিফল এখনই দিচ্ছি! আর ব'ল্‌তে হবে না, আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি। আপনি সর্দ্দারদের ডাকুন। (চতুর্থ মোসাহেবের প্রস্থান)

প্র, মো। আপনার উপরে হাকিম দেখাতে চায়, এতদূর বুকের পাটা! আমি—

হায়। এখনি তারে হাকিম দেখাচ্ছি! বড় সতী হয়েছে! সতীপনা এখনই মালুম পাওয়া যাবে!

(জামাল, কামাল, ও চতুর্থ মোসাহেবের প্রবেশ।)

জামা। (সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান)

হায়। দেউড়িতে যত সর্দ্দার আছে, সব জাও। মোল্লাকো জরুকো পাকড় লাও। মোল্লাকে ছেড়ে দেও! আমি মোল্লা চাইনে, নুরন্নেহার চাই!

জামা। হুজুর! আমরা চাকর, যে হুকুম ক'র্ব্বেন, তামিল ক'র্ব্বোই। কিন্তু শেষে যেন মারা না যাই।

হায়। তোমাদের কি? এর জন্যে যদি আমার সর্ব্বস্ব যায়, তাও স্বীকার! নুরন্নেহার কেমন সাচ্চা দেখ্‌বো! আর বিলম্ব ক'রোনা, এখনই যাও, আর সহ্য হয় না। কি? মেয়ে মানুষের এত বড় কথা!

জামা। হুজুরের হুকুম, চ'ল্লেম!

(সেলামপূর্ব্বক জামাল কামালের প্রস্থান।)

হায়। (কিঞ্চিত ভাবিয়া) আর ভাব্‌লে কি হবে, যা অদৃষ্টে থাকে তাই হবে! (চ, মোসাহেবের প্রতি) ওহে টাননা?

চ, মো। (গুলি টানিতে আরম্ভ)

গু, খো,। (আগুন দিতে অগ্রসর)

হায়। মৃদু মৃদু টান্! কেউ একটা গান ধর না—

চ, মো। আচ্ছা এই ছিটে টা ওড়াই।

গু, খো। কর্ত্তা আমি সারা দিন কিছুই খাইনি।

হায়। কিছুই খাস্‌নি, এই যে এত ছিটে খেলি!

গু, খো। কর্ত্তা না, জল টুকুও মুখে দেই নি।

চ, মো। আচ্ছা এ দুটো পয়সা নে, বাজারে জলপান কিনে খেগে যা (দুটী পয়সা দান)

(সেলাম পূর্ব্বক গুলিখোরের প্রস্থান।)

হায়। একটা গান ধর না।

চ, মো। আচ্ছা। (মোচে তা দিয়া, একটু চাট্ খাইয়া) তবে একটা মধ্যমান গাই।

রাগিণী জঙ্গলা—তাল আড়খেম্‌টা

যে বলে হয় হাড় কালী সকের ছিটে টান্‌লে পরে।
দুগালে চা'র্ চড়্ লাগাই তার দেখা পেলে
রাস্তার ধারে।
যে পেয়েছে গুলির মজা, উড়েছে তার নামের ধ্বজা,
মনে মনে হয় সে রাজা, যখন, আড্‌ডায় এসে
আড্‌ডা করে।

ত্ব চা'বু ছিটে উড়িয়ে দিলে, চতুর্ব্বর্গ ফলটী ফলে,
নবাব জাদা কাছে এলে,
কে আর তারে কেয়ার করে ?
নয়ন দুটি বুজে বুজে, ঢুলি যখন মাথা গুঁজে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য দেখি খুঁজে, তেমন মজা নাই সংসারে।
(প্র, মোসাহেব ব্যাতীত উচ্চৈঃস্বরে গান)

প্র, মো। এই বুঝি তোমাদের মধ্যমান ?

তৃ, মো। নয় ? তবে এটা কি ? ভায়া ভারি কালোবাত।

প্র, মো। ওরে তোর মাথা ! এটা আড়খেমটা, আর রাগিণী শঙ্করা

তৃ, মো। কে জানে তোর খেমটা, আর কে জানে তোর শঙ্করা !

হায়। (উষ্ণভাবে) একটু চুপ কর হে চুপ্ কর। (উচ্চৈঃস্বরে) ওহে ! তোমরা কি পাগল হয়েছ ? একটু চুপ করনা। (মোসাহেবগণ পূর্ব্বমত উচ্চরবে তাক্লাক্সিন ধিনিতাক্)

হায় (হস্ত দ্বারা বিছানায় আঘাৎ) চুপ করনা, তোমাদের কাণ্ড জ্ঞান নাই। ওদিগে যে ভয়ানক গোল হ'চ্ছে। (মোসাহেবগণ নিস্তব্ধ।) শুনেছ ? বড়ই গোল হ'চ্ছে। চল একটু এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক্ !

সকলে চলুন, আপ্নি যাবেন আমরাও যাচ্ছি। (উচ্চৈঃস্বরে আল্লা আল্লা করিয়া) [সকলের প্রস্থান]

(নেপথ্যে—উচ্চৈঃস্বরে—ছোট বিবি ম'লেম, আমায় নিয়ে চ'ল্লো, এইবারে গেলেম !)

(দ্বিতীয়বার নেপথ্যে। এগোরে নিয়ে গেলরে, তোরা এগোরে, দোহাই মহারাণীর তোর এগরে।)

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কোশলপুর।

হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা।

(মোসাহেবগণ, সর্দ্দারগণ, এবং হায়ওয়ান আলী নুরন্নেহারের হস্ত ধরিয়া দণ্ডায়মান, নুরন্নেহার হেঁট বদনে কম্পিতা।)

হায় কেমন ? এখন তো হাতে প'ড়েছ ! এখন আর কে রক্ষা ক'র্ব্বে ? বাড়ীতে ব'সে ব'সে যে ব'লেছিলে, ওঁর উপরে কি আর হাকিম নাই ?

কৈ কাকেও যে দেখ্‌তে পাইনে! তোমার সে বাবারা কোথায়? এখন দেখে না! একে রক্ষা করে না! সতী সতী ক'রে বড় ঢুলে প'ড়্‌তে! এখন সতীত্ব কোথায় থাক্‌বে? আমার হাতে তো প'ড়্‌তেই হ'লো, তবে আর এত ভিরকুটী ক'ল্লে কেন? আমার ক্ষমতা আছে কি না তাওতো দেখ্‌লে? আরো এখনি দেখ্‌তে পাবে জান্! এত দিন আমার জান্‌কে যে এত হায়রাণ করেছ জান্! এস তার প্রতিফল দিই!

নুর। (সকরুণে) আপনি সব ক'র্ত্তে পারেন! আমি আপনার প্রজা, আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ! জাত্ মান রক্ষা ক'র্ত্তেও আপনি, প্রাণ রক্ষা ক'র্ত্তেও আপনি! আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ! (রোদন) আপনিই আমার জাত্ কুল রক্ষা ক'র্ব্বেন!

হায়। এই যে তাই ক'চ্ছি! (নুরন্নেহারকে টানিয়া লইতে উদ্যত)

নুর। (মাটীতে গড়াইয়া পড়িয়া সরোদনে) আমায় ছেড়ে দিন! গলায় কাপড় দে ব'ল্‌ছি আমায় ছেড়ে দিন! আমি আপনার মেয়ে! আপনি আমার বাপ! আমার কাপড় অসামাল হলো, কাপড় পরি, ছেড়ে দিন!

হায়। (রুমাল দ্বারা মুখ বন্ধন করিতে করিতে) কাপড় নেওয়াচ্ছি।

নুর। (গেঙ্গাইতে গেঙ্গাইতে) পায় ধ—ব'—আমা—

হায়। (মোসাহেবগণ প্রতি) আপনারা দুই জন হারামজাদীর পা ধরুন, আমি হাত ধ'রে টেনে নিচ্ছি। (তৃ, এবং চ, মোসাহেব বেগে পদ ধারণ এবং খাঁ সাহেব কর্ত্তৃক লম্বমানা নুরন্নেহারকে আকর্ষণ)

(প্রস্থান)

দ্বি, মো। (ক্ষণ-চিন্তার পর) হুজুরের যে রাগ দেখ্‌তে পাচ্ছি, এতে যে কি ক'রে বসেন, তার নিশ্চয় কি? কিন্তু এর ভোগ শেষে ভুগ্‌তেই হবে!

জামা। দেখুন আমরা চাকর, হুকুম ক'ল্লে আর অতুল ক'র্ত্তে পারি নে। কাজটা বড়ই অন্যায় হ'চ্চে! মোল্লার স্ত্রী গর্ভবতী, তার পর এই জব্‌রাণ! কাজটা বড় অন্যায় হ'চ্ছে! কি করি? এঁর অধীনে থেকে একেবারে সর্ব্বনাশ হবে! এঁর তো দিগ্‌বিদিগ্ কিছুই জ্ঞান নেই। ন্যায় হ'ক অন্যায় হ'ক একটা ক'রে বসেন, যে ভাব দেখ্‌তে পাচ্ছি, এতে আমাদের জাত্ কুল থাকাই ভার! আজ্ আবু মোল্লার যে দশা হলো, কোন্ দিন আমাদেরই বা ওরূপ ঘটে!

(হাওয়ান আলীর পুনঃ প্রবেশ)

হায়। ওহে, তোমরা এখানে কি কর্চ্ছো? তোমরা বুঝি ভাগ চাও না? যাওনা—এমন দিন আর কবে পাবে!

প্র, মো। আচ্ছা বাই।　　　　(প্রস্থান)

হায়। (সর্দ্দারগণ প্রতি) তোমরা আমায় বড় খুসি ক'রেছ, আমি মনের মতো খুসি ক'র্ব্বে!

জামা। হুজুর! আমরা—হুকুম পেলে কাউকে ভয় করিনে, তবে দেখ্‌বেন শেষে যেন একেবারে দয় ডুবে না মরি! সময় বড় খারাপ, সাবেকের আমল হলে এত ভাবতেম্ না।

হায়। তার জন্য ভয় কি? মকদ্দমা আছে, মামলা আছে, আমি আছি! যত টাকা লাগে; বে পরওয়া, জান্ কবুল! জামাল, ওকে কি রকমে ধ'ল্লে?

জামা। আমরা ঐ সেই কোটার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলুম, কোন মতে আর ফাক পাইনে। অনেকক্ষণ পরে কানে আওয়াজ এল যে একটু দাঁড়াও আমি ব'ার থেকে আসি। আবার শুন্‌লুম, চাদ্‌নির রাত্, ভয় কি? তার পরেই দেখি যে নুরন্নেহার বাইরে এয়েছে। তখন একেবারে লাফিয়ে ধ'রে শূন্যে শূন্যে আস্তে লাগ্‌লুম! ও কেবল মুখে ব'ল্লো, যে ছোট বিবি ম'লেম! তার পরেই আপনি গিয়েছেন। মোল্লাকে যে রকমে তাড়িয়েছি তা তো দেখেছেন—হুজুর আমরা যেন নষ্ট না হই।

হায়। তোমাদের ভয় কি? টাকার অসাধ্য কি আছে বল দেখি?

জামা। হুজুর! সে যথার্থ, কিন্তু আমরা গরিব, সেইটা যেন মনে থাকে!

হায়। মনের মত বক্‌সিস ক'র্ব্বো।

(প্র, মোসাহেবের প্রবেশ)

প্র, মো। হুজুর সর্ব্বনাশ হয়েছে।

হায়। কি হলো?

প্র, মো। আর কি দেখ্‌ছেন, নুরন্নেহার কেমন ক'র্চ্ছে, বুঝি বাঁচেনা!

হায়। বটে? (এস্ত উঠিয়া)

প্র, মো। তার ভাব দেখে ভাল বোধ হ'চ্ছে না। (উভয়ের প্রস্থান)

(এবং জামাল কামাল ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সর্দ্দারগণ অপর দিক দিয়া বেগে পলায়ন।)

জামা। অদৃষ্টে কি জানি কি হয়? গতিক বড় ভাল বোধ হ'চ্ছে না।

(হাওয়ান আলী মোসাহেবদ্বয়ের সাহায্যে হাত পা ধরিয়া নুরন্নেহারকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

হায়। (মাটীতে রাখিয়া) যথার্থই কি মরে, না ওর সব মিছে? ও কিছুই নয়, ও একটা কাপ্ ক'রে রয়েছে!

দ্বি, মো। না, না, দেখুন যথার্থই গর্ভবতী ছিল! ঐ দেখুন তল পেট তোলা পাড় ক'র্চ্ছে!

হায়। (নিকটে যাইয়া বিস্ময়ে) যথার্থই গর্ভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তলপেট অত নড়ে কেন ?

নুর। (মৃদুস্বরে) হা খোদা ! আমার কপালে এই ছিল ? নারী কুলে জন্ম নিয়ে সতীত্ব রক্ষা ক'র্ত্তে পাল্লেম না ! হায় এই জন্মে কি আমার জন্ম হয়েছিল ? জ'ন্মেই কেন মরে গেলুম না ? তা হ'লে এত গঞ্জনা সইতে হতোনা। কুলেও খোঁটা হতোনা ! কি করি উপায় নাই, এদুঃখ কাকে জানাব ? এসময় প্রাণধন স্বামীর সঙ্গে দেখা হলো না ! মা বাপের মুখও দেখ্‌তে পেলেম না ! প্রতিবাসীরাও আমায় দেখ্‌তে পেলে না ! (দীর্ঘ নিশ্বাস) হা খোদা ! তোর মনে এই ছিল ? জমীদার হয়ে এমন কাজ ক'ল্লে ? ধর্ম্মের দিকে চাইলে না ! এত কষ্ট কি আর এক প্রাণে সয় ? হায় হায় এদের দমন-কর্ত্তা কি আর কেউ নেই ? এদের উপর কি আর হাকিম নেই ? হায় হায় জাত্‌ গেল, দেশ জুড়ে কলঙ্ক হলো, প্রাণও গেলো, সুদ্ধ আমার প্রাণই যে গেলো তা নয় ! পেটে যে একটা ছিল, তারও গেল ! খাঁ সাহেব ! আপনার মনে এই ছিল ? এই ক'ল্লেন ? খোদায় আপনার বিচার ক'র্ব্বেন ! শুনেছি, যে মহারাণী সকলের ওপরে বড়, সাএবদের ওপরেও বড়, আমরা যেমন তোমার প্রজা, তেমনি তুমিও তাঁর প্রজা ! তিনি কি এর বিচার ক'র্ব্বেন না ? প্রজার প্রজা ব'লে কি আর দয়া হবে না ? মা ! তুমি বেলাতে থাক, তোমার প্রজার প্রতি এত দৌরাত্ম্য হ'চ্ছে তুমি কি জান্তে পার্চ্ছোনা ? কেবল বড় বড় লোকই কি তোমার প্রজা ? আমরা গরিব ব'লে কি তুমি আমাদের মা হবে না ?—মা—আ—মার আ—মা—সয় না,—মা—মা—মা আমি মেয়ে দয়া—কর —মা—তো—পা—য় (মৃত্যু)

হায়। ওহে যথার্থই মে'লো ! (নিকটে যাইয়া নাসিকায় হাত দিয়া) নিশ্বাস নাই ! মরেছে, না ঐ যে তলপেট ন'ড়্‌ছে ! কৈ আর যে নড়ে না ! বুঝি পেটেরটাও মলো (বুকে হাত দিয়া) একবারে ঠাণ্ডা হয়েছে, আর নাই (কিঞ্চিত ভাবিয়া) এখন উপায় ? (প্র, মোসাহেবের প্রস্থান)

দ্বি, মো। আর উপায় ! তখনই তো ব'লেছিলাম, যা ক'র্ব্বেন আগে পাছে বিবেচনা ক'রে ক'র্ব্বেন ! এখন তো খুনের দায় ঠেক্‌তে হলো !

হায়। চুপ্‌ চুপ্‌ ! খুন খুন ক'রোনা ! যা হবার তা হলো, এখন কি করা যায় ? অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে, ব'সে ব'সে ভাব্‌লে আর কি হবে। রাত্‌ থাক্‌তে থাক্‌তেই এর একটা উপায় করা চাই।

ঘি, মো। আমার বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই নাই, আমি একবারে জ্ঞান শূন্য হয়েছি। যা আপনি ভাল বোঝেন করেন।

হায়। জামাল! তোমার বিবেচনা কি হয়?

জামা। আপনি যে হুকুম ক'র্বে'ন তাই কর্বো, এতে আর আমাদের বিবেচনা কি?

(প্র, মোসাহেব এবং নিম্নোল্লিখিত বেশে সিরাজ আলীর প্রবেশ।)

সিরা। আরে পাজিরে! এমন কাজ ক'ল্লি? একেবারে হাবু খাঁর নাম ডুবালি? তোর কি কাণ্ড জ্ঞান নাই? চির কালই কি তোর এই ভাবে গেল? লক্ষ্মীছাড়া! আর কি মর্‌বার জায়গা ছিলনা? এমন কাজ কি কর্ত্তে হয়? যত গোঁয়ার একঠাঁই জুটে এই কাজ ক'র্চ্ছে! এখন মুখে কথা নাই! তোর জন্যে সর্ব্বনাশ হবে! পূর্ব্ব পুরুষের নাম গেল, তুই কি একেবারেই পাগল হয়েচিস্? এখন আর কি ব'ল্‌বো? তোর এবুদ্ধি কে দিলে? (দ্বি, মোসাহেবের প্রতি) এখন মুখে কথা নাই, পাজিরা এখন যেন কেউ নয়! সর্ব্বনাশ ক'ল্লি! যুটে পেটে মজালি! রাগ আর বরদাস্ত হয় না—(দ্বি, মোসাহেবকে মুষ্ট্যাঘাত) তোরাই আমার সর্ব্বনাশ ক'ল্লি! তোদের কুপরামর্শেতেই হয়েছে!

দ্বি, মো। দোহাই আল্লার! কোরাণের কিরে! আপনার গা ছুঁয়ে ব'ল্‌তে পারি, আমি দফায় দফায় মানা করেছি, এমন কাজ ক'র্বে'ন না। তাকি উনি শুনেন, উনিনা একজন!

সিরা। জামাল, তোরাই আমার সর্ব্বনাশ কল্লি! তুই কি এই বদমাইসদের দলে মিশে গেছিস্?

জামা। কর্ত্তা আমি কি আর কর্বো? হুকুম কল্লে তো আর অন্তুল কর্ত্তে পারিনে!

সিরা। আর সকল বেটারা কোথা?

জামা। সকলেই পালিয়েছে!

সিরা। (উপবেশন এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হেঁট মুখে চিন্তা) হায়! এখন কি হবে? উপায়? বাঁচ্‌বার উপায় কি? এখন কি আর সে দিন আছে? এই হাতে কতকাণ্ড করেছি, কত জনের ওকর্ম্ম করেছি, সাবেক কাল্ হলে আর এত ভাব্‌তে হতো না। পাজিরা শোনও নাই? আমার বাপ্‌জী কক্কুর দিয়ে মানুষ খাইয়েছেন, আর আমরাও কত কি করেছি, এখন যে কেন চুপ ক'রে থাকি তাতো তোরা বুঝ্‌বিনে!

জামা। তা ব'লে আর কি হবে? এখন বাঁচ্‌বার পথ দেখা যাক্

সিরা। এক কাজ কর্‌রা যাক্‌, রাত্‌ শেষ হয়ে এল। আর কোন উপায়ই এখন হয় না। তবে সকলে হাতাহাতি ক'রে ধ'রে নিয়ে আবু মোল্লার বাড়ীর উত্তর দিকে খেজুর বাগানে ফেলে আসা যাক্‌! শেষে নসিবে যা থাকে তাই হবে। ভোর হলো—নেও, নেও, উঠ, উঠ, আর দেরি ক'রোনা।

দ্বি, মো। হুজুর যা ব'ল্লেন সেই ভাল। চল আর বিলম্ব ক'রে কাজ নাই। রাত ফর্সা হয়ে এলো (নেপথ্যে দুই বার কুক্কুট ধ্বনি) ঐ হয়েছে, আর রাত নাই, ধর ধর।

সিরা। জামাল ধর, সকলেই যাচ্ছে!

জামা। (কোমরে চাদর জড়াইতে জড়াইতে) তবে আর দেরি কর্‌রা নয়, ভোর হয়েছে, ঐ সেই পাগল বৈরাগী ব্যাটা গান গা'চ্ছে। (কামালের প্রতি) কামাল, ধর্‌ ভাই, একটা মেয়ে মানুষকে নে যেতে আবার আর কেউ কেন ?—আমরা থাকৃতে বাবুরা হাত দেবেন!

(জামাল ও কামাল কর্ত্তৃক শব লইয়া গমন। পশ্চাতে পশ্চাতে অধোমুখে সকলের প্রস্থান)

(পটক্ষেপণ)

(নেপথ্যে গান)

রাগিণী ললিত—তাল জলদ্‌ তেতালা।

চেতরে চেতরে চিত! এই তো দিন্‌ ঘুনায়ে এলো।
সারা নিশি ঘুমাইলে আর কত ঘুমাবে বল ॥
মায়াবিনী এই নিশি, আসল্‌ ঘুম্‌ পাড়ানী মাসী,
ভোগা দিয়ে সর্ব্বনাশী
সার কথাটী ভুলিয়ে দিল!
শিষ্ট যারা নিশিযোগে, রয় কি তারা নিদ্রাযোগে ?
মন্‌ রেখে সেই পদ-যুগে,
যোগে ম'জে জেগেছিল।
দুষ্ট লোকে রেতের বেলা, ঠিক্‌ যেন হয় কলির চেলা,
কেউ চুরি, কেউ কামের খেলা,
খুন্‌ ক্‌'রে কেউ লুকাইল!

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আবু মোল্লার খেজুর বাগান।

(কনষ্টেবলদ্বয় নুরন্নেহারের শবের পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

প্র, কন। বাবু যে এতক্ষণও আস্‌ছেন্ না?

দ্বি, কন। উট্‌তে পাল্লে তো আস্‌বেন।

প্র, কন। সে তো আর নতুন নয়।

দ্বি, কন। তাতে কি আর নতুন পুরণ আছে, বেশী মাত্রা হলেই দিন কাবার! আবার যে লক্ষ্মী কাঁদে ভর ক'রেছেন তিনি তো— জানই আর কি!

(কা'স্তে বগলে তামাকু টানিতে টানিতে দুই চাষার প্রবেশ)

প্র, চা। এ গাঁয় আর বাস্তব্বি হয় না। গেল নাত্তিরে ধ'রে নিয়ে এই কাণ্ডটা করেছে।—জমীদার বহুৎ আছে, অনেক জমীদারের নামও শুনিছি। এরা যেমন বাবা!

দ্বি, চা। মামুজি, কি নকমে মাল্লে?

প্র, চা। আমি কি দেখ্‌তে গিছি?

দ্বি, চা। বুঝিছি, বুঝিছি, ও বেটা বড় সয়তান্। বন্দুক হাতে ক'রে ঠিক সাঁজের ব্যালা আমাগার বাড়ীর পাছ কাণাছে ঘুরেই বেড়ায়, ঘুরেই বেড়ায়। পাজ্ দুয়র দে বাড়ীর মদ্দিও আসে, বেটার চা'ল্ চলন বড় খারাপ। মামুজি তুমি শোননি, ঐ সেই দহিন্ পাড়ার জোলা বড় হাক্‌মত ক'রে ব'লেহ্যাল। উনি তো তার মেয়াকে দেখে বাড়ীর সাম্‌নেই ঘোরেন্, যে ব'ল্লো হুজুর! দিনে মুনিব বলে মান্‌বো, না'ত্তিরে অজায়গায় দেখ্‌লি আর হাকিম ব'লে স্যাত্ ক'র্ব্বো না। (ইনস্পেক্টরের সহিত আবু মোল্লার প্রবেশ) ও মামুজি ঐ সাএব (পলাইতে উদ্যত)

ইনি। খাড়া রাও, কাঁহা যাতা হায়?

প্র, চা। (হুঁকা ফেলিয়া কর-যোড়ে) কর্ত্তা! আমরা কিছু জানিনে।

ইনি। (শবের নিকটে যাইয়া) এ মেয়ে নোকটী কে? কি হয়েছে? এ রকমে এখানে প'ড়ে কেন?

প্র, চা। ম'রে গেছে, শুনিছি খুন হয়েছে।

আবু। ধর্ম্মাবতার আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার মাথায় বাড়ী হয়েছে। হুজুর আমার জাত-কুল-মান সকলি গেল (সক্রন্দনে) হায় আমার কি হবে ?

ইনি। (কনষ্টেবলের প্রতি) তোমরা কি অবস্থায় দেখেছ ?

প্র, কন। এই ভাবেই দেখিছি।

ইনি। লাস্ উল্টাও।

প্র, কন। (ঐরূপ করিয়া) এই তো দাগ জখম দেখ্‌ছি।

ইনি। কোথায় কোথায় দাগ জখম আছে দেখ।

প্র, কন। হুজুর এই পীটে, পাঁজরে, গালে দাগ দেখা যাচ্ছে। আর অধোদেশ ফুলো আর থান থান রক্ত !

আবু। হায় হায় ! আমার অদৃষ্টে এই ছিল ? (কপালে আঘাত করিয়া) হায় ! খোদায় এই ক'রে এই দেখালে।

ইনি। দুজন কুলি বোলাও।

প্র, কন। ঐ দুই বেটাকেই ডাকি।

ইনি। আচ্ছা লে আও। ডাক্তার সাহেবের কাছে লাস পাঠাতে হবে।

প্র, কন। (দুই চাষাকে ধৃতকরণ) তোদের লাস নে জেলায় যেতে হবে।

প্র, চা। কর্ত্তা আমরা মোসলমান, মরা মানুষ ছুঁতে পর্ব্বোনা।

দ্বি, চা। আমাদের জাত্ যাবে, আমিও পার্ব্বোনা।

প্র, কন। কি ? পার্ব্বিনে, পার্ত্তেই হবে (ঘাড় ধরিয়া) শালা পার্ব্বিনে, উঠাও লাস উঠাও।

দ্বি, চা। না বাবা ! মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল, আমরা পার্ব্বোনা। আমাদের জাত্ যাবে। এ কাম আমাদের নয়।

প্র, কন। (মুষ্ট্যাঘাত করিয়া) নে বাঞ্চত লাস নে।

দ্বি, চা। এই নিচ্ছি (চাষাদ্বয় লাস লইয়া প্রস্থান।)

ইনি। জমীদারের পক্ষের লোক কোথায় ?

প্র, কন। হুজুর ! তারা ভয়ে আপনার কাছে আস্‌ছেনা। গ্রামে আছে— চলুন।

ইনি। আচ্ছা চল—[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিলাসপুর

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারি।

(মাজিষ্ট্রেট, কোর্টইনিস্পেক্টর, কয়েকজন আসামী, আবুমোল্লা, এবং উকীল মোক্তার দর্শকগণ আরদালী প্রভৃতি উপস্থিত)

মাজি। নেই আমি আর সাক্ষী চাইনে।

কোর্ট, ইঃ। (নিকট যাইয়া) আসামীদের পক্ষের আর কয়েকজন সাক্ষী উপস্থিত আছে।

মাজি। নেই, সাবুদ হুয়া (ফরিয়াদীর মোক্তারের প্রতি) টোম্‌রা কুচ সওয়াল হায় ?

মোক্তা। ধর্ম্মাবতার ! (গাত্রোত্থান)

উকি। (আসামীর পক্ষে) ধর্ম্মাবতার—

মাজি। ও হ'টে পারেনা, টুমি আসামীর পক্ষে আছে, টোমার বক্তৃটা শেষে হ'টে পারে। (বাদীর মোক্তারের প্রতি) টোমার আর কি আছ ?

মোক্তা। (স্কন্ধের চাদর বারে বারে নাড়িয়া এবং মোচে তা দিয়া) ধর্ম্মাবতার ! এই মকর্দ্দমা বাদী আবুমোল্লা প্রজা। আসামী হায়-ওয়ান আলী জমীদার। প্রজা মোল্লার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনা, বলাৎকার করিতে থাকা ও তদ্‌হেতু মিত্যু হওয়ার প্রমাণ হইয়াছে। আর সেই জমীদার, জমীদার, সেই জমীদার আসামী আর কয়েক জন আসামীকে সঙ্গে করিয়া প্রাণ ভয়ে কোথায় পালিয়েছে তার সন্ধান মাত্র নাই। ইহাতে পষ্ট জানা যাইতেছে যে আসামীগণ সম্পূর্ণ রূপে দোষী ও অপরাধী। ধর্ম্মাবতার ! খোদাবন্দ ! হায়ওয়ান আলী (থু থু ফেলিয়া থুবড়ি) হায়ওয়ান আলী খাঁ জমীদার। মপস্বলে প্রজার হর্ত্তা কর্ত্তা মালিক জমীদার। তাদের আদালত ফৌজদারী জমীদারই নিস্পত্য করিয়া থাকে—প্রজার পরস্পর বিবাদ নিস্পত্য হ'ক্ বা নাহক্ আপন নজরের টাকা হ'লেই হ'লো। প্রজারা

শাসন ভয়ে মুখে কথা নাই, জমীদার যা বলেন্ কোন মতেই তার অবাধ্যি হ'তে পারে না। জমীদারের অজানিতে কোন মতেই প্রজা বিচারের প্রার্থনায় আদালত আশ্রয় করিলে তখন জমীদার একেবারে অগ্নি-মূর্ত্তি হয়ে তার ভিটে মাটি একেবারে জালিয়ে ছার খার করে। আর ইহাও অপ্রকাশ নয় যে—

মাজি। চুপ চুপ আসল কথা বল—

মোক্তা। খোদাবন্দ ধর্ম্মাবতার এই মোকদ্দমায় জমীদার স্বয়ং আসামী সুতরাং প্রমাণ হওয়াই দায়। তবে যে হুজুর এতদূর হয়েছে সে কেবল সত্যি ঘটনা ব'লেই হয়েছে, নতুবা গরিবের সাধ্যি কি যে মোকদ্দমা করে। হায়ওয়ান আলী যে চরিত্রের লোক তার প্রমাণ এই দেখুন—(রায় দর্শন) ইতিপূর্ব্বে সাহেব জাদা হাকিমের আমলে এক হিন্দু স্ত্রীকে জবরাণে ধরিয়া এনে সতীত্ব হরণ করেন। ঐ প্রকার কত কুলবালার সতিত্ব নাশ করেছেন ধ্বংস করেছেন নষ্ট করেছেন মাথা খেয়েছেন জাত্ পাত করেছেন সে আমি বল্‌তে চাইনে। ধর্ম্মাবতার ওদের নিষ্ঠুরতার বিষয় কত প্রমাণ আছে। প্রধান প্রধান হাকিমের রায়েতে প্রকাশ আছে। (উপবেশন)

উকী। ধর্ম্মাবতার মোক্তার মহাশয় যে এতক্ষণ পর্য্যন্ত ব'লে' গেলেন এ মোকদ্দমার সম্বন্ধে কি ব'লেছেন, কিছুই বলেন্ নাই। জমীদার এমন করে—জমীদার প্রজার প্রতি দৌরাত্ম করে—জমীদার প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করে—সে কথা এ মোকদ্দমায় কিছুমাত্র সংশ্রব নাই, হায়ওয়ান আলী এ মোকদ্দমায় কি করিয়া দোষী হইতে পারে,—তিনি অতি ধনবান্, বিশেষতঃ বিচক্ষণ ধর্ম্মপরায়ণ, বয়স এ পর্য্যন্ত ৪০ বৎসর হয় নাই। তার দ্বারা এমন কাজ হওয়া কখনই সম্ভব হয় না। কেবল মনোবাদ সাধন জন্য এই মিথ্যা নালীশ উপস্থিত হয়েছে। কোন সাক্ষীতেই এমন স্পষ্ট প্রমাণ দেয় নাই, যে আমার মক্কেল নূরন্নেহার আওরতকে জবরাণ বলাৎকার করেছেন, আর সেই বলাৎকারে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়েছে, ফরিয়াদি আবুমোল্লা বড় ফেরেব বাজ।

আবু। (গলবস্ত্রে অগ্রসর হইয়া) ধর্ম্মাবতার আমি নিতান্ত গরিব, আমার সাধ্য কি যে জমীদারের নামে মিছে মোকদ্দমা করি ? হুজুর সে—

মাজি। চুপ্ চুপ্ (কোর্ট সবইনিস্পেক্টরের প্রতি) দারগার রিপোর্ট পড়।

কোর্ট ইঃ। (রিপোর্ট-পাঠ আরম্ভ) ফরিয়াদীর স্ত্রী নূরন্নেহার আওরতের মৃতদেহ দৃষ্টে ও সাক্ষী হাযছায়াগণের বাচনিক জোবানবন্দীতে ও তমিজদ্দীন আসামীর স্বীকৃত জওয়াবের মর্ম্মে ও তাহার সন্ধানে বাদীর বাস স্থান গ্রামের তালুকদার ১ নং আসামী হায়ওয়ান আলী ও তস্য ভ্রাতা সিরাজ আলীর সহিত ঐ গ্রামের আংশিক তালুকদার কাতল মারিয়া নিবাসী লালবিহারী সাহার জমা জমী লইয়া বিবাদ ও মনবাদ হওয়ায় ছায়েল মজকুর ঐ খাঁদিগের আশ্রিত লোক থাকিয়া এদানিক তাহাদের অসম্মতিতে সাহাদের অনুগত ও বাধ্য হওয়ায় হাওয়ান আলী অতি লম্পট ও দুষ্ট স্বভাবের মনুষ্য বিশেষ উক্ত মনোবাদে বাদীকে নির্যাতন ও স্বীয় কুপ্রবৃত্তির সাধন জন্য আপন চাকর ও বাধ্যানুগত ২ হইতে ১৮ নং প্রতিবাদীগণের সহিত জোট বদ্ধ হইয়া অমুক তারিখে অধিক রাত্রে ফরিয়াদীর প্রতিবাদী ২ নং আসামী বাটীর নিকটে থাকিয়া ছায়েলের স্ত্রী প্রস্রাব করার জন্য ঘর হইতে বাহির হইলে তাহাকে বল পূর্ব্বক ধৃত করিলে ঐ স্ত্রী সোর করাতে বাদী প্রভৃতি বাহির হইয়া সোর করায় তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন দ্বারা হটাইয়া স্ত্রী মজকুরার মুখাদি বন্দ করিয়া হতাসাঙ্গে শূন্য ভাবে আপন বাহির বাটীর পূর্ব্ব দ্বারি বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে লইয়া মুখ বদ্ধ করিয়া বলাৎকার করার ও নানা মত অত্যাচার করিয়া কষ্ট দিয়া হত্যা করা স্পষ্ট প্রমাণ ও প্রকাশ পাইলেক যে ২ নং হইতে ১০ নং আসামীগণ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধি আইনের ৩৫২।৩৫৪।৩০২।৩৭৬ ধারার অপরাধ ক্রমে ধৃত হইয়া ইত্যগ্রে ফৌজদারি আদালতে চালান হইয়াছে ১ নং প্রধান আসামী ও ১১ হইতে ১৮ নং আসামীগণ বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করায় অনেক তালাসে এ যাবত তাহাদিগকে প্রাপ্ত না হইয়া স্থানে স্থানে সন্ধানী লোক প্রেরণ করত ধৃত করার পক্ষে যথোচিত চেষ্টা থাকিয়া (এ) ফারাম সহ আবশ্যকীয় সাক্ষীগণকে হুজুরে পাঠানো হইল। আর সিরাজ আলী মজকুর অপরাধী দ্বারায় বাদীর স্ত্রীর মৃত দেহ বাগানে ফেলিয়া রাখা অর্থাৎ দণ্ড বিধি আইনের ২০২ ধারার অপরাধ করা প্রকাশ ও সে জন্য জামানত

থাকাতে তাহার গ্রেপ্তারি ওয়ারেণ্ট প্রচার হওয়ার জন্য কোর্ট ইনিস্পেক্টর মহাশয় দ্বারা প্রার্থনা করিয়া বিদিতার্থ নিবেদিলেক হুজুর মালিক নিবেদন ইতি। সন তারিখ মাস

মাজি। ডাক্তার সাহেবের সার্টিফিকেট কোথায় ?

কোর্ট ইঃ। নথিতেই আছে।

মাজি। (নথি উল্টাইয়া দেখন, কিছু কাল পরে রায় লিখিতে আরম্ভ এবং কোর্ট ইনিস্পেক্টর দ্বারা পাঠ)

কোর্ট ইঃ। হুকুম হইল যে গরহাজিরা আসামীগণের নামে ওয়ারিন করিয়া গ্রেপ্তার হয় আর হাজিরা চালানী আসামীগণকে দায়রা সোপর্দ্দ করা গেল। সন তারিখ মাস।

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অংক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিলাসপুর জেলার সেসন আদালত।

(দায়রার বিচার।)

(জজ উকীল বারিষ্টার—আসামী সাক্ষী পেস্কার আরদালী জুরীগণ ও দর্শকগণ)

পেস্কা। (জজের নিকটে গিয়া) হুজুর জুরির সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই, এক জন গরহাজির।

জজ। দেখে আস্তে পার।

পেস্কা। (দর্শকগণ মধ্যে এক জনকে সঙ্কেতে ডাকন) আপনি এদিকে আসুন।

দর্শ। (নিকটে যাইয়া) বলুন।

পেস্কা। আপনি জুরি হ'তে পারেন ?

জজ। আপনি কে আছে ?

দর্শ। খোদাবন্দ—আমি—আমি (যোড়হাত) না না খোদাবন্দ কিছু কসুর নাই আমি জলপান খাচ্ছি (বস্ত্র হইতে চিড়ে মুড়্‌কি পতন)

জজ। নেই টোমার জুরি হ'তে হবে।

দর্প। দোহাই ধর্ম্মাবতার আমার কোন কসুর নাই আমি কিছু ঘা'ট করি নাই, আমি কোষ্টা কিন্তে যাচ্ছি। পথে শুন্‌লেম যে আবুমোল্লার বৌয়ের খুনি বিচার হ'চ্ছে। হুজুর! আমি তাই দেখ্‌তে এয়েছি। ধর্ম্মবতার! ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, আমি আর কিছু জানিনে হুজুর! দোহাই ধর্ম্ম—

জজ। নেই নেই হাম টোমাকো জুরি করেগা। টোমারা ক্যা নাম? (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শিশ দিয়া তুড়ি এবং ভঙ্গি করিয়া নৃত্য)

দর্প। (সক্রন্দনে) হুজুর দেশের মালিক, যা মনে করেন, তাই ক'র্ত্তে পারেন, কিন্তু আমি কিছুই জানি না।

জজ। (ব্যঙ্গভঙ্গিতে) তোমরা নাম ক্যা হায়?

দর্প। আরজান বেপারি হুজুর! খোদাবন্দ—

জজ। টোম্ ঐ চেয়ার মে বয়ঠো।

আর। (বেগে পলায়নোদ্যত)

জজ। পাকোড় পাকোড়। (আরদালী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া চেয়ারে বসান)

আর। (চেয়ারের এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া) হুজুর! আমি কিছু জানি না, সকলকে জিজ্ঞাসা করুন আমি কিছু জানি না।

জজ। চুপরাও।

আর। এই বারই গেলুম। (নিস্তব্ধ)

(বিচার আরম্ভ।)

পেস্কা। (জজ সাহেবের নিকট করযোড়ে) হুজুর ছাপাই সাক্ষী আরো দুজন আছে।

জজ। লে আও?

পেস্কা। (আরদালীর প্রতি) জিতু মোল্লা সাক্ষীকে ডাক।

(আদালতের রিতীমতে আরদালীর দ্বারা তিনবার ফোকরানো।)

(ঢিলে পা জামা, শাদা চাপকান পরা, মাথায় পাকড়ি, তস্‌বি গলায়, হাতে যষ্টি, বৃদ্ধ জিতুমোল্লার প্রবেশ ও হলফ পাঠ)

জিতু। আমার নাম জিতু মোল্লা, বাপের নাম ফোতু মোল্লা, বয়েস ৬০।৭০ বৎসর, মোল্লাকি ব্যবসা।

জজ। মোল্লাকি কি ?

জিতু। কোরাণ প'ড়ে আমার মুরিদকে শোনাই, তুটো আহেয়র কথা কৈ যাতে দিন তুনিয়ার ভালই হবে ! বিয়ে সাদীর কলমা পড়াই, মানিক পিরের সিন্নি ফয়তা দেই, আর মুরগী জবাই করি। হুজুর ! এই সকল কাজ আমার—

বারি। (গাত্রোত্থান করিয়া) টুমি এ মকর্দ্দমার কি জানে ?

জিতু। হুজুর আমি আবু মোল্লার কুটুম। যে দিন এই মামলার বাত কতেছে, আমি সে দিন আবুমোল্লার খানকা ঘরে ব'সে সারারাত আল্লা আল্লা করে জেহীর করেছি, নামাজ পড়েছি। আমি রাত্রে ঘুম পাড়ি না।

জজ। টুমি ঘুম পাড়োনা তবে কি কর ?

জিতু। সারা রাত জেগে আল্লার কাছে রোনা পিটনা করি।

বারি। নেই ওবাত নেই, টুম কুচ্ গোলমাল শোনা হ্যায় ?

পেস্কা। হাকিম জিজ্ঞাসা কর্চ্ছেন সে রাত্রে তুমি কোন গোলমাল শুনেছিলে ?

জিতু। সে রাত্রে কোন গোল হয় নাই। এ সকল কেবল মিছে ক'রে আবু মোল্লা এদের বাদিয়েছে।

বারি। টুম মক্কামে গেয়া ?

জিতু। জোনাব ! গেছ্‌লাম। আমি চার বার অজ করেছি।

বারি। মোল্লার জরু কি রকমে মরেছে টুমি তার কিছু জানে ?

জিতু। জান্‌বোনা ক্যা ? আবুই মার্‌তে মার্‌তে এহেবারে খুন করেছে।

বারি। আবু কেঁও মারা ?

জিতু। ও নাহি কার সঙ্গে কথা কৈল।

বারি। হায়ওয়ান আলী কেমন লোক আছে—

জিতু। (তসবি কপাল চুল্‌কাইয়া মাথা নাড়িয়া) আহা অমন লোক তুনিয়া জাহানে আর নাই ! বড় দিনদার, বড় দাতা ; মক্কায় যাইবার সময় আমায় পঞ্চাশটী টাহা দেয়।

বারি। হায়ওয়ান আলী নুরন্নেহারকে মারিয়াছে ?

জিতু। (তুই গালে হাত দিয়া) তোবা তোবা তোবা ! সে কি এমন কাজ ক'র্ত্তে পারে তা কহনো হবার নয়।

[১২৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পাবনার বিদ্রোহীদের সপক্ষে

রমেশচন্দ্র দত্ত

পাবনার সাম্প্রতিক অভ্যুত্থানে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল যা আমাদের সমসাময়িক অধিকাংশের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে এবং এই প্রবন্ধে সে-বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

খুবই দুঃখের কথা, সম্ভবত আশ্চর্যের কথা নয়, বাঙলার প্রধান সংবাদপত্রগুলি এই প্রশ্নে সম্পূর্ণ একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে এবং পাবনার রায়তদের কার্যকলাপকে অবাধে নিন্দা করেছে। কয়েক সপ্তাহ পরে হাঙ্গামাকারীদের কার্যকলাপের অতিরঞ্জিত বিবরণ ছাড়া আমরা কিছু জানতে পারিনি। কলকাতায় ভাড়াকরা পলাতক জমিদাররা অথবা পাবনা থেকে লাঞ্ছিত জমিদারদের লেখা চিঠিপত্র সংবাদপত্রগুলির ওপর এই একতরফা প্রতিনিধিত্বের দ্বারা প্রভাববিস্তারে ব্যর্থ হয়নি এবং ইতিমধ্যেই যাকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছিল ভয় তার ওপর আর একমাত্রা রঙ চড়িয়ে দিল, আর সে-রঙের প্রলেপে আমরা জানতে পারলাম যে ডাকাতি, নরহত্যা এবং ধর্ষণ নাকি দৈনন্দিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এখন অবশ্য সন্তোষজনকভাবেই নির্ধারিত হয়েছে যে হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমই ছিল এবং যাও বা ঘটেছে তার অধিকাংশই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কয়েকজন বদমাশের কুমতলব হাসিল করা মাত্র। একথা ঠিকই যে এসব কিছু সত্ত্বেও অস্বীকার করা যাবে না যে রায়তরা কিছু বে-আইনী এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্যও দায়ী ছিল। এবং অন্য কেউ ঐসব কার্যকলাপের জন্য আমাদের মতো এতখানি দুঃখিত নয়, কারণ এগুলির ফলে তারা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কারণ একটি যোগ্য সরকারও এ-ধরনের কার্যকলাপকে অতিক্রান্ত তিরস্কৃত করতে ব্যর্থ হয়নি।

তবে যাঁরা এই কাজকে ভীষণ ভাবে নিন্দা করেন তাঁদের মনে রাখা উচিত যে পাবনার বিদ্রোহের মতো অভ্যুত্থান কচিৎ হিংসাত্মক কাজ ছাড়া এবং কোনোরূপ প্রতিশোধ ব্যতীত নিষ্পন্ন হয়। এ-ক্ষেত্রে এ-হলো নিপীড়নেরই

প্রতিফল। আঘাতের যে-চাপ প্রত্যাঘাতের জন্ম দেয়, তাও আঘাতের অনুপাতেই প্রত্যাঘাত করে। এবং এই প্রত্যাঘাত কাউকে ধাক্কা না দিয়ে প্রায়ই নিঃশেষিত হয় না। ইতিহাস এই শিক্ষা দেয় যে বৈপ্লবিক রক্তস্নানেই সম্রাটের অকথ্য পীড়ন এবং নিষ্ঠুরতার প্রায়শ্চিত্ত ঘটে। সেই চণ্ড আঘাতের মুহূর্তে একটা গোটা মহাদেশের ভিত পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়, যদিও এ-ধরনের উদাহরণ খুবই সামান্য আছে, তবুও চাপের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য এমন কোনো অভ্যুত্থানের লিখিত উদাহরণ নেই যেখানে প্রকৃতির এই নিয়ম পরীক্ষিত হয়নি ; যেখানে প্রত্যাঘাত কোনো না কোনো ধরনের হিংসা দিয়ে অথবা আপনারা যদি বলতে চান তবে, অপরাধ দিয়ে, কার্যকর হয়নি। পাবনার রায়তদের ক্ষমতার তুঙ্গ মুহূর্তে লোভ সামলানো সম্ভব ছিল না। ঐ একই পরিস্থিতির মধ্যে কোনো শ্রেণীর পক্ষেই বলপ্রয়োগের লোভ সামলানো কঠিন। এজন্য এলোপাথাড়ি তাদের নিন্দা করতে আমরা প্রস্তুত নই।

"……কিন্তু দলে দলে
গুহাবাসী ছিল যারা বন্দী, অত্যাচারে, অন্ধকারে,
দিবসলালিত তারা ঈগলের মতো নয় বলে
অবাক হইনা, যদি ভ্রান্তি ঘটে চিনতে শিকারে।"

সমগ্র একটি জেলা জুড়ে বিশেষ করে বাঙলার শান্ত স্বভাবের কৃষকদের মধ্যে জনগণের এই ব্যাপক অভ্যুত্থান, নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট ঘটনা। এদেশে সামন্ত প্রধানদের, ধর্মগোষ্ঠীগুলির, ধর্মোন্মাদদের, বিদ্রোহীদের অভ্যুত্থান হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃষক চরিত্রের বিদ্রোহের ঘটনার উদাহরণ অতীতকালে অতি অল্পই আছে। তবুও গত ১০ অথবা ১৫ বছরের ব্যবধানে এরকম দুটি উদাহরণ আমাদের কাছে আছে, যথা নদীয়ার নীল বিদ্রোহ এবং সম্প্রতিকালের পাবনার খাজনা বিদ্রোহ। বৃটিশ সরকারের অধীনে এই বিদ্রোহগুলি কেন ঘটছে তার কারণ অনুসন্ধান সম্ভবত ব্যর্থ প্রয়াস হবে না। আপাত দৃষ্টিতে অসত্য এবং বিকৃত বলে আমাদের অভিমতকে চাপা দেওয়া হতে পারে, তবু তার ঝুঁকি নিয়েও সাহসের সঙ্গে একথা জোর দিয়ে বলব যে ঐ ঘটনাগুলির মধ্যে আমরা শুভদিনের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি ; বাঙলার কোটি কোটি জনসাধারণের কাছে উন্নত প্রশাসন ব্যবস্থার সার কথাটি সম্পূর্ণভাবে যে হারিয়ে যায়নি ঐ ঘটনাবলীর মধ্যে তার প্রমাণ পাচ্ছি। বৃটিশ সরকার তার সমদর্শিতার এবং যখন যেখানেই দেখা গেছে সেখানেই অত্যাচার খর্ব করার নীতির দ্বারা ইতোমধ্যেই

বাঙলার কৃষককে চিন্তা ও কর্মের সেই পীড়াদায়ক দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে যে-শৃঙ্খলে তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী আবদ্ধ ছিল এবং যার ফলে তাদের পক্ষে কোনো কর্মসাধন অসম্ভব ছিল; ইতোমধ্যেই এই ঘটনা ওদের আত্মবিশ্বাস অর্জনে অনুপ্রাণিত করেছে এবং তাদের কিছু মাত্রায় আশ্বাস দিয়েছে যা তাদের অজানা ছিল। শত শত বছর ধরে কৃষকরা বাঙলার জমিদারদের সম্পূর্ণ অধীনস্থ আছে। মুসলমান শাসনের শেষভাগে বাঙলার প্রশাসন ব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে সেই সময়ের জমিদাররা তাঁদের অধীনস্থ জনগণের সর্বোচ্চ শাসক ছিলেন। কার্যত এঁরা ছিলেন ছোটখাটো সামন্ত প্রধান। সুবেদারদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল খাজনা দেওয়ার। এদের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে কেউ কখনও হস্তক্ষেপ করত না। এঁরা যখন অত্যাচারী হতে চাইতেন, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিকার ছিল না। ঐ ধরনের পরিস্থিতিতে যদি দেখা যায় কৃষকরা সমস্ত উদ্যম হারিয়ে ফেলেছে, প্রতিরোধের সব আশা নিঃশেষ হয়ে গেছে—তবে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। এক এক সময় আসে যখন প্রতিরোধ হয় অর্থহীন; কোনো কর্মতৎপরতা হয় অসম্ভব, জোটবাঁধা হয় অপরাধ—তখন নিঃশব্দ দাসত্ব-বরণই হয় স্বাভাবিক এবং তা স্থায়ী অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। আমরা স্বীকার করছি, লক্ষ লক্ষ বাঙালি যে তাদের পূর্বপুরুষদের শান্ত স্বভাব বজায় রেখে অন্তত অলসতা থেকে মুক্ত হচ্ছে এবং তারা এখনও জরুরি প্রয়োজনে এ্যাকশনের উপযুক্ত আছে এর প্রমাণ দেখে আমরা খুশীই হয়েছি। বাঙলার রায়তদের চেতনার মধ্যে এই স্বাস্থ্যকর আঙ্গিকের বিকাশের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব হলো বাঙলায় বৃটিশ সরকারের নীতির। সে-নীতি তার ছায়ায় কোনো অত্যাচারী শ্রেণীকে স্বীকার করে না—আমরা যখন একথা বলি—আমরা বিশ্বাস করি একটি সহজ সত্য কথাই বলছি।

জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকরাও ঐ একই কারণে এই পরিবর্তন হয়েছে মনে করেন, কিন্তু তাঁরা এর চরিত্র সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন কিংবা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরা এ-বিষয়ে আমাদের সঙ্গে একমত যে পূর্বে রায়তদের পক্ষ থেকে প্রকাশ্য প্রতিরোধের অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু আমরা যেমন এই ঘটনার মধ্যে রায়তদের মনোভাবের সঙ্গে একমত, ওঁরা তখন একে বৃটিশ সরকারের লালনে পুষ্ট জমিদার ও রায়তদের মধ্যে শত্রুতার চিহ্ন হিসাবে দেখেন। ওঁরা প্রশ্ন করেন, জমিদারদের সঙ্গে তুচ্ছতম কারণে মনোমালিন্য হলে দেওয়ানী আদালতে

ছোটার কথা রায়তদের কে শেখাল! কেই বা তাকে শেখাল — তার প্রভু গোমস্তা বা নায়েবকে সামান্যতম অত্যাচারের অপরাধে ফৌজদারী আদালতে টেনে নিয়ে যেতে? এ-কাজ বৃটিশ সরকারের আর তার পিনাল কোড এবং ১৮৫৯ সালের দশম আইনের। এই আইনগুলি বলবৎ হওয়ার পূর্বে জমিদার ও রায়তদের মধ্যে কোনো শত্রুতার সম্পর্ক ছিল না; (তাদের কথায়) সব কিছু শান্ত এবং ঠাণ্ডা ছিল। হয়তো তাই ছিল; তবে তা হলো মরুভূমির নিস্তব্ধতা এবং মৃত্যুর প্রশান্তি। কোনো প্রকাশ্য বিরোধ ছিল না, কারণ বিরোধ হলো একটা এ্যাকশন এবং এ্যাকশন করা ছিল অসম্ভব। দাসত্ব—নীরব ও গুঞ্জনহীন বাক্যহীন দাসত্বই ছিল সে-দিনের নিয়ম। আর সেই নিয়ম যথোচিত পালিত হতো। অত্যাচারের প্রতিরোধ হতো না, নিপীড়ন আর্তনাদ তুলত না। বৃটিশ সরকারের দোষ এবং অপরাধ হলো রায়তদের হাতে প্রচারের একটা উপায়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া, সম্ভবত নির্মম অত্যাচারের বিরোধিতার জন্যই — আর এইটাই জমিদারদের সংবাদপত্রকে এবং তথাকথিত জনমতকে অসন্তুষ্ট করেছে।

আমরা আমাদের পাঠকদের স্বচ্ছ অভিমত চাই যে, মাঝে মাঝে বিভেদ সহ দুই শ্রেণীকে সমানভাবে দেখার এই প্রয়াস কি এক শ্রেণীর অধীনে অন্য শ্রেণীর স্থায়ী এবং নীরব দাসত্বের তুলনায় সর্ব ক্ষেত্রে কাম্য নয়? আমরা আশা করি যে আমাদের ভুল বোঝা হবে না। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, যে-পরিস্থিতিতে ঐ বিদ্রোহ ঘটেছে সেজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। আমরা বলতে চাই, পরিস্থিতি যখন এ-ধরনের তখন অন্ধকারে তাকে নিভৃতে দমন করার চেয়ে ঐধরনের বিস্ফোরণের মাধ্যমে তা আলোতে আসাই ভালো। অতএব দেশের প্রত্যেকটি শুভাকাঙ্ক্ষী যেন পেনাল কোড বা আইন ১০ প্রত্যাহার করিয়ে ঐ ধরনের বিদ্রোহকে অসম্ভব করে না তুলে যে-পরিস্থিতিতে ঐ রূপ বিদ্রোহের প্রয়োজন হয় তার কারণগুলি দূর করার চেষ্টা করেন। সেই কারণ ও পরিস্থিতিগুলি কি কি? সুখের কথা, সরকারীভাবে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে, অতএব এই বিষয়ে অন্য কোনো অভিমত থাকতে পারে না। পাবনার, সিরাজগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ নোলান বলেন, "বিবাদের প্রকৃত উৎস হলো, এসাফশাহি পরগণায় প্রায়ই খাজনা বৃদ্ধি এবং বে-আইনী আদায়।" ঐ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টেলর বলেন, "এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে নাটোরের রাজার আমলে খাজনা খুবই কম ছিল, এবং রায়তরা একথা খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বলে যে তারপর থেকে আইনসম্মতভাবে কোনো খাজনা বৃদ্ধি

হয়নি। অবশ্য জমিদাররা আবওয়াব আদায় করে থাকে এবং এ-জিনিস বহু বৎসর যাবৎ চলে আসছে, ফলে আদায়ের কতটা খাজনা এবং কতটা বে-আইনী আদায় তা এখন মোটেই স্পষ্ট নয়। এমন হতে পারে জমিদাররা এই ধরনের সেস-এর কিছু অংশকে এতাবৎকাল বাস্তবে বর্ধিত খাজনা রূপে গণ্য করে আসছে এবং রায়তদের কাছে তাদের দেওয়া রসিদে ও খাতাপত্রে তা ঐভাবে দেখানো আছে। রায়তদের বক্তব্য এই যে তারা কখনও ঐ বাড়তি আদায়কে খাজনার রূপে দিতে সম্মত হয়নি, অস্থায়ী আবওয়াব হিসেবে দিতে স্বীকৃত হয়েছিল এবং মালিকদের সঙ্গে সদ্ভাব থাকার জন্য তারা এতদিন তা বিনা প্রতিবাদে দিচ্ছিল। জমিদারদের বে-আইনী আদায় সম্পর্কে সাম্প্রতিক তদন্ত এবং এই জেলায় রোড-সেস আইনের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা থেকে জমিদাররা তাদের অধস্তন প্রজাদের কাছ থেকে লিখিত নিয়োগপত্র হাতে রাখার প্রয়োজন অনুভব করে। ব্যানার্জি পরিবার তাদের রায়তদের অনেককেই কবুলিয়ত সম্পাদনে রাজী করার পরে রায়তরা আবিষ্কার করে যে কবুলিয়তের শর্তগুলি রায়তদের পক্ষে গুরুতর ক্ষতিকারক, যদি এই আবিষ্কার না হতো তবে এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দিগ্ধ যে অন্যান্য জমিদাররা ব্যানার্জি পরিবারের উদাহরণ অনুসরণ করত। রায়তরা বিবাদের কথা হয় নিজেরা বুঝে বা অন্যের কাছ থেকে বুঝে গত মে মাস থেকে জমিদারদের দাবি প্রতিরোধ করার জন্য নিজেদের সমিতিতে সংগঠিত হতে আরম্ভ করে।”

১৭৯৩ সাল থেকে একথা কি আমাদের বারে বারে বলা হয়নি যে আবওয়াব বে-আইনী এবং যে-জমিদার রায়তদের ওপর বে-আইনী সেস চাপিয়ে দেয় তার কঠোর শাস্তি হবে? সম্প্রতি ওড়িশায় যে-ঘটনা জানা গেছে, পাবনায় যে-আদায় হচ্ছে, এ-সবই প্রমাণ করে যে ঐ সব নিয়ম ও আইনকে জমিদাররা ছেঁড়া কাগজ মনে করে এবং জমিদাররা বীরদর্পে সারা দেশে সেস ও আবওয়াব চাপাচ্ছে ও জোর করে তা আদায় করছে। বাস্তবিক পক্ষে তাদের জবাব দেওয়ারও চমৎকার উদ্দেশ্য আছে। ১৮৫৯ সালের ১০ আইন অনুসারে চিরস্থায়ী রায়তদের খাজনা কোনো যুক্তিতেই বৃদ্ধি করা যাবে না, এবং দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট রায়তদের দেয় খাজনা আইনে নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি করা যাবে। যে-জমিদাররা খাজনা বৃদ্ধি করতে চান তাঁদের কাছে ঐ ধারাগুলি নিঃসন্দেহে খুবই অসুবিধাজনক, এবং তাঁদের কাছে একমাত্র খোলা রাস্তা হলো সেস ও আবওয়াব আদায় করা। রায়তরা ঐ বৃদ্ধি পাওয়া খাজনা চিরস্থায়ী না করা

পর্যন্ত দিতে বিশেষভাবে আপত্তি করে না এবং তা ধীরে ধীরে তারা দিচ্ছিল ; কিন্তু কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পরই জমিদাররা ঘুরে দাঁড়াল এবং দাবি করল যে ঐসব সেস প্রভৃতি বর্ধিত খাজনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। ছলাকলাহীন কৌশল ; অসহায় এবং অজ্ঞ রায়তদের প্রতারিত করার জন্য যোগ্য জমিদারদের হাতে ন্যায্য হাতিয়ারই বটে :

বে-আইনী সেস এবং খাজনা বৃদ্ধিই যে পাবনা বিদ্রোহের কারণ —একথা বোঝার জন্য সরকারী বিবরণ জানার প্রয়োজন করে না। যাঁরা বাঙলার রায়তদের স্বভাব এবং মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা বিদ্রোহের কারণ নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাবেন না। গালাগাল দিন, প্রহার করুন, রায়ত কোনো অভিযোগ করবে না, তাকে আঘাত করুন সে নত হয়ে যাবে ; কিন্তু তার খাজনা বৃদ্ধি করলে সে ভেঙে পড়বে। বৃটিশ শাসনের সুফলের সে সামান্যই লাভ করেছে, সভ্য জীবনের বিলাসিতা সে কামনা করে না, ধনসম্পদ তার নেই। শিক্ষা সে চায় না। এইসব অভাবকে সে কেবল একটি জিনিস দিয়ে পুষিয়ে নিতে চায় তা হলো তার জমি এবং সেই জমির বাৎসরিক ফসল। তার আশা—অতি প্রিয় ভালো ফসল ছাড়া সে অন্য বেশি কিছু চায় না ; তার সব চেয়ে বড ভয় হলো পাছে তার ফসল কমে যায় কিংবা খাজনা বেড়ে যায়। তা হলে এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে যদি সে তার এক টুকরো জমিকে প্রচণ্ড আবেগ দিয়ে ভালোবাসে—যদি সে সজাগ প্রহরীর মতো জমির ওপর তার স্বার্থ রক্ষা করে? জমিদার যখন জমিতে উৎপাদিত ফসলের ওপর তার প্রাপ্য অংশের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, রায়ত তা আর বহন করবে না — এ হলো সেই শেষ খড়ের বোঝা যা উটের পিঠ ভেঙে ফেলে। এই ধরনের অত্যাচার তার কাছে খুব নিষ্ঠুর মনে হয় এবং তার ওপর তিক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অতএব দেশের প্রত্যেক শুভাকাঙ্ক্ষীর কর্তব্য হলো ভবিষ্যতে জমিদার ও রায়তদের মধ্যে কোনো মনোমালিন্যকে অসম্ভব করে তোলার জন্য এ-ধরনের ঘটনা বন্ধ করা।

কিভাবে এটা করা সম্ভব? অন্যত্র এই প্রশ্নের জবাব আমরা দিয়েছি। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে বাঙলার অর্ধেকের বেশি রায়তদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যাদের দখলীস্বত্বের অধিকার নেই তাদের ক্ষেত্রে খাজনা বৃদ্ধির ব্যবস্থা আছে। আমরা মনে করি এই অধিকার বিশেষ আইনের মাধ্যমে দেওয়া উচিত। সমস্ত রায়তের ক্ষেত্রে একমাত্র যথেষ্ট জোরালো যুক্তি ছাড়া

খাজনা বৃদ্ধিকে সম্পূর্ণত বাতিল করতে হবে এবং রায়ত ও জমিদারদের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা মনে করি এর ফলে বাঙলার কৃষক সমাজের অধিকারের একটি মহান স্বীকৃতি দেওয়া হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে বৃটিশ সরকার এযাবৎ এই কাজ নির্লজ্জভাবে করে এসেছে। আমরা আরও মনে করি যে এই হলো একমাত্র সম্ভাব্য ব্যবস্থা যা জমিদার এবং রায়তদের মধ্যে ভবিষ্যৎ বিরোধকে এবং এই মুহূর্তে খাজনা বৃদ্ধির অধিকারের প্রশ্নে যে-অসংখ্য মামলা দেওয়ানী আদালত-গুলিকে খুঁচিয়ে চলেছে, কৃষক সাধারণকে হতাশাগ্রস্ত করছে এবং জাতির জীবনীশক্তি কুরে খাচ্ছে—তাকে প্রতিহত করতে পারে। আমাদের মনোভাব আরও স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনার জন্য আমরা যে-ধরনের আইন চাই তার কয়েকটি অংশ এখানে উল্লেখ করছি।

যেহেতু বাঙলার জমি যারা চাষ করে তাদের রক্ষা এবং কল্যাণের জন্য ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারায় একটি বিশেষ শ্রেণীকে যে-সুবিধা দেওয়া হয়েছে তা সর্বশ্রেণীর রায়তদের প্রদান করা কল্যাণকর, সেজন্য এইভাবে তা বিধিবদ্ধ করা হলো;

১। কোনো রায়তকেই একবার বর্ধিত খাজনা দিয়েছে এই কারণে নিম্নবর্ণিত কারণ ছাড়া বর্ধিত খাজনা প্রদানে বাধ্য করা যাবে না, যথা:

(/) রায়ত যে-খাজনা দিয়েছে তা যদি ঐ ধরনের বা পার্শ্ববর্তীর জমির মতোই একই সুযোগ-সুবিধা বিশিষ্ট জমির প্রচলিত খাজনার তুলনায় কম হয়;

(৵) যদি উৎপাদনের মূল্য অথবা জমির উৎপাদিকা শক্তি রায়তের খরচ ছাড়া অন্য কোনো সংস্কার দ্বারা বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে;

(৶) রায়ত যে-পরিমাণ জমির জন্য খাজনা দিচ্ছিল, জরিপের ফলে সেই জমির পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায়।

২। যদি কোনো পক্ষ উল্লিখিত কোনো একটি যুক্তিতে জমির খাজনা বৃদ্ধি চান তাহলে তিনি দেওয়ানী আদালতে মামলা করে ঐ যুক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করবেন। দেওয়ানী আদালতের রায় ছাড়া কোনো বর্ধিত খাজনাই বৈধ হিসেবে গণ্য হবে না।

৩। যখন কোনো রায়তচাষীকে কিংবা যে-কোনো ধরনের ভাগচাষীকে

জমি ভাড়া দেওয়া হবে, মালিকপক্ষকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করে একটি পাট্টা দিতে হবে।

(ক) বার্ষিক খাজনার পরিমাণ;

(খ) ঐ খাজনা কয় কিস্তিতে দিতে হবে;

(গ) লিজ প্রদানের কোনো বিশেষ শর্ত থাকলে;

(ঘ) যদি খাজনা জিনিসপত্রে দিতে হয় তবে উৎপাদনের কত অংশ দিতে হবে এবং কোন সময়ে ও কিভাবে তা দেয় তার উল্লেখ করতে হবে।

(৪) পাট্টার প্রদানকারীকে এই পাট্টা রেজিস্ট্রি করতে হবে।

(৫) এইভাবে রেজিস্ট্রিকৃত পাট্টা একমাত্র জাল ব্যতীত অতীত খাজনার হার সম্পর্কে কিংবা পাট্টা মঞ্জুরিরও পূর্বে খাজনা বৃদ্ধি হয়েছে ঐ অভিযোগ থাকলে তা চূড়ান্ত সাক্ষীরূপে গণ্য হবে।

শাস্তি

(৬) দেওয়ানী আদালতের রায় ব্যতীত যে কেউ খাজনা বৃদ্ধি করলে এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

(৭) জমি ভাড়া দেওয়ার পর চারমাস পর্যন্ত পাট্টা আটক রাখলে এবং এজন্য যথেষ্ট কারণ না দেখালে একশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

(৮) পাট্টা প্রদানের চার মাসের মধ্যে যদি কেউ রেজেস্ট্রি না করেন, ঐ গাফিলতির জন্য যথেষ্ট কারণ না দেখানো হলে তিনি একশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

বিবিধ

(৯) যেসব ক্ষেত্রে পতিত জমি চাষের আওতায় আনার অথবা ঐ ধরনের কোনো উদ্দেশ্যসাধনের জন্য জমি খুব অল্প খাজনায় বিতরণ করা হয়েছে সে-ক্ষেত্রে এই আইন প্রযুক্ত হবে না।

(১০) এই আইন বলে মামলাগুলির বিচার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মহকুমা শাসক ব্যতীত অন্যত্র হবে না।

অনুবাদ—অনিল ভঞ্জ

বিখ্যাত ভারতপথিক শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত দ্য বেঙ্গল ম্যাগাজিন-এ (সেপ্টেম্বর ১৮৭৩, পৃষ্ঠা ৫৪-৬১) Arcydae ছদ্মনামে প্রবন্ধটি রচনা করেন। ইংরেজ শাসন ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে তৎকালীন বহু বুদ্ধিবাদীর মতো রমেশচন্দ্রের দৃষ্টি অনেকখানি আবৃত থাকা সত্ত্বেও, কৃষক বিদ্রোহের পক্ষাবলম্বী হওয়া তাঁর অনন্য নির্ভীকতারই পরিচয়।—সম্পাদক, পরিচয়

সামনে লড়াই

অসিত ঘোষ

অগ্রহায়ণের মাঠে দাঁড়িয়ে পেট ভরে ভাত খাবার সাধ হলো। কাস্তে গোঁজা ছিল চালের বাতায়, টেনে নিল। আয়েসা ধান কাটায় সাহায্য করতে এগিয়ে এল। বাড়-বাড়ন্ত এই সাধ মেটাবার চেষ্টার ফলে রহিম বন্দী হলো, হাত পড়ল আয়েসার গায়ে। মুসলিম মহিলা, পেটের জ্বালায় বোরখা নামিয়ে মাঠে নেমে, অন্যায় জুলুমের কাছে অবশিষ্ট ইজ্জতটুকুও বজায় রাখতে পারল না। চেতনায় বড় বেশি অপরাধবোধ ক্রিয়া করে। রহিম হা-হা করে আয়েসার সামনে দাঁড়িয়ে মার রুখতে গিয়ে নিজে বিপন্ন হলো। অনেক গরিব-দুঃখী মানুষ এসেছিল, বিপন্ন রহিম ও আয়েসাকে বিস্ফারিত চোখে কেবল দেখল, কেউ প্রতিরোধ করতে পারল না। কোলে বাচ্চা নিয়ে লাথি খেয়ে পড়ে গিয়ে আয়েসা কাঁদল, ভয়ে কেউ চোখের জল মুছে দিতে পারল না।

ধারে-কাছে কোনো বন্দুকধারী সেপাই নেই, উঁচু প্রাচীরও নেই, তবু সে বন্দী। কব্জীর ওপর গরুর দড়ি এঁটে বসে আছে, খুঁটিটা দুই জানুর মাঝখানে রেখে পা-দুটো বাঁধা, নেতিয়ে পড়ার আদৌ সুযোগ নেই। মানচিত্রের নদী-নালার মতো সর্বাঙ্গে মারের দাগ, এই পীড়নজনিত যন্ত্রণা স্নায়ু ছিঁড়ে ফেলছে। কদিন আগেকার স্বপ্ন ও সাধ এখন বৃষ্টিহীন মেঘের মতো চেতনায় ভাসে। রহিম আল্লার কাছে দোয়া মাগল, এই অগ্রহায়ণের মাঠ কবে রণক্ষেত্র হবে। প্রার্থনার পর উষ্ণ রক্তে উত্তেজনা বাড়ে, বাঁধন খুলে পালিয়ে যাওয়ার বাসনা প্রবল হয়, পালাতে পারে না। প্রাণের মূল্য অনেকখানি মনে হয়, কেননা ইজাহার কাজীর সাঙ্গ-পাঙ্গরা জান নিয়ে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে! অতএব প্রাণটা নিয়ে মুক্তি পেলে…।

দরজার ওপারে মাঠ, গাছ-পালা, বিস্তৃত আকাশ আর রোদ, লড়াই করার উপযুক্ত ক্ষেত্র। কিন্তু কদিন আগেও মাঠে ধান ছিল, নয়নাভিরাম রূপ ছিল ধরণীর, আজ যেন খা-খা করছে। ভরা মাঠের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ঘ্রাণ নিলেও আশায় উদ্দীপ্ত হতো গরীব-দুঃখী মানুষ, এখন সোনার ফসল নেই,

কারা যেন লুঠ করে নিয়েছে। মন উদাস হলো। এইজন্যেই কি এখানে বেঁধে রাখল ? এ-কদিন গোয়ালঘরে বন্দী ছিল, আজ এত দয়া কেন ? নানা ভাবনা মনে এল। চোখের সামনে শুকনো প্রান্তর ভেসেছিল, আর তৃষ্ণার জলের মতো আয়েসার রুগ্ন চেহারা। দরজার মাঝখানে ছবির মতো। এলোমেলো চুল, চোখ কোটরে নিমজ্জিত, রোগা হাত দুটো মাঝে-মাঝে নড়ে উঠছে। রহিম বাড়ি থাকলে মজুর খেটে রোজগার করে বৌ-ছেলে-মেয়ের ভরণ-পোষণ করত, এমন চেহারা হতো না। এখন আয়েসা কিভাবে জীবিত রয়েছে রহিমের অজ্ঞাত।

হাত দশ দূরে আয়েসাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রাণ আইঢাই করে, ইচ্ছে হয় ডাকে, প্রাণের ভয়ে সমস্ত শব্দ নীরবতায় নিমগ্ন থাকে।

'তমাকে মেরে ফেলেচে শুনলম…'

রহিম অস্বাভাবিকভাবে মাথা নেড়ে কথা কইতে বারণ করল, ফলে ঘাড়ের ব্যথায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ল। ব্যথা সহ্য করার জন্যে কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইল, তারপর আয়েসার দিকে চেয়ে সে আরও আহত হলো। বৌ-এর চোখে জল, চক্ষুকোটর টইটম্বুর ভরে উপচে গাল বেয়ে পড়ে। বাঁধন খুলে দৌড়ে গিয়ে কাঁদুনে বৌকে জড়িয়ে ধরতে পারলে হৃদয়ের দাপানি মিটত, তা পারে না। আয়েসাও যেন এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, ছুটে গিয়ে দাঁত দিয়ে দড়ি কেটে, স্বামীকে নিয়ে মাঠ পার হয়ে পালায় এমন ভাব, কিন্তু সেও পারছে না, যদি মেরে ফেলে !

ইজাহার কাজীর বড ছেলে সড়কী হাতে দোতলা থেকে নেমে এল। হাতে এক-জামবাটি ফ্যান-ভাত, কদিন পর আজ খেতে দেবে। রহিম আয়েসাকে চলে যেতে ইশারা করল, গেল না। স্বামীর দিকে করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বসে পড়ল। জানমোহম্মদ-এর কাছে ফ্যান প্রার্থনা করে, রহিমকে তৃষ্ণার্তের মতো দেখছে। জানমোহম্মদ দাঁত খিঁচিয়ে আয়েসার ফ্যান চাওয়ার জবাব দেয়। তারপর রহিমের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দেয়। শরীরের গিঁঠে গিঁঠে প্রবল ব্যথা হেতু রহিম স্বাভাবিকভাবে বসতে পারল না, চেষ্টা করে উবু হয়ে বসল, সামনে এক-জামবাটি ফ্যান-ভাত। অথচ বৌ-ছেলে-মেয়ে ক্ষুধার্ত। বুকে আগুন জ্বলে, নেভানো যায় না, পুড়তে থাকে।

'অকে একটু ফ্যান স্তান !' রহিমের পাছায় লাথি পড়ল।

'দুব ঢুকি ?'

সঙ্গে সঙ্গে পেটে হাত চাপা দিল রহিম। যেমন ধারাল, তেমনি বিষাক্ত সড়কী, একবার ঢুকলে নাড়ি-ভুঁড়ি জড়িয়ে নিয়ে আসবে, হাতের সাধ্য নেই আটকায়, তবু রহিম হাত চাপে, সড়কীর আনাগোনায় আয়ো ভীত হয়ে ওঠে, আয়েসাও চড়া মুহূর্তের কাল গোনে। গ্রাস তুলতে পারছে না। জামবাটিটা বউয়ের হাতে দিতে পারলে অনেক শান্তি। জানমোহম্মদের তীক্ষ্ণ নজর এড়িয়ে দ্রুত কাজটা করতে পারলে আয়েসা জামবাটিটা নিয়ে নিশ্চই পালাতে পারবে, কিন্তু তার জীবন বিপন্ন হবে।

'খেয়ে ফেল কাফের।'

রহিম গ্রাস তোলার চেষ্টা করে।

অপরিষ্কার ফ্যান-ভাত, কাঁকর ও কুঁড়ো মেশানো। জানমোহম্মদের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরতেই রহিম জামবাটিটা নিয়ে আয়েসার দিকে দৌড়ে গেল, সড়কীটা তীব্র বেগে পায়ের ডিমে সেঁদিয়ে যাওয়ায় হাতের জামবাটি বিকট শব্দে ছিটকে পড়ল। সামনে দেখল, আয়েসার পিছন-পিছন যেন একটা দানব ছুটে যাচ্ছে, প্রাণভয়ে পাগলির মতো আয়েসা পালাচ্ছে, আর একদল কাক ছড়িয়ে-পড়া ফ্যান-ভাত খেয়ে তৃপ্ত হচ্ছে। আয়েসাকে ধরতে না পেরে জানমোহম্মদ গালাগাল দিতে-দিতে ফিরে এল। রহিম সড়কীটা উপড়ে ফেলে হাত চেপে বসেছিল।

'এক টুকরো ট্যানা দ্যান, বেঁধে লি!'

ট্যানার পরিবর্তে আরো কড়া বাঁধন পড়ল হাতে-পায়ে, সামনের দরজা বন্ধ। পায়ের ডিম থেকে ক্রমাগত রক্তপাত হতে থাকল। এখন আর চেপে ধরারও উপায় নেই। চোখের জলে ও রক্তপাতে আগুন জলে উঠল। কাজীদের সাধের সৌধ পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারলেই সে-আগুন নির্বাপিত হবে, গরিব-দুঃখী ও রহিমের জ্বালা জুড়োবে ইজাহার কাজীকে সৌধ থেকে নামিয়ে পথের ধুলোয় নামাতে পারলে। কিন্তু এখন সময়টা বড় খারাপ। প্রাণে বাঁচতে পারলে বাসনা পূর্ণ করার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। এমনি এক ইচ্ছার বশবর্তী রহিম কাঁদতে থাকল। পেটের ভিতরে যেন একটা কাঠের বল গড়িয়ে যাচ্ছে, আহত রহিম কাজীদের গেরস্তবাড়ির তৃণহীন উঠোনে চোখ রেখে বসে রইল। উঠোন থেকে রোদ চলে গেল, মাঠ থেকে মুরগীগুলো উঠে এসে ভিড় করল। সামনে দিয়ে কয়েকজন মেহেরবান রহিমকে দেখতে দেখতে ভিতরে গেল। পোশাক-পরিচ্ছদে ছোকরাদের শহরবাসী বলেই মনে হলো। খোরাক শেষ করে

মুরগীগুলো দরমায় ঢুকে গেছে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে চলেছে, এমন সময় বলদটা নিয়ে আরো কয়েকজন উদ্ধত যুবক উঠোনে নামল। সযত্নে লালিত বলদটার লোম চকচক করছে, শিঙ-এ তেল মাখানো, ফলে কেউটে সাপের মতো মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে ইস্তাহার কাজী ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে এল।

'জবাই কর!'

শহরের যুবক দল বলদটার চার-পা বেঁধে উঠোনে চিৎ করে ফেলে দিল, ছুটো-পুটি ও ছুরি শানানোর শব্দে রহিম যেন দুঃস্বপ্ন থেকে উঠল।

'ঈয়াসিন চাচার বলদ, তমরা জবাই করবে?'

দুর্ধর্ষ যুবক ছুরিটার ধার পরখ করতে-করতে অট্টহাসি হাসল।

'বেকুফ!'

তীক্ষ্ণ ছুরির আড়াই টান। আল্লার নাম করে এক কৃষকের সর্বনাশ করল উন্মত্ত যুবক। বলদটার দাপাদাপির জন্যে যুবকেরা সরে দাঁড়াল, উঠোনে রক্তের বন্যা বয়ে গেল। রক্তের প্লাবন ও সামনে লড়াই, মাঝখানের সময়টুকুতে নেড়ি-কুত্তাটা চুকচুক করে রক্ত চাটতে থাকল, অপরদিকে নির্জীব বলদটার চামড়া খোলায় ব্যস্ত হলো সকলে। কে-একজন হ্যাজাক জ্বালিয়ে দিল, বড় পাতিল মাজতে গেল, উঠোনের একদিকে দ্রুত উনুন রচনা করে জানমোহম্মদ আগুন জ্বালাল। পেঁয়াজ রশুনের গন্ধ ছুটিয়ে দিল বোরখা পরা মেয়েরা। ওদিকের দুয়ার ঘিরে কাপড়েব পর্দা, পর্দার ওপারে উজ্জ্বল আলোয় মেয়েরা ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন জলসার আয়োজন সব। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঈয়াসিনের সাধের বলদ পাতিলে সেদ্ধ হতে শুরু করল। বাতাসে মাংসের গন্ধ রহিমের নাকে দুর্গন্ধের মতো। নিজের মনেই রহিম বলে উঠল, 'আমরা মানুষ লয়?'

'কি বলে হারামী!'

রহিম খাড়া-লোম বিড়ালের মতো উত্তপ্ত অথচ স্থির। বাহু দুর্বল, চামড়া মলিন। চোখা-চোখা উত্তর চোখের মণিতে। এ-বাড়ির বাইরের কথা ভাবলেই কাজীদের গেরস্তবাড়িটাকে দ্বীপান্তর বলে মনে হয়। বন্যার মতো মুক্তি বাইরের জগতে, মাঠের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সহজেই হেঁটে যাওয়া যায়। মুক্তির ভাবনায় নিমজ্জিত রহিমের মনটা সজাগ হয়ে উঠল।

বিপুল শব্দের হা-রা-রা রব চারিদিকে। জলস্রোত নয়, জনস্রোত যেন টগবগিয়ে এগিয়ে আসছে। কারা যেন বিজয়োন্মত্ত, বাঁচার মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে আগুয়ান হচ্ছে, কিছুই বাধা মানছে না। গোস্ত রান্নায় ব্যস্ত

যুবকেরা পিছনের দরজা দিয়ে গা ঢাকা দিল। পর্দার আড়ালে ছায়া ছায়া মেয়েরা অন্দরমহলে চলে গেল। ইস্তাহার কাজী ও অন্যান্য ব্যক্তিরা বারান্দায় উঠে উঁকি মেরে মাঠ দেখতে থাকল। রহিমেরও ইচ্ছে হলো চালে উঠে মানুষের রকম-সকম দেখে, পারে না। উঠোনে হ্যাজাকের আলো নেতিয়ে থাকলেও বাইরে চোখ ধাঁধানো আঁধার। সদর ও খিড়কীর দরজায় হুড়কো পড়েছে। গ্রামীণ নির্জনতা চিরে শব্দের ঝড় উঠেছে। 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ!' বাঁচার মন্ত্রে মানুষ আল্লার দোসর হয়ে উঠেছে। গোলমাল, হৈ-চৈ। হ্যাজাকের আলো ভাসিয়ে রক্তিম আলোর আভাস চরাচরে। মশাল জ্বালিয়ে আসছে সব। দরজা ভেঙে যখন ঢুকল, রহিম ছাড়া উঠোনে আর কেউ নেই তখন। লোকগুলির হাতে শক্ত লাঠি, লাঠির আগায় ঝাণ্ডা, ঝাণ্ডার বুকে রক্তের বন্যায় কাস্তে-হাতুড়ি অবিশ্বাস্যভাবে ভেসে রয়েছে। রহিমের শরীরে রোমাঞ্চ, রক্তে বিস্ফোরণ। হেঁকে উঠল।

'ইনক্লাব জিন্দাবাদ!'

পুনরায় ঘাড়ে ব্যথা লাগল। আনন্দের আতিশয্যে ব্যথা ব্যথা নয়। মাটির দাওয়ায় রক্তের দাগে-দাগে বিপ্লবের মন্ত্র লেখা হয়ে গেছে।

'ইনক্লাব জিন্দাবাদ!'

বাঁধন খুলে দিতে, লুঙ্গি টানটান করে বেঁধে লাফিয়ে উঠল। পা টেনে-টেনে সকলের মাথার ওপর মাথা ও মুঠো তুলে হুঙ্কার দিল।

'ইনক্লাব জিন্দাবাদ!'

দরজার ফাঁক দিয়ে সালামৎ ঢুকল। রাতারাতি রহিমের সন্তান জোয়ান হয়ে উঠেছে। অন্দরমহলে মেয়েরা কান্নাকাটি করছে, পুরুষেরা উধাও। বাচ্চাটাকে বুকে নিয়ে আয়েসার সে কি হাঁক-ডাক। রোগা চেহারা এখন যেন চাবুক। মেজ ছেলে জুম্মনের দৃপ্ত ভঙ্গী। গাঁয়ের হাজার মানুষ যেন একজন। ঈয়াসিন পাতিলটার দিকে চেয়ে কেঁদে ফেলল। টগবগ করে বলদটা ফুটছে। সালামৎ এক বালতি জল নিয়ে এসে উনুনে ঢেলে দিল, ছাই উড়ল, বলদটা বাঁচল না। ক্ষিপ্ত রহিম চেঁচিয়ে উঠল।

'বদলা লিতে হবে।'

আয়েসা স্বামীর চেহারা খুব কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিল। ঈয়াসিনের দুঃখে আদিবাসীদের উল্লাস শুরু। হাঁড়িয়ার গন্ধ মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে,

তবু ওরা মাতাল নয়, স্থির সাহসে নির্ভয় মানুষ। কোমরে কাঁড়, হাতে যেন গাণ্ডীব। রহিমের ক্ষত দেখে ওদের পেশীও পেলব হয়ে উঠছে।

কাজীদের গেরস্তবাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় পাতিলে আধ-সেদ্ধ বলদ ও রহিমকে দেখে সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। চাপা ক্ষোভ দারুণ স্তব্ধতায় ভয়ঙ্কর রূপে নিহিত রইল। ইজাহার কাজীর জলসা ভেঙে কে যেন আগে-আগে হ্যাজাক নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই কদিনে মাঠ একদম খালি, পায়ে নাড়ার শব্দ; কেউ কোনো কথা বলছিল না, অথচ হাজার কণ্ঠ যেন নাড়ার শব্দে মুখর। চৈতকের মাঠে সবাই ভিড় করে দাঁড়াল, এখানে খামার হয়েছে। ধানের গাদার মাথায়-মাথায় লেখা 'কার জমি, কত ধান, কত জমি'। গরিব-দুঃখী চাষীরা জোট বেঁধে খামারে ধান তুলেছে। এবার ঘরে তোলার আয়োজন। মালিকপক্ষ তাদের ভাগের ধান নিতে আসছে না।

'কবে ঘরে লিয়ে যাব!' কে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'কদিন সবুর কর!' ঈয়াসিন বলল।

'তারপর?'

রহিম একপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল। ঈয়াসিন রহিমের দিকে তাকিয়ে ভেবে বলল, 'মালিক পক্ষের ধান ত আমরা লিতে পারিনি!' একটা গাদার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'সালামৎ কেটে তুলেছে!'

আদিবাসীরা ঢোলে ডিমডিম আওয়াজ তুলে নৃত্যপর ময়ূরের মতো মৃদুতালে নাচল গাইল। লগির ডগায় ঝাণ্ডা উড়িয়ে গাছে বেঁধে গ্রাম থেকে গ্রামে বার্তা রটিয়ে দিল। ভোরের সূর্যের মতো সকলে আশায় রক্তিম হয়ে ওঠে। রহিম সুখের দিনের কথা ভেবে খুশি হয়। অপরদিকে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল হৃদয়ের অভ্যন্তরে, উত্তেজনায় আদরের মেয়ের উপস্থিতি খেয়াল করতে পারেনি। খামারে শাকিনাকে দাঁড়াতে বলেছিল সালামৎ। বাপজানকে দেখার জন্যে ব্যাকুল শাকিনা সামনে আসার চেষ্টা করেছে, বড় মানুষ সব ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। রহিম যখন মেয়েকে দেখতে পেল, বুকে জড়িয়ে ধরল।

'আমার বেটি!' শাকিনার হাসিতে লজ্জা ও আনন্দের আভাস। লোকজনের রকম-সকম দেখে সে শুধু অবাক হয়েছে।

'শাকিনাকে আমার ওখেনে পাঠি দিস!' ঈয়াসিন বলল।

'চাচা চাল দিবে বলেছিল, সকাল থিকে তমাকে লিয়ে আসবে বলে আমরা খাবার কথা ভুলেই গেছলম!'

আয়েসা এককোণে বসে বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়াচ্ছিল। বাচ্চাটার মুখ শাড়ির আঁচলে ঢাকা পড়ে গেছে। রহিম বলল, 'হাঁফ বন্ধ হয়ে যাবে যে!'

'না গো না!' আয়েসা বলল।

উৎসব ভেঙে গেল। মাঠ ভরে কথার প্রতিধ্বনি। হাঁক পাড়লে এখন দিগন্ত ডিঙোয়। রহিমও বৌ-ছেলে-মেয়ের হাত ধরে ঘরে ফিরল। আদিবাসীরা ডিমডিম ঢোল বাজিয়ে ঘরে গিয়েছে, সেখানেও ঢোল বাজার শেষ নেই, মনে হয় সকলে নাচছে। মাঠ থেকে শব্দ ভেসে আসছে।

'বাপজান আমি মনে করছিলম লড়াই করবে সব, এত লোক, মহরমের মতন!' শাকিনা মনের কথা চেপে রাখতে পারছে না, ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার ভাবনা কেবল বাপজানকেই জানানো চলে এমন ভাব।

'লড়াই নয় ইটা, মহড়া, কুত্তা সব পালিচে!'

সালামৎ-এর সঙ্গে ঈয়াসিন মিঞার ওখানে শাকিনাকে পাঠাল। মেয়েটার লাজ ভেঙে গেছে। এক বছর আগেও কারো সামনে মুখ তুলে তাকাত না। একবার ঈয়াসিন-এর মেয়ে রাবেয়া শাকিনাকে দাওয়াত করেছিল। সে কি লাজ মেয়ের, যাবে না। অবশ্য নেমন্তন্ন খেয়ে এসে অনেক গল্প করেছিল। মেহেদি লাগানো হাত দেখিয়ে রাবেয়াব তারিফ করেছিল।

'জানলে বাপজান, রাবেয়াদের একটা মেহেদি গাছ আছে!'

বড বড় চোখের দিকে তাকিয়ে বাপজান মেয়ের গরবে ডগমগ হয়ে ওঠে, সাধে কি মাঝে-মাঝে 'আমার বেটি' বলে জড়িয়ে ধরে। শাকিনা কেঁদে উঠলেও রহিমের ভালো লাগে। আজ কোনো সঙ্কোচ নেই, সালামৎ-এর আগে-আগে হেঁটে গেল, ফিরল কিছুক্ষণ পরে, রহিমের পাশে বসল হাসতে-হাসতে।

'রাবেয়া ছাড়ছিলনি, বলে এখেনে থাক!'

'আর বাপজানের মন জগাতে হবেনি, ইটা ধর!'

আয়েসা ধমক দিয়ে বাচ্চাটাকে শাকিনার কোলে দেয়। রহিম ছোট্ট শিশু-সন্তানকে নিজের কোলে টেনে নেয়।

'তমার বাপজান কবে থিকে হোলম?'

আয়েসা রহিমের রসিকতায় হাসল না, বরং রেগে উনুনে শুকনো তালপাতা জ্বালল। শাকিনা পুনরায় গল্প জুড়ল।

'আমি বনহু, বাপজানকে খুব মেরেচে, ঘাগুলান ভাল হবে, তেল গরম করে দুব! তা বাপজান তেল নাই যে!'

'রাবেয়ার কাছে চাইলিনি কেনে!'

শাকিনা মাথা নিচু করে, ফ্রকটার ছেঁড়া অংশটা আরো ছিঁড়তে থাকে।

'বাপজান, রাবেয়া আমার মনের কথা জানতে পারেনি।'

'তোর বাপজানের ঘরে তেল নাই, সে কি করে জানবে বেটি?'

'সবাই জানে, রাবেয়া জানবেনি? আমি মনে করেছিলম রাবেয়া বুঝবে, তেল দিলনি যখন বুঝলম বুঝেনি! এখন কি করব বাপজান?'

'তেল থাক, তুই ট্যানা লিয়ে আয়!'

ক্রমশ পায়ের ডিমের গভীর ক্ষত টাটিয়ে উঠছে, সারা গা টনটন করছে। কোনোপ্রকারে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ল, কিন্তু রাতে ঘুম হলো না। সকালবেলা জুম্মন ডাক্তার নিজে এসে ডাক্তারি করে গেল। অনেকক্ষণ বসে গল্প করল।

'আমার বেটাও গেছল, দেখুসন্থ?'

হাতুড়ে ডাক্তার, দেমাক নেই। গরিব-দুঃখী লোকদের সামিল হতে আভিজাত্যে লাগে না। রহিম গায়ের ব্যথায় এসব বাক্যালাপে কোনো গর্ব অনুভব করতে পারল না। মনটা ক্ষণেক ভরে উঠলেও পরক্ষণেই মুষড়ে পড়ে। এই যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেতে প্রায় পনের দিন শুয়ে থাকতে হলো। ইতিমধ্যে চৈতকের খামারের ধান ঝাড়া-তোলা হয়ে গেছে। ছোট-ছোট মালিকেরা ভাগ নিয়েছে, বড় মালিকদের ভাগের ধান বিক্রি করে টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়েছে। আয়েসাও কয়েক মণ ধান নিয়েছে। রহিম সুস্থ হলে মজুর খেটে টাকা দিয়ে দেবে। ঈয়াসিন রাজী হয়েছে। আরো অনেকে নগদ টাকায় বাজার দর-এর তুলনায় কম দামে বেশি-বেশি ধান কিনেছে। রহিমের মতো সর্বহারা মানুষ মজুরির ওপর নির্ভর করে সামান্যই নিতে পেরেছে। তাছাড়া, রক্তে বোনা ধানের ভাগ রয়েছে। এতদিন বিছানায় পড়ে-পড়ে সে কেবল ধান ঝাড়ার শব্দ শুনেছে, আর শাকিনা অদ্ভুতভাবে ধান ভাগাভাগির গল্প শুনিয়েছে। আয়েসা মাঝে-মাঝে বলেছে, 'সালামৎটা জোয়ান মুনিষের মতন কাজ করচে!'

'করবেনি, ঐ বয়েসে আমি কিরম ছিলম, জব্বারের বেটি তুমি দেখনি?'

আয়েসা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। পর্দার আড়াল থেকে মহরমের জাঠাতে রহিমের কসরৎ ও লাঠিখেলা দেখেছে, চেহারা ও শৌর্য লক্ষ্য করেছে। যেদিন জব্বার আয়েসার শাদির কথা বলল, রহিম তার স্বামী হতে চলেছে শুনে খুশিই হয়েছিল। আয়েসার মুখ দেখে রহিম আবার হাসল।

'সুখের কথা মনে করি দিলম !'

রহিম বারোয়ারী সুখের কাজে যোগ দিতে পারছে না। বড় দুঃখী সে। ঈয়াসিন এসেছিল কয়েকদিন, রাবেয়া ও গাঁয়ের অনেক লোক তার খোঁজ নিতে এসেছিল। সকলকেই তার দুঃখের কথা বলেছে।

'তমাদের সঙ্গে আমি কাজ করতে পারচিনি !'

'তাতে কি হোয়চে, তুমি বেঁচে গেছ তাই অনেক ! আয়েসা কম রাগিচে, বলে কি আমরা নাকি সব মরে গেছি, চোখের সামনে একটা মানুষকে খুন করে ফেলচে মুর্দাগুলান কিছু করতে পারচেনি !'

এসব কথা শুনে আয়েসা ফিক-ফিক করে হেসেছে। ঘরকুনো মুসলমানী বিপ্লব করে, রহিম ভেবে আনন্দিত হয়। রহিমের দুঃখ ঘোচে না, কারণ গাঁয়ের মানুষ কাদের-এর কথা ভুলে গেছে। জোতদারদের লোক তালপুকুরের ধারে কাদেরকে মেরে মুখের চামড়া খুলে ফেলে রেখে গেল, বউটাকে প্রায় পথে বসতে হলো, তার কান্না মিটল না। কে মারল সকলে জানা সত্ত্বেও কেউ কোনো শব্দ করল না। আয়েসার মতো কাদেরের বউও ক্ষেপে যেতে পারে, বদলা নেওয়ার স্পৃহা তারও মনে জেগে ওঠাই স্বাভাবিক।

'সবাই এল, কাদেরের বউ এলনি ত !'

'এসছিল, তুমি ঘুমিছিলে তখন !'

'বোরখা নামিচে তালে !'

'তমাকে লিয়ে আসতে কাজীদের ওখেনেও গেছল দেখনি ?'

রহিম সুখী হলো। সে অবশ্য কাদেরের দুঃখী বউকে ভিড়ের মধ্যে দেখেনি। এখন দেখার জন্যে মন উচাটন হয়। পরদিন ভোরবেলা আর অসুস্থ থাকতে পারল না। পা সামান্য টেনে-টেনে সুস্থ মানুষের মতোই বাইরে বেরোল। পৃথিবীটা নতুন করে দেখার মতো।— পুকুরপাড়, পুকুরপাড়ে কলাবাগান। এই শীতে কলাগাছগুলি একটু পীতাভ হয়েছে, কোনো-কোনোটিতে কাঁদি ঝুলছে। কলাবাগান পেরিয়ে বাঁশবন, বাঁশবনে হাওয়া শনশন করছে। খাড়া তলোয়ারের মতো বাঁশের ডগা দুলছে, ডগায় কয়েকটি পাখি একত্রে বসে রয়েছে। পুব দিকে সূর্য উঠছে বাহারী রূপ নিয়ে। কলাবাগান ও বাঁশবন পেরিয়ে একটু ফাঁকা জায়গা, সামনে বাস্তুভিটা, ভিটার ওপর পেঁপে গাছ। একটা কাক পেঁপের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়েছে। রহিম হুস করে কাকটা তাড়াল। কিষ্ট পাত্রের কামারশালার চাল ফুঁড়ে

ধোঁয়া উঠছে। কয়লাপোড়া গন্ধ বাতাসে। কামারশালার দরজার ভিতরে উঁকি মেরে দেখল, চন্দ্র বাগদি হাপরের দড়ি টানছে। মেজাজ দেখে বাদশা মনে হয়। পেশি শক্ত, ছাতি উঁচু। কিষ্টকে দেখল তারপর।

'বড়ভাই, ঘরে ধান উঠেছে, পিফা রুচেনি আর, লয় ?'

'কি বলচু, ভিতরে আয় !'

'পিফা পেকেছে, কাগের পেটে যাচ্ছে !'

'পেড়ে লিয়ে আয় !'

কিষ্টর খেয়াল হলো রহিম মারাত্মকভাবে ঘায়েল হয়েছিল। চন্দ্রকান্তকে পেঁপে পেড়ে নিয়ে আসতে অনুরোধ করল। চন্দ্রকান্ত একটা লগি নিয়ে চলে গেল।

'বোস রহিম !'

'পিফাটা পাড়তে পারতম আমি !' রহিম বলল।

কিষ্ট রহিমের সর্বাঙ্গ দেখল। চন্দ্রকান্ত পেঁপে পেড়ে নিয়ে এসে উপস্থিত সকলকে ভাগ করে দিল। রহিম এক-কামড় পেঁপে কেটে হাসতে হাসতে বলল, 'আমরাই কাগ হোলম !' সকলে হাসল।

এক-এক করে অনেকেই উপস্থিত হলো। রহিমকে দেখে তারা শারীরিক খবর নিল। ফাল-কাস্তে-কুড়ুল পাজাবার জন্যেই এসেছে সব। কিষ্টর হাতে সাঁড়াশির ডগায় লাল উত্তপ্ত লোহা, নেহাইয়ের উপর ঠিকমতো ধরে রাখল, চন্দ্রকান্ত ভারি হাতুড়ির ঘা মারতে থাকল। রহিম ছিটকে পড়া লাল ফুলকিগুলি দেখতে দেখতে অনেক কিছু ভাবল।

'একটা কেঁচা করে দাও ত বড়ভাই !'

'শোল গাঁথবি ?'

'হুঁ, সাতটা শোল গাঁথতে পারি এমন কেঁচা !'

'মনে হচ্ছে মানুষ গাঁথবি !'

'দরকার হলে গাঁথব ! আর কতকগুলান ফলা, বিষ লাগি দিবে বড়ভাই !'

রহিমের মুখের চেহারা এসব কথোপকথনকালে বদলে গেল। কিষ্ট লক্ষ্য করল রহিম খুব উত্তেজিত। রহিম উঠে দাঁড়াল।

'দেখি চাচার ওখেনে যাই !'

'আর একটা বলদ কিনেচে তোর চাচা, দেখেচু ?'

'আজই ত বেরলম, দেখব, যাচ্ছি !'

ঈয়াসিনের মাটির ঘরখানি কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা, তারই পাশে গোয়াল, গোয়ালের একদিকে খড়ের গাদা। খড়ের গাদার একদিকে পোয়াল জমানো রয়েছে। সেই পোয়াল ঘেঁটে ঘেঁটে একদল বাচ্চা নিয়ে একটা ধাড়ি মুরগী ধান খুঁটছে। আকাশে একটা চিল উড়ে গেল, ধাড়ি মুরগীটা অমনি ডানা বিছোলো, বাচ্চাগুলি ডানার নিচে লুকিয়ে পড়ল। রাবেয়া মুরগীর বিপন্ন ডাক শুনে দৌড়ে এল, বাচ্চাগুলি সমেত ধাড়িটাকে ঝুড়ি চাপা দিয়ে দিল।

'আমাকে একটা-দুটা দিস রাবেয়া!'

রহিমের আওয়াজ পেয়ে চকিতে ফিরে তাকিয়েছিল রাবেয়া। তাকিয়েই চোখ নিচু করে মুখে আঙুল পুরে অর্থবহ হাসি হাসছিল। তখনই চাচি বেরিয়ে এল, রহিমকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল, সঙ্গে-সঙ্গে পরিবারের সকলেই বিপুল উৎসাহে উঠোনে নেমে এল।

'চাচি ইবার বেঁচে গেলম, তবে কেঁচা একটা করতে বলে এলম বড়ভাইকে, আর জান থাকতে ছাড়বনি!'

উপস্থিত সকলে হাসল, রাবেয়া একখানা বড় চাটাই বিছিয়ে দিল। পরিবারের লোকজন এবং রহিম বসল। রাবেয়া রহিমের কানে-কানে বলল, 'বড়ভাই তমাকে দুবনি, শাকিনাকে দুব!'

যখন রাবেয়ার চুপি-চুপি কথার রহস্য জানতে পারল অন্যান্য সকলে হেসে খুন। ঈয়াসিন রহিমের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে নতুন কেনা বলদ দেখাল, তারপর ঘুরেফিরে আগামী চাষের প্রসঙ্গে এসে আলোচনা থিতিয়ে গেল। আর কয়েক মাস বাকি, ধান-কাটা-তোলা শেষ, বৈশাখের আগে পসলা বৃষ্টিতে এখনকার শুকনো মাটি নলেন-গুড়ের মতো গলে গেলে লাঙল চালিয়ে উল্টেপাল্টে রাখা, অবশেষে বৈশাখে বীজধান বপন। রহিম আগামী দিনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেল। যে-জমিটুকু ঋণের বাড়ন্ত পরিমাণের দায়ে অলিখিতভাবে ইজাহার কাজীর দখলে চলে গিয়েছিল, যে-জমির ধান কাটতে গিয়ে রহিমের জীবনে নতুন পটপরিবর্তন হলো সে-বিষয়ে ভাবনা শুরু।

'আমার কিতাটা ইবার দখল লিতে হবেই হবে!'

'থাম, লাগানির আগে লয়!'

লাগানি আসার আগে গ্রামগুলির গরিব-দুঃখী মানুষের অনেক কষ্ট গেল। আগে কারো ঘরে একদানা শস্য থাকত না, এ-বছর যা পেয়েছিল তাও কয়েক মাসে ফুরিয়ে গেল। তা-সত্ত্বেও মানুষের বেঁচে থাকার অদম্য উৎসাহ,

আগামী দিনের সুখ-স্বপ্ন যেন ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। লড়াই করে বাঁচার প্রেরণায়, আর বাঁচার জন্যে লড়াইটাও করতে হবে রহিম থেকে আজকের কিশোর পর্যন্ত জেনে গেছে। ভরা বাদর তারপর পুণরায় অগ্রহায়ণ। লড়াইয়ের জন্যে অনেকগুলি দিন অপেক্ষা করেছে। বর্ষার আকাশ মেঘে-মেঘে ভরে যেতেই ঈয়াসিন-এর বাড়ির সামনে তকতকে বিস্তৃত উঠোনে গরিব-দুঃখী মানুষ যে-যার মতো হাতিয়ার নিয়ে শলাপরামর্শ করতে বসেছে। সকলের চেতনায় কেবল দুর্ভাবনা। ইজাহার কাজী ও অপরাপর জোতদার মারামারি করার জন্যে লোকজন ভাঁড়া করে নিয়ে এসেছে। জোতদারের হাতে নিহত কাদেরের এগার বছর বয়স্ক বালকটি ঈয়াসিনের দাওয়ায় খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছিল, মেয়েরা দরমার আড়ালে বসে পুরুষেরা কি সিদ্ধান্ত নেয় তার অপেক্ষায় কাল গুণছিল। এতগুলি মানুষের জমায়েত, ঠিক ঠাণ্ডা বরফের মতো স্থির অনড়। অনুত্তেজিত সব। হামিদ খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে বাপের কথা ভাবছিল, আর এই মানুষগুলিকে দেখে রাগ হচ্ছিল তার। একটা টাঙ্গীর খোঁচা মেরে ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে করে।

'মা আমরা কি গোর দিতে এসচি ?'

লড়াকু মানুষগুলির মনে নতুন চিন্তার উদয় হলো। সত্যিই তো তারা কেউ কোনো মৃতের সংকারে আসেনি। এরকম চাঞ্চল্য অনুভব করে হামিদ সাহস পেল। ওদিক থেকে কাদেরের বউ-এর কোনো কথা শোনা গেল না। সেই তো তার সন্তানকে নির্দেশ দেবে। দর্মার দিকে তাকিয়ে হামিদ হতচকিত হয়ে যায় প্রথমে। তারপর চেঁচিয়ে ওঠে, 'কিষাণ-মজুর এক হও!' সমস্ত দুর্ভাবনা দূর হয়ে গেল সকলের। হামিদ বড় মানুষগুলির মতো দীর্ঘ হতে পারছে না। তার যা-যা বক্তব্য স্লোগানের মাধ্যমে প্রকাশ করছে আর দরমার আড়াল থেকে সমস্ত নারী বদলা নেওয়ার রোষে উদ্দীপ্ত হচ্ছে। কাদের হত্যার বদলা চাইই চাই। কৃষকের অধিকার রক্ষা করতেই হবে। বেনাম জমি দখল করার এই তো সময়, বাড়তি জমিও ছাড়বে না কেউ, খাসজমি তো দূরের কথা। প্রত্যেকের হাতিয়ার শত্রুর খোঁজ করছিল, বাঁচার মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়া এবং লড়াই করে বেঁচে থাকার উচ্চাশা প্রত্যেকের মুখাবয়বে উদ্ভাসিত। রহিম সদ্য তৈরি কোঁচাটা সামনের কাসমল্লা গাছের গুঁড়িতে ছুঁড়ে মারল, 'সামনে লড়াই, তৈরি হও!' গাছটির প্রতিবাদের কোনো ভাষা নেই।

হাজং আন্দোলনের এক অধ্যায়

আশু দত্ত

আসামের পার্বত্য রাজ্য মেঘালয়ের পাদদেশ; ছোটো বড় অসংখ্য টিলা, পাহাড়ী নদী, ঝরণা আর বনভূমি; সমতল অসমতল এক বিস্তীর্ণ আদিবাসী অঞ্চল। এই এলাকাই পূর্ব-পাকিস্তানের ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলার উত্তর সীমান্তের এক বিস্তৃত ভূখণ্ড, দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০০ মাইল, প্রস্থে ৫ থেকে ৭ কোথাও বা ১০ মাইল।

এখানে পাহাড়ী নদীগুলি মেঘালয়ের সুউচ্চ শিখর থেকে নেমে এসেছে পল্লীর বুকে। গারো ভাষায় 'সিমনাং' নদী হয়েছে সোমেশ্বর, 'ভগী' ভোগাই আর 'দাড়েং' হয়েছে নিতাই। এই আঁকাবাঁকা নদী কত পাহাড়ী জনপদ, বসতি, বন্দরের গাঁ ছুঁয়ে ছুঁয়ে সারা এলাকায় বিস্তৃত হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানে উত্তর ময়মনসিংহের এই বিস্তৃত এলাকাই হাজং অঞ্চল নামে খ্যাতি অর্জন করেছে। এই এলাকাতেই হাজং, গারো, কোচ, ডালু বানাই, হদি রাজবংশী প্রভৃতি আদিবাসীরা স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছে।

নানা বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে, হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে এই আদিবাসীরা নিজেদের স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তারা নির্ভয়ে পাহাড় থেকে সুগন্ধী অগুরু, বাঁশ, শাল, সেগুন, তুলা, কলা, কচু, কমলা প্রভৃতি বনজ খাদ্য ও সম্পদ সংগ্রহ করেছে; শিকার করেছে হরিণ, হাতি আরও কত জানোয়ার। সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে বিনিময় বা কেনা বেচা করেছে, আর সেই সঙ্গে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন করেছে নিজেদের জমিতে ফসল উৎপন্ন করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও এই এলাকার পশ্চিমাঞ্চল সেরপুর পরগণায় কোচ আদিবাসীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন পাঠান আমল, বঙ্গ বিজয়ের যাত্রা সবে শুরু। এই এলাকাতেও তার ধাক্কা এসে পৌছল। এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আদিবাসী কোচসর্দার দলিপা নিহত হলেন। সমগ্র পরগণা মুসলিম সামন্তপ্রভুদের করায়ত্ব হলো।

পরবর্তীকালে এই সামন্তপ্রভুদের পক্ষ থেকে খাজনা ও রাজস্ব আদায়কারী আমলারাই ইজারাদারী, জমিদারী স্বত্ব লাভ করে এই আদিবাসী কৃষকদের উপর নির্মম শোষণ ও অত্যাচার চালিয়ে যায়।

এই সমগ্র এলাকা জেলার শস্যভাণ্ডার তাই এদিকে ইজারাদার, জমিদার, জোতদার, মহাজনদের প্রলুব্ধ দৃষ্টি।

প্রায় একই সময় এই এলাকার পূর্বাঞ্চলে সুসং পরগণায় বায়সা গারোর নেতৃত্বে আদিবাসীরা নিজেদের শাসন ও অধিকার অব্যাহত রেখেছিল।

তখন কনৌজ থেকে সোমেশ্বর পাঠক নামে জনৈক ব্রাহ্মণ এই এলাকায় এসে স্থানীয় কিছু চর-অনুচরসহ আদিবাসীদের শাসন উৎখাত করার জন্য এক প্রচণ্ড আঘাত হানল, তারই পাল্টা প্রতিরোধ সংগ্রামে এগিয়ে এলো বায়সা গারো। সোমেশ্বরী নদীর তীরে সংগঠিত এই প্রতিরোধ কাহিনী আজও ছড়িয়ে আছে মানুষের মুখে মুখে।

অবশেষে আদিবাসীরা পর্যুদস্ত হলেন। এই সরল, স্বাধীনতাপ্রিয় পার্বত্য আদিবাসীদের অধিকার কেড়ে নিয়ে, তদানীন্তন দেশের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-শক্তির অনুগ্রহপুষ্ট এই সোমেশ্বর পাঠকই সুসং জমিদারীর গোড়া পত্তন করে।

এই সময় দিল্লীতে ও ঢাকায় নবাব বাদশাহদের দরবারে রাজস্বের অংশ হিসাবে জমিদারদের হাতি পাঠাতে হতো। তখন সুসং জমিদার হাতি শিকারের জন্য আদিবাসীদের একাংশ বিশেষভাবে হাজংদের নিযুক্ত করত। নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও হাজং আদিবাসীরা জমিদারের হুকুমে হাতি ধরার কাজ করতে বাধ্য হতো। এই হাতি ধরার কাজে অসংখ্য আদিবাসীদের অমূল্য জীবন অকালে ঝরে পড়ত। এই হাতি শিকারই 'হাতি খেদা' নামে পরিচিতি লাভ করে।

পরবর্তীকালে বাধ্যতামূলক এই 'হাতি খেদার' বিরুদ্ধে সমগ্র সুসং এলাকায় প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হয়। আদিবাসীরা সুসং জমিদারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ফলে বাধ্যতামূলক হাতি ধরার কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর ইংরাজ কোম্পানির আমল। কোম্পানির কর্মচারী ও দেশীয় দালালরা একযোগে যে-নিষ্ঠুর শোষণ চালিয়েছিল, তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর — সেই সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ। এইরূপ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মুখেও জমিদারী শোষণ ও জুলুমের কোনোরূপ ব্যতিক্রম ঘটেনি। এর বিরুদ্ধে বাঙলার

বিভিন্ন স্থানে প্রবল বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ তারই বহিঃপ্রকাশ। তার ধাক্কা এই এলাকাতেও এসে লাগে এবং বিদ্রোহী আদিবাসী কৃষকেরা সেরপুর পরগণার বহুস্থানে জমিদার কাছারীবাড়ি ধুলিসাৎ করে দেয় ও কোষাগার লুণ্ঠন করে। অবশেষে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষের পর বিদ্রোহ দমিত হয়।

এই সময়ই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জগদ্দল পাথর কৃষকসমাজকে বিপর্যস্ত করে দিল, জমিদারেরা অবাধে খাজনাবৃদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করল। তাছাড়া, বিনামজুরীতে পরিশ্রম, বেগার খাটা, সেলামী, নজরানা প্রভৃতি জমিদারী জুলুমবাজী এই এলাকার আদিবাসীদের জীবনযাত্রা দুঃসহ করে তুলল।

এর প্রতিবাদে সারা এলাকা জুড়েই বিক্ষোভের আগুন জলে ওঠে।

১৮১২ সালে সাকাতী গারোর নেতৃত্বে হাজং গারো আদিবাসীরা পূর্বাঞ্চলে সুসং পরগণায় সংগ্রামের আহ্বান জানায়।

১৮১৩ সালে পশ্চিমাঞ্চলে সেরপুর পরগণায় পাগলপন্থী টিপু সরদারের নেতৃত্বে আরো হাজং কোচডালু প্রভৃতি হাজার হাজার জনতা 'কুড়প্রতি বার আনার বেশি খাজনা ধার্য করা চলবে না' এই দাবীতে সংগ্রাম সংগঠিত করে, জমিদার কাছারীগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং এক অস্থায়ী শাসনব্যবস্থা কায়েম করে। এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর টিপু বন্দী হন এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হন।

এমনি আরও সংখ্যাতীত খণ্ডখণ্ড সংগ্রাম ঘটে গেছে এই এলাকায়। এই সময়েই বাঙলার বিভিন্ন প্রান্তে জমিদার ও সরকারী সিপাহী সৈন্যদের সঙ্গে বিরামহীন সংঘর্ষ চলতে থাকে। তিতুমীরের বিদ্রোহ, ফারজী আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি সেই সাক্ষ্যই বহন করে।

এই খণ্ডখণ্ড কৃষক বিদ্রোহগুলির সঙ্গে সঙ্গেই দেশী সিপাহী সৈন্যদের মধ্যেও চাপা অসন্তোষ জমে ওঠে। এই বিক্ষোভের মাধ্যমেই সূচীত হয় আগামী দিনের প্রথম জাতীয় অভ্যুত্থানের জয় গান—সেই ১৮৫৭ সালের ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহের রণধ্বনি।

১৮৫৭ সালের এই অভ্যুত্থান সংগ্রামী কৃষক এলাকাগুলিকেও উদ্দীপিত করে তোলে। তাই, আমরা দেখেছি সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী অধ্যায়ে নীলবিদ্রোহ, ওয়াহবী আন্দোলনের পুনরভ্যুত্থান, পাবনায় কৃষক বিদ্রোহ।

সিপাহী বিদ্রোহের ঢেউ এই এলাকাতেও এক নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি

করেছিল। তাই, শোষণ ও অত্যাচারে নিপীড়িত আদিবাসী মানুষেরা ১৮৬৬ সালে আব্রোগারোদের নেতৃত্বে এক ব্যাপক বিদ্রোহ সংগঠিত করে। বিদ্রোহীরা খাজনা বন্ধ করে দেয় এবং সুসং রাজের চর-অনুচরদের নিশ্চিহ্ন করে। সুসং রাজার পক্ষে ইংরাজ সরকার সর্বপ্রকার সাহায্য দানের জন্য সি. জি. বেকার ও পুলিশ সুপার রেলে সাহেবকে পুলিশ ও ফৌজ সহ ঘটনাস্থলে পাঠায়। তাদের সঙ্গে আদিবাসী কৃষকদের এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাঁধে। রেলে সাহেব ও তার দল গুরুতর ভাবে জখম হয়।

অবশেষে মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত সরকারী বাহিনীর সামনে আদিবাসী কৃষকেরা পর্যুদস্ত হয়।

এই পাহাড়ী আদিবাসী এলাকায় সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ কৃষক বিদ্রোহের আগুন বিদেশী ইংরেজ প্রভুদেরও পুড়িয়ে মারবে এ-আশঙ্কা শাসক-শ্রেণীর অমূলক ছিল না। ইংরাজ সরকার ভালো করেই জানত যে এই এলাকার স্বাধীনতাপ্রিয় দুর্ধর্ষ আদিবাসীদেরকে অস্ত্রের জোরে দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়, তাই তাদের জীবনে পরাধীনতার যে-ক্ষত সৃষ্টি করে দেওয়া হলো — তাতে প্রলেপ দেওয়ার মতোই ইংরেজ সরকার তার রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচার ও ধর্মান্তরকরণের জন্য মিশনারী সাহেবদের শরণাপন্ন হলো এবং এই উদ্দেশ্যেই ১৮৭৭ সালে গারো পাহাড়ের তুরায় আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনের শাখা স্থাপিত হয় এবং পূর্ব-পাকিস্তানভুক্ত এই আদিবাসী এলাকা-গুলিতে গড়ে ওঠে মিশনারী সাহেবদের বহুবিধ কেন্দ্র।

এই সীমান্তবর্তী পাহাড়ী উপজাতিদের মধ্যে যাতে সামন্তবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন এক ও অভিন্ন শক্তিরূপে গড়ে না ওঠে — যাতে করে স্থানীয় আংশিক আন্দোলন জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে একই মিলিত স্রোতে এগিয়ে না যায় তার জন্য চলতে থাকে মিশনারী সাহেবদের সুপরিকল্পিত অভিযান।

এমনিভাবে এক সীমাহীন সামন্তবাদী শোষণ ও অত্যাচার, ব্রিটিশ শাসনের দৌরাত্ম্য, পুলিশ এবং ফৌজী আক্রমণ মিশনারীদের অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও এই এলাকার আদিবাসী জনতা গোষ্ঠীগত, আঞ্চলিক শ্রেণীগত সংগ্রামে এবং জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে।

তাই আমরা দেখছি, ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন তথা জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের পুরোভাগে এসেছেন হাজং ডালু কোচ প্রভৃতি আদিবাসী

নেতারা। সেদিন জমিদারী মহাজনী শোষণে নির্যাতীত আদিবাসী কৃষকেরা নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, লড়াই-এর সঙ্গেই জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ঝাণ্ডাও কাঁধে তুলে নিয়েছে — বরণ করেছে সীমাহীন অত্যাচার, নির্যাতন।

জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তারা যখন জমিদারী শাসন ও জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে তখন কংগ্রেস জমিদারদের সমর্থনে আত্মগোপন করে পলায়ন করেছে। এসেছে কৃষক সভার ডাক — গড়ে উঠেছে কমিউনিস্ট পার্টি।

এই এলাকার সংগ্রামী ইতিহাসের পাতায় পাতায় একটি অবিস্মরণীয় নাম প্রখ্যাত বিপ্লবীনেতা মণি সিং — অধুনা পূর্ব-পাকিস্তানের জেলে আবদ্ধ। তাঁর নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার ফলে এবং সুযোগ্য নেতৃত্বে আদিবাসী এলাকার আন্দোলন ও সংগঠন এক ইতিহাস সৃষ্টি করে।

১৯৩৯ সাল। শুরু হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে এই এলাকার আদিবাসী কৃষকেরা শেষ সংগ্রামের আহ্বান জানায়—"না এক পাই—না এক ভাই"। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী শত চেষ্টা সত্ত্বেও এই এলাকায় যুদ্ধের চাঁদা আদায় বা সৈন্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের প্রতিপ্রান্তে কৃষকেরা এগিয়ে এসেছে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে—দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছে ব্যাপক কর্মকেন্দ্র আর মজুতদারী চোরাবাজারী মুনাফাখোরদের নির্মূল করার জন্য পরিচালনা করেছে এক নিরলস সংগ্রাম।

তারপর যুদ্ধোত্তর গণ-অভ্যুত্থানের যুগ। শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী প্রভৃতি বিভিন্ন মেহনতী জনতার নিজস্ব শ্রেণীদাবির ভিত্তিতে সংগ্রামের এক বিপুল জোয়ার—রণক্লান্ত দেশীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিক্ষোভের আগুন, আই. এন. এর মুক্তি-আন্দোলন আর আই. এন. বিদ্রোহ এবং সমগ্রভাবে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে এক প্রবল অসন্তোষ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের পথে এক নতুন সম্ভাবনার সূচনা করে।

এই পরিস্থিতির পটভূমিতে আদিবাসী এলাকার কৃষকেরাও পুরানো যুগের ভূমিদাসপ্রথা নিশ্চিহ্ন করার সঙ্কল্প নিয়ে সংগ্রামের পথে এগিয়ে চলল।

এমনিভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে 'নানকার' [জমিদার, তালুকদারদের কাছারি বাড়িতে বেগার খাটার

বিনিময়ে কৃষকেরা যেটুকু জমি ভোগ করত তার উপর কৃষকের কোনো স্বত্ব ছিল না], 'ভাওয়ালী' [খাজনা হিসাবে টাকা ও ফসল দুইই দিতে হতো], 'টংক' [পার্শী শব্দের অপভ্রংশ টংক অর্থাৎ বেতন বা মজুরী। মুঘলযুগে রাজস্বের অংশ হিসাবে জমিদারদের হাতি পাঠাতে হত। এই হাতি ধরার জন্য মজুরি বা বেতন হিসাবে আদিবাসীরা জমি ভোগ করত। এই জমিকে বলা হতো টংক জমি। পরবর্তীকালে এই জমির উপর ধানে খাজনা ধার্য হয়। এই ধানে খাজনার হার একর প্রতি ৬ থেকে ১০ মণ ধান] প্রভৃতি মধ্যযুগীয় প্রথা রহিতের জন্য, তেভাগার দাবিতে, খামার প্রথা [ক্ষেতের সাকুল্য উৎপন্ন ফসল ভাগচাষীদের তুলে দিতে হতো জোতদার, জমিদার ও মহাজনদের খামারে। অবশেষে ঋণের দায়ে ভাগচাষীদের প্রাপ্য সাকুল্য অংশই সুদে-আসলে জমিদার মহাজন জোতদাররা খামার থেকেই কেটে রাখত। ফলে, শূন্যহাতে ভাগচাষীরা ফিরে যেত] উচ্ছেদের জন্য, তেভাগার দাবিতে, মহাজন আর সুদখোরদের জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে সারা পাহাড় এলাকাব্যাপী শুরু হলো এক দুর্জয় সংগ্রাম আর প্রতিরোধ।

পশ্চিমাঞ্চলে নালিতাবাড়িতে তেভাগার দাবিতে এবং খামার উচ্ছেদের জন্য আন্দোলন শুরু হওয়ায় মুহূর্তেই বীর আদিবাসীনেতা সর্বেশ্বর ডালু প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও জোতদারের আক্রমণে শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। সারা পাহাড় এলাকায় বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। ইতিপূর্বেই এই আন্দোলন এলাকা থেকে 'ভাওয়ালী' ও নানকার প্রথা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

এদিকে পূর্বাঞ্চলে সুসং পরগণায় 'টংক' খাজনা বন্ধ করে কৃষকেরা নিজ দখলে ধান মজুত রেখেছিল। ঘোষণা করা হলো—'টংক' খাজনা আদায়ের জন্য জমিদারের গাড়ি এলাকায় প্রবেশ করতে পারবে না।

এমনি ভাবে একের পর এক জমিদারের ধান আর জোতদার-মহাজনদের খামার দখল হতে থাকল। মহাজন-জোতদারী শোষণের ঘৃণ্য প্রতীক খামারগুলি পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হলো। হাজার হাজার আদিবাসী জঙ্গী বাহিনীর মিছিলে মিছিলে সমস্ত এলাকা চঞ্চল হয়ে উঠল — ইংরেজ রাজত্বের নাম-নিশানা যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়!

তখন ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কুখ্যাত ব্যাষ্টিনের পুলিশ ও সৈন্যদল, আসাম রাইফেল প্রভৃতি ইংরাজের সশস্ত্র বাহিনী একযোগে এই এলাকার নিরস্ত্র আদিবাসী জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে — হিংস্র দমননীতি ও নির্মম

অত্যাচার এলাকার গণজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। হত্যা, নারীধর্ষণ, লুণ্ঠন প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। আদিবাসী নেতা প্রখ্যাত বিপ্লবী ললিত সরকারের বাড়ি ব্যাটিনের পুলিশ বাহিনী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়।

এমনি একদিন একদল পুলিশ ফৌজ বহেরনলী গ্রামে প্রবেশ করে এবং পাশবিক অত্যাচার চালাবার উদ্দেশ্যে নিরীহ পল্লীবধূ সরস্বতীকে জোর করে টেনে বনের দিকে নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে এ-সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে—গ্রামবাসী কামোন্মত্ত সশস্ত্র সিপাহীদের ঘিরে ফেলে। বীর কৃষক-রমণী রাসমণী আর জঙ্গীনেতা সুরেন্দ্র ঘটনাস্থলে ছুটে এলো। শুরু হলো হাতাহাতি লড়াই—পুলিশের বুলেটে রাসমণী আর সুরেন্দ্র শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। অপর পক্ষে পুলিশ ফৌজের দুই জন নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। আহত সৈন্যরা একটি রাইফেল ও স্টেনগান ফেলে রেখে প্রাণভয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কৃষক জঙ্গীরা রাইফেল ও স্টেনগান হস্তগত করে।

প্রায় এই সময়েই ময়মনসিংহ শহরে ভিয়েতনাম দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ চলে। ছাত্রনেতা অমলেন্দু নিহত হন। গুলির প্রতিবাদে জনতার বিক্ষোভ বিস্ফোরণ আকারে ফেটে পড়ে এবং সেদিন ময়মনসিংহের প্রশাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল হয়ে যায়।

তারই ঢেউ এসে লাগে এই উপজাতি-অঞ্চলে। ভিয়েতনাম দিবসে ছাত্র-হত্যার প্রতিবাদে আদিবাসী কৃষকেরা হাজারে হাজারে জমায়েত হতে থাকে সুসং বন্দরে। ভীত সন্ত্রস্ত সুসং মহারাজা রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পলাতক হলেন। অফিস-আদালত বন্ধ হয়ে গেল — থানার পুলিশ-কর্মচারীরা থানা শূন্য রেখে উধাও হলেন। স্থানীয় শাসনযন্ত্রের ভিত শুদ্ধু কেঁপে উঠল।

গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের এই সংগ্রাম ও প্রতিরোধ আমাদের মতো অনগ্রসর দেশের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের অগ্রগতির পথে এক নতুন দিনের সূচনা করে। এমনি এক সম্ভাবনাপূর্ণ রাজনৈতিক রূপান্তর-মুহূর্তে আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে এবং দেশভাগের বিনিময়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হলো। জন্ম বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হলো আজাদ পাকিস্তানের এক অংশ।

স্বাধীন পাকিস্তানে জনগণের দাবি পূরণের আশা স্বভাবতই প্রবল হয়ে উঠল।

কিন্তু দিনের পর দিন অবস্থা ভিন্ন পথে পরিবর্তীত হতে থাকল। জনগণের

প্রতি লীগ সরকারের সমস্ত ওয়াদা মিথ্যা প্রমাণিত হলো। অপর পক্ষে, টংক ধান আদায় ও লেভী সংগ্রহের নামে গরিবের ধান লুঠ করার কাজে জমিদার-মহাজনের স্বার্থে লীগ সরকারের পুলিশ-আনসার বাহিনী এগিয়ে আসে।

ইতিপূর্বে দেশভাগের আগে এই এলাকার কৃষকেরা বিদেশী সরকারের আক্রমণকে উপেক্ষা করে টংক লেভী বন্ধ করে দিয়েছিল। দেশভাগের পরমূহূর্তে এ-দখল অব্যাহত থাকে। কিন্তু লীগ সরকার জমিদার-মহাজনদের স্বার্থে কৃষকদের কাছ থেকে জোরজুলুম করে টংক লেভী আদায়ের নির্দেশ দেয়।

কৃষকেরা তাদের অর্জিত অধিকার রক্ষার জন্য গড়ে তোলে এক দুর্জয় প্রতিরোধ :

"জান দিব তবু ধান দেব না—টংক লেভী রহিত চাই—ফসল কেটে ঘরে তোলো : দখল রেখে চাষ করো—জমিদারী প্রথা ধ্বংস হোক।"

এই আওয়াজ পাহাড় এলাকার দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। এই দাবিতে সমগ্র এলাকা জুড়েই চলতে থাকে বিচ্ছিন্ন সংগ্রাম।

আদিবাসী কৃষকদের এই বিক্ষোভ ও সংগ্রাম এবং প্রায় একই সময় সারা পূর্ব-পাকিস্তানব্যাপী বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঐতিহাসিক ছাত্র আন্দোলনের দৃষ্টান্ত পূর্ব-বাঙলায় ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম বিকাশের পথে প্রথম ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ—একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। পূর্ব-পাকিস্তানে ক্রমবর্ধমান জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে এই সীমান্ত এলাকার সংগঠিত উপজাতি কৃষকের সংগ্রামী ঐক্যের সম্ভাবনা লীগ সরকারকে আতঙ্কিত করে তোলে। তাই, আদিবাসী কৃষকদের পাকিস্তানের গণ-আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নির্মূল করার জন্য লীগশাহীর দমননীতি হিংস্র থেকে হিংস্রতর হয়ে ওঠে।

এই সময়ের মধ্যেই ভালুকাপাড়া গির্জার সামনে একটি শান্তিপূর্ণ কৃষক স্কোয়াডের উপর একদল সশস্ত্র পাকিস্তানী পুলিশ বাহিনী অতর্কিতে হামলা শুরু করে। সেই সময় দুর্ধর্ষ আদিবাসী নেতা প্রয়াত নয়ান হাজং-এর নেতৃত্বে কৃষক স্কোয়াড দল সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং মুহূর্ত মধ্যে পুলিশের অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়। যুগপৎ প্রতিরোধ ও আক্রমণে পুলিশ দিশেহারা হয়ে যায়। এই সংঘর্ষে তিনজন সিপাহী নিহত হয় এবং

কৃষক স্কোয়াড দল ২টি রাইফেল হস্তগত করে। সেদিনের সংগ্রামে কৃষক জঙ্গীদের কেউ মারা যায়নি।

এই সময়েই এলাকার পূর্বাঞ্চলে বিখ্যাত লেঙ্গুরার হাটে একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পাঞ্জাবী পুলিশ গুলিবর্ষণ করতে শুরু করে। কৃষকেরা প্রতিরোধ-সংগ্রামে এগিয়ে আসে এবং প্রচণ্ড লড়াই হয়। সেই প্রতিরোধ-সংগ্রামে মঙ্গলচাঁদ, অগেন্দ্র, স্বরাজ, যোগেন বাদক, বীর কৃষক-রমণী শঙ্খমণী, রেবতী, সারথী প্রভৃতি ১৫ জন মৃত্যু বরণ করে।

কিছুদিনের মধ্যেই মজুত ধান বিলি করার সময় সিলেট সুনামগঞ্জের প্রখ্যাত জঙ্গী নেতা রবি দাম মোহনপুর এলাকায় সশস্ত্র পুলিশ ফৌজের সঙ্গে এক শৌর্যপূর্ণ সংঘর্ষে নিহত হন।

এই সময় জঙ্গী কৃষক বাহিনী জমির পর জমি নিজেদের দখলে রেখে যৌথ খামারের মতোই পরস্পর সহযোগিতায় চাষের কাজ শুরু করে দিল। গড়ে উঠল যৌথ ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে 'জনক্যাম্প'। দুর্ভেদ্য গারো পাহাড়কে পশ্চাদ-ভাগে রেখে তারই পাশে রাণীপুরের 'জনক্যাম্প'।

অন্যদিকে জমিদার-মহাজন আর তাদের পোষা পেয়াদা-পুলিশ আনসার-মিলিটারি মারমুখী হয়ে উঠল। তারা অতর্কিতে জনক্যাম্পগুলির উপর হানল প্রচণ্ড আঘাত। রাণীপুর জনক্যাম্পে এক ভয়াবহ সংঘর্ষ বেঁধে যায়। পুলিশ ফৌজ আর জঙ্গীবাহিনীর মধ্যে সে-এক ভয়াবহ হাতাহাতি লড়াই। সিপাহীরা তিনজন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। আরও অনেকে আহত হয়। আর জঙ্গী কৃষক নেতাদের মধ্যে দুবরাজ, ক্ষিবোধ, নীরেন্দ্র, বীরঙ্গ, রমেশ, অতুল বীরের মৃত্যু বরণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতে আজ জমিদখলের সংগ্রাম চলেছে। সংগ্রামের সে-আগুন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। এই সংগ্রামের রণধ্বনি গ্রামের মেহনতী জনতাকে আলোড়িত করে তুলেছে, উদ্দীপিত করেছে তরুণ বিপ্লবীদের। এই মহান জন্মের গর্ভযাতনা অনুভূত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ২৫ বছর আগে বিভাগ পূর্ব-বাঙলার এই সীমান্তে—পাহাড়ী আদিবাসী অঞ্চলে। এই এলাকার আদিবাসী কৃষকের প্রতিরোধ-সংগ্রাম একদিন ইংরেজ সরকারকে আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল — বিভাগোত্তরকালে সেই এলাকার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মোকাবিলায় লীগ সরকারেরও নাভিশ্বাস উঠেছিল।

অর্জিত অধিকার রক্ষায় ও সামন্তশোষণের অবসানের জন্য এই এলাকার আদিবাসী কৃষকদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশে কৃষকবিদ্রোহের অগ্রগতির পথে এক নতুন পদক্ষেপ — নানা খণ্ড-বিখণ্ড আন্দোলন সংঘর্ষ আর শৌর্যপূর্ণ প্রতিরোধ-সংগ্রামে ঐতিহ্যমণ্ডিত এই এলাকা একদিন 'বাঙলার তেলেঙ্গানা' এবং 'মুক্ত অঞ্চল' নামে পরিচিতি লাভ করে।

কৃষক জনতার এই দুর্জয় প্রতিরোধের সামনে আতঙ্কিত লীগ সরকার পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেলস ও বালুচ সৈন্যবাহিনী দিয়ে সমগ্র এলাকাটি ঘিরে ফেলে। এবং এই সংগ্রামী এলাকার জনগণকে উৎখাত করার জন্য সাম্প্রদায়িক বিভেদ এবং দাঙ্গা বাধাবার অপকৌশলও চালাতে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে এলাকার জঙ্গী কৃষক বাহিনীর এবং সংগ্রামী জনতার এক বৃহৎ অংশ গারো পাহাড়ে, অধুনা 'মেঘালয়'-এ পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়।

সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অভিজ্ঞ ও অগ্রণীবাহিনী হিসেবে এই উদ্বাস্তু আদিবাসী জনতা 'মেঘালয়'-এর গণতন্ত্রকামী সংগ্রামী মানুষের এক নির্ভরশীল, নির্ভীক সহযোদ্ধা।

সম্প্রতি সারা ভারতে জমিদখলের জন্য এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে।

আজ দিন বদলের পালা। মেঘালয় রাজ্যেও এই আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করে গরিব জনতার পুনর্বাসনের কাজকে ত্বরান্বিত করার সুযোগ এসেছে।

তাই এখানের কৃষক ও কামউনিস্ট কর্মীগণ তাদের প্রিয় নেতা ললিত হাজং-এর নেতৃত্বে স্থানীয় অবস্থা ও সমস্যার ভিত্তিতে আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে চলেছেন।

বাঙলাদেশে কৃষক আন্দোলনের গোড়ার যুগ

সঞ্জয় গুপ্ত

১৯১৯-এর শেষের দিকে বাকুতে প্রাচ্য দেশসমূহের জনগণের সম্মেলনে বক্তৃতা করতে গিয়ে লেনিন স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছিলেন :

"আপনাদের সামনে এমন একটি কর্তব্য আসছে যা পৃথিবীর কোনও কমিউনিস্টদের সামনে কখনও আসেনি।...আপনাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে এমন একটা ক্ষেত্রে, যেখানে জনসংখ্যার অধিকাংশই হলো চাষী এবং যেখানে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে নয়, মধ্যযুগীয় জেরের বিরুদ্ধে লড়াই করাই কাজ...।"[১]

এর কয়েক মাস পরে আর একটি বিবৃতিতে লেনিন বলেন :

"এ-কথা শুনে আমি আনন্দিত যে বিদেশী পুঁজিপতিদের শোষণ থেকে নিপীড়িত জনগণের আত্মকর্তৃত্ব ও মুক্তির যে-নীতি শ্রমিক কৃষক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেছেন, তাতে স্বাধীনতার বীর যোদ্ধা, প্রগতিশীল ভারতীয়রা দ্রুত সাড়া দিয়েছেন। ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষক জাগরণের প্রতি রাশিয়ার মেহনতী জনগণ অবিচলিত মনোযোগে লক্ষ্য রেখে চলেছেন।"[২]

ভারতবর্ষে, বিশেষত বাঙলাদেশে রুশবিপ্লবের প্রভাবও যে যথেষ্ট পড়েছিল, লেনিনের বক্তৃতার বাইরেও, সরকারী নথিপত্রেই তার প্রমাণ রয়েছে। যেমন :

"রুশদেশে বলশোভিক শাসনের অস্তিত্ব অন্যান্য দেশে বিভিন্ন ধরনের বিপ্লবী বিক্ষোভকে প্রেরণা যোগাচ্ছে। ভারতের পক্ষে এ-কথা বিশেষভাবে সত্য, কেননা বলশেভিক সরকার তো দাঁড়িয়ে রয়েছে তার দরজার পাশেই। ...উত্তরপ্রদেশ ও বাঙলাদেশে কিষাণ সভা ও রায়ত সভা খোলাখুলি ভাবেই বলশেভিক-পন্থী। বলশেভিকরা যেভাবে চাষীর মধ্যে জমি বিতরণ করেছে, তা এদের খুবই আকৃষ্ট করেছে এবং ভারতীয়দের মধ্যে যারাই নিজেদের বলশেভিক বলে, তারাই এ-পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করছে।...ভারতে বিপ্লব হোক, তা নিশ্চয়ই লেনিনের কাম্য, কিন্তু লেনিন চান যে ভারতের বিপ্লব তার নিজস্ব বিশিষ্ট পথেই এগিয়ে চলুক।"[৩]

তবে বাস্তবে ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দৃষ্টি তখনও কৃষকদের

দিকে ফেরেনি। গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনই প্রথম জাতীয় চেতনার মোড় গ্রামের দিকে, চাষীদের দিকে ফেরাল। বাঙলা-দেশেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বললেন : স্বরাজ হতে হবে শতকরা নিরানব্বই জনের জন্যই। অবশ্য দেশবন্ধু বক্তৃতা করলেন বটে, তাতে বাঙলার কংগ্রেস খুব একটা সাড়া দিল না। তবে বুদ্ধিজীবীদের মুখে কেউ কেউ কৃষকদের কথাটা ধারালোভাবে উপস্থিত করলেন। বীরবল (প্রমথ চৌধুরী) ইতিপূর্বেই প্রবন্ধ লিখেছিলেন "রায়তের কথা"। এবার জাতীয়তাবাদী মুখপত্রে একটি চিঠি লিখে তিনি বললেন :

"আপনার কাগজেই পড়লুম যে পেট্রিয়টরা রায়তের দুঃখের কথা, যতদিন তারা স্বরাজ না পাবেন, ততদিন মুলতবি রাখতে চান।...অর্থাৎ আমাদের জাতীয় সকল পাপ তাঁরা আপাততঃ পোষণ করতে চান। তারপর তাঁরা যেদিন স্বরাজ পাবেন, সেইদিন ভারতবাসী গঙ্গাস্নান করে সকল পাপ থেকে মুক্ত হবেন।"[৪]

তাসখন্দে নবগঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পক্ষ থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায়, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মুখপত্র "ইম্প্রেকর"-এ যে-প্রবন্ধ লেখেন, তার সারমর্ম ছেপে বের করেন জাতীয়তাবাদী সপ্তাহিক "আত্মশক্তি"। তাঁরা লেখেন :

"শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় কংগ্রেসের কার্যপ্রণালী কিরকম হওয়া উচিত তার একটি প্রোগ্রাম প্রচার করেছেন।...জমিদারী প্রথা উঠিয়ে দিয়ে দেশে জমি জাতীয় সম্পত্তি করা হবে ; জমির খাজনা যথাসম্ভব কম করা হবে ; খাজনার হার চিরস্থায়ী করা হবে ; কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক খুলে কৃষকদের মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করা হবে, তাদের চাষের যন্ত্র সরবরাহ করা হবে··· ।"[৫]

"আত্মশক্তি" ছিল জাতীয়তাবাদীদের প্রগতিপন্থী অংশের মুখপাত্র। তাই তারা এ-ব্যাপারে নিজেদের মত প্রকাশ করে লিখল :

"যাঁরা কাউন্সিলে গিয়ে লড়াই করতে চান, তাঁরা চাষীদের হয়ে লড়তে রাজী আছেন ? তাঁরা একথা বলতে রাজী আছেন যে চাষের জমি চাষীদের সম্পত্তি বলে স্থির করা হোক ? জমিদার শুধু উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, তারা জমির কেউ নয়। তা বলতে যদি রাজী থাকেন তবে সমস্ত প্রজা তাদের পক্ষে এসে দাঁড়াবে। ...আর স্বরাজ যদি শুধু ফাঁকা বুলি হয় তাহলে তার জন্য এ-দেশে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স কস্মিনকালেও হবেনা।"[৬]

অন্য একটি সম্পাদকীয়তে তারা লিখল :

"স্বাধীনতা সংগ্রামে সবাই হয়তো নিজের পুঁটুলি বাঁচাবার চেষ্টা করবে। ...কিন্তু এই কুলি মজুর চাষার দলের পুঁটুলি নেই। লড়বার মতো একটা আদর্শ আর এক্‌ জোট হয়ে কাজ করবার শক্তি যদি এরা পায়, তাহলে এরা অসাধ্য সাধন করবে। এরাই শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকবে ..।"৭

এই সময়েই 'ইম্প্রেকরে' এক প্রবন্ধে, এম. এন. রায়ও লেখেন :

"ভারতের মুক্তি আন্দোলনে বর্তমানে সবচেয়ে শক্তিমান উপাদান হচ্ছে দেশব্যাপী কৃষক গণবিক্ষোভ। ..যে কেন্দ্রীয় স্লোগানটি দিয়ে সমগ্র ভারতের কৃষক বিক্ষোভকে একসূত্রে বেঁধে দেওয়া যায়, তা হচ্ছে 'খাজনা দেব না'। গণ-আইন অমান্য আন্দোলন সমস্ত গরিব চাষীর চেতনাকে মথিত করে তুলেছে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের এখন আর ক্ষমতা নেই গরিব চাষীকে রুখে রাখবার। তাই কৃষিবিক্ষোভ দাবানলের মতোই ছড়িয়ে পডছে সারা দেশে...।"৮

এই সময়ই দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্ত, তরুণ সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হেমন্তকুমার সরকার এগিয়ে এলেন চাষীদেব সংগঠিত করতে। তাঁকে সমর্থন জোগালেন বামপন্থী বুদ্ধিজীবি ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত। সঙ্গে রইলেন জনাব শামসুদ্দিন। তিনি 'বলশেভিকদের চর' এই অভিযোগ করলে, জবাবে হেমন্তবাবু লেখেন :

"জাতির পুণর্গঠনে বা স্বরাজ লাভের পথে যে-সমস্ত বাধা, সেগুলি ধ্বংস করা দরকার। আমলাতন্ত্রের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কৃত্রিম সৃষ্টি যে-জমিদার সম্প্রদায়, তাহার ধ্বংস না হইলে দেশের কল্যাণ নাই।...কৃষককে রুদ্রের উপাসক হইতে বলি না — তবে নিজের ন্যায্য অধিকারটুকু মানুষের মতো বুঝিয়া লইয়া বাঁচিবার উপায় করিতে বলি।"৯

এর বছরখানেকের মধ্যে বাঙলার বহু জেলায় কৃষক সম্মেলন সংগঠিত হলো — প্রত্যেকটিরই সভাপতি হয় হেমন্তকুমার সরকার, নয়তো জনাব শামসুদ্দিন। ১৯২৫এর শেষে 'আত্মশক্তিতে' এই খবরটি বের হলো :

"সম্প্রতি বাঙলার বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি প্রজা সম্মিলনের অধিবেশন হয়ে গেছে। তন্মধ্যে বীরভূম প্রজাসম্মিলন, বগুড়া জেলা প্রজা সম্মিলন, পূর্ববঙ্গ রায়ত কনফারেন্স, ময়মনসিংহ শ্রমিক ও কৃষক সম্মেলন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত প্রত্যেক সম্মিলনেই বহু কৃষক উপস্থিত হয়েছিল। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :

১। গবর্নমেণ্ট প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনের নিমিত্ত যে-পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা প্রজাসাধারণের দিক হইতে সন্তোষজনক নহে। অতএব ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ যেন ইহা মঞ্জুর না করেন।

২। কৃষকগণকে জমিতে কায়েমী স্বত্বক্রমে নিম্নলিখিত অধিকার দিতে হইবে :

(ক) স্বেচ্ছায় বিনা সালামিতে জমি হস্তান্তর করিবার অধিকার,

(খ) বিনা সালামিতে কূপ ও পুষ্করিণী খনন করা, পাকা বাড়ি তৈয়ারি করিবার ও গাছ কাটার অধিকার।"[১০]

১৯২৫-এরই শেষে গড়ে উঠল শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ দল, যাদের সংক্ষেপে সে-যুগের লোকে বলত লেবার-স্বরাজ পার্টি। তাদের মুখপত্র হলো 'লাঙল' যার সম্পাদক ছিলেন বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। দলের গঠনতন্ত্রে লেখা হলো যে "যেহেতু কোন কৃষিজীবী জাতির সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠ অধিকার, সেই যাহাতে সে নিজের জমির স্বত্বাধিকারী হয়"[১১] তার জন্য ঐ দল নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন করে যাবে এবং "নারীপুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা সূচক স্বরাজ্য লাভই এই দলের উদ্দেশ্য।"[১২]

১৯২৬এর ফেব্রুয়ারিতে কৃষ্ণনগরে এই দলের সম্মেলন থেকে দলের নাম বদলে রাখা হলো পেজাণ্টস অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি। সভাপতি হলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সহ-সভাপতি অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক হেমন্তকুমার সরকার। কাগজেরও নাম বদলে রাখা হলো 'গণবাণী'—নতুন সম্পাদক হলেন মুজফ্‌ফার আহমেদ। পরের বছর সম্মেলনে দলের নাম আর একটু বদলে হলো 'ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজাণ্টস পার্টি'—নতুন সাধারণ সম্পাদক হলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি য়ুরোপ গেলে, অস্থায়ী সম্পাদক হলেন আব্দুর রেজ্জাক খাঁ। জমিদারি প্রথার অবসান ও চাষীর হাতে জমি বিতরণের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠল 'গণবাণী' ও এই নতুন দল। তার জোর প্রতিফলন পড়ল বাঙলার কংগ্রেসেরও অভ্যন্তরে। একই ধরনের দল গড়লেন মাদ্রাজে সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার এবং বোম্বাই প্রদেশে ডাঙ্গে, মীরাজকর, ঘাটে, যোগলেকর প্রভৃতি। পাঞ্জাবে সর্দার সোহন সিং যোশ সম্পাদনা করলেন 'কীর্তি' বলে পত্রিকা এবং গড়ে তুললেন ভগৎ সিংহের সহায়তায় কীর্তি কিষাণ পার্টি। ১৯২৮এ কলকাতায় অ্যালবার্ট হলের সম্মেলনে জন্ম লাভ করল

সারা ভারত ওয়ার্কার্স ও পেজান্টস পার্টি। তার কয়েকমাসের মধ্যেই গ্রেপ্তার হলেন এই বামপন্থী নেতারা—শুরু হলো ঐতিহাসিক মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা (মার্চ ১৯২৯)।

নতুন দল বাঙলাদেশে ও বাইরে অনেকগুলি বড় বড় শ্রমিক ধর্মঘট পরিচালনা করেন। কিন্তু বড় কোনও কৃষক সংগ্রাম তখনও তাঁরা শুরু করতে পারেননি। কৃষকের মধ্যে কাজ তখনও সীমাবদ্ধ ছিল প্রচারের স্তরে। কৃষকের মধ্যে গণসংগ্রাম দেখা দিল ত্রিশের দশকে—আর সেইসব সংগ্রামের আগুনেই জন্ম নিল বাঙলাদেশের কৃষক সভা। সে আর এক ইতিহাস। কিন্তু কৃষক আন্দোলনের সেই বনস্পতির বীজ রোপিত হয়েছিল বাঙলাদেশে, বিশের দশকেই—ঐ সব প্রচার, সভা ও সম্মেলনের মাধ্যমেই। আর গোড়ার যুগের অঙ্কুরিত সংগঠন ও রোমাণ্টিক বিপ্লববাদী সাম্যবাদীদের ভূমিকার তাৎপর্যও সেইখানেই।

পাদটীকা

১। লেনিন: 'প্রাচ্য জনগণের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির দ্বিতীয় কংগ্রেসে ভাষণ,' ২২ নভেম্বর ১৯১৯

২। লেনিন: 'ভারতীয় বিপ্লবী সঙ্ঘের প্রতি', প্রাভদা. ২০মে ১৯২০

৩। সেসিল কে: ভারতে বলশেভিক কার্যকলাপ সম্পর্কে গোপন রিপোর্ট, হোম / পল / এফ ৪৫-৪৬, জানুয়ারি ১৯২১

৪। 'বীরবলের পত্র': 'আত্মশক্তি', ২৭ ডিসেম্বর ১৯২২

৫। 'মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রোগ্রাম': 'আত্মশক্তি' ঐ

৬। 'একমাত্র উপায়': 'আত্মশক্তি'. ১৩ ডিসেম্বর ১৯২২

৭। 'চাই নূতন দল': 'আত্মশক্তি', ২৫ অক্টোবর ১৯২২

৮। এম. এন. রায়: 'দি পেজাণ্ট মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া', 'ইম্প্রেকর', ২২ জুন ১৯২২

৯। হেমন্ত সরকার: 'আত্মশক্তি', আলোচনা, ২৭ মার্চ ১৯২৫

১০। 'বাঙলায় প্রজা সম্মিলন', 'আত্মশক্তি' ১৫ই মাঘ ১৩৩২ (১৯২৫)

১১। 'লাঙল', ৭ই জানুয়ারি ১৯২৬

১২।   ঐ   ঐ

ধানের আশ্চর্য গন্ধ

কৃষ্ণ ধর

দেখেছি অনেক মাঠ জাগরিত চঞ্চল ফসলে
দেখেছি বাঙলাদেশেই আদিগন্ত প্রসন্নতা ঘিরে
ছেয়ে আছে যেন এক আত্মভোলা শিল্পীর স্বভাবে।

বিচিত্র হাওয়ার দোলায় রঙছোপ, পোছ-দেওয়া মাটির বুকেতে
বিস্তৃত সবুজ সোনা আলপনা যেন এক রেনেশাসে জীবন্ত ক্যানভাসে।

নদী বহে অবিরল, পায়ে বাজে পরিচিত স্বর
নূপুর যেন বা তার কথা কয় কলকণ্ঠে মেঘের দুপুরে
ধানের সোনালী গুচ্ছ চুলে বেঁধে দুরন্ত কিশোরী
দেখেছি তারেই যেন কখনো বা সমাহিত সুমহান শস্যের স্তবে।

কা'রা এই অনিন্দিত শিল্পকর্ম খোলামাঠে রেখে দিয়ে গেছে
কা'রা এর শিল্পী কা'রা এমন দাক্ষিণ্যে
ভরে দিয়ে গেছে মাঠ, কা'রা সেই সুজন কৃষক
কবে তারা ফিরে আসবে নিজেদের শিল্পশস্য
তুলে নিতে নিকোনো উঠোনে?
কবে তারা জল বহে নিয়ে আসবে আমাদের তৃষ্ণার শিকড়ে?
রাত্রির কঠিন বেড়া, পথ সেকি এখনও সুদূর?
বীজে তার কান্না শুনি, ধানে তার আশ্চর্য সুবাস
নদী মাঠ গ্রাম গঞ্জ ভরে গেছে শস্যের গানে
শুনেছি চলার আওয়াজ পায়ে পায়ে হাঁটাপথে বৈজয়ন্ত গান
দিলখোলা সবল গলায়
শুনেছি আমারও সে অনাদি আত্মীয় তার শিরায় শিরায়
সুর তোলে আগামীর নিশ্চিত ভৈরবী

ঝড়জল বিদ্যুতের, বুলেটের কাঁদানে ধোঁয়ার
প্রতিবাদী আমাদের ভাই।

বঞ্চিত ক্ষুধার্ত খিন্ন এসেছে সে নিতে অধিকার
শস্যের সম্ভার
জাগাবে সে নিদ্রিত মাটির বুকে আমাদের সকলের গান।

শিল্পী জানে সৃষ্টি তার সবুজে সোনায় মিলে খেলাবে বিদ্যুৎ
আগামী দিনের মাঠে
ধানের আশ্চর্য গন্ধে ভরে যাবে আমাদের নিরন্ন সময়।

এখন গোধূলিলগ্ন, এখন বিবাহ

অমিতাভ দাশগুপ্ত

আরক্তিম বাঙলাদেশ,
　　　　এখন গোধূলিলগ্ন, এখন বিবাহ।
সময় মৃদঙ্গে মেঘে গুরুগুরু
নীল আলো অরণ্য-শিখরে
　　　　আলো জলতলে ত্রিকাল-শিলায়—
বিবাহে চলেছে বিলোচন।

এখানে দাঁড়াও।
　　　　ত্যাখো—এই মাটি তোমার ভায়ের
রক্তে-শ্রমে মাখামাখি,
মায়ের দুধের মতো ফিনিকে ফিনিকে ওঠা ধান,
　　　　এই নদী
মহানিম, আদিবট, মগ্ন পাকুড়ের
জটায় মেঘের বাসা বুকে নিয়ে বহতা আবেগে,

এই দেশ
গৈরিক-সবুজ
পাশাপাশি ঘনমিশ
পড়োশীর উত্তাপে, আবেশে,
এখানে দাঁড়াও—এই মাটি, স্বচ্ছ বহমান নদী,
স্বপ্ন, গাঢ় ভালোবাসা, অশ্রুতে নিবিড়
আবহমানের বাঙলাদেশ।

ডেকোনা প্রচ্ছায়া-ঘন ডালপালা আকর্ষি ছড়িয়ে
আমি যাই
দিনশেষে রক্তিম মুকুল ফোটাবে রয়েছো বসে
যাই আমি যাই
আয়তনবতী হয়ে ঈশানে নৈর্ঋতে উৎস পরিণামে
দু-আঁখি পাগল করা মানুষের পায়ে পায়ে
কাঁধে কাঁধ ঘষে যাওয়া বিদ্যুতে প্রদাহে
বুকের বাঁ-দিকে ঘন আঁতের ওপরে হাত চেপে
অমন ক'রে কি ডাক দিতে আছে—
যাই আমি যাই।

হে পরাণ-বঁধু ভালোবাসা
গাঢ় দীর্ঘিকার চেয়ে অতল চোখের ভাষা জানো
শব্দ কোরোনাকো
তুমুল আবেগ
নেমেছে পাহাড় থেকে ঢল হয়ে
তুমুল আবেগ
চলেছে জংশন থেকে খরস্রোতা রাঙা পথ হয়ে
কৈবর্তের জাল-ফেলা দাওয়ার উপর
সে শুয়ে রয়েছে মাজা, চকচকে ইলিশের আঁশে,
গোহালে ধূনোর ঝিম্ ধরা গন্ধে,
ত্রিনাথের মেলায় বাউল-মুর্শেদের
লোক-বিভঙ্গের ঠামে,

উজ্জ্বল শস্তের ধারে শান-পড়া হাসুয়ায়—
শব্দ কোরোনাকো।

কে থামাতে পারে ?
যখন দাঁড়াও তুমি উলি-ঝুলি আড়্‌রাখা ছেড়ে
ভুবনমোহিনী রাজ-রাজেশ্বরী
আহা, দেখি নাই, এত রূপ বুঝি জন্মে দেখিব না,
তোমাতে মিলায় তৃষ্ণা, পারাপার,
রাতুল-বরণ পাটে তোমার অলক্ত-রাঙা পা-দুখানি
পড়ে কি পড়ে না,
উথল বুকের দুধে দগ্ধশেষ গহিন শিকড়ে
রসের ভিয়ান গড়ো,
বাঁজা গাছে গুপ্ত-ঘাতকের অস্ত্রে ঝলকে ঝলকে
শোণিতে রাঙাও চাপ চাপ কুসুমের কাতরতা,
এখন সমস্ত ঘর, ভদ্রাসন, উঠোন, আঙিনা
ও বিতত ভ্রূভঙ্গের টানে
চলেছে ত্রিস্রোতা হয়ে—
কে কাকে থামাবে ?

আঁকা-বাঁকা নদী তুমি মানুষের সীমার নিকট দিয়ে
বহে যেতে যেতে
ঘরে ঘরে ডাক দাও
উৎসবে ব্যসনে চণ্ড-ভৈরবের উদাস শ্মশানে
প্রতিধ্বনি ফিরে আসে
সামাল আছো হে
রাঙামাটি রুক্ষ রাঢ় ক্ষ্যাপাজলবিভাজিকা-জড়ানো দক্ষিণ
বঙ্গহৃদি কলকাতা
উত্তরে আয়ত পৌণ্ড্রবর্ধনের পাথর-প্রতিমা
সামাল আছো হে

এখনই অর্জুন, উইলো, দেবদারু পয়েন্টিসিমা-র
শিখরে লাফিয়ে উঠবে নাড়ি-ছেঁড়া চাঁদ
কড়্‌কড়্‌ অস্থি-পঞ্জরের 'পরে খেলা হবে পাশা—
সামাল আছো হে।

তোমার ঘাড়ের পাশে গজিয়ে উঠবে আততায়ীর উল্লাস—
টাঙি পাশে রেখো।
বাঁশ-ঝাড়ে কুড়ুলের শব্দ জাগে—তুমি কি শুনেছো?
পাড়ায় পাড়ায় এই ধূম্রার্দ্র-লোচন রাতে
মহল্লায় টারিতে টারিতে
সবাই আছো তো জেগে—বউ, ঝি, বাছারা জেগে আছে?
এমন এলাহিযজ্ঞে সকলের দোরে দোরে
বাবুপাড়া আগুরিপাড়ায়
যথাযথ নিমন্ত্রণ হয়েছে জানানো?

আনো তবে ফুলভার
আনো দীপ্র কেউর-কুঙ্কুম
সাজাও রোমাঞ্চে প্রেমে
আ-মরি বাঙলার মুখখানি;
এতদিনে এমন মাহেন্দ্র-লগ্নে
তোমাদের ঘরের দাওয়ায়
শিস্‌-ওঠা-লণ্ঠনের থরথর, নরম ছায়ায়
মাঙ্গলিক-সূত্র হাতে
দখলি চরের মতো নতুন মুখের টানে
বিবাহে এসেছে বিলোচন।

শহীদ কম্পরাম সিং

সত্যেন সেন

দিনাজপুর জেলার লাহিড়ীহাটে মে-দিবসের উৎসব। স্বাধীনতা লাভের বছরখানেক আগেকার কথা। দিনাজপুর শহর থেকে লাহিড়ীহাটে যেতে হলে ঠাকুর গাঁ হয়ে যেতে হয়। ঠাকুর গাঁর পরের ষ্টেশন আখানগর। আখানগর থেকে লাহিড়ীহাট পর্যন্ত বরাবর একটা কাঁচা রাস্তা চলে গিয়েছে। মাইল সাতেকের পথ। লাহিড়ীহাট নামকরা হাট। বহু দূর দূর থেকে লোকেরা সেখানে হাট করতে আসে।

মে-দিবসের সভা। বিরাট সভা। কৃষক-সমিতির ডাকে চারিদিককার গ্রামগুলি ভেঙে লোক এসেছে। এখনও আসছে। হাজার কুড়ি লোক সভায় জমায়েত হয়েছে। দিনাজপুরের বিশিষ্ট কৃষক-নেতাদের মধ্যে প্রায় সবাই এসেছেন।

লাহিড়ীহাট উৎসব সজ্জায় সেজেছে। সভার সামনে বিরাট এক লাল নিশান সগর্বে পতপত করে উড়ছে। গেট সাজানো হয়েছে লাল ফেস্টুন দিয়ে। এদিকে, ওদিকে,—চারিদিকেই লাল নিশানের ছড়াছড়ি। যেদিকেই তাকাও লালে-লাল। মে-দিবস সারা পৃথিবীর মেহনতী মানুষের আনন্দ উৎসবের দিন। এই দিনেই সংগ্রামী শ্রমিকদের বুকের রক্তে রঞ্জিত লাল নিশানের জন্ম হয়েছিল। সেদিন থেকে এই লাল নিশান সারা বিশ্বের মজুর, কৃষক ও সমস্ত মেহনতী মানুষকে—সংগ্রামের পথ নির্দেশ করে চলেছে।

কিন্তু এই আনন্দ উৎসবের মাঝখানেও একটা দুঃখের কালোছায়া ছড়িয়ে পড়েছে। একজনের অনুপস্থিতি সবাইকে ব্যথিত করে তুলেছে। এখানে ওখানে বলাবলি চলছে—এমন উৎসবের দিন, এত লোক জড় হয়েছি আমরা, কিন্তু কম্পদা আজ সভায় থাকতে পারল না। এত লোকের মাঝখানেও কেমন যেন খালিখালি লাগছে।

সকল সময় সব কাজে যিনি পুরোভাগে থাকেন, কাজে-কর্মে যার উৎসাহ আর সকলের উৎসাহকে ছাপিয়ে উঠে, সেই কম্পদা বা কম্পরাম

সিং আজ সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাঁর অভাবটা সবার মনেই বাজছে। কম্পদার একটি মাত্রই ছেলে। অনেকদিন থেকেই সে রোগে ভুগছিল। সেই ছেলে গত রাত্রিতে মারা গিয়েছে। এ-অবস্থায় কম্পদা কি করেই বা আসবেন! তিনি ছেলের শবদেহ দাহন করবার জন্য অন্যান্য শ্মশান বন্ধুদের সঙ্গে শ্মশানে গেছেন।

সভার উদ্যোক্তারা সভার কাজ শুরু করবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করছেন। একজন নওজওয়ান সভার আরম্ভ ঘোষণা করবার জন্য শ্লোগান দিতে শুরু করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে হাজার হাজার মিলিত কণ্ঠের আওয়াজ উঠল। সেই মিলিত আওয়াজে সারা আকাশটা থেকেথেকে কেঁপে উঠতে লাগল।

শ্লোগান থামতেই সভার লোকেরা সচকিত হয়ে শুনল, দূর থেকে অনুরূপ আওয়াজ ভেসে আসছে। এ কি প্রতিধ্বনি? না, প্রতিধ্বনি নয়, লক্ষ্য করে বোঝা গেল, কারা যেন শ্লোগান দিতে দিতে সভাস্থলের দিকে এগিয়ে আসছে। সম্ভবত কোনো গ্রাম থেকে একদল কৃষক সভায় যোগ দেওয়ার জন্য আসছে। ঠিকই তাই। একটু বাদেই দেখা গেল, একটা মিছিল একটা ঝোপের আড়াল কাটিয়ে হঠাৎ সামনে চলে এল। কারা এরা? সবাই উৎসুক হয়ে লক্ষ্য করতে লাগল।

মিছিলটা কাছাকাছি এসে পড়তেই চমকে উঠল সবাই। মিছিলের সামনে সবার আগে এ কে? কম্পদা না? হ্যাঁ, কম্পদাই তো। তাঁর পাশে একটি শাদা থান পরা বিধবা মেয়ে। কম্পদা তার হাত ধরে এগিয়ে আসছেন, আর তার সুপরিচিত জলদগম্ভীর কণ্ঠে শ্লোগান দিচ্ছেন, "মে-দিবস জয়যুক্ত হোক", "দুনিয়ার মজুর চাষী এক হও"। মিছিলের লোকেরা গলায় গলা মিলিয়ে তাঁর আওয়াজে সাড়া দিয়ে চলেছে।

সেই মিছিল যখন সভার সামনে এসে দাঁড়াল তখন সবাই দেখল কম্পদার কোমরে গামছা বাঁধা, তাঁর মাথার রুক্ষ চুলগুলো উড়ছে। পিছনে আরও কয়েকজন শ্মশানবন্ধু, তাদেরও ঐ একই মূর্তি। চেহারা দেখে বোঝা যায় যে, তাঁরা দাহকর্ম শেষ করেই শ্মশান থেকে সোজা সভার জায়গায় চলে এসেছেন। তাঁদের পিছনে শ'খানেক লোক।

থান পরা বিধবা মেয়েটির এক হাত কম্পদার হাতে, আর এক হাত দিয়ে সে নিজের মুখ চেপে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদছে। সে কি কান্না। কিন্তু

কম্পরাম সিং এর চোখে এক বিন্দু অশ্রু নেই। তিনি সামরিক কায়দায় লাল ঝাণ্ডাকে সেলাম জানিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন আর সেই অশ্রুমতী মেয়েটিকে পরম স্নেহে নিবিড়ভাবে কাছে নিলেন। এমন একটা দৃশ্য দেখবার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। হাজার হাজার লোক, কারু মুখে কোনো কথা নেই, সবাই অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চ থেকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নেমে এলেন। তাঁদের মধ্যে একজন দু-হাত বাড়িয়ে কম্পদাকে জড়িয়ে ধরলেন। সান্ত্বনার ভঙ্গিতে কি একটা কথা যেন বললেন। কিন্তু কম্পদার মুখে কোনো ভাব বিকার লক্ষ্য করা গেল না। তেমনি অবিচল, স্থির। কোনো কথা না বলে বিধবা পুত্রবধূর হাত ধরে তিনি মঞ্চের উপর গিয়ে উঠলেন।

সভাপতির অনুমতি নিয়ে কম্পদা কিছু বলবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। কুড়ি হাজার লোক উৎকর্ণ হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কি বলবেন কম্পদা? এইমাত্র একমাত্র ছেলেকে পুড়িয়ে ছাই করে এলেন। আর এখনই উঠে দাঁড়িয়েছেন বক্তৃতা দিতে। এ-মানুষ কি পাথর না লোহা দিয়ে তৈরি?

কম্পদা বলে চললেন:

ভাইসব, আজ মে-দিবসের সভা। আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেল। কেন দেরী হলো আপনারা হয়তো তা জানেন। আমার ছেলে, সে তো শুধু আমার ছেলেই ছিল না, সে ছিল আমার বিপ্লবের সাথী, আমার কমরেড। আমার সেই কমরেড আজ আমার পাশে নেই। তাকে চিতার আগুনে ছাই করে দিয়ে এলাম।

ভাইসব, আপনারা হয়তো ভেবেছিলেন যে, আমি সভায় আসব না। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেকে বাধাও দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ মে-দিবসের সভা এই পবিত্র দিনে এখানে আমার হাজার হাজার ভাইরা মিলিত হয়েছেন। এমন দিনে আমি কি তাদের মধ্যে না এসে থাকতে পারি। ভাইসব, সারা দেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ কৃষক সন্তান আজ তিল তিল করে মৃত্যুমুখে এগিয়ে চলেছে, বেঁচে থেকেও তারা দিবারাত্রি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে। তাদের বাঁচাবার জন্য আমাদের এই সংগ্রাম। তাদের কথা মনে করলে আমাদের এই ব্যক্তিগত দুঃখ তুচ্ছ হয়ে যায়। আপনাদের সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আমার পুত্রশোক ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি। সদ্য স্বামীহারা মেয়েটি কম্পদার পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়েছিল। কম্পদা তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে

দিয়ে বললেন, কাঁদিস না বেটী কাঁদিস না এই যে তোর সামনে হাজার হাজার কৃষক ভাইকে দেখছিস এরা তোরই ভাই, তোরই আপনজন। এদের সবার সুখ-দুঃখের সঙ্গে তোর নিজের সুখ-দুঃখ মিশিয়ে নে। এদের সঙ্গে এক হয়ে সমিতির কাজে আপনাকে ঢেলে দে। এই পথেই শান্তি পাবি, আনন্দ পাবি।

এই বলে পুত্রবধূকে পাশে নিয়ে বসে পড়লেন কম্পদা। বিহ্বল জনতা কয়েক মুহূর্তের জন্য ভাষা হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর গগনভেদী ধ্বনি উঠল, "কম্পরাম সিং জিন্দাবাদ।" ধ্বনির পর ধ্বনি উঠতে লাগল, ওরা কিছুতেই থামতে চায় না।

মে-দিবস এ-দেশে প্রতি বছরই নিয়মিতভাবে উদযাপিত হয়ে আসছে। কিন্তু লাহিড়ীহাটের সেদিনকার সেই মে-দিবসের অনুষ্ঠান এক নতুন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। এ-ছবি তুলে ধরার মতো। এই ছবি দেখে আমাদের দেশের চাষী, মজুর আর মেহনতী মানুষেরা প্রেরণা পাবে, উৎসাহ পাবে, সাহস পাবে। কিন্তু যার বলিষ্ঠ তুলির আঁচড়ে এই ছবিটি সার্থকভাবে ফুটে উঠবে, কোথায় সেই শিল্পী?

দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙা থানার অন্তর্গত উত্তর-পারিয়া গ্রামের মাটি উর্বরা। এখানে বহু আত্মত্যাগী ও নির্ভীক কর্মীর সৃষ্টি হয়েছে। কম্পরাম সিং এই গ্রামে জন্মলাভ করেছিলেন। তাঁরা তিন ভাই—কম্পরাম সিং, সন্তরাম সিং আর সেবকদাস সিং। মধ্যবিত্ত কৃষক ঘরের সন্তান, সুখে দুঃখে জীবন কাটছিল। অবস্থার তুলনায় সমাজে তাঁর মর্যাদা ছিল অনেক বেশি। নির্ভীক চরিত্র আর নিঃস্বার্থ সমাজ সেবার জন্য তিনি চিরদিনই সকলের শ্রদ্ধা পেয়ে আসছিলেন।

সমাজের সর্বসাধারণের কল্যাণ কামনা জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁকে এক নতুন পথে টেনে নিয়ে এল। আমাদের দেশে যে-বয়সে লোকে আপনাকে সংসার থেকে গুটিয়ে নিয়ে এসে পরলোকের ভাবনায় ডুবে যায়, সেই সময় পঞ্চাশোর্ধে এসে তিনি নবজন্ম লাভ করলেন। কৃষক আন্দোলনের ঢেউ তখন সারা বাঙলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ঢেউ দিনাজপুর জেলার চির-নিপীড়িত কৃষক সমাজকে আন্দোলিত ও প্রাণচঞ্চল করে তুলল। বার্ধক্যের দুয়ারে দাঁড়িয়েও কম্পরাম সিং কৃষক-সমিতির আহ্বানে সাড়া দিতে দেরী করেননি।

কৃষক-সমিতির নির্দেশে হাটে হাটে তোলাবাটি বা তোলাগাণ্ডি আন্দোলন

শুরু হয়ে গেল। প্রবল প্রতাপশালী জমিদারেরা দীর্ঘদিন ধরে হাটেহাটে তোলা আদায় নিয়ে অকথ্য জুলুম চালিয়ে আসছিল। জমিদারের দুর্দান্ত কর্মচারীরা ক্রেতা ও বিক্রেতা দু-পক্ষের কাছ থেকেই ভারী হাতে তোলা আদায় করত। নিতান্ত গরিব-গরবা মানুষ, যারা দু-চার পয়সার কাজ কারবার করতে যেত তারাও তাদের হাত থেকে রেহাই পেত না।

এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপত্তি করতে বা প্রতিবাদ জানাতে গেলে মারপিট খেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে ঘরে ফিরতে হতো। কৃষকদের এমন মনোবল বা ঐক্যবদ্ধ শক্তি ছিল না যে, তাদের বিরুদ্ধে সাহস করে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। তারা ভাগ্যের দোহাই দিয়ে সবকিছুই মুখ বুজে সহ্য করে যেত। দীর্ঘ দিন ধরে, শুধু দিনাজপুরে নয়, সারা বাঙলাদেশ জুড়ে এই ধারাই চলে আসছিল। কিন্তু যুগের ধর্মে হাওয়া বদলে গেল। দিনাজপুরের কৃষকেরা জমিদারের এই বলগাহীন জুলুমের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করল।

ব্যাপার দেখে সারা দেশের লোকের বিস্ময়ের সীমা রইল না। দিনাজপুরের মাটিতে এমন সমস্ত ঘটনা ঘটতে পারে, এ-যে স্বপ্নেরও অগোচর। দেখা গেল, গ্রামেগ্রামে কৃষক-সমিতির লাঠিধারী ভলান্টিয়াররা কুচকাওয়াজ করছে। হাটের দিনে তারা সুশৃঙ্খলভাবে মার্চ করে হাটেহাটে যায়, সারা হাট টহল দিয়ে বেড়ায়, মাঝেমাঝে সুবিধামতো জায়গায় দাঁড়িয়ে এই জুলুমের বিরুদ্ধে প্রচার বক্তৃতা করে আর কিছু সময় বাদেবাদেই আওয়াজ তোলে—"তোলা আদায় বন্ধ কর", "কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ"। তাদের মিলিত আওয়াজে সারা হাটটা গমগম করতে থাকে। হাটুরে লোকেরা হাতের কাজ বন্ধ রেখে মুগ্ধ হয়ে তাদের বক্তৃতা শোনে। ওদের সাহস দেখে তারা অবাক হয়ে যায়।

লাহিড়ীহাট থেকে পাঁচ মাইল দূরে কম্পরাম সিং-এর গ্রাম উত্তর-পারিয়া। কম্পরাম সিং লাহিড়ীহাটের তোলাবটি আন্দোলন পরিচালনা করেন। আন্দোলন দিনদিন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে লাগল। জমিদার পক্ষও চুপ করে বসে ছিল না। তারা প্রথম থেকেই থানার লোকদের সঙ্গে ঘোঁট পাকিয়ে চলছিল। এইসব নিয়ে উপরওয়ালা অফিসারদের সঙ্গেও তাদের মহরম-মহরম চলছিল। উপরওয়ালা প্রভুরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। যে-চাষীরা সাত চড়েও রা করত না, নিঃশব্দে পড়েপড়ে মার খেত, তাদের মধ্যে এত সাহস কেমন করে এল? এ তো ভালো কথা নয়। এর ভবিষ্যৎ

সেণ্ট্রাল জেলে গুলী চালনার ঘটনা সেই সংগ্রামেরই একটি রক্তাক্ত অধ্যায়।

সরকার ও জেল কর্তৃপক্ষের অপমানজনক ব্যবহারের ফলে কর্তৃপক্ষ ও রাজবন্দীদের পরস্পরের সম্পর্কটা ক্রমে তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে উঠছিল। ফলে, বাদ-বিসম্বাদ, ঝগড়াঝাটি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জেলখানার পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ রাজবন্দীদের উপর এই নির্বিচার ও নির্মম গুলীবর্ষণ তারই চূড়ান্ত পরিণতি।

শোনা যায় রাজধানী ঢাকা থেকে গুলীচালনার জন্য নির্দেশ গিয়েছিল। রাজবন্দীদের প্রতিরোধ সংগ্রামকে চূর্ণ করে দেবার জন্য ওরা এই নৃশংস জল্লাদের ভূমিকায় নেমেছিল।

২৩-এ এপ্রিল তারিখে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিল সাহেব তাঁর দলবল সহ রাজবন্দীদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য ওয়ার্ডে এলেন। সচরাচর এমন সময় তিনি আসতেন না সেদিন যে পৈশাচিক পরিকল্পনা নিয়ে তিনি এসেছিলেন, সে-কথা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না।

বিল সাহেব রাজবন্দীদের প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ করছিলেন। আলোচনা চলতে-চলতে কথা কাটাকাটির মধ্য দিয়ে দু-পক্ষই উত্তেজনার চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছল। সেই সময় বিল সাহেব আচমকা ঘরের বাইরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেবার জন্য হুকুম দিলেন। সমস্ত কিছুই পূর্ব-পরিকল্পিত, আগে থেকেই সবকিছু ঠিক করা ছিল, আলাপ-আলোচনা একটা ভাওতা মাত্র।

দরজাটা বন্ধ করেই বন্দুকধারী সিপাইরা এপাশ থেকে ওপাশ থেকে জানলার শিকের মধ্য দিয়ে গুলী চালাতে শুরু করল। আত্মরক্ষার কোনো উপায় ছিল না। গুলীতে গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে পড়ে গেল সবাই। ঘরের মেঝে রক্তে ভেসে গেল। কিন্তু এতেও তুষ্ট হলো না ওরা। প্রথম পর্ব শেষ করে এবার একদল লাঠিধারী সিপাই দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে। তারপর মনের আক্রোশ মিটাবার জন্য যারা বেঁচে ছিল, তাদের বেছে বেছে লাঠিপেটা করতে লাগল। তারপর হত-আহতেরা ঐভাবেই ঘণ্টা কয়েক পড়ে রইল। যুদ্ধের মধ্যেও শত্রুপক্ষের আহত বন্দীদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এখানে তাও হলো না। আহতদের মধ্যে যাদের জ্ঞান ছিল তারা আকণ্ঠ তৃষ্ণায় 'পানি পানি' বলে কাতরে মরছিল। কিন্তু

নির্মম ঘাতকের দল তা শুনেও শুনল না। স্বাধীনতা লাভের তিন বৎসর পরে দুর্ভাগা দেশের দেশ-প্রেমিক সন্তানদের এইভাবেই পুরস্কৃত করা হলো।

সেই সাতটি মৃতদেহ ওরা কোথায় লুকিয়ে ফেলল, তাদের কি গতি করল, কেউ তা জানে না। তাঁদের জন্য কোনো স্মৃতি সৌধও ওঠেনি। শুধু খাপরা ওয়ার্ড সেই বেদনাবহ স্মৃতির গুরুভার বুকে নিয়ে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বীর শহীদদের রক্তস্নাত খাপরা ওয়ার্ডের পুণ্যভূমি একদিন কি দেশবাসীর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হবে না?

এইভাবেই জেলের মধ্যে প্রাণ দিলেন আমাদের কম্পদা—দিনাজপুরের কৃষক সংগ্রামের বীর সেনানী কম্পরাম সিং। তখন তাঁর বয়স তেষট্টি। দিনাজপুরের চাষীরা, যারা তাঁকে দেখেছে বা তাঁর কথা শুনেছে, তারা তাঁর কথা স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। দিনাজপুর তথা উত্তরবঙ্গের কৃষক-কর্মীরা এই মহান দেশ-প্রেমিকের জীবনকথা শুনে প্রেরণা পায়, উৎসাহ পায়, চলার পথের সন্ধান পায়। তাদের সকলের মধ্যে বেঁচে আছেন আমাদের কম্পদা—দিনাজপুরের কৃষক সংগ্রামের বীর সেনানী কম্পরাম সিং।

পূর্ব-পাকিস্তানের বিশিষ্ট লেখক শ্রী সত্যেন সেনের সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রামবাঙলার পথেপথে বই থেকে এই লেখাটি সংগৃহীত। রাজবংশী কৃষক কম্পরাম সিং ১৯৪৬-৪৭ সনের তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেতা।

[১২৪৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

বারি। আচ্ছা তুমি যাও। (কলম ছুঁইয়া জিতুর প্রস্থান।)

(নামাবলি গায়, কৌপিন এবং বহির্ব্বাস পরিধান, সর্ব্বাঙ্গে তিলক ছাপা, হস্তে গলে তুলসীর মালা, কণ্ঠে কুঁড়জালী, কক্ষে ঝুলি, হরিনাম জপ করিতে করিতে দ্বিতীয় সাক্ষী হরিদাসের প্রবেশ ও পূর্ব্বমত হলফ্ পাঠ)

হরি। আমার নাম হরিদাস, পিতার নাম ঠাকুরদাস, বয়স ৪০।৫০ বৎসর। আমি বৈরাগী, ভিক্ষা করি।

বারি। আবুমোল্লার স্ত্রীকে কে খুন ক'রেছে টুমি কিছু জানে ?

হরি। (মালা টিপিতে টিপিতে) রাধেকৃষ্ণ ! আমি কিছুই জানি না।

বারি। কিছু শুনিয়াছে ?

হরি। শুনেছি হুজুর।

বারি। ক্যা শোনা হ্যায় ?

হরি। হরিবোল ! হরিবোল ! শুনেছি আবুমোল্লাই মেরে ফেলেছে। উঃ কি পাপিষ্ঠ ! হবিবোল হরিবোল !

বারি। আবু মোল্লা কেমন লোক ?

হরি। হুজুর সে বড় ফরাববাজ, এক দিন আমি—

জজ। তুমি কি ? ফেরেব করিয়াছে।

(উচ্চ হাস্য করিয়া পূর্ব্বৎ তুড়ি ও শীশ দিয়া নৃত্য ও ইংরাজি গান করিয়া দর্শকগণের প্রতি দৃষ্টিকরত হাস্য পূর্ব্বক উপবেশন) তুমি —এক দিন তুমি কি ?

হরি। হুজুর ! এক দিন আমি ভিক্ষা ক'র্ত্তে ওদের বাড়ীতে গেছিলুম। ফাকি দিয়ে আমার ঝোলা দেখি ব'লে কেড়ে নিয়ে চালগুলো ঢেলে নিলে ; শেষে ঝোলাটা পায়ে প'ড়ে চেয়ে নিলুম। ও বেটা বড় ফেরেববাজ ওর জ্বালায় গাঁয়ের লোক জ্বলে ম'ল। রাধেকৃষ্ণ ! রাধেকৃষ্ণ !

বারি। মোল্লার স্ত্রীর চরিত্র কেমন ছিলে ?

হরি। (দুইকানে হাত দিয়া) রাধাগোবিন্দ ! আমার মুখ দিয়ে সে কথা বেরোবেনা।—(দীর্ঘ নিশ্বাস) মেরে ফেলেছে কি জন্য— দীনবন্ধু !

বারি। এই আসামীরা কেমন লোক?

হরি। বড় ভাল মানুষ। আর সেই জমীদার বড় লোক, বড় ধার্ম্মিক, গরিব লোকের প্রতি তাঁর ভারি দয়া! আমার বৈষ্ণবী যখন খাঁ সাহেবের বাড়ীতে যান তিনি কাপড় টাকা পয়সা চা'ল দয়া ক'রে দিয়ে থাকেন।

বা, উ। তোমার বৈষ্ণবীর নাম কি?

হরি। কৃষ্ণমণী।

বা, উ। হুজুর সেই কৃষ্ণমণী—

জজ। হাঁ হাঁ। আমি জানে।

(ডাক্তার কানিংহাম সাহেবের প্রবেশ)

জজ। How are you?

ডাক্ত। Thanks! Quite well.

জজ। Please take your seat. How is Mrs. Cuningham? I have not seen her for a long time. (মৃদুস্বরে) More than six months.

ডাক্ত। Thanks! She is in delicate state and this is the seventh month.

জজ। Oh! (ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে অধোবদনে লিখনীতে দন্তাঘাত) Do you like to go soon?

ডাক্ত। Yes; she is alone.

জজ। (আসামীর বারিষ্টারের প্রতি) Dr. Cuningham is in hurry and I think it is better to take his deposition first.

বারি। Yes; I have no objection.

বা, উ। (দণ্ডায়মান পূর্ব্বক) হুজুর! হরিদাস সাক্ষীর প্রতি আমার সওয়াল আছে?

জজ। Wait, wait. (ঈষৎ ক্রোধে) Baboo can't you wait (মৃদুস্বরে) natives? Let me take Dr. Cuningham's depositions first.

(বাদীর উকীল নিঃশব্দে চেয়ারে উপবেশন)

(ডাক্তার সাহেবের হস্তে জজের বাইবল দান)

ডাক্ত (বাইবেল চুম্বনপূর্ব্বক) My name is F. B. Cuningham, aged 72 years, I am the G. Surgeon of Bensaff District. I made the port-mortem examination of the body of Nooren-nehar, a healthy good looking woman, aged about twenty years, sent by the officer in charge of Dhurmoshala Police Station. No marks of external violence except on the genetal, profuse discharge of blood from the said part; the lungs highly conjected on digesting away the skin of the throat extravasation of blood observed, all other organs found healthy. (দ্রুতভাবে) In my opinion she must have died of sanguineous apoplexy of the brain.

জজ। (মৃদুস্বরে) Must be brain disease; (বাদীর উকীলের প্রতি) টোমার কুছ সওয়াল আছে ?—

বা, উ। ডাক্তার সাহেব জবানবন্দী দিলেন ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হ'চ্ছে যে স্ত্রী লোকটির অধোদেশ হইতে রক্ত নির্গত এবং গলার চর্ম্মের নীচে রক্ত জমা হইয়াছিল, এই সকল কারণে কি। "ব্রেণ ডিজিজে" মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা।

জজ। হাঁ। কেন না হোবে ? ডাক্তার সাহেব কহিতেছেন; হোবে হোবে।

বা, উ। হুজুর একবার ডাক্তার সাহেবকে ঐ সওয়ালটা জিজ্ঞাসা করা উচিত।

জজ। (বিরক্তি সহকারে মৃদুস্বরে) ছুট্! (ডাক্তার সাহেবের প্রতি) Is it possible that profuse discharge of the blood from the vaegina and extravasation of blood beneath the skin of the throat, produced sanguineous apoplexy of the brain ?

ডাক্ত। (উচ্চহাস্য পূর্ব্বক) হা হা হা ! If fever can produce enlargement of the spleen, then why not the sof of blood will produce sanguineous apoplexy of the brain ?

জজ। আর কিছু সাওয়াল আছে ?

বা, উ। হজুর আমরা মেডিকেল সায়েন্স ভাল বুঝি না। আর কোন সওয়াল নাই ? (উপবেশন)

জজ (বারিষ্টরের প্রতি) Have you anything to ask Dr. Cuningham ?

বারি। (সাশ্চর্য্য) To whom ? To Dr. Cuningham ?

জজ। Yes.

বারি। Certainly not ; he is perfectly right.

জজ। (ডাক্তারের প্রতি) Then you can go , give my compliments to Mrs. Cuningham.

ডাক্ত। Thanks ! (প্রস্থান)

বারি। (হরিদাসের প্রতি) তুমি কোন্ কোন্ তীর্থ দেখেছ ?

হরি। গয়া, কাশী, পেঁড়ো আর কত তার নামও জানিনে।

জজ। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) টুমি লিখাপড়া জানে ?

হরি। নাম সই ক'র্ত্তে পারি।

জজ। আচ্ছা দস্তখত কর। (নাম সই করিয়া প্রস্থান)

জজ। (বাদীর উকীলের প্রতি) বাবু আপনি এইক্ষণে বক্তৃতা করুন।
(পাঁচ মিনিট কাল উকীলের বাঙ্গালা বক্তৃতা)
(পোনের মিনিটকাল বারিষ্টারের ইংরাজী বক্তৃতা)

আবু। দোহাই ধর্ম্ম অবতার—আমার প্রতি বড় অন্যায় হয়েছে—বড় দৌরাত্ম হয়েছে।

বারি। টুম চুপরাও।

আবু। আমার বাড়ী ঘর সব গিয়েছে, জাত্‌ও গেছে হুজুর ; আমার কিছুই নাই ; (ক্রন্দন) আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।

জজ। চুপ্‌রাও !

আবু। দোহাই ধর্ম্ম অবতার ! আমার প্রতি বড় অন্যায় হয়েছে—আমি নিতান্ত গরিব।

জজ। চুপ্‌রাও ! (কিঞ্চিৎ পরে জুরিদিগের প্রতি) Is this case guilty or not ?

জুরি। Not guilty. (যথাস্থানে এক ঐক্য হইয়া)

বারি। (হো হো শব্দে হাস্য পূর্ব্বক পুস্তকাদি টেবিল হইতে হস্তে করণ এবং জজের একটু খোসামদ)

জজ। (রায় লিখিতে আরম্ভ ও ক্ষণকাল পরে দণ্ডায়মান হইয়া) ডিস্ মিস্—
আসামীগণ খালাস (হাতে তুড়ী দিয়া নৃত্য)

রায়ি। (হাস্য করিয়া) সেকহেন্ড।

(পটক্ষেপণ)

(নটীর প্রবেশ)

নটী। (স্বগত) হায় হায় একি হলো ? হা ভগবন্ তুমি কোথায় ? হায় হায়
এ জগতে অর্থই সকল দোষের মূল !

হায়রে পাতকি অর্থ ! তোর লাগি ভবে—
সুধু তোর লাগি ঘটে যত অত্যাহিত !
অবলা অমূল্য রত্ন সতীত্ব রতন,
হরিল দুর্ম্মতি পাপ পাষণ্ড বর্ব্বর
জমীদার ! ধর্ম্মাসনে হলোনা বিচার !
কারে কই মনোদুঃখ কারে বা জানাই
এ বারতা ? শোক সিন্ধু উথলিছে মনে—
কারে বা জানাই ? কেন কেন এ জিজ্ঞাসা ?
দুজন জিজ্ঞাসা-পাত্র সম্মুখে আমার—
জানাইব তাঁরে যিনি সর্ব্ব নেত্রবান্,
সর্ব্বদর্শী মহেশ্বর, জগত-কারণ,
সর্ব্বময় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বশাস্তা বিভু
ত্রৈলোক্য-ঈশ্বর যিনি, পরম ঈশ্বর—
অনুগত ধর্ম্ম যাঁর সদা আজ্ঞাবহ,
তাঁরে বিজ্ঞাপিব মনে যত আছে—
এই ভাবে জিজ্ঞাসিব কহ কহ দেব,
হবে না দরিদ্রের এ দুঃখ মোচন ?
রবেনা কি অবলার সতীত্ব রতন ?
আরো বিজ্ঞাপিব শোক কান্দি তাঁর কাছে,
ঈশ্বর-প্রসাদে যিনি ভারত-ঈশ্বরী,
যাচিব কেবল ভিক্ষা ডাকি বার বার,
কর মা কর মা দীনে কর মা নিস্তার।

(সঙ্গীত)

(রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা)

কাতরে ডাকি মা তোরে শুনমা ভারতেশ্বরি !
অবিহিত অবিচারে আর বাঁচিনে মরি মরি ॥
থাক মা সাগর পারে, কভুনা হেরি তোমারে,
রক্ষ মা প্রজা কিঙ্করে, বিনয়ে মিনতি করি।
অবলা সরলা সতী, তাহে ছিল গর্ভবতী,
সে সতীর এ দুর্গতি, উহু মরি মরি !
সবল দুর্ব্বল পরে, হেন অত্যাচার করে ?
রক্ষ মা দীন প্রজারে, মা তোমার চরণে ধরি ॥
দয়া মমতা পালিনী, প্রজার দুঃখ বিমোচিনী,
দীন দুঃখ-নাশিনী, মা তুমি শুভঙ্করী ;—
জননী বলিয়ে ডাকি, শুন সিন্ধু পারে থাকি,
করুণা কটাক্ষ রাখি, তার মা ভারতেশ্বরী ॥

(নটের প্রবেশ)

নট। প্রিয়ে ! আর দুঃখ ক'রে কি হবে ? আমাদের কথা কে শুনে ? আর কেইবা আমাদের দুঃখে দুঃখিত হয় ? হায় ! চ'কের উপর এমন অন্যায় হলো ? হায় ! হায় ! দিনে দুপুরে ডাকাতি হলো ! দীনহীন প্রজার ধন মান প্রাণ পর্য্যন্ত গেল, তার প্রতিশোধ কিছুই হলো না ! (ক্ষণকাল চিন্তা) যাক্ আমাদের আর সে কথায় কায নাই ! আমাদের কথায় কেবা কান দেয় ?

নটী। বলেন কি ? আমাদের এ কান্না কি কেউ শুনবে না। গরিবের প্রতি কি কেউ নজর করবেন না ?

(দীনবেশে ক্রন্দন করিতে করিতে আবুমোল্লার প্রবেশ।)

নট। আবার কি হয়েছে ? উঃ ! কি ভায়নক !

আবু। আমার সর্ব্বনাশ তো হয়েইছে—হায়ওয়ান আলী মোকদ্দমা জিতে আমার বাড়ী ঘর ভেঙ্গে চুরে থানে ওয়ারাণ ক'রে ফেলেছে। আমার আর দাঁড়াবার লক্ষ নাই। (ক্রন্দন) হায় হায় ! আমার ধন মান প্রাণ সকলি গেল, বিষয় সম্পত্তি যা কিছু ছিল সকলি লুটে নিয়েছে।

আমার গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—আমার অন্ন বস্ত্র কিছুই নাই।
(ক্রন্দন)

নট। কি নির্দ্দয় !! কি নিষ্ঠুর !!!

নট নটী। (উভয়ের দুঃখিত স্বরে সঙ্গীত)

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা

কবে পোহাইবে ভবে এই দুঃখ বিভাবরী।
উপায় না হয় ভেবে নিয়ত ভাবনা করি॥
কবে দেব দিবাকর, বিকাশিয়ে সুখকর,
নাশিবেন তম ঘোর, ঘোর অন্ধকার হরি ?
ওহে বিপদ বারণ, কর বিপদে তারণ,
তম কর নিবারণ নিবেদন করি ;—
তুমি দেব সর্ব্বময়, কাতরে করুণাময়,
নাশ কর দীন ভয়, শ্রীপদ কমলে ধরি॥

যবনিকা পতন।

পাবনার কৃষক বিদ্রোহ

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়

১৭৭০ সাল। বাঙলাদেশের অস্থায়ী শাসক কার্টিয়ার। এই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার, অব্যবস্থা ও প্রচণ্ড লোভে বাঙলাদেশে এক ভয়াবহ মন্বন্তর ঘটে। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামেই তা বাঙলাদেশে পরিচিত। সেদিনের সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার কৃষক, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ তিলতিল করে মৃত্যুবরণ করেছিল। অভিসম্পাত জানিয়েছিল অত্যাচারী, লোভী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে। ঐতিহাসিক হাণ্টার লিখেছিলেন, "প্রকৃত দুর্ভিক্ষের সময় সরকার বহু কষ্টে অনশনপীড়িত মানুষের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু নিত্য অনশনক্লিষ্ট প্রজাসমূহ যে প্রতি বৎসর বিভিন্ন রোগের আক্রমণে অসময়ে ইহলোক ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার কোন প্রতিকার করিতে সবকার অসমর্থ।"[১]

কেইবা কৃষকের প্রাণধারনের জ্বালা বুঝতে পারে? জমিদার, অভিজাত ইংরেজ বাহাদুর সবাই সবার স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট। কৃষকরাও বুঝত না কিভাবে এর প্রতিবাদ করবে, কার কাছে করবে। তাই তিলতিল করে মৃত্যুকেই তারা বরণ করেছে। সরকারী হিসাবে জানা যায় এই দুর্ভিক্ষের পর বাঙলাদেশে খাজনা আদায় নাকি আগের বছরের চেয়ে বেশিই হয়েছে। আশ্চর্য ইংরেজ বাহাদুর, আরও আশ্চর্য দেশের মানুষ! তবু কোনো কোনো মানুষ এ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টাও করেছে। দুর্বল শিরদাঁড়া, তাই সংগঠিতভাবে কোনো আন্দোলন তারা করতে পারেনি। তবুও তাদের বিক্ষোভ সেদিন রূপ পেয়েছিল উত্তর বাঙলার 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে'।

তারপর প্রায় একশ বছর পরে (১০৩ বছর) ১৮৭৩এ সেই উত্তর বাঙলার কৃষকরা আবার বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে, পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায়। আর তা দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়েছে যশোহর, নদীয়া ইত্যাদি বিভিন্ন জেলায়। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে এক লাফ দিয়ে পাবনা

বিদ্রোহে কৃষকরা পৌঁছতে পারেনি। অনেক জ্বালা, অত্যাচার, অনেক অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়ে, ছোট বড় অনেক বিদ্রোহ করে, তবে তারা পৌঁছেছে পাবনা বিদ্রোহের মতো গুরুত্বপূর্ণ এক বিদ্রোহে।

সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নীলবিদ্রোহ (১৮৬১)। পাবনা জেলা এ-বিদ্রোহেরও এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। কৃষকরা বলেছিল, তারা জমিতে আর নীল বুনবে না। তাই নিয়ে শুরু হয়েছিল প্রচণ্ড এক আন্দোলন। সরকারী কমিশনারের এক রিপোর্টে প্রকাশ :

"পাবনা জেলার অধিকাংশ কুঠির চাষীরাই দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে তারা আর নীলের চাষ করবে না।... ঐ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট লিখেছেন যে, নীলের চাষ না করার জন্য ঐ অঞ্চলের চাষীরা শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়ে তুলেছে। এই উদ্যোগের প্রধান হোতা হচ্ছে নদীয়া জেলার অধিবাসী জনৈক মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষকরা এখন অত্যন্ত উত্তেজিত রয়েছে... ।"[২]

জমিদারদের অত্যাচার যত বেড়েছে উত্তেজনার আগুন তত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই উত্তেজনার আগুনেই জ্বলে উঠেছে পাবনার কৃষকবৃন্দ। সাহস করে রুখে দাঁড়িয়েছে শুধু জমিদারী অন্যায়ের বিরুদ্ধে নয়, খাস জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে. 'ভারত সংস্কারক' কাগজ তখন লিখেছেন :

"এই ঘটনা দ্বারা অন্তত ইহা সপ্রমাণ হইল বঙ্গীয় প্রজাগণ প্রতিঘাত ক্ষম। ...আমরা এতদিন মনে করিতাম বঙ্গের প্রজারা বুঝি কর্দম বা তদ্রূপ কোন কোমল পদার্থ হইবে, নতুবা কি প্রকারে তাহারা জমিদার দিগের এত অত্যাচার সহ্য করে ? জমিদাররা এখনও কি সাবধান হইবেন না ?"[৩]

পাবনা বিদ্রোহের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তার ব্যাপকতায়, তার ঐক্যবদ্ধ সাংগঠনিক আন্দোলনে এবং তার বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মসূচীতে। ১৮৭৩এর জুন-জুলাই মাসে এই বিদ্রোহ শুরু হয়। তখন সর্বত্র যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সেটা বোঝা যায় তখনকার প্রায় সব মতের পত্রপত্রিকাগুলোতে যেভাবে এই খবর পরিবেশিত হয়েছিল তা থেকে। কোনো কোনো কাগজ এই বিদ্রোহে জমিদারের পক্ষ নিয়ে প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছেন ; আবার কোনো কাগজ রায়তদের সপক্ষে কথা বলে বিদ্রোহকে সমর্থন জানিয়েছেন।

তখনকার একটি প্রসিদ্ধ পত্রিকা, 'অমৃত বাজার পত্রিকা' জুলাই মাসে লেখেন: "সিরাজগঞ্জ মহকুমায় জমিদার ও রায়তদিগের মধ্যে এক প্রচণ্ড বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছে। রায়তগণ ঐক্যবদ্ধভাবে জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে ও তাহাদের সর্বনাশ করিতে বদ্ধপরিকর, কারণ জমিদারগণ অতিরিক্ত চড়া হারে খাজনা ধার্য করিয়াছে। ··· প্রতিদিন চার পাঁচশত বিদ্রোহী কৃষক ক্ষুদ্রক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করে ও নিরীহ গ্রামবাসীদের বিদ্রোহ করিতে উত্তেজিত করে।"[৪] সিরাজগঞ্জের জমিদারী ছিল নাটোরের রাজবংশের অন্তর্গত। এই জমি নিলামে উঠলে বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানের পাঁচটি পরিবার, যেমন কলকাতার ঠাকুর পরিবার, ঢাকা জেলার মুড়াগাছার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার, স্থলের সান্যাল ও পাকড়াসী পরিবার এবং ভট্টাচার্য পরিবার এই জমিদারী কেনেন। অধিক লাভের আশায় এইসব জমিদাররা কৃষকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায় এবং ক্রমশ খাজনা বৃদ্ধি ও ও কৃষকদের জমিতে দখলী স্বত্ব অস্বীকার করতে চায়। এইসব জমিদাররা ইংরেজদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্ট সন্তান। এরাই ইংরেজদের সাকরেদ। ইংরেজ আর জমিদার—একই সঙ্গে কৃষককে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলত। এইভাবে কৃষি ও কৃষকের অবস্থা এক চরম বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলে। এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে কৃষকরা ক্রোধে ফেটে পড়বে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে ?

জুলাই মাসেই 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' লিখছেন:

"পাবনা জেলার কৃষকরা জমিদারদের বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে খাজনা দিতে অস্বীকার করেছে।···কৃষকরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যেসব আবেদন করেছে তাতে তাদের অভাব অভিযোগের কথাই বলা আছে। ··· ঐ বিক্ষোভ এখন সমস্ত জেলাতেই ছড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে।"[৫]

কেন এই বিদ্রোহ ? অনেকে এর অনেকরকম কারণ দর্শিয়েছেন। কারও মতে জমিদারদের অত্যাচার এবং অন্যায়ভাবে খাজনা বৃদ্ধিই এই বিদ্রোহের মূল কারণ; আবার কারও মতে জমিদারদের প্রচণ্ড বাড়াবাড়িতে বিরক্ত ইংরেজ সরকার তাদের রাশ টানতে প্রজাহিতৈষণার ছদ্মবেশে প্রজাদের বিদ্রোহের পথে উস্কে দিয়ে, মজা দেখেছে। স্বাভাবিকভাবেই জমিদারদের দায়িত্ব অনেক বেশি এবং চাষীর সঙ্গে তাদেরই সরাসরি সম্পর্ক। তবে উস্কে না দিলেও এই বিদ্রোহের পিছনে সাম্রাজ্যবাদের শয়তানী

হাতও যে কাজ করেছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অনেক ক্ষেত্রেই চাষীরা ইংরেজদের ধূর্ততা বুঝতে না পেরে তাদের স্মরণাপন্ন হয়েছে।'

প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের মুখপত্র 'সুলভ সমাচার' খুব স্পষ্টভাবে মন্তব্য করেছেন :

"জমিদারদের এবং তাদের অধঃস্তন কর্মচারীদের দোষেই যে পাবনা ও সিরাজগঞ্জে কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।"[৬]

ঐ সময় অপর একটি প্রগতিশীল কাগজ 'সোমপ্রকাশ' লিখলেন :

"শুধু ১৮৭৩এর পাবনা কৃষক বিদ্রোহই নয়, বাঙলাদেশের সকল সাম্প্রতিক কৃষক বিদ্রোহেরই মূলে রয়েছে, খাজনা বৃদ্ধির প্রশ্নে গভীর অসন্তোষ এবং অত্যন্ত আশ্চর্য কথা এই যে, কি জমিদার, কি সরকার কেউই এ যাবৎ এ নিয়ে কোন ভাবনা চিন্তা করেনি।"[৭]

সরকার অবশ্য এ-বিদ্রোহের পিছনে তার বিন্দুমাত্র হাত আছে বলে স্বীকার করেনি। সিরাজগঞ্জের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট নোলান সাহেবের রিপোর্টে প্রকাশ :

"বিদ্রোহের মূল কারণ দুটি — চড়া হারে খাজনা আদায় এবং সেই আদায়ের কতখানি ন্যায়তঃ জমিদারের প্রাপ্য, সে সম্বন্ধে রায়তের মনে সন্দেহ। তৃতীয় কারণ এই যে কিছু কিছু জমিদার ও তাদের কর্মচারীরা হিংস্র, দুর্বৃত্ত প্রকৃতির লোক।"[৮]

কৃষকদের ক্ষোভের কারণ বোধহয় শুধুমাত্র জমির উপর খাজনা বৃদ্ধি করার জন্য নয়। জমিদারদের বায়নাক্কা নানান রকম। তদুপরি আছে তাদের পাইক পেয়াদার অন্যায় আবদার। সমস্ত ব্যাপারটা প্রাকবিপ্লব যুগের ফরাসী দেশের অভিজাতদের কথা মনে করিয়ে দেয়। ঠিক এই ভাবে (অত্যাচারটা আরও বেশি) তারাও অন্যায় জুলুম করে গরিব চাষীর কাছ থেকে নানান কর আদায় করেছে। সীমাহীন এ-অন্যায়ে চাষীদেরও ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াতে' এর এক মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাওয়া যায় — "রায়ত নিজে যে বাড়ি তৈরী করেছে বা যে গাছ নিজে পুঁতে বড় করেছে, তা যদি সে বিক্রী করে, তবে প্রাপ্ত অর্থের এক চতুর্থাংশ তাকে জমিদারকে দিয়ে দিতে হবে। গ্রামে প্রতি মণ ধান ওজন বা বিক্রীর জন্যও জমিদারকে খাজনা দিতে হবে। জমিদারের পরিবারে শ্রাদ্ধাদি হলে, তার জন্যও রায়তকে অর্থদণ্ড দিতে হবে কীর্তিভিক্ষা নামে। জমিদারের ছেলের বিয়ে বা অন্নপ্রাশনের

জন্যও রায়তকে টাকা দিতে হবে।...জমিদার খাজনা আদায়ের জন্য পেয়াদা পাঠালে তার জন্য রায়তকে পেয়াদা খরচাও দিতে হবে। জমিদারের সেরেস্তায় নায়েবকে ভেট দিতে হয় গোমস্তার। তাই গোমস্তা আবার সেই টাকাটা আদায় করে নেয় রায়তের কাছ থেকে। এইভাবে অনুপস্থিত জমিদারতন্ত্রের প্রজাদের জীবনে নেমে আসে ঘোর দুর্বিপাক। যে জমিদারকুল কলকাতায় ব্যসনে-বিলাসে কালাতিপাত করছেন তাদের অসাধু নায়েব-গোমস্তারা রায়তের উপর চালিয়ে যাচ্ছে অত্যাচারী প্রভুত্ব।..."[৯]

সচেতন ও পরিণতবুদ্ধি কৃষক কেনই বা এই অত্যাচারী পরগাছা জমিদারকে সহ্য করবে? তাই তাদের বিক্ষোভ শুধুমাত্র জমিদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে নয়, তারা চায় অত্যাচারী জমিদারতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপ। ইংরেজ সরকারের উপর কিন্তু তখনও কৃষকদের অসামান্য আস্থা!

১৮৭৩এর জুন-জুলাই মাস। শুরু হলো পাবনা কৃষকদের গণবিক্ষোভ। রূপ পেল বিদ্রোহ। দাবানলের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল বিদ্রোহের আগুন। খাজনা দেওয়া বন্ধ করল রায়তরা। খাজনা জমা দিল আদালতে। চাষীরা বেশির ভাগই মুসলমান, ও কিছু নিম্নবর্ণের হিন্দু। নেতৃত্ব দিলেন ঈশানচন্দ্র রায়, (ঈশান রাজা নামেই পরিচিত) বর্ণ হিন্দু ও সচ্ছল তালুকদার গঙ্গাচরণ পাল, রাজু সরকার, বিক্রক, ক্ষুদি মোল্লা প্রভৃতি। জমিদাররা ক্রুদ্ধ হয়ে লাঠি সড়কি দিয়ে আক্রমণ করে কৃষকদের। আক্রমণের বিরুদ্ধে সব চাষীরা এক পণ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াল। বিদ্রোহের আগুন এক জেলা থেকে আর এক জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। বিদ্রোহের নেতাগণ সিরাজগঞ্জের সব চাষীকে ঐক্যবদ্ধ করে গড়ে তুলেছেন কৃষক সংগঠন। তাঁরা গ্রামেগ্রামে সভা করে নিজেদের বিদ্রোহী বলে পরিচয় দেন, বিভিন্ন আদালতে জমিদারী প্রথা বিলোপের দাবি তোলেন। বিদ্রোহীরা বিভিন্ন স্থানের জমিদারী কাছারিগুলির উপর আক্রমণ চালান, জমিদারের প্রাসাদও আক্রমণ করেন। জমিদার ও তাদের নায়েব গোমস্তা এবং ধনী লোকেরা গ্রাম ছেড়ে পাবনা সহরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। চারিদিকে একটা প্রচণ্ড আতঙ্ক দেখা দেয়। সাড়া জেগেছে বিভিন্ন অঞ্চলের চাষীদের মধ্যে।

'সোমপ্রকাশ' লিখছেন: "জমিদারের বিরুদ্ধে রায়তদের বিদ্রোহ শুরু হইয়া গিয়াছে। পাবনার রায়তরা যে বিদ্রোহী মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা এক্ষণে প্রসার লাভ করিয়াছে নদীয়া ও যশোহরে।..."[১০]

একই সময় 'হিন্দু হিতৈষণী'তে দেখা যাচ্ছে :

"ত্রিপুরা জেলার পতিওরা পরগণাতে রায়তরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়াছে।...গঙ্গামণ্ডল পরগণাতেও তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে ও খাজনা বন্ধ করিয়াছে। অন্যান্য অঞ্চলের জমিদারদের রায়তরাও তাহাদের সহিত যোগদান করিতেছে "[১১]

বিখ্যাত সমাজসেবী কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের সম্পাদনায়, নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রাম থেকে 'গ্রাম বার্ত্তা প্রকাশিকা' নামে একটি কাগজ বের হতো। অক্টোবর মাসে এই কাগজটিতে লেখা হলো :

"পাবনা বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত হইতে না হইতেই বগুড়াতে বিদ্রোহের ধূম্রাগ্নি দেখা যাইতেছে। দিঘাপতিয়ার রাজার জমিদারী নৌ-খিলা পরগণাতে রায়তরা খাজনা কমাইবার দাবী জানাইয়াছে।"[১২]

নীল বোনা বন্ধ করে নীল চাষীদের তীব্র বিক্ষোভকে তখনকার মতো শান্ত করেছিল বটে কিন্তু তাদেব আসল সমস্যার কোনো সমাধান তাতে হয়নি। বিক্ষোভ তাদের মনের মধ্যে জমেই ছিল। পাবনার বিদ্রোহ সেই আগুনকে আবার উস্কে দিল। বিদ্রোহের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এবং তার ব্যাপকতা নীল বিদ্রোহীদের টেনে আনল এই বিদ্রোহের মধ্যে। 'সহচর' পত্রিকা থেকে জানতে পারছি :

"নীল চাষের জেলার রায়তরাও পাবনার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বিদ্রোহ সংগঠিত করার কথা চিন্তা করিতেছে "[১৩]

এইসব ঘটনাগুলো যে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো জমিদারদের বা সরকারের কাছে এসেছে তা নয়। পাবনার বিদ্রোহ কোনো বিচ্ছিন্ন নতুন ঘটনা নয়। পূর্বতন বিদ্রোহগুলোর, বিশেষ করে সাঁওতাল ও নীল বিদ্রোহের এটা ঐতিহাসিক পরিণতি। জমিদার বা সরকার প্রথমে একে এতটা গুরুত্ব দেয়নি। সরকার ভেবেছিল প্রজা বিদ্রোহে জমিদারদের বাড়াবাড়ি কিছুটা কমবে ; অন্যদিকে জমিদার ভেবেছিল, লাঠিয়াল, বরকন্দাজ ও সরকারের সাহায্য নিয়ে অতি সহজেই এ-বিদ্রোহ দমন করতে পারবে। দু-তরফেরই হিসেবের গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। 'বাড়তি খাজনা দেবোনা' এ-দাবি খুবই পরিচিত, কিন্তু এরা যে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চায় তা সরকার ভাবতে পারেনি। এদিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই জমিদার নন্দন, এবং অনেকেরই যোগ জমির সঙ্গে। তাই তাদের কাগজে অনেক

ব্যাপারে গরমগরম কথা থাকলেও, জমিদারের জমি নিয়ে টানাটানিতে তাদের কাগজও জমিদারেব সপক্ষে রায়তের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠল। অল্প কিছু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, বিশেষ করে যারা স্কুল-কলেজ অফিস আদালতের চাকুরিজীবী, (প্রধানত ব্রাহ্মরা) তারা রায়তের হয়ে লিখতে ও বলতে শুরু করল। আমাদের প্রগতিশীল জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের এ-দ্বন্দ্বের রেশ বুঝি আজও ইতিহাসে রয়ে গেছে। নানান মহলে নানান প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কেউ বলল জমিদার দোষী কেউ বলল সরকার, কেউ বলল প্রজারা বদমাইশ। সরকার দুদিক রক্ষা করতে গিয়ে বলল, জমিদারও বাড়াবাড়ি করেছে, প্রজারাও বেশি অন্যায় করে ফেলেছে।

অমৃতবাজার পত্রিকা জমিদারের দুঃখে বিগলিত হয়ে কাগজে লেখা লিখলেন। সেই লেখাকে পরিহাস করে 'বেঙ্গলী' লেখাটির উপর মন্তব্য করেছেন, "আমাদের সহযোগী 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মতে ১৮৫৯এর দশম ধারার আইন পাশ করার সঙ্গেসঙ্গে জমিদার-রায়ত সম্পর্কের স্বর্ণযুগের অবসান হয়েছে।...সেই পুরনো যুগে জমিদার-রায়ত সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হতো ১৭৯৯এর অষ্টম ধারার দ্বারা,...যার সাহায্যে জমিদার রায়তের উপর নিষ্ঠুর নিপীড়ন চালাতে পারত। ১৮৫৯এর দশম ধারা জমিদারের হাত থেকে সেই নিপীডনের যন্ত্রটি কেড়ে নিয়েছে...কেননা সেই পুরনো নিয়মের ফলে রায়ত কার্যতঃ ভূমিদাসে পরিণত হতে চলেছিল।"[১৪]

'হিন্দু পেট্রিয়ট', যে কাগজ নীলবিদ্রোহের সময় চাষীর সপক্ষে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে খোলা তলোয়ারে লেখা লিখেছেন সেই কাগজই পাবনা বিদ্রোহে দেশীয় জমিদাররা বিপদে পড়ায়, গরিব চাষীদের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করেছেন। এই স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায় 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র মতো একটা উল্লেখযোগ্য কাগজেও। যেখানে ভদ্রলোকদের নিজ স্বার্থ বিপন্ন নয় সেখানে চাষীদের হয়ে গরমগরম লেখায়, বক্তৃতায়, তারা দেশকে মাতিয়ে তোলেন, আর অন্যরকম কিছু হলেই তাঁদের প্রগতিশীলতা কোথায় হারিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, এঁদের লেখায় আরও একটা জিনিস খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে যেন এই বিদ্রোহ বনেদী হিন্দু জমিদার বনাম মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের। বিদ্রোহের একটা সাম্প্রদায়িক চরিত্র আবিষ্কারের চেষ্টা তাঁরা করেছেন। খুব সুকৌশলে সম্ভবতঃ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদও

সাম্প্রদায়িক বিষ ঢুকিয়ে সহজে কাজ হাসিল করার একটা চেষ্টা করছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এঁরা কেউই সফল হয়নি। কারণও খুব পরিষ্কার। যদিও বিদ্রোহীদের অধিকাংশই মুসলমান ও মুচি, ডোম ইত্যাদি তবুও এঁদের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন ঈশান রাজা যিনি সচ্ছল তালুকদার ও বর্ণ হিন্দু। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' থেকে একটু লেখা তুলে দেওয়া যাক।

"সমস্ত বে-আইনী জমায়েৎ ও লুটপাটে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে সুপরিচিত বদমাইশরা এবং অনেকদিনের দাগী চোর ও ডাকাতরা। বেড়া, ফরিদপুর, তোলুৎ, হাটুনিয়া, নাকালিয়া, আমিনপুর, মলকোলা ও মালদার জোলা, খোরা ও অন্যান্য নিচু জাতের মুসলমানরা। এদের সঙ্গে এসে জুটেছিল গ্রামের মুচি ও ডোমেরা।"[১৫]

প্রায় একইরকম মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে 'সোমপ্রকাশে'র লেখায় :

"আমরা বলি ১০ আইনের দোষে প্রস্তাবিত গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। বাঙ্গালাদেশে কতকগুলি অর্দ্ধক্ষিপ্ত অর্দ্ধশিক্ষিত আছেন। বৈধ উপায় দ্বারা অভীষ্ট সাধন চেষ্টা পাইলে জগতের যে অভ্যুদয় লাভ হয় তাহাদিগের সে শিক্ষা হয় নাই। বিপ্লব উপস্থিত করিয়া কার্য্যসাধনকেই তাহারা সাধীয়ানজ্ঞান করেন। চাষারা পশুপালের তুল্য, তাহাদিগের পরিণাম দর্শন ও হিতাহিত বোধ নাই। তাহাদিগকে যে দিকে ফিরান যায়, সেই দিকেই ফিরে।...আমরা অনুরোধ করি লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর অনুসন্ধান করুন উপস্থিত বিপ্লবের কে কে অধিনায়ক, তাহাদিগের গুরুদণ্ড বিধান করুন।"[১৬]

এরা অবশ্য অপরাধী জমিদারদের শাস্তিবিধানের দাবিও জানিয়েছেন।

'সমবেদক' কাগজ তার মত জানিয়েছেন যে তারা কারও মন্দই চায়না। জমিদাররা যদি অন্যায় অত্যাচার করে টাকা আদায় না করে তবে কোন আপত্তি নেই। তবে অন্যায় অত্যাচার করলে প্রত্যেকটি প্রগতিশীল মানুষেরই তাতে প্রতিবাদ জানানো উচিত। এই কাগজ 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র লেখা পড়ে মন্তব্য করেছে, দেশের গরিব চাষীরা যে একজোট হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, এটা তাঁরা সইতে পারছেন না, অতএব 'পেট্রিয়ট' নাম এখন পাল্টে ফেলা উচিত। কানাঘুসো শোনা যাচ্ছে, যে সরকার নাকি খাজনা সংক্রান্ত ব্যাপারে নতুন আইন পাশ করবেন, আশা করছি সরকার গরিব চাষীদের কথা মনে রাখবেন।

'হালিসহর পত্রিকা' সরাসরি সরকারকেই দায়ী করে জমিদারদের পক্ষ নিয়ে লেখনী ধরেছেন। তাঁদের মতে পাবনা ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামের চাষীরা জমিদারকে যে-খাজনা দেবে না বলেছেন জমিদারেরা এর ফলে কি করবেন? তারা কি রায়তদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করবেন, না আদালতের দ্বারস্থ হবেন! বলা বাহুল্য সরকারের উস্কানিতেই এইসব হচ্ছে, এতে না সরকার না জমিদার কেউই উপকৃত হবেন না। তাছাড়া প্রজারা জমিদারকে খাজনা দিতে কখনই আপত্তি করে না, সরকারকে খাজনা দিতেই আপত্তি করে। জমিদারকে যে খাজনা দেবে তা দেশেই থাকবে, কিন্তু সরকারকে যে খাজনা দেবে তাতো ইংলণ্ডে চলে যাবে। এতে ভারতবর্ষের লাভ কি? জমিদারদের বিরুদ্ধে তো সবাই রুখে দাঁড়ায়, সরকারের বিরুদ্ধে কে প্রতিবাদ জানায়? আসলে জমিদারের চেয়ে সরকার অনেক বেশি অত্যাচারী। লেখাটা রায়তের সপক্ষে নয়, জমিদারদেরই সপক্ষে। তবে এ-কাগজের একটা স্পষ্ট ইংরেজবিরোধী দেশপ্রেমিক চরিত্র লক্ষ্য করা যায়।

'বিশ্বদূত' কাগজটির চরিত্র পাবনা বিদ্রোহ সম্বন্ধে আর একটু ভিন্নতর। এক কথায় কিছুটা প্রগতিপন্থী। তাঁদের মত, জমিদারেরা খাজনা বাড়ালে যদি দোষ হয় তবে সরকার খাজনা বাড়ালেও দোষ হবে। একই কাজ করে, একজন আইনসম্মত অপরজন বেআইনী কাজ করেছে, তা কি করে হবে? আসলে দোষী উভয়পক্ষই — কারণ রায়তদের তো কোনো সুবিধাই হচ্ছে না, তাদের কষ্ট তো সমানই থেকে যাচ্ছে।

'বঙ্গবন্ধুর' সম্পাদক লিখছেন যে, পাবনা বিদ্রোহে জমিদার বা রায়ত কারুরই লাভ হচ্ছে না। রায়তের প্রচণ্ড ক্ষতিই হচ্ছে। তবে জমিদারদের প্রজা সম্বন্ধে এত উদাসীনতা এবং অর্থের প্রতি প্রচণ্ড লালসা প্রজাদের জীবনের শান্তি নষ্ট করছে। প্রজাদের ভালমন্দ দেখা তাদের কর্তব্য, এটা তারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে ভাবেন প্রজাদের কোনো উন্নতি বোধহয় তাদের ক্ষমতা ও গৌরব হানি করবে। এমন কোনো ব্যবস্থা সরকারী তরফ থেকে করা উচিত যাতে উভয়েই শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

রায়তের সপক্ষে সবচেয়ে জোরালো ও স্পষ্ট ভাষায় লেখা হয়েছে লালবিহারী দে সম্পাদিত 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রিকাতে। এই কাগজে

পরপর দুটি লেখা — 'বেঙ্গল জমিদার এ্যাণ্ড রায়ত' নামক প্রবন্ধে আরসিডি (রমেশচন্দ্র দত্ত) লেখেন :

"দেশ জুড়ে খাজনা দেওয়া, না দেওয়ার, প্রশ্নে যে বিক্ষোভ চলছে তার জন্য প্রধানত রায়তরাই দায়ী — এ ধারণা কেমন করে হলো? এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কিন্তু এই ভ্রান্ত ধারণা কেন হলো তা বোঝা কঠিন নয়। আমাদের দেশে এখনও জনমত মানে অভিজাতশ্রেণী ও মধ্যবিত্তের মতামত, এককথায় ভদ্রলোকের মতামত, কৃষক ও শ্রমিকদের মতামত নয়। সেই জনমত যে জমিদারদের অনুকূল হবে তাতে আশ্চর্য কি।"[১৭]

এবার দেখা যাক সরকারী মহলে পাবনা বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া কি হলো। সরকার ভেবেছিল এ-বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তার কিছু লাভই হবে। প্রকাশ্যে সে রায়তদের পক্ষ না নিলেও জমিদারদের খাজনা বাড়ানোর নিন্দা করে তাকে 'রক্তপায়ী ব্যাঘ্র'ও বলেছে। স্বাভাবিক ভাবেই অনেকে আশা কবেছিল সরকার রায়তের স্বার্থ কিছুটা রক্ষা কববে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ যেদিকে মোড নিল তাতে সরকাবও আতঙ্কিত হয়ে পডল। লণ্ডনের 'স্পেক্টেটর' থেকে উদ্ধৃতি এ-দেশের 'বেঙ্গলী' কাগজে বের করা হলো।

"পাবনা জেলার ৮ লক্ষ রায়ত সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে, খাজনা দেবে না বলে ঘোষণা করেছে, অন্যান্য জেলায় দূত পাঠিয়েছে। ঢাকার রায়তরা তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে।···রায়তদের এই রণধ্বনি নতুন ও বিপজ্জনক। এর অর্থ রায়তরা কর দেবে, কিন্তু খাজনা দেবে না, তারা আর জমিদারদেরই সহ্য করবে না। সরকার এর ফলে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছে।··· জনসাধারণই একমাত্র আমাদের (বৃটিশ সরকারকে) বিব্রত অথবা ধ্বংস করতে পারে।"[১৮]

আন্দোলনের এই গণচরিত্র এবং বৈপ্লবিক ঘোষণাই ইংরেজদের ভাবিয়ে তুলেছে। পাবনা বিদ্রোহেরও, পূর্বতন সব বিদ্রোহের চেয়ে এখানেই চারিত্রিক তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বেশি। ভয় পেয়ে সরকার শেষ পর্যন্ত জমিদারদের সঙ্গেই আপোষ করল। এতদিন পর্যন্ত জমিদারেরা ভয়ে যেসব অবৈধ কর আদায় করত, এখন তা নির্ভয়ে সরকারী অনুমোদনে করতে পারল। ইংরেজরা অনেক বড়বড় কথা বলে শেষে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ পেল : "লেফটেনাণ্ট গভর্ণর ভারতীয়

গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে এই সকল অত্যাচার নির্মূলনে অসমর্থ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল অসম্পূর্ণ ও মরীচাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার পুরাতন নিয়ম সকলের অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থ নূতন ব্যবস্থাপণের সাহায্য আবশ্যক।...আবওয়াব সকল চিরাগত প্রথা বলিয়া রায়তেরা দিয়া থাকে ইহা প্রদান করা অপেক্ষা অস্বীকার করাতে অধিক গোলযোগ।.. এই সকল অবৈধ চিরকালই থাকিবে।...লোকেরা সুশিক্ষিত হইলে আপনার অধিকার আপনি বুঝিয়া লইবে।"[১৯]

জমিদার ও সরকার অবশেষে জোটবদ্ধ হলো। অতএব পাবনা বিদ্রোহের কৃষকদের পরিণতি কি হলো, তা আর অনুমান করতে অসুবিধে হয় না। জমিদার আর সরকারের লাঠিয়াল ও পুলিশবাহিনী রায়তদের উপর তীব্র আক্রমণ চালাল। স্বভাবতই জোটবদ্ধ থাকলেও এর বিরুদ্ধে রায়তরা পেরে উঠল না। বিদ্রোহের সব নায়করাই এবং অনেক কৃষক জেলে গেলেন। সেখানে তাঁদের নানারকম শাস্তি হলো। বিদ্রোহের আগুন বলপ্রয়োগ নিভিয়ে দেওয়া হলো। সরকার কৃষকদের বিক্ষোভ দূর করার জন্য জমির উপর তাদের দখলী স্বত্ব স্বীকারের কথা চিন্তা শুরু করল, শেষপর্যন্ত ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলার সব রায়ত প্রজার জমির উপর দখলী স্বত্ব স্বীকার করা হলো।

পাবনা বিদ্রোহ শেষ হলো, কিন্তু তার প্রভাব রয়ে গেল বাঙলাদেশে। প্রতিষ্ঠিত হলো কৃষকদের সংগঠন—রায়তসভা। এই সংগঠনের মাধ্যমে দেশেদেশে সংগঠন গড়ার কথা বলা হলো। ১৮৮২তে নদীয়া জেলায় চারটি রায়তসভা স্থাপিত হয়। এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' লিখলেন, দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগানোর মধ্য দিয়েই দেশের শিক্ষিত লোকেরা দেশের রাজনৈতিক চেতনাকে জাগ্রত করতে পারবে। এই কাগজই লিখলেন :

"আমরা শুনে আনন্দিত হলাম যে ভারতসভা মফঃস্বলের বহু কেন্দ্রে 'রায়ত সভা' গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন। ..এই সঙ্ঘগুলি যদি দেশজুড়ে যথাযথভাবে সংগঠিত হয়, তবে তা হবে জাতীয় শক্তির একটি প্রধান উৎস।"[২০]

দেশের চিন্তা নতুন মোড় নিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাও কৃষকদের সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে শুরু করল। এই নতুন চিন্তা পরিণতি লাভ করল সংগঠিত 'কৃষক সভা'র মধ্যে। তাই কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে 'পাবনা বিদ্রোহের' গুরুত্ব অপরিসীম।

পাদটীকা

১। হাণ্টার : ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়া, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৪
২। রাজসাহী বিভাগের কমিশনার রীডের সরকারী রিপোর্ট, ১৮৬০
৩। ভারত সংস্কারক, পটলডাঙ্গা, কলকাতা, ২৫এ জুলাই ১৮৭৩
৪। অমৃতবাজার পত্রিকা, ৫ই জুলাই, ১৮৭৩
৫। হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৪ই জুলাই, ১৮৭৩
৬। সুলভ সমাচার (কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত), ১লা জুলাই, ১৮৭৩
৭। সোমপ্রকাশ, চাংড়িপোতা, ১৪ই জুলাই, ১৮৭৩
৮। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, ১০ই জুলাই, ১৮৭৩
৯। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, ১৪ই আগস্ট, ১৮৭৩
১০। সোমপ্রকাশ, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩
১১। হিন্দু হিতৈষণী, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩
১২। গ্রাম-বার্ত্তা প্রকাশিকা, নদীয়া, ২রা অক্টোবর, ১৮৭৩
১৩। সহচর, কলিকাতা, ২রা আগস্ট, ১৮৭৩
১৪। বেঙ্গলী, কলিকাতা, ৫ই জুলাই, ১৮৭৩
১৫। হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৪ই জুলাই, ১৮৭৩
১৬। সোমপ্রকাশ, ২৪এ আষাঢ়, ১২৮০ (১৮৭৩)
১৭। বেঙ্গল ম্যাগাজিন, ডিসেম্বর, ১৮৭৩
১৮। বেঙ্গলী, ২৭এ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩,—লণ্ডন, 'স্পেক্টেটর'এর উদ্ধৃতি।
১৯। ভারত সংস্কারক, ২১এ মে, ১৮৭৪
২০। ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন, কলকাতা, ১২ই জানুয়ারি, ১৮৮২

এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত 'বিশ্বদূত', 'বঙ্গবন্ধু', 'সমবেদক', 'হালিশহর পত্রিকা' প্রভৃতির উদ্ধৃতিগুলি ১৮৭৩'র 'নেটিভ প্রেস রেকর্ডস', পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মহাফেজখানা থেকে সংগৃহীত। এছাড়াও দুটি বই থেকে সাহায্য নিয়েছি—সুপ্রকাশ রায় রচিত 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, এবং প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া'।

ত্রৈলক্য মহারাজ স্মরণে

মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি পূর্বপাকিস্তান থেকে ভারতে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল সংগ্রামে লড়াইয়ে ধ্বস্ত দেহ-বার্ধক্যের কবলিত জীর্ণ শরীর একটু সারিয়ে তোলা, পুরনো বিপ্লবী বান্ধব-স্বজন-পরিজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ভারতের নওজোয়ানদের কাছে জানানো, পূর্ববঙ্গের অকুতোভয় অসাম্প্রদায়িক জাতীয় পুনরুত্থানের সংবাদ। বলেছিলেন, 'আবার পূর্ববঙ্গে ফিরে যাবো'। ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তীর মৃত্যু—উপমহাদেশের দু-অংশকে শোকার্ত করেছে। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সেতুবন্ধনে দুটি দেশের মৈত্রীসন্ধ মানুষ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এই পুবোধা যোদ্ধার মৃত্যুতে যে-রক্তের আত্মীয়তা অনুভব করলেন তা অক্ষয় হোক।

কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি মহারাজের প্রসঙ্গে মনে পড়ে। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরের গোড়ার দিক। আমার অগ্রজ শ্রী প্রিয়নাথ রায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম জগন্নাথ স্টিমার ঘাটে। কে যেন কলকাতা থেকে আসবেন। নামলেন ত্রৈলক্য মহারাজ, রবি সেন ও রমেন আচার্য। আমার পরিচয় জেনে মহারাজ বুকে টেনে নিলেন। পাশেই খরস্রোতা যমুনা (ব্রহ্মপুত্র)। বললেন, তোমার দাদা অনায়াসে এ-নদী সাঁতরে পার হতে পারেন। তুমি পারবে তো? মনে পড়ে না কি উত্তর দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই বিশাল হৃদয়ের যে-পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম, তার টান সারা জীবনেই কাটাতে পারলাম না।

ঘটনাচক্রে আমি গেলাম 'যুগান্তর' দলে। প্রায় ছ-মাস পরে মহারাজ এলেন আমাদের বাড়িতে। ফেরারী। আমার মা, মামা, দিদিমা ছিলেন মহারাজের গুণমুগ্ধ। বহুবার তিনি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা মাথায় নিয়ে আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। আমার উপরে তাঁর স্বাভাবিক দাবিই ছিল। তিনি ছিলেন 'অনুশীলন' দলের নেতা। যুগান্তর অনুশীলনের সেই বিরোধের যুগে, তাঁর কাছে কোনো অবহেলা পাইনি। বলেছিলেন দুটি কথা, 'খাঁটি থেকো'। বিপ্লবীর কাছে একনিষ্ঠতাই তো অন্যতম শ্রেষ্ঠ দাবি।

১৯৩০ সালে জেলখানাতেও দেখেছি সেই মুক্ত হৃদয়ের অভিব্যক্তি। বহরমপুর জেলে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রাজবন্দী এমনকি সাধারণ কয়েদিও ছিল তাঁর সেবার মহিমায় নিকটজন। বহরমপুর জেলে রাজবন্দীদের উপরে নির্যাতনের প্রতিবাদে তাঁর সিংহসদৃশ দৃপ্ত মূর্তি কোনোদিন ভুলবার নয়।

ত্রৈলক্যদার বিপ্লবী জীবনের সূত্রপাত স্কুলজীবন থেকেই। মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সাটিরপাড়া বিদ্যালয়ে যখন তিনি ছাত্র, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ারের ঢেউ সেখানেও আছড়ে পড়েছিল। ১৯০৬ সালে মহারাজ বরদাবাবুর সঙ্গে 'অনুশীলন' দলে যোগ দেন। ১৯০৮ সালে তাঁর ছ-মাসের জন্য কারাদণ্ড হয়। কারামুক্তির পর অনুশীলন দলের তিনি একজন প্রথম সারির নেতা হয়ে ওঠেন। 'ভবানী মন্দিরে'র প্রেরণায় দুর্গম অরণ্যে পাহাড়ে তিনি কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র গঠন করেন। এমনি একটি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল ত্রিপুরার উদয়পুর ও বিলোনিয়া পাহাড়ের মধ্যে। এই উদয়পুরের শিক্ষাশিবিরের ভার ছিল ত্রৈলক্যনাথের উপরে। অস্ত্রশিক্ষা ও অস্ত্র তৈরি, বিপ্লবীদের মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি প্রভৃতি তদারক করতেন কালীচরণ। কালীচরণ ত্রৈলক্যনাথেরই ছদ্মনাম। ইতিমধ্যে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় কালীচরণের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বের হয়। পুরস্কারও ঘোষিত হয়। ত্রৈলক্যনাথ বিপদ এড়াতে ফেরারী হন।

কালীচরণের ফেরারী জীবন বড়ই রোমাঞ্চকর। ঔপন্যাসিকের কল্পনাকে হার মানায়। কখনো বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কখনো-বা মেঘনা-পদ্মার উত্তাল তরঙ্গ শীর্ষে নৌকার মাঝি। নানা ছদ্মবেশে পূর্ববঙ্গের নানা বিপ্লবী কেন্দ্রে তিনি যোগাযোগ রাখতেন। এই সময় মৈমনসিংহের সুজায়াটা রাজনৈতিক ডাকাতির পর তিনদিনে পঁচাশী মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে মানিকগঞ্জের তিল্লী গ্রামে পৌঁছলেন সহকর্মী যোগেন রায়ের বাড়িতে। পকেটে মাত্র পাঁচ পয়সা। ছোলাভাজা ও খেয়ার পারানি দিতেই দু-পয়সা খসে গেছে। কেদারপুরের ডাকাতি, বাররা ডাকাতির দুঃসাহসী অভিযান, গোয়ালন্দ স্টিমার ঘাটে অত্যাচারী ইংরেজ জিলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এলেনকে হত্যার প্রচেষ্টা প্রভৃতি নানাবিধ দুঃসাহসিক বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার মধ্যমণি হিসেবে ত্রৈলক্যনাথ ইংরেজ সরকারের ত্রাস রূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি উত্তর ভারতের অনুশীলন দলের অন্যতম নেতা রাসবিহারী বসুর সঙ্গে নানাবিধ কার্যকলাপের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলেন। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা ১৯১০ ; প্রথম বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা ১৯১৩-১৪ ও রাজাবাজার বোমা মামলা ১৯১৩ প্রভৃতিতে ইংরেজ সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি।

অবশেষে দলের এক ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় ১৯১৪ সালে দ্বিতীয় বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি ধৃত হয়ে ১৫ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ার মৃত্যু-কুঠরীতে নির্বাসিত হন।

প্রবাদ আছে যে আন্দামানে যেখানে রয়াল বেঙ্গল টাইগারদের মেষশাবকে পরিণত করা হতো সেইখানে শত উৎপীড়নের মধ্যেও ত্রৈলক্যনাথ অসামান্য বিপ্লবী সাহস, ধৈর্য ও জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। ক্ষয়রোগ তাঁকে নিঃশেষ করতে পারেনি। তাঁর দুর্দান্ত বৈপ্লাবিক দৃঢতার জয় হলো।

১৯২৪ সালে প্রথমভাগে সবাইকে যখন মুক্তি দেওয়া হয় মহারাজও মুক্তিলাভ করেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারে তখন ভাটা পড়তে আরম্ভ করেছে। বাঙলাদেশের বিপ্লববাদীরা আবার সক্রিয় হতে আরম্ভ করেছেন।

চার্লস টেগার্টের ওপর গোপীনাথ সাহার আক্রমণের সঙ্গেসঙ্গে—১৯২৪ সালে অর্ডিনান্স বলে যেসব প্রথম সারির বিপ্লববাদীদের অবরুদ্ধ করা হয় মহারাজ তাঁদের মধ্যে একজন।

১৯২৪ থেকে ১৯২৮ সালে তিনি সুদূর বার্মায় মান্দালয় জেলে আটক থাকেন। এই সময়ে তাঁব সহবন্দীরূপে ছিলেন যুগান্তর বিপ্লবী নেতা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি।

১৯২৮ সালে সমস্ত বিপ্লবী দলগুলি, বিশেষ করে অনুশীলন, যুগান্তর ও উত্তর ভারতের হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি একটি সমন্বিত কমিটির মাধ্যমে বিপ্লবী কর্মোদ্যমের কার্যক্রম গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য মহারাজ এই মিলিত কর্মোদ্যমের অন্যতম নায়ক ছিলেন, অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নবেন সেন, রবি সেন, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও ভূপেন দত্ত প্রভৃতি। এই মিলিত উদ্যোগ তেমন সফল না হলেও, অনুশীলন ও যুগান্তর ভিন্নভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এমনি সময়ে আকস্মিকভাবে ঘটল চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ। ফলে ১৯এ এপ্রিল তারিখেই মহারাজ সহ এই দুই দলের নেতৃবৃন্দ আবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন।

১৯৩০ থেকে ১৯৩৮ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি ভারতের বিভিন্ন জেলে কাটান। প্রধানত তিনি দক্ষিণ ভারতে রাজমহেন্দ্রী; ভেলোর বেলগাও; রত্নগিরি প্রভৃতি জেলে ছিলেন। বর্তমান ভারতের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের মধ্যে কামরাজ, এ কে গোপালন, এন জি রঙ্গ প্রভৃতি তখন স্বাধীনতা আন্দোলনে সবেমাত্র কারাগারে এসেছেন।

১৯৩৮ সালের মুক্তিলাভের পর তিনি দেশের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তনের স্রোত অনুভব করেন। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ,

সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার তাঁর চিন্তার ও কর্মের রাজ্যে বিরাট পরিবর্তন আনে। বামপন্থী আন্দোলনের জোয়ারের মধ্যে তিনি ও তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলে ও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন।

এই সময়ে ১৯৩৯ সালে তিনি সুভাষচন্দ্রের কর্মোদ্যোগের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করে ভারতের বিভিন্ন অংশে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৪০ সালের প্রথম দিকে চট্টগ্রামের রাজদ্রোহের অভিযোগে তিনি আবার কারারুদ্ধ হন ও যুদ্ধের সময়ে হিজলী বন্দীনিবাসে অন্তরীণ থাকেন। ১৯৪৬ সালের ৩০শে মে তিনি মুক্ত হন ও ১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর নিজের মাতৃভূমি পূর্ববাঙলা তার সংগ্রামের কর্মক্ষেত্র হিসাবে নির্বাচন করেন। ১৯৪৮এর অভূতপূর্ব গণজাগরণের তরঙ্গ শীর্ষে—পাকিস্তানের সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করে রাখেন।

১৯৫৬ সালের পরে পূর্ববাঙলায় আবার ছাত্র-যুব আন্দোলনের স্রোত ধীরে ধীরে প্রবল আকার ধারণ করে। রাজবন্দীদের মুক্তি সে-আন্দোলনের অন্যতম দাবি ছিল। ত্রৈলক্য মহারাজ অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে মুক্তি লাভ করেন ও তাঁকে নিজগ্রাম কালাসাটিয়াতে অন্তরীণ করে রাখা হয়।

এরপর তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও পূর্ববাঙলার ছাত্র-যুব জাগরণের প্রতিটি গৌরবদৃপ্ত পদক্ষেপ অন্তর দিয়ে লক্ষ্য করেন। ভারতে প্রতিটি সম্বর্ধনার সেটাই তাঁর দুটি দেশের সৌভ্রাতৃত্বের পক্ষে শ্রেষ্ঠতম আশার বাণী ছিল।

পূর্ববাঙলার বিপ্লবী ছাত্র-যুব সমাজ এক নতুন সমাজ বিপ্লবের নায়ক। ধর্মউন্মাদনা দিয়ে তাদের আর প্রতারিত করা সম্ভব হবে না। তাঁরা নতুন সমাজ গড়বেই গড়বে। সেই সমাজের ভিত্তি হবে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার। নয়াদিল্লীর লোকসভায় ভারতের নাগরিকদের প্রতি জীবনের সর্বশেষ আবেদনের মধ্যে তিনি পাক ভারত মৈত্রীর পথেই এই উপ-মহাদেশের স্থায়ী শান্তি ও সমাজবিপ্লবের জয়যাত্রার ভবিষ্যৎবাণী করে গেলেন।

আজ মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন যেন শুধু আনুষ্ঠানিক ভক্তিবাদে পর্যবসিত না হয়। তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপায়ণের পথে, সংগ্রামের মধ্যে তাঁর প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন হবে।

শান্তিময় রায়

ই. এম. ফর্স্টার

অত দীর্ঘ দিন বেঁচে ও অত কম লিখে ফর্স্টারের মতন অত বিরাট খ্যাতি আর কোন লেখক অর্জন করেছেন বলতে পারি না। ফর্স্টারের এক-একটি বই বেরোতো আর মুগ্ধ পাঠকবৃন্দ আকুল হয়ে অপেক্ষা করত এর পরের বইয়ের জন্যে, আব প্রত্যাশিত বই বেবোতে যতই দেরি হতো তাঁর খ্যাতি ততই বাড়তে থাকত। কিছু না লিখে তিনি একাদিক্রমে পঁচিশ বছর কাটিয়েছেন। কিন্তু এই দীর্ঘ সময় তাই বলে তিনি নীরব থাকেননি, কেননা তাঁকে সর্বদাই ঘিরে থাকত তাঁর ভক্ত ও বন্ধুদের চক্র আর এই চক্রের প্রাণশক্তি যোগাতেন তিনি নিরন্তর আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে। তাঁর বন্ধুপ্রীতি ছিল এতই প্রবল যে অনেকের মতে প্রয়োজন হলে বন্ধুকে বাঁচানোর জন্যে দেশকে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হতেন না।

ফর্স্টারের বন্ধু ও শিষ্য বলে যারা গণ্য তাঁদেব মধ্যে একাধিক ভারতবাসীর নাম উল্লেখযোগ্য। যথা, মুলুকরাজ আনন্দ, রাজা রাও, আমেদ আলি। এঁদের প্রত্যেকেরই অন্তত একটি বই ফর্স্টারের আনুকূল্য ছাড়া প্রকাশিত হতো কিনা সন্দেহ। এঁরা ও আরো অনেকেই ফর্স্টারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁর একটি বইয়ের জন্যে 'এ প্যাসেজ টু ইনডিয়া'। অনেকের মতে এইটিই নাকি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই প্রসঙ্গে একটি ব্যক্তিগত ও 'পরিচয়'গত ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ত্রৈমাসিক পত্রিকা চালানো যখন দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল, সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আমাকে বললেন, "একটি ভালো উপন্যাস না পেলে মাসিক পত্রিকার কথা ভাবা যেতে পারে না। বাঙলায় সেরকম উপন্যাস পাবার সম্ভাবনা কম। তুমি যদি ফর্স্টারের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'এ প্যাসেজ টু ইনডিয়া' অনুবাদ করে দাও তাহলে তা মাসে-মাসে প্রকাশ করা যায়।" আমি সর্বনাশ গণলাম। ঐ বিরাট বই আর ঐ আশ্চর্য রচনাভঙ্গি! সুধীন আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "পুরো বইটা নয়, খানিকটা অংশ আমি বেছে রেখেছি যাতে একটা পুরো গল্প হয়। আর ফর্স্টারের গদ্য বাঙলায় রূপান্তরিত করা খুবই গোলমেলে কাজ, কিন্তু তুমি চেষ্টা করলে নিশ্চয় একটা কিছু দাঁড় করাতে পারবে।"

. ১৯৩৭ সালের কথা, বছর দুয়েক ধরে অনুবাদ বের হলো 'ভারত-পথে' শিরোনামায়। কিছু একটা যে দাঁড় করাতে পেরেছিলাম তার সাক্ষ্য আমার

কাছে আছে রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপিতে। কিন্তু বাকি বইটা আমি আর অনুবাদ করার মতন উৎসাহ সঞ্চয় করতে পারিনি, কেননা কোনো প্রকাশকের কাছ থেকেই ভরসা পাইনি যে এ-বইটি বাঙালি পাঠকদের মনোরঞ্জন করবে। অনেকে বলেছিলেন, এর চাইতে এডমণ্ড ক্যাণ্ডলার-এর 'এ্যাবডিকেশন' বইটি আকারে ছোট এবং অনুবাদ করাও সহজ, এবং বাঙালি পাঠকদের তা অনেক বেশি প্রিয় হবে। সুতরাং আমি কিছুই না করবার একটা ছুতো পেলাম।

যাইহোক ফর্স্টার ভারতবর্ষে যাতায়াত করেছেন, ভারতবর্ষকে ভালোবেসেছেন এবং ভারতবর্ষকে বুঝবার যে চেষ্টা করেছেন তার প্রমাণ জ্বলজ্বল করছে 'এ প্যাসেজ টু ইনডিয়া'র পাতায়-পাতায়। তার জন্ম ভারতবাসীর তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকার কারণ আছে।

ফর্স্টার যে আগ্রহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি অনুবাদ পড়তেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'এবিঞ্জার হার্ভেস্ট' বইতে। নানা প্রসঙ্গ নিয়ে এলোমেলো নানা কথায় ভরা বইটি। কিন্তু কথাগুলি ক্ষুরধার। 'ঘরেবাইরে'র ইংরাজি অনুবাদ পড়ে ফর্স্টার মন্তব্য করেছেন, "ভালগার"; এর বাঙলা অনুবাদ 'ইতর' করলে সে-অনুবাদও ইতর হবে। তবে এইটুকু আমি জোর করে বলতে পারি, 'ঘরেবাইরে' উপন্যাস প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এমন একটা চড়া পর্দায় লেখা, ইংরেজী অনুবাদে যা প্রায় বেসুরো শোনায়। বাঙলার কথা আলাদা। গল্প-রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ যদি অসাধারণ গদ্য-রচয়িতাও না হতেন তাহলে আমরা তাঁর অনেক গল্প-উপন্যাসেরই পুরো রসগ্রহণ করতে পারতাম কিনা সন্দেহ। 'ঘরেবাইরে' বাঙলা গদ্য একটা নতুন মোড় নিয়েছে আর তাই এই উপন্যাসটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি খরস্রোতা নদীর মতো।

ফর্স্টারের কথা প্রসঙ্গে এসে পড়লাম বহুদূরে। আবার ফর্স্টার প্রসঙ্গ দিয়েই শেষ করি। ফর্স্টার ছিলেন সত্যিকারের যাকে বলা যায় গুণীদের মধ্যে গুণী। কিন্তু আর যাইহোক তিনি নির্লিপ্ত নির্বিকার শিল্পসাধক ছিলেন না, তার প্রমাণ তাঁর দুটি কথা, "Only connect." এই হলো শিল্পী হিসেবে তাঁর চরম দান।

"Only connect···! Only connect the prose and the passion, and both will be exalted, and human love will be sun at its light. Live in fragments no longer···connect without bitterness until all men are brothers."

হিরণকুমার সান্যাল

নিয়মিত অধ্যয়ন ছাড়া প্রকৃত অধ্যাপনা চলে না। নিত্য নব জ্ঞানান্বেষণ না করলে চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই সীমিত প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হয়। কোনো কোনো অধ্যাপক নিয়ত জিজ্ঞাসু হয়ে যে-জ্ঞান ও বিদ্যা আহরণ করেন তা শুধু ক্লাসের অধ্যাপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন না, বিদ্যায়তনের চৌহদ্দির বাইরেও তা প্রসারিত করতে প্রয়াসী হন। অধ্যাপক ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য ছিলেন তেমনি একজন জ্ঞানান্বেষী। তাই বিদ্যায়তনের বাইরে সাধারণ সাংস্কৃতিক জগতের বিশেষ করে নাট্য জগতের সঙ্গে যেমন ছিল প্রত্যক্ষ সংযোগ তেমনি নিজের আহৃত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে যতটা সম্ভব সম্পদ পরিবেশন করে সাংস্কৃতিক জ্ঞানকে উন্নত করার দিকে ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। তাই তিনি একটি কঠিন বিষয় বেছে নিয়েছিলেন—তুলনামূলক নন্দনতত্ত্ব। বলতে দ্বিধা নেই এদিক থেকে বাঙলা সাহিত্য আজো পর্যন্ত যথেষ্ট অপরিপুষ্ট। বিশেষত আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শিল্পকলার বিচার খুব কমই হয়ে থাকে। অনেকেই ঊনবিংশ শতকের নান্দনিক বিচারের মানদণ্ডে ফেলে আধুনিক শিল্পসাহিত্যের মূল্যায়নে চেষ্টিত হন। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর যে সামাজিক দৃষ্টি অনেকখানি পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং তার প্রতিফলন যে আধুনিক শিল্পসাহিত্যেরও ওপর পড়ছে, রাজনৈতিক বিদ্বেষবশত অনেক সমালোচকই সে-দিকটি এড়িয়ে যান। কিন্তু ডক্টর সাধন ভট্টাচার্য অত্যন্ত সচেতনভাবে এদিকে দৃষ্টি রেখে আধুনিক শিল্পকলার, বিশেষভাবে বাঙলা নাট্যসাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে উদ্যোগী হন এবং এক্ষেত্রে যথেষ্ট বলিষ্ঠতার পরিচয় দেন। এদিক দিয়ে তাঁকে পথিকৃৎ বললে অত্যুক্তি হবে না।

বাঙলা নাট্যসাহিত্যের বিচারের যথার্থই কোনো মানদণ্ড ছিল না। ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করাই ছিল রেয়াজ। ডক্টর ভট্টাচার্যই প্রথম আধুনিক দৃষ্টিতে নাট্যসাহিত্য ও নাট্যকথা বিচারের একটা সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক মানদণ্ড নিরূপণে প্রয়াসী হন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন চল্লিশোত্তর দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গে যে একটি নব নাট্যধারা জন্ম নিয়েছে তার মূলে আছে নতুন সমাজচেতনা। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা সেটিকে উপলব্ধি করার জন্যেই তিনি এই নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত করেছিলেন। নাট্যানুষ্ঠানে, বিতর্কসভায়, নাটকের বিচারমণ্ডলীতে এই কারণেই তাঁকে প্রথম সারিতে দেখা যেত। বিনা বিচারে, বিনা বিশ্লেষণে কিছু গ্রহণ করা ছিল তাঁর

স্বভাববিরুদ্ধ। এজন্যে অনেকে পরিহাস করে তাঁকে বলতেন তিনি নাটকের শব ব্যবচ্ছেদকারী। কিন্তু বিরূপতা যতই হোক, নিজের মত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে তিনি কখনো কুন্ঠিত হতেন না। যুক্তির দ্বারা নিজের মতকে দৃঢ়ভাবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করতেন। এটাই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

নাট্যতত্ত্ব নিয়ে চর্চা করতে করতেই তিনি আপেক্ষিক নন্দনতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট হন। এজন্যে তাঁকে প্রভূত পরিশ্রম করতে হয়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে বিশ্বের সেরা নন্দনতাত্ত্বিকদের চিন্তার সঙ্গে এ-যুগের বাঙালি ছাত্রদের খানিকটা পরিচয় না হলে চিন্তার বিবর্তন সম্পর্কে কোনো ধারণা এবং এ-যুগের শিল্প-সাহিত্যের প্রকৃত মেজাজ বোঝা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সংস্কৃত ভাষায়ও দখল থাকায় প্রাচীন ভারতীয় নান্দনিক চিন্তার সঙ্গে তিনি নিজেকে পরিচিত করতে পেরেছিলেন এবং পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে তার তুলনামূলক বিচারে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই জ্ঞানপিপাসাই তাঁকে সাধনায় নিমগ্ন করে এবং পর পর তিনি শিল্প-সাহিত্যের তাত্ত্বিক বিষয়ে পুস্তক রচনা করে যেতে থাকেন। সবক্ষেত্রে তাঁর বিশ্লেষণ অকাট্য এবং প্রতিটি সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত জোর করে অমন কথা বলা না গেলেও জ্ঞানান্বেষণে তিনি যে অকৃত্রিম ও অনলস ছিলেন তা অবশ্য স্বীকার্য। তাঁর শ্রমলব্ধ সম্পদ সম্বল করে এ-পথে আরো গবেষণা, বাঙলা সাহিত্যের নান্দনিক চর্চা ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবে সে-কথা নিশ্চয় করে বলা যায়।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ডক্টর ভট্টাচার্যের প্রাণ। জন্মকাল থেকেই তিনি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কার্যত তাঁরই চেষ্টায় এখানকার নাট্য বিভাগটি গড়ে ওঠে এবং নাট্য বিভাগের পাঠ্যতালিকা মূলত তাঁরই হাতের রচনা। ছাত্রবন্ধু হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। বন্ধু বাৎসল্যের জন্যেও তিনি অনেকেরই কাছে ছিলেন আপনজন। এমন একটি মূল্যবান জীবনের অপ্রত্যাশিত অবসান হলো গত ১০ই জুলাই। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের দরুণ তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীর বেদনা বোধ করছি। তাঁর প্রারব্ধ কর্মের প্রবহমানতা যদি উত্তরাধিকারীরা রক্ষা করতে পারেন তবেই হবে ডক্টর ভট্টাচার্যের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়